শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭-৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

কাহিনী সূচী

* মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ এই খণ্ডের কয়েক জায়গায় পৃষ্ঠাঙ্ক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু এজন্য পাঠক্রমের কোনও ত্রুটি হয়নি।

ভূমিকা

়থিবীর প্রত্যেকটি জাতির কথা-সাহিত্যে দুটি ধারা বিদ্যমান—একটি ়খিক কথা-সাহিত্যের ধারা, অন্যটি লিখিত কথা-সাহিত্যের ধারা। মৌখিক ়াহিত্যের ধারাই পৃথিবীর আদি গল্পকাহিনীর উৎসভূমি, যাকে পরবর্তী ়. লোক-কথা বা ইংরাজীতে 'Folk Tale'[১] রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ়িখত কথা-সাহিত্য—উপন্যাস, ছোট গল্প, রচিত হবার বহু পূর্ব থেকেই ়মগ্র পৃথিবীব্যাপী মৌখিক রূপে প্রচারিত লোক-কথার আধিপত্য ছিল। এ় লোককথাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব সভ্যতার বহু সহস্রবর্ষব্যাপী রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্যেও পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে জীবিত থাকা এবং লোকসাধারণের মধ্যে সর্বজনীন প্রচার লাভ করে তাদের যুগযুগান্তর ধরে তৃপ্তি দান করা। লোককথা আবার বিভিন্ন ধরণের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত, কখনও Marchen, কখনও Household Tales, কোন দেশে Fairy Tales বা Animal Tales রূপে অভিহিত। ঐতিহ্যগত ভাবে বংশপরম্পরায় দেশ-দেশান্তরের মধ্যে প্রবাহিত ও প্রচারিত হওয়াই এ-জাতীয় গল্পকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা চলে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোককথার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি সর্বজনীনতা থাকে যা দ্বারা এই সব কাহিনী সকল দেশের সকল সমাজের কাছেই আদরণীয় ও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। লোক কথার চরিত্রগুলি তাই নির্বিশেষ। এক রাজা, বা এক গরীব কাঠুরে, বা বোকা জেলে, এক যে ছিল শেয়াল ইত্যাদি নির্বিশেষ রূপে পরিবেশন করা হয়। ফলে লোক-কথাগুলি সর্বকালীন ও সর্বদেশীয় হয়ে ওঠে। লিখিত কথা-সাহিত্য উপন্যাস, গল্পকাহিনীর মধ্যে একটি স্থানীয়,

১. Although the term "folk tale" is often used in English to refer to the "house hold tale" or "fairy tale" (the German Marchen), Such as "cinderella" or "Snow white", it is also legitimately employed in a much broader sense to include all forms of prose narrative, written or oral, which have come to be handed down through the years. In this usage the important fact is the traditional nature of the material. In contrast to the modern story writer's striving after originality of plot and treatment, the teller of a folk tale is proud of his ability to hand on that which he has received.

[The Folk Tale—Stith Thompson. N. Y. Ed. 1946. P.—4]

দেশীয়, সামাজিক গণ্ডীবদ্ধতা থাকে। কিন্তু মৌখিক কথা-সাহিত্য—লোক-কথার মধ্যে সেরূপ কোন সঙ্কীর্ণতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ মৌখিক লোক-কথাগুলির প্রচার, জনপ্রিয়তা ও দীর্ঘকাল টিঁকে থাকার মধ্যে যে প্রাণশক্তি (vitality) লক্ষ্য করা যায় তার প্রধান কারণ হচ্ছে লোক-কথার গল্প বলায় একটি নিজস্ব ঐতিহ্যগত ভঙ্গি।[২] গল্প-ছড়া-সংলাপ-ছড়া-গল্প এই ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তির দ্বারা যে রীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, পৃথিবীব্যাপী তারই ফলে বহুকালের ব্যবধানেও বিষয়বস্তুর পার্থক্য সত্ত্বেও গল্পগুলি টিঁকেছিলো লোকস্মৃতিতে যা পরবর্তীযুগে কোন সংগ্রাহকের দ্বারা সংগৃহীত হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, পৃথিবীর তাবৎ লোক-কথাগুলির বলার ভঙ্গি একই ধরণের বলেই একে অপরের কাছ থেকে গল্প ও কাহিনীগুলি অতি সহজেই গ্রহণ করেছে। তৃতীয়তঃ লোক-কথাগুলির জনপ্রিয়তা ও টিঁকে থাকার আর একটি কারণ হচ্ছে এর সারল্য ও স্বচ্ছতা। লোক-কথায় সাধারণত আধুনিক কথা-সাহিত্যের সমস্ত জটিলতা পরিহার করা হয়ে থাকে। জটিল কাহিনী এবং জটিল বর্ণনা দ্বারা লোক-কথা ভারাক্রান্ত হয় না। লিখিত কথা-সাহিত্যে যে বর্ণনার অতিরঞ্জন এবং কৃত্রিমতা দেখা যায়, অতি রোমাণ্টিকতার উদ্দাম উল্লাস যেমন এর কাহিনীকে মর্ত্যের সকল সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এক অনির্দেশ্য ঊর্ধ্বলোকের দিকে ধাবিত করে, লোক-কথা বা মৌখিক কথা-সাহিত্যে তা লক্ষ্য করা যায় না।[৩] এ ছাড়াও লিখিত কথা-সাহিত্যের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও দর্শন-চিন্তা বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। ফলে তা সর্বজনের সর্বদেশের, সর্বকালের সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। লোক-কথা কিন্তু সেই স্থান গ্রহণ করতে পারে।

চতুর্থতঃ বিশ্বের লোক-কথাগুলির সর্বজনীনত্ব, প্রবহমানতা ও জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে লোক-কথাগুলির পরিবর্তনশীলতা। পরিবর্তন, রূপান্তর ও নবসংযোজন লোকসাহিত্যের সাধারণ ধর্মগুলির অন্যতম—একথা পৃথিবীর সমস্ত লোকশ্রুতিবিদ আলোচনার সূত্রে প্রমাণ করেছেন। আবার লোক-সাহিত্যের মধ্যে লোক-কথার বৈশিষ্ট্যের বিচারে উপরোক্ত বিষয়গুলি

২. This oral art of tale-telling is far older than history, and it is not bounded by one continent or one civilization. Stories may differ in Subjects from place to place, the conditions and purposes of taletelling may change as we move from land to land or from century to century, and yet every where it ministers to the some basic social and individual needs.

বেশী লক্ষ্য করা যায়। লিখিত কথা-সাহিত্যে—উপন্যাস ইত্যাদির মধ্যে যেমন লেখকের ব্যক্তি-মানসিকতা পরিমার্জিত হয়ে একটি অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে, লোক-কথায় সে-জাতীয় অনমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় না ; বরং এর পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত রূপ দেশে দেশে প্রচার লাভ করে এবং যুগে যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও খাপ খাইয়ে নিয়ে টিঁকে থাকে ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

লোক-কথার বৈশিষ্ট্য অন্বেষণে আমরা একথা স্পষ্ট অনুভব করেছি যে পৃথিবীব্যাপী যে-সব লোক-কথার আবির্ভাব ঘটেছিলো, তার অধিকাংশের অবলুপ্তি ঘটলেও লোক-কথার প্রচার, জনপ্রিয়তা প্রবহমানতার ফলে বহু সংগ্রাহক, গল্প-কথক, সংকলক-এর প্রচেষ্টায় পৃথিবীর সব দেশেই কিছু কিছু লোক-কথা সংগৃহীত হয়ে প্রতিভাধর সংকলকের দ্বারা সুগ্রথিত হয়েছে। এখন এই সব সংকলনগুলিকে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও এর অন্তর্গত গল্পগুলি যে প্রচলিত লোক-কথা (traditional Folk Tale) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক কালের মৌখিক ঐতিহ্যানুসারী গল্পগুলি আজ লিখিত গল্প কাহিনীতে রূপ নিয়েছে। এই সংকলনগুলির মধ্যে পৈশাচী ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা', পালিভাষায় লিখিত বুদ্ধ জীবন কাহিনী 'জাতক', সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'কথা সরিৎ সাগর', 'বৃহৎ কথা-মঞ্জরী', 'দশকুমার চরিত', 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', আরবী ভাষায় লিখিত 'আলেফ্ লয়লা-ওয়া-লয়লা' বা সহস্র এক আরব্য রজনী অন্যতম। উপরোক্ত সংগ্রহগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সংগ্রহগুলি ভারতবর্ষেই সংকলিত হয়েছিলো। পারস্যে আরবী ভাষায় 'সহস্র এক আরব্য রজনীর' যে গল্পগুলি সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছিলো তার সঙ্গে ভারতীয় গল্প-সংকলনগুলির বহু গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাইরে সংকলিত গল্পের বৃহত্তম সংকলন হচ্ছে 'সহস্র এক আরব্য রজনী।'

আলেফ্ লয়লা ওয়া-লয়লা আরবী ভাষায় রূপকথা ও অন্যান্য গল্প সংগ্রহ। আজকাল অনেকেই সহস্র এক রজনীর রূপকথার মত গল্প পাঠ করে থাকেন বা শুনে থাকেন এবং বাস্তবিকই রূপকথার গল্পগুলিও এরূপ সংগ্রহের একটি যথাযথ অংশ। প্রাচ্যদেশীয় জনগণের মত আরববাসীরাও প্রাচীনকাল থেকেই কাল্পনিক গল্পগুলি পাঠ করে আনন্দলাভ করত। ইস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসীদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্থূল আনন্দভোগোপকরণ প্রধানতঃ অন্যস্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন—পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে, যা আমরা আল-নাদারের (al-Nadr) বিবরণ থেকে পাই। পরবর্তীকালে আরবী সভ্যতা যখন উন্নত ও সুসংগঠিত হয়েছিল তখন অপর দেশ থেকে সাহিত্য প্রভাবও তাকে নিশ্চিতভাবেই আরও শক্তিশালী করেছিল। সহস্র এক রজনীর কোন আগ্রহশীল পাঠক শুনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, গল্পগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়সূচীতে পূর্ণ ; তাদের দেখে মনে হয়, একটি সড়কে প্রাচ্যদেশীয় তৃণাচ্ছাদিত বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প-সমূহ একাধিক

আলাহার সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে। অপর পক্ষে পাঠকও লক্ষ্য করতে পারেন গল্পগুলি একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত ; একদিকে সলোমনের গল্প, পারস্যের প্রাচীন রাজাদের গল্প, বীরদর্পী আলেকজাণ্ডারের গল্প সুলতানদের, খলিফাদের গল্পগুলি আর অপরদিকে আছে অতিমূল্যবান রত্ন, কফি এবং তামাক প্রভৃতির উৎস কথা।

য়ুরোপে আবির্ভাব ঃ সহস্র রজনীর রচনাসমগ্র যেন এক ছকে বাঁধা গল্পের পুষ্পস্তবক। এই রীতি মধ্যযুগে ইটালীতে পরিচিত ছিল। গিওভানী সারকোবীর [Giovanni Sercawbi] (১৩৪৭-১৪২৪) উপন্যাসের মধ্যে এবং অ্যাসুটোলফো ও গিয়কণ্ড (Astolfo and Giocondo) এবং অ্যারিষ্টো [Aristo] রচিত অরল্যাণ্ডে ফারিসোতে এর সন্ধান পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে ভ্রমণকারীবৃন্দ যাঁরা প্রাচ্যভ্রমণে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা ইটালীতে এই বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবতঃ বহন করে আনেন। কিন্তু সম্পূর্ণ আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা য়ুরোপভূমিতে আঠারোশো শতকে এবং উনিশ শতকে পৌঁছায়। ফরাসী মনীষী এবং ভ্রমণকারী জেন অ্যানটনী গ্যালাণ্ড (Jean Antoine Galland ১৬৪৬-১৭১৫) প্রথমে এটি প্রকাশ করেন। সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণকালে প্রথমে তিনি ফরাসীদূতের সম্পাদক রূপে ছিলেন। পরবর্তীকালে সৌখীন পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ছিলেন। প্রাচ্যের প্রতি আকর্ষণেই তিনি রূপকথা গল্প ইত্যাদি সংগ্রহকার্য পরিচালিত করেছিলেন। মৌখিক গল্পগুলির সংগ্রহের ব্যাপারে ফরাসীদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ১৭০৬ খৃঃ থেকেই—"Les mille et une Nuits cantest arabes tradutist en Francais"এর—খণ্ড সমূহ প্রকাশ করতে সুরু করেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাতটি খণ্ড, নবম ও দশম খণ্ডটি ১৭১২ এবং একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডটি গ্যালাণ্ডের মৃত্যুর দু'বছর পর ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বিলম্বের কারণ, পরবর্তী গল্পগুলির ক্ষেত্রে গ্যালাণ্ডের অসুবিধা হয়েছিল উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে এবং এ ছাড়াও তাঁর মনীষার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য ঘটেছিল। তিনি জন্মগতভাবেই গল্পকথক এবং সুন্দর গল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল তীক্ষ্ণ এবং তাকে সুন্দর করে বলার দক্ষতাও তাঁর ছিল অসামান্য, সেজন্য তিনি তাঁর য়ুরোপীয় অনুবাদগুলি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেন। য়ুরোপবাসী পাঠকদের রুচি অনুসারে অনুবাদে তিনি আরবী-গ্রন্থের শব্দ ও কথা পরিবর্তন করেছিলেন যা য়ুরোপবাসীদের কাছে নূতন ছিল। এখানেই তাঁর সহস্র এক রজনীর জয় বিঘোষিত হয়। তিনি সৌভাগ্যবান ছিলেন ; যে সমস্ত উপাদান তাঁর হাতে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা থেকে তখনই তিনি বুঝেছিলেন যে, এটি সেই বৃহত্তম গল্প সংগ্রহ সহস্র এক রজনীর একটি গল্প। সে সময় সিরিয়া থেকে চার খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে পৌঁছায় এবং ঐ গ্রন্থের এক খণ্ডাংশ নেবিয়া অ্যাবটের [Nabia Abbott] গোচরে আসে। উক্ত গ্রন্থের তিনটি খণ্ড এখনও বিবলিওথেক ন্যাশনালে সংরক্ষিত আছে কিন্তু চতুর্থ খণ্ডটি খোয়া গেছে। গ্যালাণ্ডের

অনুবাদের প্রথম সাতটি খণ্ড আরবি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের প্রথম তিনটি খণ্ডের বিস্তারিত অনুবাদ এবং এতে তিনি যুক্ত করেন Sindbad Camalzaman। কামালজামান-এর অপরিচিত পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে উপাদানের অভাবহেতু তিনি তিন বছর কাজ স্থগিত রাখেন, যে পর্যন্ত না তাঁর প্রকাশক নিজ ক্ষমতায় তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়াই অষ্টম খণ্ডটি প্রকাশ করেন—যাতে স্থান পেয়েছিল Ganem (Ghanim) গল্পটি এক অপরিচিত পাণ্ডুলিপি থেকে এবং আরও দুটি গল্প Zeyn alasnam এবং Codadad পুনরায় গ্যালাণ্ড উপাদানের অভাব বোধ করতে লাগলেন এবং কাজ স্থগিত রাখলেন। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে তিনি ক্লান্ত ও বিরক্তিবোধ করছিলেন। কিন্তু ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্যটক পল লুকাসের সঙ্গী হিসেবে প্যারিসে আনীত জনৈক আলেপ্পীবাসীর সঙ্গে পরিচিত হন যে এই গল্পগুলির মৌখিক রূপ জানে। Hunna তাঁকে আরবী ভাষায় গল্পগুলি বলেন এবং গ্যালাণ্ড তাঁর পত্রিকায় সেগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। তিনি গ্যালাণ্ডকে কতকগুলি পান্ডুলিপিও দিয়েছিলেন, গ্যালাণ্ডের শেষ চার খণ্ডে যেগুলি বিশেষ কাজে লাগে। Hunna-র পাণ্ডুলিপি খোয়া যায় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আলাদীনের দুটি ও আলিবাবার একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। সহস্র এক রজনীর উৎসস্বরূপ ঐ পাণ্ডুলিপি য়ুরোপে পরিচিত হল এবং ফরাসী মূল পাঠ এবং ফরাসী ভাষা থেকে বহু ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে বহু পাঠকের কাছে এটি আরব্য রজনী নামে পরিচিতি লাভ করল।

শতাব্দীর অধিককাল ধরে গ্যালাণ্ডের ফরাসী অনুবাদ য়ুরোপে সহস্র এক রজনীর গল্প বলেই পরিচিত। দুটি গল্পের মূল আরবী গ্রন্থের হদিস নেই—তবুও সেগুলি প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় অনূদিত। অপর পাণ্ডুলিপিগুলি, যেগুলি সহস্র এক আরব্য রজনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, য়ুরোপের ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সহস্র এক রজনীর পাণ্ডুলিপির গল্পে মিল অপেক্ষা অমিল বেশি থাকায় সংকলকেরা আরবি সব গল্পকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরবর্তীকালের সংযোজন খণ্ডগুলি সেজন্য আংশিক ভাবে পৃথক এবং আংশিক ভাবে গ্যালাণ্ডের সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত।

সংস্করণ ও অনুবাদসমূহ ঃ—

আরবীয় আলেফ লয়লা ওয়া-লয়লার প্রধান প্রধান সংস্করণগুলি নিম্নলিখিত ঃ

1. The first Calcutta Edition : আরবী ভাষায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় Shuekh uhmud bin Moohummud Shirwanee ul yumunee দ্বারা কলিকাতা থেকে প্রথম খণ্ড ১৮১৪ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮১৮-তে প্রকাশিত হয়। এতে প্রথম দুই শত রজনীর গল্প এবং সিন্দবাদ নাবিকের গল্প স্থান পায়।

2. The first Butak Edition : একটি সম্পূর্ণ আরবী ভাষার

সংস্করণ। এটি ১৮৩৫-এ (মিশর থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে) কায়েরোর সন্নিকটে Butak-এ মহম্মদ আলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারী মুদ্রণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত।

3. The Second Calcutta Edition : 'আরব্য রজনীর আনন্দোচ্ছল গল্পগুলি' এই নামে আরবি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। শাহনামা সম্পাদক স্বর্গীয় Major Turner দ্বারা মিশর থেকে ভারতে আনা পাণ্ডুলিপি থেকে এটি W. H. Macnaghtenর দ্বারা কলিকাতায় (১৮৩৯-৪২) চারখণ্ডে সম্পাদিত হয়।

4. The Breslan Edition :

Habicht ইচ্ছাবশতই এক সাহিত্যিক পুরাবৃত্ত সৃষ্টি করেন এবং তিনি প্রভূত পরিমাণে সহস্র এক রজনীর ইতিহাসকে বিকৃত করেন ; কারণ টিউনেসীয় ভাষায় সহস্র এক রজনীর সংস্করণ বলে কিছু ছিল না। এর অনেক গল্প যা বহু উৎস থেকে তাঁর নিকটে এসেছিল, তা দিয়ে তিনি সহস্র এক রজনীর গল্পগুচ্ছ সেই রীতিতেই রচনা ও অনুবাদ করেন। যাহোক Macdonald স্বীকার করেছেন যে, Habicht-এর মূল গ্রন্থটি মৌখিক বর্ণনার কোন সংশোধন না করেই রচিত, সুতরাং তা প্রকৃতি বিচারে ইতরতাদুষ্ট, কিন্তু অপর মূল গ্রন্থগুলির মত পরিশোধিত নয়।

5. Later Butak and Cairo Edition.

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে Butak-এর প্রথম সংস্করণ যা কলিকাতার দ্বিতীয় সংস্করণটির অনুরূপ, বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়। Zotenberg-এর সংস্করণ, যা আঠারোশো শতকে জনৈক Shaykh এর সংগ্রহের অনুসরণে রচিত তার সঙ্গে পূর্বোক্ত সংস্করণের যোগ নিবিড়। Shaykh-এর নাম অজ্ঞাত, কিন্তু একটি নোটিশ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে শেখের মিশরীয় গ্রন্থ সম্পর্কে Zotenberg-এর অনুমান সত্য। বেরুটের জেসুইট প্রেস থেকে একটি স্বাধীন এবং পরিশ্রুত সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এটি পূর্বোক্ত সংগ্রহের অন্য পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত (১৮৮৮-৯০)।

মিশরীয় সংগ্রহ থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য অনুবাদ সমূহের কাজ চলে— Lane-এর অনুবাদ অসম্পূর্ণ কিন্তু তা খুব মূল্যবান এবং সম্পূর্ণ আলোচনা সমৃদ্ধ—এর আবির্ভাব ঘটে ১৮৩৯-এ এবং সম্পূর্ণ হয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে। 'বাটাক সংস্করণ' (১ম) থেকেই এটির সৃষ্টি। Payne-এর অনুবাদটি হয় Macnaghten সংস্করণ থেকে। এটি সম্পূর্ণ এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত। নয়খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয় (১৮৮২-৮৩), তিনটি সংযোজিত খণ্ডে Breslan ও প্রথম কলিকাতা সংস্করণ-এর (১৮৮৪) গল্প স্থান পায়। পরে আরও একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

(১৮৮৯) এই সংস্করণে Aladdin এবং Zayn at Asuam এই গল্প-গুলি ছিল। ১৯১৬ সালে Payne-এর মৃত্যুর পরে তাঁর গ্রন্থের কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ দেখা দেয়। Sir Richard Burton-এর অনুবাদ,

Macnagten-সংস্করণ ও Payne-এর সংস্করণের ওপর প্রভূত নির্ভরণীল (১০ খণ্ড ১৮৮৫ ও ৬টি সংযোজক খণ্ড ১৮৮৬-৮)। Smithers-এর সংস্করণ (১২ খণ্ডে ১৮৯৪) এবং লেডি Burton-এর সংস্করণের (৬ খণ্ডে ১৮৮৬-৮) কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছিল। Pyne ও Burton উভয়ের মিল সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে Life of Sir Richard Burton (২ খন্ডে, লণ্ডন ১৯০৬) এবং Life of John Pyne (লণ্ডন ১৯১৯) গ্রন্থে। উপরিলিখিত ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে Macdonald-এর অনূদিত আরব্য রজনীও, (দি নেশান, ন্যু ইয়র্ক আগষ্ট ৩০ এবং সেপ্টেম্বর ৬, ১৯০০) দ্রষ্টব্য।

Reclam-এর Universal Bibliothek (১৮৯৫-৯৭)-এ Max Henning একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন ২৪টি ক্ষুদ্র খণ্ডে, গদ্যে এবং অর্ধেক গদ্যছন্দে। এর প্রথম ১৭ খণ্ড সহস্র রজনীর Butak সংস্করণ থেকে এবং ১৮ থেকে ২৪ খণ্ড (বিভিন্ন সংযোজিত খণ্ডগুলি) Burton থেকেই অনূদিত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে J. C. Mardrus সহস্র রজনীর একটি ফরাসী অনুবাদের কাজ শুরু করেন Butak (১৮৩৫) সংস্করণ থেকে। সহস্র রজনীর আরও অনুবাদ স্পেনীয়, ইংরাজী, পোলিশ, জার্মান, ডেনিস, রুশ, ইতালীয় ভাষায় হতে থাকে। স্পেনীয় অনুবাদ Vicente Blasco Tbanez দ্বারা, ইংরাজী E. Powys Mathers-এর দ্বারা, পোলিশ ভাষায় অনুবাদ (অসম্পূর্ণ), E. Littmann-এর দ্বারা, জার্মান অনুবাদ (Leipzig-এ ৬ খণ্ডে, ১৯২১-৮ প্রকাশিত হয়) ১৯৫৩ সালে Wiesbaden দ্বারা (প্রথম পুনঃ সংস্করণ ১৯৫৪ সালে ও দ্বিতীয় পুনঃ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়। এতে দ্বিতীয় কলিকাতা সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুবাদ ও নিম্নলিখিত গল্পগুলি ছিল: 'আলাদিন এবং জাদু প্রদীপ', (প্যারিস পাণ্ডুলিপি থেকে, Zotenberg দ্বারা সম্পাদিত) আলিবাবা এবং চল্লিশ দস্যু (অক্সফোর্ড পাণ্ডুলিপি থেকে,) Macdonald দ্বারা সম্পাদিত (Jars 1910, 221ff 1013[44] ff) রাজকুমার আহমদ ও পরী বানো (Burton-এর থেকে এর ইংরাজী ভাষান্তর ঘটেছে হিন্দুস্থানী ভাষা থেকে যা Galland থেকে আসলে গৃহীত), আবু 'এল হাসান অথবা স্থগিত জাগরণ (Breslan সংস্করণ থেকে), নারীদের কলাকুশলতা (কলকাতা প্রথম সংস্করণ থেকে, এবং 'সিন্দাবাদের ষষ্ঠ যাত্রা ও সপ্তম যাত্রা'র শেষাংশ) কলিকাতা প্রথম সংস্করণ থেকে, Story of the Brass city, সিন্দবাদ ও সপ্ত উজীরের গল্পের শেষ, Al-Malik al Zahir Ruku el-Din Baybars al-Bundukdari এবং ষোল অভিভাবক (Breslan সংস্করণ থেকে) হিংসা পরায়ণ ভগ্নীগণ (বার্টন গ্যালাণ্ড) যায়েন এল আসনাম (প্যারিস পাণ্ডুলিপি থেকে এবং তা Groff দ্বারা সম্পাদিত) খলিফের নৈশ অভিযান (The Nocturnal Adventure of the Caliph), খুদাদাদ এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ (Khudadad and his brothers) আলী খাওয়াদজা এবং বোগদাদের বণিক (Ali Khawadja and the Merchant of Bogdad) (বার্টন গ্যালাণ্ড থেকে)।

J. Oestrup-এর ডাচ অনুবাদ ১৯২৭ সালে কাপেনহেগেন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

রুশীয় অনুবাদ I. Krackovsky দ্বারা ১৯৩৪-এ, এবং ইতালীয় অনুবাদ F. Gabrieli দ্বারা ১৯৪৯-এ সম্পন্ন হয়।

উৎস সম্পর্কিত সমস্যা এবং ক্রমবিকাশ ঃ

যখন সহস্র এক রজনীর গল্পকথা য়ুরোপে প্রথমে প্রচারিত হ'ল তখন য়ুরোপীয় পাঠকগণ প্রথমে আনন্দলাভের জন্য পাঠ করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ প্রথম উৎস সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। আধুনিক আরবী দর্শনের প্রবর্তক Silvestrede Sacy এই উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নটি আলোচনা করেন একাধিক প্রবন্ধালোচনার মধ্য দিয়ে (Journal des sevants, 1817/678 ; Recherches sur l origine du recueil des contes intitules les Mille et une nuits, Paris. 1829 ; Memories de l' Academic des Inscriptions Belles Letters, x, 1833, 30)।

তিনি সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন যে উক্ত গ্রন্থকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির রচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না এবং উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল পরবর্তী যুগে পারস্য ও ভারতবর্ষীয় উপাদান ব্যতীতই। তাঁর মতে Murudj al-Dhahab of al Mas'udi-এর একটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। এই অধ্যায়টি আরবী ও ফরাসী ভাষায় Barbier de Meynard দ্বারা প্রকাশিত। তাঁর অভিমত ঃ

"The case with them (viz, some legendary stories) is similar to that of books that have come to us from the Persian, Indian (one Mss has here : Pahlawi) and the Greek and have been translated for us, and that originated in the way that we have described, such as for example the book Hazar Afsana, which in Arabic means "Thousand tales," for "tale" is in Persian afsana. The people call this book "Thousand Nights" (Two Mss have here : thousand Nights and one Night). This is the story of the king and the Vizier and his daughter and her servant-girl ; these two are called Shirazad and Dinazad (in other Mss : and her nurse in again other Mss : and his two daughters)."

অন্যপক্ষে Joseph von Hammer 'al masnadi,র অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত নয় মনে করেন। William Lane প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সমস্ত গ্রন্থটি একজন ব্যক্তির লেখা এবং ১৪৭৫—১৫২৫ এই সময়কালের মধ্যে রচিত (The Ardsiam Nights Entertainments লণ্ডন ১৮৩৯-৪১ ভূমিকা)।

মহম্মদ বিন ইসাক বিন আবি ইয়াকুব অল-নদিম এর ফরিস্তায় হাজার

অফসনার উল্লেখ আছে এবং কাহিনীর কাঠামোও দেওয়া হয়েছে। ফরিস্তায় আরও বলা হয়েছে Abu Abdallah al-Djahshiyari উজীরের কাহিনীর স্রষ্টা। তিনি ৪০৮টি গল্প সংগ্রহ করেন কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের পূর্বেই মারা যান অর্থাৎ হাজার গল্প তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

এই আলোচনা de Goeje দ্বারা পুনরুত্থাপিত হয়। তিনি ফরিস্তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে রাজা বাহমানের কন্যার জন্য এগুলি রচিত হয়। তাঁর মতে Shahrazad নামটি Humay-র দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, সহস্র রজনীর গল্পের সঙ্গে Esther-এর যোগ আছে। August Muller মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর Sendschreiben গ্রন্থে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত রাখতে পেরেছেন। তিনি হাজার অফসনার নানাস্তর ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কোনগুলি বাগদাদ, কোনগুলি মিশর-এ রচিত হয়ে থাকতে পারে।

বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নিখুঁতভাবে কাজ করেছেন Th. Noldeke, যিনি মূলগ্রন্থে বিশদ পরিচয় দিয়েছেন, যার দ্বারা প্রত্যেকটি গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

Oestrup-এর সংকলন—Krymski রুশ ভাষায় এর অনুবাদ করেন।

সহস্র রজনী গ্রন্থের অস্তিত্ব ও প্রাচীনতম উপকরণের রূপ Nabia Abbott দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নবম শতকে। এই প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে—Journal of Near Eastern studies-এ (1949-এ)। এর পরে al Masudi দ্বারা Fihrist-এ এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বারো শতকে "সহস্র রজনী এবং এক রজনী" মিশরে পরিচিত ছিল। জনৈক al kurti যিনি শেষ খলিফার সমকালীন মিশরের ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা এ তথ্য জানতে পারি। al Ghuzuli যিনি মারা গিয়েছন ১৮১৫/১৮১২, তাঁর সংকলনে রজনীর গল্প-গুলিকে স্থান দেন একথা Torny-র রচনা থেকে জানা যায় (JAOS, 1894, 42 f); তারপর দেখা দেয় Galland-এর পাণ্ডুলিপি এবং অপর পাণ্ডুলিপি-গুলি, যা পনেরো থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে দেখা দেয়।

এগুলি থেকে জানতে পারি যে, সহস্র রজনীর প্রচলিত সংকলনে বাগদাদ ও মিশরীয় দুটি অংশ ছিল। Oestrup তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন, যার প্রথমটি পারস্য ভাষায় রচিত হাজার অফ্‌সনার রূপকথা বলে অনুমিত; দ্বিতীয় স্তরে বাগদাদ থেকে সংগৃহীত গল্প এবং তৃতীয় অংশে আছে সংযোজিত গল্প।

Nabia Abbott আবার নিম্নলিখিত স্তরবিন্যাস করেছেন ঃ

1. অষ্টম শতকের অনুবাদ হাজার অফ্‌সনা ঃ এই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্ভবতঃ Alf Khurafa নামকরণে পরিচিত ছিল।

2. অষ্টম শতকে Alf Layla নামাঙ্কিত ঐশ্লামিক প্রতিরূপ পূর্ণাঙ্গ ছিল অথবা অসম্পূর্ণ সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন।

3. নবম শতকে রচিত পারস্য ও আরবীয় উপকরণে সমৃদ্ধ। Alf Layla। গল্পগুলি অধিকাংশই নিঃসন্দেহে হাজার অফ্‌সনা ও অপরাপর চলতি গল্প থেকে সংকলিত কিন্তু এখানে সিন্দাবাদের গল্প, সীমার গল্পের উৎস (যা Littmann নির্দেশ করেছেন এবং যা Macdonald-ও বিশ্বাস করেন) সম্ভবত আরবীয়।

4. দশম শতকের Alf Samar of Ibn Abdus অপর উপকরণের মত সংযোগ করা হয়েছে অথবা চলতি Alf Layla, তা স্পষ্ট নয়।

5. দ্বাদশ শতকের সংগ্রহ : চতুর্থ সংকলন থেকে এবং এশীয় ও মিশরীয় গল্পকথা, স্থানীয় মিশরীয় গল্প উপাদানে সমৃদ্ধ। Alf Layla wa Layla, শিরোনাম পরিবর্তন সম্ভবত এই যুগে ঘটে।

6. ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্রমস্ফীত সংকলন বীরর্ষভ গল্পকথা (Heroic tales) এই সময়ের উল্লেখনীয় সংযোজন। পারস্য ও তুরস্কের দান রূপে দূর প্রাচ্যের গল্পকথাগুলি সম্ভবত এই যুগেরই অন্য উজ্জ্বল সংযোজন।

সহস্র গল্প এই শিরোনাম সম্ভবত পরিবর্তিত হয়েছে "সহস্র রজনী"তে। নবম শতকের আগেই সম্ভবত আরবীয় ও অন্য গল্পগুলির সংযুক্তি ঘটে। মুখ্যতঃ সহস্র গল্প বলতে বোঝাতো অনেক গল্পের সমষ্টি, যেমন শাহরাজাদ (Shwrazad) সম্বন্ধে বলা হয় তিনি 'হাজারটি বই' সংগ্রহ করেছিলেন। একশ, একটি বড় সংখ্যা এবং প্রাচ্যদেশীয় ইতিহাসবিদদের কাছে "শতবর্ষ পূর্বে"-র অর্থ "অনেক বছর আগে"। সুতরাং একশত সংখ্যাটিকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ না করাই শ্রেয়। কিন্তু এক সহস্র কথাটি অসংখ্য অর্থের প্রায় সমান অর্থে প্রযোজ্য এবং "সহস্র রজনী" গ্রন্থটি যা বাগদাদ শহরবাসীর নিকট পরিচিত ছিল তা ন্যূনভাবেও সহস্র রজনীর ঘটনা নয়। কিন্তু কেন সহস্র রজনী শিরোনামটি সহস্র এক রজনীতে পরিণত হল! এই পরিবর্তন সম্ভবতঃ আংশিকভাবে আরববাসীদের কুসংস্কারের জন্য এবং যুগ্ম সংখ্যার প্রতি বোধহয় অনীহায়, যেটা সাধারণভাবে লৌকিক সংস্কারে দেখা যায়। তুর্কী প্রবাদ "বিনবীর" অর্থাৎ অনেক বোঝাতে সহস্র এক থেকেও কথাটি আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় আনাটোলিয়ার বহুসংখ্যক অধিবাসী জানতেন সেখানে "বিন-বীর-খিলসী" নামে একটি ভগ্নস্তূপ আছে যা সহস্র এক ভজনালয়রূপে সমধিকভাবে পরিচিত, যদিও সেখানে এতগুলি ভজনালয় নেই। ইস্তাম্বুলে একটি স্থানকে "বিন-বীর-ডিয়েক (Bin-bir-dieck) অর্থাৎ সহস্র স্তম্ভ বলত, সেখানে কিন্তু কয়েক ডজন মাত্র স্তম্ভ আছে। তুর্কী অনুপ্রাস জাতীয় শব্দ "বিনবীর" ফারসী 'হাজার এক'কে নির্দেশ করে। এগারোশো শতকে পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি ঐশ্লামিক দেশ তুর্কী প্রভাবাধীন ছিল। এইরূপেই সহস্র এক রজনী শিরোনাম প্রথম প্রথম বহু রজনী অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ সংখ্যাটি সাহিত্যগতভাবে গৃহীত হয় এবং সংখ্যাপূর্তির জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা গল্প যুক্ত হয়।

উপাদান ঃ ভারতবর্ষ, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মিশর, তুরস্ক সহস্র এক রজনীর গল্পগুচ্ছের সংগ্রহ নানা জায়গা থেকে। এর উৎস ও উপাদান সম্পর্কে অনুমান কষ্টকর নয়। সিন্দাবাদ নামে ভারতীয় ব্যক্তিবিশেষের নাম পাওয়া যায়, তেমনি তুরস্কের ব্যক্তিবিশেষের নাম আলিবাবা; খাতু, সবাজাদ, দীনাজাদ, শাহজামান প্রভৃতি নাম পাওয়া যায় পারস্যে। বারুম, রুস্তম, আরদালীর সাপুর প্রভৃতি নামও পারসিক। যাহোক "সহস্র এক রজনীর"র বেশীরভাগ নাম প্রাচীন আরবীয়, যা আরব বেদুইনদের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নাম হিসাবে প্রচলিত ছিল। মিশরীয় নাম উল্লেখ করা হয়েছে স্থান মাস ইত্যাদি বোঝাতে। কিন্তু গল্পগুলির রূপান্তর ঘটেছিল অপর ভাষায়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি হয়েছে নামহীন। ফলত সর্বত্র নামের উপর জোর দেওয়া যায় না।

সহস্র এক রজনীর বৈদেশিক উপাদান Oestrup যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক উক্তি তিনি করেন যে ভারতবর্ষীয় রূপকথার দৈত্য বা অতিপ্রাকৃত শক্তি 'হাজার এক রজনী'তে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করেছে কিন্তু মিশরীয় দৈত্য ম্যাজিক শক্তির দ্বারা চালিত।

Emmanual Cosquin তাঁর পারস্য থেকে প্রকাশিত Studies Folkloriques গ্রন্থে (১৯২২ সন পৃঃ ২৬৫) ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ গল্পগুলিতে দেখিয়েছেন ঃ

(১) একটি মানুষ যে তাঁর অবিশ্বাসী স্ত্রীর আচরণে শোক বিহ্বল হয় কিছুটা শান্তি পায় যখন সে দেখে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বও সেই একই প্রকার দুর্ভাগ্যে আবর্তিত হচ্ছে।

(২) রাক্ষস বা দৈত্যের গল্পে তাঁর স্ত্রী অথবা তাঁর কোন বন্দী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জ্ঞানী সিন্দবাদের গল্প, সাত উজীরের গল্প এই জাতীয়।

(৩) চতুর বালিকার গল্প —যে গল্পবলার কুশলতায় নিজেকে অথবা তাঁর বাবাকে রক্ষা করতে পেরেছিল। এই গোত্রের গল্পগুলির মূল কাঠামো অপরিবর্তিত।

সহস্র রজনীর অনেক গল্পকাহিনীর উৎসভূমি ভারতবর্ষ। ঐরূপ গল্পকাহিনীর সাধু চরিত্র আমাদের স্মরণ করিয়া দেয় বৌদ্ধ ও জৈন সন্তদের কথা। এছাড়াও আছে প্রাণীদের উপকথা (fables of animals) সিন্দাবাদের গল্পচক্র (story cycles of Sindbad) এবং সীমার গল্প।

অনেকগুলি গল্পের উৎসভূমি আবার পারস্য। প্রধানতঃ যে রূপকথাগুলিতে ভূত এবং পরী স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল সেগুলি এজাতীয়। Oestrup যে গল্পগুলির উৎসভূমি নির্ণয় করেছিলেন পারস্য-ভারতবর্ষ সেগুলি ঃ

(১) জাদুবিদ্যার গল্প

(২) বসরার হাসানের গল্প

(৩) Sayf al Mutuk-এর গল্প

(৪) রাজকুমার al-Zaman এবং কুমারী Budier-এর গল্প।

(৫) Samandal-এর রাজকুমার Badr এবং রাজকুমারী Djwhar-এর গল্প।

(৬) Asdesbir এবং Hayat al Nufus-এর গল্প। তাঁর মতে Ali Shar-এর গল্পের মূল পারসিক। প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগ্নীদের গল্প এবং Pari Banu ও Ahamad এর গল্প, যেহেতু Galland-এর গল্প সংগ্রহে কেবলমাত্র দেখা যায়, সেগুলির সৃষ্টি পারস্যেই হওয়া সম্ভব, যদিও তার পারসীক রূপ এখনও পর্যন্ত অজানিত।

বাগদাদ প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। সেজন্য সম্ভবত প্রাচীন ব্যাবিলোনিয় ভাবধারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে বিস্তারিত ছিল এবং সহস্র এক রজনীর কাহিনীতে তা প্রতিবিম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। এমন কি, একটি সম্পূর্ণ গল্প 'জ্ঞানী Haykar-এর গল্প,' যা অনেক পাণ্ডুলিপিতে সহস্র এক রজনীর গল্প-অংশ স্বরূপ মনে করা হয়ে থাকে, তার উৎসভূমি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, (৭ম খৃ. পূ.)—ইহুদি ও খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আরবীয় সাহিত্যে এসেছে। চির যুবা Khidr-এর ব্যাবিলোনীয় প্রতিরূপ আছে। বুলুকিয়ার যাত্রা (the journey Bulukiya), জীবন বারি খুঁজে আনা রাজকুমার Ahmad সম্ভবত ব্যাবিলোনীয় মহাকাব্য গিলগামেশ-এরই প্রভাবিত রূপ [পোড়া ইটে লিখিত ১৩টি ট্যাবলেটের মধ্যে]। কিন্তু Khidr এবং Ahmed আরবীয় সাহিত্যে প্রবেশ করে আলেকজাণ্ডারের রোমান্স হিসাবে (Romance of Alexander) এবং বুলুকিয়ার যাত্রা ইহুদী সাহিত্যের মাধ্যমে। আব্বাসিদ খলিফাদের, তাদের রাজসভা এবং তাদের প্রজাবর্গের জীবনের খণ্ড চিত্রগুলি যা সহস্র এক রজনীর অঙ্গীভূত বাগদাদ নগরীর স্মৃতি বহন করে। সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের সম্ভাব্য পূর্ণরূপ পাওয়া গেছে বাগদাদে, রোমাঞ্চ Umar-b-al Nu' man-এ আছে পারস্য সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার প্রভাব এবং Adjib ও Gharib-এ পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার উপাদান। চতুর দাসী-বালিকা Towoddad-এর আখ্যান বাগদাদে রচিত হয়ে কতক পরিমাণে নবরূপ গ্রহণ করছে মিশরে। Bulukiya-র গল্পকথা, সিন্ধবাদ জ্ঞানীর কথা এবং Djai ad wird khan-এর আখ্যান হয়ত বাগদাদ শহরে পরিচিত ছিল। এর কোন নিশ্চিত প্রমাণ অবশ্য নেই। Istambul শহরের পাণ্ডুলিপি থেকে H. Ritter কর্তৃক প্রাপ্ত চারটি গল্প সম্পর্কেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

সাহিত্যরূপের পরিচয়

আরব্য রজনীর প্রতিটি আখ্যানের সাহিত্যিক বিবরণ দেওয়া (যা Anhang কৃত Littman-এর অনুবাদে আছে) এখানে সম্ভব নয়। আখ্যানগুলিকে ছয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

1. Fairy Tales (রূপকথা)

2. Romances and novels (রোমান্স ও নভেল)
3. Legends (ইতিবৃত্ত)
4. Didactic stories (নীতিমূলক গল্প)
5. Humourous Tales (হাস্যরসাত্মক গল্প)
6. Anecdotes (জীবনীর খণ্ডাংশ/খণ্ড গল্প)

এক : তিনটি ভারতবর্ষীয় রূপকথার ছকে এই শ্রেণীর কাহিনী গড়ে উঠেছে। যে কাহিনীগুলি প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিতেই ছিল [The Poter ; The calender ; and the Three Dames in Baghdad, The Hunchback ;] সেগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। এগুলি ছকে বাঁধা গল্পের উদাহরণ এবং এতে কিছু ছাপ আছে যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্যের কথা এবং কতকগুলি অভিপ্রায় যা প্রাচ্যদেশীয় গল্পের মধ্যেও সমভাবে রয়েছে। এই শ্রেণীর অতি পরিচিত রূপকথাগুলি হল 'Ala-al-Din and The Magic Lamp এবং Ali Baba। অপর উদাহরণ হিসাবে Kamaral Zaman and Budur, The Jealous Sisters, Prince Ahmad and Pari Banu, Sayf-al-Muluk, Hasan-al-Basri, Zayn-al-Asnam এর নাম করা যায়।

দুই : বৃহত্তম রোমান্স কাহিনী 'Uman b. al Nu'man and his sons এই শ্রেণীর—এটি ইসলামীয় জনপ্রিয় রোমান্স কাহিনীর প্রতিরূপ।

প্রেমকাহিনীগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তারা তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ (ক) ইসলামপূর্ব যুগে প্রাচীন আরবীয় জীবনধারার পরিচায়ক ; (খ) বাগদাদ ও বসরার নগরজীবন এবং ভদ্রমহিলা বা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে খলিফাদের রাজগৃহে অথবা নগরে প্রেম নিবেদন সংক্রান্ত (গ) কায়রোর প্রেম সম্পর্কিত উপন্যাস প্রভাবিত, যা আনন্দোচ্ছল এবং কামোৎপাদক ঘটনার বিবরণের প্রকাশ।

ধড়িবাজ লোকের গল্পগুলিও এখানে উল্লেখ করা যায়।

তিন : কয়েকটি আরবীয় সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত সহস্র এক রজনীতে সংগ্রথিত হয়েছে। Halim-al-Tai, Irum the city of columns ; The brass city, The city of Lebla, যা আরবদের দ্বারা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা জয়ের ঘটনাকে উল্লেখ করে, এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অপর ইতিবৃত্তসমূহে ধার্মিক মহিলা ও পুরুষদের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে সাধু রাজকুমার, যিনি Harun-al-Rashid এর পুত্র, পরে দরবেশ-এ পরিণত হন, আলেসিয়াসের বিখ্যাত ইতিবৃত্তের স্মৃতি বহন করে।

চার : নীতিগল্পগুলির অধিকাংশের উৎসভূমি সম্ভবত ভারতবর্ষ ; উদাহরণ স্বরূপ The two long cycles of Sindbad the wise, Djaliad and wirk Khan, এবং বহু উপকথার নাম করা যায়, কিন্তু কোন সময় তারা আরবীয় রূপে নব পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্ণয় কঠিন।

5. Abu'l Hasan-এর গল্পগুচ্ছ, The Sleeper Awakened,

Khalifa the fisherman, Djafar the Barm kid এবং Ali the person এই শ্রেণীর। শেষেরটি মিথ্যা ভাষণের একটি অদ্ভুত নজির। মারুফ মুচি ও কুঁজোর গল্পের ভেতর অনেক হাস্যরসাত্মক চিত্র আছে।

6. জীবনের খণ্ড চিত্রের গল্প—উপরে শ্রেণীভুক্ত হয়নি এমন গল্পগুলি এই শ্রেণীর। Hunchback-এর গল্প, Barber and his Brothers মূলত নীতি গল্পেরই সমষ্টি। অল্প কয়েকটিতে পারস্যরাজের উল্লেখ আছে অধিকাংশ গল্পেই আব্বাসীদ খলিফাদের উল্লেখ রয়েছে এবং সর্বোপরি আছে হারুন অল রসীদ-এর উল্লেখ, যিনি মুসলমানদের কাছে আদর্শ রাজারূপে পরিগণিত।

পৃথিবী ব্যাপী লোক-কথার বিভিন্ন ধারা এবং গঠনগত নানা পদ্ধতি। বিভিন্ন লোকশ্রুতিবিদ—কখনও এগুলিকে Animal tales, Romantic tales, Wonder Tales, Humourous Tales, Legendary Tales ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছেন।[8] আধুনিককালে Arne Thompson লোক-কথাগুলির শ্রেণীবিভাগকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তী যুগে 'Index of Tale Typco' রূপে পরিচিত। এছাড়া তিনি পৃথিবীর লোককথাগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথমতঃ পশুপক্ষীর কথা ঃ (Animal Tales), বন্য পশু ও গৃহ পালিত পশু, মানুষ ও বন্য পশু, গৃহ পালিত পশু, পক্ষী ও অন্যান্য পশুপক্ষী ইত্যাদি উপবিভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় বিভাগে রাখলেন সাধারণ লোক-কথাগুলি এবং এর অন্তর্গত উপ-বিভাগে থাকল যথাক্রমে দৈববিড়ম্বনা, দৈব অথবা অলৌকিক জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক কাহিনী, ধর্মীয় কাহিনী, রোমাণ্টিক কথা, বুদ্ধিহীন রাক্ষসের কাহিনী। তৃতীয় বিভাগে থাকল Folkes and Anecdotes অথবা হাস্যরসাত্মক বিভিন্ন ঘটনা মূলক কাহিনী।

যেমন ঃ বোকার গল্প, দাম্পত্য জীবনের গল্প, নারী ও পুরুষ বিষয়ক গল্প, মিথ্যা কথার গল্প, সমস্যামূলক গল্প ও অন্যান্য গল্প। এই রীতির লোক-কথার বিন্যাসকেই Type Index বলা হয়। এই রীতিতে প্রত্যেকটি type একটি সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, The quest for the lost wife (type 400), The black and the white bride (type 403) অধ্যাপক ষ্টিথ টমসন পরবর্তী ক্ষেত্রে মোটিফ বা অভিপ্রায় অনুযায়ী পুনর্বিভাগ করেন এবং Motif Index-এর রীতি অনুযায়ী A-Z কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। সেগুলির মধ্যে আছে পৌরাণিক অভিপ্রায়, পশুপক্ষী, নিষেধাজ্ঞা, ইন্দ্রজাল, প্রেতলোক, বিস্ময়, রাক্ষস, পরীক্ষা, পণ্ডিত মূর্খ, প্রতারণা, ভাগ্য-বিপর্যয়, সুযোগ, ভাগ্য, সমাজ, পুরস্কার ও শাস্তি, বন্দী ও পলাতক, পাশবিক নিষ্ঠুরতা, ধর্ম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, হাস্যরস, অন্যান্য বিবিধ অভিপ্রায়।

সহস্র এক আরব্য রজনীর গল্পগুলিকে উপরোক্ত Motif Index-এর রীতি

[8. The Folk Tale/Stith Thompson, N. Y. Ed. 1946; P.-6]

অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উক্ত বিভাগগুলির অধিকাংশ অভিপ্রায় বা Motif-এর গল্প সেখানে আছে। সেখানে একদিকে যেমন সওদাগর বা ধীবরের সঙ্গে আফ্রিদি দৈত্য কিংবা শাহজাদা আর রাক্ষসীর গল্প আছে, তেমনি আছে দর্জি কুঁজো, হেকিম, বাবুর্চি ও খ্রীষ্টান দালালের কাহিনী। তাই সেখানে দেখা যায় সিন্দবাদ ও বাজপাখীর সঙ্গে আছে বাগদাদের নাপিতের কাহিনী, আবার অজস্র পশুপক্ষীর কাহিনী, যেমনঃ রাজহাঁস ও ময়ূর-ময়ূরী, মেষপালক ও মেয়ে, কচ্ছপ ও বক, নেকড়ে ও খেঁকশিয়াল, ইঁদুর আর নেউল, কাক ও কাঠবিড়ালী ইত্যাদির গল্প। এছাড়া আছে সিন্দবাদের সপ্তম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, অসংখ্য চুটকী গল্প ও হাসির কাহিনী; যেমনঃ ছাত্র ও শিক্ষক, আজব বটুয়া, মাদ্রাসার মৌলভী ইত্যাদি। সহস্র এক রজনীর অসংখ্য গল্পের মধ্যে আছে কালো ঘোড়ার আশ্চর্য যাদুকাহিনী, খলিফা ও জেলের কাহিনী, সপ্তম হীরক কন্যার কাহিনী—এই সব কাহিনীগুলি জানায় লোককথার বিচিত্র উপাদান, বিষয়বৈচিত্র্য ও বিবিধ মোটিফ।

আরব্য রজনীর গল্পগুলি লোককথারূপে লোক শ্রুতিতে প্রবহমান ছিল, পরবর্তীকালে কোন এক বা একাধিক সংগ্রাহক ও গল্পকারের হাতে তা সংগৃহীত হয়ে সংকলিত হয় এবং তারও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস. পি. এইচ. ডি
স্যার আশুতোষ ও মোয়াট স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত,
অধ্যাপক, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সহসচিব, স্নাতকোত্তর কলা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংবাদিকতা পর্ষৎ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অনেক অনেক কাল আগের কথা।

চীনদেশের এক শহরে এক দরিদ্র দর্জি বাস করতো। শহরটার সঠিক নাম আমার মনে নাই। যাই হোক, সেই দর্জির একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। আদর করে বাবা মা, তার নাম রেখেছিল আলা অল-দিন।

ছেলেটি কিন্তু মা বাবার ইচ্ছে মতো মানুষ হলো না। লেখাপড়ার ধার দিয়েও সে গেল না। হরেক রকম বদমাইশি বুদ্ধি সব সময় তার মাথায় ঘোরাফেরা করতো। এইভাবে, খারাপ ছেলেদের কুসংসর্গে পড়ে খুব ছোটতেই সে বয়ে গেল।

যখন ওর বছর দশেক বয়স, আলা অল-দিনের বাবা সার বুঝে নিল, ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে না। মনে বড় আশা করেছিল, ছেলেকে অন্য কোনও মর্যাদার কাজে শিক্ষানবীশি করাবে। কিন্তু তার চাল-চলন দেখে সে-আশা সে পরিত্যাগ করলো। ছেলেকে কাছে ডেকে বললো, শোনও বাবা আলা, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, তোমার ওপরে অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমার কোনও আশাই পূর্ণ করতে পারবে না তুমি। যাই হোক, বয়স বাড়ছে, কবে আছি কবে নাই, তুমি এখন আমার দোকানেই বসো। অন্ততঃ দর্জির কাজটাও শেখ। খদ্দেরপাতি যা আছে, দেখেশুনে চললে, তোমার আর তোমার মা-এর কোনও অভাব হবে না।

পরদিন থেকে আলা অল-দিনের বাবা ছেলেকে সঙ্গে করে দোকানে যেতে থাকলো। কী ভাবে সাজ-পোশাক তৈরি করতে হয় তার তালিম দিতে শুরু করলো।

কিন্তু আলা অল-দিনের ডাংগুলি খেলার স্বভাব, সুস্থির হয়ে বসে সূক্ষ্ম সূচীকর্ম তার পোষাবে কেন? ফাঁক পেলেই সে দোকান ফেলে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। বাবা কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারে না। অনেক বকুনি ধমকানি শাসানি প্রহার কিছুই তাকে দোকানমুখি করতে পারল না। বাবা হয়তো কোনও খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত—ব্যস, সেই সুযোগে বাছাধন টুক করে কেটে পড়েছে। তারপর সারাদিন আর তার টিকি দেখা গেল না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও ছেলেকে বাধ্য করে কাজে মন বসাতে পারল না সে। দিনকে দিন সে মার্কামারা ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মস্তানি গুলতানি করতে করতে একেবারে চোস্ত রংবাজ বনে গেল প্রায়।

বাবা মনের দুঃখে সব আশাই ছেড়ে দিল। ছেলের দুঃখে এবং বয়সের ভারে একদিন সে শয্যা নিল। তারপর কিছুকাল রোগ-ভোগের পর একেবারে পরপারে চলে গেল।

বিধবা মা দেখল, স্বামী চলে গেছে, ছেলে অপদার্থ, সুতরাং দোকান-পাট রেখে আর কী হবে। তাই যা পেল সেই দামেই বেচে দিল।

আলাদিনের মা সেলাই-বোনায় বেশ দক্ষ ছিল। বাজার থেকে পশম কিনে এনে জামা বুনে সে দোকানে দোকানে বিক্রি করে যা লাভ পেত সেই পয়সা দিয়ে ছেলের ও তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারতো কোনরকমে।

আলাদিনকে সে একমাত্র খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া আর কখনও কাছে পেত না। সারাদিন পাড়ার সমবয়সী বাউণ্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াতো সে। মা বিরক্ত হয়ে অনেক সময় ভাবতো, ছেলেকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু মায়ের প্রাণ, তা আর পারে না।

এইভাবে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ইয়ারকি মেরে আলাদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মা চোখের জল ফেলে আর পশমের জামা বুনে রুটির পয়সা রোজগার করে।

আলাদিনের বয়স যখন পনের তখন তার দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করে। দেখতে সে সুন্দরই ছিল, প্রথম যৌবনের ছোঁয়া লাগতে আরও সুন্দর মনে হতে লাগলো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে যখন সে ঘুরে বেড়াত, সব ছেলে ছাপিয়ে তার রূপের লাবণ্যই সকলের চোখ ঝলসে দিত। যেমন তার বড় বড় টানা টানা চোখ তেমনই তার নাক মুখ গাল। আর গায়ের রং স্বর্ণচাঁপাকেও হার মানায়।

একদিন বাজারের পাশের একটা খোলা মাঠে তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সে খেলায় মেতেছিল, এমন সময় এক দরবেশ ফকির এসে উপস্থিত হলো। লোকটি মুর, মরোক্কোবাসী। আলাদিনকে দেখে সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে। বাঃ, অপূর্ব সুন্দর তো ছেলেটি!

এখানে বলে রাখি এই দরবেশটি আসলে এক যাদুকর। জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পটু। লোকের মুখ দেখে তার ভাগ্য, বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে।

আলাদিনকে দেখতে দেখতে সে ভাবে, হ্যাঁ, এইরকম একটি ছেলেরই সে সন্ধান করছিল এতদিন। এরই অন্বেষণে সে মরোক্কো ছেড়ে সুদূর এই চীন দেশ পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বত্রিশতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয় ঃ

দরবেশ ছেলেদের একজনকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা ঐ খুবসুরত লেড়কাটা কে বলতে পারো?

—ওঃ, ঐ আলাদিনের কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলতো বাবা, ও কে ?

ছেলেটি বলে, ও তো রাঙা মুলো। ওর বাবা দর্জি ছিল। কিন্তু ছেলের নাম রেখেছে দেখুন, আলা অল-দিন—যেন সুলতান বাদশাহজাদা।

—তা বাবা, যা ওর রূপ, শাহজাদা হবারই যোগ্য—

ছেলেটি ঠোঁট উল্টে বলতে বলতে চলে যায়, রূপ না হাতি। আর রাঙা মুলোর মতো রূপ থাকলেই শাহজাদা হওয়া যায় ?

দরবেশ এবার আলাদিনকে ডাকে। আলাদিন অবাক হয়, এ আবার কে ? চিনতে পারে না। পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায়।

—তোমার নাম তো আলা অল-দিন ?

আলাদিন আরও অবাক হয়, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে মালিক ?

দরবেশ বলে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি বাবা, তোমার আব্বাজান আমার বড় ভাই ছিল। আচ্ছা তোমাদের দর্জির দোকানটা আছে এখনও ?

আলাদিন বলে, না। মা বেচে শেষ করে দিয়েছে।

—কেন, বেচল কেন ?

—বা রে, বাবা মারা গেল, আমি তো দর্জির কাজ শেখার সময়ই পেলাম না। এ অবস্থায় দোকান-পাট দেখে কে ? তাই মা বেচে দিয়ে এখন পশমের জামা বোনে বাড়িতে বসে।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো দরবেশ। আলাদিন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বলে, একি ! আপনি কাঁদছেন ?

—কাঁদবো না ? আমার মায়ের পেটের ভাই তোমার বাবা মারা গেছে—আর বলছো, আমি কাঁদবো না ? ও হো হো এ আমি কী করলাম, আল্লাহ। নিজের স্বার্থ নিয়েই মেতে থাকলাম সারাটা জীবন ? সহোদর ভাই বাঁচলো কি মরলো তার একবার খবর নেবার ফুরসত করতে পারলাম না ? যাক, এই বোধ হয় দয়াময় খোদার অভিপ্রায় ছিল। তা না হলে মরার আগে শেষবারের মতো এক পলক চোখের দেখাও কী তিনি দেখাতে পারতেন না ?

দরবেশ চোখের জল মুছে আলাদিনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, আজ বড় ভাই নেই, কিন্তু তোমাকে রেখে গেছে সে। তোমার মধ্যে তাকে আমি খুঁজে পাবো, বেটা, তুমিই আমার দুঃখ শোক ঘুচিয়ে দিতে পারবে।

এই বলে সে আলাদিনের কপাল গাল চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে লাগলো।

—আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ বাবা, তোমাকে পেয়েছি। এই শোক তাপে তুমিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তুমিই তোমার বাবার অভাব পূরণ করতে পারবে—পুত্রবান পিতার কখনও মৃত্যু হয় না।

মুর দরবেশ তার ট্যাঁক থেকে দশটা সোনার মোহর বের করে আলাদিনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এটা তোমার মাকে দিও, বাবা।

আলাদিনের চোখ চকচক করে ওঠে। দরবেশ বলে, তোমরা থাক কোথায় ?

আলাদিন বলে, এই কাছেই। আসুন আমার সঙ্গে, বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

দরবেশের হাত ধরে সে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। অদূরে অবস্থিত একটা ছোট্ট কোঠাবাড়ি দেখিয়ে বলে, ঐ যে দেখছেন লালরঙের বড় বাড়িটার পাশে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি—ওখানেই আমরা থাকি।

দরবেশ বলে, ঠিক আছে, আজ আর যাবো না। কাল গিয়ে তোমার মা-এর সঙ্গে আলাপ করে আসব, কেমন? তুমি এই দিনার দশটা তোমার মা-এর হাতে দিয়ে বলবে, তোমার চাচা এসেছে বিদেশ থেকে। তাকে আমার সালাম আর শুভেচ্ছা জানাবে, বুঝলে বাবা?

আলাদিন বলে, জী বুঝেছি। আমি এখুনি গিয়ে মাকে বলছি, কাল আপনি অতি অবশ্য আসবেন।

মুর বলে, নিশ্চয়ই আসবো। সকালেই আসবো। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কাল সকালে। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কেমন? বড় ভাই-এর সঙ্গে দেখা হলো না কিন্তু তার কবরটা তো দেখতে পাবো? জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যে ঘরে শুয়ে, যে দাওয়ায় বসে কেটেছে তার, সে জায়গাগুলো তো দেখতে পাবো চোখে। আচ্ছা বাবা, আজ আর নয়, আজ আমি চলি, কাল আবার দেখা হবে।

আলাদিন দরবেশের হাতে চুম্বন রেখে ছুটে যায় মা-এর কাছে। মা ছেলেকে অসময়ে ঘরে ফিরতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়, কী রে, শরীর টরীর খারাপ করেছে নাকি? এখনও খানার সময় হতে ঘণ্টাখানেক বাকী?

আলাদিন ওসব কথা গ্রাহ্য করে না। খুশিতে আজ ডগমগ। চকচকে দশ দশটা সোনার মোহর তার কোমরে।

—না মা, শরীর ভালই আছে। তোমাকে একটা সুখবর দিতে ছুটে এলাম।

—সুখবর? কীসের সুখবর?

মা অবাক হয়ে তাকায় আলাদিনের মুখের দিকে। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে অপদার্থ ছেলে আলাদিন—সে দেবে সুখবর? সন্দেহ অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে ওঠে ওর চোখে।

—হ্যাঁ, মা খুব শুভসংবাদ। আমার এক চাচা পরবাস থেকে ফিরে এসেছেন। আজ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। জান মা, কী নজর, আমাকে দেখেই বললেন, তুমি আলা অল-দিন না? আমি তো অবাক! জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে চিনলেন কী করে? উনি বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে হুবহু তোমার চেহারার মিল আছে। তারপর কত কথা হলো। আমাদের দর্জির দোকান আছে কিনা, তুমি কেমন আছ—এইসব।

মা অবাক হয়, আমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন?

—হ্যাঁ মা, খুব ভালো লোক, একেবারে পীর ফকীরের মতো কথাবার্তা, বেশবাস—সব। কাল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন তিনি।

আলাদিনের মা বলে, কিন্তু বাবা, তোর বাবার কাছে তো তোর এই চাচার

কোনও কথা শুনিনি কখনও। তোর এক চাচা ছিল সে তো অনেক আগে—তুই যখন পাঁচ-ছ বছরের খোকা, সেই সময় মারা গেছে।

আলাদিন বললো, এ চাচা অনেক অনেক দিন আগে দেশান্তরী হয়েছিল। তারপর নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সবে ফিরেছেন।

মা ভাবলেন হতেও পারে। অনেক কাল আগের কথা। হয়তো পুরোনো শোকের আগুনটা আর উস্কে দিতে চায়নি ওর স্বামী! ভেবেছে সে তো আর বেঁচে বর্তে নাই। কী হবে সে সব শোক দুঃখের কথা তুলে?

—ঠিক আছে বাবা, কাল তাকে নিয়ে আয়। হাজার হলেও চাচা—রক্তের সম্বন্ধ।

পরদিন সকাল হতেই আলাদিন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। সাধারণতঃ এত সকাল তার কাছে মাঝ রাত্রির। সকাল দশটার আগে সে কোনও দিনই শয্যাত্যাগ করে না। কিন্তু আজ যে তাকে চাচাকে আনতে যেতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে নিল সে। বিছানার তলা থেকে সেই দশটা মোহর আবার কোমরে বেঁধে নিল। টাকাগুলো সে মাকে দেয়নি। এবং সে সম্বন্ধে বলেওনি কোনও কথা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে বাজারের পাশের সেই খেলার মাঠে এসে দাঁড়ায়। দরবেশ তখনও আসেনি। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করতে থাকে। ভাবে, হয়তো তারই আসতে দেরি হয়েছে, চাচা দেখে দেখে ফিরে গেছেন। কিন্তু না, একটু পরেই দেখা গেল, দরবেশ আসছে।

—এই যে বেটা, আলা অল-দিন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? আমার কী আসতে দেরি হয়ে গেল?

আলাদিন আমতা আমতা করে বলে, না, মানে—ভাবলাম আপনি যদি আগে এসে পড়েন, একা একা দাঁড়িয়ে থাকবেন, তাই—আমিই একটু আগে এসে দাঁড়ালাম।

দরবেশ বলে, তা বেশ করেছ, এই নাও দিনার দুটো ধর, এ দুটো মাকে দিয়ে বল, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে খানাপিনা করবো। অল্প-স্বল্প যা হোক কিছু বাজারটাজার করে নিতে বলো। আমি দুপুরে নামাজ সেরে তোমাদের বাসায় যাবো। আর হ্যাঁ, আর একবার তোমার বাসাটা ভাল করে চিনিয়ে দাও তো বাবা। কাল যদিও দেখে নিয়েছি, তবু গোলমাল না হয়ে যায়।

আলাদিন আবার দূর থেকে বাসাটা দেখিয়ে দিল মুরুকে। তারপর বিদায় নিয়ে মা-র কাছে চলে এল এক ছুটে। দিনার দুটো হাতে গুঁজে দিয়ে বললো চাচা তোমাকে দিতে বললেন, বাজার করে খানাপিনা পাকাও, তিনি নামাজ সেরে খেতে আসবেন।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তেত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

দিনার দুটো হাতে পেয়ে ছেলের কথা আর অবিশ্বাস করতে পারে না মা।

আলাদিনের অনেক ফন্দী ফিকিরের সংগে সে পরিচিত। নানা মতলব ভেঁজে কতবার যে তাকে ধোঁকা দিয়ে কত পয়সা বের করে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। কাল থেকে সে শুধু ভাবছিল, এও বোধহয় আলাদিনের নতুন এক চাল। কিছু পয়সা আদায় করার ছল। কিন্তু নগদ দুটো স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে তার ভাবনাটা ঘুরে গেল। না, তাহলে সত্যিই হয়তো তার চাচা ফিরে এসেছেন।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে ভালমন্দ কিছু মাংস সবজী মিঠাই ফল ইত্যাদি কিনে নিয়ে ফিরে এল সে। খুব যত্ন করে খানাপিনা তৈরি করলো।

দুপুর গড়িয়ে যায় যায়। মা বললো, দেখ রে আমার মনে হচ্ছে তোর চাচা বাড়ি চিনতে পারছে না। একটু বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়া না।

আলাদিন বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে এমন সময় সদরের কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল। আলাদিনের চোখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়, বলে, ঐ মা, উনি এসেছেন।

ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলতেই দেখলো, বৃদ্ধ দরবেশ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। তার পিছনে একটা কুলি। তার মাথায় একটা ঝুড়ি—ফলমূল মেঠাই মণ্ডায় ভর্তি।

কুলিটা ভিতরে ঢুকে ঘরের দাওয়ায় ঝুড়িটা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আলাদিন মুরকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

আলাদিনের মা বোরখা পরে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সালাম জানালো। বৃদ্ধও মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালো তাকে।

—খোদা হাফেজ, তাঁর অপার করুণায় আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারলাম, বড় ভাই-এর বিবি। কিন্তু মনে বড় খেদ রয়ে গেল। আর ক'টা দিন আগে আসতে পারলে তার সংগে একটিবার দেখা হতো।

শেষের দিকের কথাগুলো বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে এল। কামিজের হাতাটা দিয়ে চোখ মুছলো মুর। আলাদিনের মাও কান্নায় ভেংগে পড়লো।

বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর দুজনেই আবার নিজেদের সামলে নিতেও পারলো। মুর জিজ্ঞেস করে, বড় ভাই কোথায় বসতো, কোথায় শুতো? এইসব নানা হৃদয়-স্পর্শী তথ্য সে জানতে থাকে।

আলাদিনের মা-র আর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না, সে তার স্বামীর সহোদর ভাই। বলে, আল্লাহর চরণে যে আশ্রয় নিয়েছে তার জন্যে আমরা শোক করি কেন ভাইজান। আসুন, সবাই মিলে তাঁর কাছে আমরা মোনাজাত করি।

মুর বলে, তুমি বড় ভাল কথা শোনালে বড় ভাই-এর বৌ! বড় ভাল কথা শোনালে। সব বুঝি, কিন্তু আমরা সবাই মায়াবদ্ধ জীব, বুঝেও অবুঝের মতো শোক তাপ করে তার আত্মার অকল্যাণ ডেকে আনি। আচ্ছা থাক ওসব কথা, এখন বল দেখি, আলা অল-দিন কী করছে। রোজগার পাতি যা করতে পারছে তাতে সংসার ঠিক চলছে তো?

আলাদিনের মা এ কথার কী জবাব দেবে? কী করে বলবে ছেলে একটা অপদার্থ বাউণ্ডুলে? কী করে বলবে, অত বড় ছেলে এক পয়সা রোজগার করে না, তার মা-র ঘাড়ে বসে খায়? আর কী করেই বা বলবে যে পশমের জামা বুনে তার দিন চলে?

—না না, চুপ করে থেক না বড় ভাই-এর বৌ। ওর বাবার অবর্তমানে আমি চাচা—আমিই তার দেখা-শোনা করার একমাত্র লোক। আমার কাছে লজ্জাশরম করার তো কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না। বল, সে এখন ব্যবসাপত্র কী করছে?

আলাদিনের মা এবার বলে, কিছুই করে না আলাদিন। সারাদিন ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। খাবার সময় হলে বাড়ি ফেরে।

মুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, খুবই অন্যায়। কই, আলা অল-দিন, এদিকে আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

আলাদিন চোরের মতো জড়ো-সড়ো হয়ে একপাশে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়।

—কী, কাজ কাম করতে মন চায় না, এই তো?

আলাদিন কোনও জবাব দেয় না—দিতে পারে না। চোখও তুলতে পারে না মাটি থেকে।

মুর এবার ওকে আদর করে পাশে ডাকে, কিন্তু কাজ করতে মন চায় না কেন? মনের মতো কাজ পাওনি বলে তো? ধর যদি তোমাকে বাজারে একটা বেশ বড় সড় রেশমী কাপড়ের দোকান করে দিই—চালাবে?

আলাদিনের চোখ নেচে ওঠে। বলে, হ্যাঁ।

এর পর খানাপিনা সাজিয়ে দেয় আলাদিনের মা। খেতে খেতে মুর বলে, সে অনেক দিন—প্রায় তিরিশ বছর আগে ভাগ্য অন্বেষণে আমি পরবাসী হই। সিন্ধু, হিন্দুস্তান প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে মিশরে চলে তাই। সেখানে বছর দশেক কাটাবার পর মরোক্কোতে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে আজ বিশ বছর ব্যবসা করছিলাম। টাকা পয়সা অনেকই রোজগার করলাম, কিন্তু বড় ভাই-এর বৌ, সত্যি কথা বলতে কি, মনে শান্তি পেলাম না। যতই বয়স বাড়তে থাকল দেশের জন্য মন বড় অশান্ত হয়ে উঠলো। তখন কি জানি ভাই আমাকে ডাকছে, তা হলে সব কাজ ফেলে তখুনি চলে আসতাম। আজ যাই কাল যাই করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ভাইকে আর চোখের দেখাটা দেখতে পেলাম না। রক্তের এমনই টান সেই সুদূর মরোক্কোতে বসেও আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, ভাই আমাকে ডাকছে। সেই এলামও—দুদিন আগে যদি পৌঁছতে পারতাম—

মুর আর কথা শেষ করতে পারে না। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে!

আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে আলাদিনের মা। এবার মুরই তাকে সান্ত্বনা দেয়, কেঁদ না, কেঁদ না বড় ভাই-এর বৌ। যে গেছে সে তো গেছেই, যে আছে তাকে বুকে ধরেই তো বাঁচতে হবে। আলাদিন তোমার জীবনের একমাত্র চিরাগ। সেই তোমার জীবন আলোময় করে রাখবে।

আলাদিনের মা দুঃখ করে বলে, সে আশায় আমার ছাই পড়েছে। ছেলে কী আর মায়ের দুঃখ বোঝে। সে তার ইয়ার বক্সীদের নিয়েই মত্ত থাকে। এখনও গতরে বল আছে, চোখে দৃষ্টি আছে, তাই দুটো খেতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন অথর্ব হয়ে পড়বো, চোখে ছানি পড়বে, তখন ? তখন আমার কী গতি হবে সেই কথা ভেবেই আঁৎকে উঠি। আরও ভয় লাগে আলাদিনের জন্য। এখন ও বুঝতে পারছে না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাওয়ার সময় হলে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটিবার ভেবে দেখে না, এই খানাপিনা জুটছে কী করে।

মুর বলে, যা-হয়ে গেছে তা গেছে। আমি যখন এসে পড়েছি, আর কোনও ভাবনা করতে হবে না তোমাদের। আলাদিনকে আমি বাজারে একখানা মস্ত বড় কাপড়ের দোকান করে দেব। গা-গতরে কিছুই খাটতে হবে না ওকে, লোকজন অনেক থাকবে, তারাই সব করবে। আলাদিন শুধু তহবিল নিয়ে বসবে। টাকা পয়সার হিসেবটুকু বুঝে নিতে হবে। কী, পারবে না, আলা অল-দিন ?

আলাদিন বলে, খুব পারবো।

মুর বললো, তা হলে কালই চল বাজারে। আগে তোমাকে দোকানের মালিকের মতো সাজ-পোশাকে সেজে এক সওদাগর পুত্র বনতে হবে। জানতো আগে চাই দর্শন-ধারী—পরে গুণ-বিচারী ? সেজে-গুজে শাহজাদার মতো গদিতে বসবে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তোমাকে দেখেই খদ্দেররা মুগ্ধ হয়ে দোকানে ঢুকে পড়বে। যে ব্যবসার যে ভড়ং, তা তো বজায় রাখতেই হবে।

আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। এবং সে বাহারী সাজ পোশাক পরে সওদাগর হবে!

মুর বলে, এবার আমি উঠি। তা হলে ঐ কথাই রইলো। কাল আমি সকালে আসছি। তোমাকে নিয়ে বাজারে বেরুবো।

মুর চলে গেল। আলাদিনের মা ভাবলো, সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত! না হলে তাদের দীন হীন এই দারিদ্র্য দশায় এ রকম পরমাত্মীয় কেউ এসে সব দায় মাথা পেতে নিতে চায় ? স্বামীর ছোট ভাই-এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন।

পরদিন সকালে আবার কড়া নড়ে ওঠে। আলাদিনের মা-ই দরজা খুলে দেয়।

—এস ভাইজান ভেতরে এসে ব'সো।

—না ভাবী, এখন আর বসবো না, কই আলাদিন কোথায় ? ওকে পাঠিয়ে দাও। কাল বলে গিয়েছিলাম না বাজারে যেতে হবে ? আজ ওর সাজ-পোশাক কিনে দেব—খুব বাহারী। দেখবে যে ছেলে ঘরে থাকে না, দোকানে বসতে চায় না, সে কেমন সংসারী হয়ে ওঠে, কেমন পাকা সওদাগর বনে যায়! আসলে ওর যাতে ভাল লাগে, সেই পথেই ওকে নিয়ে যেতে হবে। নাও, আর দেরি করবো না, ওকে পাঠিয়ে দাও। আমি বাইরেই দাঁড়াচ্ছি।

আলাদিনের মা বলে, হয়তো সাহেব এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, দেখি যাই ডেকে তুলি গে—

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

বাজারের বড় বড় দোকান ঘুরে ঘুরে ওরা সাজ-পোশাক পছন্দ করতে থাকে। বৃদ্ধ বলে, লজ্জাশরম করো না, বাবা। যেটা খুশি বেছে নাও, দামের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

বাঁশবনে ডোম কানা, তবু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা পোশাক পছন্দ করতে পারলো সে। দোকানদার বললো, আপনার ভাইপোর পছন্দ আছে বলতে হয়, জনাব। এর চাইতে ভাল পোশাক আমার কেন, সারা বাজারের কোনও দোকানে পাবেন না আপনি।

মুর হাসে, নজরটা উঁচু না হলে বড় কাজ করবে কী করে?

ডোরাকাটা রেশমী শেরওয়ানী, সাদা পাগড়ীর মধ্যে মধ্যে সোনার জরির কাজ। কাশ্মীরের কোমর-বন্ধ। টকটকে লাল চামড়ার জুতো।

দোকানী যা দাম চাইলো, এক পয়সা দরাদরি না করে পুরো টাকা বের করে দিল বৃদ্ধ। তারপর পোশাকের মোড়কটা আলাদিনের হাতে দিয়ে বললো, চল বাবা, এবার আমরা হামামে যাবো। খুব আচ্ছাসে ঘষে মেজে গোসল করিয়ে নতুন সাজে সাজাবো তোমাকে।

হামামে ঢুকে মুর নিজে হাতে আলাদিনকে খোসা সাবান দিয়ে ডলাই-মলাই করে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে গোসল করালো। আলাদিন এক নতুন নওজোয়ান যুবক হয়ে বেরিয়ে এল।

গোসলের পর নাস্তা। হামামেই তার ব্যবস্থা থাকে। দুজনে তৃপ্তি করে খানাপিনা সারলো। বৃদ্ধ বললো, নাও, এবার ঐ পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়। ওখানে আয়না প্রসাধন সব আছে। খুব পরিপাটি করে ইচ্ছেমত কাজল সুর্মা আতর লাগিয়ে এস।

এমন বাদশাহী হামাম আলাদিন জীবনে দেখেনি। সেজে-গুজে যখন বেরিয়ে এল তখন কে বলবে সে শাহজাদা নয়? যেমন চাঁদের মতো রূপ তেমনি জমকালো সাজপোশাক। প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন কোন সুলতান বাদশাহর পুত্র। আলাদিন এসে বৃদ্ধের কর চুম্বন করে। সে-ও তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

—এই তোমার যাত্রাপথের শুরু হলো, বেটা। এবার আসল কাজে নামতে হবে। চল, বাজারের দিকে যাই, কোথায় তুমি দোকান খুলতে চাও আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি সেখানেই তোমার দোকান করে দেব।

দোকানের জায়গা পছন্দ করার পর বৃদ্ধ বললো, এবার চল একটু শহরটা ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যাক। লোকে তোমাকে দেখুক। তুমি যে একজন যে সে লোকের ভাইপো নও সেটা তারা জানুক।

আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে সে অনেক বাগান অনেক মসজিদ ঘুরে ঘুরে

অবশেষে এক সরাইখানায় এসে হাজির হয়। এই সরাইখানাতেই বৃদ্ধ মুর আস্তানা গেড়েছে।

—এখানেই আমি উঠেছি। চল, আমার ঘরে চল।

বিরাট একখানা প্রশস্ত ঘর। বেশ সাজানো গোছানো। লম্বা লম্বা টেবিলে কাপড় বিছিয়ে নানারকম খানাপিনা সাজানো হয়েছে। বৃদ্ধ বললো, তোমার সঙ্গে নামজাদা সব সওদাগরদের আলাপ করিয়ে দেব বলে আজ এই ভোজসভার ব্যবস্থা করেছি। ব'সো, এখুনি সবাই এসে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে শহরের সম্ভ্রান্ত সওদাগররা এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাদিনের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর আরম্ভ হলো খাওয়া-দাওয়া।

এত সব সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার আলাদিন খায়নি কোনও দিন। খুব তৃপ্তি করে খেল সে।

আসর ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা উৎরে গেল। বাসায় ফিরে আসতে মা ছেলেকে দেখে আর চিনতে পারে না। অমন বাদশাহী সাজ পোশাকে সজ্জিত আলাদিন আর সে আলাদিন নাই। একেবারে অন্য মানুষ বনে গেছে। বৃদ্ধকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারে না।

—ভাইজান, আমাদের বড় দুঃসময়ে তুমি আল্লাহর আশীর্বাদ হয়ে নেমে এসেছো। তা না হলে এ-সব তো আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। খোদা, তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।

বৃদ্ধ বলে, আরে—এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছ কেন, ভাবী। এ তো আমার কর্তব্য। আলাদিন আমার ভাইপো। তার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। তুচ্ছ ধন্যবাদ দিয়ে সে-সম্পর্ক খাটো ক'রো না, বড় ভাই-এর বৌ। আলাদিনের বাবার অভাব আমিই তো মেটাবো। আজ বড় ভাই বেঁচে থাকলে যা-করতো আমিও তাই করতে চাই।

আলাদিনের মায়ের দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। খোদা মেহেরবান, ভাইজান। তা না হলে এ সময়ে তোমার মতো একটা নির্ভর-যোগ্য বটের ছায়া আমি পাবো কী করে? এখন থেকে আলাদিনকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। ছেলেটা একেবারে অমানুষ হয়ে যাচ্ছিল, এবার হয়তো তোমার শাসন শিক্ষায় ও সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে।

—হয়তো কেন ভাবীজী, নিশ্চয়ই পারবে। কালক্রমে দেখবে, তোমার ছেলে সারা দেশের মধ্যে সেরা ধনী হয়ে উঠবে। তোমার আশংকা করার কোনও হেতু নাই। যে সৎ বংশে ওর জন্ম সে বংশের ছেলেরা কখনও অসৎ উচ্ছৃংখল হতে পারে না। তা ছাড়া আলাদিন ছেলে তো খারাপ নয়। খুব শান্ত নম্র বিনয়ী। ওকে বাউন্ডুলে বল কী করে?

মা হাসে, চাচাকে দেখে এখন ভয়ে সাধু সেজেছে।

বৃদ্ধ জোর দিয়ে বলে, আর সে অসাধু হওয়ার সুযোগ পাবে না। কাল জুম্মাবার। দোকানপাট সব বন্ধ। পরশুই ওকে দোকানে বসিয়ে দেব।

আর অসৎ সঙ্গে মিশতেই পারবে না। কাল ওকে নিয়ে যাবো শহর ছাড়িয়ে ঐ পাহাড়ের পাশে এক বাগানবাড়িতে। সেখানে শহরের নামজাদা সব সওদাগররা যাবে আমোদ প্রমোদ করতে। ওদের সঙ্গে আলাদিনের ভাব-সাব রাখা দরকার। বড় ব্যবসা করতে গেলে বড় মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে হয়। না হলে ব্যবসায় নাম ডাক হবে কী করে? আচ্ছা এখন আমি চলি। কাল এসে নিয়ে যাবো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে:

সারা রাত ধরে আলাদিনের চোখে আর ঘুম আসে না। জেগে জেগে নানা-রকম আকাশ-কুসুম রচনা করতে থাকে। সে ব্যবসা করবে। মস্ত বড় সওদাগর হবে—অনেক টাকা হবে তার। অনেক ধন দৌলত। তখন কী আর সে এই জরাজীর্ণ পড়ো বাড়িতে পড়ে থাকবে। সুলতানের উজিরের প্রাসাদের মতো একখানা পেল্লাই প্রাসাদ বানাবে। কত লোক লস্কর। কত নফর চাকর, দাসী বাদীতে গম গম করবে সারা প্রাসাদ। সে হবে তার একমাত্র মালিক। তার ইশারাতে কত লোক ওঠ্ বোস করবে।

আলাদিন আর ভাবতে পারে না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নিশুতি রাত। চারদিক নিস্তব্ধ-নিরন্ধ্র অন্ধকার। ঘরের মধ্যে চিরাগের সলতেটা নিষ্প্রভ হয়ে ধুঁকছে। আলাদিন আলোটা জোরালো করে দেয়। আলনায় ঝোলানো পোশাকটাকে সে নেড়ে চেড়ে দেখে। ঝুঁকে পড়ে নাক দিয়ে নতুন সাজের গন্ধ আঘ্রাণ করতে থাকে। হামামের সেই আতরের খুসবু তখনও সুবাস ছড়াচ্ছিল সারা পোশাকটায়।

এইভাবে এক সময় সকাল হয়ে আসে। আলাদিন হাত মুখ ধুয়ে সাজ-পোশাক পরে অধীর আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। অস্থিরভাবে পায়চারী করে এদিক ওদিক।

আজ যেন চাচা একটু দেরি করছেন? কিন্তু দেরি করার মানুষ তো তিনি নন? কিংবা সে-ই অনেক সকাল সকাল উঠে পড়েছে।

যাই হোক, একটু পরেই বৃদ্ধ মুর এসে পড়লো। আলাদিনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। কেন জানি না, তার কেবলই মনে আশঙ্কা হচ্ছিল, আজ যদি চাচা না আসেন? তা হলে বেড়াতে যাওয়াটা মাঠে মারা যাবে।

কিন্তু না, আলাদিনের আশঙ্কা অমূলক, একটু বাদেই বৃদ্ধ মুর এসে হাজির হলো। আলাদিন ছুটে গিয়ে ওর কর চুম্বন করে বললো, আমি ভাবলাম, চাচা, অপনি বোধ হয় এলেন না।

বৃদ্ধ হাসে। আলাদিনের পিঠ চাপড়ায়। বলে, খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছ বুঝি। চল, আর দেরি নয়, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। অনেক দূর যেতে হবে।

আলাদিন পা বাড়িয়েই ছিল। বলে, চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহর প্রান্তে এসে পড়ে। তারপর বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর। তাও এক সময় অতিক্রম করে গাছপালা ঘেরা এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। কত সব সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি বাগ-বাগিচা পেরিয়ে আরও সামনে এগিয়ে চলে।

আলাদিন ক্লান্ত বোধ করে। বলে, চাচা, কত পথ পার হয়ে এলাম। আর কত দূর যেতে হবে। সামনে তো ঐ পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখছি না? আমি আর চলতে পারছি না, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মুর একটা ঝোলা থেকে অনেক ফল এবং পিঠে বের করে আলাদিনের হাতে দেয়।

—নাও, খেয়ে নাও। আর বেশি দূরে নয়, ঐ তো কাছেই এসে পড়েছি। পৌঁছলে দেখবে কী মজার জায়গা? সারা দুনিয়ায় তার জুড়ি নাই।

এইভাবে নানা আশার কথায় ভুলিয়ে আলাদিনকে পাহাড়-সন্নিহিত সেই মরু-প্রান্তরও পার করে নিয়ে যায় মুর।

অবশেষে ওরা এসে পেঁছিয় পাহাড়ের পাদদেশে এক সুন্দর উপত্যকায়। একটা পাথরের চাঁইকে আসন করে ওরা পাশাপাশি বসে। মুর আলাদিনের কাঁধে হাত রাখে। বলে, নাও, এবার একটু বিশ্রাম করে নাও এখানে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, না? আচ্ছা ঘুমিয়ে পড়। তারপর আমি তোমাকে এক অলৌকিক মজার জিনিস দেখাবো। সে জিনিস, সারা দুনিয়ার কেউ তোমাকে দেখাতে পারবে না। এবং আমার বিশ্বাস পৃথিবীর কোনও মানুষই কোনও কালে দেখেনি তা। যখন তুমি দেখবে, সারাদিনের এই যে এত পথশ্রম সব সার্থক হবে তখন। আর, এখন হয়তো আমার ওপর কিছুটা বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হয়েছ, তাও কেটে যাবে তৎক্ষণাৎ। প্রথম যে-দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সে-দিন যেমন আমাকে ভাল লেগেছিল তোমার, আজ তার চেয়েও বেশি ভাল মনে হবে। যাক্ আর কথা নয়, এবার একটু জিরিয়ে নাও। পা দুখানা ছড়িয়ে দিয়ে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আলাদিন চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখে তার চোখের সামনে বিস্তির্ণ এক লতাগুল্মের ঝোপ জঙ্গল। মুর বলে, ওঠ, উঠে পড়। যাও, ঐ জঙ্গল থেকে এক আঁটি শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে নিয়ে এস।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাদিন এক বোঝা শুকনো ডাল-পালা এনে হাজির করে। বৃদ্ধ বলে, বাঃ, চমৎকার। এবার আমার পিছনে এসে দাঁড়াও।

আলাদিন আজ্ঞাবহর মতো মুর-এর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। মুর তার কোমর থেকে একটা চকমকির বাক্স বের করে কাঠের পালায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। শুকনো কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এবার বৃদ্ধ একটা ছোট্ট কচ্ছপের খোলের বাক্স বের করে। তার ভেতর থেকে খানিকটা ধূপের গুঁড়ো বের করে

মন্ত্র পড়ে জ্বলন্ত অঙ্গারে ছড়িয়ে দেয়। গল গল করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে থাকে ঊর্ধ্বাকাশে। বৃদ্ধ বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ে চলে। ধীরে ধীরে গগন-মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আলাদিন বুঝতে পারে, সারা পাহাড়টা দুলছে। হঠাৎ বিরাট এক শব্দ করে পাহাড়ের এক ধারটা বিদীর্ণ হয়ে যায়। আলাদিন লক্ষ্য করলো, অদূরে আট-দশ হাত ব্যাসের এক ইঁদারার মত গর্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ ওর হাত ধরে বললো, এস, দেখবে এস।

গর্তটা খুব একটা গভীর নয়—আট দশ হাত হবে। মুর বললো, তাকিয়ে দেখ, গর্তটার নিচে একখানা শ্বেত-পাথরের চাঁই। দেখতে পাচ্ছো?

আলাদিন বললো, হ্যাঁ পাচ্ছি।

—আর কী দেখছো?

—পাথরটার মাঝখানে দুখানা পিতলের কড়া।

বৃদ্ধ বললো, নিচে নেমে পড়। এই কড়া দুখানা ধরে পাথরটাকে টেনে তুলতে হবে।

আলাদিন শিউরে ওঠে, ওরে বাবা, ওই পেল্লাই পাথর আমি টেনে তুলতে পারি নাকি? ও আমি পারবো না।

—আমি বলছি পারবে। নামো, নেমে পড়।

আলাদিন ভয়ে কাঁপতে থাকে। না না, আমি পারবো না। আপনি সুদ্ধু নামুন। দুজনে মিলে চেষ্টা করি তবে হয়তো ওঠানো যেতেও পারে।

বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে বলে, কথার অবাধ্য হ'য়ো না আলাদিন। আমাকে দিয়ে হ'লে তোমাকে সঙ্গে আনতাম না। আমার কথা শোন, নেমে কড়াটা ধরে টান দিয়ে দেখ, পাখির পালকের মতো হাল্কা মনে হবে। তোমাকে কোনও জোরই খাটাতে হবে না।

বৃদ্ধ বলতে থাকে, যা বলছি খুব মন দিয়ে শোন। ঐ পাথরের নিচে এক অতুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আছে। আল্লাহ্ তোমার জন্যেই তা বরাদ্দ করে রেখেছেন। তোমার কপালের লিখন আমি পড়ে দেখেছি। যদিও আমার অসীম ক্ষমতা, ইচ্ছা করলে পলকে প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারি, তবু ঐ পিতলের কড়া দুটো স্পর্শ করার কোনও এক্তিয়ার আমার নাই। একমাত্র তুমি ছাড়া ঐ পাতালপুরীতে অন্য কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু তুমিই ঐ গুপ্ত ধন আবিষ্কারের একমাত্র হকদার। এখন কী ভাবে কী করতে হবে তাই তোমাকে বাতলে দিচ্ছি। হ্যাঁ শোন, যা পাওয়া যাবে তা আধাআধি বখরা করে নেব আমরা।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো আটত্রিশতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

এতক্ষণে আলাদিন-এর মন থেকে সব ভয় মুছে যায়। বলে, আমি রাজি। বলুন চাচা, কী কী করতে হবে আমাকে। আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

—এই তো শেরকা মাফিক কথা।

বৃদ্ধ বুকে জড়িয়ে ধরলো আলাদিনকে। গা মাথায় আদর করতে করতে বললো, তুমি আমার প্রাণাধিক পুত্রের চেয়েও প্রিয় বাবা। এ-দুনিয়ায় আমার বলতে আর কেউই নাই। তুমিই আমার সব। আমার যা বিষয়-আসয় কালে তুমিই পাবে। শুধু তোমার ভালর জন্য ঐ সুদূর মরোক্কো থেকে এসেছি আমি। আচ্ছা আর দেরি নয়, এবার নামো। ঐ কড়া দুটো ধরে টেনে তোল পাথরখানা!

আলাদিন লাফ দিয়ে নিচে নামল। বৃদ্ধ বললো, তোমার বাপ ঠাকুর্দার নাম নিয়ে এবার কড়ায় হাত লাগাও, দেখবে পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা হয়ে উঠে আসবে।

আলাদিন কড়া দুটো দুহাতে চেপে ধরে বললো, আমি আলীর নাতি, মুসতাফার ছেলে আলাদিন—

এই বলে টানতেই পাথরের সেই প্রকাণ্ড চাঁইখানা আলগা হয়ে হাতের সঙ্গে উঠে এল। আলাদিন চাঁইখানা একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখলো।

নিচে একটা গুহা। উঁকি দিয়ে দেখলো, সিঁড়ি নেমে গেছে। বারোটা ধাপের নিচে একখানা বিরাট দরজা। রুদ্ধ দরজার পাল্লা দুখানা তামার পাতে গড়া। অসংখ্য বল্টু আঁটা। বৃদ্ধ নির্দেশ করে, নিচে নেমে যাও। দরজাটা আপনা আপনি খুলে যাবে। দরজা দিয়ে ঢুকলে দেখতে পাবে একখানা বিরাট ঘর। ঘরখানা তিনটি দরজা দিয়ে তিনখানা কামরায় বিভক্ত করা আছে। প্রথম কামরায় দেখতে পাবে বিরাট বিরাট চারটি তামার জালা। সেগুলো তরল সোণায় ভরা। পাশের কামরায় দেখবে ঐ রকম চারটি রুপোর জালা। তার মধ্যে আছে সোণার গুঁড়ো। আর শেষ কামরায় দেখবে চারটি সোণার জালা। তার মধ্যে আছে সোণার মোহর। তুমি কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ্য করবে না। সাবধান, ভুলেও ঐ জালার গায়ে হাত ঠেকাবে না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে তোমার সর্বাঙ্গ।

তৃতীয় কামরার শেষে আর একটা দরজা পাবে। সেই দরজা দিয়ে এগোলে এক মনোরম বাগিচার মধ্যে গিয়ে পড়বে তুমি। চারদিকে কত রকমের ফুল আর ফল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু ওসব দিকে নজর করার মতো সময় নাই, আরও খানিকটা এগুলে দেখবে একটা থামে লাগানো আছে একখানা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে যাবে। দেখবে, একটা ছাদের আঙিনা। ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে দুটি থামের মাঝখানের ফাঁকে একটা কুলুঙ্গি। ঐ কুলুঙ্গির ওপরে একটা পিতলের পিলসুজ। তার মাথায় একটা চিরাগ জ্বলছে। এগিয়ে যাবে, ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেবে। তারপর চিরাগটাকে হাতে তুলে নিয়ে ছাদের ওপর উপুড় করে সব তেলটুকু ঢেলে ফেলে দিয়ে তোমার কামিজের তলায় লুকিয়ে আবার নিচে নেমে আসবে। তোমার এই মূল্যবান কামিজ কুর্তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করো না। কারণ চিরাগের তেলে কোনও দাগ লাগবে না। ও তেল

সাধারণ কোনও তেল না।

এরপর আর কোথাও দাঁড়াবে না। যে পথে যাবে ঠিক সেই পথ ধরেই আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। তবে ঘাবড়ে যেও না। মুখের হাব ভাব দেখে যেন বোঝা না যায় যে চিরাগ-বাতি চুরি করে পালাচ্ছো। এমন সহজ সাধারণ ভাবে চলবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। বড় জোর দেখে মনে হতে পারে বাগানে বেড়াতে এসেছো তুমি।

চিরাগটা যদি একবার এনে আমার হাতে দিতে পার, আলাদিন, তখন আর কে পায় আমাদের। তামাম দুনিয়ার সেরা ধনী হতে পারবো আমরা। তার আর জুড়ি পাওয়া যাবে না কোথাও!

মুর তার নিজের আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে আলাদিনকে ছুঁড়ে দিল, এটা পরে নাও। এই আংটি মন্ত্রপূত, কাছে থাকলে কোনও বিপদ হয় না। শয়তান নজর দিয়ে কোনও কাজ নষ্ট করে দিতে পারে না। তাছাড়া বুকে সাহসও অনেক বেড়ে যাবে, দেখো। এখন ভালোয় ভালোয় কাজ সমাধা করে ফিরে এস। তারপর দেখবে আমরা কত বড় লোক হয়ে গেছি। শোনও আলাদিন, তোমার ঐ শেরোয়ানীটা গুটিয়ে কোমরে গুঁজে নাও। দেখবে সাবধান, কোনক্রমেই যেন ঐ জালাগুলোর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়। তা হলে তুমিও খতম হয়ে যাবে, আর চিরাগ-বাতি লাভের আশাতেও ছাই পড়বে।

আলাদিন নিচে নেমে গেল। কুর্তার ঝুল কোমরে গুঁজে নিল। দরজার সামনে দাঁড়াতেই পাল্লা দুখানা সরে গেল। আলাদিন ঘরে প্রবেশ করলো। চাচার কথা মতো কোনও দিকেই সে দৃষ্টিপাত করলো না। এক এক করে তিনখানা ঘরই পার হয়ে বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। সামনেই সেই সিঁড়ি। সোজা উপরে উঠে গেল আলাদিন। ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল কুলুঙ্গির ভিতরে জ্বলন্ত চিরাগ-বাতিটা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো ঊনচাল্লিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে থকে ঃ

একটা পিতলের পিলসুজ কুলুঙ্গির মাথার ওপর বসানো। কাছে গিয়ে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল আলাদিন। তারপর বাতিটা হাতে নিয়ে সব তেলটুকু নিঙড়ে ফেলে দিয়ে কামিজের তলায় লুকিয়ে নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল।

বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করছে। কিন্তু নিজেকে সহজ শান্ত রাখতে হবে, চাচা বলে দিয়েছেন। তাই সে নির্বিকার হওয়ার ভান করে বাগানের এদিক ওদিক তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে থাকলো।

ফলের ভারে গাছগুলোর ডাল মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। আর সে যে কত বিচিত্র রকমের বাহারী সব ফল! আলাদিন এমন ফল কখনও দেখেনি।

স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো। কোনওটা বা কর্পূরের মতো সফেদ। কোনওটা মোমের মতো সাদা। আবার কেউ বেদানার মতো টুকটুকে লাল। কোনওটা কমলা রঙের। কোনওটা হাল্কা সবুজ, কোনওটা গাঢ় সবুজ, কোনওটা হলুদ,—বেগুনী, নীল। এত রং। সব রং-এর নামই সে জানে না।

আলাদিন বুঝতে পারেনি, ঐ সাদা ফলগুলো সব হীরে, মুক্তো, আর চন্দ্রকান্তমণি। লালগুলো পলা। সবুজ সব পান্না। নীলগুলো নীলকান্তমণি। হলুদগুলো পোখরাজ। মোটকথা ফলগুলোর সবই কোনও না কোনও মহামূল্য রত্নমণি।

আলাদিন অনেক আশা নিয়ে একটা ফল হাতে ধরে ছিঁড়ে নেয়। কিন্তু একি! এতো খাওয়ার ফল নয়। পাথরের মতো শক্ত যে। আলাদিন ভাবলো আসলে এগুলো নানারকম রঙিন কাঁচের খেলনা। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। যাই হোক, মাকে দেখাবে বলে যতটা পারল ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামিজের পকেটে কোমরের বন্ধনীতে ভরে নিল সে।

আবার সেই তিন কামরার জালাগুলোর স্পর্শ বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে পার হয়ে আসে আলাদিন। বারখানা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই দেখে পাথরের চাঁইটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ। তার চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, এনেছো? আমার চিরাগ? কই দাও।

আলাদিন হাসতে হাসতে বলে, এনেছি চাচা। দিচ্ছি। চলুন ওপরে উঠি, তারপর এই কাঁচের খেলনাগুলো সব নামাই তারপর বের করে দিচ্ছি।

মুরের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, না এখনই—এখনই দাও।

—বাঃ রে, দেখছেন না, আমার সারা কামিজ কুর্তা ভরে আমি এই কাঁচের ফলগুলো নিয়ে এসেছি। এগুলো নামাতে দিন, তাড়াহুড়ো করলে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে না? এগুলো ঠিক মতো নামিয়ে রাখি, তারপর আপনার চিরাগ বাতি বের করে দিচ্ছি। সে তো একেবারে আমার পেটের সঙ্গে গোঁজা আছে। একেবারে তলায় চাপা পড়ে আছে।

মুরের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোয়, হুম্ বুঝেছি, আমার সঙ্গে চালাকী শুরু করেছো। ভেবেছো, আমি কিছু বুঝি না? ওসব কোনও কথা শুনতে চাই না, দেবে কিনা, বল। তা না হলে এখুনি মজা টের পাইয়ে দেব; কুত্তার বাচ্চা। বের কর বলছি?

আলাদিন বুঝতে পারে না হঠাৎ চাচা কেন এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বলে, কিন্তু আমাকে বের করতে দেবেন তো, চাচা!

—চাচা! কে তোর চৌদ্দপুরুষের চাচা রে শয়তান। ভেবেছ, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি পালাবে। সেটি হচ্ছে না।

এই বলে মুর আচমকা দুই থাপ্পড় বসিয়ে দিল আলাদিনের গালে। আলাদিন টাল সামলাতে না পেরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেল।

সিঁড়ির নিচে পড়ে সে ভাবলো, এখন ওপরে ওঠা ঠিক হবে না। চাচার

রাগ খানিকটা প্রশমিত হলে তারপর ওঠা যাবে।

এদিকে বুড়ো হা-হুতাশ করে চুল দাড়ি ছিঁড়তে থাকলো। এই গুহায় নামার এক্তিয়ার নাই তার। তার কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। তাই সে আলাদিনের পিছু ধাওয়া করতে পারলো না। ওপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগলো।

ওরে শয়তানের বাচ্চা, ভেবেছিস পালিয়ে বাঁচবি। দাঁড়া তোকে এমন শিক্ষা দেব, জীবনে ভুলতে পারবি না।

লাফ দিয়ে সে ওপরে উঠে এসে কাঠের পাঁজায় আগুন জ্বালিয়ে ধুপের গুঁড়ো ছড়িয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টা আবার দুলে উঠে ফাটলটা বন্ধ হয়ে গর্তের মুখ জোড়া লেগে গেল।

আপনারা আগেই শুনেছেন, এই বুড়ো মুরটা আসলে আলাদিনের কেউ না। মরোক্কোর সে এক কুখ্যাত জাদুকর।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চল্লিশতম রজনীতে
আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

ছোটবেলা থেকে সে যাদুবিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষালাভ করে অনেক অলৌকিক কায়দা কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিল। গণনায় সে জানতে পেরেছিল এই পাহাড়ের নিচে এক আশ্চর্য যাদু চিরাগ আছে। সেই চিরাগ হস্তগত করতে পারলে, দুনিয়ার তাবৎ ধন-সম্পদের সে মালিক হতে পারবে।

গণনায় জানতে পাওয়ার পরই সে মরোক্কো ছেড়ে সুদূর এই চীন দেশে পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছিল। এবং গণনায় এও পরিষ্কার জানতে পেরেছিল, মুসতাফার পুত্র আলাদিনের নামেই সে চিরাগ বরাদ্দ করে রেখেছেন আল্লাহ। কিন্তু খোদার এই লিখন সে ভণ্ডুল করে আলাদিনকে দিয়েই চিরাগবাতি নিজের কব্জায় আনতে চেয়েছিল। কাজটা নির্বিঘ্নে সমাধাও হয়ে এসেছিল। আলাদিন চিরাগটা এনেছিল। কিন্তু ওর নিজেরই ভয় হলো, ওপরে উঠে যদি সে চিরাগটা না দেয়। যদি বলে, আমি কষ্ট করে এনেছি, তোমাকে দেব কেন? তাই তো সে ওকে দুটো থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আলাদিন যে নিচে গড়িয়ে পড়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি। গুহার নিচে নামার তার এক্তিয়ার নাই। আল্লাহর নির্দেশে এটা তার কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। তাই সে তাকে চিরকালের মতো সমাধিস্থ করে রেখে দিল। এখন সেই গুহার মধ্যে অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মরুক।

মুর ঠিক করলো সে আর এদেশে থাকবে না, তার স্বদেশ আফ্রিকাতেই সে ফিরে চললো।

এখনকার মতো যাদুকর মুরের কথা মুলতুবী রাখছি। যথাসময়ে আবার আমরা তার কথায় ফিরে আসবো।

আলাদিন গুহার নিচে বসে যখন ভাবছিল চাচা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার রাগ

কিছুটা প্রশমিত হলে সে উপরে উঠে যাবে, সেই সময় বুঝতে পারলো গুহাটা দুলছে। ভয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু গুহার মুখে পাথরের চাঁইখানা চাপা দেখে হতাশায় ভেংগে পড়লো। প্রাণপণ শক্তিতে নড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু একতিলও নড়াতে পারলো না। চিৎকার করে সে ডাকতে থাকলো, চাচা, আমাকে উপরে উঠতে দিন। এই নিন আপনার চিরাগবাতি।

কিন্তু কে শুনবে তার আর্ত-আহ্বান? মুর তখন সেখান থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আলাদিন বুঝতে পেরেছিল, লোকটা আসলে তার চাচা নয়। হতে পারে না। কারণ কোনও চাচা তার ভাইপোকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি গালাজ করে না। নিশ্চয়ই সে কোন শয়তান যাদুকর। তাকে দিয়ে কার্য সিদ্ধি করে নিতে চেয়েছিল।

এখন সে কী করবে? কী করে এই পাতালপুরীর কয়েদখানা থেকে উদ্ধার পাবে, কিছুই ভাবতে পারে না। বাগানের দিকে যেতে চায় কিন্তু সে দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ধাক্কা-ধাক্কি করেও খুলতে পারলো না। তাই নিরুপায় হয়ে আবার ফিরে এসে গুহার সিঁড়ির মুখে বসে বসে কাঁদতে লাগলো।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই গুহার মধ্যেই সে তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে। আর সে তার মার কাছে ফিরে যেতে পারবে না। ফিরে যেতে পারবে না তার আত্মীয় বন্ধুদের মাঝে। একবিন্দু জল একটুকরো রুটির অভাবে তাকে—প্রাণ দিতে হবে। অথচ তার ধারে কাছে কত সোনা। এখানে তার কানা কড়িও দাম নাই।

আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল ছায়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মরতে তাকে হবে।—ইয়া আল্লাহ এ কী করলে তুমি? কী এমন পাপ করেছিলাম, যার সাজা এইভাবে আমাকে পেতে হবে?

আলাদিন পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বড় অকরুণ। তার এত কাকুতি-মিনতি তিনি কর্ণপাত করলেন না।

তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। আলাদিন হাতের তালু দিয়ে বুক গলা ঘষে কষ্টটা কিছু লাঘব করতে চায়। হঠাৎ তার হাতের আংটির সংগে বুকে ঘষা লাগতেই এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বিশাল আকারের এক আবলুস কালো আফ্রিদি দৈত্য এসে দাঁড়ালো আলাদিনের সামনে।

—আমি স্থল জল এবং অন্তরীক্ষের অধিপতি, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু আমি ঐ আংটির দাস। এখন আংটিটা আপনার হাতে—তাই আমি আপনারও আজ্ঞাবহ। বলুন মালিক, কী চান আপনি?

অন্য সময় হলে দৈত্যের এই বিকটাকৃতি দেখে আলাদিন মূর্ছা যেত, কিন্তু এখন সে মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। সে ধরেই নিয়েছে, আজ হোক, কাল হোক তাকে মরতেই হবে। সুতরাং আফ্রিদিকে দেখে সে ভাববে কেন?

—এই মুহূর্তে আমি এই গুহার নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির উপরে যেতে চাই।

আফ্রিদি বললো, এখুনি আপনার হুকুম তামিল করছি, মালিক।

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, আলাদিন দেখলো, দৈত্যটার মাথার ওপর থেকে পাথর সরে গেল। এবং তৎক্ষণাৎ আলাদিনকে তুলে নিয়ে সে উপরে চলে এল। ঠিক যেখানে মুর যাদুকর কাঠের ধুনী জ্বালিয়েছিল সেখানে বসিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আলাদিনের সে কী আনন্দ! প্রাণভরে সে নিশ্বাস টানলো। ওপরে তাকিয়ে দেখলো, লক্ষ-কোটি তারকা-খচিত সুন্দর নীল আকাশ। মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিল। আলাদিন বাঁচার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

পাহাড় থেকে বাড়ির পথ অনেকটা। কিন্তু তখন সে খিদে-তৃষ্ণা ভুলে ছুটে চললো বাড়ির দিকে। যখন বাড়ির দোরগড়ায় পৌঁছলে, তখন রাত অনেক। মা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছেলের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। আলাদিনকে ঐভাবে ফিরতে দেখে আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সে।

—এত রাত হলো কেন রে? আমি ভয়ে মরি, তোর কী মায়ের কথা একটুও মনে ছিল না বাবা!

আলাদিনের তখন কথা বলার অবস্থা নাই, শুধু বলতে পারলো, মা, পানি—

তাড়াতাড়ি এক বদনা জল এনে ছেলের মুখে ধরে মা। আলাদিন ঢক ঢক করে প্রায় পুরো বদনাটাই নিঃশেষ করে দেয়। তারপর নেতিয়ে শুয়ে পড়ে দরজার পাশেই।

মা গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। সেই মুহূর্তে ছেলেকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আলাদিন চোখ খোলে, মা, বড্ড খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

ঘরে যা ছিল এনে দেয় সে। আলাদিন আর ধৈর্য রাখতে পারে না। গোগ্রাসে খেতে থাকে। মা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, বাবা?

আলাদিন কোন রকমে মুখের খাবার গিলে নিয়ে বলে, সেই সকালে দু-একটা ফল খেয়েছিলাম। তারপর আর জোটেনি কিছু।

মা বললো, বুঝেছি, খুব খিদে পেয়েছে। তা অত তাড়াহুড়া করছিস কেন? ধীরে-সুস্থে খা। অমনভাবে খেলে, গলায় আটকে মরবি যে?

আলাদিন বলে, তুমি কিছু ভেবো না মা। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আগে পেট ভরে খেতে দাও।

—কেন, তোর চাচা খেতে দেয়নি কিছু?

—চাচা? কে চাচা? লোকটা একটা ধাপ্পাবাজ শয়তান যাদুকর। ও জাতে মুর, কোন কালেও আমার চাচা না।

মা আঁৎকে ওঠে, ওমা বলিস কী? তবে যে সে বলেছিল তোর বাবার মায়ের পেটের ভাই। তিরিশ বছর আগে দেশ থেকে বিবাগী হয়ে গিয়েছিল?

—সব ধাপ্পা মা, সব ধাপ্পা। আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার জন্যে সে ঐরকম বাহানা করে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল।

মা অবাক হয়ে বলে, কাজ হাসিল করার জন্য? তা তোকে দিয়ে তার কোন উপকার হবে? কী এমন কাজ করে দিতে পারিস তুই।

আলাদিন তখন সব কথা মাকে খুলে বলে। কীভাবে সে তাকে পাহাড়ের উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল, কীভাবে মন্ত্রবলে সে পাহাড় বিদীর্ণ করে ফেলেছিল এবং কেমন করে আলাদিন তার কথামতো সেই চিরাগবাতিটা আনতে পেরেছিল —সব কাহিনী সবিস্তারে সে মাকে খুলে বললো।

মা তো শুনে থ। এমন সব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা যে হতে পারে বিশ্বাসই হতে চায় না তার। বলে, সামান্য একটা চিরাগবাতির জন্য তোকে ঐ পাতাল-পুরীতে নামিয়ে দিয়েছিল লোকটা? কই, কোথায় সে চিরাগবাতি?

আলাদিন এবার বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে ঐসব হীরে চুনি পান্না মুক্তোর ফলগুলো এক এক করে বের করতে থাকে।

মা আবাক হয়ে বলে এগুলো কী? এতো দেখছি সব খেলনার জিনিস! তোর চিরাগ কই?

আলাদিন বলে, সবুর কর সব বের করি, তারপর ওটাও বের করবো। একেবারে পেটের নিচে পড়ে আছে।

একটা ছোট্ট তামার চিরাগবাতি। মা দেখে বলে ওমা, এর জন্য এত কাণ্ড। দাম তো এক আধলাই হবে।

আলাদিন ঘাড় নেড়ে বলে, আমারও তো তাই ধারণা মা। কিন্তু বুঝলাম না, লোকটা এই তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্য কেন আমাকে ঐ গুহার মধ্যে পাঠিয়েছিল? আর কেনই বা সে আমাকে ঐভাবে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, তাই বুঝতে পারছি না আমি। অথচ দেখ, আমার জন্য আমাদের সংসারের জন্য কত পয়সাই না সে খরচাপাতি করলো? জানি না এই তামার চিরাগটা দিয়ে তার কী উপকার হতো?

মা বলে, ওসব যাদুকররা ঐরকম হয়। শুনেছি, অল্প বয়সী ছেলেদের ওপর ওদের খুব নজর। তুকতাক করার জন্যে নাকি উঠতি বয়সের ছোকরার দরকার হয়। যাক বাবা, জান নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পেরেছিস, সেই তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। নে, এখন ঘুমিয়ে পড়।

পরদিন সকালে আলাদিন বললো, মা খেতে দাও।

মা-এর মুখ কালো হয়ে গেল। ঘরে যা ছিল কাল রাতেই তো সব শেষ হয়ে গেছে! বললো বাবা আর তো কিছু নাই। দাঁড়া দেখি মহাজনের কাছ থেকে কিছু ধার-কর্জ পাই কিনা। পেলে কিছু কিনে নিয়ে আসবো।

আলাদিন বললো, মা ঐ চিরাগটা বেচলে একটা আধলা দিরহামও তো

মিলতে পারে। ওটা সঙ্গে নিয়ে যাও না, ধার যদি না পাও, তবে খালি হাতে ফিরতে হবে না। বিক্রি করে যা-পাও তাই দিয়ে যাহোক কিছু একটা আনতে পারবে!

মা-বলে, ভাল কথা বলেছিস বাপ। ওটা সঙ্গেই নিয়ে যাই। অমন চিরাগ ঘরে রেখে কী ফয়দা হবে। তার চেয়ে বেচে দিলে আধ দিবহাম তো মিলতে পারে। কই দে দেখি চিরাগটা।

আলাদিন ঘর থেকে চিরাগবাতিটা এনে দেয় মা-এর হাতে। বলে, এক কাজ কর মা, খানিকটা ছাই দিয়ে মেজে ঘষে সাফ করে নাও। তামার জিনিস মাজলে একটু চক চক করবে। খদ্দেরের নজরে ধরলে হয়তো পুরো একটা দিরহামই পেয়ে যেতে পারো।

মা বলে, তা মন্দ বলিসনি আলা।

রসুইখানায় গিয়ে আলাদিনের মা উনুনের ছাই নিয়ে চিরাগটা মাজতে বসে যায়। একটা ঘষা দিতেই বিরাট এক আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হয় সামনে। আলাদিনের মা তো সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে বিকট এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়?

আলাদিন ছুটে এসে রান্নাঘরের মাঝখানে দণ্ডায়মান আফ্রিদিকে দেখে আঁৎকে ওঠে, কিন্তু মূর্ছা যায় না। কাল রাতে পাহাড়ের গুহায় সে এই রকমই আর একটা আরও কুৎসিত আফ্রিদির মুখোমুখি হয়েছিল। তাই ভয় অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আলাদিনের আর বুঝতে কষ্ট হলো না, ঐ চিরাগের অলৌকিক ক্ষমতায় এই আফ্রিদির আবির্ভাব ঘটেছে। তাড়াতাড়ি সে চিরাগবাতিটা হাতে তুলে নিয়ে আফ্রিদিকে প্রশ্ন করে, তুমি কে?

আফ্রিদি বিশাল বুকটা সামনের দিকে নুইয়ে অভিবাদনের ভঙ্গী করে বলে, আমি জল স্থল অন্তরীক্ষের অধীশ্বর। কিন্তু আমার ঈশ্বর ঐ চিরাগ-বাতি। সে এখন আপনার হাতের মুঠোয়। সুতরাং আমি আপনার দাসানুদাস, আজ্ঞা করুন প্রভু, কী করতে হবে?

আলাদিন বললো, কিছু খাবার-দাবার নিয়ে এস।

পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল দৈত্যটা। কিন্তু তা পলকের জন্যই। আবার তাকে দেখা গেল এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার বিরাট একখানা রূপোর বারকোস। তার ওপর বারখানা সোনার থালায় সাজানো নানারকম সুগন্ধী সব খানাপিনা। বারকোসখানা মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

মা তখনও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। আলাদিন চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে চোখ মেলে তাকাল সে। তখনও তার ভয়, দৈত্যটা বুঝি ধারে-কাছেই রয়ে গেছে। এদিক ওদিক ভাল করে সে দেখতে লাগলো।

আলাদিন হাসতে হাসতে বলে, নাও ওঠ। তুমি ভয় করছো, দৈত্যটা তোমার গলা টিপে ধরবে? না না, ওসব কিছু সে করবে না। ওঠ, এখন সে চলে গেছে।

মা উঠে বসে। ঘরের মেঝেয় বিরাট একটা রূপোর বারকোসে সাজানো নানারকম খানাপিনা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এ সব কী? কে আনলো আলাদিন?

—আবার কে? ঐ আফ্রিদি দৈত্য, যাকে দেখে তুমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। সে দেখ কত সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য? নাও, এস খেতে বসি। বেশ গরম আছে, দেখছো না কেমন ধোঁয়া ছাড়ছে।

মা-এ পো-এ খুব রসিয়ে রসিয়ে খায়। কতকাল এসব খানাপিনা চোখে দেখেনি তারা। অন্যের বাড়ি শাদী নিকায় নিমন্ত্রণ হলে তবে এরকম দু একটা পদ হয়তো বরাতে জোটে। না হলে গাঁটের কড়ি খরচ করে কেউ এমন বাহারী খাবার বানায় না।

মা বলে, এত খাবার তো তিন বেলা খেয়েও শেষ করতে পারবো না আমরা। আর এমন দামী খানাপিনা ফেলে দিতেও মায়া লাগে। তার চেয়ে আর্ধেকটা কালকের জন্যে তুলে রেখে দিই, কী বলিস?

আলাদিন বলে, তাই দাও। আচ্ছা মা, এই থালাগুলো দেখছো, কেমন সোনার মতো চক চক করছে।

মা বললো, পিতলের বাসন যত্ন করে ঘষা মাজা করে রাখলে সোনার মতই মনে হয়, বাবা।

সেই কালিয়া, কোর্মা কাবাব, বিরিয়ানী, তন্দুরী প্রভৃতি উপাদেয় খাবারগুলো ওরা দুদিন ধরে ভুরিভোজ করে খেল। তৃতীয় দিন সকালে আবার যে কে সেই অবস্থা। ঘরে ফুটো পয়সা নাই। আলাদিন বলে, আবার আফ্রিদিকে ডাকি মা? আবার সে খাবার-দাবার দিয়ে যাবে।

মা শিউরে ওঠে, না না, বাবা, ও সবের দরকার নাই। ওই সব জীন দৈত্য আমি সহ্য করতে পারবো না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ (আল্লাহ তাকে অমর করুন) এসব একদম পছন্দ করতেন না। আফ্রিদি দৈত্য বা অলৌকিক যাদু ভেল্কী থেকে তিনি শত হাত দূরে থাকতে বলেছেন। কারণ ওগুলো শয়তানের আধার। তুই বরং এই সব রেখে অন্য কোনও ধান্দা দেখ বাবা, কিছু রোজগারপাতি করার চেষ্টা কর।

একখানা থালা কামিজের তলায় পেটে গুঁজে আলাদিন বাজারে চলে আসে। ওপাশে একটা বিধর্মী ইহুদীর দোকান। লোকটার তেজারতি কারবার। ওর দোকানেই ঢুকে পড়ে সে। লোকটাকে দেখতে ঠিক রক্ত-চোষা কাঁকনাসের মতো। একেবারে হাড্ডিসার চেহারা। চোখ দুটো কোটরে-বসা শকুনের মতো লোলুপ।

—আইয়ে আইয়ে বইঠিয়ে, জনাব। বলুন, কী উপকারে লাগতে পারি আপনার?

আলাদিন সঙ্কুচিতভাবে থালাটা বের করে ইহুদীর হাতে দেয়। ইহুদীটা থালাটার দিকে দৃষ্টিপাত করেই আলাদিনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতে

থাকে। চোরাই মাল কিনা বুঝতে পারে না। কষ্টিপাথর থালায় ঘষে সোনার মান যাচাই করে বলে, কত হলে দেবে ?

আলাদিন কী বলবে, কী দাম হতে পারে, ও বুঝবে কী করে ? বলে, আপনিই তো ভাল বুঝবেন, দরাদরির কি আছে। যা উচিত দাম হয়, দিন।

অনেক ইতঃস্তত করার পর ইহুদীটা একটা সোনার দিনার তুলে দেয় আলাদিনের হাতে। আসলে থালাটার দাম কম করে হলেও দুশো দিনার হবে। কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরেছে, ছেলেটা এর আসল কিমৎ জানে না।

পুরো একটা দিনার হাতে পেয়ে আলাদিনের চোখ চকচক করে ওঠে। দিনারটাকে মুঠি করে চেপে ধরে ইহুদীটাকে আদাব জানিয়ে সে রাস্তায় নেমে হন হন করে হেঁটে বাজারের অন্য প্রান্তে চলে যায়। ইহুদী স্যাকরাটা 'চুক চুক' করে পস্তাতে পস্তাতে কপাল চাপড়ায়।

—ইস্, আধ দিনার দিলেই চলতো, কেন একটা গোটা দিনার দিতে গেলাম—

দিনারটা ভাঙ্গিয়ে আলাদিন কিছু খানাপিনা কিনে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বলে, জান মা বাজারের ঐ ইহুদীটা কত ভাল, থালাখানা নিয়ে সে পুরো একটা দিনারই দিয়ে দিল। এই নাও বাকী টাকা।

মা হেসে বললো, তুমি কচি ছেলে। দেখতেও তো শাহজাদার মতো—তাই বুড়ো তোকে ভালবেসে বেশি পয়সা দিয়েছে।

দিনারটা ফুরিয়ে গেলে কয়েকদিন পরে আর একখানা থালা পেটে গুঁজে গায়ে চাদর জড়িয়ে আলাদিন আবার সেই ইহুদীর দোকানে আসে। ইহুদী জুল জুল চোখে আলাদিনের চাদর ঢাকা পেটের দিকে তাকায়, আজ কী আছে, জনাব ?

আলাদিন থালাখানা বের করে দেয়। বুড়োটা আবার একটা দিনার বের করে দেয়। ভাবে, গত দিনই চালে ভুল হয়ে গেছে, আজ আর একই মালের জন্য কম দেওয়া যাবে না।

এইভাবে কয়েকদিন বাদে বাদে এক একখানা করে থালা এক এক দিনারের বিনিময়ে ইহুদীটার দোকানে বেচে দেয় আলাদিন। সেই পয়সায় চলে যায় বেশ কিছুদিন।

কিন্তু বেশ কিছুদিন একদা শেষ হয়ে আসে। গৃহে আহার্যের অভাব দেখা যায়। মা-এর মুখ শুকিয়ে যায়। আলাদিন বলে, ঐ চাঁদীর বারকোসটাও বেচে দিয়ে আসি মা। কী হবে ও জিনিস ঘরে রেখে ? পেটে খিদে রেখে ঘরে সোনা রূপা জমা করে রেখে কী ফয়দা ?

মা বলে, জিনিসটা বড় বাহারী। তা খেদ করে আর কী হবে, যা নিয়ে যা। দেখ, কী পাওয়া যায়।

ইহুদী পুরো দুটো সোনার মোহর দিল আলাদিনকে। বললো, আমার কাছে এলে ন্যায্য দাম পাবেন, জনাব। অন্য দোকানে যাচাই করার আগে আমার কাছে একবার আসবেন, মোসেস-আরন-এর নামে কসম খেয়ে বলছি, ঠকবেন না।

আলাদিন বলে, সেইজন্যেই তো সোজা আপনার কাছেই আসি। আচ্ছা, আজ চলি।

শেষ সম্বল দুটি মোহরও কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। আলাদিন মাকে বলে, মা তোমার ভয় ডর একটু কমাও তো, না খেয়ে তো মরা যাবে না, আমি আবার ঐ আফ্রিদিকে ডাকছি একবার। না হলে চলবে কী করে?

মা বললো, ঠিক আছে, আমি একটু পাশের বাড়িতে বেড়িয়ে আসি। তুই যা ভাল বুঝিস, কর।

মা চলে গেলে আলাদিন চিরাগবাতিটা বের করে একটা ঘষা দিতেই আবার সেই আফ্রিদিটা এসে সালাম ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—আমি জল স্থল অন্তরীক্ষের অধীশ্বর। কিন্তু আমার ঈশ্বর ঐ চিরাগ। সে এখন আপনার কব্জায়। সুতরাং আমি আপনার দাসানুদাস, আজ্ঞা করুন প্রভু।

আলাদিন বলে, আরও কিছু খানাপিনা নিয়ে এস।

পলকের মধ্যে আবার সে ঠিক আগের মতো একখানা চাঁদীর বারকোস এনে নামায়। তার উপরে বারখানা সোনার থালায় সুগন্ধী সব মন-মাতানো খাবার-দাবার।

দুদিন ধরে খুব চব্য চোষ্য করে খেল ওরা। তার পরদিন আলাদিন আবার একখানা থালা জামার তলায় পেটে গুঁজে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে।

ইহুদীটার দোকানে যাবার পথে এক মুসলমান বৃদ্ধের স্যাকরার দোকান পড়ে। এই সদাশয় বৃদ্ধ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করছিল, কয়েকদিন পর পর ছেলেটা কামিজের তলায় কি যেন একটা নিয়ে ইহুদীর দোকানে ঢোকে। ইহুদীটা যে মস্ত ফাঁকিবাজ—লোক ঠকাতে ওস্তাদ সে কথা সবাই জানে। বৃদ্ধ ভাবে, অবোধ সরল ছেলেটাকে না জানি শয়তানটা কী ভাবে ঠকাচ্ছে। দোকানের সামনে আসতে বৃদ্ধ আলাদিনকে ডাকে, শোন বাবা, শোন।

আলাদিন দ্বিধাভরে দোকানে উঠে আসে। বৃদ্ধ বলে, প্রায়ই দেখি, তুমি ঐ বিধর্মী ইহুদীটার দোকানে যাও। লোকটা ভাল না, কী ব্যাপার, কেন যাও সেখানে?

আলাদিন বলে, সংসারের অবস্থা আগে ভাল ছিল আমাদের। এখন অভাব অনটনে পড়েছি। তাই কিছু থালাবাটি বিক্রি করে খেতে হচ্ছে।

বৃদ্ধ বলে, কই দেখি, কী এনেছো আজ?

আলাদিন থালাখানা বের করে বৃদ্ধের হাতে দেয়। এক নজরেই বৃদ্ধ বুঝতে পারে একেবারে নিখাদ খাঁটি সোনার তৈরি। জিজ্ঞেস করে এরকম কতগুলো আছে তোমাদের ঘরে।

—বারখানা। আরও বারখানা ছিল, ঐ ইহুদীকে বেচে দিয়েছি। কী দাম দেবেন এটার।

বৃদ্ধ বলে, তুমি যেই হও, আমি কোনও ঠকাবার ব্যবসা করি না, বাবা।

দাঁড়াও ওজন করে দেখি, যা ন্যায্য দাম হয় তাই পাবে।

নিক্তিতে ওজন করে হিসেব কষে সে দাম বলে. দুশো দিনার পেতে পার।

আলাদিন আকাশ থেকে পড়ে। দুশো দি-না-র ?

—হ্যাঁ দুশো দিনার। অন্য পাঁচটা দোকানে যাচাই করে দেখতে পার। যদি কেউ বেশি দিতে চায় তবু তাকে দিও না। আমার কাছে এসো, আমিও দেব তোমাকে সেই দাম।

আলাদিন বলে, অন্য দোকানে যাওয়ার কোনও দরকার নাই আমার। এখন বুঝতে পারছি, ইহুদীটা আমাকে কি ঠকান ঠকিয়েছে।

—কত করে দিয়েছিল এই এক একটা থালার জন্য ?

—মাত্র এক দিনার।

বৃদ্ধ চমকে ওঠে, এক দিনার? বল কী? এ যে গলাকাটা ব্যাপার। লোকটাকে ফাঁসী দেওয়া দরকার। কিন্তু কী করবে বল, সাক্ষী প্রমাণ তো কিছু নাই, তা না হলে ওকে জেলে ভরে দেওয়া যেত।

আলাদিন বলে, যাক, যা-গেছে তা-যাক। ও নিয়ে আর ঝুট ঝামেলা বাড়াতে চাই না। এখন থেকে আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও যাবো না।

এর পর থেকে সেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দোকানে সব থালাগুলো বেচে দিয়ে অনেক টাকা ঘরে তোলে আলাদিন। বহুকাল পরে নিজেদের দৈন্যদশা কাটিয়ে বেশ পয়সাকড়ির মালিক হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ দোকানীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাদিনের বেশ ভাব জমে ওঠে। কথায় কথায় বৃদ্ধ বলে, এ ছাড়া আর কিছু নাই তোমাদের বাড়িতে ?

আলাদিন বলে দামী জিনিস বলতে আর বিশেষ কিছু নাই। তবে কতকগুলো শৌখিন ঘর সাজানো—জিনিস কিছু আছে। তবে সে-গুলো সবই কাঁচের, পাথরের। আপনার দোকানে তার কিই বা কদর হবে।

বৃদ্ধ বলে, ঠিক আছে, কাল একটা নিয়ে এসো তো, দেখবো, কেমন শখের জিনিস ?

পরদিন সে একটা আনার নিয়ে বৃদ্ধের দোকানে আসে। বৃদ্ধ সমঝদার জহুরী। হাতে ধরেই বুঝতে পারে, এ বস্তু সাত বাদশাহর ধন—মালিক। বলে, বাবা, একটা কথা বলবো ?

—বলুন।

—এ-রকম ঘর সাজানো কাঁচ-পাথর কতগুলো আছে তোমার বাড়িতে ?

আলাদিন বলে, ঠিক গুনিনি, তা কমসে কম শ'খানেক হবে।

বৃদ্ধের চোখ ছানা-বড়ার মতো গোল গোল হয়ে ওঠে, এক-শো ?

আলাদিন বলে, ঐ রকমই হবে ? কিন্তু কেন ?

বৃদ্ধ বললো, শোন বাবা, আমি অধর্ম করিনি জীবনে, আজও করবো না। তাই বলছি, এ জিনিস তুমি আর কাউকে দেখাবে না বা বলবে না তোমার কাছে আছে এ সব ?

আলাদিন বুঝতে পারে না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, কেন ?

বৃদ্ধ বলে, আমার এই দোকানে খুব কম করে হলেও কয়েক লক্ষ দিনারের সম্পত্তি আছে। আমার বাড়ি ঘর জমি জমা এবং অন্য বিষয় আসয় বেচলেও দশ বিশ লাখ হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু সব দিয়েও তোমার এই একটা 'কাঁচের ফলের দাম মেটানো যাবে না, বাবা। এবং সে চেষ্টাও আমি করবো না। শুধু আমি কেন এই শহরের সব সওদাগরের তামাম সম্পত্তি ধনদৌলত একত্র করলেও এর একটার দাম হবে না। তাই বা বলি কেন, আমাদের যে সুলতান, তার যে এই বিশাল সলতানিয়ত—এই রকম সাত সাতটা সলতানিয়তের যা মূল্য, তোমার এই আনারটার মূল্য তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সুতরাং এমন অমূল্য রত্ন যখন যে-কোনও কারণেই হোক, তোমার নসীবে জুটেছে এগুলো হাতছাড়া করো না। যত্ন করে বাক্সে তুলে রেখে দিও।

আলাদিন বৃদ্ধের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই অনুধাবন করতে পারলো না। যাই হোক, বুঝলো জিনিসগুলো শখের হলেও বাজারে হামেশা মেলে না। কোনও শৌখিন মানুষের দেখা পেলে হয়তো মোটামুটি ভাল দামে বিকতেও পারে। তবে এটা সার বুঝতে পেরেছে, এই সদাশয় বৃদ্ধ এ বস্তুর বেসাতি করে না। যাই হোক সৎ পরমর্শই দিয়েছে। হাটে বাজারে অন্য কোনও দোকানে নিয়ে গেলে ওকে ঠকিয়ে নাম মাত্র মূল্য ধরিয়ে সবগুলো হাতিয়ে নিয়ে নেবে।

বাড়িতে ফিরে এসে আলাদিন কাঁচ-পাথরের ফলগুলো একটা প্যাটরায় পুরে খাটের তলায় ফেলে রাখে।

এর পর আর ও-নিয়ে মাথা ঘামায় না আলাদিন। খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। বৃদ্ধের দোকানে বসে গল্প স্বল্প করে।

এইভাবে দিন কাটছিল। একদিন বৃদ্ধের দোকানে বসে খোস-গল্পে মশগুল ছিল আলাদিন, এমন সময় সুলতানের পেয়াদা বরকন্দাজরা ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে ফরমাস জারি করতে করতে রাস্তা সাফ করে করে এগোচ্ছিল।

—শোনও শহরবাসীরা, সুলতানের কন্যা শাহজাদী বদর অল বুদুর আজ হামামে গোসল করতে যাবেন। সেইজন্যে সুলতানের হুকুম, যে যেখানে আছ, দোকান-পাট বন্ধ করে এ রাস্তা থেকে সরে পড়ো, না হলে গর্দান যাবে।

হুড়মুড় করে ঝপ ঝপ করে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল নিমেষে। বৃদ্ধ আলাদিনকে বললো, পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। এখনই শাহজাদী পথে বেরুবেন। তার সামনে পিছনে কয়েক শো নিগ্রো খোলা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে হাঁটবে। যদি কাউকে পথের এধারে ওধারে দেখে তারা, তবে আর রক্ষে নাই। একেবারে কচু-কাটা করে ফেলবে। তাই আর এক পলক দেরি করো না, বাবা! কি জানি কিছুই বলা যায় না, কার নসীবে কী লেখা আছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আলাদিন বাড়ি ফিরে যায় না। শুনেছিল, সুলতান কন্যা বদুর অল বুদুর নাকি বেহেস্তের ডানা-কাটা পরী। সুলতানের হারেমে ঢুকে তাকে তো দেখার দুঃসাহস হবে না কারো, তবে আজ যখন হাতের কাছে

সুযোগ একটা মিলেই গেছে, এ সুযোগ হেলায় হারাবে না আলাদিন। না হয় নিগ্রো খোজাদের হাতে তার মাথাটা উড়ে যাবে। তা যাক, বন্দর সুন্দরীকে সে দেখবেই।

ছুটে চলে যায় ঐ খানদানী হামামে। দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ঘাপটি মেরে।

একটু পরে সদলবলে শাহজাদীর ডুলি এসে দাঁড়ায় হামামের সামনে। সশস্ত্র নিগ্রো খোজারা দুই ধারে সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ডুলি থেকে নামে শাহজাদী। হামামের ভিতরে ঢুকে সে বোরখার নাকাব খুলে ফেলে।

আলাদিনের বুকের মধ্যে ধক করে জ্বলে ওঠে এক ঝলক আগুন। একি দেখছে সে। এতদিন ধরে এই না-দেখা সুন্দরীর অনেক সুন্দর মুখচ্ছবি সে মনের মুকুরে এঁকেছিল, কিন্তু আজ বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করল, তার তুলনা কোথায়! মানুষের কল্পনা এখানে পৌঁছতে পারে না।

শাহজাদী হামামের ভিতরে ঢুকে যায়। সকলের অলক্ষে টুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আলাদিন। তারপর সোজা চলে আসে বাড়িতে।

আলাদিনের সমস্ত হৃদয়ে তুফান ওঠে। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে কাতরাতে কাতরাতে বিছানায় ঢলে পড়ে।

ছেলের অস্ফুট গোঙানি শুনে মা ছুটে আসে ঘরে। আলাদিন তখন বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ অবধি গড়াগড়ি খাচ্ছিল। মা ভাবে, ছেলের বুঝি বিমার হয়েছে। গায়ে হাত রেখে বলে, কী হয়েছে বাবা, এমন করছিস কেন? কোথাও চোটফোট লেগেছে?

আলাদিন খাটের বাজুর সঙ্গে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলে, না না ওসব কিছু হয়নি।

—তবে? তবে এমন ছটফট করছিস কেন?

—সে তুমি বুঝবে না মা, এখন এখান থেকে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

মা আর কথা বাড়ায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রাত্রে এসে জিজ্ঞেস করে, ওঠ বাবা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়। দেখবি কাল সকালে সব দর্দ সেরে গেছে।

আলাদিন বলে, তুমি খেয়ে নাও মা, আমি খাবো না।

—সে কি! তুই না খেলে আমি খাব কি করে, বাবা?

—বাঃ, আমার তবিয়ত ভাল না থাকলেও আমাকে খেতে হবে। তুমি যাও আমার মাথা ধরেছে, আমি খাব না।

মা বলে মাথা ধরার ভালো গোলি আছে আমার কাছে। এক গেলাস পানির সঙ্গে খেয়ে নে, এখুনি ছেড়ে যাবে।

আলাদিন এবার ঝাঁকিয়ে ওঠে, ওসব দাওয়াই ফাইয়াই-এ আমার কিছু হবে না, মা। তুমি আর কথা বাড়িও না। এখন যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

মা চলে যায়। আলাদিন সারারাত ধরে বিছানায় পড়ে ছটফট করে। একি অসহ্য যন্ত্রণা, কেন এমন হলো তার ? বদ্দুর এর রূপে কী যাদু ছিল, যা তার সকল প্রাণ-মন মথিত করে ফেললো ?

পরদিনও আলাদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। মা অনেক সাধাসাধি করে কিন্তু কিছুই ফল হয় না। আলাদিনের বুকের জ্বালা কিছুতেই প্রশমিত হয় না।

মা ভাবে, ছেলের কঠিন কোনও অসুখ করেছে। বলে, শহরে শুনেছি এক নামজাদা হাকিম এসেছে। আমি ভাবছি, তাকে ডেকে এনে দেখাবো তোকে। তা সে যে টাকাই লাগুক।

আলাদিন চিৎকার করে ওঠে, না। ওসব ক'রো না, মা। তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার কোনও অসুখ বিসুখ করেনি।

—তবে তুই আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিস কেন, বল বাবা ? তোর কী হয়েছে ?

আলাদিন তখন মাকে সব কথা বলে। বদ্দুরের রূপে সে দিশাহরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অন্য কোনও হাকিম কবিরাজের ওষুধে কিছু উপকার হবে না। বদ্দুর তার বুকের সবটুকু অধিকার করে বসে আছে। সেখানে অন্য কোনও মেয়ের কোনও জায়গা হবে না কোনওদিন।

মা কপাল চাপড়াতে থাকে, একি সব্বনেশে কথা বলছিস বাবা। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। সুলতান বাদশাহ বলে কথা—তাদের দিকে নজর দিলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চলে! একথা যদি ঘুনাক্ষরেও সুলতানের কানে যায়, একেবারে মায়ে বেটার দুজনেরই গর্দান যাবে। ওসব অকাশকুসুম চিন্তাভাবনা তুই মন থেকে ঝেড়ে ফেল বাবা। আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণ ভাবেই বেঁচে-বর্তে থাকতে চাই। চাঁদে হাত বাড়িয়ে কোনও লাভ আছে ?

আলাদিন মা-এর এই উপদেশ কর্ণপাত করে না। বলে, তুমি যতই আমাকে বোঝাতে চাও মা, মন আমার বুঝবে না। হয় বদ্দুরকে পাবো, নয় জান খতম করে দেব, এই আমার পণ।

মা কান্নায় ভেঙে পড়ে, কিন্তু কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারবে, একবার ভেবে দেখ, বাবা। শুনেছি, শাহজাদী বদ্দুরের রূপের কথায় সারা দুনিয়ার শাহজাদারা লক্ষ-কোটি টাকার সাম্রাজ্য বিলিয়ে দিতে চায় তার পায়ে। আর আমরা এক সামান্য দরিদ্র মানুষ—কী করে তাদের চালের সঙ্গে টেক্কা দিতে সাহস করবো ?

আলাদিন বলে, টেক্কা আমাকে দিতেই হবে মা। সারা দুনিয়ার শাহজাদাদের ঘরে যা নাই আমাদের ঘরে সেই বস্তু আছে। পয়সা দিয়ে তার দাম হয় না। তবে এও জানি সুলতান বা তার কন্যার হাতে সে জিনিস পড়লে তার কদর হবে।

মা, অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী সে জিনিস ?

আলাদিন বলে, ঐ যে কাঁচের ফলগুলো দেখেছিলে—পাহাড়ের গুহা থেকে এনেছিলাম, ওগুলো আমি বাজারের ঐ বৃদ্ধ জহুরীকে একবার দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, সুলতান বাদশাহ ছাড়া এ বস্তুর কদর কেউ বুঝবে না—এর ন্যায্য দামও কেউ দিতে পারবে না। ঐ কাঁচের ফলগুলো তুমি নিয়ে সুলতানের দরবারে যাও মা। তাকে উপহার দিয়ে এস গে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

মা বলে, কই কোথায় রেখেছিস, বাবা ?

আলাদিন বলে, রসুইখানায় একটা ঝোলায় করে টাঙানো আছে।

মা তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রান্নাঘরে। ঝোলাটা নিয়ে আসে।

আলাদিন বলে, একখানা চিনেমাটির পিরিচ নিয়ে এস বড় দেখে।

সেই হীরে জহরতের ফলগুলো পিরিচে সাজিয়ে দেয় আলাদিন। বলে, গায়ে একখানা শাল জড়িয়ে তার নিচে এই পিরিচখানা ঢেকে নিয়ে যাও। সুলতানকে এগুলো ভেট দিয়ে আমার মনের বাসনা জানাবে তাঁকে। দেখবে, তিনি খুশি মনে রাজি হয়ে যাবেন।

মা বলে, আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করছে, বাবা। সুলতান বাদশাহ বলে কথা, তাদের দরবারে তো কখনও যাইনি। সাহস করে পারবো তো যেতে ?

আলাদিন বলে, সাহস তোমাকে করতেই হবে, মা। তা না হলে আমি প্রাণে বাঁচবো না। একদিকে তোমার ছেলের জীবন, অন্যদিকে তোমার লজ্জা ভয় সঙ্কোচ—আমাকে যদি বাঁচাতে চাও মা, সাহস করে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে সুলতানের সামনে।

মা বলে, অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনিসনে বাবা। এ দুনিয়ায় তোর চাইতে বড় আমার কাছে কিচ্ছু নাই। তোর জন্যে আমি ফাঁসীতেও ঝুলতে রাজি আছি।

আলাদিন বলে না, তোমাকে ফাঁসীতে ঝোলাবে কেন ? তোমার প্রস্তাবে তিনি রাজি না হলে ফিরিয়ে দিতে পারেন, সাজা দেবেন কেন ?

—কী জানি বাবা, সুলতান বাদশাহর খেয়াল, হুকুম জারি করে দিলেই হোল। তা হোক, তোর জন্যে আমি জান কবুলও করতে পারি। ও জন্যে আমি ভয় করবো না, যাবো তার কাছে, বলবো আমার প্রস্তাব। নিতে হয় নেবেন, না হয় নেবেন না। আমাকে যদি সাজা দেন তার জন্যে আমি চিন্তা করি না, কিন্তু প্রস্তাব শুনে সুলতান যদি ক্ষেপে তোকে কোনও সাজা দেয়—সে আমি সইবো কী করে, বাবা ?

আলাদিন বলে, তা হোক, বুদুরকে না পেলে এ-জীবন আমি এমনিতেও

রাখবো না, না হয় সুলতানের রোষেই মরবো। যাই হোক, তুমি যাও, মা। আমায় বিশ্বাস কর এই ভেট তাঁর সামনে ধরলে তিনি তোমার ওপর প্রসন্নই হবেন।

মা গায়ে শাল জড়িয়ে তার তলায় ফলের পিরিচখানা ঢেকে নিয়ে দরবারে এসে এক কোণে দাঁড়ালো। তখন সুলতান মসনদে বসে হুকুমতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সারা দরবার-কক্ষ উজির আমির এবং বিচার প্রার্থীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। উজির এক এক করে নাম ডাকতে থাকে। সুলতান তাদের আর্জি শোনেন। তারপর ফরমাস দিতে থাকেন। এইভাবে ধীরে ধীরে দরবারটার ভীড় হাল্কা হতে থাকে। এক সময় সুলতান তাঁর কাজ-কাম সমাধা করে মসনদ ছেড়ে নেমে প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে যায়। আলাদিনের মা কিন্তু সাহস করে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। বলতে পারে না তার আগমনের উদ্দেশ্য। দরবার যখন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় তখন সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসে বাড়িতে।

আলাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মাকে ফিরতে দেখে বড় আশা নিয়ে সে ছুটে আসে। কিন্তু মা ছেলেকে কোনও সুখবর দিতে পারে না। বলে, সবই আমার দোষ বাবা, পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না বলতে। কে যেন আমার গলাটা চেপে ধরলো। বিশ্বাস কর বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হলো না।

আলাদিন হতাশায় ভেঙে পড়লো। ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে মা বলে, তুই ঘাবড়াসনে বাবা। আজ পারিনি, কিন্তু দেখে নিস, কাল ঠিক পারবো। কাল আমি সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবোই।

পরদিন যথাসময়ে আবার সেই ফলের পিরিচ শালের তলায় ঢেকে আবার দরবারে হাজির হয়। কিন্তু সেদিনও সেই একই অবস্থা—অনেক চেষ্টা করেও জড়তা কাটাতে পারে না আলাদিনের মা। একে-একে দরবারের সব কাজ সমাধা করে সুলতান প্রাসাদে ফিরে চলে যান। আলাদিনের মা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

সে দিনও বাড়ি ফিরে সে আলাদিনকে কোনও আশার বাণী শোনাতে পারে না। তবে ভরসা দেয়, হাল সে কিছুতেই ছাড়বে না। আবার যাবে আগামী কাল।

পরের দিনও এক দশা। বোবার মতো দরবারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ব্যর্থ মনে ফিরে আসে।

এইভাবে অনেক দিন কাটার পর একদিন সুলতান উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ঐ যে ওপাশে একটা মেয়েকে দেখো, আমি লক্ষ্য করছি, প্রতিদিন সে দরবারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার মনে হয় সে কিছু বলতে চায়।

উজির বললো, কিন্তু জাঁহাপনা কত সাধারণ মানুষ আপনার দরবারে আসে—তাদের নিজের নিজের আর্জি পেশ করে। ওর যদি বলারই কিছু

থাকবে, ঐ ভাবে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। নিয়ম মতো দরখাস্ত পেশ করতে পারে। সময় মতো তার শুনানিও উঠতে পারে।

সুলতান বলে, তোমার কথা আমি বুঝলাম সবই। কিন্তু সব মানুষই তো সমান বিচক্ষণ নয়। হয়তো কোন কারণে সে সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করছে না। যাই হোক ওকে আমার কাছে আসতে বল, আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো।

তৎক্ষণাৎ উজিরের ইশারায় পেয়াদা এসে আলাদিনের মাকে বললো, আপনি মসনদের সামনে হাজির হোন, সুলতান আপনাকে জেরা করবেন।

আলাদিনের মা-এর বুকে কাঁপুনি ধরে। কোনও রকমে টলতে টলতে সে সুলতানের সামনে এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়।

সুলতান প্রশ্ন করেন, কে তুমি ?

—আমি জাঁহাপনার একান্ত অনুগত এক দাসী, ধর্মাবতার আমার স্বামী এই শহরের এক সামান্য দর্জি ছিল। অনেক দিন তার এন্তেকাল হয়েছে। এখন আমার একমাত্র সন্তান আলাদিন—তাকে নিয়ে কোনও রকমে দিন গুজরান করছি।

সুলতান বলেন, বেশ কিন্তু এখানে এই দরবারে তোমার কী আর্জি। আমি লক্ষ্য করছি, রোজই তুমি আস। ঐ এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। কী ব্যাপার, তোমার যদি কোনও কিছু বলারই আছে, তা বল না কেন ?

আলাদিনের মা বলে, ভয়ে জাঁহাপনা।

—ভয়ে ? কিসের ভয়ে ? আমার সলতানিয়তের কোনও প্রজা আমার সামনে ভয়-সঙ্কোচ করে কোনও কথা গোপন করবে না এই-ই আমি চাই। তোমার কোনও ভয় নাই, নির্ভয়ে বল, আমি তোমার আর্জি শুনতে চাই। কী তোমার অভাব, অথবা অভিযোগের নালিশ ? কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করেছে বা কারো কাছে প্রতারিত হয়েছ ?

—না জাঁহাপনা, কোন অভাবের আর্জি পেশ করতে আমি আসিনি। আর তাছাড়া মহামান্য শাহেন শাহর সুশাসনে আমি বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছি। আমার প্রতিবেশিরা প্রত্যেকেই সহৃদয়, মহানুভব, কোনও নালিশ অভিযোগ আমার নাই।

সুলতান অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, তবে ? তবে কেন নিত্য এই দরবারে এসে দাঁড়িয়ে থাকো।

আলাদিনের মা বলে, আমার নিবেদনটা একটু অন্য রকম। এবং তা দরবারের এই সব লোকজনের মধ্যে বলাও সঙ্গত মনে করি না। ধর্মাবতার যদি একান্তে আমার কথা বলার অনুমতি দেন তবে খুব ভাল হয়।

সুলতান কিছুই বুঝতে পারেন না। উজিরের দিকে তাকালেন তিনি। উজির বললো, আজকের দরবারের কাজ সবই শেষ হয়ে গেছে জাঁহাপনা, আপনি যদি অনুমতি করেন। আমরা দরবার ত্যাগ করে চলে যাই।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে সবাইকে যেতে বল। কিন্তু তুমি যেও না।

উজিরের ইশারায় দরবার-কক্ষ নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল। তখন সুলতান বললেন, এবার তোমার কী বলার আছে, বল ?

আলাদিনের মা আর একটু সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু মুখে কোনও কথা বলতে পারে না। কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে থাকে। বুকের স্পন্দন আরও দ্রুততর হয়ে ওঠে।

উজির বলে, কই, তোমার কী বলার আছে বল জাঁহাপনার সামনে!

সুলতানও বলেন, নির্ভয়ে বল। তোমার কথা নিভৃতে শুনবো বলে আমি দরবারের সকলকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। বল।

আলাদিনের মা তবু কথাটা যেন বলতে পারে না। সুলতান এবার একটু রাগত স্বরেই বলে, এভাবে সময় নষ্ট করো না, যা বলার আছে চটপট বলে ফেল।

এবার আলাদিনের মা মরিয়া হয়ে বলে, মহামান্য ধর্মাবতার আমার গুস্তাফী মাফ করবেন। আমি সামান্য এক দর্জির বিধবা পত্নী। আমার একমাত্র ছেলে আলাদিন। দেখতে শুনতে চমৎকার। কিন্তু পয়সা না থাকলে এ-দুনিয়ায় রূপের কী দাম ? কোনরকমে দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন সংস্থান হয়তো হয়, কিন্তু তার বেশি নয়।

সুলতান অধৈর্য হয়ে ওঠেন, আহা, সে তো বুঝলাম, এখন আসল কথাটা কী ঝটপট বলে ফেলো তো, বাপু। আমার আর নষ্ট করার মতো সময় নাই।

আলাদিনের মা বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, সে কথা শুনে আপনি কুপিত হবেন না। আপনি দীন-দুনিয়ার মালিক, আপনার অসীম ক্ষমতা, আপনি ক্রুদ্ধ হলে—

—আহা, অত ভনিতা করছো কেন, যা বলার সোজাসুজিই বল না—আমি তো বলেছি, আমার দরবারে যার যা অভিরুচি আর্জি জানাতে পারে। তার জন্য আমি রুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হই না।

আলাদিনের মা বলে, জাঁহাপনা, আমার নির্বোধ পুত্র আলাদিন আপনার দাসানুদাস নফর, সে একদিন শাহজাদী বদর অল বুদুরকে স্বচক্ষে দেখেছে।

উজির প্রশ্ন করলো, কী উপায়ে ?

—শাহজাদী কিছুদিন আগে গোসল কেলীর জন্য হামামে গিয়েছিলেন। সেই সময় জাঁহাপনার কড়া পাহারা সত্ত্বেও আলাদিন হামামে ঢুকে পড়তে পেরেছিল।

সুলতান এবং উজির দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললেন, আশ্চর্য!

আলাদিনের মা বলতে থাকে, ঐ হামামে পরমাসুন্দরী শাহজাদীর রূপের ছটা দেখে বাছা আমার মজে যায়। সেই থেকে সে প্রেমানলে দগ্ধ হচ্ছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। তার এক কথা শাহজাদী বুদুরকে না পেলে জীবন রাখবে না। আমি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি, জাঁহাপনা, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে নাই, কিন্তু ছেলের আমার ধনুর্ভাঙ্গা পণ, হয় সে বুদুরকে শাদী করবে নয় সে জান দেবে। এখন আপনিই বিচার করুন, ধর্মাবতার। এ-কথা

শোনার পর কোন্ পাষাণী মা চুপ করে ঘরে থাকতে পারে? আলাদিন আমার একমাত্র সন্তান, ঈদের চাঁদ। তাকে যদি হারাই—এ বিশ্ব-সংসারে আমার আর কী থাকবে? তাই একেবারে অসম্ভব জেনেও এই অবাস্তব প্রস্তাব নিয়ে আপনার দরবারে আমি নিত্য আসি। এবং শত চেষ্টা করেও যখন আপনার সামনে তা পেশ করতে পারি না তখন বুকের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ব্যর্থ হয়ে আবার ঘরে ফিরে যাই। লোকে শুনলে, আমাকে ও আমার ছেলে আলাদিন দুজনকেই বদ্ধ পাগল বলবে, জানি। তবু, সব জেনে-শুনেও, কেন আপনার কাছে এই প্রস্তাব আজ রাখছি তা তো সন্তানের পিতা হয়ে আপনি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন, জাঁহাপনা!

সুলতান গম্ভীর ভাবে বললেন, অবশ্যই পারছি। তুমি ছেলের মা। আমি মেয়ের বাবা। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার যে অপত্য স্নেহ মায়া মমতা মহব্বত, তার তুলনা কোথায়? না, আমি তোমাকে উন্মাদ বলবো না। পুত্রের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য, তুমি অসাধ্য সাধন করতে পার, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো তোমার আমার মধ্যে কোনও সমতা নাই। সুতরাং এ প্রস্তাব তো আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমার কন্যা শাহজাদী—আজন্ম ঐশ্বর্য-বিলাসের মধ্যে লালিতা। তোমার পুত্র সাধারণ এক গরীব দর্জির সন্তান। এই বিরাট ফারাক পূরণ করার তো কোনও পথ নাই। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে আমরা মানুষকে মানুষের ধন-দৌলতের মাপ কাঠিতে বিচার করি। অন্য কোনও গুণাবলী কোনও কাজে আসে না। এক্ষেত্রে আমার কন্যা বদরের পাণি গ্রহণ করতে গেলে তার যোগ্য ইনাম চাই। এবং আমি বুঝতে পারছি, সে দৌলত তোমাদের নাই। সুতরাং তোমার ছেলের মন থেকে এ দুরাশা মুছে ফেলার পরামর্শ দাও গে।

আলাদিনের মা-এর চোখ জলে ভরে আসে। শালের তলা থেকে চিনা মাটির থালাখানা বের করে সুলতানের সামনে রাখে সে।

—আমার পুত্র আলাদিন, শাহেন শাহকে তার নজরানা পাঠিয়েছে, জাঁহাপনা।

মণি-মাণিক্যের দ্যুতিতে সমগ্র দরবার-কক্ষ ঝলমল করে ওঠে। সুলতান দুহাতে মুখ ঢেকে মসনদের পিছনে হেলে পড়েন।

—এ কি! এসব কি?

উজির থালা থেকে একটা ফল হাতে তুলে নেয়। দেখতে দেখতে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, অপূর্ব।

সুলতানের হাতে তুলে দেয় সে ফলটা, দেখুন, জাঁহাপনা, আপনি তো জগৎ-বিখ্যাত জহুরী, একমাত্র আপনিই এর আসল কদর বুঝবেন। ওফ্, আমি ভাবতে পারছি না; এ ধন কোথায় পেল সে।

সুলতান পরীক্ষা করে বললেন, সারা দুনিয়ার কোনও নবাব বাদশাহদের কারো ঘরে এ বস্তু নাই। এই সামান্য দর্জির বিবি এসব পেল কোথায়? এর একটার উচিত দাম আমার ধনাগারে নাই। এতগুলো তুমি কোথায় পেলে,

দর্জির বিবি ?

আমার ছেলে আলাদিন একবার পরদেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে নিয়ে এসেছে। সুলতান মহানুভব, আপনি যদি আমার ছেলের এই সামান্য ভেট গ্রহণ করেন সে ধন্য হবে, জাঁহাপনা।

সুলতান উজিরের দিকে তাকালেন, তা হলে উজির, এর পর তো আর এই বিধবাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না। বদ্দরকে পাওয়ার যোগ্যতার মূল্য তো সে সংগ্রহ করে এনেছে। এখন না বলা যাবে কী করে ?

উজির বলে, কিন্তু জাঁহাপনা আপনার সঙ্গে অনেক আগেই আমার কথা হয়ে আছে, আপনি বলেছিলেন, বিশেষ যোগ্যতর পাত্র না পাওয়া গেলে শাহজাদী বদ্দরকে আপনি আমার পুত্রের সঙ্গেই শাদী দেবেন।

সুলতান বলেন, সে কথা আমি বিস্মৃত হইনি, উজির। এখনও বলছি, আমার যোগ্য ইনাম তুমি সংগ্রহ কর, তোমার ছেলের সঙ্গেই বদ্দরের শাদী দেব। এর জন্য আমি তোমাকে তিন মাস সময় দিলাম। এই তিন মাসের মধ্যে তোমাকে এর চেয়ে আরও মূল্যবান দান-সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে।

উজির বললো, তাই হবে জাঁহাপনা। যেভাবেই পারি, আমি এর চেয়ে আরও অমূল্য রত্নমাণিক্য আপনাকে এনে দেব।

সুলতান এবার আলাদিনের মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যাও, দর্জি-ঘরণী। তোমার পুত্র আলাদিনের সঙ্গেই বদ্দরের শাদী হবে, এ একরকম নিশ্চিত রইলো। শুধু আমার সত্য রক্ষার জন্য উজিরকে আমি তিন মাসের সময় দিলাম। আমি জানি, আমার উজির কেন, দুনিয়ার কোনও সম্রাট বাদশাহর পক্ষেও—এই মণি-মাণিক্যের অধিক কোনও বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ধরে নিতে পার, সে তোমারই পুত্রবধূ হবে, শুধু তিনটি মাস-সময় আমি উজিরকে দিলাম। এই তিন মাস পরে আর কোনও—বাধা থাকবে না। বদ্দরকে আমি তোমার ছেলের হাতেই তুলে দেব।

আলাদিনের মা—সুলতানকে কুর্ণিশ জানিয়ে ঘরে ফিরে এল। আলাদিন অধীর হয়ে পায়চারী করছিল। অন্যদিন মা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে দরবার থেকে। কিন্তু আজ তার অনেক বেশি দেরি হচ্ছে। তবে কি, কোনও অঘটন ঘটলো ?

—বেটা আলাদিন, মা আনন্দে ছুটে এসে আলাদিনকে জড়িয়ে ধরে, আজ আমার এত চেষ্টার সুফল পেয়েছি।

আলাদিন বুঝতে পারে খবর, শুভ সন্দেহ নাই। বলে, কী মা ? কী হয়েছে, বল।

আলাদিনের মা বলে, তোর ঐ কাঁচের খেলনাগুলো দিতেই সুলতান গলে গেলেন। বললেন, শাহজাদী বদ্দরকে তোর সঙ্গেই শাদী দেবেন তিনি। কিন্তু তিন মাস বাদে এই শাদী হবে। এখনই হ'তো, কিন্তু ঐ মুখপোড়া উজিরটা বাগড়া দিল।

—বাগড়া দিল কেন ?

—তার নিজের বাঁদরমুখো বামন হাঁদা একটি ছেলে আছে। শাহজাদী বদরের সঙ্গে শাদী দেবার জন্য সে সুলতানের কাছে বায়না ধরেছে। সুলতান ওকে তিন মাস সময় দিলেন, বললেন, এর মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও দামী দেন-মোহর দিতে হবে, তা না হলে এ শাদী তোর সঙ্গেই দিয়ে দেবেন তিনি। কিন্তু এখন আমার ভয় লাগছে, বাবা, ঐ বাঁদরমুখো উজিরটা যদি আরও বেশি ধনদৌলত জোগাড় করে ?

আলাদিন হাসে, তুমি একটা আস্ত পাগল, মা। যে-বস্তু সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে এসেছো, তামাম দুনিয়া ঢুঁড়লেও তার নখের যুগ্যি একটা জিনিস জোগাড় করতে পারবে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনপঞ্চাশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

আলাদিন আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে, মা, মাগো, এতদিনে তুমি আমার স্বপ্ন সফল করতে পেরেছো। শাহজাদী বদর এখন আমার। তাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। যে রত্ন আমি ভেট দিয়েছি, সুলতানকে তার সমান দূরে থাক, হাজার ভাগের এক ভাগও দেওয়ার সাধ্য নাই কারো। সুতরাং বদর আমার।

আলাদিনের মা—ছেলেকে আদর করে বলে, এখন ভালয় ভালয় শুভ কাজটা মিটে গেলে হয়। ঐ কু-নজরে উজিরটাকে দেখে আমার ভাল ঠেকল না বাবা। না জানি ছুঁচোটা কী শয়তানী করে বাগড়া দেয় ?

আলাদিন বলে, তুমি রাখতো মা, উজিরের কী ক্ষমতা, সে আমার একগাছি চুলও ছিঁড়তে পারবে না। তুমি দেখে নিও, ও ব্যাটার নাকের ডগা দিয়ে শাহজাদীকে আমি শাদী করে ঘরে নিয়ে আসবো।

পুরো তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হবে আলাদিনকে। মা-এ পো-এ দুজনে মিলে পল পল করে সময় গুণতে থাকে। এইভাবে এক এক করে দুটি মাস কেটে যায়। আলাদিন আশায় আনন্দে নেচে ওঠে। আর মাত্র একটা মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মাকে ডেকে আলাদিন বলে, মা শাদীর তো আর মাত্র একটা মাস বাকী। তুমি এবার ধীরে ধীরে কেনাকাটা শুরু কর। সওদাপত্র তো কম লাগবে না, শাহজাদীর সঙ্গে শাদী, জাঁকজমকের ঘাটতি হলে তো চলবে না, মা।

মা বলে, আমি সেই কথাই ভাবছিলাম, বাবা। আজই বাজারে যাচ্ছি।

আলাদিনের মা বাজারে ঢুকেই তাজ্জব বনে যায়। সারা বাজারের প্রতিটি দোকান ঝলমল করছে। নানারকম বাহারী সাজপোশাক এবং শৌখিন জিনিসের চমকে চোখ ঝলসে যায় আর কি।

একটা বড় দোকানে ঢুকে পড়ে আলাদিনের মা। সোনার জরির কাজ করা

কয়েকটি মূল্যবান সাজ-পোশাক ঝোলানো ছিল দোকানের সামনে। তার একটার দাম জিজ্ঞেস করে সে।

—কত দাম এটার?

দোকানী অবাক হয়ে আলাদিনের মা-এর দিকে তাকায়। বলে, তোমার কী দেমাক খারাপ হয়েছে নাকি গো, জান না আজ বাজারের যত দোকানে যত বাহারী সাজ-পোশাক বা শখের সামান যা ঝোলানো হয়েছে সব বিক্রি হয়ে গেছে।

—বিক্রি হয়ে গেছে? বিক্রি হয়ে গেছে তো দোকানে রাখছো কেন? সে তো ঘরে নিয়ে গেলেই পারে।

দোকানী বলে, তোমার সাহস তো বড় কম নয় মেয়ে, কার সম্বন্ধে কী কথা বলছো, তা জান? স্বয়ং শাহজাদী বদ্দুরের শাদীর সাজ-পোশাক এসব—যা দেখছো, সব। জান না, আজ রাতে উজিরের ছেলের সঙ্গে শাহজাদী বদ্দুরের শাদী হবে? উজির নিজে এসে এইসব সাজ-পোশাক পছন্দ করে গেছে। এখুনি তার লোক-লস্কর আসবে। উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে চলে যাবে।

আলাদিনের মা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় আর একটা দোকানে। সে দোকানদারও একই কথা বলে। এর পর সে প্রায় উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে ঘরে ফিরে আসে। মাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে, আলাদিন অবাক হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কী হলো মা, কী হয়েছে, শুধু হাতে ফিরে এলে যে? সওদা করলে না কিছু?

মা বলে, আমার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে, আগে একটু পানি দে, সব বলছি।

আলাদিন ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল এনে মা-এর মুখে ধরে। ঢক ঢক করে জলটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করে মা বলে, বাবা, আমাদের কপাল ভেঙেগেছে।

—মানে, আলাদিন কিছুই আঁচ করতে পারে না, কী বলছো মা, কপাল ভেঙেগেছে কেন?

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমি বাজারে গিয়ে শুনে এলাম ঐ বাঁদরমুখো মুখপোড়া উজিরটার ছেলের সঙ্গে শাহজাদী বদ্দুরের শাদী হচ্ছে আজ রাতে।

আলাদিন বলে, না মা, সে কী করে হয়, কেউ তোমার সঙ্গে মস্করা করেছে।

—না বাবা, না; আমি জনে জনে জিজ্ঞেস করেছি। সবারই মুখে এক কথা। পথে ঘাটের মানুষ এই শাদীর কথায় মেতে উঠেছে, আমি নিজ কানে শুনে এসেছি। তাছাড়া সারা বাজারের সব সেরা সাজ-পোশাক আর শখের বাহারী জিনিস তামাম কিনে নিয়েছে ঐ উজিরটা।

আলাদিনের চোখ জ্বলে ওঠে, বেইমান—

আলাদিনের মা বলে, বেইমান বলে বেইমান, সুলতান নিজ মুখে আমাকে

কথা দিল, 'শাহজাদী বদরের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদী হবে।' তা এই কী ইমানদারের বাক্য? সর্বনাশ হবে ছারখার হয়ে যাবে সব।

আলাদিন মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, মা, তুমি মেজাজ খারাপ ক'রো না। কী করে এই মিথ্যের মোকাবিলা করতে হয় তা আমার জানা আছে। তবে এও তোমাকে বলে রাখলাম মা, ঐ শয়তান উজির যদি স্বপ্ন দেখে থাকে তার গুণধর পুত্রের অঙ্কশায়িনী করাবে শাহজাদী বদরকে, সে গুড়ে বালী। আমার হাতে এমন অস্ত্র আছে যাতে বাছাধনের সব সাধ ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। যাও মা তুমি আর মন খারাপ ক'রো না। ভালো করে খানা পাকাও। আমার বড় খিদে পেয়েছে।

মা সুলতান আর উজিরের মুণ্ডুপাত করতে করতে রসুইখানার দিকে চলে যায়। আলাদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে ঝোলা থেকে চিরাগটা বের করে। আলতো করে একটু ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হয়। আভূমি আনত হয়ে আলাদিনকে সে কুর্নিশ করে। বলে, আমি ত্রিভুবনের মালিক। আমার অসীম ক্ষমতার কাছে সবই পদানত। শুধুমাত্র এই যাদু চিরাগই আমার একমাত্র ঈশ্বর। এঁর নির্দেশ আমার শিরোধার্য, এখন আপনি যখন এই চিরাগের মালিক, সেই কারণে আমি আপনার দাসানুদাস। গোলামকে হুকুম করুন মালিক। আপনার আজ্ঞা পালন করতে আমি প্রস্তুত।

আলাদিন বললো, শোন, চিরাগ-দাস তোমাকে একটা কথা বলি। এবারে কিন্তু আমার খানাপিনার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠাইনি। ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং তোমাকেই তার সুরাহা করতে হবে। সুলতান আমার কাছ থেকে মণিরত্নের উপঢৌকন গ্রহণ করেছে। এবং কথা দিয়েছিল, তার কন্যা শাহজাদী বদরকে আমার সঙ্গে শাদী দেবে। কথা ছিল তিন মাস পরে আমাদের শাদী হবে। কিন্তু দু মাস পার হতে না হতেই সুলতান তার বাগদানের সব কথা ভুলে গেছে, অথবা মনে রেখেও আমার সঙ্গে বেইমানী করতে চলেছে। খবর পেলাম সে তার মেয়েকে উজিরের ছেলের সঙ্গে শাদী দিচ্ছে আজ রাতে। কিন্তু এ শাদী আইন-সিদ্ধ নয়। যেন তেন প্রকারে উজিরের ছেলের হাত থেকে শাহজাদীর সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। আমার একান্তভাবে অধিকার আছে শাহজাদী বদরকে ভোগ করার। সুতরাং অন্য কারো থাবা আমি বরদাস্ত করবো না। এবং এই কারণেই আমাকে সাহায্য করার জন্য আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

আফ্রিদি বললো, আমাকে এত সব কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন কেন মালিক। আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। আপনি হুকুম করুন, বান্দা তামিল করতে প্রস্তুত।

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, তবে শোন, আজ সন্ধ্যায় যখন শাহজাদী বদরকে উজিরের ছেলের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সবাই চলে যাবে সেই সময় তুমি তাকে-তাকেই আশে পাশে থাকবে, সাবধান উজিরের ছেলেটা যেন ওর গায়ে হাত ঠেকাতে না পারে। তুমি তাদের চোখে ঘুম ঢেলে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে তক্ষুনি। তারপর দুজনকেই নিয়ে চলে আসবে এখানে আমার এই ঘরে। আর

তারপরের ব্যাপার আমি বুঝবো। হ্যাঁ, আনার সময় পালঙ্কশয্যা সমেত নিয়ে আসবে ওদের, বুঝলে?

আফ্রিদি মাথা নুইয়ে বলে, জো-হুকুম, মালিক।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো একান্নতম রজনীতে

আবার কাহিনী বলতে শুরু করে সে ঃ

সুলতান শাহজাদী বুদুরকে উজির-পুত্রের সঙ্গে কেন শাদী দিতে সম্মত হলেন সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা দরকার।

সেদিন আলাদিনের মা দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুলতান উজিরকে বললেন, শাদীর যৌতুক হিসেবে আলাদিন যে মণিরত্ন পাঠিয়েছে তার মূল্য অর্থ দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শাহজাদীকে আলাদিনের হাতে তুলে না দিয়ে উপায় নাই উজির। আমি তিন মাস সময় অবশ্য রেখেছি কিন্তু আমার মনে হয় সারা আরব দুনিয়ার কোনও সুলতান শাহজাদাই আলাদিনের উপঢৌকনকে টেক্কা দিতে পারবে না। সুতরাং একরকম ধরেই রাখ, শাহজাদী বুদুর আলাদিনের বেগম হবে।

উজির বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, শাহজাদীকে শাদী করার পক্ষে একমাত্র যৌতুক উপঢৌকনই কী সব? ঘর বর কিছুই দেখার প্রয়োজন নাই? ছেলে দেখতে কেমন—কালা বোবা হাঁদা কিংবা অন্ধ-খঞ্জ কিনা তাও তো একবার স্বচক্ষে দেখা দরকার।

সুলতান বললেন, একশোবার। তিন মাস সময় কি আমি শুধু শুধু পিছিয়ে দিলাম নাকি? সবই তো খোঁজ খবর নিতে হবে? এবং তা তোমাকেই নিতে হবে। আজ থেকেই আলাদিনের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা কর উজির। কী করে সে, কোথায় থাকে, কী তার খানদানী সব আমার জানা দরকার।

উজির বলে, ওসব নিয়ে আপনি একটুও চিন্তা করবেন না হুজুর। কাক পক্ষীও টের পাবে না। আমি আজই চর নিযুক্ত করছি। তারা আমাকে আলাদিনের সব গোপন সংবাদ এনে দেবে নিত্য।

উজির কয়েকদিন পরে সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, আলাদিন বাণিজ্য করতে বিদেশ গেছে। মাসখানেক বাদে ফিরবে কথা আছে।

মাসখানেক পরে উজির আবার সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, খবর এসেছে ভারত সাগরের কূলে আলাদিনদের জাহাজ ডুবে গেছে। জাহাজের মাত্র একজন যাত্রী রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে। তার বিবরণে জানতে পারলাম, জাহাজের আর কেউই প্রাণে রক্ষা পায়নি।

সুলতান বললেন, আহা হা, বেচারী! ভাগ্যে বুদুরের শাদীটা দিয়ে দিই নি তখন। তাহলে মেয়েটা আমার পাথারে পড়তো। তা এক কাজ কর উজির। তুমি বরং আর একটু ভাল করে খোঁজ খবর কর। হয়তো আল্লাহর কৃপায় সে

বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

উজির বলে, যে লোক ফিরে এসে খবর দিয়েছে, তার কথা অবিশ্বাস করার মত কোনও কারণ নাই। তা সত্ত্বেও আপনি যখন বলছেন, আমি খোঁজখবর নিতে লোক পাঠাচ্ছি। তবে মৃত্যু সংবাদ সচরাচর মিথ্যে হয় না, জাঁহাপনা।

এর কিছুদিন পরে উজির সুলতানকে জানাল, জাঁহাপনা আমার দূতেরা ফিরে এসেছে। তারা খবর নিয়ে জেনেছে, সত্যিই সে-জাহাজের একটিমাত্র মানুষ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ প্রাণে রক্ষা পায়নি।

সুলতান অনেক আফশোশ করলেন। তারপর বললেন, সবই নিয়তির লেখা। কেউই তার বাইরে যেতে পারে না উজির। যাই হোক, আর তো অপেক্ষা করা যায় না, এবার শাহজাদীর শাদীর ব্যবস্থা করতে হয়।

উজির করজোড়ে আর্জি পেশ করে, সুলতান মহানুভব, আপনি এক সময় আমার পুত্রকে জামাতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদি অধমের আর্জি মঞ্জুর করেন তবে আমার ছেলেটার একটা গতি হয়।

সুলতান বললেন, উত্তম, তাই হবে। আমি আর দেরি করতে চাই না। দু একদিনেই শাদীর সব ব্যবস্থা করে ফেল।

উজিরের চালে বিভ্রান্ত হয়ে বদুরের শাদীতে সায় দিলেন তিনি। পরদিন থেকেই শাদীর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। শারা শহরে রটে গেল সেই বার্তা। দোকান পাট-এ নানারকম বাহারী রংদার সাজ-পোশাক এবং উপহার উপঢৌকনের সামান ঝলমল করে উঠলো। উজিরের ঢালাও হুকুম, বাজারের সেরা সেরা সব জিনিস তার ছেলের শাদীর জন্যে চাই। অন্য কাউকে তা বিক্রি করা চলবে না। দোকানীরাও মওকা বুঝে দামী দামী সাজ-পোশাক আর সামানপত্র আমদানী করে দোকান ভরে ফেললো। এবং তিন-চারগুণ দামে তা উজিরের কাছে বিক্রি করে মোটা মুনাফা ঘরে তুলতে লাগলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বাহান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

আলাদিন মাকে তার ফন্দী ফিকিরের কোনও আভাষ দিল না। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। খানাপিনা শেষ করে মা ঘরে শুতে চলে গেল। আর আলাদিন নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে আফ্রিদির আগমন প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণতে থাকলো।

এদিকে সুলতানের প্রাসাদে শাদীর উৎসব সমারোহ চলছে তখন। একে একে অভ্যাগত আমন্ত্রিতরা বিদায় নিচ্ছে। শাহজাদী বদুরকে যথারীতি উজির-পুত্রের সঙ্গে এক ঘরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। প্রথা অনুযায়ী পাত্র পাত্রী উভয়ে নগ্ন হয়ে ফুলশয্যায় রাত্রি যাপন করবে। সেইভাবে শাহজাদী বদুরকে বিবস্ত্রা করে উজির-পুত্রের ঘরে পালঙ্কে বসিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা

বন্ধ করে দিয়ে গেছে হারেমের মেয়েরা।

উজির-নন্দন উলঙ্গ হয়ে পালঙ্কে শুয়ে এতক্ষণ শাহজাদীর প্রতীক্ষায় অধীর হয়েছিল, এবার তাকে কাছে পেয়েই জড়িয়ে জাপটে ধরতে এগিয়ে যায়। কিন্তু পলকে তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। পালঙ্কটা মেঝে ছেড়ে শূন্যে উড়ে যেতে লাগল। আতঙ্কে দুজনেরই অবস্থা তখন কাহিল। প্রায় হত-চৈতন্য বলা যায়। প্রাণপণে বিছানায় মুখ ঢেকে পড়ে রইলো ওরা। পালঙ্কটা নিমেষে খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশপথে উড়ে চললো। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আলাদিনের ঘরের মেঝেয় এসে নেমে পড়লো।

এ সবই আফ্রিদির ঐন্দ্রজালিক কারসাজি। অদৃশ্য দৈত্য এবার স্বরূপ ধারণ করে আলাদিনকে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, হুকুম তামিল করেছি হুজুর। এবার আর কী করতে হবে আজ্ঞা করুন, বান্দা প্রস্তুত।

আলাদিন বললো, এই মেয়েছেলের দালালটাকে পায়খানার হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়ে আজকের মতো তুমি বিদায় নাও। কাল খুব ভোরে—রাতের আঁধার না কাটতেই আবার এসে হাজির হবে আমার সামনে। তখন যা বলার বলবো।

—জো হুকুম জাঁহাপনা।

এই বলে সে উজিরের ছেলেকে এক হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে পায়খানা ঘরে চলে গেল।

আলাদিন দেখলো মখমলের শয্যায় শাহজাদী বুদুরের নগ্ন দেহখানা এলিয়ে পড়ে আছে। সারা চোখে মুখে তার আতঙ্ক। আলাদিন বললো, শাহজাদী শঙ্কা করার কোনও কারণ নাই। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো না। আমাকে বিশ্বাস কর, যদিও তুমি আর আমি এই ঘরে একা, তবু কথা দিচ্ছি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করবো না আমি।

আলাদিনের এই কথায় শাহজাদী বুদুর তেমন কোনও ভরসা পায় না। সন্দেহাকুল চোখে সে আলাদিনের দিকে তাকায়।

আলাদিন বলে, আমাকে নির্ভর করতে পার শাহজাদী, তোমার কোনও অসম্মান আমি করবো না। তোমার বাবার প্রাসাদে যেমন নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলে, এখানেও ঠিক তেমনি নির্ভয় নিরাপদ তুমি। আমি শুধু ঐ জন্তুটার থাবা থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যই এখানে নিয়ে এসেছি। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। উজিরের ঐ ছেলেটা একটা গবেট হাঁদা। শুধু সে নারী-মাংস খুবলে খেতে জানে, আর কোনও যোগ্যতাই তার নাই। আমি জানি না, তোমার বাবা আমার সঙ্গে শাদী দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও কেন ঐ বেল্লিকটার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়েছেন। কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদী আমার জান থাকতে তা হতে দেব না। তুমি আমার বাগদত্তা। আইনতঃ তোমাকে শাদী করার একমাত্র অধিকার আমারই আছে। এবং সে শাদী হবেও। তাই আমি চাই না —আমার ভাবী বিবির দেহ কেউ স্পর্শ করুক। এমন কি আমিও বিধি সম্মত শাদী করার আগে তোমার দেহ গ্রহণ করবো না।

শাহজাদী বদ্দুর তার বাবার বাগদানের কোনও কথাই জানত না। তাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে শুধু কাঁদতে থাকলো, আলাদিনের কোন কথার জবাব দিল না।

আলাদিন ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলো। একখানা শাল ছুঁড়ে দিয়ে বললো, আমি শয্যার মাঝখানে একখানা খাঁড়া পেতে রাখছি। তার ওপাশে তুমি থাকবে আর আমি থাকবো এ পাশে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়, তোমার কোনও অনিষ্ট করবে না কেউ।

আলাদিন এক মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলো, কিন্তু শাহজাদীর চোখে আর ঘুম এল না। সারারাত সে অজানা আতংকে শিহরিত হতে থাকলো। অবশ্য তার সদ্য বিবাহিত স্বামী উজির পুত্রের জন্য তার বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। শাদীর সময় থেকে ওকে দেখা ইস্তক বদ্দুরের সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠতে চাইছিল। এমন কদাকার কুৎসিত, বেঁটে হাঁদা বাঁদরমুখো একটা লোক তার স্বামী হবে, ভাবতে পারেনি সে।

পরদিন প্রত্যূষে চিরাগের আফ্রিদি আবার এসে হাজির হলো। আলাদিন তখনও নিদ্রামগ্ন। আফ্রিদি একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতে আলাদিনের ঘুম ছুটে যায়। শাহজাদী জেগেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে সে ধড়মড় করে শয্যার উপর উঠে বসে কাঁপতে লাগলো। ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি চোখ বুলিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না। অথচ সে নির্ঘাৎ জানে, এই ঘরের মধ্যেই কেউ সেই বিকট বিদঘুটে আওয়াজটা তুলেছে।

আলাদিন কিন্তু পরিষ্কার আফ্রিদিকে দেখতে পাচ্ছিল। বিছানা ছেড়ে সে আফ্রিদিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেল। সেখানে ফিস ফিস করে সে আফ্রিদিকে কী সব বললো, বদ্দুর শুনতে পেল না।

একটু পরে আফ্রিদি পায়খানা থেকে উজির-পুত্রকে শূন্যে ঝুলিয়ে এনে নামালো বদ্দুরের পাশে—পালঙ্ক-শয্যায়। পায়খানার নোংরা জলে তার সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত—ভেজা। ভয়ে অথবা হিমে বোঝা গেল না, সর্বাঙ্গ ওর ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

এরপর পালঙ্কটা আবার শূন্যে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আকাশ-পথে বায়ুবেগে সুলতানের প্রাসাদের দিকে ধাবমান হলো।

পলকের মধ্যেই আবার সুলতান-প্রাসাদের যথা-নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে এনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আফ্রিদি। বদ্দুর এবং উজির পুত্র বোবা বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল পালঙ্কটা আবার তাদের নিজেদের কামরাতেই ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে বদ্দুরের বাবা মা মেয়েকে দেখতে এলেন। বদ্দুর আকুল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মা মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে সোহাগ করে বলে, কী বাছা, কী হয়েছে। শাদীর প্রথম রাতে ভয় পেয়েছিস? তা ভয় পাবার কী আছে বাছা? ওরকম প্রথম প্রথম দু একটা রাত কেমন কেমন মনে হবে। তারপর দেখবি, আপসে আপ সব সহজ হয়ে গেছে। মা মেয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, খুব কী ব্যথা পেয়েছিস

মা ? রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেছে ?

বদুর মাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, না মা ওসব কিছু না।

—তবে ? তবে কী হয়েছে, মা ? তোর স্বামী কী তোর সঙ্গে কাজ কাম ঠিক ঠিক করেনি ?

একথার কোন জবাব দেয় না বদুর। সুলতান জামাতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু উজির-পুত্র মাথা নিচু করে বসে থাকে। কোনও কথা বলতে পারে না। সুলতান এবং বেগম দুজনেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকেন। উজির-পুত্র শয্যা ছেড়ে নেমে সুড় সুড় করে হামামে গিয়ে ঢোকে। গত রাতের পায়খানার নর্দমার নোংরা জলে তার সর্বাঙ্গ ক্লেদাক্ত হয়েছিল। হামামে ঢুকেই সে গামলা-গামলা জল ঢেলে ময়লা কাদা ধুয়ে সাফ করার কসরৎ করতে থাকে। মনে মনে ভাবে গত রাতের ঐ লজ্জার কাহিনী সে বলবে কী করে লোককে।

বদুরেও নীরবে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে দিতে থাকে। মা বাবার হাজার প্রশ্নের একটাও সে জবাব দেয় না—দিতে পারে না। গত রাতের ঐ অবিশ্বাস্য অলৌকিক লজ্জাকর কাহিনী কী করে শোনাবে সে তাদের। আর শুনলেই কী তাঁরা সে কথা বিশ্বাস করবেন ?

মেয়ের অঝোর নয়নে কান্নায় মা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই প্রশ্ন করেন, সব মেয়েরই শাদীর প্রথম রাত অদ্ভুত লাগে। কারো কাছে সুখের মনে হয় আবার কেউ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কিন্তু এ সবই তো সাময়িক মা। দুটো রাত কাটাতে পারলেই সব গা সওয়া হয়ে যাবে। তখন আজ যার কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিস দেখবি তখন তার জন্যেই প্রাণে আকুলি বিকুলি করবে। এখন কান্না থামা, বেটা। লজ্জা করিস নে, সত্যি করে বলতো, জামাই তোর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেছে ?

তবু বদুর চুপ করে থাকে। মা অধৈর্য হয়ে বলেন, কী, কথার জবাব দিবি না ? যা বাবা, এত ঢং করছিস কেন ? আমিও তো এক সময় শাদীর ক'নে হয়েছিলাম না, হইনি ? কিন্তু তোর মতো এত সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড করিনি বাছা। তোর বাবা আর আমি এই সাত সকালে ছুটে এসেছি তোর খবর নিতে। তাঁরও তো মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা তোর উচিত।

বদুর দেখলো মা বাবা উভয়েই বিশেষ চিন্তিত এবং আহত, অপমানিত হয়েছেন। সুতরাং আর চুপ করে থাকা সঙ্গত হবে না।

—মা, তোমরা কী করে ভাবলে তোমাদের উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি এতটুকু কম আছে ? আমি এতক্ষণ চুপ করে আছি, শুধু লজ্জায়। কী করে তোমাদের বলবো সে-সব কথা, তাই ভেবে পাচ্ছি না, মা। কী যে ঘটে গেছে গত রাতে, আমি নিজেই তা এখনও বুঝতে পারছি না। একেবারে আজগুবি অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে কাণ্ড !

এরপর অনেক-সময় ধরে নানাভাবে বর্ণনা করে মা বাবাকে গত রাত্রের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনালো সে। তার স্বামী পাশে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে

পালংকটা কী ভাবে ওপরে ওঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশপথে উড়তে উড়তে এক অজানা বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে নেমেছিল এবং সে ঘরের এক সুন্দর যুবক তার পাশে সারারাত শুয়ে ঘুমিয়েছিল, অথচ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। সেই সব ঘটনা সে মা-বাবার সামনে বিবৃত করলো।

তখনও বুদুরের আতংক কাটেনি। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী ভাবে কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। আবার সকাল হওয়ার আগেই আমাদের পালংকটা আবার উড়তে উড়তে ফিরে এল এই বাসর-কক্ষে। আমি এখনও ভাবতে পারছি না মা, শাদীর প্রথম রাতে এমন একটা অলক্ষুণে কাণ্ড কেন ঘটলো।

সুলতান এবং বেগম পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করেন। ওদের আর বুঝতে বাকী থাকে না, অনভ্যস্ত সহবাসের আতঙ্কে মেয়ে সারারাত ধরে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। মা বললেন, বেটা, ওসব মন থেকে মুছে ফেল। শাদীর প্রথম রাতে অনেক মেয়েরই ওরকম হয়ে থাকে। যাই হোক আমাদের কাছে যা বললে তা আর অন্য কাউকে ব'লো না। এসব কথা শুনলে লোকে তোমাকে পাগল ঠাওরাবে। যাক ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। মন থেকে ওসব বাজে দুঃস্বপ্নের কথা মুছে ফেল। হাসি গানে মেতে থাকো। তুমি আমাদের একমাত্র কন্যা। তোমার শাদীর জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কত গণ্যমান্য মেহেমানরা এসেছে। সারাদেশের মানুষ কত আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। চল্লিশ দিন ধরে চলবে এই উৎসব। এখন এই সব অলক্ষুণে দুঃস্বপ্নের কথা কারো কানে গেলে সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তাই বলছি মা, কেউ যেন না জানতে পারে এসব কথা।

সুলতান এবং বেগম মেয়েকে নানারকম উপদেশ বাক্য শুনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হামাম থেকে গোসল করে উজির-পুত্র আবার ঘরে ফিরে আসছিল, সুলতান তাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বেটা, কাল রাতটা তোমাদের কেমন কাটলো ?

উজির-পুত্র বোকার মতো ফিক্ ফিক্ করে হেসে বললো, কেন বলুন তো, আপনার মেয়ে আমার নামে কিছু খারাপ বলেছে নাকি ?

সুলতান বলে, না, খারাপ বলবে কেন ? কিন্তু মনে হলো সাধারণ ভাবে যেমনটা কাটা উচিত তা কাটেনি। কী ব্যাপার বলতো ? শাহজাদী কী তোমার এই কুরূপ দেখে মুখ ফিরিয়েছিল ?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তিপ্পান্নতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

উজির-পুত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে, না না, ওসব তো কিছুই

হয়নি। সাধারণভাবে যা ঘটা সম্ভব সবই আমাদের ঘটেছে।

জামাই-এর কথা শুনে সুলতান এবং বেগমের ধারণা বদ্ধমূল হলো, মেয়ে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। সুলতান বললো, মনে হচ্ছে, শাহজাদী শরীরে অস্বাভাবিক ব্যথা পেয়েছে। বাবা, একটা কথা মনে রেখ, তোমার বিবির শরীর বড় পলকা ফুলের মতো নরম। ওকে একটু সাবধানে ব্যবহার করো।

জামাইকে উপদেশবাণী দিয়ে সুলতান বেগমকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

আলাদিন সারাদিন ধরে মনে কল্পনা করতে লাগলো, শাহজাদী বুদুর আর তার সদ্য শাদী করা স্বামীটাকে নিয়ে সুলতান-প্রাসাদে কী সব কাণ্ডকারখানা ঘটতে পারে।

সন্ধ্যার পরে খানা-পিনা শেষ করে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলো আলাদিন। চিরাগটা বের করে আলতোভাবে একবার ঘষতেই আবার এসে হাজির হলো সেই আফ্রিদি। আলাদিন বললে, সুলতানের প্রাসাদে যাও অপেক্ষা কর, যখন শাহজাদী এসে আবার পালঙ্ক-শয্যায় শোবে আবার ওদের নিয়ে এস এখানে।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পালঙ্ক-শয্যা সমেত শাহজাদী আর স্বামীটাকে নিয়ে এসে হাজির করলো আলাদিনের সামনে। তারপর উজির-পুত্রকে তুলে নিয়ে চলে গেল পায়খানার ঘরে।

সে রাতেও আলাদিন রোরুদ্যমানা শাহজাদীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তোমার কোনও ভয় নাই। এখানে তোমার মান ইজ্জত সব নিরাপদ। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

শয্যার মাঝখানে আবার রাখা হলো একখানা মারাত্মক ধারালো অস্ত্র। তার এক পাশে শাহজাদী অন্য পাশে আলাদিন শুয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলো। পরদিন সকাল হওয়ার আগেই আবার সেই আফ্রিদি এসে পালঙ্কসমেত ওদের দুজনকে রেখে এল প্রাসাদের বাসর-কক্ষে।

সুলতান সারারাত কন্যার চিন্তায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারেননি। সকাল হতে না হতে তিনি একাই চলে এলেন শাহজাদীর বাসরঘরে। বেগমকে সঙ্গে আনলেন না, কারণ বেগম অল্পতেই অধৈর্য হয়ে ওঠেন। মেয়েকে কটু কথা বলতে দ্বিধা করেন না।

সুলতানের আগমন সংবাদ পাওয়ামাত্র উজির-পুত্র শয্যাত্যাগ করে খিড়কীর দরজা দিয়ে হামামে পালিয়ে যায়।

সুলতান ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়ের কাছে এসে কপালে চুমু দিয়ে বললেন, আজকের রাতটা নিশ্চয়ই তোমার ঐরকম বাজে দুঃস্বপ্নে কাটেনি মা! মনে কোনও দ্বিধা সংকোচ করো না। কেমন কেটেছে তোমাদের বাসর রাত বলতো, মা?

শাহজাদী বুদুর বাবার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। তাঁর হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শাহজাদী তার হাতের মধ্যে

মুখ গুঁজে কাঁদছিল বলে সুলতানের সেই রোষ কষায়িত মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে পারলো না। সুলতানের গলার স্বরে সে চমকে উঠলো।

—সাফ সাফ জলদি জবাব দাও। আসল কথা কী? না হলে আমি তোমার গর্দান নেব, বেয়াদপ লেড়কী কোথাকার!

বুদুর বাবার এই হুংকারে কান্না-বিজড়িত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠে বলতে পারলো আব্বাজান, রাগ করো না, আমাকে দয়া কর। কেন জানি না, আজ রাতেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। একথা শুনলে আম্মা আমাকে আস্ত রাখবে না জানি, কিন্তু আব্বাজান, তুমি আমার অসহায় অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে চেষ্টা করবে। এ কী দুর্বিপাকে পড়লাম আমি, কী অপরাধ করেছি, কেন এভাবে আল্লাহ আমাকে সাজা দিচ্ছেন। এর চেয়ে যে মরাও অনেক ভাল। আব্বাজান আমি তোমাকে বলছি আজ রাতেও যদি ফের একই ঘটনা ঘটে, তবে আর এ জীবন আমি রাখবো না। কাল সকালে আমাকে তোমরা আর জ্যান্ত দেখতে পাবে না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো চুয়ান্নতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু করে সে:

কন্যার কথায় সুলতানের হৃদয় বিগলিত হয়। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন তিনি।

—সত্যি করে বলতো মা, কী কী ঘটনা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ বল, তোমার কোনও ভয় নাই। এখানে তোমার মা আসেননি। ভয়ের কোনও কারণ নাই, আমাকে সব খুলে বল দেখি।

বুদুর বাবার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে সব সবিস্তারে খুলে বললো তাকে।

—তোমার যদি বিশ্বাস না হয় আব্বাজান, উজির-পুত্রকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ। তাহলেই বুঝতে পারবে, আমি কতটা কি সত্যি বললাম।

সুলতানের চোখ জলে ভরে ওঠে। প্রায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, এ সবই আমার গলতি মা, আমিই তোমাকে হাত পা বেঁধে দরিয়ায় ফেলে দিয়েছি। এমন একটা অকাল-কুষ্মাণ্ডর হাতে তোমাকে সঁপে দিলাম—তোমাকে রক্ষা করার কোনও ক্ষমতাই সে বুড়বাকটার নাই, বেশ বুঝতে পারছি। আমার কত আশা কত স্বপ্ন ছিল। তুমি আমার আদরের দুলালী—সুখে থাকবে, তোমার মুখে হাসি দেখবো, এই ছিল আমার একমাত্র বাসনা। কিন্তু বিধি বাম হলেন, আমি দেখছি তোমার কাছে এ জীবন বিষবৎ মনে হচ্ছে, মৃত্যুর আতঙ্ক তোমাকে ঘিরে ধরেছে—এর চেয়ে দুঃখের বেদনার আর কী হতে পারে, মা? আমি ঐ অপদার্থ আহম্মকটার বাবাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তার কাছে আমি কৈফিয়ৎ তলব করবো, কেন তার ছেলে আমার মেয়ের জীবনটাকে এমনি ভাবে তছনছ করে দিচ্ছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, সহজে আমি ওদের বাপ বেটাকে

রেহাই দেব না। এর পরে আর একটা দিনও যাতে এসব ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

সুলতান বন্দরদের বাসরকক্ষ ছেড়ে নিজের দরবারে ফিরে গেলেন। ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, —এই বিশ্রী ব্যাপারের ইতি তিনি ঘটাবেনই।

প্রধান উজিরকে ডেকে পাঠালেন সুলতান। উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়লেন, তোমার ঐ গুণধর পুত্রটি কোথায়? হাজির কর তাকে। গত দুই রাতে কী সব ঘটনা ঘটেছে, সে তোমাকে বলেছে কিছু?

উজির করজোড়ে বললো, আপনার এই ক্রোধের টান আমি অনুধাবন করতে পারছি না, জাঁহাপনা। না, ছেলে আমাকে কিছুই বলেনি। যদি অনুমতি করেন, আমি এখনি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি।

সুলতান বললেন, হ্যাঁ, তাই যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে উল্লুটাকে।

উজির দরবার থেকে বেরিয়ে ছুটে যায় ছেলের সন্ধানে। উজির-পুত্র তখন গোসলাদি শেষ করে সবে হামাম থেকে বেরিয়েছে, উজির তাকে দেখতে পেয়েই রাগে ফেটে পড়ে, এই কুত্তার বাচ্চা, কুত্তা, বল কী হয়েছে গত দুই রাতে। কৈফিয়ৎ দে, কেন আমাকে সত্যি কথা সঙ্গে সঙ্গে জানাসনি, পিঠের চামড়া আজ আমি খুলে নেব, বদমাইশ।

উজির-দুলাল মাথা হেঁট করে বলে, আমি বলবো বলবো ভেবেছিলাম, আব্বাজান। কিন্তু লজ্জায় সে-কথা বলতে পারিনি আপনার কাছে।

—লজ্জা? কীসের লজ্জা? কী—কী ব্যাপারটা ঘটেছে শুনি?

উজির-তনয় গত দুই রাতের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো তার কাছে। সব শুনে উজিরের মুখ কালো হয়ে যায়।

—ছিঃ ছিঃ, এসব শোনার আগে তোমার মরা মুখ কেন আমি দেখলাম না? কেন, একগাছি দড়িও কী তোমার জোটেনি? কড়িকাঠে ঝুলে পড়ে জান খতম করে দিতে পারনি, বে-শরম?

উজির-পুত্র অধোবদন হয়েই বলে, সত্যিই আব্বাজান, এর চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে অনেক ভাল। এমন শাদীতে আমার দরকার নাই। অমন পরমাসুন্দরী শাহজাদী আমার চাই না আব্বাজান। আমি ঠিক করেছি, ওকে আমি তিনতালাক বয়ান তালাক দেব—আজই। আপনি সুলতানকে বলে দিন, আজ থেকেই শাদী-নামা নাকচ হয়ে গেল। আমি বাদশাহ বনতে চাই না, আব্বাজান। ধন-দৌলত, সলতানিয়ত হুকুমত আর শাহজাদীতে আমার লোভ নাই। সব শখ আমার মিটে গেছে। আমি আপনার সাধারণ উজির-সন্তান হয়েই একটু শান্তিতে বাস করতে চাই। সারা জীবন আমি অকৃতদার হয়ে একা একা নিজের ঘরে কাটাবো, তবু ঐ সব প্রাণান্তকর ঝামেলার মধ্যে আমি আর মাথা গলাবো না, আব্বাজান। পায়খানার নর্দমার মধ্যে রাত্রিবাস—উফ্, সে কী দুঃসহ যন্ত্রণা! ওসব আমি আর ভাবতে পারছি না, এর এখনই একটা বিহিত করুন আপনি।

ছেলের কথায় উজির মুষড়ে পড়ে। তার কত উচ্চাশা ছিল—সে একদিন এই বিশাল সলতানিয়তের একচ্ছত্র অধিপতি হবে। তার হুকুমেই চলবে সব। কিন্তু মুখপোড়া বাঁদর ছেলেটা এসব কী বলছে? সব সাধ যে তার ভেস্তে গেল।

—আমি বুঝতে পারছি, অশেষ ক্লেশ তোমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কী ভেবে দেখেছ, এর ফলে কতটা তুমি হারাবে? তার চেয়ে আমি বলি কি, ধৈর্য ধরে আর একটা রাত দেখ। কথা দিচ্ছি, আমি তোমার জন্যে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করবো, তোমার কোনও ভয় নাই, কেউ স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।

—আপনি যত খুশি পাহারার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু আমি আর ঐ অপয়া বাসরঘরে ঢুকবো না, আব্বাজান।

উজির বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে দরবারে। সুলতান জিজ্ঞেস করে, এবার তোমার কী বলার আছে বল উজির?

উজির মাথা হেঁট করে বলে, শাহজাদী যা বলেছেন,তা সবই সত্য, জাঁহাপনা। কিন্তু সে-জন্য আমার ছেলের কোনও দোষ নাই। যাই হোক, শাহজাদী বুদুরকে এই ভীতি থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই আমার পুত্র তাকে তালাক দিতে চায়।

—চমৎকার। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এ শাদী সুখের হতে পারবে না। সুতরাং তালাকই শ্রেয়ঃ। পাত্র যদি তোমার পুত্র না হতো উজির, তবে আমি তাকে তলোয়ারের এক কোপেই খতম করে দিতাম। যাক, আপদ চুকে গেল, তুমি আজই আবার সারা দেশে ঘোষণা করে দাও, শাহজাদীর শাদী নাকচ হয়ে গেছে। আর এও জানিয়ে দাও সবাইকে, যদিও উজির-পুত্রের সঙ্গে তার শাদী হয়েছিল তবু এখনও সে অপাপবিদ্ধ কুমারী। তার সতীত্ব অটুট আছে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলা থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঞ্চান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলাদিন ঘরে বসেই জানতে পারলো, শাহজাদীর শাদী নাকচ হয়ে গেছে। আনন্দে সে নেচে উঠল। আশ্চর্য যাদু চিরাগের দৈত্যের উদ্দেশ্যে সে দু হাত তুলে আশীর্বাদ জানাতে থাকলো। এত সহজে এমন চমৎকার ভাবে কাজ সমাধা হয়ে গেল—আফ্রিদি ছাড়া কী সম্ভব হতে পারতো।

সুলতানের কথামতো তিন মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সে চুপচাপ অপেক্ষা করলো। তারপর আলাদিন মাকে বললো, মা এবার তুমি সুলতানের কাছে যাও। গিয়ে বল, 'আপনার কথামতো আমি তিন মাস অপেক্ষা করেছি। এখন আপনি আপনার সত্য রক্ষা করুন।'

আলাদিনের মা দরবারে আসতেই সুলতান তাকে চিনতে পারেন। উজিরের

দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। উজির তখন কম্পমান। সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই জাহাজ ডুবিতে আল্লাহর অশেষ কৃপায় আলাদিন প্রাণে রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে সম্প্রতি। কথাটা আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, জাঁহাপনা। আমার গুস্তাকী মাফ করুন।

সুলতান বললেন, আল্লাহই আমাকে সত্যভ্রষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, উজির। আজ যদি তোমার ছেলে শাহজাদীকে তালাক দিয়ে মুক্ত না করতো তবে আমি তো মহাপাতক হতাম। আজ তো সে শাহজাদীকে দাবী করতেই এসেছে আমার কাছে। আমি ভাবতে পারছি না, বয়ান তালাক না হয়ে গেলে কী কেলেঙ্কারী কাণ্ডটাই না হতো আজ। খোদা মেহেরবান। তিনি আমার সত্য রক্ষা করেছেন। আমি যে বাগদান করেছিলাম উজির! উফ্, ভাবতে পারছি না—কী সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারতো। যাই হোক, এখন আল্লাহর দোয়ায় আমার সত্য রক্ষা হবে!

উজির তখন ঈর্ষায় জ্বলছিল! শাহজাদীর শাদী বাগড়া দিয়ে ভণ্ডুল করার শেষ চেষ্টা করলো সে, জাঁহাপনা, আপনি আমাকে হুকুম করেছিলেন পাত্রের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আলাদিনের বাবা এই শহরের একপ্রান্তে একটি ছোট্ট দর্জির দোকানে কাজ করে প্রায় অর্ধাহারে দিন কাটাতো। মরার সময় সে একটা কানাকড়িও রেখে যেতে পারেনি বিবি-বাচ্চার জন্য। এখন জাঁহাপনা নিজেই বিবেচনা করে দেখুন, এই দীন-দরিদ্র দর্জির সন্তানের সংগে শাহজাদীর শাদী দেওয়া সংগত হবে কিনা! আমার তো একদম বিশ্বাস হয় না, সে সৎভাবে জীবন-যাপন করে।

সুলতান বলেন, কিন্তু এখন সে তো আর গরীব নাই উজির। যে-সব রত্নমাণিক সে যৌতুক পাঠিয়েছিল, তা দেখার পর নিশ্চয়ই তোমার মনে কোনও সংশয় নাই।

—আমিও সেই কথাই বলছি, জাঁহাপনা। এই সামান্য কিছুকাল আগেও যার ঘরে দুবেলা উনুন জ্বলতো না, সে সৎভাবে এই সম্পদ রোজগার করলো কী করে?

সুলতান হাসেন, তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। যে সব রত্নমণি-মাণিক্য সে আমাকে ভেট পাঠিয়েছে তা কেউ রোজগার করে কখনই সঞ্চয় করতে পারে না, উজির। একটা জীবনে দূরে থাক, সাতপুরুষ ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ফুলে ফেঁপে উঠলেও এ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব না। একমাত্র খোদাতাল্লার অসীম কৃপা ছাড়া এসব বস্তু কারও করায়ত্ত হতে পারে না। তার নিজের নসীবেই হোক বা তার পূর্ব-পুরুষদের সুকৃতির ফলেই হোক, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই সে এই দুর্লভ সম্পদের মালিক হতে পেরেছে। কিভাবে কেমন করে সে হতে পেরেছে সে সব তথ্য আমার জানবার প্রয়োজন নাই। এটুকু বুঝতে পেরেছি, সে পরম ভাগ্যবান পুরুষ হয়ে ধরায় জন্মেছে। সুতরাং শাহজাদী বুদুর তারই ভোগের পাত্রী হওয়া উচিত বলে মনে করি আমি।

উজির দেখলো আর কোনও মতেই সুলতানকে নিরস্ত করা যাবে না। তবু শেষবারের মতো আর একটা বাণ ছুঁড়লো সে।

মহামান্য সুলতানকে এই অধমের নিবেদন, সবই ঠিক আছে, তা আলাদিনের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার পরীক্ষা করার জন্য আর একদফা যৌতুক চেয়ে পাঠানো দরকার মনে করি আমি। অবশ্য জাঁহাপনা যদি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন আমার কিছু বলার নাই।

সুলতান স্মিত হাসলেন, উত্তম। তাহলে পাত্রের মাকে সেই বায়নাই শুনিয়ে দাও উজির। ঠিক আছে ওর মাকে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে বল আমিই বলছি তাকে।

সুলতানের হুকুম মতো আলাদিনের মা তাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। সুলতান বললেন, আমি তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি মেয়ে। আমি আমার হলফ-এর কথা ভুলিনি, মনে আছে। তোমার পুত্রের সঙ্গেই শাহজাদীর শাদী হবে সন্দেহ নাই। এবার তাহলে দেনমোহরের কথায় আসা যাক, কী বল? একথা তো সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, শাহজাদী বুদুরের রূপের জোড়া নাই কোথাও। সুতরাং যোগ্য পাত্রীর যোগ্য দেনমোহর তো দিতে হবে।

—জাঁহাপনা যথার্থ বলেছেন। উপযুক্ত দেনমোহর ছাড়া তো শাদী সুসম্পন্ন হতে পারে না। আপনি আজ্ঞা করুন, হুজুর। আপনার অভিলাষ পূরণ করবো।

সুলতান বললো, সাবাস! তবে শোনও আমার কন্যা যা চায় তার ফিরিস্তি শোনাচ্ছি, তিন মাস আগে যে রত্নমণিগুলো আমাকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিল তোমার পুত্র, সেই রকম চল্লিশখানা সোনার থালায় ভর্তি ঐ ধরনের মণি-মাণিক্যের ফল সাজিয়ে নিয়ে আসবে চল্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদী। আর এই বাঁদীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবে চল্লিশজন নিগ্রো নফর। তারা কালো হলেও দেখতে সকলেই সুন্দর এবং তাগড়াই জোয়ান যুবক হওয়া চাই। তারা সবাই বাদশাহী কেতা অনুসারে যথাযোগ্য সুন্দর সুন্দর সাজে সুসজ্জিত হয়ে আসবে আমার প্রাসাদে। ব্যস, এর বেশি আর আমার কিছু চাইবার নাই, পাত্রের মা। অবশ্য তোমার ছেলে এর আগে আমাকে যা পাঠিয়েছে তার একটা মণি-মাণিক্যের মূল্য অনেক। কোনও সুলতান বাদশাহ ঐ সব রত্নমাণিক্যের একটাও সংগ্রহ করে আনতে পারবে না আমি জানি। তাই এ আমার দাবি নয়, অভিলাষ। যদি তোমার পুত্র পূরণ করতে পারে, আমি খুব খুশি হবো।

আলাদিনের মা সুলতানের বায়না শুনে শিউরে উঠলো। সর্বনাশ, এই রকম অসম্ভব দাবি কেউ পূরণ করতে পারে নাকি! এতো শাহজাদীকে না দেবার ছল। মুখে হ্যাঁ না কোন শব্দ উচ্চারণ না করে সে নীরবে দরবার ছেড়ে ঘরে ফিরে যায়। কাঁদতে কাঁদতে সে ছেলেকে বলে, আমি আগেই বলেছিলাম, বাবা, ওসব সুলতান বাদশাহদের সংস্রবে যেতে নাই। তুই শাহজাদী বুদুরের

আশা ছাড়। কিন্তু আমার কথা শুনলি না তখন, এখন ঠেলা বোঝ।

আলাদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন মা, আবার কী ঝগড়া হলো ?

আলাদিনের মা তখন ইনিয়ে বিনিয়ে লোভী শকুনি সুলতানের লালসার কাহিনী শোনালো ছেলেকে।

—বাবা তখন যদি ঐ সোনার থালাগুলো না বেচে লুকিয়ে রাখতিস, তবে আবার না হয় সেই পাহাড় গুহায় ঢুকে ঐরকম কিছু কাঁচের ফল সংগ্রহ ক'রে আনতিস। কিন্তু সে-সব কাঁচ পাথরের ফল জোগাড় হলেও চল্লিশখানা সোনার থালা কোথায় পাবি, বাবা। আর সোনার থালাও যদি যোগাড় হয়, ঐ চল্লিশটা সুন্দরী বাঁদী আর চল্লিশটা নিগ্রো নফর তুই কোথায় পাবি ? জানিস বেটা সুলতানটা হয়তো অত খারাপ নয়, কিন্তু বাঁদরমুখো ঐ পাজি উজিরটাই যত নষ্টের গোড়া। যত সব কুবুদ্ধি, ঐ লোকটাই জোগাচ্ছে তাকে। সে চায় না এ শাদী হোক। কারণটা অতি সোজা—এত বড় হুকুমত আর অমন সুন্দরী শাহজাদী তার হাতছাড়া হয়ে গেছে—এ শোক কী সে ভুলতে পারে ? আমি স্বচক্ষে দেখলাম, ঐ শয়তান উজিরটা সুলতানের কানে কানে ফুসমন্তর দিচ্ছিল।

আলাদিন হাসে। তোমাকে কালো মুখ করে ঢুকতে দেখে আমার তো আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল মা। ভাবলাম আবার বুঝি সব কেঁচে গেছে। কিন্তু এখন ধড়ে প্রাণ এল, যাক বাঁচালে তুমি।

—ধড়ে প্রাণ এল ? বলিস কী বাবা ? সুলতানের যা বায়নাক্কা তাতে কী তুই শাহজাদীকে ঘরে আনতে পারবি কখনও ?

—আলবাৎ পারবো মা। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি জান না, আমার হাতে কী মোক্ষম অস্ত্র আছে। পয়সা-কড়ির সমস্যা আমার কাছে কোনও সমস্যাই নয়। এক লহমায় আমি সুলতানের সব চাহিদা পূরণ করে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে, মা।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছাপ্পান্নতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

আলাদিনের মা দ্বিধা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আলাদিন এত জোর দিয়ে ও সব কথা কী করে বলতে পারে বুঝতে পারল না সে। খানা পাকাবার জন্য বাজারে সওদা করতে চলে যায় সে।

আলাদিন দরজা বন্ধ করে চিরাগটা বের করে মৃদু ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদিটা আবার এসে হাজির হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বলে আমি ত্রিভুবনের মালিক, আমার ওপরে আর কেউ নাই। কিন্তু আমার মালিক ঐ চিরাগ। এখন তা আপনার হাতে, সুতরাং আপনিই আমার একমাত্র মালিক। আজ্ঞা করুন, হুজুর, কী করতে হবে আমাকে ?

আলাদিন বলে, শোনও আফ্রিদি, সুলতান তার কন্যা বুদ্দুরকে আমার সঙ্গে

শাদী দিতে রাজি হয়েছে। আর তার বদলে আমাকে চল্লিশটা সোনার থালায় ভর্তি করে মণি-মাণিক্য পাঠাতে হবে। আর সেই থালাগুলো প্রাসাদে বয়ে নিয়ে যাবে চল্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদী। তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে চল্লিশটি সুদর্শন সুঠামদেহী নওজোয়ান নিগ্রো নফর। এ সবই তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে, পারবে তো ?

আফ্রিদি বিকট মুখব্যাদন করে হাসলো, কী যে বলেন মালিক ; এ আবার একটা কাজ নাকি ! আমি এক পলকেই আপনার কাছে সব হাজির করে দিচ্ছি।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চল্লিশজন সুন্দরী বাঁদী আর চল্লিশজন নওজোয়ান নিগ্রো নফরকে এনে হাজির করলো আলাদিনের বাড়ির সামনে। বাঁদীগুলোর প্রত্যেকের মাথায় একখানা করে বিরাট বড় সোনার থালা। আর সেই সব থালায় থরে থরে সাজানো মণি-মাণিক্যের নানা রকম ফল। আলাদিন এর আগে সুলতানকে যা ভেট পাঠিয়েছিল তার চাইতেও আকারে এগুলো অনেক বড়।

আলাদিন ইশারা করতে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল। আলাদিনের মা বাজার থেকে ফিরে এসে ছেলের শান্তভাব দেখে তাজ্জব বনে যায়। এই এক দণ্ডের মধ্যে আলাদিন এতগুলো নফর বাঁদীই বা জোগাড় করলো কী করে ? আর ঐ সব হীরে চুনি পান্না মণি-মাণিক্য ভর্তি সোনার থালাগুলোই বা কোথায় পেল সে !

আলাদিন হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—কী মা, কী দেখছো ? খুব অবাক হচ্ছো, ছেলের কাণ্ড দেখে, তাই না ? এ আর এমন কী, তোমার ছেলে আরও অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে মা।

আলাদিন মায়ের হাত থেকে বাজারের থলেটা নিজের হাতে নিয়ে বলে, মা তুমি আর দেরি করো না। এদের নিয়ে এখুনি প্রাসাদে রওনা হয়ে যাও। সুলতানের পায়ের সামনে থালাগুলো নিবেদন করে বলো, জাঁহাপনার সব ফরমাশ এনে হাজির করেছি, এবার শাদীর আজ্ঞা করুন।

আলাদিনের মা চল্লিশজন বাঁদী আর চল্লিশজন নিগ্রো নফরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানের প্রাসাদাভিমুখে রওনা হলো।

এক একজন স্বর্ণ-থালা-বাহক বাঁদী তার সামনে দশ হাত এবং পিছনে দশ হাত দূরে দূরে এক একজন নিগ্রো নফর। সকলেই জমকালো সাজে সজ্জিত। সেই আশিজনের বিশাল বাহিনী নিয়ে আলাদিনের মা প্রাসাদ-ফটকে এসে হাজির হলো এক সময়।

সান্ত্রীরা ছুটে গিয়ে সুলতানকে খবর দিল, আলাদিনের মা শাদীর দেন-মোহর নিয়ে এসেছে, জাঁহাপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে। সুলতানের নির্দেশে তাকে বরণ করে দরবারে নিয়ে আসতে গেল উজির।

সুলতান সেদিনের মতো দরবারের কাজ মুলতুবী করে সভা ভঙ্গ করে সকলকে বিদায় দিয়ে নতুন অভ্যাগতদের জন্য দরবারকক্ষ মুক্ত করে রাখলেন।

এক এক করে চল্লিশজন সুসজ্জিত নিগ্রো নফর এবং চল্লিশজন সুবেশা

সুন্দরী বাঁদী দরবারে প্রবেশ করলো। মেয়েরা সুলতানের মসনদের সামনে সোনার থালাগুলো এক এক করে নামিয়ে রেখে এক পাশে সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সকলে। আর এক পাশে দাঁড়ালো নিগ্রো-নফরগুলো। মা এসে দাঁড়ালো ঠিক মাঝখানে। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনার ওয়াদা মতো সবকিছু এনে হাজির করেছি, জাঁহাপনা। এবার আপনি সন্তুষ্ট মনে শাদীর সম্মতি দিলে বাঁদী কৃতার্থ হবে।

সুলতান অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি একবার স্বর্ণ থালায় সজ্জিত মণি-মাণিক্যের রত্নফলগুলোর দিকে আর একবার সুন্দরী বাঁদীদের দিকে এবং সুঠামদেহী নিগ্রো নফরদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নয়ন ভরে দেখতে থাকলেন। এই সময়ে আলাদিনের মা যে তাঁকে কুর্নিশাদি জানিয়ে তার আর্জি পেশ করেছে সে দিকে আর একদম খেয়াল নাই। সুলতানকে নীরব থাকতে দেখে আলাদিনের মা প্রমাদ গুণলেন, হায় আল্লাহ, জাঁহাপনার বুঝি পছন্দ হয়নি এসব।

—আমার গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, কোথায় আমার ত্রুটি হয়েছে জানলে তার বিহিত করতে পারি। মনে হচ্ছে, শাহেনশাহ খুশি হতে পারেননি।

আলাদিনের মা-এর এই কথায় সুলতান সম্বিত ফিরে পান। উজিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তাজ্জব ব্যাপার। এই সব দৌলতের কাছে আমার কোষাগারের ধনরত্ন তো তুচ্ছ উজির!

উজির মাথা নাড়লেন, জাঁহাপনা যথার্থই বলেছেন।

সুলতান বললেন, এমন অতুল ঐশ্বর্যের যে মালিক সে হবে আমার জামাতা —এ কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা উজির?

—হুজুর যথার্থই বলেছেন।

সুলতান বললেন, আমার কন্যা শাহজাদী বদরের রূপের খ্যাতি জগৎজোড়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলে এত বিপুল ধনরত্নের মালিক যে তার স্বামী হবে তাও তো আমি কল্পনা করতে পারিনি, উজির?

—মহানুভব শাহেনশাহ যথার্থই বলেছেন। তবে যদি অভয় দেন একটা কথা বলি, আমাদের শাহজাদী বদরের রূপের মূল্য এ-সব ধন-দৌলত দিয়ে মাপা যাবে না, জাঁহাপনা।

সুলতান বুঝলেন, উজির তাকে তোষামদ করতে চাইছে। হেসে বললেন তিনি, না না, উজির ওসব কথা বলে তুমি আমাকে খুসি করতে পারবে না। যে সম্পদ আজ আলাদিন পাঠিয়েছে এখানে তামাম দুনিয়ার সব কিছুর বদলেও তার দাম শোধ হয় না। বদর আমার চোখের মণি, আদরের ধন, জগতের সেরা সুন্দরী, কিন্তু, বাবা হয়েও বলছি, এত দাম তার হতে পারে না। যাই হোক, এরপরে তুমি আর বলতে পার না, উজির, আমি আমার কন্যাকে হাত পা বেঁধে দরিয়ায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

উজির মুখ কাচুমাচু করে বলে, না, তা অবশ্য নয়—

সুলতান এবার দরবারের অন্যান্য আমির অমাত্যদের দিকে তাকালেন। তারা সবাই সমস্বরে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

—এমন সুপাত্র আর দুটি পাওয়া যাবে না, জাঁহাপনা। আমাদের মনে হয়, মহামান্য আলাদিনই শাহজাদী বদরুরের একমাত্র যোগ্য পাত্র।

সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে তিনবার কুর্নিশ জানালো সুলতানকে। অর্থাৎ তারা সকলে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিল।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো আটান্নতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

সুলতান এবার আলাদিনের মা-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার পুত্র আলাদিনের অতুল সম্পদ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বদরুকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেতে গেলে টাকাটাই তো একমাত্র ব্যাপার নয়, এখন বল তোমার পুত্র আর কী কী গুণের অধিকারী?

আলাদিনের মা বললো, ছেলে আমার রূপবান, অবশ্য লোকে বলে। আমি মা, মা-এর চোখে সব সন্তানই অপরূপ, সুতরাং আমার মতামত আপনাকে শোনাবো না, জাঁহাপনা। আমার চোখে ছেলে বড় দুবলা; কিন্তু অপরে বলে আলাদিনের মত সুন্দর স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান নাকি এ সহরে খুব বেশি নাই।

—ব্যাস ব্যাস, সুলতান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, আর বলতে হবে না। রূপ আছে, যৌবন আছে, দৌলত আছে এর চেয়ে বেশি তো আর কী চাই? এ-ই বদরুরের একমাত্র যোগ্য বর। আমি আর একদিনও দেরি করতে চাই না পাত্রের মা। আজ থেকেই তাকে আমি আমার বাদশাহী খানদানীর এক শরিক করে নিতে চাই। এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার পুত্রাধিক স্নেহে বুকে টেনে নিতে চাই। পবিত্র গ্রন্থ সাক্ষী রেখে তার সঙ্গে আমার কন্যার শাদী দেব আজ সন্ধ্যায়। এই আমার পাকা কথা।

আলাদিনের মা দরবার থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে আসে। আলাদিন অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসেছিল। না জানি আবার কোন বাগড়া আসে। মাকে ছুটে আসতে দেখে আলাদিন বুঝতে পারে, সংবাদ শুভ।

আলাদিন বলে, কী সংবাদ এনেছ, মা?

মা বলে, সুলতান পাকা কথা দিয়েছেন। আজই শাদী হবে।

আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। এতদিনে তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। মা বলে, সবই আল্লাহর অসীম কৃপাতে সম্ভব হতে চলেছে, বাবা। তাঁর করুণা ছাড়া এ-অসম্ভব কী করে সম্ভব হতে পারে? নে আর দেরি করিস নে, তৈরি হয়ে নে। সন্ধ্যের আগেই রওনা হতে হবে।

আলাদিন নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে প্রদীপটা বের করে আলতোভাবে ঘষে। এবং তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয় সেই আফ্রিদি। আলাদিন বলে, শোন চিরাগের বান্দা, আমি আগে গোসল করবো, তারপর জমকালো শাহজাদার

সাজপোশাকে সাজবো। এমন বাহারী মূল্যবান পোশাক আমার জন্যে আনবে যা দুনিয়ার আর কেউ যেন যোগাড় করতে না পারে। লোকে দেখে যাতে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে। খুব কম করে হলে লক্ষ কোটি দিনার তার দাম হওয়া চাই।

আফ্রিদি কুর্ণিশ জানিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে বললো, আপনি আমার পিঠে চেপে বসুন, মালিক। আমি আপনাকে হামামে নিয়ে যাব।

আলাদিন চেপে বসলে আফ্রিদি তাকে নিয়ে আকাশ পথে উড়তে উড়তে এক সুরম্য হামামে নিয়ে এসে হাজির হলো। এমন চোখ ঝলসানো হামাম কোনও সুলতান বাদশাহও চোখে দেখেনি কখনও। আগাগোড়া ইমারতটা স্ফটিকে নির্মিত। প্রবাল, পোখরাজ,পান্না,মতি দিয়ে নানারকম কারুকার্য করা। একটা বিশাল ফুলবাগিচার মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এই হামাম। বাগিচার মাঝখানে একটি বিরাট জলের ফোয়ারা—অবিরত ধারা বহন করে চলেছে। তাকে ঘিরে প্রশস্ত এক জলধারা—প্রায় পুকুরের মতো। স্বচ্ছ নির্মল নীল জল—নিথর। মনে হয় এখানে কেউ কখনও অবস্থান করেনি এর আগে। আলাদিন এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারলো, ধারে কাছে কোনও লোকালয় নাই। শুধু পাখির কূজন ছাড়া জন-মানবের কোনও সাড়া নাই।

অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে স্নান করলো আলাদিন। আফ্রিদি সাজ-পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল পুকুরের পাড়ে। আলাদিন জল থেকে উঠে এসে ঐ সাজ-পোশাকে শাহজাদার মতো করে সাজলো।

এরপর আফ্রিদি আবার তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে এসে নামায়। আলাদিন বলে, এর পর তোমাকে কী করতে হবে জান, বান্দা ?

আফ্রিদি বলে, হুকুম করুন, মালিক।

আলাদিন বলে, আমার জন্যে একটা চমৎকার তাজি ঘোড়া নিয়ে এসো। সব চেয়ে সেরা হওয়া চাই। সেই সঙ্গে আটচল্লিশটি সুঠাম সুন্দর নওজোয়ান বান্দা নিয়ে আসবে। ওরা আমার ঘোড়ার দুই পাশে এবং সামনে পিছনে বারজন করে সারিবন্ধভাবে প্রহরী হয়ে চলবে। এছাড়া আরও বারটি সুবেশা সুন্দরী বাঁদী চাই আমার মা-এর জন্য। মাকে বৃত্তাকারে ঘিরে সুলতানের প্রাসাদে নিয়ে যাবে তারা। আরও একটা কথা, আমার আটচল্লিশজন দেহরক্ষী প্রত্যেকের গলায় একটা করে পাঁচ হাজার দিনার ভর্তি বটুয়া ঝোলানো থাকবে। প্রয়োজন হলে যাতে আমি সেই অর্থ দুহাতে খরচ করতে পারি। বৎস, এখন এই পর্যন্ত। তুমি এস।

রাত্রির অন্ধকার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো উনষাটতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

আলাদিনের কথা শেষ হতে না হতেই আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু

সে ক্ষণকালের জন্য। পর মুহূর্তেই সে একটা আরবী তাজি ঘোড়া, আটচল্লিশটা বান্দা, বারটি সুন্দরী বাঁদী এবং অন্যান্য যে-সব জিনিসপত্র আলাদিন ফরমাস করেছিল—সব যথাযথ এনে হাজির করলো। এবং সব কিছুই বড় চমৎকার। আলাদিন যেমন যেমন চেয়েছিল তার চেয়েও সুন্দর।

আলাদিন বললো, ঠিক আছে, এখন তুমি যাও। আবার যখন দরকার হবে ডাকবো।

আফ্রিদি অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলাদিন ঘোড়ায় চেপে বসলো। বান্দারা সারিবদ্ধভাবে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। মা সেজেগুজে বাইরে আসতে বাঁদীরা তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে নিল।

এইবার আলাদিন শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো। রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে শত সহস্র মানুষ জমায়েৎ হতে লাগলো। সুলতানের হবু জামাতা আলাদিনকে দেখার কৌতূহলে পর্দানসীন মেয়েরাও জানালার পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে।

মহা সমারোহে পথ পরিক্রমা শেষ করে এক সময় মিছিল প্রাসাদ ফটকে এসে হাজির হলো।

সুলতান আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন আলাদিন সদলে প্রাসাদ অভিমুখে আসছে। যথাযোগ্য সমাদরে হবু জামাতাকে বরণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সুলতান স্বয়ং প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাদিনকে অভ্যর্থনা করার তদারক করছিলেন।

উজির হাতে ধরে আলাদিনকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো। আলাদিন এগিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে যথাবিহিত কুর্নিশ জানালো। আলাদিনের সুন্দর চেহারা এবং তার মূল্যবান সাজ-পোশাক দেখে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমির অমাত্য সেনাপতিদের হর্ষধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো এক অপূর্ব ছন্দলহরী তুলে।

সুলতান আলাদিনকে এক হাতে বেষ্টন করে ধীর পদক্ষেপে দরবার কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, খোদা হাফেজ, বাবা, আল্লাহর অভিপ্রায় কেউ এড়াতে পারে না। শাহজাদী বদুরের সঙ্গে তোমার মিলন বিধাতার লিখন, তাই শেষ পর্যন্ত তা ঘটতে চলেছে। অনেক আগেই এ শাদী হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক যা হয়ে গেছে ও নিয়ে এখন সে জন্য আমি দুঃখিত বাবা। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, ও নিয়ে এখন আমার খেদ নাই। সব ভাল যার শেষ ভাল।

আলাদিন বললো, ফল পাকবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সময় না হলে তা ভোগের যোগ্য হয় না, জাঁহাপনা।

আলাদিনের এই চমৎকার সারবান কথায় মুগ্ধ হন সুলতান।

—আজ আমি ধন্য আলাদিন, তোমার মত যোগ্য পাত্র কার না কাম্য।

দুনিয়ার যে-কোনও সুলতান বাদশাহ তোমাকে জামাতা করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো।

দরবারে নিজের তখ্‌তের একপাশে বসিয়ে আলাদিনের সংগে নানারকম সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মেতে উঠলেন সুলতান।

এর পর খানা-পিনার আয়োজন করা হয়। দরবারের আমির অমাত্যদের সংগে নিয়ে সুলতান এবং আলাদিন আহারাদি সমাধা করেন। এই ভোজসভার প্রধান পরিবেশক ছিল সেই বাঁদরমুখো বুড়ো প্রধান উজির। সে নিজে হাতে সুলতান এবং আলাদিনের খানাপিনা পরিবেশন করলো।

আহার উৎসব শেষ হলে সুলতান কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে শাদী-নামা বানিয়ে সইসাবুদ করে দিয়ে বিদায় নিল।

সুলতান আলাদিনকে বললো, বাবা, আজ রাতে তুমি কি বাসরঘরে বুদুরকে নিয়ে সহবাস করবে?

আলাদিন বলে, জাঁহাপনা, যে শুভ মুহূর্তটির জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি এত কাল, সেই সৌভাগ্য আমি হাতের মুঠোয় পেয়ে আর ক্ষণকাল বিলম্ব করতে চাই না। শাহজাদী বুদুরের সংগে মিলিত হওয়ার জন্য আমার হৃদয়মন আকুল হয়ে উঠেছে। আমি তাকে একান্ত করে পেতে চাই জাঁহাপনা। প্রাসাদের ওই কল-কোলাহল আমাদের ভালবাসার অন্তরায় হয়ে উঠবে। তাই আমি আপনার এই প্রাসাদকক্ষে আমার বিবিকে নিয়ে সহবাস করতে ইচ্ছা করি না।

সুলতান বললেন, বেশ তো তুমি যদি জনসামারোহ পছন্দ না কর তবে তোমার জন্য আমি আমার প্রমোদ বিহারের নিরালা নির্জন প্রাসাদকক্ষই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেখানে প্রকৃতির অপরূপ শোভা তোমাদের মুগ্ধ করবে। বাইরের কোনও অবাঞ্ছিত মানুষ বিরক্ত করতে যাবে না।

—না, জাঁহাপনা। শাহজাদী বুদুর আমার প্রাণের স্পর্শমণি। তাকে আপনার জলসাঘরে নিয়ে তুলতে চাই না। সে ফুলের মতো পবিত্র নির্মল। বহু বাঁদীর নূপুর নিক্কণে যে প্রাসাদের পাথরের মেঝে কলংকিত হয়ে আছে শাহজাদী বুদুর সে ঘরে পা রাখবে না।

সুলতান আহত হলেন, ঈষৎ; কিন্তু আনন্দিত হলেন ততোধিক। কী অপরূপ মান ইজ্জৎ বোধ! বুদুর তার প্রাণাধিক কন্যা। প্রমোদ-বিহারের রঙমহলে তাকে নিয়ে যাওয়া যে অসংগত এ চৈতন্য তিনি আলাদিনের কাছ থেকেই পেলেন। জামাতার বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা ও আত্মসম্মানবোধে সুলতান বিমোহিত হয়ে গেলেন।

—তা হলে তুমিই অভিপ্রায় ব্যক্ত কর বেটা, তোমাদের মধুযামিনী কোথায় হতে পারে। যেখানে বলবে সেখানেই আমি ব্যবস্থা করে দেব।

আলাদিন বললো, এই প্রাসাদের এ পাশে যে বিশাল ফাঁকা মাঠটা পড়ে আছে ঐ মাঠে আমি একখানা নতুন প্রাসাদ বানাতে চাই, জাঁহাপনা। সেই নতুন প্রাসাদে আমি আমার বিবিকে নিয়ে বসবাস করতে চাই। এখন আপনার অনুমতি পেলেই আমি কাজে হাত দিতে পারি।

—এ অতি উত্তম কথা। তুমি আমার শুধু জামাতা নয়। পুত্রসম প্রাণাধিক প্রিয়। তোমার যেখানে খুশি যেমন খুশি, প্রাসাদ ইমারত বানাও, এর জন্য আমার কোনও অনুমতির প্রয়োজন নাই, বাবা। তোমরা দুজনে বেহেস্তের সুখে সম্পদে দিন কাটাবে—এই তো আমি আশা করবো। তার জন্য যা যা দরকার আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তাহলে আর দেরি করো না বাবা, চটপট প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করে দাও। বলা তো যায় না, বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নাই, যাবার আগে তোমরা ঐ প্রাসাদে বসবাস করছো—পুত্র পরিবার নিয়ে ধন সম্পদ সুখ বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছ—দেখে মরতে চাই।

আলাদিন বললো, এবার আমাকে অনুমতি করুন, জাঁহাপনা, আমি আমার বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।

আলাদিন নিজের বাড়িতে ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চিরাগটা বের করে আলতোভাবে ঘষতেই আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হলো।

আলাদিন বললো, তোমার এতাবৎ সব কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি, বান্দা। কিন্তু এবারে তোমাকে আরও অনেক কঠিন কাজের ভার দেব।

আফ্রিদি অভিবাদন জানিয়ে ঘোৎ ঘোৎ করে নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ তুলে বললো, হুকুম করুন, মালিক, কঠিন বলে কোনও কাজ আমার কাছে নাই।

আলাদিন বললো, জানি। সেইজন্যেই ভরসা করে তোমাকে ডেকেছি। শোন, সুলতানের প্রাসাদের পাশে যে ফাঁকা মাঠটা আছে সেখানে আমি এক অনিন্দ্যসুন্দর হর্ম্যপ্রাসাদ বানাতে চাই। সারা দুনিয়ায় তার তুল্য ইমারত কোথাও কেউ কখনও দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না—এমনি হওয়া চাই, পারবে তো?

আফ্রিদি আকর্ণ বিস্তৃত দাঁত বের করে হাসলো, কী যে বলেন, কত্তা, এ আবার একটা কঠিন কাম নাকি। আগাগোড়া প্রাসাদটা আমি পান্নার পাথর দিয়ে বানিয়ে দেব। তার ভিতরে বাইরে হীরে, চুনী, মুক্তো, নীলা, চন্দ্রকান্তমণি, পলা, পোখরাজ—নানারকম মণি-মাণিক্য দিয়ে কারুকাজ করা হবে। এখন বলুন, এ জিনিস আপনি পছন্দ করেন কিনা?

আলাদিন অবাক হয়ে বলে, আগাগোড়া প্রাসাদটা পান্নার পাথর দিয়ে গড়া হবে? কিন্তু সে তো পাহাড়প্রমাণ পান্না লাগবে, বান্দা!

—তা লাগুক। সে আমি ব্যবস্থা করবো। আপনি ওসব নিয়ে আদৌ চিন্তা-ভাবনা করবেন না মালিক। শুধু হুকুম করুন, আপনার কী পছন্দ।

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, আমি আর ভাবতে পারছি না, তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। শুধু খেয়াল রাখবে, দেখা মাত্র লোকে যেন বাহবা দিয়ে বলে, এমনটি আর হয় না। আর একটা কথা, প্রাসাদের মাথার উপরে ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল গম্বুজ বসানো থাকবে। এই গম্বুজটাকে কয়েকটা সোনা আর চাঁদীর থাম মাথায় করে ধরে রাখবে। আর গম্বুজটা হবে স্বচ্ছ স্ফটিকের। সূর্যের কিরণ পড়লে গগণমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এছাড়া সারা প্রাসাদের

চারপাশে যেন নিরানব্বইটা জানলা থাকে। এই সব জানলাগুলোর কার্নিশ প্রবাল পাথরের তৈরি হবে। এবং হীরে মতি ও মূল্যবান মণি-মাণিক্যে খচিত থাকবে এর পাল্লা আর চৌকাঠগুলো। আর হ্যাঁ, ভুলে যেও না, প্রাসাদের সামনে এক অনুপম বাগিচা থাকবে। তার মাঝখানটা ঝর্ণা, ফোয়ারা, পানির চৌবাচ্চা এবং বিলাসের নানা উপকরণে সুসজ্জিত হবে।

আফ্রিদি মাথা নুইয়ে বলে, যথা আজ্ঞা মালিক। আর কিছু অভিপ্রায় আছে?

—ওঃ, হ্যাঁ, শোন, প্রাসাদের তলায় মাটির নিচে একটা গুপ্তঘর থাকবে। এটি হবে আমার কোষাগার। এই ঘরে মূল্যবান মণি-মাণিক্য, ধনরত্ন এবং সোনা-দানায় ঠাসা থাকবে। এছাড়া রসুইখানা, আস্তাবল এবং দাসদাসী নফর চাকরদের থাকার জন্য আস্তানা। সেগুলো সম্বন্ধে তোমাকে আর পরামর্শ দেবার কিছু নাই। যেমন ভাল বুঝবে তেমনি করে বসাবে। ব্যস এখন এই পর্যন্ত। এবার যাও; সব ঠিকঠাক বানিয়ে তবে আমার কাছে ফিরে আসবে।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার সে আলাদিনের কামরার শয্যাপাশে এসে দাঁড়াল। আলাদিন তখনও নিদ্রামগ্ন। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে অদ্ভুত ধরনের সেই আওয়াজ বের করতেই আলাদিনের ঘুম ছুটে যায়। আফ্রিদি কুর্নিশ জানিয়ে বলে, মালিক আপনার আজ্ঞামত সব তৈরি। মেহেরবানী করে আপনি গিয়ে একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

আলাদিন বললো, বেশ, চল যাই দেখে আসি।

আফ্রিদির পিঠে উঠে বসতে সে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সুলতানের প্রাসাদের পাশের খালি ময়দানে নব নির্মিত ইমারতের সামনে। প্রথম দর্শনেই আলাদিন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, বাঃ, চমৎকার। এতো আমি যা কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক সুন্দর বান্দা!

—মেহেরবানী করে ভিতরে চলুন মালিক।

ভিতরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আলাদিন। একি ব্যাপার! মর্তলোকে না বেহেস্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে? আলাদিন বলে, আমি কিন্তু এতটা ভাবিনি। তুমি যা বানিয়েছ, সত্যিই তার তুলনা নাই।

খুটিয়ে খুটিয়ে সব ঘরে ঘরে দেখতে থাকে আলাদিন। যেখানে যে বস্তুটি থাকলে দেখতে বাহারী হয় তাই বসানো হয়েছে। মাটির নিচের ঘরটা দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অমন হীরা মণি-মাণিক্যের দ্যুতি কী কেউ খোলা চোখে সহ্য করতে পারে?

আলাদিন বললো, তোমাকে বহুত বাহবা দিচ্ছি নফর। কিন্তু একটা জিনিস করতে বাকী রয়ে গেছে। অবশ্য তোমার কোনও দোষ নাই। আমিই বলতে ভুলে গেছি।

আফ্রিদি সাগ্রহে জানতে চায়। কী করতে হবে, মালিক?

—সুলতানের প্রাসাদ আর আমার প্রাসাদের মাথার ওপর দিয়ে একখানা গালিচা পাতা থাকবে, শাহজাদী বদ্দর তার ইচ্ছামত এ প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদে যাতে খালি পায়ে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য এটা দরকার।

আফ্রিদি বলে, এতো আলবৎ দরকার, মালিক। তিনি তো আর মাটিতে পা রেখে এ প্রসাদ-ও প্রসাদ করতে পারেন না। সেইজন্যে আপনি না বললেও আমি নিজে থেকেই দুই প্রাসাদের মাথার ওপর দিয়ে একখানা গালিচা বীথি তৈরি করে দিয়েছি।

আলাদিন খুব খুসি হলো আফ্রিদির কথা শুনে। কিন্তু অবাক হলো তখুনি।

—কই, কোথায় তোমার গালিচা বীথি, বান্দা? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

আফ্রিদি হাসে, আছে, আপনি প্রাসাদের ওপরে চলুন দেখতে পাবেন।

উপরে উঠে আসতে আলাদিনের ভ্রম ঘুচলো। একখানা হাল্কা মেঘ-রঙের মখমলের গালিচা এ প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদের ছাদ পর্যন্ত বিছান আছে। বলে না দিলে মনে হতে পারে একখণ্ড মেঘ ভেসে রয়েছে মাত্র।

—নিখুঁত সুন্দর, আলাদিন আনন্দে নেচে ওঠে, এমন অপূর্ব সুন্দর কখনও দেখেনি কেউ। সত্যিই তোমার কাজ তারিফ করার মতো বান্দা। আমি খুব খুশি হয়েছি। চল, দেখা আমার শেষ হয়েছে, এবার আমাকে আবার ঘরে পৌঁছে দাও।

আফ্রিদি আলাদিনকে নিয়ে উড়ে চলে গেল তার ঘরে।

এদিকে সুলতান-প্রাসাদে তখন বিস্ময়ের বান ডেকেছে। প্রাসাদের প্রহরী কর্মচারী নফর চাকররা সকালবেলায় ঘুম থেকে চোখ খুলেই দেখে পাশের খোলা ময়দানে এক সুরম্য প্রাসাদ, তার বর্ণাঢ্যে চোখ ঝলসে যায়। মাথার ওপরের স্ফটিকের গম্বুজটায় তখন সূর্যকিরণ পড়ে জ্বলন্ত এক সূর্যগোলকে পরিণত হয়েছে। সবাই মিলে ছুটে গেল উজিরের কাছে। উজির অবিশ্বাস নিয়ে বাইরে এসে তাজ্জব বনে যায়। দ্রুত পায়ে সে ছুটে যায় সুলতান-সকাশে।

—জাঁহাপনা আপনার জামাতা আলাদিন এক কুশলী যাদুকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুলতান উজিরের এবম্বিধ উক্তিতে অসম্মানিত বোধ করেন।

—কেন? কী দেখলে তার?

—আপনি বাইরে বেরিয়ে দেখুন জাঁহাপনা, এক রাতের মধ্যে প্রাসাদের প্রান্তে সে এক বিশাল ইমারত বানিয়ে ফেলেছে। এতো কোনও মানুষের সাধ্যে সম্ভব হতে পারে না, হুজুর।

—কেন হতে পারে না, উজির। ওসবই তোমাদের ঈর্ষার কথা। যে মানুষ পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য মণি-মাণিক্যের মালিক, যার ধন-দৌলতের কোন সীমা পরিসীমা নাই, সে শুধু বিত্তবানই নয়, অসীম ক্ষমতাবানও বটে। তার ধনবল

যেমন অপার জনবলও তেমনি অপর্যাপ্ত থাকতে পারে। সুতরাং তার মতো মানুষের পক্ষে রাতারাতি একখানা ইমারত বানানো কী অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে ?

উজির বুঝলো, সুলতান স্নেহবন্ধ হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে অন্যরূপে বোঝাতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। তাই সে আর দ্বিরুক্তি না করে চুপ করে গেল।

এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক এখানে। এখন আমরা আবার আলাদিনের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো একষট্টিতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

ঘরে ফিরে এসে আলাদিন মা-এর কাছে গিয়ে বললো, মা তৈরি হয়ে নাও। একটু পরেই আমরা প্রাসাদে যাবো। তোমার বাঁদীদেরও তৈরি হয়ে নিতে বল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাদিন নিজেও সেজেগুজে ঘোড়ায় চেপে বসলো। তার চারপাশে ঘিরে সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়ালো সেই নিগ্রো নফররা! মা-ও বেরিয়ে এল বারজনে সরিবৃত হয়ে। আলাদিন মাকে উদ্দেশ করে বললো, মা আমি আমার মত নফরদের সঙ্গে নিয়ে চললাম। তুমি তোমার মতো বাঁদীদের নিয়ে প্রাসাদে চলে এস।

আলাদিন শহর পরিক্রমা করতে করতে এগোতে থাকে। কিন্তু আলাদিনের মা সোজা পথে অনেক আগেই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো।

সুলতান নিজে এসে সাদর অভ্যর্থনা করলো জামাইএর মাকে। খোজাদের হুকুম করলো, যা এঁকে শাহজাদীর কাছে নিয়ে যা।

—যান, ওদের সঙ্গে যান, ছেলের বৌকে একবার দেখুন।

শাহজাদী বুদুর শাশুড়ীকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে সালাম জানিয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ফরাসে বসালো। দাসী বাঁদীরা নানারকম সরবৎ গোলাপজল মিঠাই মণ্ডা ইত্যাদি নিয়ে এসে সামনে সাজিয়ে দিল। শাহজাদী অনুরোধ জানায়, একটু কিছু খান, মা।

মা-এর মন ভরে যায়। আহা, কী মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর। অপলক চোখে সে তাকিয়ে তাকিয়ে বুদুরকে দেখতে থাকে। বিধাতা পুরুষ এমন নিখুঁত করে গড়েছেন কী করে তাকে—সেই কথা সে ভেবে পায় না।

বুদুরের রূপে মোহিত হয়ে গিয়েছিল আলাদিনের মা। এমন সময় তার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, হ্যাঁ, খাবো মা। তুমিও খাবে তো ?

বুদুর বলে, বেশ, খাবো। আপনি খান, আমিও নিচ্ছি।

একটু পরে সখিরা বুদুরকে সাজাতে বসে। তার চুল বেঁধে দিল এক অপূর্ব ছাঁদে। মুখে মাখিয়ে দিল মসৃণ প্রসাধন। দেহে পরালো নানারকম মূল্যবান আভরণ অলঙ্কার। জমকালো সাজ-পোশাক পরে যখন সে উঠে দাঁড়ালো,

আলাদিনের মা ভাবতে থাকলো, মাটির দেশে এ মেয়ের জন্ম হলো কী করে ?

সন্ধ্যা সমাগত। এবার পাত্রী তার জন্য নির্মিত নতুন প্রাসাদে যাবে। সেখানেই যাপন করবে তারা মধুযামিনী। আলাদিন তার নিজের প্রাসাদের ছাদে গালিচা-বীথির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তার প্রাণাধিকা বদুরের জন্য।

শাহজাদী এক এক করে মা বাবার কাছে বিদায় নিল। তার সঙ্গে চলেছে শতাধিক দাসী বাঁদী খোজা নফর। বাজিয়েরা অপূর্ব তালে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করলো। সুরের মূর্ছনায় প্রাসাদ-পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠলো। শাহজাদী ধীর পায়ে গালিচা-বীথি অতিক্রম করে নতুন প্রাসাদে চলে এল। আলাদিন স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে সে বদুরের হাত ধরে প্রাসাদের বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। সে ঘরে অন্য কোনও লোকের ভিড় নাই। শুধু আলাদিন তার মা আর বদুর।

নানা উপচারে খানাপিনা সাজানো হয়েছিল। বিশাল টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো সোনার থালায় নানা দেশের নানারকম মুখরোচক আহার্য।

আলাদিনের মা বদুরকে বলে, এস মা, আমরা খানাপিনা শেষ করে নিই।

খেতে বসে বদুর মুখে গ্রাস তুলতে ভুলে যায়। হাঁ করে সে দেখতে থাকে প্রাসাদের অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য। সে প্রাসাদ পরিবেশের মানুষ। দুনিয়ার সেরা সেরা শিল্পকর্ম সে দেখেছে, কিন্তু এমন অসাধারণ বস্তু কখনও প্রত্যক্ষ করেনি জীবনে।

—এসব কী করে, কারা বানিয়েছে, মা ?

মা এ কথার কী জবাব দেবে। আলাদিন বলে, কেন ভাল হয়নি ?

—ভাল ? একে যদি সামান্য ভাল বল, তা হলে এতকাল আমরা যা দেখেছি জেনেছি সে সবকে তো কুৎসিত বলতে হয়। আমি বলছি, এই যে শিল্পকর্ম ছড়িয়ে আছে সারা প্রাসাদের প্রতিটি দেওয়ালে চাতালে, আসবাবপত্রে, এমন শিল্পীরা কী দুনিয়ায় আছে ?

আলাদিন হাসে, কেন থাকবে না। না থাকলে এসব হলোই বা কী করে ?

বদুর তন্ময় হয়ে ঘাড় নাড়ে, তবু সে খাবারের থালায় চোখ নামাতে পারে না। অপলকভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে থাকে।

আলাদিনের মা মোটা বুদ্ধির মানুষ, প্রাসাদটা দেখতে বড় বাহারী হয়েছে, এ কথা সেও তারিফ করেছে। কিন্তু শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজ বোঝার মতো অমন সংবেদনশীল মন তার নয়—সে ওসব বুঝবে কী করে ? কিন্তু বদুরের যে শিক্ষা-দীক্ষা আছে। সে বুঝতে পারে সুচারু শিল্পকর্ম দেখে সে রসাপ্লুত হতে পারে।

বদুর দেখে খুশি হতে পেরেছে জেনে আলাদিনের মনে আনন্দ আর ধরে না। খেতে খেতে বদুর তারিফ করে, আজ এমন এক পরিবেশের মধ্যে আমি এসে পড়লাম, এমনটা শুনেছি ইস্কান্দার বা সুলেমানের সময়েই নাকি সম্ভব হতো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বাষট্টিতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

খানাপিনা শেষ হলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। রাত্রির মাদকতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বড় ঘরে এক দল সুবেশ সুন্দরী বাঁদী এসে দাঁড়ালো। সকলের হাতে বাদ্যযন্ত্র।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাচ গানের আসর জমে ওঠে। আলাদিন বদরুকে হাতে ধরে বাসরকক্ষে নিয়ে আসে। এক এক করে ওর দেহের সকল বেশবাস সে খুলে এক পাশে রেখে দেয়। শাদীর প্রথম রাতে এই রীতিই প্রচলিত।

এর পর যা ঘটতে পারে তাই ঘটেছিল। সে সব খুঁটিনাটি বিবরণের কোন প্রয়োজন নাই।

রাত্রি শেষ হলে, সকালে শাহজাদী বদরের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়। আলাদিন সেজেগুজে আস্তাবলে গিয়ে একটি তাজি ঘোড়া বেছে নিয়ে চেপে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। আলাদিনকে পেয়ে সুলতান খুশিতে উপচে পড়লেন।

আশা করি তোমাদের প্রথম মিলন রাত্রি সুখের হয়েছে বেটা? বদর কেমন আছে।

আলাদিন বলে, ভাল, খুবই ভাল কেটেছে, জাঁহাপনা। বদর এখন সুখ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আজ আপনি আপনার উজির আমির অমাত্যদের নিয়ে আমার প্রাসাদে পায়ের ধুলো দিলে আমি ধন্য হবো।

সুলতান বললেন, এ তো বড় আনন্দের কথা, বাবা। চল, আমি এখুনি যাবো তোমার প্রাসাদে।

সুলতান আলাদিনকে সঙ্গে করে উজির আমির অমাত্য সমভিব্যাহারে তখনি জামাই-এর প্রাসাদ পরিদর্শন করতে বেরুলেন।

দূর থেকে দেখে প্রাসাদের ভিতরের অসাধারণ কারুকর্ম আন্দাজ করতে পারেননি সুলতান। যতই দেখতে থাকেন ততই মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। এমন জাঁকজমক বিলাসবহুল প্রাসাদ তিনি কল্পনাতেও ভাবতে পারেননি কখনও। কোন্ দক্ষ কারিগর বানিয়েছে এসব, সেই কথা ভেবেই তিনি অবাক হন। জানালাগুলো এক এক করে গুণে দেখলো, মোট নিরানব্বইটি, প্রতিটি জানালা সুন্দর করে সাজানো—তাদের চারপাশ ঘিরে সে কি অপরূপ চারুকলার নিদর্শন। শুধুমাত্র একটি জানালার কাজ অসম্পূর্ণ।

আলাদিন সুলতানকে সঙ্গে করে বদরের বাসরকক্ষে নিয়ে গেল। মেয়ের মাথায় হাত রেখে সুলতান আদর করে বললেন, ভাল আছিস, মা? দুঃস্বপ্ন কিছু দেখিসনি তো?

বুদুর সলজ্জ হাসি হেসে অস্ফুট স্বরে বলে, না বাবা। ভালই ঘুমিয়েছি।

সুলতান বুঝলেন, কন্যা সুখ-সম্ভোগে মধুযামিনী যাপন করেছে। আলাদিনকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ, বাবা। আশীর্বাদ করি, চিরজীবন সুখে থাক।

এরপর কন্যা জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে আহার করলেন সুলতান। আফ্রিদির দৌলতে নানাবিধ মুখরোচক খানা-পিনায় আপ্যায়ন করলো আলাদিন। সুলতান সে-সব অসাধারণ খাবার-দাবার জীবনে কখনও চোখে দেখেননি। কী তার সুবাস, কী তার জিভে জল আসা আস্বাদ!

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তেষট্টিতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

খানা-পিনা শেষ হলে আলাদিন বললো, আমার প্রাসাদ দেখে আপনার কেমন লাগলো, জাঁহাপনা।

সুলতান বলল, এক কথায় অপূর্ব—অসাধারণ। তামাম দুনিয়ায় এর কোনও জুড়ি নাই। শুধু একটি জানালার কারুকাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে দেখছি। যাই হোক, আমি আমার জহুরীদের ডেকে কাজটুকু সমাধা করে দিচ্ছি।

এই বলে তিনি উজিরকে বললেন কারিগর আর জহুরীদের শমন পাঠাও। এখুনি—এখানে আসতে বল।

সুলতানের হুকুমে তৎক্ষণাৎ শহরের সেরা জহুরী এবং কারিগররা এসে হাজির হলো সেখানে। সুলতান বললেন, ঐ যে দেখছো একটি জানালা—এটার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

জহুরীরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। অন্য সব জানালায় যে ধরনের হীরে জহরত বসানো আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে তারা অবনত মস্তকে এসে দাঁড়াল সুলতানের সামনে।

—গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা, পাশের সব জানালায় যে ধরনের কাজ রয়েছে, তা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সারা দেশ খুঁজেও ঐ একটা জানালার একশো ভাগের এক ভাগ পরিমাণ হীরে জহরত সংগ্রহ করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। কোনও অর্থের বিনিময়েই ঐ সব একটা মণিরত্ন সংগ্রহ করা যাবে না।

সুলতান উজিরকে বললেন, তুমি আমার কোষাগারে যাও। সেখানে যা কিছু মূল্যবান ধনরত্ন আছে নিয়ে এস এখানে। জহুরীদের দেখাও সে-সব দিয়ে তারা জানালাটার কাজ সমাধা করে দিতে পারে কিনা।

—জো হুকুম, জাঁহাপনা!

উজির সুলতানের ধনাগারের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। সুলতান কিছুটা আহত কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার এই সলতানিয়তের জহুরীদের কাছে

এতটা ধনরত্ন পাওয়া গেল না—এই সব ধনরত্নের সমান।

আলাদিন সুলতানের অবস্থা বুঝতে পেরে ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলার জন্য গান-বাজনার আয়োজন করে। মনে আশা, সংগীতের মূর্ছনায় হয়তো বা তিনি একটু সহজ হতে পারেন।

ফল যে হলো না-তা নয়। সুলতান কিছুক্ষণের জন্য গানের জগতে তন্ময় হয়ে পড়লেন। কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র। উজির ফিরে আসতেই তিনি আবার সেইদিকে মনোযোগ দিলেন, কই দেখি কী সব এনেছ?

জহুরী সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সুলতান বললেন, দেখ তো এসব দিয়ে কাজটা নিখুঁতভাবে অন্য জানালার কাজের সঙ্গে মিলিয়ে, করা যাবে কিনা।

জহুরীরা পরীক্ষা করে দেখে বললো, এখানে যা আছে তার আটগুণ জহরত লাগবে, জাঁহাপনা। এবং আপনি যদি পুরো জহরত সংগ্রহ করে দিতে পারেন তা হলে আমার কারিগররা—তিন মাসের মধ্যে সেগুলি বসিয়ে অন্য জানালার প্রায় অনুরূপ কাজ—কিছুই বলা যায় না, তুলে দিতে পারবে আশা করি। অবশ্য হাতের কাজ কিছুই বলা যায় না, দু'চারদিন বেশিও লাগতে পারে।

লজ্জায় সুলতানের মুখমণ্ডল বেগুনী বর্ণ হয়ে গেল। সারা প্রাসাদটা এক রাতের মধ্যে বানিয়েছে আলাদিন। এই একটি মাত্র জানালার কারুকাজ সমাধা করতে শহরের সেরা কারিগররা বলছে তিন মাস সময় লাগবে? অপারগতার দুঃসহ জ্বালায় জ্বলতে থাকেন তিনি। ছিঃ ছিঃ, এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

আলাদিন মজা দেখছিল। এবার অবশ্যই তার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় সুলতান পেয়েছেন, বুঝতে পারলো সে। আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠলো মন, বললো, যাক ওসব হীরে জহরতের দরকার হবে না। ওগুলো যেখানে ছিল সেখানেই রেখে আসুন উজির সাহেব, জানালার বাকী কাজটুকু আমি এখুনি সমাধা করে নিচ্ছি।

সুলতানের দিকে তাকিয়ে আলাদিন বিনম্র বিগলিত হয়ে বলে, মহামান্য শাহেনশাহ আমার অপরাধ নেবেন না, যে মণিমাণিক্য আপনাকে আমি ভেট দিয়েছি সেগুলো দিয়ে আমার প্রাসাদের জানালার কারুকাজ করা আপনার পক্ষে শোভন সংগত হবে না, জাঁহাপনা। এভাবে আমার দেওয়া জিনিস আমাকে ওআপস করে দিলে আমি আহত হবো। ওগুলো যেমন আপনার প্রাসাদে ছিল তেমনিই সেখানে থাক। আমি নিজেই এ জানালার কাজ সম্পূর্ণ করে নিচ্ছি। আপনি, মেহেরবানী করে, একটুক্ষণ আপনার কন্যার কক্ষে বিশ্রাম করুন। আমি এখুনি কাজটুকু শেষ করে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

সুলতানকে সঙ্গে করে বুদুরের কামরায় নিয়ে যায় আলাদিন।

—আপনি এখানে বসে কন্যার সঙ্গে কথা বলুন, আমি এখুনি আসছি।

আলাদিন ফিরে এসে চিরাগটা নিয়ে ঘষতেই আফ্রিদি এসে হাজির হলো। আলাদিন বললো, বান্দা, ঐ জানালাটার কারুকাজ বাকী রয়ে গেছে। ওটা অন্য জানালার মতো করে দাও এখুনি।

আলাদিনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে আফ্রিদি এক অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় পলকের মধ্যে জানালাটাকে অন্য জানালার মতো নিখুঁত সুন্দর করে হীরে জহরত বসিয়ে সাজিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলাদিন সুলতানকে বন্দুরের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এসে বললো, দেখুন, দেখুন তো জাঁহাপনা, কাজটা অন্য জানালাগুলোর মতো নিখুঁত হয়েছে কিনা।

সুলতান ধাঁধায় পড়লেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও ওই নিরানব্বইটি জানালার মধ্য থেকে সেই জানালাটিকে আর খুঁজে বের করতে পারলেন না। আগের এবং সদ্য তৈরি জিনিস চোখে দেখলেই ধরা যায়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সুলতান সদ্য নির্মিত জানালাটাকে চিহ্নিত করতে পারলেন না।

আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না, আলাদিন, কোনটার কাজ তুমি সমাধা করলে?

আলাদিন হাসতে থাকে। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এইটে।

সুলতান লজ্জিত হলেন। বললেন, তোমাকে যতই আমি দেখছি, ততই বেশি অবাক হচ্ছি বাবা। এত গুণের অধিকারী কী করে হলে তুমি?

রাত্রি অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল!

সাতশো চৌষট্টিতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হয়ঃ

সুলতান উজিরকে ডেকে পাঠালেন। একটু পরে সে কুর্নিশ জানাতে তাকে বললেন তিনি, তাকিয়ে দেখ উজির—জানালাটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

উজির এদিক ওদিক সবগুলো জানালার ওপর চোখ বুলাতে থাকে কিন্তু সেই অসমাপ্ত জানালাটিকে আর দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, সে জানালাটা কোথায় গেল, ধর্মাবতার?

সুলতান হেসে বলেন, ঐ তো, দেখতে পাচ্ছো না? আলাদিন এক লহমায় কেমন সুন্দর করে কারুকাজ করে ফেলেছে।

উজির আগেই বুঝেছিল আলাদিন এক কুশলী যাদুকর ছাড়া কিছু নয়। এবার তার ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো। বুঝতে বাকী রইলো না ছেলেটি শুধু যাদুকরই নয়, জাল ধনরত্ন বানাতেও ওস্তাদ। কিন্তু এসব কথা সুলতানকে শোনালে হিতে বিপরীত হবে। সুতরাং সে মনের কথা মনেই চেপে শুধু বলতে পারলো, খোদা হাফেজ, তার অপার লীলা বোঝা বড় ভার।

সেদিন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সুলতান আলাদিনের প্রাসাদে এসে কন্যা জামাতার সঙ্গে অবসর বিনোদন করতে থাকেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন বাহারী জিনিসের আমদানী দেখে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি।

অপরিমিত সুখ বিলাসের মধ্যে কাল কাটাতে থাকলেও আলাদিন কিন্তু তার শৈশবের দারিদ্র্য দুর্দশার বীভৎস চিত্র কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে বুঝতে পারে, এই শহরেরই সর্বত্র কত নিরন্ন অসহায় পরিবার এক টুকরো

রুটির জন্যে অসহ ক্ষুধা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। ভাবতে ভাবতে এক-এক সময় সে অন্য জগতে হারিয়ে যায়। সেই সুরম্য অট্টালিকার বিলাসমহলে তার দেহটা পড়ে থাকলেও মন কিন্তু উধাও হয়ে যায় সর্বহারাদের পাশে। এবং শুধু এই কারণে প্রায় রোজই সে তার নফরদের হাতে দিনারের তোড়া দিয়ে বলে, যা পথে-ঘাটে যাদের দেখবি দারুণ দুর্দশা—তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, আসবি এগুলো।

এইভাবে দরিদ্রদের মধ্যে দুহাতে অর্থ বিলিয়ে খানিকটা তৃপ্তি বোধ করে সে। অভাব অনটনের দুঃখ অনেক। কিন্তু প্রাচুর্যের যন্ত্রণাও বড় কম নয়। আলাদিন অহরহ দগ্ধ হতে থাকে। দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের সঙ্গে তার এত বৈভব-বৈষম্য সে বুঝি আর সহ্য করতে পারে না।

আলাদিনের নির্দেশে তার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রতিদিন হাজার হাজার দীন ভিখারীকে পাত পেড়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হলো। আলাদিনের এই সহৃদয় বদান্যতা সারা শহরের আপামর মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগলো না। চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠতে থাকলো। এমন দয়ালু দাতা জামাই পেয়েছেন সুলতান। সবাই দুহাত তুলে আলাদিন বুদুরের নামে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে। ওরা যেন শতায়ু-সুখী হয়।

এবার আমরা সেই মূর যাদুকর বুড়োটার দিকে চোখ ফেরাচ্ছি ঃ

লোকটা সেই পর্বত গুহায় আলাদিনকে আটক করে স্বদেশে মরোক্কোয় প্রস্থান করলো। আলাদিন তখন খিদে তেষ্টায় প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় সেই পাহাড় তলদেশের অন্ধকূপ গুহায় মৃত্যুর মুহূর্ত গুণতে থাকে। বুড়োটা খুব ভাল করেই জানতো, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে আলাদিন। একটি অবোধ অসহায় শিশুকে ঐ ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সে সচ্ছন্দে স্বগৃহে ফিরে আসতে পারলো। তার নিষ্ঠুর কসাই প্রাণে এতটুকু মমতা সে কখনও পালন করেনি জীবনে। আলাদিনের জীবন-মৃত্যু নিয়ে আদৌ চিন্তিত বা বিচলিত বোধ করেনি। তার মনে তখন হাহাকার উঠেছে—যাদুচিরাগটি কব্জায় না পাওয়ার শোকে।

দিন যায়। মূরের মনের খেদ আর মেটে না। ইস্, হাতের মুঠোয় পেয়েও সে হারিয়েছে। আর একটু হলেই সে আলাদিনের কাছ থেকে চিরাগটা ছিনিয়ে নিতে পারতো। সে চেয়েছিল গুহার নিচে থাকতে থাকতে আলাদিনের কাছ থেকে চিরাগটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে পাথর-বন্দী করে মেরে ফেলবে। সেইজন্যে সে তাকে দু একটা চড়-চাপড় দিয়ে একটু ভয় দেখিয়ে বাতিটা হাতের মুঠোয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়িয়ে গেল। কে জানে মার খেয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গুহাগৃহের দরজার চৌকাঠে গিয়ে পড়ে যাবে। সিঁড়ির নিচে নামার তো তার এক্তিয়ার নাই। এবং এও বুঝতে পেরেছিল, আলাদিন একবার ওপরে উঠতে পারলে আর তাকে পাত্তা দিত না। কারণ চিরাগ সম্বন্ধে তার মাত্রাধিক আগ্রহ দেখে সে সন্দেহ করেছিল

নিতান্তই তার মধ্যে কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে। তা না হলে কালি-ঝুলি মাখা একটা তামার প্রদীপ নিয়ে এত ঝামেলা করছে কেন সে।

বুড়ো যাদুকর তার নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই কপাল চাপড়ায়। কিন্তু চিরকালের মতো চিরাগটা পাওয়ার আশা অন্তর্হিত হওয়া সত্ত্বেও তার শোক আর সে কাটাতে পারে না কিছুতেই।

বেশ কিছুদিন পরে বুড়ো মুর তার যাদুদণ্ড আর বালীর ঝুলিটা নামিয়ে নিয়ে টেবিলে বসে। বালীগুলো টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে দণ্ডটা দিয়ে মন্তর-তন্তর আওড়াতে আওড়াতে আঁকিবুকি কাটতে থাকে। উদ্দেশ্য, আলাদিন কী ভাবে সেই পর্বত-গুহায় প্রাণ ত্যাগ করেছে, এবং যাদুচিরাগটাই বা এখন কোথায় পড়ে আছে তা নিরূপণ করা।

বার বার আঁকিবুকি কেটে কেটে সে হুঙ্কার ছাড়তে থাকে, বল, জলদি করে বল লাঠি, আলাদিন কবে মরেছে আর চিরাগটাই বা কোথায় পড়ে আছে ?

কিন্তু লাঠিখানা বার বার ছিটকে বেরিয়ে যেতে থাকে। যাদুকরের কথার কোনও জবাব দিতে পারে না।

মুরের মনে সন্দেহের কালো ছায়া নেমে আসে। তবে কী গণনায় ভুল হচ্ছে। তবে কী আলাদিন এখনও জীবিত ?

যাদুদণ্ড ইঙ্গিতে সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, আলাদিন মরেনি। সে এখন বহাল তবিয়তে, চীন সুলতানের কন্যাকে শাদী করে, সুখ-বিলাসের মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। আর যাদু-চিরাগ ? সে তো তারই দখলে আছে এখন। তার দৌলতে এখন সে সুলতানের প্রাসাদের পাশে পেল্লাই একখানা চমৎকার চোখ ঝলসানো প্রাসাদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সে এখন সুলতান-জামাতা। শুধু তাই নয়, তার দান-ধ্যানে দেশের মানুষ তাকে মহাজন বলে সম্মান করে। সে আর এখন দীন ভিখারী আলাদিন নয়। তাকে এখন আমির আলাদিন বলে লোকে। সে এখন দীনদয়াল আলাদিন। লোকে তাকে অনাথের নাথ অগতির গতি একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। সে সবই তার এখন ঐ চিরাগের কল্যাণে।

হুম বুঝলাম, শয়তান বদমাইশটা আমারই অস্ত্রে আমাকে ঘায়েল করেছে। আমার হকের ধন আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাদশাহী সুখ-বিলাসে সে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি শয়তানের শয়তান—মুর যাদুকর। তুমি কত সেয়ানা হয়েছ আলাদিন, আমিও তা দেখবো। তোমাকে আমি কী করে খতম করি একবার দেখ।

আর ক্ষণমাত্র মরোক্কোয় অপেক্ষা না করে সে চীনের উদ্দেশে পথে বেরিয়ে পড়ল। মন্ত্রবলেই তার বাহুতে বোধহয় ডানা গজিয়েছিল, তা না হলে মরোক্কো থেকে চীন তো কম দূরের পথ নয়, সে এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছলই বা কী করে ?

আলাদিনের সুরম্য প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকের জ্বালা আরও বেড়ে যায়। ভাবে, এই প্রাসাদ ঐশ্বর্য সুখ-বিলাস উপকরণাদি সবই তার হকের

সম্পত্তি। আলাদিন শয়তান বেল্লিকটা তাকে ঠকিয়ে আজ সে তার ভুয়ো মালিক হয়েছে। এর উপযুক্ত সাজা তাকে দেবই দেব আমি।

শহরের একপ্রান্তে একটা সরাইখানায় উঠেছে সে। সেদিনের মতো সরাইখানা ফিরে গিয়ে মাথায় ফন্দী আটতে লাগলো—কী ভাবে শয়তানটাকে শায়েস্তা করা যায়। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও মতলবই সে আঁটতে পারলো না। পরদিন আবার গেল সে আলাদিনের প্রাসাদের সামনে। কিন্তু অতবড় প্রাসাদে তার কোন্ কামরায় আলাদিন থাকে এবং সে কামরার কোথায় কোন্ বাক্সে তোরঙ্গে চিরাগটিকে সে লুকিয়ে রাখে তাই বা কে বলে দেবে তাকে। আর বললেই বা কী? ঐ প্রাসাদের কড়া প্রহরা ভেদ করে অন্দরেই বা প্রবেশ করতে পাববে কে?

সেদিনও সে ব্যর্থ মন নিয়ে সরাইখানায় ফিরে আসে। যাদুদণ্ড আর বালীর ঝোলাটা বের করে টেবিলের ওপরে বালীগুলো ছড়িয়ে দেয়। কাঠিকে দিয়ে আঁকি-বুকি কাটতে কাটতে মন্ত্র আওড়ায়। দণ্ডকে প্রশ্ন করে, বল বেটা, আলাদিন কোথায় কোন্ ঘরে শুয়ে থাকে। এখন সে কোথায়? চিরাগটা কী তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে না? না, প্রাসাদেই কোথাও লুকিয়ে রাখে?

বালীর লিখন পড়ে বুড়ো শয়তানটার চোখ নেচে উঠে। আকর্ণ বিস্তৃত দাঁত বের করে বিকটভাবে হাসতে থাকে—হা হা হা। এবার বাছাধন, যাবে কোথায়?

আলাদিন সেদিন শিকারে চলে গেছে। যাবার সময় সে চিরাগটা দেরাজে তালা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছে। টেবিলের ওপর রেখেই খেয়ালের ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

আলাদিন প্রায়ই সদলবলে শিকারে যায়। বুদুরকেও সে সঙ্গে নিতে চেয়েছে প্রতিবার। কিন্তু শান্ত নিরীহ প্রকৃতির বুদুর শিকারে কোনও মজা পায় না। তাই সে প্রাসাদেই থেকে যায়। প্রতিবারই। আলাদিন অবশ্য দিন সাতেকের বেশি দেরি করে না। এই ক'টা দিন স্বামী-চিন্তায় বিভোর থাকে সে। দিন কাটাতে তার খুব একটা খারাপও লাগে না। সব সময় যে কাছে কাছে থাকে সে যদি কখনও-সখনও চোখের আড়াল হয় তবে আরও মধুর বলে মনে হয় তাকে।

মুর যাদুকর গণনায় বুঝতে পেরেছিল, আলাদিন শিকারে গেছে। ফিরতে দিনকয়েক দেরী হবে। এবং চিরাগটা সে তার শোবার ঘরের টেবিলেই রেখে গেছে ভুল করে।

এই মওকা। শয়তানটা প্রায় ছুটতে ছুটতে বাজারে যায়। চিরাগের দোকানে ঢুকে বলে বেশ ঝকঝকে সুন্দর সুন্দর তামার চিরাগ দাও এক কুড়ি।

দোকানি তাকে নানা আকারের নানা বাহারের চিরাগ দেখায়। বুড়োটা বলে, ঠিক আছে সবগুলোই আমার এই ঝুলিতে ভরে দাও। কত দাম?

দোকানির সঙ্গে সে আর দাম নিয়ে দরাদরি করে না। যা সে চায় তাই

গুণে দিয়ে রাস্তায় নেমে হন হন করে হাঁটতে থাকে আলাদিনের প্রাসাদের দিকে। আর মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ে, চিরাগ চা-ই, চি-রা-গ নেবে গো? নতুন চিরাগের বদলে পুরানো দিলে বদল হবে—

পাড়ার ছেলেরা বুড়োর অদ্ভুত ধরনের সুর করে হাঁক ডাকে মজা পেয়ে তার পেছনে লাগে। পাগল পাগল বলে ক্ষেপায়। কিন্তু ধূর্ত যাদুকর বালকদের ঠাট্টা মজাতে কর্ণপাত করে না। সে সমানে হাঁকতে হাঁকতে অগ্রসর হয়, চিরাগ নেবে গো, চি-রা-গ—পুরানো চিরাগের বদলা নতুন চিরাগ মিলবে—চিরাগ নেবে, চিরাগ চা-ই—

শাহজাদী শূন্য প্রাসাদের বাতায়ন-পাশে বসে বাইরের পথচারীদের যাওয়া-আসা লক্ষ্য করছিল। এমন সময় একটা জগঝম্পের আলখাল্লা পরা একটা কোথাকার কুৎসিত লোলচর্ম বুড়ো ফিরিওয়ালার পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ছেলে-ছোকরাকে হুটোপুটি করতে দেখে বুদুরের অন্তরের কিশোর প্রাণ নেচে ওঠে। বড় মজা পায়।

লোকটার কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কাঁধে একটা বিরাট ঝোলা। একহাতে একখানা ত্রিভঙ্গাকৃতির যষ্ঠি, অন্য হাতে একটি ঝকমকে তামার নতুন চিরাগবাতি। সুর করে হাঁক ছাড়ে, চি-রা-গ নেবে গো—চিরাগ—। পুরানো চিরাগ বদল করে নতুন চিরাগ দেবো।

বুদুরের পাশে সখীরাও খিল খিল করে হাসে। মজা পায়, ওমা লোকটা বলে কী? পুরানো চিরাগ বদল করে নতুন চিরাগ দেবে?

বুদুর বলে, ঐ জন্যেই তো ছেলেগুলো ওর পেছনে লেগেছে। লোকটার বোধ হয় সত্যিই মাথা খারাপ, না হলে নতুন জিনিস দিয়ে কেউ পুরানো জিনিস দিতে চায়।

একজন সহচরী বলে, ওঃ, তাই বুঝি ছেলেগুলো পাগল পাগল বলে বুড়োটাকে ক্ষেপাচ্ছে!

আর একজন পরিচারিকা বলে, আমাদের মালিকের ঘরের টেবিলে একটা কালিঝুলিমাখা পুরানো চিরাগ দেখেছি আজ। তা শাহজাদী, ওটাকে পালটে নিলে কেমন হয়?

বুদুর বলে, তাই নাকি? তোদের মালিকের টেবিলে আছে? কই, নিয়ে আয় দেখি।

মেয়েটি ছুটে গিয়ে চিরাগটা নিয়ে আসে। বুদুর হাতে নিতে চায় না। দূর দূর, ওদিকে রাখ, আমার পোশাকে তেলকালি লেগে যাবে। উফ্‌ কী নোংরা! যা ওটাকে খোজার হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দে বুড়োটার কাছে! এই রকম একটা জবরজং পুরানো চিরাগের বদলে যদি একটা নতুন পাওয়া যায়—ক্ষতি কী।

মেয়েটি এক খোজার হাতে দিয়ে বুড়োর কাছে পাঠায়। খোজাটা বাম হাতের দুটি আঙুল দিয়ে আলগোছে ধরে বাতিটাকে নিয়ে যেতে যেতে বলে যতো সব বিদঘুটে কাণ্ড!

এই রকম একটা পোড়-খাওয়া পুরানো নোংরা পিদিমের বদলে একটা আস্ত আনকোরা বাতি দেবে নাকি সে। সব বুজরুকি। খালি খালি হয়রানি করছো তোমরা, দেখো, লোকটার অন্য ধান্দা আছে। বাতিটা হাতিয়ে নিয়ে তখন নতুন বায়না ধরবে। বলবে সংগে কিছু নগদ ছাড়ো, না হলে নতুন মাল পাওয়া যায় নাকি?

পরিচারিকাটি বলে, তোমার অত বকবক করার কী আছে, যা হুকুম করছি তামিল কর।

খোজা পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, কী? কী বললে? তুমি আমায় হুকুম করছ? তুমি কি আমার মালকিন নাকি? এই রইলো তোমার চিরাগ। ওরে আমার হুকুমদার রে! তুইও যেমন এক বাঁদী আমিও তেমনি বান্দা। আমাকে তুই হুকুম করিস কিসের জোরে রে।

মেয়েটি সুযোগ পেলেই এই খোজাটিকে চটায়। বেশ মজা পায়। মুখে ভীষণ গাম্ভীর্য টেনে বলে, দেখ নফর, বাতি ওঠা, যা বলছি শোন, তা না হলে তোর আজ গর্দান নেব।

—কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? তুই আমার গর্দান নেবার কে? আমি পারবো না—

—কী, পারবি না? তবে শাহজাদীকে গিয়ে বলি, নফর আপনার হুকুম তামিল করতে চাইছে না—

খোজাটা মুহূর্তে কেঁচোর মতো গুটিয়ে যায়, অ, তাই বল। স্বয়ং শাহজাদীর হুকুম। তা এতক্ষণ ন্যাকরা করছিলি কেন রে মুখপুড়ি।

এই বলে সে ছো মেরে চিরাগটা তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বুড়োটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—এটার বদলে দেবে একটা?

বুড়োটা হতবাক হয়ে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে যাদুচিরাগটা। হ্যাঁ, সেই চিরাগ—তার সারাজীবনের স্বপ্নের ধন। অবশেষে এতদিন পরে তার হাতের নাগালের মধ্যে এসেছে। কি এক অপূর্ব শিহরণে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। তখনও তার মনে পাওয়া না পাওয়ার সংশয় দুলছে। যদি এইমাত্র লোকটা বলে, না থাক তোমার চিরাগটা পছন্দসই মনে হচ্ছে না, নেব না। অথবা, আলাদিন যদি ধূমকেতুর মতো এই মুহূর্তে এসে হাজির হয় এখানে। যদি কোনও কারণে তার শিকার অভিযান বাতিল করে প্রাসাদে ফিরে আসে? ওরে সর্বনাশ তা হলে তো সে ধনে-প্রাণে মারা যাবে! চিলের মতো ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নেয় সে চিরাগটা। খোজাটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটা কী কিছুই অনুধাবন করতে পারে না। লোকটা কী একটা ঠগ? এইভাবে লুব্ধ করে লোকের জিনিসপত্র ঘর থেকে বের করে আনিয়ে ছেনতাই করে? কিন্তু না, তা নয়। পরমুহূর্তেই সে তার ভুল বুঝতে পারলো। বুড়োটা তার ঝোলা থেকে আরও ঝকঝকে একটা চিরাগ বের করে খোজার হাতে গুঁজে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে রাস্তার বাঁকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। ছেলেগুলো

আর তাকে ধাওয়া করে সুবিধে করতে পারে না। বদরের আর তার সহচরীরা এই দৃশ্য দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

একটানা ছুটতে ছুটতে যাদুকর বুড়োটা সোজা চলে আসে তার সরাইখানার ঘরে। যাদুচিরাগটাকে বের করে ঘষতেই সেই আফ্রিদি দৈত্যটা এসে হাজির হয় সামনে। বলে, আমি ত্রিভুবনের অধিপতি। আমার তুল্য শক্তিধর আর কেউ নাই। একমাত্র আপনার হাতের এই চিরাগ ছাড়া কেউ আমার প্রভু নয়। এই চিরাগ এখন আপনার কব্জায়। সুতরাং এখন আপনিই আমার একমাত্র মালিক, হুকুম করুন, হুজুর, কী করতে হবে। বান্দা প্রস্তুত।

যাদুকর বললো, ওরে বাবা, অত বকিসনে, সব আমি জানি। নে এখন চটপট যা বলি করে ফেল দেখি।

—আজ্ঞা করুন, মালিক।

—শোন বান্দা, এর আগে তোর মালিক ছিল আলাদিন।

—যথার্থ বলেছেন, হুজুর।

—তার হুকুমে এক বিশাল প্রাসাদ এনে বসিয়ে দিয়েছিস সুলতানের প্রাসাদের পাশে।

—বিলকুল সাচ্ বাত্।

—এখন আমার হুকুম, ঐ প্রাসাদটা যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে আলতো করে তুলে নিয়ে গিয়ে আমার স্বদেশ মরোক্কোর এক নির্জন বনাঞ্চলে স্থাপন করে রেখে আয়। তারপর আমাকেও নিয়ে যাবি সেখানে।

—জো হুকুম মালিক, আমি এখুনি করে দিচ্ছি।

বুড়োটা বলে, তা কতক্ষণ সময় লাগবে তোর?

আপনার চোখ দুটো একবার বন্ধ করে আবার খুলতে যতটুকু সময় লাগবে তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে না, হুজুর।

—ঠিক আছে।

এক পলকের মধ্যে ফিরে এসে আফ্রিদি জানালো, আপনার হুকুম তামিল করেছি মালিক। এবার আমার পিঠে চেপে বসুন। আপনাকে এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি সে প্রাসাদে।

আফ্রিদি হামাগুড়ি দিয়ে বসতে যাদুকরটা তার পিঠে চেপে বসলো এবং পলকের মধ্যে সে তাকে নিয়ে গিয়ে মরক্কোর এক নির্জন জঙ্গলের এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিল।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছেষট্টিতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে:

পরদিন সকালে সুলতান কন্যার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বদরের প্রাসাদে আসেন। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রাসাদ কোথায়? এ তো তার সেই ফাঁকা ময়দান।

ঠিক আগে যেমনটি ছিল তেমনি খালি পড়ে আছে। কে বলবে গতকাল সন্ধ্যাতেও এক বিশাল গগনচুম্বী ইমারত মাথা তুলে সদর্পে দাঁড়িয়েছিল।

সুলতান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। দুহাতে তিনি চোখ রগড়াতে থাকেন। কিন্তু না, এ তাঁর ভ্রম নয়। সত্যিই সেখানে প্রাসাদ বলে কিছু নাই। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন তিনি। সর্বনাশ, তার বুকের কলিজা নয়নের মণি বুদুর। সে কোথায় গেল ? তার কী হলো ?

এবারে আর তার বুঝতে বাকী থাকে না, সবই সেই শয়তান যাদুকর আলাদিনের ভেল্কী। সুলতান ছুটে ফিরে আসেন তাঁর নিজের প্রাসাদে। ছাদের ওপরে উঠে আবার ভাল করে দেখতে থাকেন। কিন্তু না, তার দেখার কোনও ভুল নয়। পাশে ময়দান, সেখানে প্রাসাদ বলে কিছুই নাই। কখনও যে ছিল তারও কোনও চিহ্নমাত্র নাই।

কন্যার শোকে পাগল-প্রায় সুলতান নিজের চুল দাড়ি ছিঁড়তে থাকেন, ইয়া আল্লাহ, এ কী করলে তুমি ? কী এমন পাপ আমি করেছিলাম, আমার একমাত্র চোখের মণি মেয়েকে তুমি কেড়ে নিলে ?

একটি ছোট শিশুর মতো তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। উজির এসে পাশে দাঁড়ায়। সুলতান এবার হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে উজির। আলাদিন শয়তানটা সত্যিই একটা যাদুকর ছিল। সে আমাকে ধোকা দিয়ে শাহজাদীকে শাদী করে উধাও হয়েছে।

উজির মনে মনে হাসে। মুখে বলে, আল্লাহর অপার লীলা। তিনি যা করবেন তা তো কেউ এড়াতে পারবে না, জাঁহাপনা ! কিন্তু আমি তো শুনেছি আলাদিন দলবল নিয়ে শিকারে গেছে।

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়েন, এখুনি সেপাই পেয়াদা পাঠাও। যেখানে পাও তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এস আমার সামনে। আমি তার গর্দান চাই।

উজির এবার সাহস করে বলতে পারে, জাঁহাপনাকে আমি অনেক আগেই সতর্ক করে বলেছিলাম, ছেলেটি এক ধূর্ত ঠগ যাদুকর। কিন্তু সেদিন ধর্মাবতার পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে আমাকে ভৎর্সনা করেছিলেন।

একথার কোনও জবাব দিতে পারেন না সুলতান। মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে উজিরের কথায় সায় জানান শুধু।

উজির বলে, ঠিক আছে আমি এখুনি সিপাই সান্ত্রী পাঠাচ্ছি। যদি সে সত্যিই শিকারে গিয়ে থাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতষট্টিতম রজনী :

আবার গল্প শুরু হয় :

উজিরের আদেশে সিপাই সর্দার শ'খানেক সিপাই নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় শহর ছেড়ে। বেশি দূর তাদের যেতে হয় না। শহর ছাড়িয়ে একটা প্রান্তর,

সেটা পার হলে এক গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গলেই তাঁবু খাটিয়ে শিকার করতে আসে আলাদিন।

সিপাই সর্দার আলাদিনের সামনে পেঁছে যথা মর্যাদায় কুর্নিশাদি জানিয়ে সুলতানের ফরমাস জানায়।

—আপনি আমার গুস্তাকী মাফ করবেন, মালিক। আপনার বদান্যতা দেশের কোনও মানুষই ভুলবে না কোনও দিন। আপনি ধনী দরিদ্র সকলের প্রাণের দোস্ত। আপনার মতো দরদী বন্ধু এ জগতে হয় না। কিন্তু আমরা সুলতানের নফর, হুকুমের দাস। তাঁর আদেশ অমান্য করার শক্তি আমাদের নাই।

আলাদিন হাসে, বেশ তো কী তাঁর আদেশ বল, শুনি।

সর্দার ইতস্ততঃ করে, সে আদেশ কী করে আপনাকে শোনাবো, মালিক। সে যে মুখে আনতেও জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি, তোমরা বড়ই বিব্রত বোধ করছ। কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন নাই। দ্বিধাহীন চিত্তে অসঙ্কোচে বল, কী তাঁর হুকুম। সুলতানের আদেশ তোমাদের যেমন আমারও তেমনি শিরোধার্য। আর কুণ্ঠিত হয়ো না বন্ধু, বল, কী তাঁর আদেশ।

সিপাই সর্দার কোনও রকমে বলতে পারে, কী কারণে জানি না, সুলতান আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর হুকুম, আপনাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে, টানতে টানতে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে। আপনি মহামান্য আমির, সুলতানের জামাতা—এ কী কঠিন কাজ আমাদের ঘাড়ে তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন, বলুন মালিক। এখন আমি কী করি।

আলাদিন বলে, কী আবার করবে? সুলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই প্রভুভক্ত নফরের একমাত্র কাজ— তাই তোমরা করবে। এস আমার কোমরে দড়ি বাঁধ, আমি প্রস্তুত।

আলাদিন তার ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। সিপাইরা তার কোমরে দড়ি বেঁধে প্রাসাদে এনে হাজির করলো। আসার পথে আলাদিনের এই বন্দীদশা দেখে শহরবাসীরা আহত হলো সবাই, চোখের জল ফেললো অনেকে। কিন্তু সুলতানের হুকুম, মুখে কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। কী কারণে জামাতার এই সাজা, জানবার জন্য সারা শহর ভেঙ্গে পড়লো প্রাসাদের চারপাশে। লোকে লোকারণ্য। কেউ কিছু বলতে পারে না, সুলতান জামাতার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন।

সেপাইরা আলাদিনকে টানতে টানতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাইরে তখন উত্তাল জনসমুদ্র। একটা চাপা গর্জন, বেশ বুঝতে পারা যায়, জনতা রোষে ফেটে পড়তে চাইছে।

আলাদিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেও একটি মানুষও প্রাসাদের সামনে থেকে নড়ে না। বরং ক্রমশঃ ভিড় বাড়তে থাকে।

ধীরে ধীরে জনতা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা জিগির তোলে, দীন-দয়াল

মালিক, আলাদিনের মুক্তি চাই। সাচ্চা হীরা আলাদিনকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

সুলতান রাগে ফুঁসছিলেন। আলাদিনকে দেখামাত্র তিনি কোনও রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই হুকুম দিলেন, কোতল কর। আর একমুহূর্ত আমি এই শয়তান ঠগের মুখ দর্শন করতে চাই না।

জল্লাদ দোতলার ছাদে নিয়ে গেল আলাদিনকে। কারণ জনতা তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বাগানের বাইরে ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে আলাদিনকে সে হাঁটু গেড়ে বসতে বললো। আলাদিন এতটুকু বিচলিত নয়। সে জানে সে কোনও অপরাধ করেনি, বিনা দোষে যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিতে হয় সে নেবে। তারপর পাপের ফল দণ্ডদাতা ভোগ করবে—এও সুনিশ্চিত।

হাঁটু গেড়ে সে বসে ঘাতকের খাড়ার আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়। জল্লাদ তার চোখে কাল কাপড় বেঁধে দিয়ে খাড়া উঁচিয়ে ধরে। কিন্তু নিচে থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, বন্ধ কর, রুখে যাও।

ঘাতক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার সে খাড়া বাগিয়ে ধরে। কারণ সুলতানের হুকুম তাকে তামিল করতেই হবে। নিচে থেকে জনতা মারমুখী হয়ে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে ঘাতককে লক্ষ্য করে, মালিক আলাদিনের গর্দান নিলে রক্তের নদী বয়ে যাবে। বন্ধ কর, খাড়া ফেলে দাও ঘাতক।

আবার জল্লাদ উদ্যত খাড়া নামিয়ে নিয়ে সুলতানের দিকে তাকায়। সুলতান তখনও তার গোঁ-তে অটল, হুকুম তামিল কর, বেতমিজ।

এবার মারমুখী জনতাকে আর বাগে রাখতে পারলো না সিপাই পেয়াদারা।

সুলতান প্রমাদ গণলেন। এ জনতার রোষ শান্ত হবার নয়। জল্লাদকে তিনি নিরস্ত হতে হুকুম দিলেন, ঠিক আছে, শহরবাসীর অনুরোধে, এ যাত্রায় আমি ওর প্রাণভিক্ষা দিলাম।

এবার জনতা শান্ত হলো খানিকটা।

সুলতানের সামনে আলাদিনকে হাজির করা হলো। তিনি বললেন, জনতার দাবীতে তুমি এবারের মতো প্রাণে রক্ষা পেলে। কিন্তু আমার আদরের দুলালী বুদুরকে যদি ফিরিয়ে না দাও আমি তোমাকে রেয়াৎ করবো না।

আলাদিন বুঝতে পারে না, বুদুরকে ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন উঠছে কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, শাহজাদী বেগম হলেও সে আপনারই কন্যা আছে। আপনি যেমন নিত্য দুবেলা তাকে দেখতে যান তেমনি যাবেন। আপনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে কী করবেন? আর কেনই বা নেবেন? আমার কী গুস্তাকী, জাঁহাপনা?

সুলতান বলে, কেন, তুমি কিছুই কি জান না?

—না, হুজুর।

সুলতান বলেন, ওপাশের জানলার পর্দা সরিয়ে দেখ, তোমার প্রাসাদ কোথায় গেল?

আলাদিন দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। সত্যিই সেই আফ্রিদির তৈরি

করা প্রাসাদটার কোনও চিহ্নমাত্র নাই। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে, এ সেই মরক্কোর যাদুকরটার শয়তানী। সে ছাড়া এ অঘটন আর কেউ ঘটাতে পারে না।

সুলতান বললেন, শোন আলাদিন, তোমার প্রাসাদ-টাসাদ চুলোয় যাক। আমার মেয়েকে তুমি ফেরত এনে দাও। তা না হলে এ যাত্রা তোমার গর্দান বাঁচলেও আখেরে তোমাকে আমি ছাড়বো না।

আলাদিন বলে, জাঁহাপনা, কেউই কার ভাগ্য এড়াতে পারে না। সুতরাং এও আমি জানি আমার নসীবে যা লেখা আছে তা কখনই খণ্ডন করতে পারবো না। আর মৃত্যুর কথা বলছেন? ও ভয়ে আমি ভীত নই কখনোই। তবে শাহজাদী বুদুর যেমন আপনার প্রাণাধিকা কন্যা আমারও তেমনি বুকের কলিজা। তাকে ছাড়া আমিও প্রাণে বাঁচতে পারবো না। যেভাবেই হোক, তার সন্ধান আমাকে করতেই হবে।

সুলতান বলেন, ওসব ছেঁদো কথা রাখ। আমি তোমাকে চল্লিশ দিন সময় দিলাম। তার মধ্যে শাহজাদীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তুমি—এই আমার হুকুম। তা না হলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তুমি পালিয়ে থাক, আমার প্রহরীরা তোমাকে পাকড়াও করে আনবেই।

আলাদিন বললো, আমি জ্ঞানত কোনও পাপ করিনি। জানি না, কার চক্রান্তে অথবা কোন্ অভিশাপে এমন দুর্ভাগ্য আমার ঘটেছে, 'যাই হোক, আমি পথে বেরুচ্ছি। বুদুরকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে এ জীবন আমি রাখবো না।

আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে তখুনি আলাদিন নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে।

সারাদিন ধরে একটানা পথ চলে চলে এক সময় যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন কোনও গাছতলায় বসে একটু জিরিয়ে নেয়। নদীর জল আর গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটায়। তারপর আবার চলতে শুরু করে। কত গ্রাম গঞ্জ শহরে পৌঁছয়। সেখানে জনে জনে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেউ একটা বুড়ো যাদুকরকে দেখেছ? সে আমার বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে।

কেউই আলাদিনকে কোনও আলোর নিশানা বলতে পারে না। এইভাবে দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হতে থাকে। হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ে। যাদুকর মহাধূর্ত। সে যে কোথায় নিয়ে চলে গেছে বুদুরকে—কেউ কী তার হদিশ বলতে পারবে? শুধু এইভাবে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালে কী কোনও ফয়দা হবে?

একদিন এক বিশাল বিস্তৃত নদীর সামনে এসে আলাদিনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। ওপারে যাওয়ার কোনও যানবাহন নাই। অথচ নদী পেরোতে না পারলে সামনে চলার পথও নাই। কূলে বসে বসে সে ভাবতে থাকে, এ পোড়া জীবন রেখে আর কী লাভ? বুদুরকেই যদি সে না ফিরে পেল, কী হবে এ জীবনে বেঁচে থেকে?

সামনে স্রোতস্বিনীর কালো জল। সে তাকে হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে। আর কেন আলাদিন, তোমার ইহজগতের লীলা সাঙ্গ হয়েছে, এবার আমার কোলে এসে দেহ রক্ষা কর।

আলাদিন আর স্থির থাকতে পারে না। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে গগনবিদারী চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার? কী এমন পাপ আমি করেছি তোমার দরবারে—যার সাজা এইভাবে আমাকে দিলে খোদা?

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আলাদিন। সেই নদী উপকূলে ঘাসের শয্যায় গড়াগড়ি যায় তার সুকুমার সুন্দর দেহখানা। হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে থাকে। মাথার চুল ছিঁড়ে, জামা কাপড় ফালা ফালা করে ফেলে। প্রায় উন্মাদের দশা। দু হাতের তালু দিয়ে থুতনি গাল ঘষতে থাকে।

হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। আলাদিনের ডান হাতের তর্জনীতে সেই যাদুকরের দেওয়া আংটিটা পরা ছিল। পাহাড়-গুহার নিচে নামার আগে শয়তান বুড়োটা এই আংটিটা আলাদিনকে পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, যদি কখনও চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে তবে এই আংটি ঘষবে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এক দৈত্য এসে দাঁড়াবে তোমার সামনে। তাকে যা করতে বলবে, সে করে দেবে।

এই আংটির দৌলতে একদিন সে সেই পাহাড়ের মৃত্যু-গুহার ফাঁদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছিল। আজ এতদিন আংটিটা তার হাতেই আছে। কিন্তু সে-কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিল। আজ গালের সঙ্গে হাতের তালু ঘষতে ঘষতে আংটিটাও ঘর্ষিত হয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটে গেল। দৈত্য-প্রবর আবির্ভূত হলো তার সম্মুখে। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আমি আংটির গোলাম। আমার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি এখন আংটির মালিক। সেই কারণে আমার প্রভু। হুকুম করুন মালিক, কী করতে হবে, বান্দা প্রস্তুত।

আলাদিনের চোখ আশার আনন্দে নেচে উঠলো, শোনও বান্দা, আমি সেই মরক্কোর বুড়ো যাদুকরের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি। পাহাড় গুহা থেকে আশ্চর্য যাদু-চিরাগ উদ্ধার করে এনেছিলাম আমি। সেই চিরাগের বান্দা আফ্রিদি দৈত্য আমার নফর ছিল। তাকে দিয়ে আমি এক সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করিয়ে ছিলাম। চীন সুলতানের কন্যা শাহজাদী বুদুরকে শাদী করে পরমানন্দে বসবাস করছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার অসতর্কতার দোষেই ঐ শয়তানটা আমার চিরাগটা হাতিয়ে নিয়েছে। এবং তারই ফলে সে আমার বিবিকে সুদ্ধ প্রাসাদটা তুলে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে, আমি কিছুই হদিস করতে পারছি না। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা। আমার বিবি আর প্রাসাদটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, এই আমি চাই।

আলাদিনের কথা শুনে আফ্রিদি দৈত্য মাথা নিচু করে বললো, আপনার সব হুকুম আমি তামিল করতে পারি, কিন্তু এই হুকুম আপনি করবেন না মালিক, একাজ আমি করতে পারবো না।

আলাদিন অবাক হয়ে বলে, কেন ? তুমি যে বললে, কোনও কাজই তোমার অসাধ্য নয় ?

দৈত্য বললো, মর্ত্যলোকের কোনও কাজই আমার অসাধ্য নয়, কিন্তু চিরাগের মালিক আফ্রিদি দৈত্য আমার ওস্তাদ। তার কোনও কাজ আমি ভুণ্ডুল করতে পারি না।

দৈত্যের কথা শুনে আলাদিনের মন আবার হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। তবে, তবে কী উপায় হবে ? প্রাসাদটা যদি সে না নিয়ে আসতে পারে তবে আর শাহজাদী বুদুরকে উদ্ধার করা যাবে কী করে ?

দৈত্যটা বললো, আপনি যদি হুকুম করেন, আমি আপনাকে আপনার ঐ প্রাসাদের সামনে পৌঁছে দিতে পারি। তারপর যদি পারেন, আপনি উপায় করে নেবেন।

আলাদিন এবার একটু আশার আলো দেখতে পায়। বলে, ঠিক আছে, তাই কর। সেই প্রাসাদের সামনেই আমাকে পৌঁছে দাও।

দৈত্য ওকে পিঠে তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উড়ে এসে মরোক্কোর সেই নির্জন জঙ্গল প্রান্তরে রক্ষিত প্রাসাদের পাশ্চাৎ দিকে নামিয়ে দিল।

আলাদিন দেখামাত্র চিনতে পারে, এই তার সেই প্রাসাদ। বুঝতে অসুবিধে হলো না কোন্ জানালাটা তার নিজের, এবং কোন্ জানালাটা শাহজাদী বুদুরের শয়ন-কক্ষের। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে অধীর হয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো বুদুরের কামরার দিকে। কিন্তু অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল জানালায় কারো ছায়াও দেখতে পেল না আলাদিন। তবে কী, শয়তান যাদুকরটা বুদুরকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছে ? অতি সন্তর্পণে সে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে। এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে নেয়, কেউ কোথাও তাকে লক্ষ্য করছে না। অন্য কোনও লোকের দৃষ্টিতে পড়লে আশঙ্কার কিছু নাই, কিন্তু ঐ বদমাইশটার নজরে পড়লে নসীবে অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু চারিদিক নিথর নিস্পন্দ। জনমানবের কোনও সাড়া শব্দ পায় না সে। মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে আন্দোলিত তরুশাখার পত্র মর্মর শোনা যায়।

আলাদিন দুঃসহ আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে জানালার দিকে। ভেড়ার মগজ রসুইখানায় পাকাবার জন্য পাঠিয়ে এক ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন অস্থির প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে, এ তেমনি এক প্রতীক্ষা।

যাদুকরটা প্রাসাদসুদ্ধ বুদুরকে এখানে নিয়ে আসার পর থেকে শাহজাদী আলাদিনের শোকে দুঃখে কাতর হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছে। সে আর পালঙ্ক ছেড়ে ওঠে না, খায় না ঘুমায় না। তার একমাত্র চিন্তা কী করে আবার সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবে। আশঙ্কায় তার বুক কাঁপে, শয়তান বুড়োটা প্রতিদিনই একবার করে তার ঘরে আসে। অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মন ভেজাবার চেষ্টা করে। বুদুর বুড়োটার দিকে ফিরেও তাকায় না। ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কিন্তু এও বুঝতে পারে, বদমাইশটা তাকে সহজে

নিস্তার দেবে না। এখন সে মুখে মধু ঢেলে কথা বললেও কিছুদিন বাদেই তার আসল চেহারা মেলে ধরবে সে। তার পাশবিক অত্যাচারের লোলুপতা থেকে কী করে সে নিজেকে রক্ষা করবে ভাবতে পারে না।

সূর্য ঢলে পড়ে। একটু পরেই রাত্রির কালো অন্ধকার নেমে আসে। এখনও জানালায় এসে দাঁড়ালো না শাহজাদী। তবে কী সে এ ঘরে নাই? আংটিটা ঘষতেই আবার এসে দাঁড়ালো দৈত্যটা। আলাদিন বললো, আমি তো সারাদিন শাহজাদীর ঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু সে তো জানালার ধারে কাছে এল না। এখন খোঁজ নিয়ে বল, সে কোথায়? এই প্রাসাদে কী নাই?

দৈত্যটা পলকে অদৃশ্য হয়ে পলকেই আবার ফিরে এসে বলল, না হুজুর, তিনি এই ঘরেই শুয়ে আছেন। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। শয্যা ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না।

আলাদিন বললো, তুমি এক কাজ কর। এক খোজা নফরের বেশে তাকে গিয়ে বল, সে যেন একবার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়।

—জো হুকুম, মালিক!

দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেল। এক নফরের রূপ ধরে সে শাহজাদীর কামরায় ঢুকে বললো, শাহজাদী, একবার মেহেরবানী করে জানালার পাশে এসে দাঁড়ান, দেখুন বাগানে কী সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাহজাদী উঠে এসে জানালার পাশে দাঁড়ায়। এবং আলাদিনকে দেখতে পেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। ওঃ, তুমি সোনামণি, তুমি এসেছ?

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনসত্তরতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—এদিকে আরও আরও কাছে জানালার সামনে এসে দাঁড়াও সোনা, কোনও ডর নাই, ছুঁচোটা এখন প্রাসাদে নাই। কোথায় কার সর্বনাশ করতে বেরিয়েছে। সেই রাতে খানা-পিনার আগে ফিরবে না। আলাদিন জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বদুর হাত বাড়িয়ে আলাদিনের চিবুক অধর স্পর্শ করে। আদর জানায়। বলে, আমি আল্লাহর কাছে অহরহ মোনাজাত করছি, জানতাম আমার মিনতি তিনি ঠেলতে পারবেন না। কিন্তু আজই যে তোমার দেখা পাবো তাও ভাবতে পারিনি।

বদুরের ইশারায় নফর প্রাসাদের ফটক উন্মুক্ত করে দিল, শাহজাদী বললো, আর দেরি না করে চটপট ভিতরে চলে এস।

আলাদিন ঘরে আসতেই বদুর দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীর বুকে ঢলে পড়ে। কান্নায় সে ভাসিয়ে দেয় ওর বুক। আলাদিন ওকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, কেঁদ না মেরিজান, আমি যখন একবার এসে পড়েছি, ঐ শয়তান

যাদুকরটাকে আমি একবার দেখে নেব। তুমি কিছু ভেব না। এখন বল, তোমার ঘরে লুকাবার জায়গা আছে কোথাও ?

বদরু বলে, খুব আছে। ঐ যে দেখছো, মেহগনি কাঠের পেল্লাই আলমারীটা—ওটায় আমার সাজ-পোশাক থাকে। ওর মধ্যে দিব্যি তুমি শুয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারবে।

আলাদিন বলে, আরে না ঘুমোবার দরকার নাই, আজ রাতেই কেল্লা ফতে করে তোমাকে নিয়ে আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আচ্ছা হ্যাঁ, যাদু-চিরাগের কথা বুড়ো তোমাকে বলেছে কিছু ? ওটা কোথায় আছে জান ?

বদরু বলে, হ্যাঁ, বলেছে, ঐ চিরাগের যাদুতেই নাকি তুমি এই প্রাসাদ বানিয়েছিলে। আমার পোড়াকপাল, ঐ শয়তানটার ধোঁকায় ভুলে তোমার ঐ চিরাগটা আমি লোকটার কাছে পালটি করে নতুন একটা চিরাগ নিয়েছিলাম। তখন কী জানতাম ও চিরাগবাতি আলো জ্বালাবার নয়। ওর মধ্যে এমন যাদু আছে, যা দিয়ে তামাম বিশ্ব-সংসার পায়ের তলায় রাখা যায় ? আমি বুঝবো কী করে ? আমাকে তো তুমি বলনি কোনও দিন। বুড়োটা আমাকে সব বলেছে। এও বলেছে, ঐ চিরাগের মায়াবলে দুনিয়ার সব সুখ বিলাস সে আমার পায়ে এনে নিবেদন করতে পারে। শুধু একবার তার কথায় রাজি হলেই হলো। শয়তানটা কত রকম লোভ দেখায় জান ? বলে, চাও তো যে কোনও দেশের শাহেনশাহর বেগমকে এনে তোমার বাঁদী করে রাখতে পারি।'

আলাদিন হাসে, তা মিথ্যে বলেনি। ও এমনই চিরাগ, ওর যাদুতে অসাধ্য সাধন করা যায়। সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। এই যে ইমারত এর একটা জানালার কারুকার্য সাত সুলতানের ধন-সম্পত্তির চাইতেও অনেক বেশি দামী। এ সব কী কোনও মর্ত্যলোকের মানুষের চেষ্টায় সংগ্রহ হতে পারে ? থাক ওসব কথা। এখন বল দেখি, ঐ চিরাগটা কোথায় ? বুড়োটা কী কোথাও লুকিয়ে রেখে যায়, না সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে ?

বদরু বলে, আমিও অনেক কোসিস করেছি, হাতাবার, কিন্তু বুড়োটা মহা ধূর্ত ধড়িবাজ। ও বস্তু সে নিজের কাছ-ছাড়া করে না। কামিজের তলায় তলপেটে গুঁজে রাখে, সব সময়। দরজা বন্ধ করে রাতে ঘুমায়। কিন্তু তখনও ওটা ওর তলপেটেই গোঁজা থাকে।

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নাই। তোমাকে আজ খানিকটা ঢং করে অভিনয় করতে হবে।

—কী রকম ?

—লোকটা রাতে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তো ?

—ও বাবা, তা আর আসবে না। রোজই তো ও মনে বড় আশা নিয়ে আমার ঘরে আসে। নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে আমাকে শয্যা-সঙ্গিনী করতে চায়। কিন্তু আমি যখন ওর দিকে বিষনজর হেনে বলি, জানে যদি বাঁচতে চাও, আমার ঘর ছেড়ে সিধে বেরিয়ে যাও, তখন আর একটি কথা বলতে পারে না। ভীতু পেঁচার মতো পালিয়ে যায়।

আলাদিন বলে, বহুত আচ্ছা। কিন্তু আজ তোমাকে অন্য চালে চলতে হবে। চুল টুল বেঁধে, প্রসাধন প্রলেপ লাগিয়ে খুব দামী দামী গহনা পর এবং জমকালো সাজ-পোশাক পরে একেবারে কামাতুরা পটের বিবিটি সেজে বসে থাকবে। লোকটা ঘরে ঢোকা মাত্র উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে পালঙ্কে এনে বসাবে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে, তোমার মত বদলেছে। মনে আর কোনও খেদ নাই। এখন তার অঙ্কশায়িনী হতে তোমার আর কোনও বাধা নাই।

বদুর আলাদিনের মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে, কী যে আজে বাজে অলুক্ষণে কথা সব বল তার ঠিক নাই।

—আহা-হা, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন, আগে পুরোটা শোন, তারপর যা বলার বলবে।

—বেশ বল কিন্তু বাপু, তোমাকে আগেই বলে রাখছি, ওই শয়তানটাকে নিয়ে আমি শুতে পারবো না। তুমি হয়তো মতলব এঁটেছো, বুড়োটা ঘুমিয়ে পড়লে, ওর তলপেট থেকে চিরাগটা বের করে নিতে পারবো। কিন্তু অত সহজ ভেবো না। বুড়োর ঘুম খুব পাতলা! খুট করে ছোট্ট একটা আওয়াজ শুনলে শুয়ে শুয়েই সে গোঙায়—এ্যাই কে র‍্যা ?

আলাদিন বলে, তুমি আমাকে অত মাঠো ভাবলে কী করে, সোনা। বুড়ো-হাবড়াদের নিদ খুব পাতলা হয়, আমি জানি। ও পাশে যাবো না আমি। বুড়োটাকে এমন দাওয়াই দিতে হবে যাতে আর ইহজীবনে ওর ঘুম না ভাঙে।

—বিষ ?

বদুরের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। আলাদিন বলে, হ্যাঁ বিষ।

—কিন্তু এখানে কোথায় পাবে বিষ। একেবারে জনমানব শূন্য জঙ্গল জায়গা। দু-চার দশ দিনের পথ হাঁটলেও কোনও গ্রাম গঞ্জ বা দোকান-পাট মিলবে না। বিষ কোথায় পাবে ?

আলাদিন বলে, তুমি সেজে-গুজে তৈরি হও। সে ব্যবস্থা আমি করবো। শুধু কায়দা করে খাবারের সময় সরবত বা মদের পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

বদুর গোসল করতে হামামে ঢোকে। আলাদিন হাতের আংটি ঘষে। দৈত্য এসে হাজির হয়। আলাদিন হুকুম করে, জহর ঠোঁটে লাগানো মাত্র ঢলে পড়বে এমন জহর চাই খানিকটা। এখুনি।

দৈত্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার আবির্ভূত হয়ে আলাদিনের হাতে একটা পুরিয়া তুলে দিয়ে বলে, এর মধ্যে যে বিষ আছে তাতে লক্ষ্য মানুষকে মারার পক্ষে যথেষ্ট।

হামাম থেকে ফিরে এলে আলাদিন বিষের পুরিয়াটা বদুরের হাতে দিয়ে বলে, খুব সাবধান, ভুলেও কখনও না ধুয়ে হাত মুখে লাগাবে না। এর এক কণামাত্র বিষ বুড়োকে মারার পক্ষে যথেষ্ট। কায়দা করে যাদুকরটার পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে হবে খানিকটা। কিন্তু কী করে দেবে ? লোকটা যদি তোমার হাতে কিছু একটা আছে বুঝতে পেরে সন্দেহ করে ?

বুদুর বলে, সে ভাবে হাতে আমি ধরবো না। তুমি বলছ, এতো মারাত্মক বিষ। কণামাত্র জিভে ঠেকলে অক্কা পাবে। তাহলে পুরিয়াটা খুলে, আমার ডান হাতের তর্জনীর ডগায় খানিকটা মাখিয়ে নিই। সরবতই থাক আর সরাবই থাক, সে পেয়ালায় আঙগুলটা আলতো করে ডুবিয়ে দিতে অসুবিধে হবে না আমার।

আলাদিন বলে, আর, ধর যদি বুড়োটা বলে, তবিয়ত ভাল নাই, আজ কিছু খাবো না—তখন?

বুদুর বলে, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নাই। আমি নিজে থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগের ঢং করবো। তাতে তো চনমন করে উঠবে বাঁদরটা! আমার মুখের কাছে এগিয়ে আনতে যাবে ওর ঠোঁট, ঝুলে-পড়া তোবড়ানো ফোকলা বদনখানা। তখনি আমি চোখের বান হেনে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলবো, আহা অত তাড়া কিসের, সারা রাতই পড়ে আছে, মালিক। আমি তো তোমারই—। ব্যস কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

আলাদিন বুদুরকে বুকে টেনে উল্লাসে ফেটে পড়ে, সাবাস্।

যথাসময়ে বুড়ো যাদুকর প্রাসাদে ফিরে আসে। খবর পেয়ে বুদুর আলাদিনকে তার সাজ-পোশাকের আলমারীতে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখে। পরে আশ্চর্য কুশলতায় বুড়ো এবং বুদুর দুজনে এক সঙ্গে খানাপিনার টেবিলে গিয়ে বসে। এর একটু পরে সরবতের পেয়ালায় চুমুক দিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বুড়োটা।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আলমারী খুলে আলাদিনকে বাইরে বের করে বুদুর।

—খতম হয়ে গেছে।

আলাদিন বুড়োর কাছে গিয়ে কামিজের তলায় হাত ঢুকিয়ে তলপেট থেকে চিরাগটা বের করে নেয়। অল্প একটু ঘষতেই চিরাগ-দৈত্য আফ্রিদি এসে হাজির হয়ে সালাম ঠুকে বলে, ত্রিভুবনের অধিপতি আমি, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। একমাত্র এই চিরাগ ছাড়া আমি কারো দাসত্ব করি না। চিরাগ এখন আপনার হাতে। সুতরাং আপনিই আমার একমাত্র প্রভু। এখন আদেশ করুন, মালিক, কী করতে হবে।

আলাদিন বলে, শোন চিরাগের বান্দা। প্রাসাদ যেমন আছে তেমনি অবস্থায় আলতোভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে আগে যেখানে ছিল সেখানে বসিয়ে দাও। দেখো, আমাদের বিশেষ করে শাহজাদী বুদুরের যেন কোনও ঝাঁকানী না লাগে।

জো হুকুম, বলে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই আলাদিন বুঝতে পারল, গোটা প্রাসাদটা মহা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল তার স্বদেশে চীনের সেই সুলতান-প্রাসাদের পাশে এসে গেছে তারা।

তখন নিশুতি রাত। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সুলতান তাঁর শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে দেখলেন, আলাদিনের সেই প্রাসাদটা আগে যেখানে যেমনটি ছিল ঠিক সেখানে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের চোখকে নিজে বিশ্বাস করতে পারেন না। অভূতপূর্ব বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের বাদশাহী কায়দা কেতা ভুলে রাত্রিবাস পরেই খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সুলতানকে স্বাগত জানাতে আলাদিন সদরে বেরিয়ে এল।

—একি আপনি এভাবে না এসে শমন পাঠালেই তো পারতেন, জাঁহাপনা। বান্দা হাজির হতো।

সুলতান তখন কন্যা সন্দর্শনে উন্মুখ, আলাদিনের কোনও কথাই তাঁর কানে ঢুকলো না বোধ হয়। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, শাহজাদী বদরুর কোথায়?

আলাদিন বলে, আপনি ভিতরে আসুন। সে এখনও ঘুমুচ্ছে। আমি ডেকে দিচ্ছি, ভিতরে আসুন আপনি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো একাত্তরতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কন্যাকে ফিরে পেয়ে সুলতান আনন্দে কেঁদে ফেলেন। বদরুর বলে, আব্বাজান তোমার একি চেহারা হয়েছে?

সুলতান কন্যাকে আদর করতে করতে বলেন, তোর শোকে জানে যে বেঁচে আছি এই ঢের মা। তুই আমার একমাত্র সন্তান, চোখের মণি, তোর অদর্শন কী আমি সইতে পারি? কী হয়েছিল তোর, কী করে কে তোকে এই প্রাসাদ সুদ্ধ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আমি তো ভাবতেই পারছি না, মা।

বদরুর তখন সেই শয়তান মুর যাদুকরের সব কাহিনী সুলতানকে খুলে বললো।

—জান আব্বাজান, আমি তো দিন রাত কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিলাম, বুড়ো শয়তানটা বুঝি আর আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু ওপরে আল্লাহ আছেন, এত পাপ অনাচার তিনি সহ্য করবেন কেন? তাই দেখ, তার সমুচিত সাজা সে পেল।

সুলতান বুঝতে পারলেন, আলাদিন নির্দোষ। জামাইকে বুকে টেনে নিয়ে তিনি আদর করে বললেন, সন্তান-স্নেহে অন্ধ হয়ে সবকিছু না জেনে তোমাকে অনেক কষ্ট লাঞ্ছনা দিয়েছি বাবা। কিছু মনে রেখ না। তুমি তো জান বাবা, আমি আমার সলতানিয়ত খোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু আমার প্রাণাধিক বদরুরের কেশাগ্র ছুঁতে দিতে দেবো না কোনও শয়তানকে।

আলাদিন বলে, আমি আপনার সে-সময়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলাম আব্বাজান। যাক, যা হয়ে গেছে তা আর মনে পুষে রেখে লাভ নাই। আপনার কন্যাকে ফিরে পেয়ে আবার আপনি আনন্দ-মুখর হতে পেরেছেন এই আমার পরম ভাগ্য।

আলাদিন তার নফরদের বললো, ঐ বুড়ো মুরটার লাশটা নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আয়। শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক-এর দেহের মাংস। সেই হবে তার যোগ্য পুরস্কার।

সুলতানের প্রাসাদে ও সারা শহরে উৎসবের বাদ্যি বেজে উঠলো। সুলতান ঘোষণা করলেন, শাহজাদীর ফিরে আসার আনন্দে ফাটকের কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হলো। যে যেখানে আছ, আনন্দ কর, নাচো গাও, পিও জিও। দলে দলে হাজার হাজার মানুষজন এসে প্রাসাদে পাত পেড়ে পরিতৃপ্তি করে খেয়ে যেতে লাগল। সুলতান কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন। দুহাতে ধনরত্ন বিতরণ করা হতে লাগলো।

এরপর আলাদিন বুদুরকে নিয়ে অপর্যাপ্ত সুখ-সম্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে।

দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হয়। মাসে মাসে বছরও ঘুরে আসে। কিন্তু বুদুর সেই পরম সংবাদটি আর শোনাতে পারে না কাউকে। বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল সন্তান। সেই সন্তানের আগমন-বার্তা এসে পৌঁছল না দেখে সুলতান বেগম এবং অপরাপর আত্মীয়-পরিজন সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। তবে কি শাহজাদী বুদুর বন্ধ্যা? একটি সন্তানও এল না তার গর্ভে।

বুদুর বিষণ্ণ বদনে একা একা বসে ভাবে। একটি সন্তানই যদি কোলে না এল তবে এ জীবনে কীসের সুখ, কীসের আনন্দ?

চেনা জানা যে যা বলে পালন করতে কসুর করে না বুদুর। কত জলপড়া ঝাড় ফুঁক টোটকা তো করা হলো, কিন্তু ফল নৈব চ।

আলাদিন স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়, অত ভাবো কেন, সোনা, আমরা কী এখনই বুড়ো হয়ে গেছি। অঢেল যৌবন তো পড়ে রয়েছে! আজ হয়নি, কাল হবে। ও নিয়ে অত মন খারাপ করতে নাই। আমরা কোনো পাপ করিনি, দেখো, আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন।

কিন্তু আলাদিনের এই সান্ত্বনা বাক্যে বুদুরের খাঁ খাঁ করা শূন্য হৃদয় পূর্ণ হতে পারে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস কোন রকমে চেপে বলতে পারে না না, ওসব আমি ভাবি না। তুমি আছ আমি আছি আমার আর ভাবাটা কী? তুমিই তো আমার সকল চিত্ত জুড়ে রয়েছ, সোনা।

একটু থেমে আলাদিনের বুকে মাথা রেখে বুদুর বলে, একটা কথা বলবো, জান?

আলাদিন অবাক হয়। এমন কী কথা, যার জন্য বুদুর এত দ্বিধা সঙ্কোচে ভণিতা করছে।

—কী ব্যাপার, অমন কিন্তু কিন্তু করছ কেন, চটপট বলেই ফেল না?

বুদুর বলে, শহরে এক গুণী সন্ত বৃদ্ধা এসেছেন। শুনলাম তিনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। যে-সব মেয়েদের সন্তান হয় না, তাকে দর্শন করলেই নাকি গর্ভবতী হয়। তুমি এ সবে মত দেবে কিনা জানি না, তবে একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়।

আলাদিন হো হো করে হেসে ওঠে, ও, তাই বল। তা—আমার অমত হবে কেন। বেশ তাকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি।

চারজন খোজা নফরকে ডেকে পাঠিয়ে দিল সে বৃদ্ধাকে নিয়ে আসার জন্য।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সন্ত বৃদ্ধা আলাদিনের প্রাসাদে এসে পৌঁছল। সর্বাঙ্গ মোটা কাপড়ের বোরখায় ঢাকা। গলায় দোদুল্যমান আজানুলম্বিত বহু বিচিত্র এক মালা। সারা অঙ্গে নানারকম পাথর, ধাতুর চাকতি, পশু-পাখির হাড্ডি এবং অনেক রকমের গাছের মূল ইত্যাদি দিয়ে বানানো এক ভয়ংকর বস্তু। হাতে একখানা আঁকাবাঁকা লাঠি। এক হাতে একটা পিতলের ধূপদানী।

খোজারা ওকে হারেমে শাহজাদী বদুরের সামনে হাজির করল। বৃদ্ধা আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বদুরকে দোয়া জানাল। বদুর ওকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বললো, শুনেছি, আপনি সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর। আপনার অসাধ্য নাকি কিছুই নাই। আপনি যখন মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় চরণ ধুলো দিয়েছেন তবে একটুখানি করুণা করে আমার ক্ষুদ্র একটি মনস্কামনা পূর্ণ করুন, এই আমার ইচ্ছা।

বৃদ্ধা বলে, আমি বুঝেছি বেটা, তোমার মনের বাসনা আমি জ্ঞাত হয়েছি। ঠিক আছে, যা বলছি মন দিয়ে শোন। যদি ঠিক ঠিক করতে পার, তবে নির্ঘাৎ পুত্রলাভ হবে তোমার।

বদুর চমকে ওঠে, পুত্র লাভ! আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ।

—বলুন মা, যত দুঃসাধ্যই হোক, আমি তা করবোই।

বোরখাবেশি সন্ত বলে, বলবো, অবশ্যই বলবো, মা। কিন্তু সে বস্তু কী তুমি সংগ্রহ করতে পারবে?

বদুরের আর বাঁধ মানে না। বৃদ্ধার পায়ের কাছে সে হাঁটু গেড়ে বসে পা-দুটো চেপে বলে, খুব পারবো, আপনি আদেশ করে দেখুন। আমার স্বামী আলাদিন, এ দুনিয়ার অসাধ্য কাজ তার কিছুই নাই।

সন্ত বলে, ঠিক আছে তাকে বলো, সে যেন একটি রকপাখির ডিম সংগ্রহ করে এনে তোমার শোবার ঘরের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখে। ব্যস আর কিছুই করতে হবে না। দশমাস দশদিন পরে দেখবে, তুমি পুত্রবতী হয়েছ। এই রকপাখির ডিম কোথায় পাওয়া যায় তাও তোমাকে বলে দিচ্ছি। ককেসাস পর্বতমালার নাম শুনেছ তো, সেই পর্বতের অত্যুচ্চ শিখরে রকরা ডিম পাড়ে। সেখান থেকে সে-ডিম বহন করে নামিয়ে আনা সহজ কর্ম নয়।

বদুর বলে, ও-নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না, আমার স্বামীর কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়। অনায়াসে সে এনে দিতে পারবে। এ ছাড়া আর যদি কোনও আজ্ঞা থাকে করুন, মা, আমি পুত্রলাভের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

বৃদ্ধা বলে, না, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। সন্তান লাভের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। এই ডিমটার গুণে তোমার মাতৃত্বের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে জেগে

উঠবে। এখন সে মরার মতো অসাড় হয়ে আছে তোমার দেহের ভিতর। ঠিক আছে বেটা, আজ তাহলে আমি আসি। আমার জন্যে আরও অনেকে এসে অপেক্ষা করছে হয়তো। সকলের দুঃখের লাঘব করাই তো আমার এক মস্ত ধর্ম।

বুদুর নানা ধনরত্নে বৃদ্ধার ঝুলি পূর্ণ করে দিল। প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললো, দেখি, যদি সময় পাই, কাল আর একবার আসবো তোমার কাছে। আজ রাতে আল্লাহর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হবে। তখন তোমার কথা বলবো তাঁকে। যদি তিনি প্রসন্ন হয়ে কোনও বাণী দেন আমি তোমাকে জানিয়ে যাব, মা।

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদিন বুদুরের কক্ষে প্রবেশ করে।

—কী, কী বলে গেলেন উনি?

বুদুর বিষণ্ণ মনে বলে, সে প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

—আরে বলই না, আমি আলাদিন, ত্রিভুবনে অসাধ্য বলে কোন কিছু নাই আমার কাছে। বল তো পুরো হিমালয় পাহাড়টিকে তুলে অন্য কোথাও বসিয়ে দিতে পারি। এর চেয়ে বড়ো কঠিন কী কাজ থাকতে পারে।

বুদুরের মুখে হাসি ফোটে, না অত বড় কাজ নয়, তবে খুব সহজও নয়। ককেসাস পাহাড়ের মাথায় রকপাখিরা ডিম পাড়ে। সেই ডিম একটা আমার চাই।

—কেন কী হবে তা দিয়ে।

—সন্ত বলে গেল আমার শোবার ঘরের মাঝখানে একটা রকপাখির ডিম ঝুলিয়ে রাখলে আমি পুত্র-সন্তানের মা হবো।

—বহুত আচ্ছা, আলাদিন বলে, এ আর কী কঠিন কাজ। দাঁড়াও এখুনি আফ্রিদি দৈত্যকে ফরমাশ করছি, চোখের পলকে সে এনে হাজির করবে। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তিয়াত্তরতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

এই বলে আলাদিন বুদুরকে ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যায়! চিরাগবাতিটা হাতে নিয়ে আলতোভাবে ঘষতেই আফ্রিদি এসে হাজির হয়। যথাবিহিত কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আলাদিন আফ্রিদিকে বলে, জান বান্দা আজ এক কাণ্ড করেছে আমার বিবি। এতকাল আমাদের শাদী হয়েছে। কিন্তু বালবাচ্চা কিছু হয় নি বলে শাহজাদীর খুব মন খারাপ। তাই সে আজ এক বৃদ্ধা সন্তের সঙ্গে দেখা করবে বলে আমার কাছে বায়না ধরেছিল। আমি সেই ফকির সন্তকে প্রাসাদে এনে তার সামনে হাজির করেছিলাম। সে ফরমাশ করে গেছে আমাদের শোবার ঘরের মাঝখানে একটি রকপাখির ডিম ঝুলিয়ে রাখতে হবে। সে ডিম নাকি ককেসাস পর্বত-শিখরে

পাওয়া যায়। তা বাপু, একটু কষ্ট করে একটা ডিম এনে দাও তুমি।

আলাদিনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বিকট এক আর্তনাদ করে ওঠে আফ্রিদি দৈত্য। আলাদিন চোখ তুলে তার ভয়াল ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখে শিউরে ওঠে। দুহাতে ঢেকে ফেলে নিজের মুখ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না দৈত্যটা এতকাল বাদে আজ হঠাৎ এমন চণ্ডাল মূর্তি ধারণ করলো কেন। উফ! কী ভীষণ তার মুখব্যাদন। জ্বলন্ত ভাটার মতো তার গোলাকৃতি চোখ দুটো দেখে হৃদপিণ্ডের কাঁপুনি ধরে গেছে আলাদিনের। সাহস করে আর তাকাতে পারে না। হাতে মুখখানা ঢেকে রেখেই ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, কী হলো চিরাগের বান্দা, এত গোসা হলো কেন তোমার? আমি কী তোমাকে মন্দ বলেছি কিছু?

—এ কি কথা বলছেন, মালিক! এর চেয়ে খারাপ কথা আর কী হতে পারে বলুন। আপনি আমাকে দুচার ঘা মারতে চাইতেন, পিঠ পেতে দিতাম, কিন্তু এ কি সাংঘাতিক কথা আপনি বললেন। নেহাত আপনার সঙ্গে আমার এতদিনে অনেকটা মায়া-মমতা গড়ে উঠেছে। অন্য মালিকদের মতো আপনি কখনও মুখ গোমড়া করে ফাই-ফরমাশ করেন না। আমি বান্দা, নফর। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সব সময়ই আমি বড় ভাল ব্যবহার পেয়েছি। সেই কারণে আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতাও জন্মে উঠেছে। তাই আপনি রক্ষা পেয়ে গেলেন আজ। তা না হলে যে কথা আপনি উচ্চারণ করেছেন, তা শোনার পর আপনাকে টুটি টিপে আমি মেরে ফেলতাম।

আলাদিন আতঙ্কিত হয়ে বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর বান্দা, এখনও আমি বুঝতে পারছি না, আমি খারাপ কী বলেছি।

আফ্রিদি খানিকটা শান্ত হয়ে বলে, তবে শুনুন মালিক, বুঝতে পারছি, সজ্ঞানে আপনি ও কথাটা বলেননি। সেই বৃদ্ধাটা আপনার অনিষ্ট করার জন্য আপনার বিবিকে ওই সর্বনাশা কুপরামর্শ দিয়ে গিয়েছিল। আপনি হয়তো জানেন না, আমাদের—জীন দৈত্যদের সবার উপাস্য ঈশ্বর হচ্ছে পরমপিতা রক।

এই বলে আফ্রিদি দুই কাঁধে, কর্ণমূলে এবং নাকে হাত রেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললো, আপনার হাতে যে চিরাগ সে আমার প্রভু, মালিক। কিন্তু রক আমাদের সমগ্র জীন দৈত্যকুলের ঈশ্বর। তার চেয়ে বড় আর কেউ নাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং তার ডিম আপনি আমাকে চুরি করে আনতে বলে,কী সাংঘাতিক গর্হিত কাজ করেছেন, একবার ভেবে দেখুন।

আলাদিন বলে, বিশ্বাস কর বান্দা, তোমাদের ঈশ্বরকে একবিন্দু খাটো করার অভিপ্রায় নিয়ে একথা আমি বলিনি।

আফ্রিদি বলে, আমি বুঝতে পেরেছি মালিক, আপনি এক দুষ্ট দুরাচারের পাল্লায় পড়েছেন। আপনার বা আপনার বিবির কোন গুনাহ নাই, মালিক।

আলাদিন বলে, আচ্ছা, বান্দা বল দেখি, ওই বৃদ্ধার অন্তরে এমন অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি হলো কেন? আমি তো তার কোনও ক্ষতি করিনি।

—কে বললো আপনি তার ক্ষতি করেন নি, মালিক! তার বড় ভাই সেই

বুড়ো যাদুকর মুরকে আপনারা বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছেন। এ তারই প্রতিহিংসা। বৃদ্ধা সন্তের বেশে যে এসেছিল আসলে সে কোন নারী নয়। সেই মুর যাদুকরের সহোদর ভাই। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে এ শহরে এসেছে। নিজের কোনও বিদ্যা জানা নেই, যা দিয়ে সে আপনাকে ঘায়েল করতে পারে। তাই চক্রান্ত করে কলা-কৌশলে আমার হাতে আপনাকে নিধন করাতে চেয়েছিল। কারণ সে জানতো, রকপাখীর ডিমের কথা শোনামাত্র আমি আর পলকমাত্র অপেক্ষা করবো না। আপনার ঘাড় মটকে দেব। কিন্তু লোকটার চাল ঠিকমতো খাটলো না। আমি সব বুঝতে পারলাম। তবে এও ঠিক অন্য সব মালিকের মতো আপনি যদি চিরাগ ঘষেই শুধুমাত্র বলতেন, 'একটা রকপাখির ডিম নিয়ে এস' তাহলে মৃত্যু আপনার অবধারিত ছিল। কিন্তু, আমি প্রতিক্ষেত্রেই দেখেছি, আমাকে দিয়ে কোনও একটা কাজ করাবার জন্য আপনি বিস্তারিত ভূমিকা করে কার্য কারণ খুলে বলেন। এতে অবশ্য আমি অনেক সময় মনে মনে ঈষৎ বিরক্তি বোধ করেছি, কিন্তু আজ শুধু সেই কারণেই আপনার প্রাণ রক্ষা হয়ে গেল, মালিক। না হলে এতক্ষণ আপনার লাসটা পড়ে থাকতো এই মেঝেয়।

আলাদিন কেঁপে ওঠে। যাক, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

আফ্রিদি বলে, আমাদের শাস্ত্রে একটা উপদেশ আছে, ধাড়ি কুত্তার চেয়ে ছোট কুত্তাগুলো আরও বেশি পাজি হয়। বুড়ো মুর যাদুকরের চেয়ে তার এই ছোট ভাইটা আরও মারাত্মক শয়তান। সে আপনাকে নিধন করতে ক্ষেপে উঠেছে। একটু সাবধানে থাকবেন, মালিক। এই আমার নিবেদন। যাই হোক, আমি আপনাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখবো, আপনার কোনও চিন্তা নাই।

এই বলে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল।

বদুরের কাছে ফিরে এল আলাদিন। বললো, শোন, মণি, আমি নিজে কানে ঐ বৃদ্ধার কথা শুনতে চাই। কী ভাবে কী করতে হবে, নিজে কানে শোনার পর আমি তোমাকে ঐ রকপাখির ডিম আনিয়ে দেব।

বদুর বলে বেশ তো, কাল সকালেই সে আবার আসবে এখানে। তুমি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানে সব শুনে নিও।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চুয়াত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

পরদিন সকালে মুর যাদুকরের কনিষ্ঠ সহোদর বৃদ্ধা সন্তের ছদ্মবেশে আবার এসে হাজির হয় আলাদিনের প্রাসাদে। খোজারা সমাদর করে নিয়ে যায় তাকে শাহজাদী বদুরের কক্ষে।

আলাদিন আগে থেকেই পর্দার আড়ালে অপেক্ষমান ছিল। তার এক হাতে দড়ির ফাঁস, অন্য হাতে রজত শুভ্র চকচকে ধারালো তলোয়ার। ছদ্মবেশী বদুরের সামনে এসে দাঁড়াতেই আলাদিন পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে

ক্ষিপ্র হাতে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দেয় তার গলায়।

বদরুর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে, একি! একি করছো তুমি? কিন্তু আলাদিন তৎক্ষণে তলোয়ারের এক কোপে লোকটার ধড় মুণ্ডু আলাদা করে ফেলেছে।

বদরুরের চোখে ক্রোধের বহ্নি, একি করলে তুমি? এ যে মহাপাতকের কাজ হলো। এ পাপ আমরা রাখবো কোথায়?

আলাদিন হাসতে হাসতে বললে, এই লোকটার আসল পরিচয় তুমি কিছুই জান না, সোনা। এই দেখ—

আলাদিন তলোয়ারের ডগা দিয়ে বোরখাখানা চিরে ফালা ফালা করে সরিয়ে দিল।

বদরুর তো হাঁ হয়ে গেছে। এমন অবাক কাণ্ড কেউ ভাবতে পারে?

আলাদিন বলে, লোকটা যে আসলে কোনও বৃদ্ধা সন্ত ফকির নয়, সে তো দেখতে পাচ্ছো! এর প্রকৃত পরিচয় কী জান? ঐ ঘাটের মড়া শয়তান যাদুকর মুরটার এ ছোট ভাই। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে এ শহরে এসে আস্তানা গেড়েছিল। ওর একটাই মতলব ছিল, আমাকে এবং তোমাকে নিহত করা। কাজ প্রায় হাসিল করেও ফেলেছিল, কিন্তু উপরে আল্লাহ অসীম করুণাময়। তাঁর দরবারে আমাদের কোনও অপরাধ নাই। তাই সোনা, তিনিই আমাদের রক্ষা করেছেন।

বদরুর তখনও থর থর করে কাঁপছে। আলাদিনকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, আমি তো বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুমি কী করে জানতে পারলে লোকটার এই অভিসন্ধি।

আলাদিন বললো, আমার চিরাগের বান্দা আফ্রিদি দৈত্যই আমাকে সব বলেছে, মণি। সেই আমাকে জানিয়েছে লোকটা মুর যাদুকরের সহোদর ভাই। প্রতিহিংসার আগুনে সে জ্বলছে। আমায় মারার ফন্দী এঁটে সে এ প্রাসাদে বৃদ্ধা ফকিরের ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছিল।

তারপর আলাদিন আফ্রিদি দৈত্যের সব বৃত্তান্ত খুলে বললো বদরুরকে। বদরুর বললো, দৈত্যটা খুবই ভাল, তাই আমরা রক্ষা পেলাম, না?

আলাদিন বলে, সবই খোদাতালার খিদমদ। তিনি রাখলে কী কেউ মারতে পারে?

এরপর আলাদিন আর বদরুর জীবনের ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রেমের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে বহু বৎসর অতিবাহিত করে গিয়েছিল এবং এও জেনে আপনারা খুশি হবেন, শাহজাদী বদরুর আদৌ বন্ধ্যা নারী ছিল না। একাধিক সন্তানের আদর্শ জননী হওয়ার পরম সৌভাগ্য তার জীবনেও ঘটেছিল।

শাহরাজাদ বললো, এই হলো আলাদিন এবং তার আশ্চর্য যাদুচিরাগের কাহিনী।

সুলতান শারিয়ার বললো, খুব সুন্দর, বড় চমৎকার। এমন কাহিনী বহুকাল মনে থাকবে।

শাহরাজাদ বলে, এবার যদি জাঁহাপনা অনুমতি করেন তবে কামর আর হালিমাহর কাহিনী শোনাতে পারি।

—বেশ তো শোনাও।

শাহরাজাদ হাসে, তার আগে ছোট্ট একটা হিতোপদেশের গল্প শোনাই আগে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ধরনের শিক্ষামূলক অনেক কাহিনী রেখে গেছেন। আমাদের জন্য। আজ তারই একটা শোনাচ্ছি আপনাকে।

সুলতান শারিয়ার বলে, আচ্ছা তাই শোনাও দেখি কেমন উপদেশের কথা। শাহরাজাদ, আমি ভেবে পাই না, তুমি একনাগাড়ে এতদিন ধরে একটার পর একটা এইরকম মজাদার কিস্সা কি করে বলে যেতে পারছো!

শাহরাজাদ বলে, মহানুভব শাহেনশাহর অপার করুণা। ওয়াদা মতো প্রতিটি রাতে তো আমি আপনাকে কাহিনী শোনাতে পারিনি। কখনও মন মেজাজ ভাল লাগেনি বলে বাদ দিয়েছি, আবার কখনও অসুখ-বিসুখ হওয়াতেও ছেদ পড়েছে। একবার তো একটানা বিশদিন বিমারে পড়েছিলাম। আপনাকে কিস্সা শোনাতে পারিনি। কিন্তু আমার ওপর আপনার অশেষ দয়া,—আপনি আমাকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন।

শারিয়ার হাসে, তুমি কী আমাকে শুধুমাত্র হৃদয়হীন পাষণ্ড বলেই মনে কর শাহরাজাদ। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের শরীর। অসুখ-বিসুখ হবেই। তাছাড়া তুমি তো একটা কলের পুতুল নও, দম দিলেই চলতে থাকবে। আর সকলের মতো তোমারও ইচ্ছে অনিচ্ছে ভাল লাগা না-লাগা বলে একটা ব্যাপার থাকতেই পারে। আমি কী এতই অমানুষ, সেটুকুও বুঝতে পারবো না?

কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে যায় শাহরাজাদের। একটুক্ষণ পরে সে গল্প শুরু করে:

কোন এক সময় এক সুন্দর সুপুরুষ বিদ্যোৎসাহী তরুণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অতি অল্প বয়সেই পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। যেখানে যা ভাল বইপত্তর পেত সংগ্রহ করে পড়তো সে। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সন্ধান পেলেই সে ছুটে যেত তাদের কাছে। যদি কিছু জ্ঞান আহরণ করা যায়। এইভাবে দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে নিতে থাকলো সে। তবু তার তৃষ্ণা মেটে না। দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে চলে—নতুন কোনও বিদ্যা যদি সে শিখতে পারে এই আশায়।

একদা চলতে চলতে এক ফকির দরবেশের সাহচর্য পায় সে। যুবক তাকে আঁকড়ে ধরে, আপনি আমাকে কিছু জ্ঞান দান করে যান পীরসাহেব।

দরবেশ ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, বেটা, তোমার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম, এই বয়সে তুমি যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছ আমি সারাজীবন ঘুরে ঘুরে এই বৃদ্ধবয়সে তার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারিনি। তোমাকে জ্ঞান দান আমার বিদ্যায় কুলাবে না। বরং আমি তোমাকে এক দিব্যজ্ঞানীর কাছে পাঠাচ্ছি সেখানে যাও, তিনি তোমাকে দিব্যজ্ঞান দিতে পারবেন।

যুবক কৃতজ্ঞচিত্তে সেই জ্ঞানী মহাজনের ঠিকানা নিয়ে রওনা হলো। কুড়ি দিন একটানা পথ চলার পর এক গণ্ডগ্রামে এসে পৌঁছলো। সেই গ্রামে বাস করেন সেই দিব্যজ্ঞানী, এক কর্মকার।

যুবক দেখলো, একটা ছোটখাটো কামারশালা। এক পলিতকেশ বৃদ্ধ নিজের হাতে হাপর টেনে লৌহশলাকা গরম করছে। যুবককে দেখে বৃদ্ধ কর্মকার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী বাবা, কী দরকারে এসেছ।

যুবক তার পদধূলি মাথায় নিয়ে বললো, আমি আপনার কাছে এসেছি জ্ঞানলাভের জন্য। অনেক পথ হেঁটে বহু দূরদেশ থেকে আসছি। শুনেছি সারা দুনিয়ার মধ্যে এখন আপনিই একমাত্র প্রাজ্ঞব্যক্তি।

বৃদ্ধ হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, জ্ঞান-সমুদ্রের এক আজলা পানিও কী আমরা গ্রহণ করতে পারি বাবা। যাই হোক কাছে এস। এখানে বস। আমার যা জানা আছে অবশ্যই তোমাকে তা শেখাবো, কিন্তু তার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে, হাঁক-পাক করলে হবে না।

যুবক বলে, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।

বৃদ্ধ বললেন, তা হলে আজ থেকে পাঠ শুরু হয়ে যাক। এই নাও ধরো এই হাপরের দড়িখানা। বুড়ো হয়েছি, একনাগাড়ে কতকাল ধরে দড়ি টেনে হাওয়া করে লোহা গরম করে আসছি। এবার তুমি এসে গেছ, ভালই হোল। আমি হাতুড়ি পিটে যন্ত্রপাতি বানাবো, আর তুমি হাপর টেনে আমার কাজের একটু সাহায্য করবে।

যুবক বলে, এভাবে আপনার কোনও কাজে লাগতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি।

প্রতিদিন কামারশালা খোলে বৃদ্ধ। হাপর জ্বালানো হয়। যুবক সারাদিন ধরে হাপর টানে আর বৃদ্ধ নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করতে থাকেন। কত রকম খদ্দের আসে। কত লোকের কত রকম ফরমাশ। বৃদ্ধ যত্ন সহকারে সব শোনে। বায়না নেয়। এবং সেই মত কাজ সমাধা করে যথা-সময়ে খদ্দের বিদায় করেন।

একদিন দুদিন করে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। বৃদ্ধ কোনও জ্ঞানের কথা বলে না। যুবক ভাবে, সময় হলে তিনি নিজে থেকেই বলবেন। সুতরাং পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না।

কিন্তু দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হতে চললো, বৃদ্ধ তার নিজের কামার-

শালার কাজকর্মে ডুবে থাকেন। সারাদিন অন্য কোনও কথাবার্তা বলার ফুরসতই নাই! যুবক লক্ষ্য করে, এই বয়সেও বৃদ্ধ কী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এক মুহূর্ত কাজে গাফিলতি নাই। সারাদিন ধরে হাতে কাজ করে চলেছেন এবং সেই সঙ্গে মুখে কথা বলে যাচ্ছেন খদ্দেরদের সঙ্গে। কোনও বিরাম নাই।

এইভাবে মাসে মাসে বছর পার হয়ে গেল। যুবক বুঝতে পারলো, বৃদ্ধ ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন না। কিন্তু কেন? অনেক ভেবেও কোনও কারণ অনুসন্ধান করতে পারে না সে। যাই হোক, যুবক নিজে থেকে তার শিক্ষালাভের কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে সাহস করে না। বৃদ্ধ যদি অপ্রসন্ন হন, যদি তিনি বিমুখ হয়ে বলেন, না বাপু আমার দ্বারা হবে না, তুমি অন্য পথ দেখ।

এক এক করে পুরো পাঁচটা বছর কেটে গেল। তবু বৃদ্ধ মুখ খোলেন না। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন না ওর কাছে। এবার কিন্তু যুবক ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে সেই পরমক্ষণটির প্রতীক্ষা করতে থাকে।

এইভাবে আরও পাঁচটা বছর চলে গেল। যুবক তখন সব কিছু ভুলে বৃদ্ধের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। সে জানে সময় হলে আপনা থেকেই তিনি তাকে দিব্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করবেন।

বৃদ্ধ একদিন বললেন, আচ্ছা বাবা একটানা দশটা বছর তুমি একই ভাবে হাপর টেনে যাচ্ছো, তোমার বিরক্তি লাগে না?

যুবক বললো, এখন আমি সে সবের অনেক ওপরে চলে গেছি, বাবা। প্রথম প্রথম যে একেবারে সে-রকম হয়নি তা নয়, কিন্তু এখন আর হয় না?

বৃদ্ধ বলেন, আমার কাছে কিছু শিখবে বলে এসেছিলে! এতকাল ধরে তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে শুধু হাপরের দড়ি টানালাম। দিব্যজ্ঞান তো কিছু দিতে পারলাম না, বেটা।

যুবক বলে, প্রথমে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়েছে বাবা, দিবাজ্ঞান লাভ করতে গেলে, অসীম ধৈর্যের অধিকারী হতে হবে। জগতে ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে। এতকাল পরে এই পরম সত্যটি আমি আপনার সাহচর্য থেকে লাভ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।

বৃদ্ধ আশীর্বাদ করে বললেন, যাও বাবা গৃহে ফিরে যাও। যে ধৈর্য তিতিক্ষার পরিচয় তুমি রেখে গেলে আমার কাছে, সারা দুনিয়ায় তার নজির মেলা ভার। আমি বিশ্বাস করি, তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছ।

যুবক বৃদ্ধের পদধূলি মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

শাহরাজাদা থামলো। সুলতান শাহরিয়ার বলে, অপূর্ব! খুব ভাল লাগলো শাহরাজাদ। এবার তাহলে তোমার সেই কমার আর হালিমাহর কিস্সা শুরু কর, শোনা যাক।

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা ভাবছি, তার আগে অন্য আর একটা কাহিনী আপনাকে শোনাবো।

শারিয়ার বলে, কী কাহিনী ?

গুলাব সুন্দরী ফারিজাদ-এর কিস্‌সা বলছি শুনুন, জাঁহাপনা। খুব সুন্দর নির্মল মনোগ্রাহী এক কাহিনী।

সুলতান বলে, বেশ তাই বল, শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন পারস্যের সুলতান খসরু শাহ।

অবশ্য আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন, জাঁহাপনা শাহেনশাহ খসরু শাহ কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ বাদশাহ ছিলেন। একদিকে যেমন কুসুমাদপি কোমল ছিল তাঁর হৃদয়, অন্যদিকে বজ্রের চেয়েও কঠিন এবং দীপ্যমান ছিলেন তিনি। লোকে বলে, তাঁর ইঙ্গিতে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খেত।

সে যাই হোক, তাঁর জীবনের বহু বিখ্যাত-কাহিনী আজ লোকের মুখে মুখে ফেরে, আজ আমি তাঁরই সময়ের একটি সত্য ঘটনা আপনাকে বলছি।

সুলতান প্রায় প্রতিরাতেই বিদেশী বণিকের ছদ্মবেশে শহর পরিক্রমায় বেরুতেন। উদ্দেশ্য—তাঁর প্রাজারা কে কেমন ভাবে দিন গুজরান করছে, প্রত্যক্ষ করা।

এক রাতে তিনি তাঁর উজিরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের প্রান্তে অতি দীন দরিদ্র এক পল্লীতে প্রবেশ করলেন। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারাই অভাবের তাড়নায় জর্জরিত।

একটা গলির মুখে পুরানো বস্তিবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই গুটিকয়েক মেয়ের বাক্যালাপ শুনে থমকে দাঁড়ালেন সুলতান। দরমার বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলেন ঘরের মধ্যে তিনটি মেয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে আড্ডা জমিয়েছে। মনে হয় ওরা তিন বোন। বড় দুটির শাদীর বয়স পার হয়ে গেছে। ছোটটি অপেক্ষাকৃত কচি এবং সুন্দরী। বেশ বোঝা যায় দারিদ্র্যের চাপেই ওদের বাবা-মা মেয়েদের শাদী দি[illegible] প্যারেনি।

বড় জন বলছিল, [illegible] যদি কখনও শাদী করি তবে কাকে করবো জানিস ?

অন্য দুজন কৌত[illegible] য়ে তাকায়। বড়টি বলে, সুলতানের যে হালুইকর আছে—তাকে আমি শা[illegible] রবো। ওঃ, কী মজা হবে, যত খুশি মিঠাই মণ্ডা আর বাদশাহী হালওয়া খাবো রোজ। জানিস ভাই, শাহী হালওয়া খেতে আমার ভারি ভাল লাগে। তা হালুইকরকে শাদী করলে তো আর হালওয়ার

কোনও অভাব থাকবে না। যত প্রাণ চায় খাবো। কিন্তু তোদের জন্য মন কেমন করবে। আমি খাবো আর ভাববো, আহা তোরা একটু খেতে পেলি না। আমি কিন্তু আমার স্বামীকে বলবো তোদের জন্য একটু পাঠাতে। কিন্তু সে কি রাজি হবে? যাক, সে পরে দেখা যাবে।

মেজটি বলে, না ভাই আমার ওসব মিঠাই-মণ্ডার লোভ নাই। আমি যদি শাদী করি তো করবো সুলতানের খাস বাবুর্চিকে। সে কতরকম কোর্মা কোপ্তা কালিয়া পোলাও বানায় রোজ। উফ্, ভাবতেই জিভে পানি এসে যাচ্ছে। কী মজাসে খাবো রোজ। মাংস খেতে আমার কী যে ভাল লাগে, দিদি। তোরা ভাবিস নে, আমার স্বামীকে বলে তোদের জন্যেও মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেব একটু আধটু।

বড় দুজনের কথা শেষ হলো। কিন্তু ছোট তখনও নীরব। বড় বোন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, কি রে ছোট, তুই যে বড় চুপটি করে আছিস্? তোর কী ইচ্ছে-টিচ্ছে বলে কিছু নাই? বল না, ভাই, শুনি।

ছোট তবু কথা বলে না। ও এখনও বড়দিদির মতো প্রগলভ হয়ে উঠতে পারেনি। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে। মেজ বলে, ঘাবড়াস নে বোন, আমাদের শাদী হয়ে গেলে তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। খুব সুন্দর দেখে একটা পাত্র দেখে শাদী দিয়ে দেব তোর। প্রাসাদেরই কোনও আমলা-টামলা কাউকে দেখে গছিয়ে দেব তোকে। তাহলে তিন বোন কাছাকাছিই থাকতে পারবো, কী বলিস?

ছোট যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। এমনিতেই সে বেশ সুন্দরী, তার ওপর লজ্জারক্ত মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। এবার সে মৃদু অথচ বেশ প্রত্যয় নিয়ে মধুর কণ্ঠে বলে, শোনও দিদি, আমার ইচ্ছা শাদী যদি করতেই হয় তবে কোনও আমলা অমাত্য নয়, খোদ মালিককেই করবো।

দুই বোন ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, মানে?

—মানে—আমি স্বয়ং সুলতানকেই স্বামী হিসেবে পেতে চাই।

বড় দু' বোন হো হো করে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, ওরে বাব্বা, দেখি অল্পে মন ওঠে না।

ছোট বলে, সত্যিই দিদি অল্পে আমার মন ভরবে না। আমি বাদশাহর বেগম হবো, আমার ছেলেমেয়েরা চাঁদের মতো সুন্দর হবে। আমার মেয়ের রূপ দেখে দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহরা পাগল হয়ে ছুটে আসবে। আমার আদরের দুলালীর কান্নায় পান্না ঝরবে, হাসলে মুক্তো পড়বে।

সুলতান খসরু শাহ এবং তার উজির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। তার পর অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সরে [illegible] যাতে ওরা কেউ টের না পায়।

পরদিন সকালে সুলতান উজিরকে বললেন, ঐ মেয়ে তিনটিকে দরবারে হাজির কর।

কোরবানীর খাসির মতো এসে দাঁড়ালো তিন বোন। ভয়ে ওরা কাঁপছিল।

না জানি কোন অপরাধে সুলতান তাদের তলব করেছেন। হয়তো ফাঁসীর দড়িতেই লটকে দেবেন তিনি। নানারকম অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত-চকিত হয়ে দরবারের এক পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা।

সুলতান খসরু তখতে বসে গম্ভীর গলায় বড় জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কী, তোমার কী মনের বাসনা? কী হলে তুমি সুখী হবে?

মেয়েটি ভেবে পায় না, এ কথার কী জবাব সে দেবে। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সুলতান বলে, কী বলতে পারলে না তো? তা হলে আমিই বলি তোমার মনের কথা। তুমি আমার হালুইকরকে শাদী করতে পেলে জীবনে খুব সুখে থাকবে, তাই না?

মেয়েটি অবাক হয়, সুলতান সর্বজ্ঞ, না হলে তার মনের কথা তিনি জানলেন কী করে! মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, ঘাড় নেড়ে সে জানায়—হ্যাঁ।

এবার সুলতান মেজকে উদ্দেশ করে বলে, তোমার কী বাসনা? আমার খাস বাবুর্চিকে শাদী করবে? খুব ভাল-মন্দ খানা-পিনা খেতে পাবে রোজ, না? বেশ তাই হবে। তোমাদের দুজনের ইচ্ছেমতো হালুইকর আর বাবুর্চির সঙ্গেই তোমাদের দুজনের শাদী দিয়ে দেব।

এরপর সুলতান মসনদ থেকে নেমে এসে অধোবদনা ছোটকে হাতে ধরে নিজের পাশে বসাল।

—এখন থেকে তোমার আসন আমার এই পাশে। তুমি আমার খাস বেগম হবে আজ। কেমন, রাজি তো?

সেইদিনই যথানিয়মে কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে তিন বোনের শাদীর পর্ব সমাধা হয়ে যায়।

ছোটর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা বড় দুই বোন আঙুল কামড়াতে থাকে। ইস্, কী ভুলই না ওরা করেছে। কেন মরতে হালুইকর আর বাবুর্চির সঙ্গে শাদী করার ইচ্ছা মনে এসেছিল। ছোটটা কী ভাগ্যবতী, যেই মুখ দিয়ে বের করলো, সুলতানকে শাদী করবে, অমনি তার কপালে স্বয়ং সুলতান খসরুই জুটে গেল। হায় হায়, এ কি নিজের সর্বনাশ নিজেই করল ওরা।

যত দিন যায় ততই ঈর্ষার আগুন বুকে ধক ধক করে জ্বলতে থাকে দুই বোনের। কিন্তু মুখে মধু ঢেলে কথাবার্তা বলে ছোট বোনের সঙ্গে। ছোট বোন বড়দের মনের এই কুটিলতা বুঝতে পারে না।

ন' মাস পরে ছোট বোন একটা চাঁদের মতো ফুটফুটে পুত্র-সন্তানের জন্ম দিল। স্বভাবতই বড় দুই বোন ছোট বোনের পরিচর্যা করতে এগিয়ে এসেছেন। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি যখন অচৈতন্য সেই ফাঁকে তার পুত্র-সন্তানটিকে ওরা সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় একটা কুকুরের মরা বাচ্চা এনে রেখে দিল।

জ্ঞান ফিরে ছোট তার দুর্ভাগ্য দেখে ভেঙে পড়লো। সুলতান ক্ষোভে দুঃখে দরজা বন্ধ করলেন।

বড় দুই বোন একটা বাক্সের ডালায় বসিয়ে সদ্যজাত পুত্রটিকে খালের জলে

ভাসিয়ে দিল। বাক্সটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ভিড়ল সুলতানের বাগানের পাশে।

এক সদাশয় বৃদ্ধ মালী ঐ বাগানের পরিচর্যা করে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটি সদ্যজাত শিশু ভেসে এসে ভিড়েছে বাগিচার ধারে। ছেলেটিকে বুকে তুলে সে বাসায় যায়। মালী-বিবি চিরকালের বন্ধ্যা। শাদীর পর কতকাল কেটে গেছে, অনেক দোয়া মানত করেও একটি সন্তান পেটে ধরতে পারেনি সে। শিশুটিকে পেয়ে সে যেন হাতে চাঁদ পেল। ভাবলো আল্লাহর করুণাতেই সে পুত্রবতী হতে পারল।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁচাত্তরতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

পর বৎসর সুলতানের বেগম আর এক পুত্রের জন্ম দিল। এ সন্তানটি আগের পুত্রের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু বড় বোনদের চক্রান্তে সেবার সে পুত্র প্রসবের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলো। ওর দিদিরা কায়দা করে ছেলেটিকে সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় একটা বেড়ালের মরা বাচ্চাকে রেখে দিল।

প্রসূতির প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। সুলতান ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

সেবারও বড় দুই বোন সদ্যজাতকে একটি বাক্সের ডালায় বসিয়ে খালের জলে ভাসিয়ে দেয়। এবং একই ভাবে ভাসতে ভাসতে গিয়ে বাগানের ধারে ভেড়ে, বৃদ্ধ মালী দেখতে পেয়ে বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যায়। বড় ভাই-এর পাশে পাশে ছোট ভাইও মালী এবং মালী বৌ-এর অশেষ আদর-যত্নে মানুষ হতে থাকে।

এর পরের বছর সুলতান-বেগম তৃতীয় সন্তান প্রসব করে। এবারেরটি কন্যা। কী তার রূপ, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন বেহেস্তের ডানা-কাটা পরী! দুই বোনের চক্রান্তে সে সন্তানও কোলে পায় না মা। এবার ওরা মেয়েটিকে সরিয়ে নিয়ে একটা মরা ইঁদুর বাচ্চাকে রেখে দেয় সেখানে।

এ আঘাত সুলতান আর সহ্য করতে পারে না। পর পর তিনবার এ ধরনের অশুভ ঘটনার মূল কারণ হিসাবে বেগমকে দায়ী করেন তিনি। তার ধারণা হয় বেগম নিশ্চয়ই শাপগ্রস্তা কোনও শয়তানী। প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো তার।

বেগম সুলতানের কাছে মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা করলো। হাজার হলেও হারেমের বেগম, সুলতান বিচলিত হলেন তার প্রার্থনায়। যাই হোক, প্রাণে সংহার না করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন তিনি।

একই ভাবে কন্যাটিকেও খালের জলে ভাসিয়ে দিল দুই বোন। এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই বৃদ্ধ মালীর নজরে পড়ায় তাকেও সে ঘরে নিয়ে গিয়ে পরম আদরে লালন পালন করতে থাকলো।

দুই বোন গোপনে এই সব কাজ করতে পেরে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

সময় বয়ে চলে। ছোট বোনের তিন সন্তান মালীর ঘরে বড় হতে থাকে। ওদের নাম রাখা হয় ফরিদ ফারুজ এবং ফরিজাদ। ফরিজাদ দেখতে পরীর মতো সুন্দরী। তার চুলের বর্ণ সোনালী। কান্নায় তার পান্না ঝরে, আর হাসলে পরে মুক্তো পড়ে মুখ দিয়ে। যে দেখে সেই বলে এমন সুন্দর মেয়ে মানুষের ঘরে জন্মায় না।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাইবোন লেখাপড়ায় চৌকস হয়ে ওঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা যাবতীয় পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে ফেলে। শুধু লেখা পড়া নয়, আচারে ব্যবহারেও তাদের তুলনা রইল না।

এইভাবে ওরা যখন বেশ বড় সড় হয়ে উঠল, মালী-বৌ একদিন দেহ রাখল। বিবির শোকে মালী কাতর হয়ে পড়ল। সুলতান দেখলেন, বৃদ্ধ মালী বয়সের ভারে এবং শোকে তাপে অথর্ব হয়ে পড়েছে। তিনি তাকে অবসর নিতে বললেন। মালীর নামে তিনি জায়গীর লিখে দিলেন। বললেন, সারা জীবন তো আমার সেবা করেছ, এবার আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না। আমি তোমার ভরণ-পোষণের জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিলাম।

এর কিছুকাল পরে মালীও দেহ রক্ষা করল।

তিন ভাইবোন বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। সুলতানের মৌরসীপাট্টার আয় থেকে তাদের বেশ ভালভাবেই দিন কাটতে থাকে।

দুই ভাই প্রায়ই শিকার সন্ধানে বাইরে যায়। বোনটি ঘরে থাকে। ওদের বাড়ির লাগোয়া একটি সুন্দর বাগান। একদিন ফরিজাদ একা একা বাগানের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় তার দাসী এসে খবর দিল বাগানের ফটকে এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছেন। ফরিজাদ এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এসে একটি গাছের তলায় বসাল। কেন জানি না, বৃদ্ধাকে দেখামাত্র ফরিজাদের মনে হলো মহিলাটি বড় সুন্দর পবিত্র। একটা থালায় করে কিছু ফল কেটে এনে তার সামনে রেখে বললো, মেহেরবানী করে একটু কিছু খান।

বৃদ্ধা ফরিজাদের ব্যবহারে বড়ই মুগ্ধ হয়ে বললো, মা তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো।

ফরিজাদ জিজ্ঞেস করে, আপনি কে মা? কেনই বা এমনভাবে পথে বেরিয়েছেন।

বৃদ্ধা বললে, মা, আমি আল্লাহর এক নগণ্য সেবিকা। সারা জীবন ধরে তাঁরই নাম গান করে আমার দিন কাটছে। পথে পথে ঘুরে বেড়াই। যে আদর করে ডাকে তারই কাছে যাই। আজ তুমি ভালবেসে ডাকলে তাই এলাম। আবার কোথায় চলে যাবো জানি না। তোমার এই বাগানটা দেখে বড় ভাল লাগলো। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না মা। বাগানে সবই আছে কিন্তু তিনটি জিনিসের অভাব দেখছি।

ফরিজাদ জিজ্ঞেস করে, কী সে তিনটি বস্তু, মা?

বৃদ্ধা বললো, বলছি মা, বলছি।

এরপর সে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল। তারপর বললো, তোমার বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। কিন্তু ওরা এক সঙ্গে সুমধুর তানে গান করে না। আর এই যে সব তরুবর এদের শাখা মলয় বাতাসে আন্দোলিত হলে এক সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেসে আসতে পারে, কিন্তু আসছে না। তৃতীয়ত ঐ যে ঝর্না বয়ে চলেছে ওখানে ঐ ঝর্নাও তো গান গেয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তোমার ঝর্না গেয়ে ওঠে না কেন? শোন মা, এই তিনটি জিনিস যদি তোমার বাগিচায় থাকতো তা হলে একেবারে বেহেস্ত হয়ে উঠতো জায়গাটা।

ফরিজাদ বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন, মা। কিন্তু এমন অপার্থিব বস্তু আমি কোথায় পাবো? আপনি কী তার সন্ধান জানাতে পারেন, কোথায় কোন দেশে গেলে এসব পাওয়া যেতে পারে?

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে বলে, তোমাকে আমি নিশানা বলে দিচ্ছি, যদি সেখানে কাউকে পাঠাতে পারো সে দেখে আসতে পারবে সেই নন্দন কানন। এখান থেকে বিশ দিনের পথ। সোজা চলে যেতে হবে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে। সেখানে প্রথম যে মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এখানে এমন কোন উপবন আছে যেখানে পাখিরা কথা বলে, গান গায়। তরুশাখা মধুর সুরের মূর্ছনা তোলে এবং ঝর্ণা কলতান করে? সেই মুসাফীর পরদেশী পথ বাতলে দেবে। সেই মতো গেলে পেঁছে যাবে সেই সুন্দর উপবনে। আচ্ছা মা, তোমার আদর যত্ন এবং সুন্দর ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছি। এবার আমি চলি। খোদা হাফেজ।

বৃদ্ধা আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ফরিজাদ এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার কথা শুনছিল। সে চলে যেতে তার সম্যক চৈতন্য ফিরে এল। মনে মনে আফশোশ করতে লাগলো, বৃদ্ধার কাছে আরও ভাল করে পথের নিশানাটা জেনে নিলে ভাল হতো। কিন্তু তখন আর তার কোনও উপায় রইল না। দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেছে সে। ব্যথায় বুকটা টন টন করে ওঠে ফরিজাদের। দুচোখ জলে ভরে ওঠে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

শিকার শেষে দুই ভাই ঘরে ফিরে দেখে বোন ফরিজাদ সেখানে নাই। বেশ অবাক হয় ওরা। এ সময় তো সে ঘরেই থাকে। বাইরে বাগানে আসে। ছোট ভাই ফারুজ বলে ঐ দেখ বড় ভাই গাছের তলায় কত পান্না। তাহলে তো বোন খুব কান্নাকাটি করেছে।

দুভাই চিন্তিত হয়ে বাগানের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় এসে দেখে ফরিজাদ অঝোর নয়নে কাঁদছে। দুই ভাই আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে কী এমন ব্যাপার ঘটেছে যার জন্যে তাদের আদরের বোনের চোখে জল।

ফরিজাদ করুণভাবে হাসে। বলে কেন কাঁদছি জানতে চাইছ দাদা? সে

আমি বলতে পারবো না!

—কেন? কী এমন কথা যে বলতে পারবে না, বোন? কেউ তোমার মনে আঘাত করে গেছে?

ফরিজাদ বলে, না না, সে সব কিছু নয়।

—তবে? তবে কেন তোমার চোখে পানি বোন? বল, আমাদের কাছে কোনও কথা গোপন করোনা বোন। তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমরা স্থির থাকতে পারি না।

ফরিজাদ বলে, এই বাগানটা আমার একদম পছন্দ নয়, দাদা। এখানকার পাখিরা কথা বলতে পারে না, গান গাইতে পারে না। গাছগুলো সব বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে, আর ঝর্ণা সেই বা এমন নীরব কেন?

ফরিজাদ কী বলতে চায় কিছুই অনুধাবন করতে পারে না ভাইরা। তখন সে সেই বৃদ্ধার আগমন এবং তার কথোপকথন বৃত্তান্ত সব দাদাদের খুলে বললো।

বোনের কথা শুনে ভাইরা বেশ অবাক হয়। বড় ভাই আশ্বাস দিয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না বোন, আমি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করবো। তোমার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য কাফ পর্বত-শিখরেও আমরা উঠে যেতে পারি। এ তো সামান্য বিশদিনের পথ। আমি অনায়াসেই এনে দিতে পারবো তোমাকে এসব। আমাকে শুধু পথের নিশানাটা ভাল করে বলে দাও।

ফরিজাদ বললো, আমি যেটুকু শুনেছিলাম বললাম, দাদা। এর বেশি কিছু আর জানি না। কিন্তু এ নিয়ে তোমরা এত চিন্তা করছো কেন? ঐ অজানা দেশে যাওয়ার কোন দরকার নাই।

বড় ভাই ফরিদ বলে, ও নিয়ে তুমি কোনও দুর্ভাবনা করো না বোন। আমার চমৎকার এক ঘোড়া আছে। সে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ভারত সীমান্তে। আমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি একাই যাবো, ফারুজকে সঙ্গে নেব না। সে তোমার কাছে থাকবে।

ফরিজাদ দাদাকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ফরিদ বলে সে যাবেই। এবং এ যাত্রায় আর কারো সঙ্গে যাবার প্রয়োজন হবে না। বোনকে অভয় দিয়ে বলে, আমার জন্যে একটুও ভাবিস না বহিন, আমার কোনও বিপদ হবে না। এই নে এই ছুরিখানা রাখ। যদি কখনও দেখিস এর ফলায় মরচে ধরছে, বুঝবি, আমার কোনও বিপদ ঘটেছে বা কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছি আমি। কিন্তু যদি ঠিক এই রকমই চকচকে থাকে তবে বুঝবি, আমি বেশ ভাল আছি। আর যদি দেখিস ছুরির গায়ে লাল লাল রক্তের মতো দাগ লেগেছে—বুঝবি আমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এবং সে রকম কোনও চিহ্ন দেখতে পেলে, তোদের দুজনকেই বলে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে আমার নামে মোনাজাত করিস!

ফরিদ ছুরিখানা বোনের হাতে তুলে দিল।

একটানা কুড়ি দিন ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ভারত সীমান্তের পর্বতমালার পাদদেশে এক শস্য-শ্যামল প্রান্তরে এসে পৌঁছল ফরিদ।

কিছুদূর এগোতে এক বটবৃক্ষের নিচে এক বৃদ্ধ সাধুকে দেখে সে এগিয়ে এল। ঘোড়া থেকে নেমে ফরিদ সাধুকে প্রণতি জানিয়ে বললো, আমি দূর দেশ থেকে আসছি, বাবা সাহেব।

সাধু হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে কী যেন বলে, সে বুঝতে পারে না। আবার বলে, সন্ত বাবা, আমি অনেক দূর দেশ পারস্য মুলুক থেকে আসছি। শুনেছি এখানে এমন উপবন আছে যেখানে পাখিরা কথা বলে, গান গায়, গাছপালা এবং নদী ঝর্নাও নাকি সঙ্গীত-মুখর হয়ে থাকে সর্বদা! আপনি কী বলতে পারেন, কোন পথে গেলে সেই শ্রুতিসুখকর নয়নাভিরাম জগতে আমি পৌঁছতে পারবো?

সাধু মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, সে বলতে পারে। কিন্তু মুখে কোনও কথা উচ্চারণ করলো না।

ফরিদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি মুখ ফুটে কথা বলছেন না কেন, ফকির সাহেব? আপনি যদি বলতে না পারেন, শুধু শুধু এখানে আমাকে দেরি করিয়ে দেবেন না। আমাকে যেভাবেই হোক সেই অপরূপ অলৌকিক উপবনে পৌঁছতেই হবে।

এবার ফকির বেশ পরিষ্কার বোধগম্য ভাষায় বললো, অধৈর্য হয়ো না বেটা, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। এতক্ষণ বলতে দ্বিধা করছিলাম, কারণ তোমার মতো এমন সুন্দর একটি নওজোয়ান ছেলের সেই বিপদ-সঙ্কুল দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-শিখরে ওঠা কি সঙ্গত হবে! বড় দুর্গম ভয়ঙ্কর সে পথ।

ফরিদ বলে, তা হোক, যেতে আমাকে হবেই। আপনি আমাকে নিশানা বলে দিন। আল্লাহ আমার দেহে যথেষ্ট শক্তি এবং মনে অপরিমিত সাহস দিয়েছেন। আমি কিছুতেই ভয় করি না।

—কিন্তু বেটা, অদৃশ্য দানবের সঙ্গে যুঝবে কী করে? তুমি তো তাকে চোখে দেখতে পাবে না। আর সেই সব ভূতপ্রেতদের সংখ্যা হাজার হাজার।

—তা হোক, আপনি আমাকে পথ বলে দিন, আমি যাব। কোনও বাধাই আমার কাছে বাধা নয়। কোনও বিপদই আমি গ্রাহ্য করি না।

সাধু বললো, বেশ আমার বারণ যখন শুনবে না, তখন যাও। পথ আমি বাৎলে দিচ্ছি।

এই বলে সে তার কাঁধের ঝুলি থেকে একটা লালরঙের মসৃণ ও গোলাকৃতি কঠিন বস্তু বের করে সজোরে নিক্ষেপ করলো! গোলাকার ডেলাটা অনেকটা দূরে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে বাঁই বাঁই করে ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। সাধু আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে বললো, ঐ—ঐ জায়গাটায় চলে যাও। ওখান থেকে সোজা উঠে যাবে পাহাড়ের চূড়ায়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতাত্তরতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

খুব সাবধান, সাধু বলতে থাকে, পাহাড়টা একেবারে খাড়াই। তবে দুপাশে ধরার মতো পাথরের চাঁই আছে অনেক। ওগুলো ধরে ধরে খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠতে হবে। মাঝে মাঝেই নানারকম বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে। ভেবো না, সেগুলো হাওয়ার দাপটের শব্দ, সবই ঐ সব অদৃশ্য ভূত-প্রেতের ভয় দেখানো আওয়াজ। ওসবে যদি ভয় পাও, তবে ওঠার পথেই তোমাকে খতম করে দেবে ওরা। তুমি ওদের হুমকীতে ভয় পেও না একটুও। কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে খুব সাবধানে ওপরে উঠতে থাকবে। এইভাবে সব বাধা-বিপত্তি এবং ভয়-ভীতি কাটিয়ে যদি ওপরে উঠতে পারো, দেখবে পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিরাট খোলা জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি। ওরা একে অন্যের সঙ্গে দিব্যি কথা বলছে, গান গাইছে। তুমি অনায়াসে ঐ পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। ওরা তোমার কথার উত্তর দেবে। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করবে, সেই গাছপালা ঝর্নাধারা কোথায়—যারা গানের মূর্ছনা তুলতে পারে? তখন পাখিরা তোমাকে নিশানা বলে দেবে। তারপর খোদা তোমার সঙ্গে আছেন।

যথা-নির্দেশিত স্থান থেকে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠার কালে প্রথম দিকে তেমন কোনও অসুবিধা মনে হলো না ফরিদের। কোনও ভয়ঙ্কর কিছুও শ্রুতিগোচর হলো না। শুধু মাঝে মাঝে মনুষ্যাকৃতির বড় বড় কালো পাথরের চাঁই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঝুলছিল। সেই পাথরগুলো ধরে ধরে সে উপরে উঠে যেতে লাগলো। ফরিদ বুঝতে পারলো, তার পূর্বসূরীরা অনেকে এই পথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে শয়তানের ভীতিতে ভয় পেয়ে পাথর হয়ে জমে গেছে।

আরও খানিকটা উঠতে এক বিকট কান-ফাটা গগন-বিদারী শব্দ ভেসে এল। ফরিদ বিচলিত হলো না একটুও। ফরিদ বেশ বুঝতে পারলো, এ আর্তনাদ কোনও মানুষের হতে পারে না। সব শয়তানের কারসাজী। তা হোক, ভয় সে পাবে না। কিছুতেই। হঠাৎ কে যেন প্রশ্ন করলো, কী চাও তুমি? কেন উপরে ওঠার দুঃসাহস করছো। এখনও বলছি ভালয় ভালয় নেমে যাও। নইলে আর সকলের যা দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছো—তোমারও তাই হবে।

এমন কর্কশ কণ্ঠ কী করে মানুষের হতে পারে। আর মানুষ হলে কী সে তাকে দেখতে পারে না? ফরিদ অবিচল নির্বিকার। শয়তানের শাসানি সে শুনেও শুনলো না। যেমন উপরে উঠছিল তেমনি উঠতে থাকলো।

আবার কানে এল, লোকটাকে টুটি টিপে মেরে ফেল, ওকে রুখে দাও, মেরে ফেল, রুখে দাও, মেরে—

অগণিত হাজার হাজার কণ্ঠের আক্রোশ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো চারদিক থেকে। আবার কেউ কেউ হুঙ্কার ছাড়তে লাগলো, লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও নিচে। ছাতু হয়ে যাক।

কিন্তু আবার যেন কে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বললো, আহা মেরো না, মেরো না, ছুঁড়ে দিও না, দেখছো না কেমন সুন্দর দেখতে—

কে যেন বললো, তুমি খুবসুরত, এস এস, আমাদের সঙ্গে এস।

মনে হলো খিল খিল করে হেসে উঠলো কারা। কিন্তু ফরিদ কিছুই গ্রাহ্যে আনলো না! সোজা ওপরে উঠতে লাগলো। মনে তার অদম্য সাহস। কোনও দিকে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইলো না, কে বা কারা তার আশে পাশে বা পিছনে ঘিরে ধরছে কিনা।

যতই সে উপরে যেতে থাকলো দানবের চিৎকার কোলাহল শাসানী হুঙ্কার ক্রমশই বাড়তে লাগলো। ফরিদ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ভূত-প্রেতের আগুনের হল্কার মতো প্রশ্বাস তার গায়ে লাগছে। কখনও বা চেঁচামেচি চিৎকার ক্ষীয়মান হয়ে মিলিয়ে যায়। মনে হয় ওরা ওকে ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। আবার কখনও বা মনে হয় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাক্ষসগুলো! চিৎকার গর্জনে কানের পর্দা ফেটে যায় আর কি!

বৃদ্ধ ফকির বলে দিয়েছিল চারপাশে বা পিছনে যাই ঘটুক, তুমি কখনও ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করবে না। এতক্ষণ সে সাধুর কথা স্মরণ রেখে কোনও কিছুতেই বিভ্রান্ত না হওয়ার সংকল্প নিয়ে শান্ত সবল পদক্ষেপে উপরে উঠে আসছিল। কিন্তু ঠিক তার পিছনে কে যেন কার মাথায় গদাম করে একখানা লাঠি বসিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তচিৎকার দিয়ে সে হাজার হাজার হাত নিচে পড়ে গেল। এরপর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না ফরিদ। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখতে চাইলো ঘটনাটা কী। এবং সেই তার প্রথম পদস্খলন। সঙ্কল্পচ্যুতি। এবং সেই তার চরম বিপর্যয়!

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো অদৃশ্য শয়তানরা। অর্থাৎ অবশেষে তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে বাছাধন! তৎক্ষণাৎ ফরিদের দেহখানা একখণ্ড কালো পাথরে রূপান্তরিত হয়ে পাহাড়ের গায়ে লটকে রইলো। সেই সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে ফরিদের পেয়ারের তাজি ঘোড়াটাও নিশ্চল পাথরের চাঁই হয়ে গেল। এবং ঐ গোলাকৃতি লাল শক্ত বস্তুটি গড়গড় করে গড়াতে গড়াতে ফিরে চলে গেল সেই বৃদ্ধ ফকিরের সামনে।

শাহজাদী ফরিজাদ প্রতিদিন দাদার দেওয়া ছুরিখানা পরীক্ষা করে দেখে। সে দিন সকালে উঠে ছুরির গায়ে রক্তের ছিটে দেখে তার বুক কেঁপে উঠলো। তা হলে তাদের বুকের কলিজা চোখের মণি বড় ভাই আর ইহজগতে বেঁচে নাই! আর সে ভাবতে পারে না। অস্ফুট এক আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো।

ফারুজ ছুটে এসে দেখে একপাশে বোন ফরিজা অন্যপাশে ছুরিখানা লুটিয়ে পড়ে আছে। বোনের মূর্ছিত দেহখানা তুলে ধরে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে প্রকৃতিস্থ করার প্রয়াস করতে থাকে ফারুজ। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এল। মেজ ভাইকে সামনে দেখে কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়লো, বড় ভাই আর বেঁচে নাই, দাদা। হায় হায়, কেন আমি তাকে যেতে দিলাম। আমার শখের বায়না মেটাতে গিয়ে দাদা আমার প্রাণ খোয়ালো। ও ফরিদ ভাই, কোথায় গেলে

তুমি। এ আমি কী করলাম। কেন তাকে যেতে দিলাম, দাদা ?

ফরিজাদ নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, কপাল বুক চাপড়ায়। নিজেকেই নিজে গালি-গালাজ করে, ওরে মুখপুড়ি, শয়তানী, তুই তো অমন সুন্দর ভাইটাকে হত্যা করলি ? এ পাপের শাস্তি তোর কী হবে ?

বোনকে নানাভাবে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফারুজ। সে-ও দাদার শোকে মুহ্যমান। কিন্তু এ অবস্থায় আদরের দুলালী ছোট বোনকে সামলাতে না পারলে সে হয়তো আত্মঘাতী হতে পারে। এই আশঙ্কায় ফারুজ বোনকে আঁকড়ে ধরে সোহাগ আদর দিয়ে ভ্রাতৃশোক ভোলাবার প্রয়াস করে।

—অমন করে কান্নাকাটি করে কী হবে, বহিন, নসীবে যার যা লেখা আছে তা তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। তা না হলে, বল, কোথায় পারস্য আর কোথায় ভারত, সহস্র যোজন পথ। সেই পথ পাড়ি দিয়ে সে মোউৎকে বরণ করতে যাবে কেন ? একবার শান্ত হয়ে ভেবে দেখ, নিয়তির এই-ই নির্দেশ ছিল। তা না হলে এমনটা হতে পারত না। যাই হোক, আমি তো আর এখানে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না, বহিন! আর কালবিলম্ব না করে এখুনি আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। দেখতে হবে দাদার কী হয়েছে। তুমি কিছু ভেবো না, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো তোমার কাছে।

ফরিজাদ আর্তনাদ করে ওঠে, না না, সর্বনেশে দেশে তোমার গিয়ে কাজ নাই। একবার এক ভাইকে হারিয়েছি, আর আমি আর এক ভাইকে ঐ বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারবো না।

ফারুজ হেসে ফরিজাদ-এর মাথায় হাত বুলায়।—পাগলী, আমার কোনও বিপদ আপদ হবে না, দেখে নিস। আমি যাচ্ছি, তুই বহিন, একটু সাবধানে থাকিস।

এই বলে ফারুজ বোনের হাতে একটা মুক্তোর মালা তুলে দিয়ে বলে, এই মুক্তোগুলোয় যদি কালো চিহ্ন দেখতে পাস তবে বুঝবি, দাদার যা দশা হয়েছে আমারও তাই ঘটেছে। তবে আমার বিশ্বাস, তেমন কিছু হবে না।

বিশ দিন একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ফারুজও এসে পৌঁছয় সেই বৃদ্ধ ফকিরের সামনে। ফকির তাকে অনেক চেষ্টা করে ঐ পাহাড় ওঠা থেকে বিরত হওয়ার জন্য। কিন্তু ফারুজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে যাবেই। তাই অবশেষে সে ঝুলি থেকে সেই গোলাকৃতি মসৃণ বস্তুটি বের করে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ঐ ওখান থেকে পাহাড় চূড়ায় উঠে যাও। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না, পিছন ফিরে তাকাবে না কখনও। তা সে যাই ঘটুক।

ফারুজ বৃদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য করে নির্ভয় চিত্তে পাহাড়-শীর্ষে আরোহণ করার জন্য উপরে উঠতে থাকে। দানব শয়তানের হুঙ্কার, চিৎকার, তর্জন গর্জন উপেক্ষা করে সে প্রায় শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছে, এমন সময় সে শুনতে পেল দাদা ফরিদের কণ্ঠস্বর, ভাইজান আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিস ? আমি যে পাহাড়-গহ্বরে আটকে পড়ে আছি ভাই একবার আমাকে একটু ধর।

ফারুজের সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে বুঝতেই পারলো, এও সেই

সব শয়তানদের এক অভিনব ছল। দাদাকে উদ্ধার করার জন্য পিছন ফিরে পলকে সে কঠিন কালো প্রস্তরখণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে ঝুলতে থাকলো।

ফরিজাদ রোজ সকালে উঠে মুক্তোর মালাটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে। সে দিন সকালে মালাটা হাতে নিয়েই সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।—হায় হায় একি হলো, এ কি করলাম আমি? দু-দুটি ভাইকে মেরে ফেললাম?

মুক্তোর মালাটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফরিজাদ বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হা-হুতাশ করতে থাকে। তারই দোষে তারা প্রাণ হারালো। সে এমনই সর্বনাশী, এমনই পাপীয়সী?

ফরিজাদ মন স্থির করে, সেও যাবে ভাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাতে যদি মোউং আসে তো আসুক। ক্ষতি কী? কী হবে এই শোকাহত বিষাদাচ্ছন্ন জীবনে বেঁচে থেকে। তার চেয়ে মৃত্যু যদি তাকে কোলে টেনে নেয়, সেই হবে তার পরম শান্তি।

পুরুষের ছদ্মবেশে সেজে তাগড়াই একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে ফরিজাদ। বিশ দিনের দিন সে-ও এসে পেঁছিয় সেই বৃদ্ধ ফকিরের আস্তানায়। ফরিজাদ সন্তকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, ফকির সাহেব, এদিকে দুজন খুবসুরত নওজোয়ান ছেলেকে দেখেছেন এর আগে? তারা এসেছিল সেই উপবনের সন্ধানে—যেখানে বনের পাখি কথা বলে, গান গায়, তরুশাখা এবং ঝর্নাধারা সংগীতে মুখর হয়ে থাকে, দেখেছেন কী তাদের?

বৃদ্ধ বললো, তুমিই তো সেই সুন্দরী ফরিজাদ? হ্যাঁ, আমি ওদের দুজনকেই দেখেছি। ওরা আমার কাছে সেই আশ্চর্য উপবনের নিশানা জানতে চেয়েছিল। আমি ওদের বারণ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা ওরা শোনেনি। তাই পথের নিশানা আমি বাতলে দিয়েছিলাম। তারপর, এর আগে আরও অনেকের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। আমি জানতাম, আমার উপদেশ ঠিক ঠিক জেনে শেষ পর্যন্ত কেউ চলতে পারবে না। তাই সকলকেই আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু সকলেরই এক গোঁ। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যা হবার তাই হয়েছে।

ফরিজাদ ভাবে, এই বৃদ্ধ ফকির তার নাম কী করে জানলো? তবে কী সে অন্তর্যামী ত্রিকালজ্ঞ পয়গম্বর?

ফকির বললো, আমি জানি তুমিও সেই আশ্চর্য উপবনে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারছো না। সেখানে পাখিরা কথা বলে বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঝর্না নদী গান গায়—সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার লোভ কী সামলানো যায়? তবু বলবো, আমার যদি কথা শোনও, ঐ দুর্গম গিরিশৃঙ্গে ওঠার পরিকল্পনা তুমি ত্যাগ কর ফরিজাদ? একাগ্র চিত্তে আমার উপদেশ মনে রেখে নিতে না পারলে তুমিও তোমার দাদাদের মতোই কালো পাথরের একখণ্ড চাঁই-এই পরিণত হবে।

ফরিজাদ বলে, না বাবা সাহেব, আশ্চর্য উপবনের যাদু দেখার কোনও বাসনা আমার নাই। কিন্তু আমার দুই দাদা যেখান থেকে ফিরে আসেনি সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই তাদের কী হয়েছে? আপনি

আমাকে মেহেরবানী করে পথটা একবার বলে দিন, বাবা ?

ফকির বললো, ঠিক আছে শাহজাদী ফরিজাদ নিজের চোখেই যখন দেখতে চাও তোমার দাদাদের হাল, যাও, পথ আমিও পথ বাতলে দিচ্ছি।

এই বলে ঝুলি থেকে সেই লাল গোলাকৃতি বস্তুটি দূরে নিক্ষেপ করে দিল বৃদ্ধ! বললো, ঐ দেখ ওটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পাহাড়ের তলায় একটা জায়গায় থেমে গেলো। তুমি চলে যাও সেখানে। ওখান থেকে পাহাড়ে ওঠার একটা দুর্গম পথ পাবে। ঐ পথ বেয়ে খাড়াই উঠে যেতে হবে সোজা ওপরে। আশে পাশে আকড়ে ধরার মতো কতকগুলো কালো পাথরের ঝুলন্ত চাঁই দেখতে পাবে। আসলে ওগুলো কিন্তু পাথর নয়। তোমার পূর্বসূরীরা শিখরে ওঠার আশা নিয়ে উঠতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে জমে গেছে। যাই হোক, ওগুলো ধরে ধরে তোমাকে এগোতে হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ মা ঐ পাহাড়ের চারপাশে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার ভূত-প্রেত ডাকিনী যোগিনী। ওরা তোমাকে ভয় দেখাবে। নানারকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ডাকে তোমার কানে তালা ধরিয়ে দেবে। ভয়ে তোমার বুক কেঁপে উঠবে। কিন্তু সাবধান, কিছুতেই ভীত হয়ো না। সামনে ছাড়া অন্য কোনও দিকে দৃকপাত করার চেষ্টা করো না। তাহলে তোমারও দশা তোমার ভাইদের মতোই হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ তার ঝুলি থেকে খানিকটা তুলো বের করে ফরিজার হাতে দিয়ে বললো, ভাল করে দু কানে গুঁজে নাও। তাহলে ঐ সব বিকট আওয়াজ তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

ফরিজাদ তুলোটুকু হাত পেতে নিয়ে দু কানে গুঁজে ফকিরকে সালাম জানিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

তুলো গুঁজা থাকার দরুন ভূত-প্রেতদের নানারকম বিকট আওয়াজ তার কর্ণকুহরে তেমন একটা পৌঁছতে পারলো না। তাই অনেক কষ্টে এক সময় সে পাহাড়-শিখরে উঠে আসতেও পারলো।

যে দিকে সে তাকায়, বড় সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করে। একটু এগোতেই চোখে পড়ে একটা বিশাল পাখির খাঁচা, তার মধ্যে হাজার হাজার নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর সব পাখি কল কল করে কথা বলছে পরস্পর। কাছে যেতেই একটা বুলবুল এগিয়ে এসে ফরিজাদকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এখানে এলে কী করে ?

ফরিজাদ বললো সব। বুলবুল শুনে বলে, খুব ভাল করেছ, ঠিক আছে, এখানে যখন এসে পড়েছ তখন ঘুরে ঘুরে সব দেখবে তো ?

ফরিজাদ বলে, শুনেছি এখানে গাছেরা গান গায় ?

বুলবুল বলে, ওমা, গাইবে না কেন ? তোমাদের দেশে বুঝি গায় না ? চল তোমাকে ঐ বনের কাছে নিয়ে যাই, ওখানে দেখবে কি সুন্দর সব গাছপালা। আর সোনালী জলের কি চমৎকার ঝর্ণা। সবাই গান গাইছে।

বুলবুল ফরিজাদকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখায়। ফরিজাদ

বলে, খুবই ভাল ভাই, কিন্তু মনে আমার সুখ নাই। এত আনন্দের মুলুকে এসেও খুশিতে নাচতে পারছি না।

বুলবুল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কেন ভাই ?

ফরিজাদ বলে, আমার দুই দাদা এই উপবনে আসতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে কালো পাথর হয়ে আটকে আছে।

বুলবুল বলে, ও এই কথা। ও জন্যে আবার দুঃখ করছ কেন ? এই ঝর্নার জল খানিকটা নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে ছিটিয়ে দাও ওদের গায়ে। দেখবে এখুনি ওরা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে আবার কথা ক'য়ে উঠবে।

বুলবুলের কথামতো ঝর্নার জল নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে ঢেলে দিল ফরিজাদ। আর কী আশ্চর্য, ফরিদ এবং ফারুজ দুজনেই তরতর করে উপরে উঠে এল তখুনি। শুধু ওর দুই দাদাই নয় এতকাল ধরে যে সব দুঃসাহসী নওজোয়ান এই পর্বতারোহণ করতে এসে শয়তানের পাল্লায় পড়ে কৃষ্ণপাথরে রূপান্তরিত হয়েছিল, তারা সকলেই সজীব হয়ে উঠলো।

এরপর ওরা তিন ভাইবোন বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে ওদের প্রস্তরীভূত ঘোড়াগুলোকে জীবন্ত করে তুললো।

ফরিজাদ বললো, চল দাদা, আগে ঐ সন্তের কাছে গিয়ে তাকে সালাম জানাই। কারণ তাঁর দয়াতেই আজ তোমাদের ফিরে পেলাম আমি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, সেই গাছতলায় এসে দেখা গেল, বৃদ্ধ ফকির আর সেখানে নাই। আস্তানা গুটিয়ে কোথায় সে চলে গেছে। ফরিজাদ বুলবুলকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার বুলবুল, ফকির সাহেব কোথায় চলে গেলেন ?

বুলবুল ঈষৎ রাগতভাবেই বলে, এ তোমার অযথা কৌতূহল শাহজাদী। তোমাকে তিনি কী শিক্ষা দিয়ে গেছেন, মনে নাই ? অহেতুক অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নাই। তোমার চারপাশে হাজারো রকম ঘটনা ঘটতেই পারে। সব ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাবে। তোমার নিজের কাজ তুমি ভাল করে সমাধা করবে, এই তার নির্দেশ। সেই কারণেই তিনি তোমার দু কানে তুলো গুঁজতে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, বুঝতে পারনি ? ফরিজাদ লজ্জিত বোধ করে। হ্যাঁ, তাই তো, তার নিজের যাতে কোনও প্রয়োজন নাই সে ব্যাপারে অযথা আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত হয়নি। বৃদ্ধ ফকির হয়তো তাদের পথ চেয়েই সেখানে অপেক্ষা করছিল। তার কর্তব্য কর্ম শেষ হয়ে যাওয়াতে সে প্রস্থান করেছে। সুতরাং ও নিয়ে সে কেন চিন্তা করছে ?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো উনআশীতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

এরপর বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে তিন ভাইবোন নিজের দেশ পারস্যে ফিরে আসে।

আবার দুই ভাই শিকারে যায়। ফরিজাদ বুলবুলকে নিয়ে ঘরে থাকে।

এখন সে তার দিবারাত্রির সঙ্গী। দুজনে কত কথা বলে, গান গায়।

একদিন শিকার শেষে ঘরে ফিরে আসছিল ফরিদ আর ফারুজ। পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেল সুলতান খসরুর সঙ্গে। পুত্রদ্বয়ের অলোক-সামান্য রূপে আকৃষ্ট হয়ে সুলতান থমকে দাঁড়ালেন। এমন চাঁদের মতো সুন্দর ছেলে দুটি কার?

ফরিদ আর ফারুজ কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়।

সুলতান সস্নেহে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমরা, বাবা?

—আমরা জাঁহাপনার বান্দা মৃত মালীপুত্র।

—ও, তোমরাই সেই দুই ছেলে? শুনেছিলাম, তোমাদের এক ভগ্নি আছে?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা, সে আমাদের ছোট। ঘরেই আছে সে।

সুলতান বলে, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হলো, বাবা। চল তোমাদের ঘরে যাওয়া যাক। বোনটিকেও দেখে আসি।

ফরিদ বলে, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা।

ফারুজকে সে ফিস ফিস করে বলে, তুই ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি চলে যা। ফরিজাদকে খবর দে, সুলতান আসছেন। তাঁর আদর আপ্যায়নের যেন ব্যবস্থা করে সে।

ফারুজ এসে বোনকে বললো, জানিস বোন, পথে সুলতানের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবো, ফরিজাদের সঙ্গে আলাপ করবো। ওরা এখুনি এসে পড়বেন। তুই একটু খানাপিনার ব্যবস্থা কর।

ফারুজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফরিজাদ সমস্যায় পড়লো, সুলতান বাদশাহ বলে কথা। তাঁকে আদর অভ্যর্থনা করার কতটুকুই বা সাধ্য আছে তাদের?

কি করা যায় কিছুই ঠাওর করতে না পেরে ফরিজাদ তার নিত্যসঙ্গী বুলবুলকে জিজ্ঞেস করে, কী করা যায় বলতো বুলবুল ভাই? স্বয়ং সুলতান আসছেন আমাদের ঘরে! কী খেতে দেব তাকে? কিসে তুষ্ট হবেন তিনি।

বুলবুল বলে, এ নিয়ে ভাবছো কেন? তোমাদের সুলতান শশা খেতে খুব ভালবাসে। এক কাজ কর একখানা মুক্তো দিয়ে শশার বিরিয়ানী বানিয়ে রাখ। সুলতান খুব তৃপ্তি করে খাবেন।

পাখিটার আজগুবি কথা শুনে ফরিজাদ ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। বলে, এ তুমি কী বলছো? মুক্তোর বিরিয়ানী? মুক্তো কী আবার খাওয়া যায় নাকি? বল, চালের বিরিয়ানী?

বুলবুল বলে, না না, চালের নয়, মুক্তো দিয়েই শশার বিরিয়ানী বানাও। সুলতান খুব তৃপ্তি করে খাবেন। আর অন্য কিছু খানা-পিনাও দরকার হবে না।

ফরিজাদ যদিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না তবু তার প্রিয় সংগী বুলবুলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলো না। কারণ সে জানতো, বুলবুল যা বলে তা ভেবে-চিন্তেই বলে। কখনও সে ফালতু কথা বলবে না।

সুলতান খসরু বাড়িতে প্রবেশ করার সংগে সংগে পাখিটা সোচ্চার হয়ে ওঠে, এই যে সুলতান খসরু, আসুন আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক। আমরা আপনার আগমনেরই প্রতীক্ষায় বসে আছি এত কাল।

ফরিজাদ এই প্রথম বোরখায় সর্বাংগ ঢেকে সুলতানের সামনে এসে যথা-বিহিত কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

সুলতান বলেন, বাঃ, চমৎকার! তোমরা আমার বহুকালের অনুরক্ত ভৃত্য মালীর সন্তান। আমার বড় আদরের! আজ তোমাদের বাবা বেঁচে থাকলে আরও আনন্দের হতো। যাই হোক, বাবা-মা তো আর চিরকাল কারও বেঁচে থাকে না। আল্লাহ তাকে কোলে নিয়েছেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? সব পিতা বেঁচে থাকে তার সন্তানের মধ্যে।

খাবারের টেবিলে কাপড় বিছানো হলো। ফরিজাদ শসা দিয়ে বানানো একটিমাত্র মুক্তোর বিরিয়ানীর থালা এনে রাখলো সেখানে। তারপর সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি আমাদের গরীবখানায় এসেছেন। বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করতে পারিনি। এই সামান্য একটু বিরিয়ানী বানিয়েছি। যদি মেহেরবানী করে আহার করেন।

ভারি মিষ্টি কণ্ঠস্বর ফরিজাদ-এর। এবং আরও মিষ্টি করে বলতে জানে সে। সুলতান খসরু মুগ্ধ হয়ে যান। বলেন, বাঃ, মাইজী নিজে হাতে বানিয়েছে, খাবো না? পেট ভরে পরিতৃপ্তি করে খাবো। তাছাড়া দেখছি আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার শসা দিয়ে বানিয়েছ? ওঃ, জিভে আমার জল এসে যাচ্ছে এখুনি।

সুলতান হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসে। শসা ভাজার টুকরোগুলোর দিকে লোলুপ চোখে তাকায়। কিন্তু একি! এ তো চালের বিরিয়ানী নয়। এক থালা মুক্তো—তার সংগে শসা ভাজা? খসরু ভাবে, এ নিশ্চয়ই নতুন ধরনের এক খানা। নিশ্চয়ই শসা ভাজার সংগে খেতে চালের বিরিয়ানীর চেয়েও সুস্বাদু লাগবে।

এই যখন ভাবছে সুলতান, সেই সময় বুলবুল পাখিটা বেশ জোরে জোরে বলে ওঠে, অমন করে ভাবছেন কী সুলতান খসরু। নিন খান। কী, একথালা মুক্তো দেখে ঘাবড়ে গেলেন? ভাবছেন এ আবার কেমনতর খানা? তাহলে অনেক বছর পিছনে চলে যান একবার। মনে আছে সুলতান খসরু, কোন এক সন্ধ্যায় আপনি বণিকের ছদ্মবেশে শহর পরিক্রমা করতে করতে এক দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেছিলেন? মনে পড়ে সে দিনের কথা? ভাল করে ইয়াদ করে দেখুন তো, একটি বস্তিবাড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-বাড়ির তিনটি অবিবাহিতা কন্যার নানারকম জল্পনা-কল্পনার কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেছিলেন কিনা। মনে পড়ে—ঐ তিন কন্যার সর্বকনিষ্ঠা বলেছিল, শাদী

যদি করতেই হয়, খোদ সুলতানকেই করবো? মনে পড়ে? ভাবুন, ভেবে দেখুন, আরও সে বলেছিল কিনা—আমাদের মিলনে যে সন্তানের জন্ম হবে তারা হবে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। আরও সে বলেছিল একটি মেয়ে হবে। তার মাথার চুল হবে সোনার মতো সোনালী। কান্নাতে তার পান্না ঝরবে, আর হাসলে পড়বে রাশি রাশি মুক্তো। এ সেই কন্যার মুখ-নিঃসৃত মুক্তো।

সুলতান খসরুর কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠছে ততক্ষণে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব তার মনে পড়ছে!

বুলবুল ফরিজাদকে উদ্দেশ্য করে বললো, ফরিজাদ, বোরখা খুলে পিতার সামনে দাঁড়াও। তোমার পিতা তোমাকে দেখুন। তোমার মাথার সোনালী চুল দেখলে তাঁর সব সংশয় ঘুচে যাবে।

ফরিজাদ বোরখা খুলে ফেলে সুলতানকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে, বাবা, —তুমি আমাদের বাবা! বল, বাবা, বুলবুল যা বলছে তা ঠিক?

বুলবুল এবার চটে ওঠে, বুলবুল কখনও মিথ্যে বলে না ফরিজাদ। তোমার পিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সেই রাতের পর পরদিন তোমার মা আর দুই মাসীকে তিনি দরবারে ডেকে এনেছিলেন কিনা। এবং সেইদিনই তিন বোনের ইচ্ছামত পাত্রের সঙ্গে তাদের শাদী হয়ে গিয়েছিল কিনা?

সুলতান মাথা নাড়েন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক। কিন্তু আমার বেগম তো তিনবারে তিনটি জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা পয়দা করেছিল।

—ঝুট! সব মিথ্যে কথা। বড় দুই বোন, ছোট বোনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হয়ে এই চক্রান্ত করেছিল! সুলতান তাদের শয়তানীর কথায় বিশ্বাস করে নিরপরাধ বেগম সাহেবাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন—

সুলতান খসরু আর্তনাদ করে ওঠেন, আমি সব—সব বুঝতে পারছি এখন। সব পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু—কিন্তু বেটা, ও পাপ আমি রাখবো কোথায়? তোমাদের জননী নিষ্পাপ ফুলের মতো পবিত্র এক মেয়ে। তাকে আমি কারাগারের দোজক যন্ত্রণা দিয়েছি এতকাল। এই গুনাহ কী খোদাতালা ক্ষমা করবেন?

ফরিজাদ বলে, কিন্তু বাবা, এতে তো আপনার দোষ সামান্যই। সাজা যদি পেতে হয় আমাদের মাসীদেরই পাওয়া উচিত! কারণ তারাই আপনাকে ধোঁকা দিয়েছিল।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

সুলতান বেগমকে কারাগার থেকে মুক্ত করে হারেমে নিয়ে এলেন। সে ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়ে সুখের সাগরে ভাসতে থাকলো। আর সেই বড় দুই বোন? তাদের যে-সাজা যোগ্য ছিল, তাই মাথা পেতে নিতে হলো তাদের।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ থামে। দুনিয়াজাদ এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনেছিল, এবার সে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলে, যেমন সুন্দর তোমার কিস্সা তেমনি মিষ্টি

তোমার বলার ঢং, দিদি।

—ঠিক। বিলকুল ঠিক বলেছে দুনিয়াজাদ। বহুৎ মিঠা তোমার বলার কায়দা, শাহরাজাদ। আহার নিদ্রা ভুলে রুদ্ধশ্বাসে শুনতে হয়!

শাহরাজাদ বলে, এবার জাঁহাপনা, আপনাকে সেই কামর আর হালিমাহর কিস্‌সা শোনাবো। তবে আজ তো রাত খতম হয়ে এল। আজ আর নয়, আসুন আমরা শুয়ে পড়ি। কাল থেকে শুরু করা যাবে, কেমন?

সুলতান শাহরিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে নিতে বলে, সেই ভাল, শাহরাজাদ আজ এখানেই গল্পের ইতি হোক। এস ঘুমের আগে আমরা একটু ভালবাসা করি, কী বল?

শাহরাজাদ সুলতানের বুকের তলায় হারিয়ে যেতে যেতে বলে, এই দুনিয়া ওদিকে ফিরে শো—মুখপুড়ি!

সাতশো আশীতম রজনী:

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে:

কোনও এক সময়ে এক শহরে আবদ অল রহমান নামে এক ধনী সওদাগর বাস করতো। আল্লাহর কৃপায় সে একটি পরম রূপবান পুত্র এবং পরমাসুন্দরী এক কন্যা লাভ করেছিল।

সওদাগর পুত্র-কন্যার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওদের দুজনকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে লালন-পালন করতে থাকে। একটিমাত্র বিশ্বাসী বৃদ্ধ নফর ওদের দুজনকে দেখাশুনা করতো। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে ওরা বড় হতে থাকে।

এইভাবে চৌদ্দটা বছর কেটে গেছে। ছেলের দেহে যৌবনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। একদিন সওদাগর-গৃহিণী স্বামীকে একান্তে ডেকে বললো, বলি ছেলের বয়স কত হলো খেয়াল আছে?

সওদাগর বলে, থাকবে না কেন, এইতো চৌদ্দ চলছে।

—তবে ছেলে কি এখনও সেই কচি খোকাটি আছে নাকি ভাবছ? তার বিয়ে শাদী দিতে হবে না? তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে শুনে নিতে হবে না। ঐভাবে অন্ধকার ঘরে ওদের বন্দী করে কী ফয়দা ওঠাবে শুনি?

—আহা বিবিজান, সওদাগর স্ত্রীর উষ্মা শান্ত করতে বলে, তুমি বুঝছ না কেন, কামর তো আর বাচ্চা ছেলের মত সাধারণ রূপলাবণ্য নিয়ে জন্মায়নি। ওর দিকে তাকালে যে ভয় করে আমার। অমন সর্বনাশা রূপ তো বাপু আমি আমার জীবনে কোথাও দেখিনি। আল্লাহর একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত।

একটামাত্র আমার পুত্র-সন্তান, সুলতান বাদশাহর ঘরে জন্মায়নি, গায়ে গতরে খেটে খেতে হবে। সাধারণ মানুষজনের সংগে মিশতে হবে না। এমন ঘরে এত রূপবান পুত্রের কী দরকার ছিল বিবিজান ?

—ওমা, একি কথা, সওদাগর-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুমি বাপ হয়ে একি কথা মুখে আনছো গো ? ছেলেমেয়ে দেখতে সুন্দর হবে, এ তো বাবা মায়ের চির-জীবনের সাধনা। কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, তা না আল্লাহর উপর দোষারোপ করছো ?

সওদাগর বলে, তুমি আমার আসল কথাটাই বুঝলে না, বিবিজান। ছেলেমেয়ে খুবসুরত হবে না, তা তো বলিনি। সব বাবা-মাই চায় তাদের সন্তানরা সুদর্শন সুন্দর হোক। কিন্তু তা বলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ঘরে আসমানের চাঁদ—একি শোভা পায়, বল, না এর ঝামেলাই সহ্য করা যায় ?

—ঝামেলা ? ছেলেমেয়েকে তুমি ঝামেলা মনে কর ?

—এ্যাই দ্যাখো, আমি বলতে চাইছি এক আর তুমি বুঝছো আর এক। কী মুশকিল বলতো।

—থাক থাক, অত বোকা বুঝিয়ে আর কাজ নেই। সে যাকগে, এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন।

—বল।

—বলি আখেরের কথা তো কিছু ভাবতে হবে ?

—আলবত ভাবতে হবে।

—তাহলে ছেলেকে ঘরের মধ্যে কয়েদ করে রাখছ কেন ? তাকে দোকানে বসাতে হবে না। তোমার বয়স হয়েছে। আল্লাহ করুন তুমি শ' সাল বেঁচে থাক! কিন্তু মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। আমিও আগে যেতে পারি, তুমিও পার। ধর যদি অসময়ে তেমন কিছু একটা বিপদই ঘটে যায় তখন ছেলেমেয়ে দুটো কি পথে বসবে ?

সওদাগর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, কেন, পথে বসবে কেন ? জান, বাজারে আমার কত বড় দোকান, এত আমার খদ্দেরপাতি। দেখে শুনে খেলে সাত পুরুষের কোনও ভাবনা থাকবে না।

—দেখে শুনে খেলে—তা দেখাশোনাটা কে করবে শুনি। ছেলেকে তো ঘরে পুরে রেখেছ। ধর আজ বাদে কাল তুমি ইন্তেকাল করলে। তখন হঠাৎ যদি একটা ফুটফুটে ছেলে গিয়ে গদীতে গিয়ে বসে বলে, এ দোকানের আমিই মালিক। লোকে শুনবে ? তারা মুখ টিপে হাসবে না ? বলবে না, কই সওদাগর সাহেবের কোনও লেড়কা আছে বলে তো আমরা কখনও শুনিনি ? তোমার ছেলেকে যদি দোকানে তারা ঢুকতে না দেয় তখন আমি কি কাছারী-আদালত করতে যাবো ? সংসারে বাঁচতে গেলে সমাজ ছাড়া বাঁচা যায় না। তাদের সকলের মতামত অগ্রাহ্য করেও টিকতে পারা যায় না। তাই আগে থেকেই সাবধান হতে হয়।

সওদাগর অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করে, তা—এখন কী করতে বল আমায়।

—কী আবার বলবো, ছেলেটাকে এখন থেকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাও। গদীতে বসিয়ে রাখ তাকে। পাঁচজনে দেখুক, জানুক এ তোমারই ঔরসজাত সন্তান। তারপর আস্তে আস্তে দোকানদারীও শিখে নেবে সে। খদ্দেরদের সঙ্গেও জানপছান হবে।

সওদাগর অনেকক্ষণ ধরে গৃহিণীর কথাগুলো অনুধাবন করে দেখলো। হুম, নাঃ, অন্যায় কিছু বলেনি কামরের মা। আজ যদি সে হঠাৎ মারা যায় তখন ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে। পাড়া-পড়শী বা সমব্যবসায়ীরা কামরকে হঠাৎ দেখে তার ঔরসজাত সন্তান বলে স্বীকার নাও করতে পারে। হয়তো এমনও ভাবতে পারে, স্ত্রীর অন্য কোনও ভালবাসার ছেলে! ছিঃ ছিঃ, সে কি লজ্জার ব্যাপার হবে।

—কই গো শুনছো, সওদাগর বিবিকে ডেকে বলে, ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক। ছেলেকে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানো দরকার। তা আর দেরি কেন, আজ থেকেই নিয়ে যাবো। ওকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে তৈরি করে দাও।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো একাশীতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ছেলের হাত ধরে সওদাগর দোকানের পথে রওনা হয়। কিন্তু মুহূর্তেই বিপদ ঘনিয়ে আসে। পঙ্গপালের মতো পথচারিরা এসে ছেঁকে ধরে কামরকে। সকলের চোখে-মুখে দারুণ বিস্ময়। এমন আসমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এল কী করে? কেউ হাত ধরে টানে। কেউ গাল টিপে আদর করে। কেউ বা চুমু খেয়ে যায়।

সওদাগর প্রাণপণে ভিড় ঠেলতে থাকে। ভয় হয় ভীড়ের চাপেই বুঝি তার ছেলেটা মারা যাবে। সে চিৎকার করে ওঠে, কী করছো তোমরা, সরে যাও। ছেলেটা মরে যাবে যে।

কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আজব বস্তু দেখার কৌতূহলে দলে দলে ছুটে আসতে থাকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

সওদাগর ছেলেকে নিয়ে কোনক্রমে ছুটতে ছুটতে এসে দোকানে ওঠে। ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় দোকানের পিছনের দিকে। কিন্তু জনতা তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ দোকানের সামনে এসে হুড়োহুড়ি করতে থাকে।

এই সময় ভিড় ঠেলে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ দরবেশ এসে ঢুকলো দোকানে। সওদাগর সসম্ভ্রমে স্বাগত জানাল ফকিরকে।

—কোথায় তোমার লেড়কা?

সওদাগর বললো—ওই ওপাশে বসে আছে। এদিকে রাখলে বাজারের মানুষ ওকে ছিঁড়ে খাবে। তাই লোকের চোখের আড়ালে বসিয়ে রেখেছি।

দরবেশ কামরের পাশে গিয়ে বসে। দোকানের বাইরে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ওই লোকটাকে বাইরে বের করে দিন। বুড়ো দরবেশগুলো ছেলে খাওয়ার যম।

সওদাগর চিন্তিত হয়ে ওঠে। সত্যিই এই সব ঘাটের মড়া ফকিরগুলো সাধারণতঃ ভীষণ বদ হয়। ছোট ছোট খুবসুরত ছেলেদের ওপর ওদের ভীষণ লোভ। সওদাগর দিশাহারা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কী করে সে ছেলেকে উদ্ধার করবে ?

—ফকির সাহেব, এবার তাহলে আসুন, আমার দোকান বন্ধ করে ঘরে যাবো।

সওদাগর নিরুপায় হয়ে দোকান বন্ধ করে পালাবার সিদ্ধান্ত পাকা করে। কিন্তু দরবেশ ওঠার নাম করে না। সওদাগর ভাবে, লোকটা পয়সা-কড়ি না নিয়ে নড়বে না। একটা মোহরের তোড়া ওর সামনে রেখে বলে, আজকের মতো ক্ষান্তি দিন। আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাবো।

গৃহিণীর ওপর আক্রোশে মনে মনে সে গজরাতে থাকে, আজ আগে বাড়ি যাই, তারপর তারই একদিন কী আমারই একদিন, দেখে নেব। উফ্, ছেলেকে দোকানদারী শেখাতে হবে। এখন শেখাও দেখি দোকানদারী। কাল থেকে মা-বেটাকে দোকানে পাঠাবো। দেখবে, কত ধানে কত চাল।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় সওদাগর আবদ অল রহমান। দরবেশ টাকার তোড়াটা স্পর্শ করে না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সওদাগর ছেলের হাত ধরে হন হন করে বাড়ির পথে রওনা হয়। কিন্তু দরবেশটা ওদের পিছু ছাড়ে না। সে ততোধিক লম্বা লম্বা পা ফেলে রহমানের পাশে এসে চলতে চলতে বলে, আজকের রাতটা আমি তোমার বাড়িতে মেহমান হতে চাই সওদাগর।

লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে রহমানের। এখন কী উপায় হবে। হাদিসের নির্দেশ আছে কোনও মুসাফীর যদি মেহমান হয়ে আসে তাকে ফিরিয়ে দিলে মহাপাতক হতে হবে। ইসলামের নির্দেশ অমান্য করবে কী করে সে? কিন্তু লোকটার মতলব ভাল নয়, ওকে বাড়িতে আশ্রয়ই বা দেবে কী করে সে ?

একবার যখন সে নিজের মুখে বলেছে তার ঘরে মেহমান হবে সে তখন কিছুতেই তাকে না করতে পারবে না রহমান। কিন্তু তা বলে লোকটাকে সারারাত সে আশ্রয় দেবে না তার ঘরে। সকাল সকাল খাইয়ে ওকে বিদেয় করে দেবে সে। কিন্তু লোকটা যদি বদ মতলব নিয়ে আমার ছেলের দিকে নজর দেয় তবে মেহমান বলে আর রেয়াত করবো না ওকে। আস্ত কবর দেব আমার বাগানে। তারপর ফৌজকে যেতে হয় যাবো, কুছ পরোয়া নাই।

লোকটার ভড়ং আছে আঠারো আনা। বাড়িতে পৌঁছেই সে নামাজের

ব্যবস্থা করতে বলে রহমানকে। মেহমানের যাতে অনাদর না হয় সে দিকে সওদাগর সচেতন। মাদুর পেতে দিল। ওজু করার পানি এনে দিল। দরবেশটা নামাজাদি শেষ করে কোরাণ পাঠ করতে থাকলো। সওদাগর ভাবে, নিয়মমতো অনেকেই কোরাণের কিছু অংশ পাঠ করে রেখে দেয়। কিন্তু অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, লোকটা কোরাণ থেকে আর চোখ ফেরায় না। পাতার পর পাতা সে পাঠ করতে থাকে। সওদাগর নিরুপায়। রাত গভীর হয়ে আসে। কিন্তু ফকিরকে বলতে পারে না পাঠ শেষ করুন, খানা-পিনা সেরে নিন, আপনাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু লোকটা থামতে জানে না বোধ হয়। রহমান ছটফট করতে থাকে। ঘরছেড়ে ভিতরে চলে যায়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে অতিথিকে একা ফেলে অন্যকাজে মন দিতে নাই। তাই সে কামরকে বলে, যা তো বাবা, ফকির সাহেবের পাশে গিয়ে বসে কোরাণ পাঠ শোন। ধর্ম কথা কানে গেলেও পুণ্য হবে।

কামর বলে, কিন্তু আব্বাজান লোকটা দোকানে হাত লাগিয়ে আমার গাল টিপে দিয়েছিল।

রহমান হাসে, বুড়ো মানুষ, একটু আদর করেছে, তাতে দোষ কী। যা কাছে গিয়ে বোস। যদি একটু আধটু আদর টাদর করে, উঠে আসবেনা যেন। হাজার হলেও মেহমান তো আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

ছেলেকে দরবেশের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কিন্তু রহমান নিশ্চিন্ত হতে পারে না। দোতলার একটা ঘরের জানলার পাশে গিয়ে বসে সে। সেখান থেকে দরবেশকে পুরো নজর করা যায়। কিন্তু দরবেশ তাকে দেখতে পাবে না।

কামর আসে। দরবেশের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটার চোখ ছলছল করে ওঠে।

—এস এস, কাছে এস, বেটা। এখানে আমার কোলে এসে বোস।

আহা গলায় যেন মধু ঢালা। কামারকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে মনে মনে সে যে হা হুতাশ করছিল তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কামর তার কোলে অবশ্য বসেনা, কিন্তু বেশি দূরত্ব না রেখে প্রায় গা ঘেঁষেই বসে পড়ে।

দরবেশ বলে, বসো বেটা ভাল করে বসো। কোরাণ পাঠ করি, মন দিয়ে শোন।

দরবেশ এক মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে থাকে। ভাবাবেগে অশ্রুধারা নামে তার দুগাল বেয়ে। দোতলার ওপর থেকে রহমান এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়। মিথ্যাই সে তাকে সন্দেহ করে ছিল। আসলে সে তো এক ধর্মপ্রাণ।

তাড়াতাড়ি সে নিচে নেমে আসে। দরবেশের সামনে হাত জোড় করে বলে আমার গুস্তাকী মাফ করবেন ফকির সাহেব। আপনার চোখে জল কেন? আমার আদর যত্নে কী কোনও দোষ হয়েছে।

দরবেশ স্মিত হেসে বলে, না বাবা, সে সব কিছু নয়।

—তবে?

—কেন বাবা আমার পুরোনো ক্ষত খুচিয়ে আবার ঘা করে দিতে চাইছো ?

রহমান বলে, আমি আপনাকে জোর করছিনা, বাবা সাহেব। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে আমাকে শোনাতে পারেন। শুনতে বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার।

বৃদ্ধ বললো, বেশ তাহলে বলছি, শোন।

আমি এক কপর্দক-শূন্য দরিদ্র দরবেশ। এ সংসারে নিজের বলতে কোনও ধন-সম্পদই আমার নাই। আল্লাহর আশীর্বাদই আমার একমাত্র পাথেয়। তাই সঙ্গে করে দেশে দেশে পথে-পথে ঘুরি।

এমনি ভাবে চলতে চলতে একবার এক জুম্মাবারের সকালে বসরাহ শহরে পৌঁছলাম। বাজারে ঢুকে দেখি কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই। অথচ প্রতিটি দোকানপাট খোলা। নানারকম জিনিসপত্রে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো গোছানো। অবাক কাণ্ড, আতিপাতি করে তলাশ করেও না কোনও খদ্দের, না কোনও দোকানী—কারও দেখা পেলাম না। চারদিকে যেন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। ভাবতে লাগলাম, দোকানপাট যেভাবে পসরা সাজানো—তাতে মনে হয় এইমাত্র সবাই ছিল. কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মুহূর্তে সকলে উধাও হয়ে গেছে।

খিদেয় আমার পেট জ্বলছিল। সামনেই দেখলাম এক হালুইকরের দোকান। থরে থরে মিঠাই মণ্ডা সাজানো। মনে হলো, এইমাত্র বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। দোকানে ঢুকে যতটা প্রাণ চায় খেলাম। পাশেই একখানা কাফিখানা। সেখানে ঢুকে নানারকম কাবাব, কোরমা, বিরিয়ানী, কালিয়া যা ইচ্ছে হলো পেট পুরে খেয়ে নিলাম। সত্যি, বিশ্বাস কর, অমন মুখরোচক সুগন্ধী খানা আমি তার আগে কখনও আস্বাদ করিনি। এরপর আমি এলাম এক শরবতের দোকানে। এক পেয়ালা খুসবুওয়ালা পেস্তার শরবত খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে থাকলাম।

শরবত খেয়ে দোকান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটছি। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে থাকলাম। এত বড় শহর, কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই—যেন এক বিরাট কবরখানার মধ্যে দিয়ে চলেছি।

হঠাৎ এক বাজনার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম! তবে কী কেউ বা কারা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের লহরা কানে স্পষ্টতর হতে থাকলো। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, এ সংগীত কোনও শুভ সংকেত নয়। নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের কাজ। আমি একটা গুদোমের পালাকরা বস্তার আড়ালে লুকিয়ে রাস্তার দিকে চোখ মেলে রাখলাম। সেখান থেকে পথচারীদের আমি সবই প্রত্যক্ষ করতে পারবো কিন্তু ওরা শত চেষ্টা করলেও আমাকে দেখবে না কেউ।

একটু পরেই বুঝতে পারলাম বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে একটা মিছিল আসছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে।

পরীর মতো সুন্দরী চল্লিশটি মেয়ে পথের দু'ধার দিয়ে দুই সারি বেঁধে চলেছে। তাদের রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু এহ বাহ্য। এদের পিছনে একটা খচ্চরের পিঠে আসীন এক অলোক-সামান্যা পরমাসুন্দরীকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পথে প্রবাসে ঘুরে ঘুরেই আমার দিন কাটে। জীবনে অনেক ভালো অনেক খারাপ অনেক সুন্দর অনেক অসুন্দর আমি দেখেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর বাবা, সে দিন যাকে দেখেছিলাম তার জুড়ি দেখিনি কোথাও? কোনও মেয়ে যে অমন রূপসী হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আমার মুখে এমন কোনও ভাষা নাই যে তার রূপের বর্ণনা দিতে পারি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিছিল পার হয়ে গেল, আমি বস্তার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে দোকানপাট একটু আগেও জনশূন্য খাঁ-খাঁ করছিল তা আবার মুহূর্তেই দোকানী আর খদ্দেরে সরগম হয়ে উঠেছে। একজনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, কাকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেল ওরা? আমার প্রশ্ন শুনে লোকটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আপাদমস্তক এক সন্দেহের চোখে একবার দেখে নিয়ে ভীত-চকিত হয়ে সরে গেল, কোনও জবাব দিল না। আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু সেও ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে ছুটে পালাল! এরপর যাকেই জিজ্ঞেস করি কেউ আমার কথার জবাব না দিয়ে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে কেটে পড়ে। শেষে এক নাপিতকে পাকড়াও করলাম, ও নাপিত ভাই, ব্যাপার কী বলতে পার, কে গেল মিছিল করে?

আমার কথা শুনে নাপিত কানে আঙগুল দিল। ফিস ফিস করে বললো, ওসব কথা জিজ্ঞেস করতেও নাই, জবাব দিতেও নাই। মনে হচ্ছে আপনি পরদেশী, এখানে আর আপনার একদণ্ডও থাকা উচিত নয় মুসাফির। আপনি এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান! এর বেশি আর কিছু জানতে চাইবেন না, বলতে পারবো না। জানে যদি বাঁচতে চান, এখুনি শহর ছেড়ে পালান। ভাগ্যে আপনি মিছিল আসার আগে বুদ্ধি করে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলেন, না হলে আপনার কাটা মুণ্ডু এতক্ষণে এখানে গড়াগড়ি যেত। আমরা সদা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকি। একটু আগের দোকান-পাটের অবস্থা দেখে টের পেয়েছেন আশা করি। কখন যে কার ভাগ্যে কী ঘটতে পারে, কেউ জানি না আমরা।

নাপিতের কথা শুনে বুঝলাম ও-শহরে আমার মতো ভাব-ভোলা মানুষের আর এক দণ্ডও অবস্থান করা উচিত নয়। তাই সেই মুহূর্তেই শহর ছেড়ে প্রান্তরের পথে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে অবশেষে আজ এসে পৌঁচেছি তোমাদের এই শহরে। এসেই দেখলাম তোমার এই পুত্রকে। আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়। তখন থেকে আমার শুধু একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে, এ ছেলের একমাত্র জুটি ঐ বসরাহ-সুন্দরী। বসরাহতে তাকে দেখার পর থেকে শুধু এই কথাই ভেবেছি, এমন তুলনাহীন সুন্দরীর যোগ্য বর কোথায় মিলবে?

তা আল্লাহ যখন তাকে পয়দা করেছেন, তার উপযুক্ত জুটিও যে বানাবেন তাতে আর সন্দেহ কী? তোমার পুত্রকে দেখে বুঝলাম এ পাত্র একমাত্র তারই যোগ্য হতে পারবে। এখন খোদার কী অভিপ্রায় জানি না, তবে এরা একসঙ্গে মিললে সোনায় সোহাগা হবে।

দরবেশ তার কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো, ব্যস, আজ এই পর্যন্ত। এবার আমি বিদায় নিচ্ছি, সওদাগর। তোমার আতিথেয়তা আমার মনে থাকবে। আমি আশা করবো তোমার পুত্র বসরাহ-কন্যাকে শাদী করে সুখ-সম্ভোগে বসবাস করুক।

এরপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই রাতের অন্ধকারেই পথে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তরুণ কামর সারাটা রাত বিনিদ্রভাবে কাটাল। বৃদ্ধ দরবেশ তার মনে নতুন রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেল। কল্পনার তুলি দিয়ে মনে মনে সে সেই বসরাহ-কন্যার ছবি আঁকার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই তার অলোক-সামান্যা রূপলাবণ্যের মূর্তিটি প্রতিভাত করতে পারে না।

পরদিন সকালে উঠে সে মা-এর কাছে গিয়ে বায়না ধরে, মা আমি আজই বসরাহ পথে রওনা হবো। আমর সামান-পত্র গুছিয়ে দাও। ঐ বসরাহ-কন্যাকে না পেলে এ জিন্দগী বরবাদ হয়ে যাবে আমার।

মা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। স্বামী আবদ অল রহমানকে ডেকে বললো, শোন তোমার ছেলের কথা। সে গোঁ ধরেছে, বসরাহয় যাবে। সেই মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে সে শাদী করবে না।

রহমান ছেলেকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। বিদেশ বিভূঁই জায়গা। জানা নাই, চেনা নাই, আন্দাজে কোথায় যাবি, বাবা?

কিন্তু কামর তার মত বদলাতে রাজি নয়। সে যখন ভেবেছে, যাবেই। তাতে যা ঘটে ঘটুক। সে বললো, আমি যাবই। এতে যদি তোমরা বাধা দাও, আমার মরা মুখ দেখবে।

মা বাবা দুজনেই শিউরে ওঠে, ওকি কথা! অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে নাই বাবা।

রহমান সব দোষ তার বিবির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। তোমার বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে আজ ছেলেটাকে খোয়াতে বসেছি।

দুঃখে হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ে, আবদ অল রহমান, নিজেকে বড় বুদ্ধিমান ভেবেছিলে! অতি সাবধানে ছেলেকে সিন্দুকে পুরে আগলে রাখতে চেয়েছিলে। ঠিক হলো, এই তোমার উচিত পুরস্কার পাওনা ছিল।

যার নসীবে যা লেখা থাকে কেউই খণ্ডন করতে পারে না। কামর-এর মা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, এ নিয়ে আর হা-হুতাশ করে কী করবে, বল। যা ঘটবার তা ঘটবেই। তুমি আমি হাজার কোসিস করেও ঠেকাতে পারবো না।

ছেলের যাত্রার গোছগাছ করে দিল মা। একটা বটুয়াতে ভর্তি করলো

হীরে চুনী পান্না! ছেলের হাতে দিয়ে বললো, ভাল করে সঙ্গে রাখিস। বিপদ আপদের সহায়!

রহমান ছেলেকে নব্বই হাজার দিনার রাহাখরচ দিল। এবং তার পুরোনো নফরদের দুজনকে সঙ্গে দিয়ে বললো, এরা দুজন আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রিয় বান্দা, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, দেখা শুনা করবে। এদের পরামর্শ অমান্য করো না। কারণ, নফর হলেও, এরা তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—জ্ঞান বৃদ্ধ।

উটের পিঠে রসদ এবং অন্যান্য সামানপত্র চাপিয়ে সেইদিনই কামর ইরাকের পথে রওনা হয়ে গেল। এবং কিছুদিন পরে নিরাপদেই বসরাহতে এসে পৌঁছল।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তিরাশীতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সেদিনও ছিল জুম্মাবার। কামর শহরে প্রবেশ করেই দরবেশের কথার সত্যতা বুঝতে পারে। কী আশ্চর্য, পথঘাট জনশূন্য, দোকানপাট খোলা। থরে-থরে সামানপত্র সাজানো। কিন্তু কোনও দোকানে দোকানীও নাই, খদ্দেরও নাই। যেদিকে তাকায় খাঁ খাঁ করছে। নিজের পায়ের শব্দেই সে চমকে ওঠে।

খিদে পেয়েছিল ভীষণ। একটা দোকানে ঢুকে পেটপুরে খেয়ে নিল কামর। কিন্তু দাম মেটাবে কাকে? কেউ তো দোকানে নাই। যাই হোক, বাইরে বেরিয়ে আসতেই দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ বাদ্য-সঙ্গীত শুনতে পেয়ে সে দরবেশের কথা স্মরণ করে একটা গুদোমের পালাকরা বস্তার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

একটু পরেই মিছিল বাজারের পথের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো। কামর উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে।

চল্লিশটি সুবেশা অপ্সরীর মতো সুন্দরী রমণী-পরিবৃতা হয়ে এক নবযৌবন-উদ্ভিন্না সুকুমারী ভ্রমণে বা বিহারে বেরিয়েছে। দরবেশ তার লাবণ্যের অসামান্যতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি, শুধু বলেছিল দুনিয়ার সর্বত্র সে ঘুরেছে সারা জীবনভোর, কিন্তু অমন রূপ সে কখনও দেখেনি। কামর ভাবলো, ফকির সাহেব সত্যিই বলেছিল—এ রূপের জুটি মেলা ভার।

রুদ্ধশ্বাসে অপলক দৃষ্টিতে তরুণীর রূপসমুদ্রে অবগাহন করতে থাকে কামর। এতদিনের পথ-শ্রম; মা-বাবার মনে দুঃখ দিয়ে চলে আসা—সব আজ তার কাছে সার্থক হয়ে উঠলো এই মুহূর্তে। মনে মনে নিজেকে সহস্র ধন্যবাদ জানাতে থাকে সে,—ধন্য কামর, তুমি আজ সত্যই ধন্য হয়ে গেলে। আজ দুচোখ ভরে যে রূপ তুমি দর্শন করলে, তারপর তোমার যদি মৃত্যুও আসে কোনও খেদ থাকবে না।

মিছিল অদৃশ্য হয়ে গেলে কামর বাইরে এসে দেখে পথঘাট হাটবাজার

জনসমাকীর্ণ। দোকানী দোকানে বসেছে, খ... রদাম করে কেনা কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী আশ্চর্য, এদের মুখ দেখে বুঝবারই জো নাই, একটু আগেই তারা আতঙ্কে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

কামর একটা দোকানে ঢুকে খুব জমকালো একটা সাজ-পোশাক কিনে বাজার সন্নিহিত হামামে গিয়ে খুব ভাল করে ঘষে মেজে সাফ করে অনেক জল ঢেলে স্নান করে শাহজাদার মতো সাজে সেজে-গুজে পথে বেরিয়ে এল। অদূরেই সেই নাপিতের দোকান। লোকটা তখন একজনের মাথায় ক্ষুর ধরেছে। প্রায় আধখানা মাথা সাফ করে এনেছে, এমন সময় কামারকে ঐ বেশে তার দোকানে ঢুকতে দেখে হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সেলাম ঠুকে স্বাগত জানায়। কামর ওর হাতে একটা মোহরের তোড়া গুঁজে দিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। তা এখানে তো তোমার খদ্দেররা রয়েছে, একটু বাইরে আসবে ?

নাপিত তোড়ার ওজনটা অনুভব করে বুঝতে পারে মালকড়ি নেহাত কম নাই। বিচলিত হয়ে বলে, কী যে বলেন হুজুর, আপনি হুকুম করলে আমি জাহান্নামেও যেতে পারি।

দুজনে দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে একটু নিরালা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। কামর বলে, শুনেছি প্রতি জুম্মাবার সকালে এই পথ দিয়ে একটা মিছিল যায়। এবং যে-কোনও কারণেই হোক, সেই সময়টায় পথঘাটে, হাটে বাজারে কোন জনপ্রাণী থাকে না। কিন্তু কেন ? কার ভয়ে ? আমি এই শহরে নবাগত। আড়ালে লুকিয়ে ঐ মিছিলের সুন্দরীকে আজ আমি দেখেছি। এক কথায় বলতে গেলে, চোখে আমার ধাঁধাঁ লেগে গেছে। এমন রূপ কখনও দেখিনি। তা বলতে পার, এই ডানাকাটা পরীটি কে ?

নাপিত গম্ভীর হয়ে গেল। কী যেন ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর বললো, আমি ঠিক জানি না, মালিক। তবে এইটুকু বুঝেছি, শুক্রবার সকালে ঐ মিছিল পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ দোকান পাটে বসতে বা কেনাকাটায় বেরুতে সাহস করে না।

—এর কারণ কী ? ভয়টা কোথায় ?

নাপিত কাচুমাচু মুখে বলে, আজ্ঞে এর বেশি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আমি জানি না, বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, আমার বিবি সব জানে। তাকে জিজ্ঞেস করলে এবং সে যদি রাজি হয় সব আপনাকে বলতে পারবে। আপনি একটুক্ষণ এখানে দাঁড়ান, হুজুর, আমি আমার বিবিকে জিজ্ঞেস করে আসি। সে যদি রাজি হয়, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো আমার বাড়িতে।

এই বলে নর-সুন্দরটি তার দোকানের আধ ন্যাড়া খদ্দেরটির কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে তোড়াটা নাচাতে নাচাতে বাড়ির পথে ছুটে যায়।

বিবির হাতে মোহরগুলো তুলে দিয়ে বলে, বহুত বড়িয়া এক মালদার সওদাগরকে পাকড়াও করেছি। এক্ষুণি তাকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে, বরাতে থাকলে আরও কিছু মিলতে পারে বিবিজান। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

ওকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে, কেমন ?

ছুটতে ছুটতে সে কামরের কাছে এসে বলে, বিবিজান আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে—আর ভাবনা নাই, আপনি আসুন, মালিক।

নাপিতের সঙ্গে কামর ওর বাড়িতে এসে পৌঁছয়। নাপিত-গৃহিণী বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে বেশ। কামরকে সে অতিথির অধিক আদর আপ্যায়ন করে বসালো। দামী খুসবুওলা শরবত এনে খেতে দিল এবং পরম স্নেহময়ীর মতো কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো।

এই সুদূর প্রবাসে এসে এমন একজন মাতৃসমা মমতাময়ীর দেখা পেয়ে কামর উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নাপিত-গৃহিণী কামরকে নানারকম খানা-পিনা এনে খেতে দেয়। মুখে মধু ঢেলে বলে, কী আর খেতে দেব বাবা, গরীব-সরীব মানুষ। ঘরে যা ছিল দিলাম, জানি না তোমার মুখে রুচবে কিনা।

কামর লজ্জিত বোধ করে, কী যে বল মা, ভালবেসে দিলে খুদ-কুঁড়োও অমৃত মনে হয়।

খানা-পিনা শেষ হলে, কামর জেব থেকে এক মুঠো মোহর বের করে নাপিত-বৌ-এর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এটা ছেলের ভালবাসার দান, নাও মা। তোমার আদর-যত্নের দাম এই তুচ্ছ টাকা পয়সা দিয়ে হতে পারে না। কিন্তু আমি এখানে পরদেশী, এর বেশি তো আর কিছুই দিতে পারবো না, মা।

মোহরগুলো ওড়নার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে নাপিত-বৌ বলে, অমন করে বলো না বাছা, আমাদের এই গরীবখানায় তোমার বড় কষ্টই হবে।

—ও-নিয়ে তুমি একদম ভাববে না, মা। আমাকে না ঘরের ছেলে বলে মনে করেছ ? তবে অমন পরপর ভাবছো কেন ? নিজের ছেলের মতো করে ভাবো, দেখবে আর খুঁত খুঁত করবে না মন। যাই হোক মা জননী, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি, এবার সে সম্বন্ধে কিছু শোনাবে ?

নাপিত-বৌ বলে, আলবৎ, একশোবার শোনাবো, বেটা। তবে শোন ঃ

আমাদের এই বসরাহর সুলতান একদিন ভারতের সম্রাট-এর কাছ থেকে একটা ইয়া বড় মুক্তো উপহার পেলেন। আমরা তো দেখিনি, শুনেছি, অত বড় মুক্তো নাকি হয় না। একেবারে ছোটখাটো একটা সূর্যের মতো। সব সময় তার গা থেকে আলোর রোশনাই ঠিকরে বেরোয়।

সুলতান বাজারের জহুরীদের ডেকে মুক্তোটা দেখিয়ে বললেন, আমার ইচ্ছে এটা গলায় পরে থাকি। কিন্তু মুক্তোটা তো আনকোরা। সুতো পরানোর কোনও ফুটো নাই। তোমরা খুব সাবধানে এটায় সুতো পরাবার মতো সূক্ষ্ম একটা ফুটো করে দাও।

জহুরীরা এক এক করে সকলেই সেই পরমাশ্চর্য মুক্তোটা নেড়ে চেড়ে দেখে বিষণ্ণ বদনে সুলতানের হাতে ফেরত দিয়ে বললো, এ বস্তু জীবনে আমরা এই প্রথম দেখলাম। হাজার হাজার মুক্তো আমরা কেনাবেচা করেছি, করছি, কিন্তু এমন অসাধারণ রত্ন কখনও চোখে পড়েনি, জাঁহাপনা। জানি না এর কত মূল্য। অথবা কোনও অর্থের বিনিময়ে আদৌ এ বস্তু কেনা যায় কিনা—তাও আমাদের

অজানা। সেই কারণে এই অমূল্য রত্নে যন্ত্র চালিয়ে ফুটো করার দুঃসাহস আমাদের কারো নাই। যদি কোনও কারণে টুটে যায় তা হলে? তা হলে কী দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে পারবো আমরা? না না, হুজুর, আমরা অপারগ, এ মুক্তোয় আমরা বিঁদ করতে পারবো না।

সুলতান হতাশ হয়ে বললেন, সে কি কথা? তোমরা সব আরব দুনিয়ার তুখোড় সব জহুরী। তোমরা যদি না পার, কে পারবে? আমার যে বড় শখ, মুক্তোটা কারে ঝুলিয়ে গলায় পরবো। আমার বুকের ওপর জ্বলন্ত সূর্যের গোলার মতো দুলবে সারাদিন। লোকে অবাক হয়ে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে—আমার এই শখটা মিটবে না?

জহুরীদের একজন বললো, এই শহরে উবেদ নামে এক বৃদ্ধ কারিগর আছে। জাঁহাপনা যদি তাকে তলব করেন, আমাদের মনে হয়, সে একাজ করে দিতে পারবে।

সুলতান আশান্বিত হয়ে বললেন, বেশ তো তাকে ডাকো।

সুলতানের হুকুমে তখনই বৃদ্ধ উবেদকে হাজির করা হলো। সুলতান বললেন, দেখ এই মুক্তোটা। এটা ফুটো করে দিতে হবে। আমি গলায় ধারণ করবো? কিন্তু সাবধান, কোনও ক্রমেই যেন চোট না খায়। যদি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পার তবে তোমার মনঃস্কামনাও আমি পূরণ করবো—তা সে যাই হোক।

বৃদ্ধ উবেদ মুক্তোটা হাতে নিয়ে নিরীক্ষণ করলো কিছুক্ষণ। তারপর কোমর থেকে একটা তুরপুণ বের করে আশ্চর্য দক্ষতায় পলকের মধ্যেই এপার ওপার করে দিল! সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন জাঁহাপনা, আপনার রত্নের গায়ে কোনও চোট লেগেছে কিনা!

সুলতান দেখলেন একটা সূক্ষ্ম সূতো পরাবার মতো নিখুঁত একটি ছিদ্র হয়ে গেছে অথচ মুক্তোর গায়ে কোথাও আঘাত লাগেনি।

—সাবাস্, চমৎকার হয়েছে। এবার তোমার পালা। বল বৃদ্ধ, কী চাও তুমি? যা চাইবে আমার ওয়াদা মত আমি পূরণ করবো। বল, নির্ভয়ে বল তোমার মনের বাসনা।

বৃদ্ধ উবেদ বলে, জাঁহাপনা বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়েছি আমি। এবং বুদ্ধি-সুদ্ধিও আমার বরাবরই কিছু কম। ঘরে আমার রূপসী বিদুষী তরুণী বিবি আছে। দেখতে যেমন সে ডানাকাটা পরি, গুণেও তেমনি সে সেরা। তার বুদ্ধির কাছে অনেকেই হার মানে। তার মতামত ছাড়া কোনও কাজই করি না আমি। জাঁহাপনা যদি অনুমতি দেন, আমি বিবিজানের কাছ থেকে জেনে আসি।

সুলতান বললো, বেশ তো, চটপট যাও, জেনে এস। কথা যখন দিয়েছি, ওয়াদা আমি পূরণ করতে চাই।

বৃদ্ধ উবেদ ঘরে ফিরে এসে সুলতানের অভিপ্রায়ের কথা বলে বিবিকে। উবেদ-বৌ আনন্দে নেচে ওঠে, উফ্ কী মজা! এতদিনে আমার মনের

বাসনা পূর্ণ হবে।

উবেদ বলে, হবে মানে? যা চাইবে তাই পাবে, বিবিজান। যত টাকা পয়সা, সোনাদানা—যা চাইবে তাই পাবে। একবার মুখ দিয়ে বের করতে পারলেই হবে। বিবিজান, আমার ভাবতে কী রকম গা শিরশির করছে। আর আমাদের এই রকম দীন ভিখারির মতো দিন কাটাতে হবে না। কাল থেকেই আমরা আমির ওমরাহ বনে যেতে পারবো। শুধু একবার বেশ বুদ্ধি করে ভেবে চিন্তে বল কী চাইতে হবে। আমি মুখ দিয়ে বের করা মাত্র সুলতান বলবেন, 'আর্জি মঞ্জুর।' ব্যস, আর দেখতে হবে না—আমরা রাতারাতি বড় লোক হয়ে যাবো। যাই হোক, আর দেরি করো না বিবিজান, চটপট বল কী চাইতে হবে। আমাকে আবার এখুনি দরবারে ফিরে যেতে হবে, এখুনি।

উবেদ-বৌ বলে, ভাববার কিছু নাই গো, অনেক আগেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, জীবনে যদি তেমন কোনও সুযোগ আসে তবে আমার একটা সাধ মেটাবো প্রাণ ভরে।

—কী সাধ গো, বল না?

—বলছি বলছি। বলবো বলেই তো ছটফট করছি তখন থেকে। ভাল করে শোন, সুলতানকে গিয়ে বলবে, জাঁহাপনা, আমার বাসনাটা নিতান্তই সামান্য। টাকাকড়ি বলতে কিছু চাই না আমি। শুধু আপনি অনুমতি করুন, প্রতি জুম্মাবার সকালে আমার বিবি শহর পরিক্রমায় বেরুবে নামাজের দুঘণ্টা পূর্বে। সেই সময়টুকু শহরবাসীরা কেউ ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে পারবে না। যদি কেউ পথে বা হাটে বাজারের কোথাও থেকে থাকে তবে মিছিলের বাদ্য-সঙ্গীত শোনামাত্র যে যার কাছের মসজিদে প্রবেশ করে আত্ম-গোপন করে থাকবে। কিন্তু একটা কথা, দোকানপাট নিত্য যেমন খোলা থাকে তেমনি খোলামেলাই পড়ে থাকবে। কিন্তু কোনও দোকানে কোনও খদ্দের বা দোকানী থাকতে পারবে না সে সময়। সবাইকে ছুটে গিয়ে কাছের মসজিদে আশ্রয় নিতে হবে। যদি কারো মাথা দেখা যায় তবে আমার স্ত্রীর প্রহরীদের উদ্যত খড়্গ তার মুণ্ডুচ্ছেদ করে ফেলবে তৎক্ষণাৎ। এজন্য জাঁহাপনার কাছে আমি বা আমার বিবি নরহত্যার দায়ে সোপর্দ হবো না।

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে উবেদ-বৌ থামলো। বৃদ্ধ উবেদ তো থ'। এ আবার কী বদখদ চাওয়া হলো?

দুনিয়াতে এত জিনিস থাকতে এইরকম ফালতু চাওয়া কী কেউ চায়?

বৃদ্ধ মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, হায় হায়, কেন সে মেয়েমানুষের বুদ্ধি নিয়ে কাজ করবে ভেবেছিল।

যাই হোক, বৃদ্ধেরা তরুণী ভার্যাকে চটাতে সাহস করে না। তাই উবেদও মনের দুঃখ মনে চেপে সুলতানের দরবারে ফিরে আসে।

সুলতান উবেদের মনোবাঞ্ছা শুনে প্রীত হয়ে বলেন, বহুত আচ্ছা, আজই আমি ঢ্যাঁড়া পিটে ফরমান জারি করে দিতে বলছি, প্রতি জুম্মাবারে নিত্য যেমন হাটবাজার, দোকানপাট খোলা থাকে তেমনি খোলা থাকবে। কিন্তু

নামাজের দু ঘণ্টা আগে থেকে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে পারবে না কেউ। যারা হাটে-বাজারে বা পথে-ঘাটে রয়ে যাবে তারা কাছাকাছি মসজিদে গিয়ে মাথা লুকাবে। যদি কারো শির দেখা যায় প্রহরীর তলোয়ারের ঘায়ে কোতল করে দেবে।

সেই থেকে প্রতি শুক্রবার উবেদ-বেগম শহরে পথ-বিহারে বের হয়। সে সময় কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে—পথে-ঘাটে বের হতে পারে! এই নিয়ম চলে আসছে সেইদিন থেকে। জানি না আর কতকাল এভাবে শহরবাসীরা জুম্মাবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাবে।

নাপিত-বৌ থামলো। তারপর একটু মৃদু হেসে কামরের দিকে তাকিয়ে বললো, কিন্তু বেটা, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার এই কিস্সা শুনে তোমার পেট ভরলো না! যতক্ষণ না নিজের চোখে উবেদ-বেগমকে আর একবার দেখতে পাচ্ছো স্থির থাকতে পারবে না!

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, মা। শুধু তাকে দেখার জন্যে তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে এত দূরদেশে এসেছি। ঘরে আমার মা বাবা চোখের পানি ফেলছেন। কিন্তু তাও উপেক্ষা করে চলে এসেছি এখানে—তার সঙ্গে দেখা করবো বলে।

নাপিত-বৌ বলে, ঠিক আছে, সব আমি ব্যবস্থা করে দেব। এখন বলতো বাবা, সঙ্গে কী পয়সাকড়ি এনেছ?

কামর বলে হীরে মুক্তো, চুণী পান্না এই চার রকমের জহরত কিছু আছে সঙ্গে। আর আছে কয়েকটা থলিতে হাজার আশী দিনার।

নাপিত-বৌ বলে, চমৎকার। তা হলে ওঠো। চল আমার সঙ্গে। বাজারে যেতে হবে। ওখানে জহুরী উবেদের একটা দোকান আছে, আগে ওখানেই যাবো আমরা। এখন শুধু তোমার জহরতের থলেটা সঙ্গে নাও। তারপর আমি যা যা শিখিয়ে দেব সেই সেই মতো কাজ করবে।

একটা কথা, বড় কিছু করতে গেলে অসীম ধৈর্যের দরকার। আমার এই উপদেশটুকু মনে রাখলে আখেরে তোমার লাভ হবে। তবে কার্য উদ্ধার হয়ে গেলে এই গরীব মাকে ভুলে যেও না, বেটা। আমার স্বামী বড় দরিদ্র। সারাদিন খেটে সে দুবেলার রুটি সংগ্রহ করে। তুমি যদি দয়া করে খুশি মনে তাকে দুটো পয়সা দিয়ে যাও—আল্লাহ্ তোমার ভাল করবেন।

কামর বলে, ও-নিয়ে আপনি ভাববেন না, মা। আপনাদের এই উপকার আমি ভুলবো না।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চুরাশীতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

শহরের এক প্রান্তে উবেদের স্যাকরার দোকান। জনাকয়েক কারিগর নিয়ে সে কাজ করে। অলঙ্কার নির্মাণে উবেদের নাম শহরজোড়া। তাই

কাজেরও অভাব হয় না। নানারকম মানুষের নানারকম বায়না। উবেদ সকলের কাজই যত্নসহকারে করে দেয়—সবচেয়ে কম মজুরীতে।

কামর এসে দোকানে উঠতেই উবেদ আদর অভ্যর্থনা করে বসতে দেয়। কামরের রূপ আর জমকালো সাজপোশাক দেখে ভাবে, নিশ্চয়ই কোনও আমির বাদশাহর সন্তান।

জহরতের থলে থেকে ছোট্ট একখণ্ড হীরে বের করে উবেদের হাতে দেয় কামর। বলে, আমার ইচ্ছে একটা আংটিতে বসিয়ে দিন আপনি। এ শহরের সবাই এক বাক্যে আপনার নামই করলো, তাই অন্য সব দোকান ফেলে আপনার কাছেই এলাম।

উবেদ হীরাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে, কী ধরনের আংটির ওপর বসাতে হবে, মালিক? নক্সা দেখাবো?

কামর বলে, না না, ওসব দেখাবার কোনও দরকার নাই। আমি খবর নিয়েছি, আপনি শুধু সেরা জহুরীই নন—উঁচুমানের শিল্পীও। সুতরাং ওটা আপনার মনমতো একটা আংটির ওপর বসিয়ে দেবেন। বিশ্বাস করি, তা দেখে আপনার পছন্দ তারিফ করবে সকলে। ও হ্যাঁ, এই নিন সামান্য কিছু অগ্রিম রাখুন। পুরো মজুরী নেবার সময় দেবো।

এই বলে অন্য একটা থলে থেকে এক মুঠো মোহর বের করে উবেদের হাতে দিল কামর। এবং দোকানের কর্মরত কর্মচারীদের প্রত্যেককে বকশিশ করলো একটা করে মোহর দিয়ে।

ইতিমধ্যে কামরকে দেখার জন্য কিছু ইতর মানুষের ভিড় হয়ে গেছে। কামর আর এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করে ওদের প্রত্যেককে একটা একটা করে দান করলো। তারপর বিস্ময় বিমুগ্ধ উবেদকে আর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কোনও সুযোগ না দিয়ে দোকান ছেড়ে পথে নামতে নামতে বললো, তা হলে আজ আসি শেখ সাহেব। কাল নিতে আসবো?

উবেদ বিস্ময়ে বিগলিত হয়ে যুক্তকরে বলে, আপনার মাল মজুত থাকবে মালিক। আপনার যখন খুশি এসে নিয়ে যাবেন।

উবেদ সব কাজ ফেলে নিজে হাতে একটা আংটি তৈরি করতে লেগে গেল। দক্ষ কারিগরের নিপুণ হাতের যাদুতে সন্ধ্যার আগেই এক মনোহর কারুকার্য করা অদ্ভুত সুন্দর এক আংটি তৈরি হয়ে গেল। অনেকদিন পর এত সুন্দর একটি কাজ ওঠাতে পেরে খুশিতে ভরে ওঠে উবেদের মন। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের সৃষ্টি নিরীক্ষণ করতে থাকে সে। অনেক যত্ন নিয়ে করেও এমন মনের মতো কাজ সব সময় হয় না। আংটিটা দেখতে দেখতে নতুন এক সৃষ্টির গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠে সে। এমন একটা অসামান্য কীর্তি তার প্রিয়তমা তরুণী ভার্যাকে না দেখিয়ে কী সে থাকতে পারে! তাই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় আংটিটা সঙ্গে নিতে ভোলে না।

ঘরে ফিরে আংটিটা বিবির হাতে দিয়ে বলে, দেখতো কেমন হয়েছে? আমি নিজে হাতে বানিয়েছি। বাজি রেখে বলতে পারি, সারা দুনিয়ায় এমন

কোনও স্যাকরা নাই যে এর জুড়ি একটা বানিয়ে দিতে পারে। হুঁ হুঁ বাবা, আমার নাম উবেদ।

সত্যিই আংটিটার গঠনরীতি, কারুকর্ম এবং হীরেটাকে বসানোর দক্ষতা এক কথায় অপূর্ব। উবেদ-বিবি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আংটিটার দিকে। আংটির কাজ না, হীরে কোন্‌টা বেশি তাকে মোহিত করে ঠিক বুঝতে পারে না।

—এমন দামী জহরত দিয়ে এই শখের আংটি বানায় যে সে মানুষটি কেমন?

উবেদ বলে, ওঃ, তাকে যদি তুমি দেখতে বিবিজান, ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতে।

—ওমা সে কি কথা, ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবো কেন?

—কেন জানি না, তবে তার রূপের জেল্লা দেখলে তোমার চোখে ধাঁধা লেগে যেত। এই হীরেটা দেখছ, এদিক ওদিক ঘোরালে কেমন দ্যুতি ছাড়ে? আর তাকে আর ঘোরাতে ফিরাতে লাগে না। যে পাশ থেকেই তাকে দেখবে —এই রকম হাজার হীরের দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে দেখবে। চোখ না ধাঁধিয়ে পারে? আহা কী তার রূপ? কী করে বর্ণনা দিয়ে তোমাকে বোঝাবো, বিবিজান। মোটকথা আমি বুড়ো হয়ে মরতে বসেছি, তাকে দেখে আমারই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অমন চোখ, অমন গাল, নাক, অধর আমি দেখিনি কারো। নাঃ, কোনও আমির বাদশাহর প্রাসাদেও নজরে পড়েনি।

উবেদ-ভার্যা বৃদ্ধ স্বামীর কথাগুলো যেন গিলছিল। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলো, উমর কত?

—তা তোমার মতই চোদ্দ-পনের হবে। কিন্তু কী বাড়ন্ত গড়ন। দেখলে মনে হয়, এক তাগড়াই নওজোয়ান।

উবেদ-বিবির যৌবন গলতে থাকে। কামনার বহ্নি জেগে ওঠে। শাদীর পর থেকে বৃদ্ধ উবেদ তাকে এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মানুষটা বুড়ো হয়েছে। দেহের তাগদ কমে এসেছে। এখন কী সে তার এই নতুন যৌবনের জোয়ারের সামনে দাঁড়াতে সাহস যায়! কিন্তু তিলে তিলে সে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। রঙে রসে এখন সে পাকা ফলের মতো টইটম্বুর।

উবেদ-ভার্যা আর কোনও প্রশ্ন করে না। কি জানি মানুষটা যদি কোনও সন্দেহ করে। যদি ভাবে তার বিবি পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়েছে?

আংটিটা সে একটা আঙুলে পরে নেয়।

—বাঃ, দেখ, কেমন সুন্দর মানিয়েছে? মনে হচ্ছে যেন আমার জন্যেই গড়েছে?

মেয়েটার চোখ আনন্দে নেচে ওঠে।

উবেদ বলে, সব হুরীদের আঙুল একই রকম হয়। আচ্ছা, কাল সকালে মালিক যখন আসবে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবো। সে যদি বিক্রি করতে চায় তোমার জন্যে কিনে নেব। তোমার যখন এত পছন্দ, দেখবো সে রাজি হয় কি না।

কামর ফিরে আসে নাপিতের বাড়িতে। একশোটা দিনার নাপিত-বৌ-এর

হাতে দিয়ে বলে, প্রথম দফার কাজ ঠিক ঠিক মতই করে এসেছি—যেমনটি বলেছিলে। এই নাও এই টাকাটা রাখ, মা। তাহলে এর পর আমাকে কী কী করতে হবে ?

নাপিত-বৌ বলে, কাল সকালে যেমন উবেদের দোকানে যাবে, আংটিটা দেখে বলবে, 'তৈরি খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আমার হাতের তুলনায় দেখতে একটু ছোট হয়েছে। যাই হোক, এটা আপনি রেখে দিন, শেখ সাহেব। বরং আর একটা হীরে দিচ্ছি, এটা দিয়ে একটু বড় করে অন্য একটা বানিয়ে দিন। আর এটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম।' এই বলে তোমার থলে থেকে একটু বড় গোছের একটা হীরে বের করে ওর হাতে দেবে, দেখবে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ দেবে।

পরদিন সকালে কামর উবেদের দোকানে পৌঁছলে উবেদ তাকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে আংটিটা বের করে হাতে দেয়। কামর নেড়ে নেড়ে দেখে প্রশংসায় গদগদ হয়ে বলে, আপনার হাতের যাদুতে অসাধারণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেখ সাহেব আমার হাতের তুলনায় হীরেটা একটু ছোট হয়ে গেছে। তা হোক, এটা আপনি রেখে দিন, আপনাকে খুশি মনে উপহার দিলাম। আপনি বরং আমাকে আর একটু বড় হীরে দিয়ে একটা বানিয়ে দিন।

এই বলে থলে থেকে অপেক্ষাকৃত একটা বড় হীরে বের করে সে উবেদের হাতে দেয়। সেই সঙ্গে ষাটটি স্বর্ণমুদ্রাও গুঁজে দিয়ে বলে, আপনার কারুকার্যের ইনাম দেবার ধৃষ্টতা আমার নাই, শেখ সাহেব। এটা আমি আপনাকে শরবত খেতে দিলাম। আচ্ছা চলি, কাল সকালে আবার আসবো।

দোকান ছেড়ে বেরুবার সময় সামনে জমায়েত হওয়া দীন ভিখারীদের মধ্যে মুঠো মুঠো দিনার ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায় কামর।

বৃদ্ধ জহুরী হতবাক হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবতে পারে না, মানুষ এমন দিল-দরিয়া কী করে হতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরে আংটিটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, নাও বিবিজান তোমার জন্যেই বোধ হয় গড়েছিলাম। তাই বোধ হয় তার পছন্দ হলো না।

—পছন্দ হলো না ? এমন সুন্দর জিনিসটা মনে ধরলো না তার ?

—আরে একি তোমার আমার পছন্দ ? না জানি সে কোন আমির বাদশাহর ছেলে। দেখে শুনে বললো, 'হাতের কাজ তোমার খুব সুন্দর শেখ, তবে আকারে কিছু ছোট হয়েছে। সে দোষ তোমার নয়, আমিই হীরেটা ছোট দেখে দিয়েছিলাম। যাই হোক, হারেমের মেয়েদের হাতে মানাবে ভালো, এটা তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। তাই মনে হচ্ছে, নিজের অজান্তে আমি তোমার হাতের মাপেই বানিয়েছিলাম, বিবিজান। আর খোদার কী মর্জি, তোমার নসীবেই জুটে গেল। নাও, তোমার পছন্দের জিনিস তোমার কাছেই এসে গেল।

উবেদ-বিবি বলে, ওমা সে কি কথা, তা হলে তিনি কী পরবেন ? এত শখের জিনিস !

—সেজন্যে ভেব না বিবিজান। আর একটা হীরে আমার হাতে দিয়ে সে বললো, শেখ সাহেব, এটা দিয়ে আর একটা গড়িয়ে দিন আমাকে, আশা করি সেটা আরও সুন্দর হবে।

মেয়েটির অন্তর আকুল হয়ে ওঠে কামরকে দেখার জন্য। কিন্তু মুখে সে আকুলতা প্রকাশ করা সম্ভব না। বৃদ্ধ সন্দেহ করতে পারে। শুধু সে বললো, বানিয়েছ নাকি? কই দেখি কেমন হয়েছে?

বৃদ্ধ বলে, বানাবো না মানে? অমন খদ্দের কটা মেলে? আমি নিজে হাতেই এটাও তৈরি করেছি, এই দেখ!

আংটিটা হাতে নিয়ে উবেদ-বিবির চোখ নেচে ওঠে।

—বাঃ, অপূর্ব। আরও সুন্দর হয়েছে।

হাতের আঙ্গুলে পরে নিয়ে বলে, দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর মানিয়েছে!

বৃদ্ধ জহুরী বলে, সুন্দর জিনিস সুন্দর হাতেই তো মানায়। আচ্ছা দেখা যাক, যদি তোমার নসীবে থাকে, তবে এটাও হয়তো তোমার হাতেই ফিরে আসবে।

কামর ফিরে এসে নাপিত-বৌকে বিবরণ জানায়। একটা দিনারের তোড়া হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এরপর কী করতে হবে মা?

নাপিত-বৌ বলে, কাল সকালে জহুরীকে বলবে, এ আংটিটা আবার বেজায় বড় হয়ে গেল। সে যাক গে, আপনি আমাকে আর একটা গড়িয়ে দিন। এবার তুমি আরও একটু দামী হীরে দেবে ওর হাতে।

পরদিন সকালে কামর আবার উবেদের দোকানে যায়। আংটিটা দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দারুণ হয়েছে। কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে শেখ সাহেব। এত বড় হীরেটা আমার হাতে মানাবে না। আপনি বরং আর একটা বানিয়ে দিন। আমি মাঝামাঝি আকারের একটা হীরে দিচ্ছি আপনাকে।

এই বলে অন্য একটা হীরে এবং একশোটা স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দিয়ে বললো, এটা আপনার জলপানি। আর ঐ আংটিটা আপনার হারেমের কোনও বাঁদীকে উপহার দিলাম আমি।

যথারীতি সেদিনও সে মুক্ত-হস্তে মুদ্রা ছড়াতে ছড়াতে দোকান ছেড়ে নাপিত-বৌ-এর কাছে ফিরে আসে।

এইভাবে সে নাপিত-বৌ-এর প্রতিটি পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকে। প্রতিদিনই সে উবেদের কাছে গিয়ে নতুন আংটির বরাত দিয়ে আগের আংটিটা নাকচ করে উপঢৌকন দিয়ে আসে। আর বোকা বৃদ্ধ জহুরী এক এক করে সবগুলো নিয়ে গিয়ে তরুণী ভার্যার হাতে দিয়ে একটু মন পাওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুন্দরী তার বুড়ো স্বামীকে জ্ঞান দিয়ে বলে, আহা তুমি কী মানুষ বলতো! এমন যে লোক, নিত্য তোমার বিবির জন্যে একটা করে জহরতের আংটি উপহার পাঠাচ্ছে তাকে একবার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খানাপিনা করতেও বলতে পারছো না?

বৃদ্ধ বলে, ও হো হো, তাইতো, ও কথা তো একদম মনে হয়নি, বিবিজান ! আমি না হয় একটু মাটো, কিন্তু তুমি তো অনেক বুদ্ধি ধর ; তুমিও তো আমাকে হুকুম করনি চাচার মেয়ে ? ইস্, কী ভুলটাই না হয়ে গেছে !

উবেদ-বিবি বলে, যাক যা হবার তা হয়েছে। কাল তাকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এস। আমি খুব আদর আপ্যায়ন করে তোমার সব ভুল শুধরে দেব।

পরদিন সকালে যথারীতি কামর এসে উপস্থিত হয় উবেদের দোকানে। আংটিটা দেখে বলে, নাঃ, আপনার হাতের কাজের প্রশংসা না করে উপায় নাই কিন্তু এই পাথরটা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না। আপনি বরং এটা আপনার বাঁদীদের কাউকে দিয়ে দিন।

এই বলে কামর আর একটা মূল্যবান পাথর এবং এক তোড়া মোহর জহুরীর হাতে দিয়ে বলে, আজ তাহলে আমি আসি ?

উবেদ হাত জোড় করে বলে, আপনি বহুত খান-দানী বংশের সন্তান ; আমাদের গরীবখানায় আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করছি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তবে মেহেরবানী করে একবার আমার বাসায় পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন মালিক।

কামর বললো, এ তো খুব আনন্দের কথা। বেশ তো, আপনি দোকানপাট বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরবেন, আমাকে আমার সরাইখানা থেকে ডেকে নিয়ে যাবেন দয়া করে। আমি প্রস্তুত থাকবো।

এই বলে সে তার সরাইখানার ঠিকানাটা বৃদ্ধকে দিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁচাশীতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

সেদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ জহুরী সরাইখানা থেকে কামরকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে পেঁছায়।

খানা-পিনা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। দুজনে মিলে তৃপ্তি করে খানা-পিনা সেরে নিল। উবেদ বিবি নিজে হাতে নানারকম আহার্য বস্তু প্রস্তুত করেছিল। কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, মোরগ মোছাল্লাম, বিরিয়ানী, হালওয়া, পেস্তার বরফী শরবত—আরও অনেক কিছু।

খাবারের শেষে শরবত-এ চুমুক দিতে ঘুমে ঢলে পড়লো দুজন।

এ কাণ্ড উবেদ-বিবির। আগে থেকেই সে ফন্দী এঁটেছিল, তাই শরবতের পেয়ালায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল খানিকটা। এবং তার অব্যর্থ ফল হাতে হাতেই ফলে গেল।

বিরাট ফরাসের এক পাশে বৃদ্ধ অন্য পাশে নওজোয়ান কামর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলো। আর এদিকে রিরংসা-দংশিতা সেই তরুণী বেশ-

বাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাম-চঞ্চলার মতো ছুটে এসে কামরের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি অবলেহন করতে থাকলো। সে সময় সেই রতি-তাড়িত নারীর কাম-কটাক্ষ দেখলে যে-কোন পৌরুষের পতন ঘটতে পারতো নিমেষে।

এরপর, আল্লাহ জানেন, সে রাতে সে-মেয়ে কামরের নিদ্রা-বিগলিত দেহখানা নিয়ে কী খেলায় মেতেছিল।

সারারাত ধরে সে কামরের দেহের সঙ্গে লীন হয়ে সেঁটে ছিল। কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই তার গনগনে গরম দেহখানা উঠিয়ে নিয়ে অন্দরে পালিয়ে গেল। যাবার আগে সে আঙ্গুলে কাজল লাগিয়ে কামরের বুকে পর পর চারটি কাল ছাপ এঁকে দিয়েছিল।

হারেমে ফিরে গিয়ে হালিমা ওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচরীকে প্রহরী করে বাইরের ঘরে পাঠায়। এই মেয়েটি সারারাত ধরে উদ্যত খাঁড়া হাতে দরজায় প্রহরারত ছিল। হালিমা বললো, যা ওদের নাকে ঘুম ছাড়ার ওষুধটা গিয়ে ধর গে, তা না হলে সারাদিনেও ঘুম ভাঙ্গবে না ওদের।

নাকে ওষুধের ঝাঁজ ঢুকতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে উবেদ।

—ইস্ একি কাণ্ড, একেবারে যে সকাল হয়ে গেছে। নামাজের সময় বয়ে যায় দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়।

কামরও বুঝতে পারে না, কি করে সারাটা রাত সে একভাবে অসাড়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারলো। এমন বেয়াড়া ঘুম তো কখনও ছিল না তার। ঘুমের পর এমন অবসাদ তো সে জীবনে কখনও অনুভব করেনি। কে যেন সারা শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে রেখে গেছে।

রজু করার সময় ঠোঁটে জল লাগতেই ছ্যান ছ্যান করে জ্বলে উঠলো। ঠোঁট দুখানা ফেটে চৌচির, ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ব্যথায় টনটন করছে। গালে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো' মাঝে মাঝে কেটে ছড়ে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

কামর ভেবে পায় না, এমনটা কী করে হলো। ভালোমানুষ সারা গায়ের কোথাও কোনও ব্যথা দরদ ছিল না, কিন্তু এই একটা রাতের মধ্যে এ সব অসম্ভব ব্যাপার কী করে ঘটতে পারলো ?

জহুরী দেখে বললো, ও কিছু নয়, ঘরে মশার বাড়াবাড়ি হয়েছে। ওগুলো মশার কামড় দাগ আর কিছুই না। ঘুমোনোর আগে মশারী না টাঙানো বোকামী হয়েছে।

কামর বলে, কিন্তু আপনার মুখে তো এ রকম কোনও দংশন দেখতে পাচ্ছি না ?

বৃদ্ধ হেসে বলে, মশারা রসিক। ওরা বেছে বেছে সুন্দর মুখেরই সন্ধান করে। এই বুড়োর কোঁচকানো ঝুলে পড়া চামড়া ওদের পছন্দ হবে কেন ?

এরপর দুজনে নামাজ সেরে নাস্তা সেরে নেয়। তারপর উবেদ চলে যায় দোকানে: আর কামর ফিরে আসে নাপিত-বৌ-এর কাছে।

কামরকে লক্ষ্য করে নাপিত-বৌ হাসতে হাসতে বলে, না না, আমাকে আর

মুখে কিছু বলতে হবে না, বেটা। আমি তোমার মুখের চেহারা দেখেই সব বুঝে নিয়েছি।

কামর বলে, না মা, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সারারাত খুব মশায় কেটেছে।

নাপিত-বৌ এবার হো হো করে হেসে ওঠে, খালি মশার কামড় ? আর কিছু দেখতে পাওনি শরীরে ?

কামর বলে, হ্যা মা পেয়েছি। এই দেখুন আমার বুকে কালো কালি মাখা আঙ্গুলের চারটে ছাপ। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার বুকে এই টিপসই লাগলো কী ভাবে ?

নাপিত-বৌ ভালভাবে পরীক্ষা করে বললো, তুমি খুব সরল সোজা মানুষ, বাবা। ঘোর প্যাঁচ কিছুই মাথায় ঢোকে না তোমার। তা না হলে কোন্‌টা মশার কামড়, আর কোন্‌টা চুম্বনের দংশন, চিনতে পার না ? ঐ আঙ্গুলের চারটে টিপ কেন দিয়েছে সে, জান ? সে তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে দাসখত সই করে দিয়েছে। এখন সে একমাত্র তোমার। এবার তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক কর, বাবা। আমার বিশ্বাস ঐ জহুরী আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাবে। কিন্তু কাজ হাসিল হলে এই মা-বেটিকে ভুলে যেও না যেন।

কামর বলে, না মা, আপনার উপকার আমার মনে থাকবে।

এরপর কামর বিদায় নিয়ে সরাইখানায় ফিরে যায়।

হালিমা স্বামীকে বেশ কড়া সুরেই প্রশ্ন করে, কালকের রাতটা কেমন কাটালে তোমরা। বাড়িতে একজন মেহমানকে নিয়ে এসে কী রকম ব্যবহারটা করলে তার সঙ্গে ?

বৃদ্ধ জহুরী বলে, ব্যবহার তো কিছু খারাপ করিনি, বিবিজান। —তবে কী জান, বেচারা সারারাত মশার কামড় খেয়েছে। একটা মশারী খাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

—আজ রাতে যদি তাকে আবার নিয়ে আস, ঐ ভাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো না আগেই। নিজে কষ্ট করেও অতিথির সৎকার করতে হয়।

বৃদ্ধ বলে, সেই ভাল, ছেলেটাকে একটু আদর যত্ন করা হয়নি। কী ঘুম যে পেয়েছিল কাল, কিছুই করতে পারিনি! দেখি আজ যদি তাকে নিয়ে আসতে পারি, আদর যত্নের ত্রুটি রাখবো না।

কামর দোকানে এলে বৃদ্ধ আবার তাকে আমন্ত্রণ জানায়।

কাল রাতে যা ঘুম পেয়েছিল, কোনও আনন্দই করা যায়নি! আজ যদি আর একবার পায়ের ধুলো দেন—

কামরও এই আমন্ত্রণের আশাই করে এসেছিল। সহজেই সম্মত হয় সে।

সে রাতেও একই কায়দায় শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দুজনকে শয্যাশায়ী করে ফেলে হালিমা। তারপর উদগ্র কামনার বহ্নি জ্বালিয়ে বিবসনা হয়ে ছুটে এসে কামরের যৌবন-জাগ্রত দেহের সঙ্গে বিলীন হয়ে সারাটা রাত সুরতরঙ্গে মেতে ওঠে।

পরদিন সকালেও একই ধরনের ব্যথা বেদনা অনুভব করে সে, অধরে গালে সারা দেহে। কিন্তু বৃদ্ধকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝতে দেয় না।

জহুরী জিজ্ঞেস করে, আজকের রাতটা কেমন কেটেছে, মালিক ?

কামর বলে, খুব ভাল। আজ আর মশা-টশা কামড়ায়নি দেখছি।

সেদিন সে নাপিত-বৌ-এর কাছে ফিরে বলে, আজকেও একই রকম কেটেছে। সারা অঙ্গ ব্যথায় টনটন করছে। আর এই দেখুন আমার দেহে কে যেন এই চাকুখানা ঢুকিয়ে রেখে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না—এর কী অর্থ ?

নাপিত-বৌ বলে, খুব সাবধান বেটা, মেয়েটা ভীষণ চটে গেছে। ও জানতে চেয়েছে। আজ রাতেও যদি ঐভাবে অসাড় হয়ে পড়ে থাক তবে তোমাকে সে খুন করে ফেলবে। মেয়েরা যখন কামের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে পড়ে তখন তারা বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। একা একা ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না। তাই তোমাকে সে জাগ্রত পেতে চায়।

কামর অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে কী করে আমি জেগে থাকবো। আমি তো আর ইচ্ছে করে অসাড় হয়ে পড়ে থাকি না। কাল রাতে তো আমি জেগে থাকার অনেক কোসিস করেছিলাম কিন্তু শরবতটা খাবার পর আর চোখের পাতা টেনে তুলতে পারলাম না কিছুতেই।

নাপিত-বৌ যুক্তি দেয়, আজ রাতে বেটা, খানা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন তোমাদের সামনে শরবতের পেয়ালা এনে রাখবে, তুমি কায়দা করে শরবতের পেয়ালা ওঠাতে গিয়ে ফেলে দেবে। কিন্তু লক্ষ্য রেখ, ততক্ষণে বুড়োটা যাতে তার পেয়ালাটা চুমুক দিয়ে খালি করে ফেলে। তাহলে মজাটা চলবে ভাল। দেখবে, জহুরী ঘুমে ঢলে পড়বে তখুনি। কিন্তু তোমার চোখে আর ঘুম আসবে না। তারপর কী করতে হবে, নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।

আনন্দে নাপিত-বৌ-এর হাতে চুম্বন করে কামর।

—চমৎকার! আজ রাতে আমি বাজি মাত করে দেব।

সে রাতেও বৃদ্ধ উবেদ কামরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। যথারীতি নানা উপচারে আহারাদি শেষ হয়ে গেল। একটা রেকাবীতে দু' পেয়ালা শরবত সাজিয়ে এনে সামনে রাখে পরিচারিকা। বৃদ্ধ এবং কামর দু'জনে একসঙ্গেই পেয়ালা দুটো হাতে তুলে নেয়। কিন্তু কামর মুখে ঠেকাতে একটু বিলম্ব করে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধের পেয়ালা নিঃশেষ হয়ে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামরের হাত কেঁপে পেয়ালাটা নিচে পড়ে যায়।

বৃদ্ধ শুধু চুকচুক করে ওঠে, ইস্ পড়ে গেল—

আর কোনও কথা সরে না তার, ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তার সকল সত্তা। ফরাশের একপাশে ঢলে পড়ে সে।

পরিচারিকা হারেমে ফিরে গিয়ে জানায়, সে শরবত দিয়ে এসেছে ওদের। এবং ওরা দুজনেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হালিমা রাগে জ্বলতে থাকে। মুর্খটা তার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে

আজও শরবতটুকু গিলেছে ? ফুঁসতে ফুঁসতে হাতে একখানা ছুরি নিয়ে সে ছুটে আসে।

তখন ফরাশের দুপাশে জহুরী আর কামর অসাড় হয়ে পড়েছিল। হালিমা ছুরিকা হাতে কোমরের ওপর চেপে বসে শাণিত ছুরিটা কামরের বুকে বসিয়ে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু কামর খপ করে হাতখানা চেপে ধরে হো হো করে হেসে উঠে হালিমাকে হত-চকিত করে দেয়।

—ওরে দুষ্টু, এই তোমার ঘুম ? আমার সঙ্গে তামাশা করছিলে এতক্ষণ ? কে, কে তোমাকে এসব শিখিয়ে দিয়েছে, শুনি।

কামর এবার হালিমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। অধরে অধর রেখে বলে, এক বৃদ্ধা নাপিত-বৌ! সেই আমাকে তোমার টিপ-ছাপ আর ঐ চাকুর অর্থ বলে দিয়েছে।

—ভারি চালাক মেয়েমানুষ তো! সে তোমাকে লায়েক করে তুলেছে, দেখছি! কিন্তু যাদু, আমাকে তো তুমি জান না, আজ সারারাত ধরে তোমাকে আমি উল্টে পাল্টে যাচাই করে দেখে নেব,—সে বুড়ি তোমাকে তালিম দিয়ে কতখানি পাকা পোক্ত করে পাঠিয়েছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছিয়াশীতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

উত্তাল উন্দাম এক ছন্দতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সমুদ্র-স্নান করতে থাকে ওরা। সারারাত ধরে। এক সময় হালিমা বলে, বুকের কলজে ছিঁড়ে দিতে পারি কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারবো না, মেরে জান! এ অমৃত আমি দু'চার-দিন বা দু'চার মাস বা বছরের জন্য খেতে চাই না। সারা জিন্দগীভর তোমার যৌবন-সুধা পান করবো আমি। এই আমার পণ। ঐ অপদার্থ নপুংসক বুড়োটার বাঁদী হয়ে আর থাকবো না। চল, আমি তোমার দেশে যাবো। তোমাকে ছাড়া একদণ্ড আমার চলবে না, মালিক। এখন যা বলি শোন। আমাদের এই বাড়ির ধারে-কাছে একখানা বাড়ি ভাড়া করে সরাইখানা ছেড়ে চলে এস তুমি। বুড়োটা যদি আবার তোমাকে নেমন্তন্ন করে বলবে, পর পর তিন দিনই যথেষ্ট। তার পর আর ভাল দেখায় না।

কামর কসম খেয়ে বললো, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবো, সোনা।

এরপর আবার ওরা সুরত-রঙ্গে মেতে ওঠে।

এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। হালিমা হারেমে ফিরে যায়।

পরদিন সকালে উঠে কামর নাপিত-বৌ-এর কাছে চলে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় উবেদ আবার কামরকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু কামর রাজি হয় না। বলে, আমি ঐ সরাইখানা ছেড়ে আপনাদের পাড়ায় একখানা বাড়ি ভাড়া করবো ঠিক করেছি।

বৃদ্ধ জহুরী বোকাসোকা মানুষ। উৎসাহিত আনন্দে কামরের অভিপ্রায়কে

স্বাগত জানিয়ে বললো, চমৎকার হবে। তা আমার বাড়ির লাগোয়া বাড়িটাই ভাড়া আছে। আপনি যদি অনুমতি করেন আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

কামর বলে, বেশ তো, তাই করে দিন, ভালই হবে। কাছাকাছি পাশাপাশি থাকা যাবে।

সেইদিনই বৃদ্ধ পাশের বাড়িটা ভাড়া নিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিল কামরের জন্য।

প্রতিদিন সকালে জহুরী দোকানে চলে গেলে হালিমা খিড়কীর পথ দিয়ে কামরের ঘরে এসে প্রবেশ করে। সারাটা সকাল ওরা গল্প করে, দাবা খেলে, রঙ্গ তামাশা করে। এবং আদর সোহাগ চুম্বনে মেতে ওঠে।

হালিমা ফন্দী আঁটে। কী করে বুড়ো জহুরীর হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। কামরকে বলে, শোন মালিক, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কামর হালিমাকে বুকের কাছে টানতে টানতে বলে, বল কী করতে হবে? পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে হবে?

হালিমা হাসির ঝরনা হয়ে নিজের উদ্ধত বুকে হাত রেখে বলে, হ্যাঁ, এই পাহাড় থেকে।

কামর উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হালিমা ওকে শান্ত হতে বলে, আহা, আমি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না। একটু ধৈর্য ধর, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

এই বলে সে বুকের মধ্যে থেকে একখানা ছোট ভোজালী বের করে কামরের হাতে দিয়ে বলে, দেখছো, কী সুন্দর! এর বাঁটখানা বুড়োটা নিজে হাতে বানিয়েছে!

কামর নেড়ে চেড়ে দেখলো ছুরিখানা। সত্যিই খুব সুন্দর। সোনার বাঁটের সূক্ষ্ম কারুকর্ম একমাত্র উবেদের হাতেই সম্ভব।

হালিমা বললো, এই ছুরিখানা নিয়ে তুমি বুড়োর দোকানে যাও। ওকে দেখিয়ে বল, এটা তুমি বাজারের একটা লোকের কাছ থেকে কিনেছ একশ' দিনারে। ওকে জিজ্ঞেস করবে, জিনিসের তুলনায় দামটা ঠিক নিয়েছে কিনা। বুড়ো যাই বলুক, ছুরিখানা নিয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে এখুনি।

কামর বললো, আমি এখুনি যাচ্ছি।

ছুরিখানা উবেদের হাতে দিয়ে কামর বললো, দেখুন তো শেখ সাহেব, ঠকে গেলাম কিনা। একশো দিনার নিয়েছে।

উবেদ চমকে ওঠে, কার কাছ থেকে কিনলেন?

—এই বাজারেরই একপাশে এক ফিরিওলা বসেছিল নানারকম বাহারী জিনিসপত্র নিয়ে। ছুরিখানার বাঁটের কাজ দেখে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল।

উবেদ গম্ভীর হয়ে গেল। ছুরিখানা কামরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, না, ঠকেন নি। এর অনেক দাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে উবেদ বাড়িতে ফিরে এসে ক্রোধান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে বিবিকে, আমার ভোজালীখানা কোথায়?

হালিমা ইচ্ছে করেই জবাব দেয় না। বৃদ্ধ ফেটে পড়ে, কী চুপ করে রইলে কেন? কোথায় আমার ভোজালী?

হালিমা বলে, কী ব্যাপার হঠাৎ অমন রণমূর্তি ধরে এই অসময়ে ঘরে ফিরে এলে কেন?

বৃদ্ধ এবার চিৎকার করে ওঠে, ওসব কথা পরে হবে, আগে আমার কথার জবাব দাও। বল কোথায় আমার ভোজালী?

হালিমা কিন্তু শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে, কেন? আমার কাছেই থাকে, আমার কাছেই আছে।

—কই, বের কর দেখি?

হালিমা বলে, না। এখন তুমি যে কারণেই হোক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছ আমার ওপর। এ সময় অমন মারাত্মক অস্ত্র তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না আমি। তবে নিশ্চিন্ত থাক, সে জিনিস ঘরেই আছে। এবং আমার বাক্সেই আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে ওঠে জহুরী। বলে, না, নাই।

হালিমা ভুরু কোঁচকায়, মানে? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? আমি কী মিথ্যে বলছি তোমার কাছে?

—জানি না। এখুনি আমি দেখতে চাই আমার ছুরি।

—বেশ দেখ।

অভিমানে আহত হয়ে কাঁদ কাঁদ ধরা গলায় হালিমা বলে, জানকে আমি পরোয়া করি না। বুকে বসিয়ে দিতে চাও দেবে। দাঁড়াও, এখুনি আমি বাক্স খুলে বের করে দিচ্ছি তোমার ছুরি।

বাক্সের ডালা তুলে ভোজালীখানা বের করে বৃদ্ধের হাতে তুলে দিতে চায় হালিমা, নাও ধর। এই বুক পেতে দিলাম, শেষ করে দাও এ আপদ। এত সন্দেহ, অবিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। স্বামী যদি বৌকে বিশ্বাসই না করতে পারলো, কি দরকার সে পোড়া জীবনে।

বেচারা উবেদ! অনুতাপে লজ্জায় মরমে মরে যেতে থাকলো।

—আমাকে মাফ করে দাও, চাচার মেয়ে। আমার ঘাড়ে শয়তান ভর করেছিল। না হলে তোমার মতো সতী-সাধ্বীকে সন্দেহ করি!

পরদিন সকালে এক বাঁদীর সাজে সেজেগুজে কামরের ঘরে আসে হালিমা।

—দেখ তো মালিক, বিকাবো কিনা বাজারে?

কামর অবাক অথচ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে হালিমার যৌবন-মদমত্তা মোহিনী সাজগোজের দিকে।

—লুফে নেবে গো, লুফে নেবে? কোন্ বাদশার প্রাসাদে যাবার শখ হয়েছে, শুনি?

হালিমা কামরকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়, আহা-হা, ধরো না, ধরো না আমাকে। প্রসাধন প্রলেপ সব মুছে যাবে। আচ্ছা, আর দেরি নয়। চল

পরিত্যাগ করে তোর হাত ধরে পালিয়ে এসেছে, তাকে বিশ্বাস কী? দুদিন বাদে তোকেও কলা দেখিয়ে সে অন্য পুরুষের সংগে চলে যাবে না, তার কী প্রমাণ? এসব বেলেল্লাপনা আমি একদম পছন্দ করি না। তুই একে ছেড়ে দে, বাবা। আমি তোর সংগে অনেক বড় ঘরের পরমাসুন্দরী মেয়ের সংগে শাদী দিয়ে দিচ্ছি। আমার ইয়ার-বন্ধুদের ঘরে অনেক ভাল মেয়ে আছে। তারা আমাকে নিত্য খোসামদ করছে। তুই আমার কথা শোন, এসব বাজে নেশায় মেতে থাকিস না।

কামর বলে, কিন্তু বাবা, আমি তো তোমাদের মত নিয়েই বসরাহয় গিয়েছিলাম। যাই হোক, তোমাদের যখন ইচ্ছা নয়, আমি হালিমাকে শাদী করতে চাই না। তোমরাই মেয়ে পছন্দ কর। আমি তাকেই শাদী করবো।

এরপরে হালিমাকে আবদ অল রহমান তার বাড়ির কাছেই একটা গুদামঘরে কয়েদ করে রেখে দেয়।

অনেক দেখেশুনে কাইরোর কাজীর পরমাসুন্দরী এক মেয়ের সংগে কামরের শাদী দিয়ে দেওয়া হলো। চল্লিশ দিন ধরে আনন্দে উৎসবে মেতে রইলো রহমান-পরিবার। রহমান একমাত্র ছেলের শাদীতে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করলো না। চল্লিশ দিন ধরে খানা-পিনা নাচগান দান-ধ্যান সমানে চলতে থাকলো। অবারিত দ্বার। ঢালাও আমন্ত্রণ। যার ইচ্ছা পেটপুরে খেয়ে যেতে পারে। কেউ বাধা দেবে না।

কামর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকলের খাওয়া দাওয়া তদারক করছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়লো, ছিন্নবসন দীন দরিদ্র এক কৃশকায় বৃদ্ধের দিকে। চিনতে অসুবিধে হলো না, এই সেই বৃদ্ধ জহুরী উবেদ।

বাবার কাছে ছুটে গিয়ে সে খবর দেয়, সেই জহুরী উবেদ এসেছে, বাবা। মেহমানদের সংগে বসে আছে।

রহমান দ্রুতপায়ে বাইরে এসে খাবার ঘরে ঢোকে। বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে আলাপ পরিচয় করে।

—আপনার এমন হাল হয়েছে কেন, শেখ সাহেব? এরকম দীন দশার কী কারণ?

উবেদ বলে, যাদের আপনজন মনে করেছিলাম, তারা যখন আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করলো তখন ঘৃণায় আমি বসরাহ ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু নসীব খারাপ, পথে আরব-দস্যুদের হাতে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে আজ নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চিত সম্পদ ছিল সব তারা লুটে নিয়ে গেছে। শুধু আল্লাহর অসীম কৃপায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছি কোনক্রমে।

রহমান ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাক পরতে দিল।

—আপনি আমার মহামান্য মেহমান। কোনও দ্বিধা সংকোচ করবেন না, শেখ সাহেব। অকপটে প্রাণের কথা জানাতে পারেন আমাকে। সত্য কথা

বলতে কোনও ইতস্ততঃ করবেন না। আমি সব জানি। আপনার বিবি হালিমা এখন আমার হেপাজতে নিরাপদেই আছে। কোনও চিন্তা করবেন না। এখন একটু কিছু খানা-পিনা সেরে নিন। আমি ভাবছিলাম, দু'চার দিনের মধ্যেই আপনার বিবিকে আপনার কাছে বসরাহয় পাঠিয়ে দেব। তা আপনি যখন স্বয়ং এসে গেছেন তখন আর তার দরকার হবে না। হালিমাকে আপনার হাতে তুলে দেব। আমার ধারণা, আপনি তার সন্ধানেই এই দূর দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আপনার এত দুঃখ ক্লেশের একমাত্র কারণ আপনার এই বিবি। সব কাহিনীই আমি শুনেছি কিন্তু কিছু মনে করবেন না শেখ সাহেব, এর জন্যে পুরো দোষ তার একারই! আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি তাকে। তারপর ইচ্ছে করলে তাকে আপনি মার্জনা করে ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। অথবা তার প্রাপ্য সাজারও ব্যবস্থা করতে পারেন। সবই আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করবে। যাক সে-সব পরে হবে, এখন আগে কিছু একটু মুখে দিয়ে নিন। মনে হচ্ছে, অনেক দিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হয়নি আপনার।

বন্ধুকে মেহমানের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে খানা-পিনা করতে বসে দুজনে। খেতে খেতে রহমান একসময় বলে, একটা নারী যখন কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে থাকে তখন সে পুরুষের পক্ষে তার ফাঁদ এড়িয়ে পালিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার ছেলে কামর, একেবারে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ছিল কাম-কলায়। কিন্তু আপনার বিবি হালিমা তাকে নিজে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়ে পোক্ত করে তুলেছে! আমি ভেবে পাই না, যে নারী তার স্বামীর সঙ্গে শঠতা করে তারই নাকের ডগায় পরপুরুষ নিয়ে রতিরঙ্গে মত্ত হতে পারে, সে বিবি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কী ফয়দা হবে আপনার? কামনা বাসনা মানব-দেহে সহজাত। আল্লাহরই দান। কিন্তু তা যদি বিপথগামী হয় তবে তা দিয়ে সংসারের কী কল্যাণ হতে পারে?

জহুরী বিষণ্ণভাবে বলে, আপনি যথার্থই বলেছেন, ভাইসাব। আপনার ছেলের কোনও দোষ আমি দেখি না। সব দোষ আমার বিবির। কই, কোথায় সে?

কামর-এর বাবা বললো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। কাছেই একটা বাড়িতে তাকে আটকে রেখেছি আমি।

রহমান বন্ধুকে সঙ্গে করে সেই বাড়িটায় নিয়ে গিয়ে তালা খুলে দিয়ে বলে, ভিতরে যান, এই ঘরেই সে আছে।

জহুরীকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে হালিমা। সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে এক পা এক পা করে পিছু হটতে থাকে সে। কিন্তু জহুরীর দুটি হাতের থাবা ওর গলাটা টিপে ধরে।

—ওরে শয়তানী বেবুশ্যা খানকি মাগী, এই তোর পুরস্কার—

রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতাশীতম রজনীতে

আবার সে শুরু করে ঃ

যদিও ছেলে কামর-এর দোষ ততটা ছিল না, তবু আবদ অল রহমান অনুতাপের আগুনে পুড়তে থাকে। বৃদ্ধ জহুরী বেচারা কারো ক্ষতি করেনি জীবনে, অথচ এইভাবে তার জিন্দগীটা বরবাদ হয়ে গেল কেন?

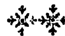
শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামলো। সুলতান শারিয়ার বললো, এইভাবেই বিশ্বাসঘাতিনীরা সাজা পায়, শাহরাজাদ। সংসারে যেসব মেয়ে ভ্রষ্ট-চরিত্রের হয় তাদের সকলের দশাই হালিমার মতো হয়। শাহরাজাদ, হয়তো তুমি আমার কথায় ক্ষুব্ধ হলে, কিন্তু মনে করে দেখ, কী ক্রোধের কারণে প্রতিদিন একটি করে মেয়েকে শাদী করে পরদিন সকালে হত্যা করার হলফ নিয়েছি আমি! আমিও নারীর কাছ থেকে পেয়েছি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এবং সেই কারণেই আমার এত ক্রোধ—এমন প্রতিজ্ঞা। জান, বলতে আজ বুকে বাজে, যেদিন আমার প্রাণাধিকা বেগমকে দেখলাম, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে আমার পবিত্র প্রেমকে কলুষিত করে ফেলেছে সেইদিনই আমি তাকে এবং তার হারেমের সব সাগরেদ দাসী বাঁদীদের কোতল করেছি।

সুলতান শারিয়ারের দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল।

শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শারিয়ার নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এই দ্যাখ, আমি কী সব বলে তোমাদের গল্পের মেজাজটাই মাটি করে দিলাম। যাক, এবার তার নতুন কিস্সা শুরু কর, শাহরাজাদ!

তার অস্মি-

এক সময়ে কাইরোয় একটি সাংঘাতিক চতুর রমণী বাস করতো। চোখের পলকে এমন ভেল্কী সে লাগিয়ে দিতে পারতো যার তুলনা মেলা ভার।

একজন ইসলামী চারটি মেয়েকে শাদী করে ধর্ম রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কে কবে শুনেছে, একটি নারী একাধিক স্বামী-সহবাসে ভোগবাসনা তৃপ্ত করেছে?

আমাদের এ কাহিনীর নায়িকা সেই জাতের এক মেয়ে। একই সঙ্গে দুটি পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে সে দুজনকেই তুষ্ট করতো।

এদের একজনের নাম হারাম। লোকটা চোর। সারারাত ধরে পরস্ব অপহরণ করাই তার একমাত্র পেশা। সুতরাং রাতে সে বাড়ি থাকতো না। লোকের ঘরে সিঁদ কাটতে কাটতে তার সারারাত কাবার হয়ে যেত। সকালবেলায় বাড়ি ফিরে বৌকে নিয়ে শুয়ে পড়তো সে। সারাদিন সহবাস নিদ্রায় কাটিয়ে আবার

সন্ধ্যায় নিজের ধান্দায় বেরিয়ে যেত।

অন্যজন পকেটমার। সুতরাং তার কার্যকলাপ ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে। হাটে বাজারে, জনসমাগমে তার ছিল গতিবিধি। দারুণ দক্ষতায় হাত-সাফাই করে অন্যের পয়সা-কড়ি হাতিয়ে নিতে ভারি ওস্তাদ ছিল সে। সারাটা দিন ধরে সে শিকার-সন্ধানে টো টো করে ঘুরে বেড়াতো, আর ফিরে আসতো সন্ধ্যা-কালে। কারণ তখন তো আর পথে ঘাটে মানুষ চলে না। খানা-পিনা সেরে সে 'পরমা সতী স্বাধ্বী' বৌকে নিয়ে শুয়ে পড়তো।

এইভাবে দিন কাটতে থাকে। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছরও অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

একদিন চোরটা বৌকে সোহাগ করতে করতে বলে, এখানে কোতোয়ালের বড় উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। লোকটা ভীষণ কড়া। মনে হচ্ছে, এ শহরে আর চুরির ব্যবসা চালানো যাবে না। সিপাইগুলো আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে পারে না আজকাল। বড্ড মুশকিলে পড়েছি। রাতের পর রাত চলে যাচ্ছে। আমদানি হচ্ছে না বিশেষ কিছুই। তাই ভাবছি বিবি, দু একদিনের মধ্যে অন্য কোনও শহরে চলে যেতে হবে কাজের ধান্দায়।

সন্ধ্যায় পকেটমার আকিল শূন্য হাতে ফিরে এল। চতুরা বৌ জিজ্ঞেস করে, কি গো, এমন মনমরা হয়ে পড়ে রইলে কেন? কী হয়েছে?

বৌকে বুকে জড়িয়ে আকিল বলে, না এ শহরে আর এ ব্যবসা চলা[illegible] খানকীর ছেলে এই নতুন কোতোয়ালটার জ্বালায় কিছুই সুবিধে করতে না। সিপাইরা সব সময় পিছনে পিছনে লেগেই থাকে। ভাবছি, অন্য[illegible] জেনে শহরে চলে যাব। এভাবে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে থাকলে খাব কী? [illegible]লতায়

দুষ্টা রমণী পকেটমারের বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কা[illegible] বিদেশে চলে গেলে তোমাকে ছেড়ে একা একা কী করে থাকবো আমি? [illegible]ছে

আকিল সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে, আহা আমি কি চিরকালের মতো যাচ্ছি নাকি। কিছু মোটামুটি মালকড়ি বানাতে পারলেই আবার চলে আসবো। তাহলে আর দেরি করে লাভ নাই। কাল রাতেই আমি রওনা হয়ে যাবো। তুমি আমার জামাকাপড় আর কিছু পথের খানা বেঁধে-ছেঁদে ঠিক করে রেখ, কেমন?

পরদিন সকালে হারাম এসে বলে, খোঁচড় পিছনে লেগেছে। শালারা বোধ হয় আমাকে শ্বশুর ঘরে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। তবে আমারও নাম হারাম। কেমন করে চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। বিবিজান, তুমি আমার জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে দাও। হ্যাঁ সঙ্গে কিছু খানা আর রেস্ত দিও। আজ বিকেলেই আমি এ শহরের বুকে লাথি মেরে রওনা হবো।

ছলনাময়ী কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, আমার কী হবে গো? তোমাকে ছাড়া একটা দুপুর আমি ঘুমাতে পারি না, কেমন করে আমি বাঁচবো?

হারাম একটু কড়া ধাঁচের লোক, আঃ। শুভকাজে যাওয়ার সময় প্যান

প্যান করে বাধা দিও না তো ! আমি মরে যাচ্ছি—না, চিরকালের মতো ছেড়ে যাচ্ছি ? ভয় নাই, তোমার স্বামী তোমারই থাকবে। তা সে বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী এসে দাঁড়ালেও এ বান্দা মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

মেয়েটা লাস্যময় কটাক্ষ করে, সত্যি বলছ ? তোমাদের পুরুষ মানুষকে বাপু বিশ্বাস নাই। আর তোমাদেরই বা কী দোষ দেব বল। আজকাল দুষ্টু মেয়ে-মানুষগুলোই যত বেহায়া। একটা শক্ত সমর্থ খুবসুরত মরদ দেখতে পেলে আর কথা নাই। কী ভাবে তাকে নষ্ট করতে হয় তার সব ছলাকলাই তাদের মুখস্ত।

হারাম বলে, যাও যাও, এখন নিজের কাজে যাও তো। তুমি কি ভাব, তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর সব মেয়েছেলেই বদ ?

সারাদিন ধরে অনেকবার রতি-বিহার করে সন্ধ্যার আগেই হারামকে রওনা করে দেয় মেয়েটা। আর সন্ধ্যার পরে আসে আকিল। তাকেও খাইয়ে-দাইয়ে, বার-কয়েক সহবাস শেষে শেষ রাতের দিকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে।

নিয়তি অলক্ষ্যে হাসছিল।

সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ছোট্ট শহরের উপান্তে এসে সেখানকার একমাত্র সরাইখানায় আশ্রয় নেবার জন্য ঢুকে পড়ে আকিল। সরাই-খানাটি ছোট্ট। একটি মাত্র ঘর। কোন রকমে একটা রাতের মতো মুসাফির [illegible]করা এখানে রাত্রি বাস সেরে চলে যায়।

[illegible]টমার আকিল দেখলো, যাত্রী বলতে তখন পর্যন্ত আর মাত্র একজন তার [illegible]ঠেছে তার আগে। বিদেশে মানুষ বেশি মিশুকে হয়ে ওঠে। কথায় অস্থ [illegible] আলাপ পরিচয় হয় দুজনের। আকিল জিজ্ঞেস করে, ভাই সাহেব [illegible]ছি গা এলিয়ে পড়ে আছেন, খুব ক্লান্ত বুঝি ?

লোকটি ঈষৎ হালকা হাসি টেনে বলে, ক্লান্ত হবো না ? সেই কাইরো থেকে একটানা হেঁটে আসছি। পা দুখানা টনটন করছে ! উফ্ !

আকিল বলে, আমারও সেই দশা। আমিও কাইরো থেকেই হেঁটে আসছি। যাক ভালই হলো, আল্লাহ বহুত মেহেরবান, তা না হলে এই নির্জন অন্ধকার রাতটা একা একাই কাটাতে হতো। জানেন তো পয়গম্বর বলেছেন, পথের সব চেয়ে বড় সম্বল হচ্ছে সঙ্গী। যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হলো। আসুন ভাইসাব হাতে হাতে মেলাই। আজ আমাদের যে দোস্তী এখানে তৈরি হলো, তা যেন জীবনের কোনও অবস্থাতেই নষ্ট না হয়।

দুজনে হাতে হাত রাখলো। আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো।

আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন, অন্যজন হারাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ তারা এই পান্থশালায় এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

হাত মুখ ধুয়ে দুজনে খানা খেতে বসে। আকিল বলে, দোস্ত, আজ আমার যা আছে তাই দুজনে খাবো, আসুন।

হারাম বলে, ঠিক আছে, আমারটাও বের করছি। সবই একটু একটু করে খাওয়া যাবে। বাকী যা থাকবে কাল আবার দুজনে একসঙ্গেই খাবো।

আকিল তার প্যাটরা থেকে চাপাটি, সবজী, চাটনী প্রভৃতি যা যা বের করে। হারামও ঠিক ঠিক সেই সব খাবারই বের করে তার ঝুলি থেকে। দুজনেই অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে ফেলে।

—আশ্চর্য ব্যাপার তো! ভাবলাম আপনার খানা আর আমার খানা হরেক কিসিমের হবে। তা না, আপনিও যা যা এনেছেন আমিও দেখছি সেই সবই এনেছি।

এই বলে হারাম একটা ছোট পুঁটলীতে বাঁধা একটা নাস্তার কৌটো বের করে। তার মধ্যে ছিল ভেড়ার টেংরীর ঝোল। ওরা এ খাবারটাকে 'পায়া' বলে।

আর কী আশ্চর্য, আকিলও একটা কৌটো খুলে ঠিক অবিকল ঐ রকম ভেড়ার পায়া বের করে।

এবার দুজনেরই বিস্ময় চরমে ওঠে।

—আল্লাহ আকবর, একি কাণ্ড! আচ্ছা আপনি এসব খানা কোত্থেকে এনেছেন?

আকিল জিজ্ঞেস করে। হারাম বলে, আমার বিবি বানিয়ে দিয়েছে সব। কিন্তু আপনারগুলো?

আকিল বলে, আমার খানাও তো আমার বিবি বানিয়ে দিয়েছে?

—কোথায় থাকেন আপনি?

আকিল বলে, কাইরোর 'বিজয় দরজার' কাছে!

হারাম অবাক হয়ে বলে, আমিও তো ওখানেই থাকি!

এরপর দুই নচ্ছার এক এক করে দুজনের খুটিনাটি সব পরিচয় জেনে নেয়। দুজনেই বুঝতে পারে নষ্ট মেয়েছেলেটা তাদের কী আশ্চর্য কুশলতায় প্রতারণা করে এসেছে এত কাল।

দুজনেই ক্রোধে ফেটে পড়ে, আমরা দুজনেই এতদিন একটা মেয়ের কাছে বোকা বনেছি, দোস্ত। এর উচিত সাজা তাকে দিতে হবে।

হারাম বলে, মাথা গরম করবেন না, ভাইসাব। চলুন ঘরে ফিরে যাই। আগে কৈফিয়ত তলব করে দেখি, সে কী বলতে চায়।

দুজনে একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো তাদের বাড়ির দরজায়। মেয়েটি ভাবতে পারেনি, এইভাবে তার দুই স্বামী একজোট হয়ে তাকে আক্রমণ করবে কোনও দিন। বাঁচবার আর কোনও পথ নাই দেখে ছলনাময়ী হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে দুজনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

—আমি অবলা নারী, না বুঝে লোভে পড়ে তোমাদের দুজনকেই শাদী করে ফেলেছিলাম। বিশ্বাস কর, তোমাদের কাউকে ঠকাবার কোনও মতলব ছিল না আমার। এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করে দাও, সোনারা!

হারাম এবং আকিল দুজনেই মেয়েটিকে সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল। তাই তার কান্নায় বিগলিত হয়ে দুজনেই তাকে ক্ষমা করলো।

মেয়েটি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওরা বললো, দেখ বিবিজান, এতদিন যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু সব জানাজানি হওয়ার পর তো আর এ

ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমরা দুজনেই তোমার স্বামী হয়ে থাকতে পারি না। যে-কোনও একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। এবং এখুনি।

ধূর্ত শয়তানীটা ভাবে, দেহের তাগদ দুজনেরই জব্বর। একজনকে খুশি করলে আর একজনের মাথায় খুন চেপে যাবে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে মৃত্যু—তা সে সহজেই অনুমান করতে পারে।

অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে নীরব থাকতে দেখে দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। হারাম চিৎকার করে ওঠে, কী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? মুখ খোল। একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। এবং এখুনি। ঝটপট সাফসাফ বলে দাও। আমাদের অত সময় নাই।

মেয়েটি চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, এ বড় কঠিন সমস্যা, একমাত্র খোদা ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এখন আমি কী বলি বল তো। তোমাদের দুজনই আমার বড় ভালবাসার ধন। কাকে ছেড়ে কাকে নিতে চাইবো আমি?

—ওসব আমরা জানি না, দুজনের একজনকে বাছাই করে নিতে হবে তোমাকে। এবং তার জন্যে আর বেশি সময় দিতে পারবো না আমরা।

মেয়েটি বলে, এতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বোঝার বস্তু নয়। কী করে ঠিক করবো, কার দিকে আমার মন বেশি ঝুঁকতে চায়?

—ওসব ফালতু কথা আমরা শুনতে চাই না। সাফসাফ বাতাও—আভি।

মেয়েটি এবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। না না, আমি পারবো না। আমার মহব্বতের চোখে তোমরা দুজনেই সমান। তিল মাত্র ফারাক করতে পারছি না কাউকে। এখন তোমাদের মধ্যে গুণে বুদ্ধিতে কে বড় বলতে পারবো না। একমাত্র সেইভাবেই হয়তো দুজনকে আলাদা করা সম্ভব হতে পারে। আমার মনে হয়, তোমরা তোমাদের নিজের নিজের কেরামতি দেখাও আমাকে। যার বুদ্ধি বেশি হবে তাকেই আমি ধরে রাখবো। কী, আমার কথা তোমাদের পছন্দ হয়?

—চমৎকার।

দুজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে। তা হলে আজ থেকেই পাট শুরু করা যাক। যে বেশি বুদ্ধি খাটিয়ে চুরি বিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করবে তাকেই সে গ্রহণ করবে। কিন্তু কে আগে শুরু করবে? তাও ঠিক হলো। ভাগ্য পরীক্ষা করে। আকিল প্রথম সুযোগ পেল।

সুতরাং হারামকে সঙ্গে নিয়ে আকিল বাজারে আসে। এক ইহুদী সুদখোর স্যাকরাকে দেখিয়ে বলে, এই লোকটাকে ভাল করে চিনে রাখ। দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে এই বুড়োটা টাকা ধার দিয়ে সোনাদানা বন্ধক নিয়ে বেড়ায়। ওর কাঁধে যে ঝোলাটা দেখছো—ওটা ভর্তি আছে সোনার মোহর আর অলঙ্কারে। তুমি দেখ, ওটা আমি কেমন করে ছিনিয়ে নিই কুত্তার বাচ্চাটার কাছ থেকে।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ইহুদীটা হাতে একটা চিরাগ বাতি নিয়ে

পথ চলছিল। আকিল ঝড়ের বেগে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ইহুদীকে ঈষৎ ধাক্কা মেরে তার হাতের বাতিটা ফেলে দিয়ে কাঁধের ঝুলিটাকে লোপাট করে অন্ধকার গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ে পলকের মধ্যে। ইহুদীটার চিৎকার চেঁচামেচিতে আশে-পাশের মানুষজন ছুটে আসে। কিন্তু আকিল ততক্ষণে পগারপার। মাঝখান থেকে নিরীহ এক গো-বেচারাকে সামনে দেখতে পেয়ে ইহুদীটা তাকেই চোর ঠাউরে দেখিয়ে দিতেই জনতার বেধড়ক প্রহারে আধমরা হয়ে গেল সে।

আকিল হাসতে হাসতে হারামের কাছে ফিরে এসে বাহাদুর গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে, কেমন দেখলে, দোস্ত?

এমন চমৎকার হাত সাফাই, তারিফ না করে উপায় কী? হারাম বলে, একদম যাদুকা খেল দেখিয়ে দিলে বন্ধু! বহুৎ সুক্রিয়া।

আকিল বললো, আরে দাঁড়াও দোস্ত আসল খেলা এখনও শুরু হয়নি।

—কী রকম?

হারাম অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। আকিল বলে, ইহুদীর এই থলেটা হজম করা কী অত সোজা ভেবেছ নাকি। ব্যাটাচ্ছেলে এখনি কোতোয়ালীতে এজাহার দেবে না? তারপর সিপাই সান্ত্রীরা সারা শহর তোলপাড় করে খুঁজতে থাকবে। তখন? তখন আমি এসব রাখবো কোথায়, শুনি?

হারাম বলে, হুঁ, কথাটা তো ভাববার মতো। ও ব্যাটা জাতে ইহুদী। অন্যের রক্ত চুষে খায়। জান থাকতে ওর একটা কানাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা শক্ত। তা কী করবে?

আকিল বলে, দাঁড়াও খুলে দেখি আগে, কী কী মাল আছে ভেতরে।

একটা ঝোপের আড়ালে এসে ঝোলাটা খুলে উপুড় করে দিল আকিল। এক গাদা সোনার মোহর। নেড়ে চেড়ে দেখলো, মোহর ছাড়া অন্য কোনও বস্তু নাই। দশটা মোহর তুলে নিয়ে সে হারামের হাতে দিয়ে বলে এগুলো ট্যাকে গুঁজে রাখ তো!

তারপর নিজের হাতের আকিল নাম খোদাই করা একটা তামার আংটি খুলে ঐ মোহর গুলোর সঙ্গে থলেয় পুরে যেমনটি বাঁধা ছিল সেই ভাবে বেঁধে আকিল বললো চল, ইহুদীটার পিছনে ধাওয়া করে লোকটাকে ধরতে হবে।

হারাম কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। বলে, কেন? ওর পিছনে যেও না। দেখলে তো তোমাকে ধরে ফেলবে?

আকিল বলে, আরে, এস না। খেলাটা কেমন জমে দেখ।

ইহুদীটা তখনও বাজার ছেড়ে বেশি দূর যায়নি, হন হন করে ওকে পাশা কাটিয়ে যেতে যেতে থলেটা ওর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পলকে উধাও হয়ে গেল আকিল।

হারানো ধন ফিরে পেয়ে ইহুদীর সে কি আনন্দ। কে ছেনতাই করেছিল, কে ফেরত দিয়ে গেল সে দিকে ওর কোনও কৌতূহল নাই তখন। শুধু ইষ্ট

দেবতার উদ্দেশ্যে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকলো সে।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় সামনে থেকে এসে ইহুদীর কামিজ চেপে ধরলো আকিল, হু হু বাবা, আমার থলে চুরি করে হাওয়া হবে ভেবেছিলে? দাঁড়াও বিধর্মী শয়তান, তোমার শয়তানী আমি আজ শেষ করে দেব।

ইহুদী তো অবাক। কী বলবে কিছুই ভেবে পায় না প্রথমে।

—এ তুমি কি বলছো বাবা, মানুষ চিনতে ভুল করেছ মনে হচ্ছে।

—ভুল করেছি তোমার মতো শকুনিকে চিনতে কারো ভুল হয় না আরুনের বাচ্চা। ন্যাকামী করা তোমার আমি ভুলিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে প্রত্যেক দিন তুমি এই শহরের কত মানুষের সর্বনাশ করো ইজরায়েল সন্তান? কাঁধের ওপর দেখছি জলজ্যান্ত আমার থলেটা, আবার বলছো, মানুষ চিনতে ভুল করেছি আমি। তোমার বাঁদর-মুখ মনে রাখার কোনও প্রয়োজন নাই আমার। আমি আমার থলেটা তো চিনতে পারছি। চল, কাজীর কাছে চল, আমি নিজে হাতে তোমাকে সাজা দিতে চাই না। যা করার আইন মোতাবেক তিনিই করবেন।

কাজীর কথা শুনে ইহুদীর প্রাণ তুড়ুক তুড়ুক করতে শুরু করে। বে-আইনি সুদেখাটানো টাকা, সরকারের দপ্তরে জমা পড়লে আর কী তা উদ্ধার করা যাবে? তার অনেক রকম কাকুতি-মিনতি করতে থাকে লোকটা।

দোহাই বাবা, কাজী কোতয়ালে টেন না, বিশ্বাস কর, আমার পয়গম্বর, আব্রাহাম, আইজাক, জ্যাকব এর নামে শপথ করে বলছি, এ থলে আমার। তুমি ভুল করেছ।

—ভুল করেছি! ওরে শয়তান সুদখোদ, চোর, আমি ভুল করেছি। তুমি এই ভাবে সাধু সাজবার চেষ্টা করে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? চলু—আর কোনও ওজর শুনতে চাই না তোর। চুরি করার সাজা তোকে আজ পেতেই হবে।

আকিলের চেঁচামেচি চিৎকার হুঙ্কারে আমার পাশের দোকান-বাড়ি থেকে অনেক ছেলে ছোকরা বয়স্ক বৃদ্ধ সবাই ছুটে এল।

—কী, কী হয়েছে?

আকিল বলে এই বিধর্মী শয়তান চোরটা আমার থলেটা চুরি করে পালাচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে এসে আমি ধরেছি। ওকে কাজীর কাছে নিয়ে যাবো, কিন্তু ব্যাটা যাবে না কিছুতেই। তা আমি কী ছাড়বো নাকি?

একে ইহুদী তায় চোর, সুতরাং জনতা রোষে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ব্যাটাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দাও।

এদিক-ওদিক থেকে দু'চারটে চড়-চাপড়ও পড়তে থাকে। আলিক বলে, ভাই সব, আমরা সাচ্চা মুসলমান, অন্য ধর্মের কাউকে প্রহার করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না। তার চেয়ে কাজীর কাছে নিয়ে চলুন লোকটাকে। আইনে যা সাজা পাওয়ার তাই সে পাবে।

আকিলের বিজ্ঞজনোচিত বক্তৃতায় সকলেই অনুধাবন করলো উচিত অনুচিত

যে কারণেই হোক কোনও ইহুদীর গায়ে হাত ওঠালে ইহুদী মুসলমানে সংঘাত বেধে যেতে পারে।

ইহুদীটাকে প্রায় জোর করেই কাজীর কাঠগড়ায় হাজির করা হলো।

কাজী প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? এই বৃদ্ধ ইহুদীকে ধরে এনেছো কেন তোমরা?

আকিল বলে, ধর্মাবতার, লোকটা চোর? এই দেখুন এর কাঁধে আমার থলেটা! ওটা চুরি করে পালাচ্ছিল, আমি দৌড়ে এসে পাকড়াও করেছি। আপনি এর বিচার করুন।

ইহুদী বলে, এসব মিথ্যে কথা, মালিক, এ থলে আমার। এতে আমার পয়সা কড়ি আছে।

কাজী প্রশ্ন করে, কত টাকা আছে তোমার থলেয়?

—জী হুজুর পাঁচশো সোনার মোহর নিয়ে আমি আমার এক মহাজনের কাছে যাচ্ছিলাম—

—মিথ্যে কথা, হুজুর। বিলকুল বানানো কথা। লোকটা শুধু চোরই না—অসৎ মিথ্যুক। ডাহা মিথ্যে কথা বলছে সে।

কাজী বললো, ঠিক আছে তুমি তো বলছো থলেটা তোমার?

—কোনও সন্দেহ নাই, ধর্মাবতার।

—তা হলে তুমিও বল, থলেয় কী কী জিনিস আছে?

আকিল তিল মাত্র না ভেবে বলে, সোনার মোহরই, তবে পাঁচশো নয়, চারশো নব্বইটি স্বর্ণমুদ্রা আছে ওতে। এছাড়া আমার আর একটি মূল্যবান জিনিসও আছে ওর মধ্যে।

কাজী এবং ইহুদী আকিলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। আকিল বলে, আমার নাম লেখা একটা তামার আংটিও থাকার কথা থলেয়। এই আংটিটার আর্থিক মূল্য কিছুই নয় কিন্তু আমার কাছে ওটা কোনও কারণে অমূল্য বস্তু। জানি না চোরটা থলে থেকে ওটা সরিয়ে ফেলেছে কিনা।

ইহুদী বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, একেবারে আষাঢ়ে গপ্পো—

কাজী গম্ভীর হয়ে ইহুদীকে বলে, থলেটা খুলে সব বের কর, দেখি।

সামনের টেবিলের উপর থলেটা উজাড় করে ঢালা হলো। চকচকে মোহরগুলোর মধ্যে তামার আংটিটাও বর্ণভেদেই পৃথক হয়ে নজরে পড়লো সকলের। মোহরগুলো গুণে দেখা গেল চারশো নব্বই—আকিলের কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। কাজী রায় দিল, মোহর সুদ্ধ থলেটা আকিলকে দিয়ে দাও আর চোর ইহুদীটাকে পঁচিশ ঘা বেত লাগাও।

মোহরের থলেটা নাচাতে নাচাতে হারামের সঙ্গে আকিল পথে বেরিয়ে আসে। হারাম বলে, বহুৎ বড়িয়া ওস্তাদ কা খেল দেখালে দোস্ত। জবাব নাই।

আকিল বলে, আমার কাজই বুদ্ধির খেলা। এভাবে কত লোককে বোকা বানিয়ে অকূলে ভাসিয়েছি তার ঠিক নাই। যাই হোক, এবার দোস্ত তোমার

কেরামতি দেখতে হয়! হাজার হলেও তুমি জাতে সিঁদেল চোর। বুকের পাটা দশ হাত না হলে অন্যের ঘরে ঢোকা যায় ?

হারাম মুচকি হাসে। বলে, চল আজ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সুলতানের প্রাসাদের পিছনে এসে পড়ে। হারাম বলে দাঁড়াও একটু। আমি একখানা রশি নিয়ে আসি।

আকিলকে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্ষণকালের জন্য হারাম অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর এক বাণ্ডিল রশি এনে বলে, আমরা প্রাসাদের ওপরে উঠে যাবো। আমি একাই যেতাম কিন্তু মজাটা দেখাবার জন্য তোমাকেও সংগে নিতে হবে। এস, আমার পিছনে পিছনে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এস। কোনও ডর নাই।

ভয়ে আকিলের হাত পা কাঁপতে থাকে। কিন্তু অদম্য কৌতূহল এড়াতে না পেরে হারামের পিছনে পিছনে সেও দড়ি বেয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠে যায়। তারপর হারামকে অনুসরণ করে করে কখনও নিচে নেমে কখনও ডাইনে ঘুরে কখনও বাঁয়ে চলে এক সময় ওরা একটা দামী পরদা ঝোলানো ঘরের সামনে এসে থামে।

পরদাটা ফাঁক করে হারাম দেখে নেয় ঘরের মাঝখানে একটা সোনার পালঙ্কে এলিয়ে পড়ে আছে সুলতান। আর তার পায়ের কাছে ঢুলুঢুলু চোখে বসে একটি কিশোর নফর পা টিপছে আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

হারাম বললো, দোস্ত তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে দেখ। আমি ভিতরে ঢুকছি।

আকিলের বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সর্বনাশ যদি জেগে ওঠে সুলতান ?

হারাম পা টিপে টিপে ছেলেটির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিদ্রাচ্ছন্ন কিশোর তখন যন্ত্রচালিতের মতো সুলতানের পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। একখানা রুমাল দিয়ে ছেলেটার মুখ বেঁধে ফেলে হারাম। তারপর পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ালের একধারে ফেলে রাখে।

এরপর হারাম ছেলেটার জায়গায় বসে সুলতানের পা টিপতে আরম্ভ করে। সুলতানও নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তবু পায়ের ওপর কড়া হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুমজড়িত কণ্ঠেই বলে, কীরে অত জোরে জোরে টিপতে আরম্ভ করলি কেন ?

হারাম বাচ্চাদের মতো গলা নকল করে বলে, জাঁহাপনা, একটা কিস্‌সা শোনাবো ?

সুলতান চোখ না খুলে আধো আধো ঘুমের ঘোরেই বলে, বেশ তো, বল না।

হারাম বলতে থাকে :

এক শহরে দুই বন্ধু বাস করতো। ওদের একজনের নাম হারাম আর একজনের নাম আকিল। হারাম-এর ব্যবসা চুরি করা। আর আকিল হাত সাফাই করে পকেট মেরে লোক ঠকিয়ে খায়।

এরপরে আকিল কী করে এক ইহুদীর থলে হাত সাফাই করে হাতিয়ে নিয়ে তার মধ্যে নিজের হাতের তামার আংটি রেখে দিয়ে কাজীর কাছে প্রমাণ করেছিল, থলেটার প্রকৃত মালিক আকিল—ঐ ইহুদী নয়, তা বললো। এরপর হারাম তার কেরামতি দেখাবার জন্য দোস্ত আকিলকে প্রাসাদের পাঁচিল টপকে ভিতরে নিয়ে এল। তার উদ্দেশ্য সুলতানের প্রাসাদে ঢুকে সে তাকে কিস্সা শোনাবে। এবং এমনি তার বুদ্ধি আর সাহস, করলোও সে তাই। সুলতান তার পালঙ্কে শুয়ে এলিয়ে পড়ে আছেন, আর তার পায়ের কাছে বসে পা টিপছে এক ঘুম-কাতর ছোকরা নফর। তাকে কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে সে সুলতানের পায়ের কাছে বসে ছেলেটির গলা নকল করে সুলতানকে কিস্সা শুনিয়ে দোস্তকে অবাক করে দিল। এখন বলুন তো জাঁহাপনা, ওদের দুই বন্ধুর মধ্যে কে বড় ?

সুলতান ঘুম জড়ানো স্বরেই বললো, কেন ? ঐ হারাম ? কাজিকে না হয় ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, কিন্তু সুলতানকে ফাঁকি দেবার হিম্মৎ কার হতে পারে ?

এরপর হারাম বন্ধুকে সঙ্গে করে প্রাসাদের বাইরে নেমে আসে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে সুলতান দেখলো, তার পেয়ারের ছোকরা বান্দা মুখ বাঁধা অবস্থায় দেওয়ালের পাশে পড়ে রয়েছে। বাঁধন খুলে দিলে সে গতরাত্রের স্বচক্ষে দেখা সব কাহিনী শোনালো সুলতানকে। সুলতান অবাক হলেন, সে কি রে, আমি তো ভেবেছিলাম, তুই আমাকে কিস্সা শোনাচ্ছিস। বহুৎ তাজ্জব কি বাত—

দরবারে এসে সুলতান উজিরকে বললো, সারা শহরে ঢ্যাঁড়া পিটে জানিয়ে দাও সবাইকে, হারাম নামে কে আছে সে এসে নির্ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা করুক। আমার প্রাসাদের সুরক্ষা ভেদ করে কাল রাতে সে আমার ঘরে ঢুকেছিল। কি সাহস, ভাব একবার, আমি ইনাম দিতে চাই। ওকে একবার সামনে হাজির হতে বল।

সেইদিনই হারাম সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। সুলতান ওর বুদ্ধি এবং সাহসের প্রশংসা করে বললো, আমি খুব খুশি হয়েছি। আজ থেকে তোমাকে আমার সারা সলতানিয়তের কোতোয়ালদের সর্দার পদে বহাল করলাম।

সুচতুরা আকিলকে বোঝালো, বুদ্ধি এবং সাহসের জোরে হারাম আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। সুতরাং শর্তমতো হারামই আমাকে পাওয়ার অধিকারী। তুমি কিছু মনে দুঃখ রেখ না সোনা, যদিও আমি তার ঘরের বিবি হয়ে যাচ্ছি কিন্তু মনে-প্রাণে তোমাকেও আমি ভালবাসি—ভালবাসবো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ বললো, গল্পও শেষ হলো রাতও ফুরিয়ে গেল। আজ এখানেই শেষ। কাল আবার নতুন কিস্সা শুরু করা যাবে।

অষ্টাশীতম রজনী ঃ

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী শুরু করে ঃ

মিশরের সুলতান খলিফা মহম্মদ ইবন থাইলুন জ্ঞানে গরিমায় মহত্ত্বে যেমন সেরা ছিলেন তেমনি ছিলেন তিনি একজন যোগ্য সুশাসক। কিন্তু তাঁর পরলোকগত পিতা ছিল তার ঠিক উল্টো। শিক্ষা-দীক্ষার সে ধার ধারতো না, প্রজাদের ওপর নিপীড়ন করে প্রদেয় রাজস্বের তিন চার গুণ আদায় করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। দীন হতে দীনতম কোনও মানুষও তার ক্ষুদ্রতম সঞ্চয় আগলে রাখতে পারতো না সুলতানের কোপদৃষ্টি থেকে।

কিন্তু মহম্মদের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রজাদের দুঃখে তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে উঠতো। তিনি ছদ্মবেশে প্রজাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের অবস্থার হালচাল জেনে নিয়ে তার প্রতিবিধান, করার চেষ্টা করতেন।

সুলতান মহম্মদের শুধু মনে প্রশ্ন জাগতো তার সলতানিয়তে প্রজাদের মধ্যে এত আর্থিক বৈষম্য কেন ? কেন একদল লোক বিলাস ব্যসনে অলস জীবন যাপন করবে ? আর কেনই বা বাকী সব মানুষ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করবে ?

একদিন তিনি তাঁর দরবারের তাবৎ গণ্যমান্য আমলা ও পাত্র-মিত্র পারিষদদের হাজির হতে বললেন তাঁর সামনে।

সকলে এসে সমবেত হলো। সারা দরবার-কক্ষ সেদিন পরিপূর্ণ। সুলতান সকলকে আহ্বান করেছেন। সুতরাং একজনও গর-হাজির থাকেনি সেদিন।

সুলতান মহম্মদ বললেন, আপনাদের মধ্যে আমার উচ্চতম পদের উজিররাও যেমন আছেন তেমনি আছে আমার প্রাসাদের দ্বাররক্ষীরাও। আজ আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই।. আমার কর্মচারীরা যে যে-রকম মাইনে পায় তাতে তাদের প্রত্যেকের কীভাবে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হতে পারে তা আমি দেখতে চাই। যদি দেখি, কেউ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ গ্রহণ করে তবে আমি তা কমিয়ে দেব নির্ঘাৎ। কিন্তু যদি দেখি, যারা কম মাইনে পেয়ে অতি কষ্টে সংসার চালায় তাদের আমি মাইনের অঙ্ক বাড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করবো না।

সুলতানের নির্দেশ মতো প্রথমে এসে দাঁড়ালো তার চল্লিশ জন উজির। সকলেরই সাজ-পোশাক বাদশাহী। নানারকম স্বর্ণালঙ্কার-খচিত পোশাক

আশাক-এ ঝকমক করছে তারা। এর পরের সারিতে এসে দাঁড়ায় বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদাবরা। তাদেরও জাঁকজমক দেখার মতো। এরপর সেনাবাহিনীর প্রধানরা এল। তারপর এল কাজীরা।

সকলেই এক এক করে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্ণিশ জানায় সুলতানকে। সুলতান সকলেরই সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করেন। কাউকে হয়তো কোনও প্রশ্ন করেন, আবার কাউকে কিছুই বলেন না।

এইভাবে সুলতানের সব দপ্তরের সমস্ত কর্মচারীদের সালাম কুর্ণিশ জানানো হয়ে গেলে, সব শেষে সুলতানের হারেমের দুই বল্লমধারী খোজা নফর এসে দাঁড়ালো। যদিও ওরা দুজনেই অলস এবং দেখতে বেশ নাদুস-নুদুস, তবু চোখে মুখে যেন কি এক বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছিল দুজনেরই। স্বয়ং সুলতান ডেকেছেন, সকলেই কেমন সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে হাজিরা দিয়েছে কিন্তু ওদের সাজ-পোশাক দেখলে মনে হয় কতকাল ধরে যেন মেঝের গড়াগড়ি খেয়েছে! ওরা দুজনেই একসঙ্গে সুলতান মহম্মদের সামনে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে ক্ষুব্ধ ধরা গলায় বলতে থাকলো, আপনি দীনদুনিয়ার মালিক জাঁহাপনা, আপনার দয়াতেই বান্দারা কোনও রকমে বেঁচে আছে। কিন্তু আপনার পিতার আমলে আমরা কি সুখেই না ছিলাম। তিনি গত হওয়ার পর থেকে আমাদের কপাল পুড়তে আরম্ভ করেছে। এখন আমাদের এমন হাল হয়েছে, যা মাহিনা পাই তা দিয়ে দুবেলার উদর-পূর্তি হয় না। পরনের বেশবাসের দশা দেখছেন, জাঁহাপনা। এমন সংগতি নাই একখণ্ড চাদর কিনে গায়ে দিই। সারাটা শীতকাল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাই। কিন্তু কি করবো, কাকেই বা জানাবো আমাদের এ দুঃখের করুণ কথা। কেই বা শুনতে চাইবে। তবে আমাদের ভয় হয় কি জানেন, জাঁহাপনা, এইভাবে অনাহারে কাটাতে কাটাতে হয়তো বা কোনদিন এই রোগা টিঙটিঙে শরীরটা ধুপ করে পড়ে শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক খোদাতালা আমাদের সুলতানের সুখ-সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘ জীবন দান করুন, এই প্রার্থনা করি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সুলতান মহম্মদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই দুই দ্বাররক্ষী সত্যিই ভীষণ দুস্থ। এমন কোনও ইনাম পায় না যা দিয়ে ওরা একটু ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। প্রাসাদের ভিতরে ওদের কাজ, সুতরাং বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ নাই এবং সেই কারণেই অন্যের কাছ থেকে বখশিশাদি পাওয়ায় বিশেষ কোনও সুযোগ পায় না এরা।

মহম্মদ আশ্বাস দিলেন, আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা অবগত হলাম। আমার হুকুমতে এই বৈষম্য আমাকে সত্যিই ব্যথা দিয়েছে। যাই হোক, এর পর থেকে তোমরা যাতে একটু ভালভাবে কাটাতে পার, সেজন্য প্রতি বছরে দুশো দিনার করে ইনাম পাবে।

সুলতানের এই ন্যায় বিচারে গদগদ হয়ে দ্বাররক্ষীদ্বয় বার বার তিনবার সালাম কুর্ণিশ জানিয়ে সভাকক্ষ থেকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সভায় সমাগত কর্মচারীবৃন্দ সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করার পর সবাই যখন সভাকক্ষ ছেড়ে গমনোদ্যোগ করছে এমন সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন সুলতান। লোকটি, যে কারণেই হোক, এতক্ষণ তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসেনি। সুলতান তাঁর সন্নিকটে আসতে ইশারা করলেন।

বৃদ্ধ গুটি গুটি সুলতানের দিকে এগিয়ে এসে যুক্তকরে নিবেদন করে, আপনি আমাদের ভাগ্যবিধাতা, মহামান্য শাহেনশাহ। এই বৃদ্ধ বান্দা আপনার বিশেষ কোনও দপ্তরে নিযুক্ত নাই। সেই কারণে হুকুমৎ বিধি অনুসারে আমার নির্দিষ্ট কোনও পদও নাই। তবে আপনার অবগতির জন্য জানাই, মহামান্য সুলতানের মৃত পিতার আমি এক নগণ্য অনুরক্ত নফর ছিলাম। তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত একটি ছোটো কৌটো আমার হেপাজতে রাখতেন। শাহেনশাহ জীবিত থাকতে তাঁর প্রয়োজন মতো কৌটোটা আমি তাঁকে বের করে দিতাম। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আবার তিনি সেটা আমার হাতেই ফিরিয়ে দিতেন। এইভাবে বহুকাল কেটে গেল, আমি তাঁর সংগে সংগে ছায়ার মতো থাকি ঐ কৌটোটা নিয়ে। হঠাৎ তিনি একদিন ইন্তেকাল করলেন। এখন আমি সমস্যায় পড়লাম সেই কৌটোটা নিয়ে। নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু। অন্য কারো হাতে তুলে দেবার নির্দেশও দেননি তিনি। সুতরাং আজও সেটা আমি যখের ধনের মতো আগলে রয়েছি। আমি জানি না তার মধ্যে কী জিনিস আছে।

আজ আপনাদের গোলামী করতে করতে আশীটা বছর কেটে গেছে। মুখ ফুটে কোনও দিন কোনও কথা বলতে হয়নি। কারণ মহামান্য শাহেনশাহর পিতা জীবিত থাকতে আমার কোনও অভাবই তিনি রাখতেন না। না চাইতেই দুহাত ভরে পেতাম। কিন্তু তিনি গত হওয়ার পর আমাকে বড় একটা কেউ নজর দেয় না। মাস গেলে দশটি স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ আছে তাই নিয়ে ঘরে যাই। সংসারে অনেক খানেওয়ালা বাল-বাচ্চা, এই সামান্য বেতনে আমি আর দিন গুজরান করতে পারছি না, জাঁহাপনা। ভেবেছিলাম, যত অভাবই থাক, যত কষ্টই হোক, নিজের দুঃখের কাহিনী নিজ মুখে আর শোনাবো না কাউকে। খোদা ওপরে আছেন, আর মর্তে আল্লাহর প্রতিভূ আপনি আছেন, কোনও না কোনও দিন আপনারা আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন। বহুদিন প্রতীক্ষা করার পর আজ আপনার সামনে এসে দাঁড়াবার সুযোগ মিলেছিল। মনে বড় আশা করে এসেছিলাম, জাঁহাপনা, এই অধমের দিকে একবার নজর পড়লে শাহেনশাহকে আর মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না।

সুলতান মহম্মদ অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু এই সামান্য একটা কাজের জন্য হুকুমতের এতটা ব্যয়-বরাদ্দ কে করেছে। এ তো চলতে পারে না। কী এমন সে কৌটো? তার রক্ষার জন্য এত টাকা খরচ করতে হচ্ছে? কী আছে তার মধ্যে।

বৃদ্ধ বললো, খোদা কসম, আমি বলতে পারবো না। গত চল্লিশ বছর ধরে বাদশাহর হুকুম মতো আমি সেটা আগলে ধরে রেখেছি।

মহম্মদ বললেন, এক্ষুণি নিয়ে এস, আমি দেখবো।

বৃদ্ধ দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবং একটু পরেই একটি ছোট্ট সোনার কৌটো নিয়ে ফিরে আসে। সুলতান ইশারা করতে ঢাকনাটা সে খুলে ধরে।

সুলতান দেখলেন, কৌটোর ভিতরে ছোট্ট এক ডেলা রাঙামাটি আর এক-টুকরো পাতলা ছাগচর্ম রক্ষিত আছে।

চামড়ার টুকরোটায় বেশ পরিষ্কার বড় বড় হরফে কী যেন লেখা আছে। সুলতান হাতে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বহু ভাষায় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার এক বর্ণ উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি। উজির আমির পাত্র-মিত্র সভাকবি কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারলো না।

সুলতান বললেন, মিশর এবং সিরিয়ার, পারস্য এবং ভারতের জ্ঞানী-গুণীদের ডাকো। হয়তো তাঁদের কেউ পড়ে দিতে পারবেন।

সুলতানের আমন্ত্রণে অনেক পণ্ডিতরাই এলো কিন্তু কেউই পাঠোদ্ধার করতে পারলো না। সুলতান দেশে-বিদেশে প্রচার করে দিলেন, যদি কেউ এই চর্মপত্র পাঠ করে দিতে পারে তবে তাকে অঢেল ইনাম দেওয়া হবে। অথবা কেউ যদি তেমন কোনও ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারে তাকেও প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই ঘোষণার দিন কয়েক পরে একদিন এক সাদাপাগড়ী পরে এক বৃদ্ধ এসে হাজির হলো সুলতানের সামনে। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সে বললো, আল্লাহ আমাদের পালনকর্তাকে দীর্ঘায়ু করুন, আমি আপনার পিতা শাহেন-শাহ থাইলুনের এক অধম বান্দা। তাঁর জীবিত কাল পর্যন্ত আমি তাঁর সেবা করে গেছি। আমিই জানি ঐ কৌটোয় রক্ষিত চর্মপত্রটির ইতিহাস। ঐ চর্মপত্র একমাত্র একজনই পাঠ করতে পারেন। তিনি তার মালিক। অল আসারের পুত্র শেখ হাসান আবদাল্লাহ তাঁর নাম। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আপনার পিতা তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। জানি না, আজও সে জীবিত আছে কিনা?

সুলতান মহম্মদ প্রশ্ন করলেন, কেন তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল?

বৃদ্ধ বললো, কারণ আপনার পিতা অনেক জোর-জুলুম অত্যাচার করেও তাকে দিয়ে ঐ পত্রের পাঠ উদ্ধার করাতে পারেননি। লোকটির কাছ থেকে ঐ পত্রখানা তিনি জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন।

সুলতান তখুনি প্রহরী-সর্দারকে হুকুম করলেন, যাও সব কয়েদখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজে-পেতে দেখ, শেখ হাসান আবদাল্লাহ নামে কেউ কোথাও আছে কিনা, পেলে সঙ্গে করে নিয়ে এস আমার কাছে।

খোদাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। প্রহরী-সর্দার শেখ হাসান আবদাল্লাকে কয়েদখানার বাইরে এনে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাকে সাজিয়ে সুলতান সমীপে হাজির করলো।

সুলতান দেখলেন, এক অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ। তার চোখেমুখে বহু লাঞ্ছনা অত্যাচারের ছাপ। সুলতান সশ্রদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন তাকে। তখতে তারই পাশে সসম্মানে বসালেন। তারপর বললেন, শেখ সাহেব, আমার বাবা যে ভুল, যে অন্যায় করে গেছেন, তার জন্য আমি মর্মাহত।

এমন কোনও বস্তু আমি জোর করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই না যা আমার সম্পত্তি নয়। তা সে যদি তামাম দুনিয়ার সমগ্র ধনভাণ্ডারের চাবিও হয়, তবুও।

হাসান আবদাল্লার দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। দুহাত ওপরে তুলে আকুল হয়ে বলতে থাকে, খোদা, তুমি আছ, তুমিই একমাত্র সত্য এই দুনিয়ায়, তা না হলে শত্রুর অন্ধকার কারাগারে তিলে তিলে পচে শেষ হচ্ছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই ভাবতাম তোমার কথা। ইন্তেকাল সব দুঃখ বেদনার অবসান ঘটাতে পারে, আমি তোমার কাছে দিবস রজনী সেই প্রার্থনাই জানিয়েছিলাম এতকাল। কিন্তু তখন কী জানতাম আমার শত্রুর পুত্রই আমাকে মুক্ত করে আবার সূর্যের আলো দেখাবে একদিন। এখন ভাবছি সবই তোমার অপার লীলা।

তারপর সুলতানের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বললো, জাঁহাপনা, একদিন যার জন্য অনেক রক্তপাত ঘটে গেছে, অসহ অত্যাচার সয়েছি, এবং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমার মুখ থেকে একটি শব্দ বের করতে পারেনি, আজ তা আমি স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। যে সহৃদয়তার পরিচয় আপনি দিয়েছেন আমার কাছে তার মূল্য অসীম। আপনার পিতা সেদিন আমাকে মেরেধরে ভয় দেখিয়ে কবুল করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি অন্যায় এবং অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াতে শিখিনি। এবং সেই কারণেই জীবনকেও পণ করতে হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রেম প্রীতি ও সহৃদয়তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমার বিশ্বাস প্রেম দিয়ে দুঃসাধ্য সাধন করা যায়। আজ আপনাকে আমি খুশি মনে ঐ চর্মপত্র পাঠ করে দিচ্ছি। এই একটি মাত্র দলিল সঙ্গে করে আমি একদিন মানুষের অগম্য সাদ্দাত ইবন আদাতের শহর ছেড়ে চলে আসতে পেরেছিলাম। আজ পর্যন্ত সে শহরে কোনও জনমানব যেতে পারেনি।

সুলতান বৃদ্ধের হাতে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, আপনি আমার পিতৃসম, যদি কিছু মনে না করেন এই চর্মপত্রের পাণ্ডুলিপি এবং ঐ আজব শহর সম্বন্ধে যা জানেন বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বৃদ্ধ বললো, সে এক বিরাট কাহিনী, মালিক। যাই হোক বলছি শুনুন ঃ

আমার বাবা কাইরোর একটা সম্ভ্রান্ত সওদাগর ছিলেন। ধন-সম্পদ ছিল যেমন প্রচুর, তেমনি ছিলেন তিনি সর্বজন-সম্মানিত ব্যক্তি।

আমি তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান। আমার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সেই সময়ের সেরা পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন আমার বিদ্যালাভের জন্য।

আমার যখন মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স সেই সময়েই বিদ্বজ্জনের মধ্যে আমার পাণ্ডিত্য নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যকর আলোচনা হতে লাগলো। ফলে, অচিরেই আমি দেশ বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠলাম। প্রাচীন পুঁথি পাঠে আমার মতো দক্ষ মানুষ সে-সময়ে আর দুটি ছিল না।

দিনক্ষণ দেখে বাবা আমাকে এক পরমাসুন্দরী চতুর্দশীর সঙ্গে শাদী দিলেন। আমার বিবি শুধু দেখতেই রূপসী ছিল না, লেখাপড়াতেও ছিল বেশ বুদ্ধিমতী। শাদীর পর সুখ-সম্ভোগের মধ্যে পুরো দশটা বছর আমরা একত্রেই কাটিয়েছিলাম।

কিন্তু নিয়তিকে কে এড়াতে পারে ?

বাবা মারা গেলেন। সেই সঙ্গে সৌভাগ্যও বিদায় নিল। ব্যবসা বাণিজ্যে দারুণ লোকসান হতে লাগল। মহাজনদের কাছে ঋণ জমে পাহাড় হয়ে উঠলো। এমন সময় মরার ওপর খাঁড়ার ঘা—আমার প্রাসাদোপম বিরাট ইমারত আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বিপদ কখনও একা আসে না। আমার শেষ সম্বল একটিমাত্র জাহাজ—তাও সমুদ্রঝঞ্ঝায় তলিয়ে গেল একদিন।

আমি কপর্দকশূন্য পথের ভিখিরি হয়ে গেলাম। আমি ভবঘুরের মতো দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। এত দুঃখে, বিপদেও কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করেছি নিত্য। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যে দেশেই যাই, মসজিদে সময় মতো নমাজ পড়া। মসজিদে গেলে অনেক সাধু মানুষের দেখা মেলে। তাঁরা অনেক জ্ঞানের কথা, অনেক ধর্মোপদেশের কথা বলেন। আমার সে-সব শুনতে বড় ভাল লাগতো। ঐ নিঃসম্বল জীবনে তাঁরাই ছিল আমার প্রকৃত আপনজন, বন্ধু।

এইভাবে ভাগ্য অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে অবশেষে একদিন শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসি। আমার বৃদ্ধ বিধবা জননী ও ক্ষুধাক্লিষ্ট সন্তান ও বিবির মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। এমনই আমার দুর্ভাগ্য, নিজের মা বৌ বাচ্চাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না ? এ হেন তুচ্ছ জীবন রেখে কী লাভ ?

একদিন, কোনও উপায়েই আর কিছু সংগ্রহ করতে পারলাম না। আমার বিবি তার অঙ্গের শেষ বস্ত্রটুকু খুলে আমার হাতে দিয়ে বললো, যাও, এটা বেচে যাহোক কিছু এনে দাও। বাচ্চাটার মুখের দিকে আমি আর চাইতে পারছি না।

মনের ক্ষোভ মনেই চেপে পোশাকটা নিয়ে বাজারে গেলাম। সেখানে দোকানে দোকানে ঘুরে বিক্রির চেষ্টা করছি, এমন সময় খয়েরী রঙের উটের পিঠে এক বাদাবীকে দেখতে পেলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহারজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো উননব্বইতম রজনী :
আবার সে বলতে শুরু করে :

আমাকে দেখতে পেয়ে সে লাগাম টেনে উটটাকে থামালো। তারপর নিচে নেমে খুব বিনয়াবনত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মালিক, আপনি কী বলতে পারেন, অল আসারের পুত্র হাসান আবদাল্লার বাড়িটা কোন্ দিকে ?

এক পরদেশীর মুখে একথা শুনে আমি আমার দৈন্যদশার কারণেই কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেলাম। হয়তো এই বিপদকালে আল্লাহই ওকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে আশীর্বাদ হিসাবে, কিন্তু তবু আমি নিজেকে উন্মুক্ত করে ধরতে পারলাম না ওর কাছে।

আপনি আরব-শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জনাব, এই কাইরো শহরে ও রকম নামের কোনও মানুষ তো কেউ বাস করে না।

আমি আর ওর সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। কথা কয়টি বলেই পিছন ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু বাদাবী ছুটে এসে আমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলো, খোদা হাফেজ, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, আপনিই শেখ হাসান আবদাল্লা কিনা ? আপনার বাবাই তো অল আসার ? আমি বুঝতে পেরেছি কেন আপনি নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইছেন। বাড়িতে মেহমান এলে তাকে কী করে সমাদর করবেন এই আশংকাতেই আমাকে এড়াতে চাইছেন, তাই না ?

ওর কথায় আমি আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি কাতর অনুনয় করে বললাম, আমাকে দয়া করে মাফ করুন, আমাকে ভুলে যান।

কিন্তু সে কথায় সে কান দিল না। আমাকে অনেক আদর সোহাগ করে চুম্বন করতে লাগলো।

—কেন, ভাইসাব এত দ্বিধা কেন ? সব দিন মানুষের সমান যায় না। ধর, আমি যদি তোমার সহোদর বড় ভাই হতাম ? পারতে কী মুখ ফিরিয়ে নিতে ?

এর পর আর কথা চলে না। আমি ওকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এলাম। উটের পিঠে চাপলো না,, আমার পাশে পাশে সে হেঁটেই এল। সারাটা পথ আসতে আসতে শুধু একটা চিন্তায়ই আমাকে দংশন করতে থাকলো—মুসাফির মেহমানের সামনে ধরার মতো কোনও সম্বলই তো আমার নাই।

ঘরে ফিরে বিবিকে বললাম সব কথা। —জান বিবিজান, মনে হচ্ছে আল্লাহ স্বয়ং পাঠিয়েছে এঁকে। আর আমাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না, দেখে নিও।

আমার বিবি বললো, কিন্তু সে তো হলো, এখন কী খেতে দেব মেহমানকে। হাদিসে আছে ঘরে অতিথি এলে পুত্র-কন্যাদের খানাপিনাও তার প্রাপ্য। তুমি দেরি করো না। ছুটে বাজারে যাও। যে দামেই পারো পোশাকটা বেচে কিছু সওদা করে নিয়ে এস। অতিথি সৎকার শেষে যদি কিছু বাঁচে তবে আমাদের ভোগে লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু এখন বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবো কি করে ? বৈঠক

খানায় ওকে বসিয়েছি। বেরুতে গেলে ওর সামনে দিয়ে বেরুতে হবে। তা কি তিনি হতে দেবেন ? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবেন, তোমার কামিজের তলায় কী নিয়ে যাচ্ছ ভাই, দেখি ? তখন আমি কী বলবো ওকে ?

বিবি বললেন, কিন্তু তা বলে অতিথিকে অভুক্ত রেখে চক্ষুলজ্জা নিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না গো।

মহা সঙ্কটে পড়লাম। কিন্তু কিই বা উপায়, বাইরে বেরুতে গিয়েই বাদাবী ভাই-এর জেরার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—দেখি ভাইসাব দেখি, কামিজের তলায় ওটা কী ?

আমি থতমত খেয়ে বলি, কই না তো, কিছু না।

—খোদা মেহেরবান, আমার কাছে গোপন করো না ভাই। বল কী নিয়ে যাচ্ছ—এবং কেন ?

আমি পোশাকটা বের করে দেখালাম ওকে। বললাম, আমার বিবির বড় শখের জিনিস। এবং এটাই শেষ সম্বল আমাদের। এতদিন আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু আজ আর কোনও উপায় নাই। তাই বাজারে বেচতে যাচ্ছি।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি না আমাকে বড় ভাই বলে ঘরে এনেছ ? একজন মেহমানের পরিচর্যার জন্য তুমি বিবির এই শখের জিনিসটা বিক্রি করতে যাচ্ছ ? এই নাও, দশটা দিনার। যাও, যা প্রাণ চায় কিনে-কেটে নিয়ে এস। আমরা সবাই মিলে আজ ফলার খাবো।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে দিনারগুলো আমার হাতে গুঁজে দিল। আমি না করতে পারলাম না।

সেই শুরু হলো। প্রতিদিন বাদাবী আমাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বাজার করে আনতে বলে। আমিও নানারকম চর্ব্য-চোষ্য জাতীয় খানাপিনা কিনে এনে মহাস্ফূর্তিতে দিন কাটাতে লাগলাম।

এইভাবে পনেরোটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ষোল দিনের দিন বাদাবী সর্দার আমাকে বললো, আচ্ছা হাসান আবদাল্লাহ, তুমি কি নিজেকে বিক্রি করতে চাও ?

আমি পরিহাস মনে করে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই, বান্দা তো আপনার কাছে বিক্রি হয়ে আছে মালিক।

বাদাবী এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কী দাম দিলে নিজেকে বিক্রি করবে তুমি ?

আমি তখনও লঘুভাবে নিচ্ছি ও-কথাগুলো। বললাম একখানা কোরাণ আর এক হাজার দিনার—এই তো যথেষ্ট এতেই আমার চলবে।

—আমি তোমাকে দেড় হাজার দিনার দেব, আবদাল্লাহ, তুমি রাজী ?

হঠাৎ কেমন খটকা লাগলো বাদাবীর কথায়। নাঃ, ও তো তামাশা মজাক ফজাক করে বলছে না এসব। সত্যি সত্যিই ব্যবসাদারী চালে দরাদরি করছে। আমি তখন নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছি। ওকে এক রকম কথাই দিয়ে দিয়েছি, হাজার দিনার পেলেই আমি ওর হয়ে যাবো। তার বদলে সে

বদান্যতা দেখিয়ে বলেছে দেড হাজার দেবে। আমি ভাবলাম, বাদাবী মন্দ প্রস্তাব করেনি। বৌ বাচ্চার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। টাকাটা পেলে এরা দুটো খেয়ে বাঁচবে। আর আমার জীবন? ও নিয়ে আমার কোনও মায়া মমতা নাই। যদি কেউ ফাঁসী দেবার জন্যেও কিনে নিতে চায় আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারে আমিই, তো সব নই। আমার বিবি আছে মা আছেন। তাদেরও অনুমতি দরকার। বললাম আমি একবার বিবিকে জিজ্ঞেস করে দেখি। আমার নিজের দিক থেকে বিন্দুমাত্র অমত নাই। আমাকে একটু সময় দিন, মালিক।

—বেশ তো, ভেবে চিন্তে আলাপ আলোচনা করেই আমাকে বলো। এত তাড়াহুড়োর কী আছে?

এই বলে আমাকে ছেড়ে সে তার নিজের কাজে বেরিয়ে পড়লো।

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, আমার মা বৌকে সব কথা বলতে তারা কেঁদে কপাল চাপড়াতে থাকলো।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেখ, তোমরা অবুঝ হয়ো না। যে নিদারুণ দুঃখের দিন দেখেছ এর আগে, এই বাদাবী আসার পর তা কেটে গেছে, বলা যায়। এবং আমার ধারণা, তার প্রস্তাব মেনে নিলে তোমরা সকলে খেয়ে পরে বাঁচবে? এ ছাড়া এখন যদি তার কথা না শুনি সে হয়তো রেগে গিয়ে বলবে, এতদিন তোমার খাওয়ার জন্য যে টাকা দিয়েছি তা ফেরত দিয়ে দাও। তখন আমি কোথা থেকে সে ঋণ শোধ করবো?

আমার বিবি এবং মা শঙ্কিত হলো। তাইতো শয়তান বাদাবীটা যদি টাকার দাবি তোলে তাহলে কী উপায় হবে?

মুখে আর না বলতে পারলো না ওরা। বিকেলে বাদাবী ফিরে এলে আমি বললাম, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।

বাদাবী তখুনি পনেরোশো দিনার গুণে আমাকে দিল।

—পয়গম্বরের কাছে প্রার্থনা জানাও, আবদাল্লাহ তোমার ওপর যেন সদয় থাকেন। তাহলে ভাইজান, এখন থেকে তুমি আমার কেনা সম্পত্তি হলে? তোমার আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আমার কাছে সুখেই থাকবে। স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হবে না কিছুমাত্র। আমি শুধু তোমাকে আমার সুদূর যাত্রাপথের এক বন্ধু সহচর করে রাখবো। জানতো পয়গম্বর বলেছেন: বিদেশ ভ্রমণ কালে সঙ্গীই সবচেয়ে বড় পাথেয়।

আমি ফুল্ল মনে সেই পনেরশো দিনারের তোড়াটা নিয়ে মা এবং বিবির কাছে গেলাম। তারা তখন অঝোরে কাঁদছিল। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম ওদের, বাদাবী আমাকে তার আপনজন করেই রাখবে, তোমরা কোনও দুশ্চিন্তা করো না আমার জন্য।

কিন্তু সে-কথায় কী প্রিয়জনকে ভোলানো যায়?

—না না, ঐ রক্তমাখা টাকা আমরা ছোঁবো না। তার চেয়ে না খেয়ে মরবো সে-ও ভালো।

আমি বললাম, তোমরা যা ভয় করছো, তা হবে না। বাদাবী খুব সুন্দর মানুষ। আমাকে কেনার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছিল না তার। শুধু তোমরা কষ্ট পাবে জেনেই সে অনুগ্রহ করে এটা করলো।

আপনজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদাবীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লাম। বাদাবী-সর্দার প্রথমে আমাকে বাজারে নিয়ে গেল। সেখান থেকে তাজা তাগড়াই দেখে একটা উট কিনলো আমার জন্য। তারপর সাজ-পোশাক খাবার-দাবার অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম সামানপত্র কিনে চাপিয়ে দিল তার পিঠে। আমি উঠে বসলাম আমার উটে আর বাদাবী তার নিজেরটায়।

তারপর যাত্রা শুরু হলো।

মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়ে একটানা দশ দিন চলতে থাকলাম। সে এক দুঃসাহসিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জীবনে এমন অভিজ্ঞতার স্বাদ এই প্রথম পেলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো নব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

এগার দিনের দিন আমরা এসে পৌঁছলাম এক শস্য-শ্যামল প্রান্তরে। আনন্দে নেচে ওঠে মন।

সবুজ ক্ষেত পার হয়ে এক বিস্তীর্ণ রুপালী মাঠ। মাঠের মাঝ-বরাবর একটি গ্রেনাইট পাথরের উঁচু পাহাড়ের চূড়াটা দেখে মনে হয় এক তাম্রবর্ণ বিশাল বপু যুবক শীর্ষাসন করে আছে। তার বিস্তৃত ডান হাতের মুঠোয় ধরা পাঁচটা বিরাট চাবি। প্রথম চাবিটা সোনার, দ্বিতীয়টা রুপার, তৃতীয়টা তামার, চতুর্থটা লোহার এবং পঞ্চমটা সীসের তৈরি। সবগুলোই দেখতে বড় অদ্ভুত ধরনের।

এই চাবিগুলো এক একটা নিয়তির প্রতীক। সোনাটা দুঃখের, রুপারটা কষ্টের, তামারটা মোউৎ-এর, লোহারটা যশের এবং সীসারটা সুখের এবং জ্ঞানের।

কিন্তু এত সবের আমি কিছুই জানতাম না। এবং সেই কারণেই আমার জীবনে নেমে এসেছিল গভীর দুঃখ বেদনা।

মিনারের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম আমরা। বাদাবী তার উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লো। দেখাদেখি আমিও নামতে যাচ্ছিলাম এমন সময় দেখি, বাদাবী ধনুকে তীর জুড়ে মিনার-শীর্ষের সেই ঊর্ধ্বচরণ যুবকের দিকে তাক করছে। বাঁ হাতে ধনুকটাকে বাগিয়ে ধরে তীরসুদ্ধ ছিলাটাকে বুকের কাছে টেনে এনে নিশানা করে ছুঁড়ে দিল তীর। কিন্তু তীর ছোঁড়ার অভ্যাস বা তেমন দক্ষতা ছিল না বলে বোধ হয় তাম্রমূর্তিকে আঘাত করতে পারলো না সে তীর। অনেকটা দূর দিয়ে চলে গেল। আশাহত বাদাবী আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, এবার তোমার পরীক্ষা নাও, ধর,

দেখি কেমন তোমার নিশানা। ঐ চাবিগুলোকে তাক করবে।

তীর ধনুকটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে। ধনুকটা বড় সুন্দর। দক্ষ ভারতীয় কারিগরদের হাতে তৈরি।

প্রথম বাণেই আমি তাম্র-যুবকের হাত থেকে সোনার চাবিটা ফেলে দিলাম নিচে। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে বাদাবীর হাতে দিতে গেলাম। কিন্তু সে নিতে চাইলো না, বললো, এটা তোমার কাছে রাখ, আমার চাই না। তুমি তো দেখছি চৌকস তীরন্দাজ—এটা তোমার দক্ষতার পুরস্কার।

সুতরাং স্বর্ণ চাবিটা আমার কোমরে গুঁজে রাখলাম। হায়, তখন কী জানি সে চাবি দুঃখ-লোকের দরজা খুলে দেবে আমার জীবনে!

পরের বারে রুপার চাবিটাকে নামিয়ে আনলাম। কিন্তু বাদাবী সেটাও আমাকে দিয়ে দিল। যথারীতি ওটাকেও ট্যাকে গুঁজলাম আমি। এ চাবিটা কষ্টের পাথারে ডুবিয়ে দেবে আমাকে। কিন্তু সে-কথা তখন জানবো কী করে?

পরের দুই তীরে লোহা আর সীসার চাবি দুটো পেড়ে আনলাম। এর প্রথমটা যশখ্যাতির এবং দ্বিতীয় সুখসমৃদ্ধি ও জ্ঞানগরিমার প্রতীক। বাদাবী আনন্দে নেচে উঠে দুটোই নিজে নিয়ে নিল। এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বন করে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা যাও, এবার তুমি মুক্ত। আর তুমি আমার বান্দা নও।

আমি তার বদান্যতায় অভিভূত হয়ে গেলাম। লোকটা কত মহৎ কত উদার। এত পয়সা দিয়ে আমাকে কিনেছিল, এই সামান্য কাজের বিনিময়ে সে আমাকে মুক্ত করে দিল! কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত হয়ে এল। কোমর থেকে চাবি দুটো বের করে বললাম, এ দুটো আপনার। আপনি রাখুন।

বাদাবী আমাকে আদর সোহাগ করে বললো, না, ও দুটো আমি তোমাকে দিলাম, ভাইজান।

আরও একটা চাবি তখন মিনার-শীর্ষের তাম্রযুবকের হাতে ধরা আছে, সুতরাং ওটাকেও নামিয়ে আনবো এই আমার ইচ্ছা। ধনুকে তীর জুড়ে সবে নিশানা ঠিক করতে পেরেছি, আর একটু হলেই তীরটা হাত থেকে বেরিয়ে যায় আর কি, এমন সময় বাদাবী ছুটে এসে ধনুক সুদ্ধ আমার হাতটা সজোরে নামিয়ে নিম্নমুখী করে দিয়ে প্রায় ভর্ৎসনা করেই বললো, আঃ, কি করছো! যে দুঃখ কষ্ট সঙ্গে নিয়েছ তাই বয়ে বেড়াও—আবার ওটার দিকে নজর কেন?

তার এই অপ্রত্যাশিত উষ্মায় আমি সেই মুহূর্তে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। তীরটা জ্যাতে আর ধরে রাখতে পারলাম না। কিন্তু ধনুক নিম্নমুখী ছিল, তাই তীরখানা আমার একখানা পায়ের পাতা ভেদ করে মাটিতে গেঁথে গেল।

সে কি রক্তারক্তি কাণ্ড। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে গেলাম আমি। বাদাবী অবশ্য তীরখানা পা থেকে ছাড়িয়ে ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে উটের ওপরে চাপিয়ে দিল।

সেই শুরু হলো আমার দুর্ভাগ্যের দিন।

একটানা তিন দিন তিন রাত্রি ধরে মরুপ্রান্তর ভেঙেগ চলেছি। পায়ের অসহ্য ব্যথায় প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি আমি। বাদাবী আমাকে মাঝে মাঝে সাহস দিয়েছে। কষ্টকে সইবার জন্য মন শক্ত করতে হয়। কিন্তু এই দুঃসহ যন্ত্রণা কী করে মুখ বুজে হজম করা সম্ভব?

খিদেয় পেট জ্বলছিল। বাদাবী বললো, সামনেই একটা নদী পাবো। নদীর পাড়ে একটা বাগান আছে। হয়তো বরাতে থাকলে কিছু ফলটল মিলতে পারে।

অচেনা সব গাছ। ফলগুলোও সব অজানা। লাল রঙের। দেখতে বড় সুন্দর। তখন খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, পায়ের ব্যথা তুচ্ছ করে প্রায় বাঁদরের মতো লাফিয়ে একটা গাছের ওপরে উঠে গেলাম। ওঃ, যত সব টুকটুকে পাকা ফল। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলতে লাগলাম। তারপর নেমে এসে একটা ফল মুখে নিয়ে সবে কামড় বসিয়েছি হঠাৎ আমার ব্রহ্মতালু ঘুরে গেল। কে যেন আমার চোয়ালে তুরপুন বিঁধে দিতে থাকলো। আমি আর হাঁ করে ফলটাকে মুখ থেকে বের করে ফেলতে পারি না। চিৎকার দেব তারও উপায় নাই। গোটা ফলটা আমার মুখ অবরোধ করে আছে। হাত পা ছুঁড়ে গোঁ গোঁ করতে করতে আছড়ে পড়ে গেলাম। আমার অবস্থা আঁচ করতে না পেরে বাদাবী কাছে ছুটে আসে। চোয়ালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফলটাকে বের করে ফেলে দেয়।

গাছতলায় যে ফলগুলো পড়েছিল সেগুলো কুড়িয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে বাদাবী বুঝতে পারে, ফলগুলোর গা ছোট ছোট সোঁয়া পোকায় ঢাকা। আমি খিদের জ্বালায় ওসব দিকে নজর করার খেয়াল করিনি। এই বিষাক্ত পোকাগুলোর বিষ-যন্ত্রণা তিন দিনের আগে উপশম হয় না। সারা মুখ ফুলে ঢোল হয়ে যাবে।

বাদাবীর কথা শুনে যন্ত্রণা আমার আরও বেড়ে গেল। এই বিছে কামড়ের জ্বালা তিনদিন ধরে সহ্য করতে হবে! ওরে বাবা, এর চেয়ে যে মৃত্যু অনেক ভাল ছিল।

ধীরে ধীরে আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো। যন্ত্রণায় আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলাম সেই গাছতলায়। বাদাবী আমাকে পরিত্যাগ করেনি। সে আমার পাশেই রইলো। চারদিনের দিন সকালে অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। ফোলা এবং ব্যথা অনেকটা কমে এসেছে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। বাদাবী বললো, যাও না, ওদিকে নদী আছে, জল খেয়ে এস।

আমি নদীর দিকে ছুটলাম। রুপার মতো ঝকঝকে পানি। যতটা পারলাম প্রাণভরে খেয়ে ফিরে এলাম।

বাদাবী বললো, চল যাত্রা করা যাক। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেছে বোধ হয়। কিন্তু এখানকার কোনও ফল মুখে তোলা ঠিক হবে না। তার চেয়ে চল, সামনে এগোই। একটা পাহাড় পাবো। তার নিচে অনেক গাছ-

গাছালি আছে। সেখানে কিছু মিললেও মিলতে পারে।

আবার উটের পিঠে চাপলাম দুজনে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই পেটে বেশ ব্যথা অনুভব করতে থাকলাম। যত এগোই ব্যথাটা বাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা পেট জুড়ে অসহ্য ব্যথায় ছটফট করতে লাগলাম। প্রাণ যায় যায়--এমন অবস্থা।

বাদাবী বললো, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তার নাম জপ কর, কমে যাবে।

পাহাড়ের পাদদেশে এসে একটা সুন্দর উপবনে থামলাম আমরা। সামনে নানা জাতের নাম না জানা গাছপালা। বাদাবী সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্য থেকে একটা বাঁশের কোড়া জাতীয় একটা জিনিস কেটে নিয়ে এল। ওপরের খোসা ছাড়াতে ভেতরে বেশ শাঁসালো বস্তু দেখা গেল। বাদাবী বললো, খাও, পেটও ভরবে, তেষ্টাও যাবে।

খেয়ে দেখলাম—বেশ মিষ্টি। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সারারাত সুখ-নিদ্রায় কাটলো।

সকালবেলায় শরীর মন বেশ ঝরঝরে বোধ হলো। বাদাবী বললো, কী, এখন বেশ ভাল লাগছে তো? আচ্ছা এবার তোমায় একটা কাজ করতে বলবো। ঐ যে পাহাড়ের চূড়াটা দেখছো ওখানে উঠে যেতে হবে। এখন সূর্য ওঠার দেরি আছে। চূড়ায় উঠে তুমি সূর্যোদয়-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। কিন্তু সাবধান আরোহণের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। সূর্যের লাল আভা যখন দেখতে পাবে তখন পূর্বদিকে মুখ করে নমাজ পড়তে বসবে। তারপর নমাজ শেষ হয়ে গেলে নিচে নেমে আসবে। মনে থাকবে তো?

শরীরের ওপর দিয়ে কদিন অনেক ধকল গেছে, তবু বাদাবী আমার পরম হিতৈষী, তার কথা ঠেলতে পারলাম না। পায়ে তখনও বেশ ব্যথা ছিল, তা সত্ত্বেও কোনও রকমে ওপরে উঠে গেলাম।

পাহাড়ের উপরিভাগ একেবারে ন্যাড়া। কোথাও আড়াল করে দাঁড়াবার উপায় নাই। অথচ প্রচণ্ড দমকা হাওয়ার দাপট ক্ষণেক্ষণেই আমাকে টাল-মাটাল করে ফেলছিল। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না, হাওয়ার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সেই উন্মুক্ত পর্বত-শিখরে সটান শুয়ে পড়লাম আমি। দেহ অবসাদগ্রস্ত ছিল, স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম জড়িয়ে ধরলো আমার চোখে।

যখন ঘুম ভাঙলো তাকিয়ে দেখলাম, সূর্য সবে উঠেছে। আমি দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, কে যেন আমার পা দুখানা জোর করে চেপে ধরে রেখেছে, কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করলাম, আমার ঠ্যাং দুখানা ফুলে কলা গাছের মতো হয়ে গেছে। পেটের দশাও তাই। মনে হচ্ছিল আমার পেটের মধ্যে কে যেন একটা আধমণি তরমুজ পুরে দিয়েছে। ফুলে ফেঁপে ঢবঢব করছে। ঘাড় কাঁধ কেমন যেন সিঁটকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এদিক-ওদিক নড়াতে-চড়াতে পারছিলাম না।

এতৎসত্ত্বেও আমি বুকে বল সঞ্চয় করে অমানুষিক কায়দা কসরত করতে

করতে এক সময় উঠে দাঁড়াতে পারলাম। আমার কেবলই আশংকা হচ্ছিল, সময় মতো নামতে না পারলে বাদাবী হয়তো বা আমাকে ছেড়েই চলে যাবে।

ঐ অবস্থাতেও পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে নমাজ সারলাম। অবাক হলাম আমার নমাজ শেষ হতে না হতেই সারা আকাশ ঘন তমসায় আবৃত হয়ে গেল।

আমি আর অপেক্ষা না করে পাহাড়ের ধাপে ধাপে পা রেখে অতি সন্তর্পণে নিচে নামতে থাকলাম। পা দুখানা দানবের মতো বিশাল দশমণি ওজনের বলে মনে হচ্ছিল। নিজের পা নিজেই টেনে ওঠাতে পারি না—এমনি আমার অবস্থা।

এভাবে ভারসাম্য রেখে কতক্ষণ আর ঠিক থাকা যায়, একবার একটু বেকায়দায় পা পড়তেই হড়কে গেলাম। ব্যস, তারপর গড়াতে গড়াতে পপাত ধরণীতলে। বলা বাহুল্য আমার কোনও চৈতন্য ছিল না তখন। দেহের পোশাক-আশাক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে। সারা অংগে সহস্র ক্ষতয় রক্তাক্ত। কী করে যে প্রাণে বাঁচলাম, তা আমার জীবনদাতা বাদাবী মালিকই জানে, আমি বলতে পারবো না।

কয়েকদিন পরে বাদাবীর পরিচর্যায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলাম। সে আমাকে ভরসার বাণী শোনাতে লাগলো।

—অনেক বরাত করে এসেছ, ভাই, তা না হলে ঐ রকম পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ার পর কেউ বাঁচতে পারে না। যাক, ফাঁড়া ছিল কেটে গেছে, এবার তোমার ভাগ্যের চাকা অন্যপথে ঘুরবে, আল্লাহকে ডাকো, তাঁর ওপর ভরসা রাখো। বুকে সাহস আনো। এরপর আমাদের এক নতুন সন্ধানে পা বাড়াতে হবে। জীবনের অনেকগুলো বছর আমি তার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে, এবার তার পথের নিশানা আমি পেয়ে গেছি। খোদা হাফেজ, চল তার নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ি, বরাত যখন খুলেছে, আল্লাহ নিশ্চয় পাইয়ে দেবেনই।

এরপর কোমর থেকে তরবারী বের করে সামনে পুঁতে দিয়ে সে বললো, এই—এইখানে খুঁড়তে হবে। এখানেই পাওয়া যাবে সেই গুপ্তধনের সন্ধান। এস, এস, আর দেরি করো না ভাইজান, হাত লাগাও। ঘায়ের ব্যথা-বেদনা সব ভুলে যাও এখন। তুমি আন্দাজ করতে পারবে না, যে বস্তুর সন্ধানে আমি হন্যে হয়ে দেশে দেশে ফিরছি, তার সন্ধান পেলে, বেহেস্ত কোন্ ছার, সুখ-সম্ভোগ আর ঐশ্বর্য-সম্ভারের সীমা পরিসীমা থাকবে না আমাদের।

কিন্তু ওর ঐ দারুণ উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথাবার্তাতেও আমাকে বিন্দুমাত্র চাংগা করতে পারলো না। দেহে শক্তি বলতে এক ফোঁটা কিছু নাই। সারা অংগে ব্যথা, ক্ষতয় জ্বর-জ্বর। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি উঠে বসতে পর্যন্ত পারলাম না।

এবার বাদাবী বেশ রাগতভাবেই বললো, শোন হাসান আবদাল্লা, তোমাকে যা বলছি তা শুনছো না। তার ফলে তোমাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে

হবে। আমি বলেছিলাম, সাবধান, পাহাড়ের মাথায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ো না কখনও, সর্বনাশ হবে। আমার বারণ সত্ত্বেও তুমি সে কাজই করলে। ফলে, এখন দেখছো, এ কী দুর্ভোগে ভুগতে হচ্ছে। ঐ পাহাড়ে শয়তানের বাতাস লেগেছে তোমার হাড়ে। শরীরের সব খুন জহর করে দিয়ে গেছে সে।

বেশ ক্রোধের সংগেই সে বলে গেল কথাগুলো। কিন্তু তখন আমি দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে কাঁপছি দেখে কিছুটা শান্ত হয়ে বললো, ভেবো না, আমি তোমার ওপর খুব রেগে গেছি। আমি তোমাকে আমার সব রকম চেষ্টা দিয়ে সারিয়ে তুলবো।

এই বলে সে তার কোমর থেকে একখানা তীক্ষ্ণ ফলার ছুরি বের করে আমার সারা দেহের নানা জায়গায় ফুটিয়ে দিয়ে শরীরের বিষাক্ত পানি বের করে ফেলতে লাগলো।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে অনেক পানি বের করার পর শরীরটা কিছুটা হাল্কা বোধ হতে থাকলো। বাদাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে বসতে পারলাম এক সময়।

এরপর দুজনে মিলে বাদাবীর নির্দেশিত জায়গায় গর্ত খুঁড়তে লেগে গেলাম। অনেক মাটি তোলার পর গর্তটা বেশ বড় এবং গভীর হয়ে গেল। এক সময় দেখলাম, একটা পাথরের গম্বুজ মতো কি একটা বেরিয়ে আসছে। উৎসাহ বেড়ে গেল অনেক। শরীরের ব্যথা-বিষ আর তেমন অনুভব করতে পারলাম না তখন। ক্ষিপ্রহাতে মাটি কেটে গম্বুজটাকে পরিষ্কার করতে থাকলাম।

বাদাবী গম্বুজটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে টানাটানি করতে করতে ওপরের ঢাকনাটা খুলে বেরিয়ে এল।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, অসংখ্য ছোট বড় মানুষের কংকাল আর তার ওপর ছাগলের চামড়ায় লেখা একখানা ঐ পাণ্ডুলিপি, যেটা আপনি এখন হাতে ধরে আছেন।

আমার মালিক ছোঁ মেরে এই চর্মপত্রখানা তুলে নিল তার হাতে। উত্তেজনা, এবং কী এক অজানা শংকায় ঠকঠক করে সে কাঁপছিল তখন। যদিও পাণ্ডুলিপির ভাষাটা দুর্বোধ্য, তবু চোখের সামনে মেলে ধরে পাঠোদ্ধারের জন্য ছটফট করতে থাকলো।

অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকার পর এক সময় সে জয়োল্লাসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলে বললো, পেয়েছি—পেয়েছি আবদাল্লাহ, এতদিনের স্বপ্ন আমার সার্থক হয়েছে। সেই অমর্তলোকের নিশানা আমি খুঁজে পেয়েছি এতকাল পরে। আবদাল্লাহ, আনন্দ কর, নাচো গাও—আর কোনও ভাবনা নাই। অবার আমরা সঠিক পথ ধরে যেতে পারবো সেই স্বপ্নপুরীতে। আজ পর্যন্ত কোন মানুষ সাদ্দাতের ঐ মিনারের দেশে যেতে পারেনি। কিন্তু আমাদের যেতে বিশেষ কোনও অসুবিধে হবে না। ঐ মিনারপুরীতে পৌঁছতে পারলেই আমরা সেই লাল গন্ধকের কৌটোটা উদ্ধার করে আনতে পারবো।

আমি বললাম ঐ লাল গন্ধক দিয়ে কী হবে ?

—কী হবে ? পাগল—তুমি কিছুই জান না। তামাম দুনিয়ার সব ধন-রত্ন করায়ত্ত করার বীজমন্ত্র আছে ঐ গন্ধকে।

আমার শরীর আর চলছিল না। তা ছাড়া পথের বিপদে আমার বড় ভয়। বললাম, আমাকে মেহেরবানী করে ছেড়ে দিন, মালিক। যদিও আপনার সৌভাগ্যে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, তবু বলছি ঐসব ধন-সম্পদে আমার কোনও লোভ নাই। আমি মা বৌ-বাচ্চাদের কাছে ফিরে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই দিন কাটাতে চাই। আপনি আমাকে রেহাই দিন।

বাদাবী আমার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকালো।

—বেচারা! এত যে দুঃখ-কষ্ট সয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতটা পথ এলাম সে কি শুধু আমার একার লাভের জন্য ?

আমি বিনীতভাবে বলি, তা আমি জানি, মালিক। কিন্তু আমার কপালে অত ঐশ্বর্যর অত সুখ সইবে না। কারণ, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এক এক যাত্রায় আমাদের দুজনের দুরকম ফল হচ্ছে। আমি যা করতে যাচ্ছি তাই আমার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুঃখ-যন্ত্রণার সীমা থাকছে না। কিন্তু আপনার বেলায় তো তা ঘটছে না। তাই বুঝতে পেরেছি, ওসব ঐশ্বর্য সম্পদ আমার জন্যে বরাদ্দ করে রাখেননি তিনি।

আমার এসব দুঃখ বিলাপে কর্ণপাত করলো না বাদাবী। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে সামনের ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল এবং অনেকগুলো সেই বাঁশের কোড়া জাতীয় খাবার বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বললো, নাও, আর দেরি নয়, ওঠ, চেপে বস।

সে তার নিজের উটে এবং আমি আমার উটে চেপে বসলাম। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে সোজা পশ্চিম দিকে চলতে থাকলাম আমরা। একটানা তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর এক নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এই নদী গলিত পারদ-প্রবাহিনী। ওপারে পার হওয়ার একটি সরু সেতু আছে। সেতুটি স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্মিত। কিন্তু উপরিভাগ পিচ্ছিল, পা রাখামাত্র হড়কে নিচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

আমার মালিক কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ালো না। উট থেকে নামলো। আমাকেও নামতে বললো। বাদাবী একটা ঝোলা থেকে দুজোড়া পশমের জুতো বের করে এক জোড়া আমাকে দিয়ে বললো, আমি যেমন করে পরছি দেখে দেখে তেমনি করে পরে নাও।

জুতো পরার পর বাদাবী আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললো, একদম আমাকে ছাড়বে না। শক্ত করে ধরে খুব সন্তর্পণে দেখে-শুনে পা ফেলবে।

আল্লাহর মর্জিতে পায়ে পায়ে পার হয়ে গেলাম সেই মরণ-সেতুটি।

কয়েক ঘণ্টা সামনের দিকে পথ চলার পর এক কৃষ্ণ উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম আমরা।

দুপাশে গগনচুম্বী পাহাড়, মাঝখান দিয়ে পথ। পাহাড়ের গায়ে গজিয়েছে

বিশাল বিশাল পাইন বৃক্ষ। তার ছায়া-ঘন কালো কুটীল অন্ধকার নেমে এসেছে সারা পর্বতপথে। এদিক ওদিক নজর পড়তেই আমার পীলে চমকে উঠলো। সেই সব গাছের ডালে জড়িয়ে আছে ভয়ংকর সব পাহাড়ী সাপ। ওদের হাঁ-তে গোটা একটা হাতী ঢুকে যেতে পারে। ভয়ে শিঁউরে উঠে আমি দৌড়ে এগিয়ে পালাতে যাই। কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়? পাহাড়ের পথ আর ফুরায় না। এবং সারা পথব্যাপীই এই একই ভয়াবহ দৃশ্য।

আমি চোখ ঢেকে পথের ওপরে বসে পড়লাম। কান্নায় কণ্ঠ বুজে এল, ইয়া আল্লাহ, এ কোথায় দোজকের দরজায় নিয়ে এলে তুমি! এর চেয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করাও যে ভাল ছিল আমার।

বাদাবীর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে কাতর কাকুতি করে বললাম, আপনি আমার বিবি বাচ্চাদের জানে বাঁচিয়েছেন। সে কৃতজ্ঞতা কখনও ভোলার নয়। কিন্তু একি করলেন আপনি? এমন ভয়ংকর দেশে কেন নিয়ে এলেন আমাকে? এর চেয়ে এক কোপে কাল্লাটা কেটে নামিয়ে দিলে তো পারতেন মালিক? হায় আল্লাহ, কেন আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে গিয়েছিলাম আমি? না হয় খেয়ে না খেয়ে কোনও রকমে দারিদ্র্য-যন্ত্রণাতেই দিন কাটাতাম। তবু তো আপন জনের কাছে আপন দেশেই মরতে পারতাম! কেন আপনি আমাকে সুখের লোভ দেখালেন?

বাদাবী একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে থামিয়ে দিল, আঃ থাম। ধৈর্য ধর, বুকে সাহস সঞ্চয় কর নওজোয়ান। তুমি না পুরুষমানুষ! ভয় নাই, কেউ তোমাকে সংহার করতে পারবে না। আমরা আবার কাইরো ফিরে যাবোই। এই প্রত্যয় মনে থাকা চাই। কেউ আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। আর যখন আমরা দেশে ফিরবো তখন আর আমাদের কোনও দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কিছু থাকবে না! বদলে পাবো অতুল ঐশ্বর্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিলাস।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বিরানব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই বলে বাদাবী মালিক আমার পাশে বসে পড়ে সেই চর্মপত্রখানা বের করে নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ করতে থাকলো। তার একাগ্রতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আশেপাশের ঐ সর্পভয় তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। মনে হলো, সে যেন তার নিজ গৃহের নিভৃত শয়নকক্ষে নিঃশংক চিত্তে বসে রয়েছে! আমি কিন্তু ভয়ে মরি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করার পর বাদাবী মুখ তুলে বললো। হাসান আবদাল্লা ঝটপট এই জায়গাটা থেকে সরে পড়তে চাও?

—আলবাৎ—একশোবার চাই। আপনি বিশ্বাস করুন, মালিক, অর্থ বা সুখে আমার প্রয়োজন নাই। অনেক দুঃখ তাপের মধ্যেও আমি আমার বাচ্চা বৌ-এর সঙ্গে দিন কাটাতে চাই। আপনি আমাকে আর কষ্ট দেবেন না মালিক।

আপনি যদি বলেন, আমি আগাগোড়া কোরাণ কণ্ঠস্থ আওড়াতে পারি আপনার কাছে। আপনি যদি হুকুম করেন, আল্লাহর সব পবিত্র বাণী আপনাকে শোনাতে পারি এখনি। যদি বলেন, আপনার পুণ্যার্থে দশ বছর ধরে মক্কা মদিনাতে মোনাজাত করতে পারি আমি। এ ছাড়াও আপনি আরও যা যা ফরমাশ করবেন সবই আমি হাসিমুখে তামিল করে যাবো, কিন্তু একবার আমাকে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

বাদাবী আমার দিকে স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাকাল একবার।

—না হাসান আবদাল্লাহ, অত বড় বড় কঠিন কাজ তোমাকে করতে হবে না আমার জন্য। এর পরের পথটুকু অত্যন্ত সুগম। কিন্তু তার আগে আর একটি কাজ করতে হবে তোমাকে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, কী কাজ ?

বাদাবী তীর-ধনুকটা এগিয়ে দিয়ে বলে, সামনে এগোলে অনেক সাপের মধ্যে একটা বিরাট বড় কৃষ্ণফণার সাপ দেখতে পাবে। ঐ সাপটাকে তীর-বিদ্ধ করে মারতে তোমার মতো বিচক্ষণ তীরন্দাজের এমন কিছুই বেগ পেতে হবে না! সাপটাকে মেরে তার কাল্লা আর কলিজা কেটে নিয়ে আসবে আমার কাছে। ব্যস, এরপর আর তোমার কোনও কাজ নাই।

—ইয়া আল্লাহ। এই কী একটা সোজা কাজের বায়না হলো। না না, আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না ঐ বিষধর কালনাগিনী মারতে। কেন, অতই যদি সহজ মনে করেন, নিজে মেরে আনুন না ? আমি মরে গেলেও পারবো না।

বাদাবী আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, হাসান আবদাল্লাহ সব কথা কী ভুলে গেলে ভাই ? মনে করে দেখ, তোমার বৌ ছেলের মুখে যে খানা জুটছে তা কী জন্য ?

আমি কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গেলাম। কান্নায় ভরে এল দুচোখে জল। তীর-ধনুকটা নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

অতি সহজেই দেখা মিললো সেই কালনাগিনীর। তার বিশাল উদ্যত ফণা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লাম। একটা ড্রাগনের মতো দাপাদাপি করতে করতে একটু পরে সে নেতিয়ে পড়ে গেল। কোমর থেকে ছোরা বের করে ওর কাল্লা আর পেট চিরে কলিজাটা কেটে এনে বাদাবীর সামনে রেখে বললাম, এই নিন।

বাদাবী খুব তারিফ করলো আমার কাজের। বললে, তুমি ছাড়া এ কাজ আর কে করতে পারতো এত সহজে ? আচ্ছা এবার একটু আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে দাও।

আশপাশ থেকে গাছের ডালপালা কুড়িয়ে এনে পালা দিলাম। বাদাবী একখণ্ড হীরে বের করে সূর্যকিরণে মেলে ধরতে কিছুক্ষণের মধ্যে শুকনো ডালপাতায় আগুন জ্বলে উঠলো। তখন সে ঝুলি থেকে একটি ছোট্ট লোহার হাঁড়ি এবং পলার পাথরের সরু একটা চোঙা বের করে বললো, এই যে পলার

চোঙ্গাটা দেখছো আবদাল্লা, জান, এর মধ্যে কী আছে।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, কী করে জানবো, আপনি তো বলেননি কখনও?

বাদাবী বললো, এর মধ্যে ফিনিক্স পক্ষীর খুন আছে।

চোঙ্গার মুখের ছিপিটা খুলে লোহার হাঁড়িটার মধ্যে রক্তটুকু ঢেলে দিল সে। তারপর গনগনে আগুনের উপর বসিয়ে দিল হাঁড়িটাকে। এরপর সেই সাপের কাল্লা আর কলিজা দুটোও ছেড়ে দিল হাঁড়িটার মধ্যে। তারপর আপনার হাতের এই চর্মপত্রখানা মেলে ধরে সে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে থাকলো।

একটুক্ষণ পরে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমাকে বললো, আমার ঘাড়ে কাঁধে খুব ভাল করে এই হাড়ির পাঁচনটা মালিশ করে দাও তো।

মালিশ করতে করতে আমি লক্ষ্য করলাম ওর কাধের মাংসল জায়গা দুটো আস্তে আস্তে থলথলে নরম হয়ে আসছে। এরপর দেখা গেল দুপাশ থেকে দুখানা ডানা বেরিয়ে পড়ছে। ক্রমশঃ ডানা দুখানা বেশ বড়সড় হয়ে গেল একেবারে ঈগল পাখীর মতো।

এবার বাদাবী পাখা দুখানা আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে ওপরে ওড়ার চেষ্টা করতে থাকে। আমি দেখলাম বাদাবী আকাশে উড়বে উড়বে তাক করছে। ওর কামিজের খুঁট খুব শক্ত করে চেপে ধরে রইলাম। বাদাবী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পলকের মধ্যে শূন্যলোকে উঠে গিয়ে বায়ুবেগে আকাশপথে উড়ে চললো। আমিও চললাম ঝুলতে ঝুলতে।

জানি না, জাঁহাপনা, ঐ ভাবে কতক্ষণ আমরা আকাশপথে উড়ে চলেছিলাম। তবে এক সময় বুঝতে পারলাম, সেই কৃষ্ণ পর্বতমালা পিছনে ফেলে আমরা এক বিশাল বিস্তৃত স্ুবর্ণ প্রান্তর-শীর্ষে এসে গেছি। এই মাঠের চারপাশটা স্বচ্ছ নীলরঙের স্ফটিকের দেওয়ালে ঘেরা। মাঠের বালুকারাশি স্ুবর্ণধূলী। আর ছোট ছোট নুড়িগুলো সব নানা রকমের হীরে জহরৎ।

এই প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে বাগান ঘেরা এক প্রাসাদ-নগরী। চারপাশে অজস্র সারি সারি মিনার।

বাদাবী বললো, এই সেই মিনার দেশ—সান্দাতের শহর।

পাখা দুখানা ঈষৎ গুটিয়ে নিতেই শোঁ শোঁ করে নিচের দিকে নামতে থাকলাম আমরা।

ধীরে ধীরে ডানা দুটো গুটাতে গুটাতে এক সময় শরীরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং তখুনি আমরা নিচে নেমে পড়লাম।

প্রাসাদ-নগরীর চারপাশ সোনার দেওয়ালে ঘেরা। প্রবেশদ্বার একটাই। পরপর সাতটা ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ভিতরে একটা বিরাট ফুলবাগিচা। দুইপাশে দুই ফোয়ারা। অবিরল ধারায় পানি ঝরছে। মাঝখানে একটি মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপরে একটি সোনার মসনদ। কিন্তু সে মসনদে কোন স্ুলতান বাদশাহ নেই কেউ। আছে শুধু একটি ছোট সোনার কৌটো—যেটা এখন আপনার হাতে আছে, জাঁহাপনা।

বাদাবী কৌটোটা তুলে নিয়ে খুললো। ভিতরে লাল রঙের খানিকটা গুঁড়ো।

সে চিৎকার করে উঠলো, দেখ দেখ, হাসান আবদাল্লাহ, এই সেই লাল গন্ধক—কি না।

আমি বললাম, কী একটা বাজে জিনিস নিয়ে অমন হৈ হৈ করছেন, মালিক। ওসব ফেলে দিয়ে এদিকে দেখুন, কত বড় বড় সব হীরে জহরত। এগুলো বরং পুটলি বেঁধে নিই, আসুন। আমি তো বাবা, যতটা পেরেছি পকেট ভর্তি করে নিয়েছি।

বাদাবী বলে, আরে, ওসব তুচ্ছ, ওসব রাখ। এই এক বিন্দু গুঁড়োতে ওরকম হাজার হাজার হীরে জহরত বানানো যাবে। আর, সাবধান, এখানকার কোনও মণিমুক্তো সঙ্গে নেবার চেষ্টা করো না। তাহলে বাইরে পা দেবার আগেই নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে তোমার।

তাড়াতাড়ি সে ছুটে এসে আমার পকেট থেকে সব হীরে জহরতগুলো বের করে ফেলে দিল। কোমর-টোমর ভাল করে তলাশ করে দেখে নিল। তারপর বললো চল, আমাদের কাজ খতম। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবো না আমরা।

হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে সাতটা ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। কিন্তু এ কি! সামনে বিশাল বিস্তীর্ণ স্বর্ণ-প্রান্তর এবং অসংখ্য মিনার দেখে গিয়েছিলাম—সে সব কোথায় উধাও হয়ে গেল? তাকিয়ে দেখলাম, সেই পারদ-নদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।

সেই স্ফটিক-সেতু পার হলাম দুজনে। আমাদের উট দুটো যেন আমাদের জন্যেই পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুটির পিঠে দুজনে চেপে বসলাম। বাদাবী বললো, ব্যস, আর কোথাও নয়, সোজা মিশরে যাবো আমরা।

দুহাত তুলে আল্লাহকে সালাম জানালাম।

আমার কোমরে তখনও সেই চাবী দুটি গোঁজা ছিল। জানতাম না ওরাই আমাকে দুর্ভাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বার বার।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তিরানব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

অনেক দুঃখ দুর্বিপাক কাটিয়ে রুগ্নদেহে অবসন্ন মনে অবশেষে একদিন কাইরো এসে পৌছলাম। মনে আশার আলো ফুটলো। কতকাল পরে আবার আমার আপনজনের সঙ্গে মিলিত হবো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ঘরে ফিরে কোনও জনপ্রাণীর সাড়া না পেয়ে শঙ্কিত হলাম। পড়শিরা জানালো, আমি চলে যাওয়ার কয়েক-দিন পরেই এক মহামারি রোগে পরিবারের সকলেই ইন্তেকাল করেছে।

আমি শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লাম। হায় হায়, একি আমার ভাগ্য!

যাদের মুখে অন্ন জোগাবার জন্য এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করলাম তারাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল ?

বাদাবী আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, দেখ, চিরকাল কেউ বেঁচে থাকতে আসেনি এ সংসারে। সবাইকেই একদিন তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে হবে। কেউ দুদিন আগে কেউ দুদিন পরে যাবে তাঁর কাছে। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং এ নিয়ে শোক করতে নাই। যে আগে যেতে পারে, সেই বেশি ভাগ্যবান।

বাদাবী আমাকে হাতে ধরে অন্যত্র নিয়ে গেল।

নীলনদের তীরে এক প্রাসোদোপম মনোহর ইমারত কেনা হলো একটি। আমাকে সংগে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকলো বাদাবী। আমার মনের দুঃখ লাঘব করার জন্য বাদাবী তার সম্পদের অর্ধেক আমাকে বাটোয়ারা করে দিল। এবং কীভাবে ঐ গন্ধক গুঁড়োর সাহায্যে সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায় তার কৌশল শিখিয়ে দিল। সে প্রায় রোজই মণ মণ সীসা নিয়ে এসে সোনা করে তার অর্ধেক আমাকে ভাগ করে দিতে লাগল। সে ভেবেছিল, এই-ভাবে ধনসম্পদের মোহে আমি প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথা ভুলে আবার হাসি-গানে মেতে উঠবো। কিন্তু আমি তা পারলাম না। অর্থ আমাকে শোক তাপ ভুলাতে পারলো না।

আমার মালিক বাদাবী বিলাস ব্যসনের মধ্যে বিলিয়ে দিল নিজেকে। প্রতিদিন নানারকম বাদশাহী খানা-পিনা নাচ-গান আমোদ-প্রমোদের সমারোহ চলতে থাকলো। বাঁদীহাটের পরমাসুন্দরী বাঁদীতে ভরে উঠলো সারা প্রাসাদ। তাদের নূপুর-নিক্কণে অনুরণিত হতে লাগলো প্রাসাদের প্রতিটি মহল। স্বভাবতই ইয়ার-বক্সীদের ঘাটতি ছিল না। অনেক রথী-মহারথী আমির শাহজাদারাও মাইফেল করতে আসতে লাগলো নিয়মিত।

বাদাবী বড় দিলদরিয়া মানুষ। দান-ধ্যানে মুক্তহস্ত। কেউ যদি কোনও সুন্দরী বাঁদীর গান বা নাচে মুগ্ধ হয়ে তারিফ করতো সংগে সংগে মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দিয়ে বলতো, যদি মেহেরবানী করে আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করেন, ধন্য হবো।

আমি কিন্তু ওর ঐ জলসা-ঘরে যাইনি কখনও। শোকের পাথরে আমি কুল খুঁজে পাই না, নিভৃতে নিজের ঘরে বসে বসে আত্মবিলাপ করে দিন কাটাই।

একদিন সে আমার ঘরে এল। সংগে একটি পরমাসুন্দরী লাজুক তরুণী। বাদাবী সুরার মৌজে মশগুল হয়েছিল। খুশীর বন্যায় সে ভাসছিল। আমার খুব কাছে এসে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। মেয়েটিকে টেনে বসালো তার উরুর ওপর। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, হাসান আবদাল্লাহ, তুমি তো আমাকে কখনও গান গাইতে শোনানি, না? আজ আমি তোমাকে গান শোনাবো একটা।

আমাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সে উদাত্তকণ্ঠে গাইতে শুরু করলো ঃ

আজ রাতে সুরার নেশায় মাতাল আমি
তুমিও বন্ধু সংগী হতে পারতে
কমলানেবুর, গাছগুলো আকাশের সব বাতাস
কী পান করে নিঃশেষ করে ফেলেছে ?
আমাকে আর এক পেয়ালা পূর্ণ করে দেবে, বন্ধু ?
আমার হৃদয়ে তুফান উঠেছে
দেখ দেখ, কত গোলাপের কুঁড়ি লুটিয়ে পড়েছে পায়ে !
যদিও তোমরা সবাই উলঙ্গ—সুন্দর
তবু ঐ যে এক ফালি ঈদের চাঁদ
তার তুলনা কোথায় ?

গান শেষ করে বৃদ্ধ বাদাবী মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আমার শয্যার একপাশে শুয়ে পড়লো। আমি ভাবলাম এবার সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

কিন্তু মেয়েটি মুহূর্তের মধ্যে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখে-মুখে সে কি নিদারুণ আতঙ্ক !

আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কী ? কী হলো ? উঠে পড়ছো কেন ?

মেয়েটির ইশারাতে বুঝতে পারলাম, আমার এতদিনের সংগী মালিক বাদাবী বন্ধু চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে।

প্রাণপাখী দেহ ছেড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু, বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিষ্টি মধুর একটু নরম হাসি তখনও লেগে রয়েছে ওর অধরে।

নিজের হাতে আতর-জলে ওর দেহখানা ধুইয়ে দিলাম আমি। শেষ-কৃত্যের সমারোহে কোনও ত্রুটি রাখিনি। একটি কর্মবীর সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের অবসান হয়ে গেল।

অনেক দান ধ্যান করলাম। হাজার হাজার ধনী দরিদ্র মানুষকে পরমাদরে আপ্যায়ন করে খাওয়ালাম। এইভাবে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল আমার মনিবের প্রতি শেষ কর্তব্য করলাম আমি।

মনিবের সব সম্পত্তির তখন আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী। আপনার হাতের এই ছোট সোনার বাক্সটা খুলে দেখলাম। লাল গন্ধকের গুঁড়োয় ভর্তি ছিল কৌটোটা। কিন্তু দু'হাতে অঢেল খরচ করতে করতে তার অনেকখানিই শেষ হয়ে গেছে। বাকী যেটুকু ছিল তা এখনও তেমনি আছে ঐ বাক্সে। আমি কিছু খরচ করিনি। কোনও প্রয়োজনই হয়নি। কারণ অর্থে আমার লোভ বা প্রয়োজন ছিল না তখন। যাই হোক, এখন যেটুকু গন্ধকগুঁড়ো কৌটোটায় আছে তা আপনার সলতানিয়তের তামাম ঐশ্বর্যের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান, জাঁহাপনা। সেই প্রথম আমি চর্মপত্রটি মেলে ধরলাম। বাদাবী আমাকে পাণ্ডুলিপি পাঠ করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছিল। তাই পড়তে কোনও অসুবিধা হলো না। পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বুঝতে পারলাম আমি এতকাল ধরে

সোনা আর রুপোর যে চাবি দুটো অতি সযত্নে কোমরে গুঁজে রেখেছি তাই আমার যত দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ। সঙ্গে সঙ্গে চাবি দুটোকে বের করে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চুরানব্বইতম রজনী ঃ
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চাবি দুটো যখন আগুনে পুড়ছে ঠিক তখনই খলিফার পেয়াদা এসে দরজায় কড়া নাড়লো। দরজা খুলতেই তারা আমাকে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে গেল সুলতানের সামনে।

সুলতান থাইলুন, আপনার পিতা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমি খবর পেয়েছি নকল সোনার কারবার চালাচ্ছো তুমি। এক্ষুণি আমার সামনে সব কায়দাকানুন খুলে বল, না হলে কঠোর সাজা পেতে হবে।

আমি বলতে অস্বীকার করায় তিনি আমাকে বেদম প্রহার করালেন। কিন্তু আমি মুখ খুললাম না। তখন তিনি আমার হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তন্ন তন্ন করে এই কৌটোটা হস্তগত করে আমার প্রাসাদটা ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না তিনি।

কয়েদখানায় ছুঁড়ে দিয়েও ক্ষান্ত হলেন না তিনি। প্রতিদিন নিয়ম করে আমার ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকলেন। তাঁর আশা ছিল, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন না একদিন আমি ঐ গুপ্ত রহস্য বলতে বাধ্য হবো। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ আমার জেদ ছিল, অন্যায় জুলুমের কাছে মাথা হেঁট করবো না আমি।

কিন্তু আজ চল্লিশ বছর পরে আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গেছি। আজ আমার কোনও অহংকারই নাই, জেদ নাই, লোভ মোহ উচ্চাশা কিছুই নাই। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর পদাশ্রয়। তিনিই একমাত্র ভরসা। কী হবে আমার ঐশ্বর্যে, তাই আপনাকে আমি এই কৌটোর সব রহস্য অকপটে খুলে বলে দিলাম। আপনি সুলতান, আপনার অর্থের প্রয়োজন আছে। ওটা গ্রহণ করে আমাকে ভারমুক্ত করুন, জাঁহাপনা!

সুলতান মহম্মদ তখন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ হাসান আবদাল্লাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—খোদা হাফেজ, আপনার মতো সদাশয় মানুষ এত শাস্তি কেন ভোগ করলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বিধাতার বিচার?

এরপর সুলতান মহম্মদ হাসান আবদাল্লাকে তার দরবারের প্রধান উজিরের পদে বহাল করে তার সুচিন্তিত পরমার্শ নিয়ে বহুকাল সৎভাবে হুকুমত পরিচালনা করেছিল।

ঐ গন্ধক গুঁড়োর সাহায্যে শত শত মণ সীসা সোনায় পরিণত করেছিল

...লতান [illegible] কিন্তু নিজের ভোগের জন্য সে সোনার একটা কণা কখনও ব্যবহার করেনি। [illegible] মূল্যে বিশাল এক মসজিদ বানিয়েছিল সে। আজও মিশরের সেই সেরা মসজিদ সুলতান মহম্মদ ইবন থাইলুনের মসজিদ নামে জগদ্বিখ্যাত। শোনা যায় মসজিদটি বানাতে সাতহাজার মানুষের সাত বছর লেগেছিল। আর অর্থ ব্যয় হয়েছিল—সাড়ে সতের হাজার মণ স্বর্ণমুদ্রা।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শাহরিয়ার বললো, বুঝলাম বিধিলিপি কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তোমার কিস্‌সাটা শুনে মনটা বড় দুঃখে কাতর হয়ে গেল, শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, ঠিক আছে, এবার আপনাকে একটি লঘু রসের কাহিনী শোনাচ্ছি জাঁহাপনা। মনের ভার লাঘব হয়ে যাবে।

শাহরিয়ার জানতে চায়, কার কিস্‌সা শোনাবে, শাহরাজাদ সুলতানের বয়স্য মজিদ অল দিন আবু তাহির মহম্মদের হাস্য-মধুর একটি কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

এক সময়ে কাইরো শহরে আবু কাশেম নামে এক অর্থগৃধ্নু উনুনী বাস করতো। আল্লাহ তাকে অনেক দিয়েছিলেন। বিষয় সম্পত্তি পয়সা কড়ির প্রাচুর্য ছিল যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও লোকটির ধন-লিপ্সা আর কমে না। পয়সা বাঁচাবার সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস ছিল তার। লোকে তাকে চশমখোর হাড়কঞ্জুস বলতো।

ওর সাজ-পোশাক দেখে পথের দীনতম ভিখিরি ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। আলখাল্লার মতো শত সহস্র তালিতাপ্পি দেওয়া একখানাই চোগাচাপকান বারোমাস তার অঙ্গে শোভা পেত। ঐ মহামূল্য অঙ্গবাস ছাড়া আবু কাশেমের আলাদা কোনও অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করতে পারতো না। অনেকে তামাশা করে বলতো, আবু কাশেম মারা গেলে পর ঐ পোশাকটাকে যাদুঘরে রেখে দেওয়া হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেখার জন্য। কাশেমের মাথার তেল-চিটচিটে শতছিন্ন পাগড়ীটা ছিল আরও বাহারী। এমন তার সুবাস—আতঙ্কে কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষতো না। সেই খুশবু একবার আঘ্রাণ করলে অন্নপ্রাশনের আহার্য আবার প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কাশেমের চোগাচাপকান আর পাগড়ীর প্রকৃত বর্ণ কিরূপ ছিল তা নিয়ে বহু চিন্তাবিদের বহুবিধ সারগর্ভ গবেষণা ছিল। কারণ সৃষ্টির আগে থেকে, ঐ বেশবাস ওর অঙ্গে ওঠার পর আর কখনও জল স্পর্শ করেনি। সুতরাং কালে আর তেলে (জলে নয় কিন্তু) প্রকৃত বর্ণ কবে যে বিলীন হয়ে গেছে আজ আর তা কেউ স্মরণ করতে পারে না।

জুতোর অবস্থা ছিল আরও মজাদার। এমন আজব জুতো কোনও কালে কেউ দেখেনি। সেলাইএ সেলাইএ জর্জরিত তার সারা অংগ। আর সুচ বেঁধানোর কোনও জায়গা নাই। সবচেয়ে দেখার মতো ছিল জুতোর চার-পাশের দাঁত বের করা কাটাগুলো। ছোট বড় নানারকম কাঁটায় কণ্টকিত ছিল। হঠাৎ কেউ দেখলে আঁৎকে উঠবে। কারণ কাঁটাগুলো মেসিন গানের মতো চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রতিভাত হবে। ভাল করে লক্ষ্য করলে অবাক হয়ে ভাবতে হবে, যে অসাধারণ দক্ষতায় রিপু-কর্ম করা হয়েছে, এবং তার ফলে জুতোর আসল চেহারা যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে এক অভিনব নতুন আকৃতি লাভ করেছে কোনও সুনিপুণ মুচি এক যুগ কসরত করেও হুবহু ঐ রকম আর এক জোড়া বানিয়ে দিতে পারবে না। মোট কথা ওর জুতো জোড়াটার হাল নাল, কাটা সেলাই, ও জোড়াতালির এক জগঝম্প সংস্করণ বলা চলে। ওজনে এবং আয়তনে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না। ভাবা যায় না, ঐ রকম আধমণি ওজনের একহাত লম্বা একজোড়া জুতো পায়ে নিয়ে সে অবাধে চলা-ফেরা করতো কী ভাবে! কিন্তু যারা কাশেমকে দেখেছে তারা ওর কেরামতি দেখে তারিফ না করে পারেনি। কাশেম জুতো জোড়া পরে সারা শহর বার দশেক চষে ফেলতো রোজ। কোনও অসুবিধেই হতো না ওর। কাশেমের জুতো জোড়াটা তৎকালে কাইরোর কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিল। যদি কারও স্বভাব-চরিত্রকে জাঁদরেল বলে বোঝাতে চাইতো, লোকে বলতো; মানুষটা যেন কাশেমের চপ্পলের মতো বাজখাঁই। যদি কোনও মাদ্রাসার মৌলভীর গোমড়া মুখের বর্ণনা দিতে যেত, বলতো, লোকটার মুখের দিকে তাকানো যায় না— যেন কাশেমের চপ্পল। কুলিরা একটু ভারি মোট বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতো, বাবা, এতো মোট না, কাশেমের চপ্পল। যদি কোনও লোক অভ্যাস দোষে কখনও নেমন্তন্ন বাড়িতে একটু বেশি মাত্রায় ভোজন করে পেটটা ডাঁই করতো, যারা পেট রোগা স্বল্পাহারী তারা ঈর্ষাকাতর হয়ে চুকলি কাটতো. দেখ দেখ, লোকটা লোভে পড়ে খেয়ে পেটটা কেমন কাশেমের চপ্পলের মতো জয়ঢাক করে ফেলেছে। সত্যিকথা বলতে কি, সাধারণ মানুষ কারণে অকারণে কাশেমের জুতোর প্রসঙ্গ টেনে আনতো।

ব্যবসায় একদিন কাশেমের মোটামুটি মালকড়ি নাফা হলো। কাশেম ভাবলো, আজ সে পয়সা খরচা করে হামামে গোসল করে ভালমন্দ কিছু একটা খানা-পিনা করবে। কাশেমের কুষ্ঠিতে এ ধরনের কথা লেখা নাই। কিন্তু কেন জানি না, বহুকাল পরে তার শখ হলো।

দোকানপাট বন্ধ করে জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে সে হামামের দিকে ছুটলো। আজকাল সব সময় জুতো জোড়া সে পায়ে না দিয়ে বেশির ভাগ সময় কাঁধে ঝুলিয়েই চলা-ফেরা করতো। ওর ধারণা এতে পায়ে চোট লাগলেও জুতো জোড়াটায় তাপ্পি কম লাগাতে হবে।

হামামে পেঁছে দোরগড়ায় জুতোটাকে সাজিয়ে রেখে সে ভিতরে ঢুকলো গোসল করতে। বছরখানেক জল স্পর্শ করেনি সে। সুতরাং কয়েক পর্দা

ময়লা চিটেগুড়ের মতো লেপটে গিয়েছে সারা অঙ্গে। ডলাই মলাইকাররা মোটা বুরুশ দিয়ে ঘষে ঘষেও তা আর সাফ করতে পারে না। প্রায় ঘণ্টা ছয়েক ধরে কায়দা কসরত করে কোনও রকমে তারা খানিকটা সাফ করে গোসল করিয়ে ছেড়ে দিল। স্নান সমাপন করে কাশেম বাইরে এসে দেখে, তার জুতো জোড়াটা উধাও। কে বা কারা চুরি করে পালিয়েছে। কিন্তু চোর ব্যাটা রসিক আছে। কাশেমের জুতোর দিকে নজর অনেকেরই ছিল, কাশেম জানতো। দাঁও পেলে যে তারা কসুর করবে না, তাও সে আশংকা করেছিল। তবে তার জুতোর বদলে অন্য এক জোড়া বাহারী নতুন জুতো রেখে যাবে তারা, ভাবতে পারেনি। কাশেম দেখলো, তার জোড়াটা নাই, কিন্তু তার জায়গায় হালকা হলুদ রঙের সুন্দর একজোড়া চপ্পল তারা রেখে গেছে ওর জন্য। কাশেম অবলীলাক্রমে ঐ জুতোয় পা গলিয়ে দেখলো বেশ মাপে মাপে হয়ে গেল। ভেবে অবাক হলো, চোরটা কখন কীভাবে তার পায়ের মাপটাও চুরি করে নিয়েছিল। তা না হলে এমন ঠিক মাপের জুতো সে কিনবে কি করে তার জন্য? কাশেম ভাবে, যাক ভালই হলো। জুতোটা একটু পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন ধরেই পালটাবো পালটাবো করছিলাম। তা চোর ব্যাটাই তার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।

কাশেম আর দাঁড়ালো না। হারেম থেকে বেরিয়ে হন হন করে বাড়ির পথে রওনা হলো।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। কাশেম বেরুবার কিছুক্ষণ আগে কাজী সাহেব হারেমে ঢুকেছেন গোসল করতে। কাশেম যে চপ্পল পরে মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল আসলে তা ঐ কাজী সাহেবেরই জুতো।

তা হলে কাশেমের সেই মার্কামারা জুতোটা গেল কোথায়? দ্বাররক্ষী অনেকক্ষণ ধরে কাশেমের বদখদ চপ্পলটাকে সদর দরজার সামনে পড়ে থাকতে দেখে ছড়ির ডগা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দরজার পাল্লার আড়াল করে রেখে দিয়েছিল। কারণ, খদ্দেররা ঐ ধরনের একটা নোংরা বীভৎস বস্তু দেখে নাক সিটকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিল। দারোয়ানের মনে হয়েছিল এমন অবাঞ্ছিত জিনিস সদর দরজার শোভা পেতে থাকলে হামামের সম্ভ্রান্ত খদ্দেররা সব পালিয়ে যেতে পারে। ভেবেছিল, কাশেম যখন গোসল সেরে বাইরে বেরুবে তখন সে বের করে দেবে তাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা আর ঘটেনি। কাশেমের স্নান করতে সময় লেগেছে অনেক। এর মধ্যে ফটকের দারোয়ান বদল হওয়ার সময় হয়েছে। আগের দারোয়ান বাড়ি চলে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়েছে নতুন লোক। এবং আগের দারোয়ান ঘরে ফেরার আকুলতায় কাশেমের জুতোর কথাটা বেমালুম ভুলে গেছে।

বিপত্তি বাধলো এখানেই।

কাজী সাহেব গোসল সেরে হামাম থেকে বেরিয়ে দেখেন তাঁর চপ্পল নাই। সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা বরকন্দাজরা তটস্থ হয়ে খোঁখুঁজি শুরু করলো। এবং

অল্পক্ষণের মধ্যে কাশেমের সেই জগৎ বিখ্যাত জাঁদরেল জুতো জোড়া দরজার আড়াল থেকে টেনে বের করলো তারা। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো সেটা কাশেমের সম্পত্তি।

কাজীর হুকুমে তখুনি কাশেমকে পাকড়াও করে আনা হলো তার সামনে। জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে কোরবানীর খাসীর মতো এসে দাঁড়ালো সে। কাজী সাহেব জুতো জোড়া কেড়ে নিয়ে কাশেমকে ফটকে পাঠালো। সেখানে অবশ্য কাশেম কয়েদখানার সেপাইদের হাতে আদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি পায়নি।

সারা দেহ ব্যথায় জরজর। দিনকয়েক ফাটক খেটে ছাড়া পাওয়ার পর, ঘরে ফিরে এসে ক্ষোভে দুঃখে সব আগে সে তার ঐতিহাসিক অপয়া জুতো জোড়াটা নীলের জলে বিসর্জন দিয়ে এল।

এর কয়েকদিন পরে। এক জেলে নীলে মাছ ধরছিল। একবার জাল গুটাতে গিয়ে বেশ ভার ভার মনে হলো তার। ভাবলো, ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হয়েছে, হয়তো বড় সড় গোছের মাছ জড়িয়ে গেছে তার জালে। অনেক সন্তর্পণে এবং বেশ কায়দা কসরত করে জালখানাকে তীরে তুলে আনলো সে। —আ—আ—হ, জেলে চিৎকার করে ওঠে, তার জালের সুতো ছিঁড়ে-খুড়ে একশা হয়ে গেছে।

কাশেমের জুতো জোড়া জালে জড়িয়ে এই সর্বনাশ করেছে গরীব বেচারা জেলে। তার জীবিকার একমাত্র হাতিয়ার জালখানার দশা দেখে সে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো, এখন আমি কী করে খাবো?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জেলে কাশেমের দোকানে আসে। জুতো জোড়াটা দোকানের মধ্যে জোরসে ছুঁড়ে মারে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাজানো বড় বড় কাচের জারে লেগে কয়েকটা ওষুধ ভর্তি জার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। নানা বর্ণের ওষুধের ঢল নামে ঘরের মেঝেয়। জেলে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, আমার মুখের অন্ন নষ্ট করলে এই শাস্তিই পেতে হয়, বুঝলে কাশেম সাহেব? দেখ, আমার জালের অবস্থাখানা দেখ। তোমার ঐ জুতোর কাঁটা আমার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে আজ।

কাশেমের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ে। তার এত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল এই অপয়া জুতো জোড়ার জন্যে। দাঁত মুখ খিচিয়ে ওঠে সে জুতোটার দিকে তাকায়। যেন এখুনি বুঝি আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ওটাকে। কিন্তু অমন উপাদেয় বস্তু কী করেই বা গলাঃধকরণ করে!

ঠিক করলো মাটির তলায় পুঁতে রাখবে সে। যাতে ভবিষ্যতে আর ওটাকে নিয়ে নতুন ঝামেলায় জড়াতে না হয়। সুতরাং সে সামনের বাগানের মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে জুতো জোড়াকে রেখে কবর দিয়ে দিল।

কাশেমের এক প্রতিবেশির সঙ্গে ওর বেশ অসদ্ভাব ছিল। লোকটিও তাকে তাকে ছিল। কাশেমকে বাগানে গর্ত খুঁড়তে দেখে সে কোতোয়ালীতে ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে এল যে, আবু কাশেম সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অনেক টাকা-

কাড় রোজগার করে। এবং বাগানের মধ্যে সেগুলো সে পুঁতে রাখে।

কোতোয়াল অবিশ্বাস করতে পারে না। এমন ঘটনা তো প্রায়ই ঘটছে। সরকারের নজর থেকে আড়াল রাখার জন্য অনেক বে-আইনি সম্পদ অনেকেই এইভাবে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে সে পেয়াদা পাঠিয়ে কাশেমকে পাকড়াও করে নিয়ে এল তার সামনে। কাশেম যতই বলে, জী না, টাকা পয়সা কিছু না, ওটা আমার পায়ের ছেঁড়া জুতো জোড়া। কিন্তু ঘুষখোর কোতোয়াল ওসব কথায় বিশ্বাস করে না। মোটামুটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবে সে ছাড়া পায়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁচানব্বইতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

নিদারুণ হতাশা দুঃখ ক্ষোভে ঘরে ফিরে এসে যত অনিষ্টের মূল ঐ জুতো জোড়াটা হাতে নিয়ে সে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়ে একটা নালার জলে ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু এমনি মন্দ কপাল, স্রোতের টানে গড়াতে গড়াতে গিয়ে আটকে যায় এক জল-সেচ কলের চাকায়। সঙ্গে সঙ্গে কলটা অচল হয়ে থেমে যায়। মালিক ছুটে এসে দেখে আবু কাশেমের সেই ছেঁড়া চপ্পলটা তার কলের চাকার দাঁতের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেক গুলো দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে।

কলের মালিক কাশেমের নামে মামলা দায়ের করে দিল। বিচারে ক্ষতি পূরণ বাবদ শুধু অনেক টাকা গচ্চাই দিতে হলো না, সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে হলো তাকে বেশ কিছুকাল। অবশ্য ফাটকের কর্তাকে মোটামুটি ঘুষ খাইয়ে কয়েকদিন পরেই সে বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছিল।

মনের দুঃখে, টাকার শোকে মুহ্যমান হয়ে কিছুদিন ঘরেই বসে কাটায়। জুতো জোড়াটা বাড়ির পিছন দিকে ছাতের কার্ণিশের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে— যাতে আর ঐ সর্বনাশা বস্তুটিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে না হয়।

কাশেমের বাড়ির পিছনেই আর একটা বাড়ি। ও বাড়ির বাঘা কুকুরটা ঝুলন্ত জুতো জোড়াকে করায়ত্ত করার জন্য ও-বাড়ির দোতলা থেকে এ্যাইসা জোরে এক লাফ দিল যে, একেবারে এসে পড়লো এ বাড়ির ছাতের মাঝখানে। কাশেম তখন ছাতে বসে বৈকালিক শোভা উপভোগ করছিল। কুকুরটা লাফিয়ে এসে আর পড়ার জায়গা পেল না। পড়বি তো পড় একেবারে আবু কাশেমের গায়ের উপর! কুকুরটার ধারালো থাবায় বৃদ্ধ কাশেমের চোয়ালের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে গেল। উফ্, সেকি রক্তারক্তি কাণ্ড। পাড়ার লোকরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল তাকে। দিন দুই বাদে মাথা মুখ গলা পেঁচিয়ে পেল্লাই এক পাগড়ী সমান পটি বেঁধে ঘরে ফিরে এল সে। হেকিম বদ্যি হাসপাতালের খরচ বাবদ এক গাদা টাকা বেরিয়ে গেল। ক্ষতের চেয়ে খরচের ব্যথাটাই বেশি করে কাতর করে ফেললো কাশেমকে।

তার এই শেষ বিপর্যয়ে মাথা আর ঠিক রাখতে পারলো না কাশেম।

জুতো জোড়াটা নিয়ে ছুটে গেল সে কাজীর কাছে। সাশ্রুনয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমার এই জুতো জোড়াটা আমার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হুজুর। এর জন্যে আমার যা গচ্চা গেছে তাতে আমি আজ সর্বস্বান্ত। এখন ঘরে আর ফুটো পয়সা নাই। ভিক্ষে করে ছাড়া পোড়া রুটির জোগাড় করতে পারবো না। এটাকে যতই ছাড়াতে চাইছি কিছুতেই ছাড়ছে না আমাকে। তাই আজ আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এটা আমি আমার হেপাজতেই রেখে যাচ্ছি হুজুর। এরপর থেকে এই জুতোর জন্য কারো কোনও ক্ষয় ক্ষতি হলে আমি আর দায়ী হবো না, এই আমি বলে গেলাম।

এই বলে কাশেম সেই প্রকাশ্য আদালতের মেঝেয় তার এতকালের সংগী জুতো জোড়াটাকে বয়ান তালাক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কাজী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন।

একটুক্ষণ পরে শাহরাজাদ আবার একটা নতুন কিস্‌সা বলতে শুরু করে ঃ

এক শহরে এক জেলে বাস করতো। লোকটির জাত-ব্যবসা ছিল মাছধরা ঃ কিন্তু সর্বজনের কাছে সে পরিচিত ছিল চরসখোর হিসেবে।

সারা দিনে রাতে মাত্র তিনবার সে চরস সেবন করতো। খুব সকালে কাজে বেরোবার আগে, বাসি পেটে একবার। একবার ভর দুপুর বেলায় এবং আর একবার সূর্য পাটে বসার সময় খেত সে। এর বেশি সে একবারও খেয়ে পয়সার অপচয় করতো না কখনও।

সে বলতো, এটা তার নেশা নয়। সারা দিন গাধার মতো খাটার ক্ষমতা জোগায় এই চরস। শরীরে যেমন তাগদ জোগায়। মনও স্ফূর্তিতে থাকে। কাজে কখনও কুঁড়েমি লাগে না। এমন কি কোনও কোনও দিন সে ভূতের মতোও খেটে প্রচুর মাছ ধরে আনে।

কখনও-সখনও সন্ধ্যাবেলায় মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে খেতো। তারপর টিমটিমে একটা ফুপি জ্বালিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে বসে বসে ঝিমাতো। আর বিড় বিড় করে আপন খেয়ালে কি যেন সব আওড়াতো।

এই রকম এক সন্ধ্যার কথা শুনুন ঃ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে খানিকটা মাত্রা চড়িয়ে সে চরস সেবন করে চোখ বুঁজে দাওয়ায় বসে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনে চলেছিল। কিছুক্ষণ পর একবার নয়ন মেলে তাকিয়ে দেখে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে আঙিনা ভরে গেছে। জেলের প্রাণে বসন্ত জেগে ওঠে। পায়ে পায়ে সে রাস্তায় নেমে আসে। নিশুতি নির্জন রাত। কোথাও কোনও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। শুধু চাঁদের আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে সর্বত্র।

জেলের মনে খুশির বন্যা উপচে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে তার নিত্য সংগী নীলের ধারে এসে উপস্থিত হয়।

মাথার ওপর পূর্ণচাঁদের মেলা। নীলে নিথর জল। ঘাটে ঘাটে মাঝি-মাল্লারা নৌকা নোঙর করে নিদ্রামগ্ন। নদীর পাড়ে নদী এবং প্রকৃতির অপরূপ মনোহর শোভায় অভিভূত হয়ে পড়ে সে! হঠাৎ তার নজর চলে যায় নদীর অতলে। স্বচ্ছ জলে চাঁদের ছায়া পড়েছিল। জেলে অবাক হয়ে ভাবে, হায় বাপ্, আসমানের চাঁদ নদীর জলে নেমে মাছের সংগে খেলায় মেতেছে? এ মওকা তো ছাড়া যায় না। চাঁদমামাকে এবার কব্জায় পেয়েছি, পালাবে কোথায়?

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে ঘরে ফিরে এসে জালটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার নীলের পথে ছুটে যায়।

মনে আশঙ্কা ছিল, হয়তো ফিরে গিয়ে দেখবে চাঁদমামা চলে গেছে! কিন্তু না; তখনও সে তেমনি মধুর হাসি ছড়িয়ে জলের তলাতেই দুলছে। সেই নীল নির্জন গভীর নিশুতি রাতে কাঁধ থেকে জালটা নামিয়ে হাতে বাগিয়ে ধরে সহজাত দক্ষতায় বৃত্তাকারে ছড়িয়ে ফেলে। মনে আশা, চাঁদকে সে জালের ঘায়ে জড়িয়ে ফেলবে! কিন্তু একটু পরে গুটিয়ে তোলার পর সে হতাশায় ভেঙে পড়ে!

জালটা কাঁধে তুলে আবার সে বাড়ির পথ ধরে।

কিছু দূরে আসার পর রাস্তার পাশের নালার জলে আবার সে চাঁদটা দেখতে পেয়ে নেচে ওঠে, ওরে মামা, তুমি হালা এইখানে পালিয়ে এয়েছো। দাঁড়াও দেখছি।

খুব সন্তর্পণে আবার সে জালটাকে ছড়িয়ে ফেলে নালাটার উপর। দুটি কুকুর শুয়েছিল নালার ধারে। হঠাৎ জালে ঢাকা পড়ে তাদের নিদ্রা ছুটে যায়। জাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হুড়পাড় করতে থাকে তারা। জেলে ভাবে মোটা মাছ বেঁধেছে। খুব কায়দা কসরত করে সে জালটাকে গুটাবার চেষ্টা করে কিন্তু জাঁদরেল কুকুর দুটোর দাপটের কাছে সে টিকে থাকতে পারবে কেন। ওরা ওকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় নালার জলে। জেলে নাকানি চোকানি খেতে থাকে।

—কই গো, কে আছ, সাচ্চা মুসমলান, বাঁচাও, বাঁচাও!

তার চেঁচামেচি চিৎকারে আশেপাশের বাড়ির প্রহরীরা ছুটে আসে! চরসখোরের কাণ্ড দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

ওদের তামাসা দেখে জেলের হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।

—তোমরা তো বড় বেল্লিক বদমাইশ হে, এইভাবে শয়তান আমাকে বেকায়দায় ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে, আর তোমরা মুসলমানের বাচ্চা হয়ে কিনা দাঁত বের করে হাসছো? তোমরা কী এক বাপের জম্মা?

জেলের কথায় প্রহরীরা ক্ষেপে ওঠে। লোকটা জাতে মাতাল হলেও গালি-গালাজ-এর বেলায় তো বেশ টনটনে আছে।

—দাঁড়াও, তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

জেলেকে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে টানতে টানতে কাজীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো ওরা।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো আটানব্বইতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

আল্লাহর কী মহিমা, কাজী সাহেবও চরস-এ বুঁদ হয়ে ঝিমচ্ছিল তখন। ঐ নেশার ঝোঁকেও তিনি বুঝতে পারলেন, প্রহরীরা যাকে ধরে এনেছে সে তারই মতো এক চরসখোর।

জেলেকে রেখে প্রহরীদের বিদায় করে দিলেন তিনি। তারপর নফরদের বললেন, এ্যাই, মেহমানের খানাপিনা এবং শোবার ব্যবস্থা করে দে। দেখিস, যেন কোনও অসুবিধে না হয় ওর।

খুব চর্ব্য চোষ্য করে খেয়ে দেয়ে গরম বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো জেলে এবং এক ঘুমে বাকী রাত এবং পরের দিনটাও কাবার হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় কাজীর চাকর এসে ডেকে তুললো জেলেকে।

—সাহেব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, মালিক।

কাজীর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন জেলেকে।

—তুমি আমার বুকের কলিজা, আমার ভাই, এস, মৌতাতে বসা যাক।

দুই চরসখোর বসে চরস খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চাকর এসে খবর দিল রাতের খানা দেওয়া হয়েছে টেবিলে।

কাজী সাহেব জেলের হাত ধরে টেনে তোলেন, চল ভাইসাব, খানা-পিনা সেরে নিই।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আবার ওরা দুজনে মুখোমুখি বসলো। আরও খানিকটা চরস গলাধঃকরণ করে নেশাটাকে রঙদার করে নিতে চাইলো।

এরপরেই শুরু হলো আসল মজা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাত্রাতিরিক্ত মাদকের ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল।

কাজী সাহেব এক এক করে সব সাজ-পোশাক খুলে ফেললেন। জেলেও দেখাদেখি ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হলো ওদের উদ্দাম নৃত্য। শুধু নাচ নয়, অপূর্ব সঙ্গীত-লহরীতেও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো দুজনে। ভাগ্যে ধারে কাছে গাধারা কেউ ছিল না।

রাত তখন নেহাত কম নয়। নাচের তাণ্ডব চলেছে অন্দরে। কিন্তু পথচারীরাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সব।

সুলতান এবং তার উজির নৈশ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ওঁরা কাজীর বাড়ির সামনে এসে পড়েন। ওদের পরনে বণিকের ছদ্মবেশ। উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখলেন, কাজী সাহেব এবং অন্য একটি লোক একেবারে উলঙ্গ হয়ে নানা ঢং-এ

নেচে চলেছে এবং রসভ-কণ্ঠের লহরা তুলছে।

সুলতান এবং উজির ভিতরে ঢুকতে কাজী সাহেবরা নৃত্যগীত বন্ধ করে এগিয়ে এল সামনে।

—আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। আমার কী সেই ভাগ্য, অধমের গরীবখানায় আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লো।

কাজী সাহেব বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা সংকুচিত না হয়ে এগিয়ে এসে সুলতানকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

সুলতান আসন গ্রহণ করলে, কাজী সাহেব জেলেকে নিয়ে আবার রসকলি নৃত্য-সংগীতে উদ্দাম হয়ে উঠলেন।

কাজী সাহেবের দেহের বর্ণ সোনার মতো। কিন্তু তাঁর সংগীটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের। সুলতান উজিরের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, দেখছো, আমাদের কাজীর গায়ের রঙটাই শুধু ফর্সা, কিন্তু আসল বস্তুটি তার সাথীর তুলনায় ধানি লঙ্কা!

—কী? কানে কানে গুজুর গুজুর করছো কী তোমরা? জেলেটা প্রায় ক্ষেপে উঠলো, জান, আমি কে? এই শহরকা সুলতান। চুপসে বসে নাচ দেখ আমাদের। কোনও রকম গুজ গুজ ফুস ফুস করবে না, বুঝলে? এ আমার হুকুম। যদি এরপরে ফের এই রকম বেয়াদপি করতে দেখি, তবে তোমাদের দুজনারই গর্দান নেব আমি। মনে থাকে যেন, আমি হচ্ছি সুলতান, আর আমার এই সংগীটি হচ্ছে আমার উজির। তামাম দুনিয়াটা আমার হাতের মুঠোয়। জালখানা গুটাবো আর সব খলবল করে উঠে এসে লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ের ওপর। হুঁ হুঁ বাবা, যে সে কথা নয়, আমি হচ্ছি আরব দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি। আমার হুকুমে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খায়।

সুলতান এবং উজির বুঝলেন, ও'রা দুই চরসখোরের সামনে এসে পড়েছেন। উজির জিজ্ঞেস করলো, তা মহামান্য সুলতান, কতদিন হলো এখানকার সুলতান হয়েছেন। এর আগে যিনি মসনদে ছিলেন, তিনি গেলেন কোথায়?

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ জেলে জবাব দেয়, তাকে আমি বিদায় করে দিয়েছি।

—আপনি বিদায় দিলেন আর তিনি চলে গেলেন?

—সঙ্গে সঙ্গে। এক তিল দেরি করলেন না। যেই আমি বললাম, এবার তোমার দিন ফুরিয়ে গেছে, তুমি কেটে পড়, অমনি সে আভূমি আনত হয়ে আমাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, আমি তো আপনারই জন্যে পথ চেয়ে এই মসনদ আগলে বসে রয়েছি, জাঁহাপনা। আপনার মসনদ আপনি নিন। আমাকে রেহাই দিন এই গুরুদায়িত্ব থেকে। বাদশাহীতে আমার কোনও মোহ লিপ্সা নাই। এতবড় হুকুমতের গুরুদায়িত্ব আমার ঘাড়ে পর্বতপ্রমাণ ভারি বোঝা হয়ে আছে এত কাল। এত দায়িত্ব আমি আর পালন করতে পারছি না।

সুলতান আর হাসি চাপতে পারেন না। কিন্তু ওদের সামনে প্রাণ খুলে

[illegible]
রাস্তায় নেমে পড়েন তিনি।

গল্পটা এখানেই শেষ নয়। পরদিন সকালে সুলতান কাজী সাহেব এবং তার অনুচরটাকে তলব করলেন।

কাজী এবং জেলে এসে হাজির হলো দরবারে। সুলতান কাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাজী সাহেব, আপনি আমার আদালতের বিচারক। মহামাননীয় ব্যক্তি। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, এই বিধান আমরা চাই আপনার কাছে। কিন্তু একটা কথা বলি, নিশুতি রাতে পাড়া-প্রতিবেশী এবং পথচারীদের কানের তালা ফাটানো সঙ্গীত শুনিয়ে শান্তি ভঙ্গ করার বিধান আপনার কোন্ আইনে আছে? নিজের বাড়ির অন্দরে চরস খেয়ে সঙ্গী সাথী নিয়ে উদ্দাম হয়ে নাচন-কোদন করাই কি আপনার মতো প্রাজ্ঞ বিচারপতির সাজে?

কাজী সাহেব বুঝতে পারেন গতরাতের ছদ্মবেশী বণিকদ্বয় স্বয়ং সুলতান এবং তাঁর উজির ছাড়া কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে সুলতানের মসনদের সামনে।

—দোহাই হুজুর, আমার গুস্তাকী মাফ করুন। না জেনে আমি আপনার যথাযোগ্য সম্মান করতে পারিনি। তখন চরসের নেশায় কি বলতে কি বলেছি আপনাকে, এখন আমার কিছুই মনে নাই। আপনি বিশ্বাস করুন, জাঁহাপনা। যা-ই বলে থাকি, আমি বলিনি, বলেছে আমার নেশা—চরস। সেই কথা ভেবে অধমকে রেহাই করে দিন এবারের মতো।

জেলেটার নেশা তখনও কাটেনি। চোখ দুটো চেষ্টা করেও খুলে রাখতে পারছে না সে।

কিন্তু কাজীর কথায় সে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, আরে, অত কাচুমাচু করার কী আছে? আমরা কী চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি। ইচ্ছে হয়েছে নেশা করেছি।

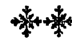
তারপর সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে আপনি এখানে আপনার প্রাসাদে সুলতান হয়ে তখতে বসে আছেন। খুব ভাল। কিন্তু আমিই বা কম কিসে আপনার তুলনায়? কাল রাতে আমাদের প্রাসাদে আমরা সুলতান উজির ছিলাম। সেখানে আপনারা তো আমার প্রজার সমান।

সুলতান মজা পান।

—তোমার কথা একশোবার খাঁটি। আমি আমার তখতে, তুমি তোমার ডেরায় সুলতান। তাহলে এসো দোস্ত, আমরা দুজনেই সুলতান হয়ে এক সঙ্গে বসবাস করি।

জেলে গম্ভীরভাবে বলে, আপনার প্রস্তাব আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি। কিন্তু তার আগে আমার উজিরকে সব গুনাহ থেকে রেহাই দিতে হবে।

সুলতান হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, তোমার সম্মানে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

এরপর আর একটা কাহিনী শুরু করে শাহরাজাদ।

কোনও এক সময়ে মিশরের এক শহরে সরকারের রাজস্ব আদায়কারী এক তহশীলদার বাস করতো। কর আদায় উপলক্ষে সারা বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হতো।

তহশীলদারের ঘরে ছিল যুবতী বৌ। স্বামীর অবর্তমানে বৌটার নিঃসঙ্গ রাত আর ফুরায় না। উদ্দাম যৌবন কেঁদে কেঁদে সারা হয়। কিন্তু তহশীলদারটার বয়সে ভাটা পড়েছিল। তার উপর হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যেদিন সে ঘরে ফিরে আসে সেদিন আর শরীরটাকে ধরে রাখতে পারে না। খেয়ে-দেয়ে বিছনায় শোয়া মাত্র নাক ডাকাতে থাকতো।

বৌটা দেহের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে ক্ষেপে উঠলো। কিছুদিনের মধ্যেই সে এক নওজোয়ান খুবসুরত নাগর জুটিয়ে নিল।

ছেলেটির গায়ে তাগদ অনেক। বৌটা যখন ডাকতো তখনই এসে তার মনঃস্কামনা পূর্ণ করে যেত। মেয়েটির দেহমন খুশিতে ডগোমগো হয়ে ওঠে। কারণে অকারণে ছেলেটিকে সে নানারকম সাজ-পোশাক কিনে দেয়, নগদ অর্থও মুঠি মুঠি গুঁজে দেয় জামার পকেটে।

এইভাবে দুটি নর-নারী অবৈধ সুখ-সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে বেশ কয়েকটা বছর পার করে দিল।

একদিন তহশীলদার ঘরে ফিরে এসে তার পর দিনই বৌকে বললো, আমার খচ্চরটাকে দানা-পানি খাইয়ে দাও। আর আমাকেও কিছু একটা খানা-পিনা দাও, এখুনি বেরুতে হবে।

বৌটা মনের আনন্দে চটপট স্বামীকে বিদায় করার জন্য কাজে লেগে গেল। খচ্চরকে দানা-পানি খাইয়ে তার পিঠে জীন লাগাম চাপিয়ে দিল। কিন্তু তহশীলদারকে খেতে দিতে গিয়ে দেখে রুটি চাপাটি কিছু নাই ঘরে। নিগ্রো দাসীটাকে বললো, এই, চট করে দুখানা রুটির মতো খানিকটা গম পিষে দে তো, তোর মালিক খেয়ে এখুনি কাজে বেরুবে।

তহশীলদার বললো, এখন গম পিষে রুটি বানাতে বানাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার দরকার নাই, আমি বরং বাজার থেকে দুখানা তন্দুরী রুটি কিনে নিয়ে আসছি।

এই বলে সে দ্রুতপায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের পথে চলে গেল।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো একত্রিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

বৌটা তার স্বামীর বাজার থেকে ফেরার অপেক্ষায় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়েছিল। দূর থেকে ওর নাগর ছেলেটা মেয়েটিকে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবলো, তহশীলদারটা বোধ হয় কাজে বেরিয়ে গেছে, তাই বৌটা দরজা ধরে তারই প্রতীক্ষা করছে।

ছেলেটি বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটিকে বললো, আমার এখুনি তিনশো দিরহাম দরকার।

মেয়েটি বলে, কিন্তু আজ তো আমার হাতে কিছু নাই, গো।

ছেলেটি বলে, তোমাদের তো একটা খচ্চর আছে দেখছি। ওটা আমাকে দাও। আমি বিক্রি করে নেব। টাকাটা আমাকে আজ জোগাড় করতে হবে।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমার স্বামী ফিরে এসে যদি দেখে খচ্চরটা নাই, আমাকে আস্ত রাখবে সে?

কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। তার আব্দার এড়াতে পারে না প্রেমিকা। খচ্চরটা নিয়ে চলে যায় ছেলেটি।

কিছুক্ষণ পরে তহশীলদার রুটি কিনে ফিরে আসে। আস্তাবলে ঢুকে রুটি ক'খানা ঝোলার মধ্যে পুরে নিতে যায়। কিন্তু এ কি! খচ্চরটা গেল কোথায়? জীন লাগাম সব পড়ে আছে অথচ খচ্চরটা নাই! সে ছুটে আসে বৌ-এর কাছে। কী ব্যাপার খচ্চরটা কোথায়?

বৌটা শান্ত গলায় বললো, তুমি বাজারে যাওয়ার একটু পরেই খচ্চরটা মানুষের রূপ ধরে আমাকে বললে, আমাকে যাদু করে খচ্চর বানিয়ে রাখা হয়েছিল। আসলে আমি সুলতানের কাজী। এখন আমি দরবারে চললাম। এই বলে সে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

তহশীলদার রাগে ফেটে পড়লো, তুমি আমার সংগে মসকরা করছো?

—বারে মসকরা করতে যাবো কেন? যা ঘটেছে তাই বললাম। তোমার সংগে ছলচাতুরী করে আমার কি ফয়দা হবে? তোমাকে বলতে আমি সাহস করিনি, খচ্চরটা সত্যিই মাঝে মাঝে মানুষের মতো কথা বলতো আমার সংগে। আমি তো শরমে মরি। তাড়াতাড়ি বোরখায় মুখ ঢেকে আস্তাবল থেকে পালিয়ে আসতাম। কিন্তু আজ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। আমি ঘরে দাওয়ায় বসে কাজ করছি হঠাৎ দেখি আস্তাবল থেকে এক সদাশয় বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন। আমি ছুটে ঘরের মধ্যে পালাতে গেলাম। তিনি আমাকে মা বলে ডাকলেন। বললেন, মা, আমাকে শরম করার কিছু নাই। আমি তোমার বাপের মতো। কপাল দোষে এতদিন খচ্চর হয়ে ছিলাম। আজ আমার মুক্তি হয়েছে। আমি সুলতানের কাজী। এখন তাঁর দরবারেই ফিরে যাচ্ছি।

তহশীলদার চোখ কপালে তুলে বলে, ইয়া আল্লাহ, এমন আজব কাহিনী

তো জীবনে কখনো শুনিনি। কিন্তু খচ্চর ছাড়া এখন আমি কাজে বেরুবো কী করে? আজ আমাকে কত গ্রামে যেতে হবে কর আদায় করতে। কী করে যাবো বলতো?

বৌটা পরামর্শ দেয়, তুমি এক কাজ কর। এক আঁটি বিচালী নিয়ে দরবারে গিয়ে কাজীকে দূরে থেকে দেখাতে থাক। তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন। খচ্চর ছাড়া তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। তখন তিনি দরবার ছেড়ে তোমার সংগে চলে আসবেন।

তহশীলদারের খুব পছন্দ হলো বৌ-এর কথাগুলো। তখুনি একগোছা বিচালি নিয়ে দরবারে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলো।

বৌটা বললো, একটা কথা কিন্তু মনে রেখ, খুব সাবধান, কাজী আর খচ্চর একই ধাঁচের জানোয়ার। ওরা ভীষণ বদলা দেবার ফিকিরে থাকে। এতকাল তুমি ও'র উপর যে-সব অত্যাচার করেছ, সে-সব কিন্তু তিনি একটুও ভুলে যাননি। মওকা পেলে তোমার ওপর শোধ তুলতে কসুর করবেন না তিনি।

বৌ-এর শেষ উপদেশটুকু মাথায় রেখে অতি সন্তর্পণে সে কাজীর আদালতে প্রবেশ করে। কাজী সাহেব তখন তাঁর আসনে বসে মামলার কাজ পরিচালনা করছিলেন। বিরাট কক্ষের একেবারে পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল তহশীলদার। হাতে এক আঁটি বিচালি, মাঝে মাঝে কাজী সাহেবের দিকে একটু উঁচু করে তুলে ধরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে থাকলো।

ব্যাপারটা কাজীর নজর এড়ালো না। ইশারা করে ডাকলেন তিনি, এদিকে এগিয়ে এস আমার সামনে।

কিন্তু তহশীলদার সেখান থেকে এগিয়ে না গিয়ে কাজী সাহেবকে ইশারা করে ডাকলো, আপনিই আসুন আমার কাছে।

কাজী সাহেব তহশীলদারকে চিনেছিলেন। সে যে সরকারের এক তহশীলদার তা তিনি জানতেন। ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনও গোপন কাজকর্মের জন্য কোতোয়াল তাকে পাঠিয়েছে এখানে। তাই, সেদিনের মতো আদালতের সব কাজ মুলতুবী রেখে সকলকে বিদায় করে দিলেন তিনি। তারপর তহশীলদারের কাছে এসে বললেন, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? খুব কি জরুরী কিছু?

তহশীলদার সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিচালির গোছাটা কাজীর সামনে ধরে জিভ আর তালুর সাহায্যে পশু পোষ মানানোর মতো অদ্ভুত এক আওয়াজ তুলে তাঁকে পায়ে পায়ে আদালতের বাইরে ডেকে আনতে প্রলুব্ধ করতে লাগলো।

কাজী সাহেব ব্যাপারটা অনুধাবন করতে না পেরে তহশীলদারকে অনুসরণ করতে করতে আদালতের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন তহশীলদার তাঁর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, খোদা হাফেজ, সত্যিই আমি আপনার ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনে মর্মাহত হলাম। আপনি ভাববেন না,

শুধু শুধু আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি এখানে। আজ আমাকে অনেক-গুলো গাঁয়ে যেতে হবে আদায় করতে। সেজন্য আদালতের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। তার আগেই আপনাকে ডাকতে হলো। যাই হোক, আর দেরি করা চলে না, নিন এবার আপনি আবার খচ্চরের রূপ ধরুন, আমি আপনার পিঠে চেপে এখুনি রওনা হবো।

কাজী সাহেব আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, এ কি অদ্ভুত কথা!

তহশীলদার বেশ বিনীতভাবে বললো, না না, আর ওসব ভয় করবেন না। একবার যখন জেনেছি আপনি আসলে জানোয়ার নন, তখন কী আর আপনার পাছায় চাবুকের ঘা মারতে পারি? আমি জানি, আমাদের—মানুষের পাছাগুলো কী থলথলে নরম। চাবুকের আঘাত পেলে বড় ব্যথা লাগে। আল্লাহ নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার কোনও ভয় নাই। চাবুক ছড়ি আমি হাতেই নেব না। যাক, আর দেরি করবেন না, এমনিতেই অনেক বেলা হয়ে গেছে। নিন চলুন। কথা দিচ্ছি, রোজ রাতে যা দানা-পানি দিই আজ থেকে তার দু'গুণ বরাদ্দ করে দেব।

কাজী সাহেব বুঝলেন, পাগলা গারদ থেকে কোনও ভাবে এই রুগীটা পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। ভয়ে তাঁর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এক পা এক পা করে পিছু হটতে হটতে আদালত-কক্ষের দরজা পেরিয়েই তিনি এজলাসের দিকে দৌড়ে পালাতে গেলেন। কিন্তু তহশীলদারও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও তাকে ধাওয়া করে ছুটে এল। কাজী সাহেব প্রমাদ গুণলেন। ঘরের সব লোককে তিনি ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। সেই শূন্য কক্ষে তহশীলদারের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনও পথ নাই। কাজী সাহেব খুব করুণ কণ্ঠে বললেন, বুঝতে পারছি, আপনার খচ্চরটা খোয়া গেছে। এবং একটা খচ্চর না হলে আপনার কাজ-কর্মও সব অচল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এক কাজ করুন, এই নিন তিনশো দিরহাম আপনাকে দিচ্ছি আমি। এ দিয়ে বাজার থেকে সেরা জাতের একটা খচ্চর কিনতে পারবেন অনায়াসেই। নিন ধরুন, টাকাটা নিয়ে আমাকে রেহাই দিন।

এই বলে ট্যাঁক থেকে তিনশো দিরহামের একটা তোড়া তহশীলদারের হাতে গুঁজে দিয়ে কাজী সাহেব আর কোন দিকে দৃকপাত না করে আদালত কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

তহশীলদার ভাবে, কাজী সাহেব লোকলজ্জা এড়াতে তিনশো দিরহামের এই তোড়াটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে পালালেন। তা যাক, ভালই হলো, তিনশো দিরহামে ওর চাইতে আরও তাজা তাগড়াই খচ্চর কিনতে পারবে সে।

তহশীলদার বাজারে গিয়ে একটা একটা করে অনেকগুলো খচ্চর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে থাকে। কিন্তু মনমতো পছন্দ হয় না একটাও। একটা দালাল বললো, কত দামের মধ্যে খুঁজছেন শেখ?

—পছন্দ হলে তিনশো দিরহাম পর্যন্ত দিতে পারি।

লোকটি লোলুপ উৎসাহে বলে, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ভাল মাল এনে

দেখাচ্ছি আপনাকে।

পাশের একটা কামরা থেকে একটা বেশ তাগড়াই খচ্চর বের করে নিয়ে এসে সে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, দেখুন, চলবে ?

ততক্ষণে তহশীলদারের চোখ কপালে উঠেছে, একি, এ যে তারই সেই খচ্চরটা! যেখানে যা যা খুঁত ছিল সব হুবহু ঠিক আছে। তহশীলদার খচ্চরটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো একটু, তারপর দালালটাকে বললো, না হে, এ রকম জানোয়ারে চলবে না আমার। সত্যিকারের জানোয়ার চাই আমার।

লোকটা দাঁত-মুখ খিচিয়ে ওঠে, সত্যিকারের জানোয়ার মানে ? এটা কি তবে মিথ্যেকারের জানোয়ার নাকি ? কী বলতে চান আপনি। সওদা করতে এসেছেন না মসকরা করতে এসেছেন এখানে ?

তহশীলদার বলে, না মসকরা করবো কেন ? তবে যে কারণেই হোক, এটা আমি কিনবো না। অন্য কিছু আছে।

—বেশ তো পছন্দ না হয় অন্য খচ্চর দেখাচ্ছি।

তিনশো দিরহাম দিয়ে আর একটা খচ্চর পছন্দ করে সে কিনে বাড়ি ফিরে আসে। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া কাহিনী সবিস্তারে বৌকে শোনালো সে।

এইভাবে চতুরা নষ্ট নারীর বুদ্ধির কৌশলে সবদিকই রক্ষা পেল। মেয়েটি তার নাগরকে নিয়ে রসের সায়রে কেলি করে দিন কাটাতে থাকলো। তহশীলদার একটা নতুন তাগড়াই খচ্চর ফিরে পেল এবং কাজী সাহেব মিথ্যা কেলেঙ্কারীর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। অবশ্য তার জন্যে তিনশো দিরহাম গচ্চা দিতে হলো তাঁকে। তা যাক, আদালতের ফি বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তা উসুল করে নেবেন সুদে আসলে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো দুইতম রজনী :

এবার সে আর একটা নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে :

এক অত্যন্ত গরীব দম্পতি সারাদিন ধরে শহরের পথে পথে ভুট্টার খই বিক্রি করে বেড়াতো। ওদের পরমাসুন্দরী একটি কন্যা ছিল।

শহরের কাজী একদিন মেয়েটির মা বাবার কাছে তার পাণি প্রার্থনা করলো। কাজী সাহেব পাত্র হিসাবে ফেলনা বলা চলে না। বয়সটাই একটুখানি যা বেশি—তা বেশিই বা বলা যায় কি করে, আশী বছরে কি আর কেউ শাদী নিকা

করে না? তবে চেহারাটা তেমন খুবসুরত নয়। আড়ালে কু-লোকে বাঁদর হনুমান বলে। কিন্তু দেখতে তাদের মতো হলে আসলে তো আর বাঁদর বেবুন নয় সে। তা ছাড়া পুরুষ মানুষের আবার রূপ-জৌলুসের কী দরকার। পয়সা কাড়ি কেমন আছে, কেমন কামায় – সেই কথাই তো আসল। সে দিক থেকে কাজী সাহেবের জুড়ি নাই। ঘুষের টাকায় ফেঁপে ফেঁপে সে কলাগাছ হয়ে গেছে। বাড়ি ঘর-দোর, ধন-দৌলতের কোনও অভাব নাই। মেয়ের বাবা বললো, আমি রাজি।

সেইদিনই কাজীর সঙ্গে শাদী হয়ে গেল মেয়েটির।

কাজী সাহেব তার বার্ধক্য এবং চেহারার দৈন্য ঢাকতে প্রতিদিন নতুন নতুন নানারকম উপহার উপঢৌকনে ভরে দিতে লাগলো তার নব-পরিণীতা তরুণী বেগমকে। কিন্তু যত মন-ভোলানো বাহারী রংদার বস্তুই উপহার দিক সে, একটি সোমত্ত ভরা-যৌবনের নারীকে তুষ্ট করার মত আসলি-উপহার দিতে অপারগ হলে কোন্ মেয়ে ক্ষমা করতে পারে তার স্বামীকে? স্বভাবতই ঐ সব ফালতু উপহার উপঢৌকনে তার মন ভরে না। কিন্তু কীই বা করতে পারে সে। অসহায় অবলা এক নারী, তাই, নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে সব। নিষ্কাম নিস্তেজ জড় পদার্থের মতো সারাদিন রাত বিছানায় পড়ে থাকে।

কাজী সাহেব কোসিসের কোনও ত্রুটি রাখে না। ঘড়ি ঘড়ি এসে বেগম সাহেবার খোঁজখবর নিয়ে যায়। মোলায়েম করে মন-ভোলানো অনেক রকম রস-কথা বলে চাংগা করার প্রয়াস করে। কিন্তু শুধু কথায় কী আর চিড়ে ভেজে, সুপ্তকাম-তরুণী-ভার্যা ফিরেও তাকায় না নপুংসক কাজীর দিকে।

কাজী সাহেব তার দপ্তরের কাজের চাপের দরুণ এক খুবসুরত নওজোয়ান পেশকার বহাল করলো। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর এ আদব-কায়দাও তেমনি। খুব নম্র, বিনয়ী, মৃদুভাষী।

কাজী সাহেব কাজের অছিলায় ছেলেটিকে অন্দরে পাঠায় মাঝে মাঝে। বেগম সাহেবার খোঁজখবর দেখা-শোনা করতে বলে। ছেলেটি একান্ত অনুগত কর্মচারীর মতো যথাযথ আদেশ পালন করে চলে।

এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে দুই তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা-শরমের ব্যবধান ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে সেখানে এক নতুন সম্পর্কের সেতু গড়ে ওঠে। তার নাম মহব্বত।

কাজী সাহেব অভিজ্ঞ মানুষ। সবই সে অনুমান করতে পারে। একটি জোয়ান ছেলে আর যুবতী মেয়ে একত্রে হলে কী কী ঘটতে পারে, তা তার অজানা নয়। কিন্তু কিছুই যেন সে আঁচ করতে পারে না এই রকম অজ্ঞ নির্বোধের ভান করে থাকে।

ক্রমশঃ প্রেমের প্রথম পর্ব শেষ হলে একদিন কাজী-বেগম দুহাত বাড়িয়ে পেশকার ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয়। তার এতদিনের সুপ্ত কামনা লেলিহান বহ্নিশিখা হয়ে ছেলেটির জাগ্রত যৌবনকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। সে আহ্বানে ছেলেটিই বা সাড়া না দিয়ে পারে কি করে? হাজার হাজার টাকার সাজ-পোশাক

গহনা অলঙ্কারে কাজী সাহেব যা দিতে পারেনি, সে বস্তু কানায়-কানায় ভরে দেয় তাকে ঐ ছেলেটি।

বেগমের মুখে হাসি দেখে কাজী সাহেব খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে।

প্রেমের বড় বিচিত্র গতি। মেয়েটি ওর জানলায় রুমাল ঝুলিয়ে রাখতো। সাদা আর লাল রঙের দুখানা রুমাল ঝুলাতো সে। যখন সাদা রুমাল ঝুলতো বুঝতে হবে কাজী সাহেব বাড়িতে নাই। আর যখন লাল রঙের রুমাল ঝুলতো বুঝতে হবে, এখন নয়, এখন এস না, কাজী সাহেব ঘরেই আছে। এইভাবে প্রেমিকা নারী তার দয়িতকে বুঝিয়ে দিত, কখন আসতে হবে এবং কখন আসতে হবে না।

এইভাবে কাজীর চোখে ধুলো দিয়ে ওদের মহব্বত মিলন যথারীতি চলছিল। কিন্তু চিরদিন চললো না।

একদিন বিকেলে কাজী সাহেব কাজে বেরুলেন। বললেন, বড় লোকের বাড়িতে শাদী আছে। রাতে আর ফিরতে পারবো না, বিবিজান।

বিবিজান তো আনন্দে নেচে উঠলো। ঘর-দোরে গোলাপ জল ছিটালো। কুসুম-সজ্জায় শয্যা রচনা করলো। তারপর জানলায় একখানা সাদা রুমাল মেলে দিয়ে পালঙ্কে শুয়ে প্রিয়-মিলনের সুখ-স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো।

একটু পরেই দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসে সে। এ তো তার প্রেমিকের মৃদু করাঘাত নয়। দরজা খুলতে দেখলো, বৃদ্ধ কাজী সাহেব এক খোজা নফরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয় মেয়েটি।

—কি গো, শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি?

কাজী সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, বেশ ভালই ছিলাম। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। কোনও রকমে শাদীনামা লিখে দিয়েই আমি চলে এলাম।

—তা বেশ করেছ, মেয়েটি বলে, তুমি শোও, আমি তোমার সারা গাটা গোলাপ জল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছি। দেখবে, আরামে ঘুম এসে যাবে।

কাজী সাহেবকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে তার দেহ থেকে এক এক করে সব সাজ-পোশাক খুলে একেবারে বিবস্ত্র করে সে। তারপর গোলাপ জল ছিটিয়ে সারা শরীরটা ভাল করে মুছিয়ে, চাদর দিয়ে ঢেকে বলে, এবার দেখবে, এখুনি ঘুম আসবে। আর ঘুম ঠিকমতো হলে কাল সকালে শরীরও ঝরঝরে হয়ে যাবে।

এই প্রথম কাজী সাহেব তার বেগমের কাছ থেকে এমন দরদ ঢালা ব্যবহার পেল। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

বুড়ো কাজীর গায়ের দুর্গন্ধে বমি আসছিল মেয়েটির। তোয়ালে আর সাবান নিয়ে সে হামামে গিয়ে ঢুকলো।

ইতাবসরে পেশকার নাগরটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানলার দিকে লক্ষ্য করে

বুঝলো, কাজী সাহেব ঘরে ফিরবে না, আজকের রাত তাদের মধুযামিনী হবে। যথারীতি সে জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে সুন্দরীর জানলা টপকে ঘরের ভিতরে এসে নামে।

ঘরের এক কোণে একটা মৃদু আলোর চিরাগ টিমটিম করে জ্বলছিল। প্রায়ান্ধকার। তবে এটুকু বেশ বোঝা যায়, পালঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে সে ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। প্রথমে দু একবার সোহাগ সম্বোধন করে ডাকলো সে। কিন্তু তাতেও পালঙ্ক থেকে কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে বেশ জোরেই শব্দ করে হেসে উঠলো।

—হুম, একেবারে ঘুমে গলে গিয়েছ দেখছি। তা দেখি, কেমন কতখানি ঘুমে কাতর করেছে, আমার নয়নতারাকে।

চাদরের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয় ছেলেটি।

—ওরে, বাবা, একেবারে তৈরি হয়ে আছ যে দেখছি বিবি সাহেব? অন্য দিন সাজ-পোশাক টেনে টেনে আমাকে খুলতে হয়, তা আজ দেখছি নিজে হাতেই সে কাজটি সমাধা করে রেখেছ, তোফা!

দুষ্টুমি করে সে শায়িতের দু'পায়ের মাঝখানে হাত রাখে। উদ্দেশ্য রাগ-মোচনের আগে খানিকটা সোহাগ-শৃঙ্গারে কামোত্তেজিত করে তোলা। কিন্তু থলথলে কী একটা অদ্ভুত বস্তুর স্পর্শে আঁৎকে উঠে সে তড়িতাহতের মতো হাতটা টেনে বের করে নেয়।

হাতটা গুটিয়ে নিতে পারলেও দেহটাকে সরিয়ে নিতে পারে না ছেলেটি। ততক্ষণে কাজী সাহেবের দুই বাহু তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে।

ছেলেটি শিউরে ওঠে। সর্বনাশ, কাজী সাহেব! নিমেষে তার দেহের বিপুল শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু বলহীন বৃদ্ধরা ক্রোধে উত্তেজিত হলে ক্ষণকালের জন্যও আসুরিক শক্তির আধার হয়ে ওঠে।

পেশকার ছেলেটি তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। বৃদ্ধ কাজী তাকে অতি সহজেই পাশের একটা খালি কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে ডালা এবং তালা বন্ধ করে দেয়। এই বাক্সটায় দিনের বেলায় শয্যার কাঁথা-তোষক-গুলো ভরে রাখা হয়। আকারে বেশ বড়সড়। সুতরাং তার মধ্যে একটা জোয়ান মানুষ অক্লেশে শুয়ে থাকতে পারে।

কাজী সাহেব হুঙ্কার ছাড়লো। নফর চাকররা তটস্থ হয়ে ছুটে এল।

—তোদের বেগম সাহেবা কোথায়?

—কী হুজুর, তিনি হামামে গেছেন।

কাজী সাহেব গজরাতে থাকে, ঠিক আছে, সে আসুক তার সামনে আমি ডালা খুলবো। যদি সে বলে, লোকটাকে সে চেনে না তা হলে, নিজে হাতে আমি তাকে এই তলোয়ার দিয়ে দুখানা করে ফেলবো। আর যদি বলে সে তার নাগর, তাহলে, এই দুহাতের থাবায় দুজনের গলা টিপে এক সঙ্গে দুজনকে শেষ করে ফেলবো। আমি স্বয়ং কাজী। এই আমার বিচার।

কাজীর বাড়ির এক বৃদ্ধা দাসী হামামে গিয়ে কাজী-বেগমকে খবরটা

জানিয়ে দেয়। সর্বনাশ হয়েছে বেগম-সাহেবা, পেশকার সাহেব ঘরে ঢুকতেই কাজী সাহেব তাকে ধরে বিছানার বাক্সে বন্দী করে ফেলেছে, এখন কী হবে ?

মেয়েটি ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে, ইস্, একেবারেই মনে ছিল না। জানলার সাদা রুমালখানা সরাতে ভুলে গেছি। একটা কাজ কর, বুড়িমা, যেভাবেই হোক কাজী সাহেবকে কিছুক্ষণের জন্য ও-ঘর থেকে সরাতে হবে।

বুড়ি বলে, আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। কিন্তু কী করে খাওয়াবেন তাকে ?

ঠিক আছে একটা বড়ি আর এক গেলাস পানি নিয়ে গিয়ে রাখ আমার ঘরে আমি যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে কাজী-বেগম ঘরে ঢুকেই আঁৎকে ওঠে, হায় বাপ, তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছ ? হেকিম সাহেব বলে গেলেন একদম নড়া চড়া করা চলবে না। শোও, শোও বলছি আগে।

কাজী সাহেব একটু নরম হয়ে বলে, কিন্তু আমার কথাটা আগে শোন। মানে—মানে—

—আর মানে মানে করতে হবে না। এই শরীরে বেশি কথাবার্তা বলাও বারণ। তোমার সব কথা কাল শুনবো আমি। এখন এই দাওয়াই-এর গোলিটা খেয়ে শুয়ে পড়।

কাজী সাহেব প্রসন্ন হয়। বলে, আহা আবার হেকিম সাহেবকে ডাকতে গেলে কেন ? শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল, তুমি যত্ন করে গোলাপ নির্যাস দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছো, তাতেই আমি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

—তা হলেও সাবধানের মার নাই। হেকিম সাহেবও বললেন ভয়ের মতো তেমন কিছু নয়, তবে দু-একদিন বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে, কোনও কাজ কামে বেরুতে পারবে না। শুধু সুবোধ ছেলের মতো আমি যা যা বলবো তাই মেনে চলবে, কেমন ?

তারপর জলের গেলাস আর ঐ ঘুমের বড়িটা হাতে তুলে নিয়ে কাজীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নাও, টুক করে গিলে ফেল তো—

কাজী সাহেব বড়িটা খেয়ে বলে, শোন, খুব গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে একটু আগে।

মেয়েটি বলে, তোমার শরীর স্বাস্থের চেয়ে গুরুতর ব্যাপার, এখন অন্ততঃ আমার কাছে আর কিছু থাকতে পারে না। তুমি যা খুশি বলতে চাও, কাল সকালে বলো, শুনবো।

কাজী সাহেব বাধা দিয়ে বলে, কাল সকালে শুনলে চলবে না বিবিজান। এখনই শোন, না হলে লোকটা মরে যাবে।

—যে মরে মরুক। তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। চুপচাপ শুয়ে পড়, আর একটি কথা বলবে না।

কথা অবশ্য আর বলার কোনও ক্ষমতাও হলো না কাজীর। ঘুমে ঢলে পড়লো সে তখুনি।

মেয়েটি খাট থেকে নেমে বাক্সটার দিকে ছুটে যায়। ডালাটা খুলে ধরে। ছেলেটি ঘেমে নেয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে ওকে বাইরে বেরুতে সাহায্য করে। কাজীকে দেখে সে ভয়ে সিটকে যায়।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, ভয় নাই, ও এখন কাটা সৈনিক। এসো আমরা আজ নিচে মেঝেয় মাদুর পেতেই মধুযামিনী যাপন করবো।

শেষ রাতে মেয়েটি ছেলেটিকে জাগিয়ে তোলে, এ্যাই—ওঠ ওঠ। তোমাকে যেতে হবে। সকাল হতে আর দেরি নাই। তার আগে চল আস্তাবলে যাই। একটা কাজ করতে হবে।

ওরা দুজনে আস্তাবলে এসে একটা গাধাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে শোবার ঘরে। মেয়েটি বলে, এস দুজনে মিলে ধরাধরি করে গাধাটাকে বাক্সটার মধ্যে পুরে ফেলি।

গাধাটাকে বাক্সে ভরে ডালা বন্ধ করে দেয় মেয়েটি। ছেলেটিকে বলে, এবার তুমি কেটে পড়। আমি বুড়োর পাশে শুয়ে পড়ছি।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই কাজী মেয়েটিকে ঠেলা দেয়, এই ওঠো, ওঠো তো।

মেয়েটি বিরক্ত হওয়ার ভান করে পাশ ফিরে শোয়, কেন, কী হলো, এত ভোরে ডাকছো কেন?

—ডাকছি তোমার বিচার হবে, ওঠ।

মেয়েটি এবার চোখ বড় বড় করে তাকায়, কিসের বিচার?

—এখনি বুঝতে পারবে। আমি পাড়ার পাঁচজন সাক্ষী ডাকতে পাঠিয়েছি। তারা এখুনি এসে পড়বে। তখনই বুঝবে কিসের বিচার।

একটু পরে পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক মানী ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। কাজী-সাহেব তাদের উদ্দেশ্য করে বলে, আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাক্ষী হওয়ার জন্য।

এই বলে কাজী সাহেব উঠে গিয়ে বাক্সের ডালাটা তুলে ধরে। আর সংগে সংগে গাধাটা মাথা তুলে মুখ বাড়িয়ে দেয়।

কাজী সাহেব রাগে চিৎকার করে ওঠে, এই মাগী, কোথায় সে বল, না হলে গলা টিপে তোকে শেষ করে দেব আজ।

দুহাতে থাবা মেলে সে মেয়েটির গলাটা টিপে ধরতে এগিয়ে আসতে থাকে।

মেয়েটি আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে পালায়, ওরে বাবারে, মেরে ফেললো আমাকে। বাঁচাও—বাঁচাও।

সাক্ষীরা ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পারে না। উন্মত্ত কাজী সাহেবকে জাপটে ধরে একজন।

মেয়েটি ঘরের বাইরে থেকে বলে, ওকে আপনারা দড়ি দিয়ে বাঁধুন। কাল রাত থেকেই মাথাটা বিগড়ে গেছে।

শাহরাজাদ বললো, এরপর আর একটা কিস্সা শোনাচ্ছি :

কোনও এক সময়ে এক দুর্জয়-সাহস সুলতান প্রতাপের সঙ্গে সব প্রজা পালন করতেন। সুলতানের তিন পুত্র। বড়টির নাম আলী, মেজটির নাম হাসান এবং ছোট ছেলের নাম ছিল হুসেন। তিন পুত্রই দেখতে ছিল খুব সুন্দর। সুলতানের এক সম্পর্কে বোনের হাতে তাদের লালন পালনের ভার দেওয়া হয়েছিল।

ছেলেরা প্রাসাদের মনোরম পরিবেশে বড় হতে থাকে। তাদের তিন ভাই-এর সঙ্গে মা-বাপ-মরা অনাথ এক মাসতুতো বোনও মানুষ হচ্ছিল। এই মেয়েটির নাম নুর অল-নিহার। অপরূপ সুন্দরী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। ওর হরিণীর মতো কাজল-কালো টানাটানা চোখের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

চার ভাই-বোন এক সঙ্গে খায় দায়, খেলাধুলো করে এবং একই সঙ্গে ঘুমোয়। সুলতান ভেবেছিলেন, নুর বড় হলে পাশের কোনও সুলতান বাদশাহর পুত্রের সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবেন। কিন্তু মেয়েটির দেহে যখন প্রথম যৌবন উন্মেষ ঘটলো তখন তাকে পরদা নসীন করে রাখার জন্য পুত্রদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, তাঁর তিন পুত্রই নুরের প্রতি সমান ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সুলতান ভাবলেন, এ অবস্থায় যে কোনও দুই পুত্রকে বঞ্চিত করে একজনের হাতে যদি নুরকে তুলে দেন তবে ভাইএ ভাইএ বিবাদ বেঁধে যাবে। আবার যদি ওদের বাদ দিয়ে অন্য কোনও দেশের শাহজাদাদের কারও সঙ্গে শাদী দিয়ে দেন তাহলেও অশান্তি বাড়বে। সুতরাং কী ভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করা যায় কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

তিন ছেলেকেই সুলতান ডেকে পাঠালেন।

—শোনও বাবা, তোমরা সবাই আমার চোখে সমান। কারও ওপর কোনও পক্ষপাত আমি করতে পারি না। অথচ তোমাদের তিন জনের সঙ্গেই তো নুরের সাদী দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। তোমাদের ভাইদের মধ্যে যাতে সদ্ভাব বজায় থাকে সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

সুলতান বললেন, শোনও, আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করেছি। তোমরা তিন ভাই নিজের নিজের পছন্দ মতো তিন দেশে যাত্রা কর। আমি দেখতে চাই তোমরা নিজেদের হিম্মতে কে কতটা অবাক করার মতো কী করে আসতে পার। যার কাজে আমি সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ হবো সেই পাবে নুরকে। কী, তোমরা রাজী?

ছেলেরা বাবার প্রস্তাবে একবাক্যে সম্মতি জানালে সুলতান বললেন, তাহলে যাত্রার আয়োজন কর। কার কী টাকা পয়সা প্রয়োজন বল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খাজাঞ্চীখানা থেকে বস্তা বস্তা সোনা বের করা হলো। এবং যার যতটা ইচ্ছা, প্রত্যেক ছেলে সেগুলো সঙ্গে নিল।

দিনক্ষণ দেখে একই সময়ে ওরা বণিকের ছদ্মবেশে রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সুলতানকে বলে গেল, এক বছর পরে আবার ঠিক এই দিনে ওরা সকলে প্রাসাদে ফিরে আসবে।

শহর ছেড়ে বড় সড়ক ধরে ওরা তিন ভাই এক সঙ্গে চলতে চলতে এক সময় অন্য এক শহর প্রান্তের এক সরাইখানায় এসে উপস্থিত হয়। এখান থেকে সড়কটা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে চলে গেছে। ঠিক হলো, এবার ওরা তিনজনে তিন দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, সে রাতটা ওরা তিন ভাই সরাইখানাতেই আশ্রয় নিল। রাতের খাবার খেতে বসে তিনজনে পরামর্শ করলো, সফর শেষে এক বছর পরে ঠিক এই দিনে ওরা প্রথমে এই সরাইখানাতে এসেই মিলিত হবে। তারপর তিন ভাই এক সঙ্গে প্রাসাদে ফিরবে। যদি কেউ আগে এসে পৌঁছয় তবে সে অন্য ভাইদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবে।

পরদিন খুব ভোরে যাত্রার পূর্বে তিন ভাই পরস্পরে শুভ কামনা জানিয়ে বিদায় আলিঙ্গন বিনিময় করে যে যার পথে রওনা হয়ে গেল।

এক টানা তিন মাস ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দুর্গম গিরি প্রান্তর অতিক্রম করার পর বড় ছেলে আলী একদিন ভারতের সমুদ্র উপকূলের বিশানগড় সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত হলো। শহরের সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত সরাইখানার একটি বিরাট সুসজ্জিত কামরা ভাড়া করে নিল সে।

অনেক দিনের পথের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছিল। সেদিন সারাটা দিন পড়ে পড়ে ঘুমালো আলী। এবং সন্ধ্যার একটু আগে সেজে গুজে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো।

শহরের ঠিক মাঝখানে একটা বেশ সাজানো গোছানো বাগিচা তার মাঝখানে বিরাট একটা জলের ফোয়ারা। তার চার পাশটা শ্বেত পাথরে বাঁধানো। বাগানের মধ্যে নানা রকম বাহারী ফুলের সমারোহ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

চার পাশে নানারকম দোকান পাট। হরেক কিসিমের ভারতীয় পণ্যের মেলা। যা দেখে তাই বড় সুন্দর মনে হয় আলীর। দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে হরেক জিনিসের দাম জেনে নিতে থাকে সে।

আলী বিদেশী এ শহরে নবাগত, তার সাজ পোশাক, চাল চলন দেখে সবাই বুঝতে পারে তা। এক দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ ভাবই জমে ওঠে। দোকানী বলে, যদি কিছু মনে না করেন তবে চলুন, আমার গরীবখানায় একটু পায়ের ধুলো দেবেন আজ।

এ আমন্ত্রণ এড়াতে পারে না আলী। নতুন দেশে এসেছে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ সালাপ জমাতেই হবে। তাই সাগ্রহে রাজি হয়ে যায়।

দোকান বন্ধ করে আলীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে আসে দোকানী। আপ্যায়ন

করে বাইরের ঘরে বসিয়ে সে অন্দরে চলে যায়।

আলী জানালার পাশে বসে পথচারীদের যাওয়া আসা দেখতে থাকে।

একটু পরে একখানা ছোট্ট গালিচা হাতে করে একটা লোক হাঁকতে হাঁকতে এগিয়ে চলেছে. গালিচা নেবে গো—বহুৎ আজব গালিচা! একদম জলের দরে বিকিয়ে যাচ্ছে। মাত্র তিরিশ হাজার মোহরে দিয়ে দেব।

আলী হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে। বলে কী? নামাজ পড়ার যোগ্য ছোট্ট একখানা গালিচার দাম তিরিশ হাজার? লোকটার কী মাথা-টাথার কিছু গোলমাল আছে? লোকটা আরও কাছে ওর জানালার সামনে আসতে আলী ওকে ডাকে, এই শোনও, দেখি তোমার গালিচাখানা। এত দাম হাঁকছ কেন?

লোকটা নির্বিকার ভাবে বলে. এত দাম কোথায়, কত্তা। আমার মালিক বলে দিয়েছে, চল্লিশের কমে বিক্রি করবি না, তা রাত হয়ে যাচ্ছে, হাত খালি করে ঘরে ফিরতে চাই, তাই তিরিশ হাজারেই ছেড়ে দেব ঠিক করেছি—একেবারে জলের দাম।

আলী পরীক্ষা করে দেখলো। অতি সাধারণ একখানা গালিচা। ভেবে পেল না, এইটুকু একখানা সাধারণ গালিচার এত দর কেন হাঁকছে লোকটা? পারস্যের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা একশোখানা ঘরজোড়া গালিচার তো তিরিশ হাজার টাকা দাম নয়!

—নিশ্চয়ই তোমার গালিচার অন্য কোনও মাহাত্ম্য আছে মনে হচ্ছে। তা না হলে এত দাম চাইছো কেন?

লোকটি এবার আলীর দিকে চোখ তুলে ভাল করে তাকাল, হ্যাঁ সাহেব, আপনি ঠিকই ধরেছেন। এ গালিচা মন্ত্রঃপূত। এর ওপর বসে আপনি যেখানে যাওয়ার বাসনা করবেন সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাবে। তা সে হিমালয়ের চূড়াতেই হোক বা ভারত মহাসাগরের মাঝখানেই হোক। সাগর প্রান্তর গিরি নদী কোনও বাধাই এর কাছে বাধা নয়। চোখের পলকে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবেন।

আলী বলে, তোমার কথা যদি ঠিক হয়, যদি প্রমাণ পাই তোমার গালিচা ঐ রকম অলৌকিক গুণধর, তবে তিরিশ কেন চল্লিশ হাজারই দেব তোমাকে। এ ছাড়া দালালী হিসাবে আর এক হাজার বেশি দেব তোমাকে! আগে তোমার কারিকুরি দেখাও দেখি—

লোকটির চোখে কেমন অবিশ্বাসের প্রশ্ন, কোথায়, আগে একচল্লিশ হাজার মোহর আমাকে দেখান, তা হলে এখুনি ভেল্কীবাজি দেখিয়ে দেব আপনাকে।

আলী বলে, টাকা আমার ডেরায় আছে। এই শহরের সব চেয়ে সেরা যে সরাইখানা—সেখানে আমি একখানা ঘর ভাড়া করে উঠেছি। সওদা হয়ে গেলে আমার সঙ্গে যেও হাতে হাতে টাকা দেব, মাল নেব।

লোকটি এবার উৎসাহিত হয়ে বলে, সরাইখানার পথ তো এখান থেকে নেহাত কম নয়। তা পায়ে হেঁটে গিয়ে কী লাভ, আসুন এই গালিচায় এসে বসুন আমার পাশে, এক পলকে পৌঁছে যাবো আপনার ঘরে। গালিচায় বসে

আপনি মনে মনে স্মরণ করবেন একবার, কোথায় যাবেন। ব্যস আর কিছু করতে হবে না, সোজা পেঁছে দেবে পলকে।

হলোও তাই। গালিচায় বসে চোখ বন্ধ ক'রে মনে মনে একবার মাত্র ভেবেছে. এখন ঘরে ফিরতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে দেখলো, সেই সুরম্য সরাইখানায় তার নিজের কক্ষে এসে পড়েছে সে।

তাজ্জব ব্যাপার! আলী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নফরকে বললো, একে একচল্লিশ হাজার মোহর দিয়ে দে।

আলী ভাবে সার্থক তার ভারতে আসা। অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন এক আজব বস্তু সংগ্রহ করতে পেরেছে যা তার অন্য দুই ভাই কখনোও করতে পারবে না। যে দেশেই যাক, আর যত চেষ্টাই করুক, এমন অলৌকিক যাদুকরী জিনিস ওরা পাবে কোথায়? সুতরাং কেল্লা ফতে—নুর অল-নিহার তারই বুকে মাথা রাখবে। বাবা বিচক্ষণ সুলতান, বিচারে তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আর ন্যায় বিচার হলে তাকে টেক্কা দিতে পারবে না অন্য কোনও ভাই।

কিন্তু সমস্যা হলো—বছরের সবে তিনটি মাস অতিক্রান্ত। কথা আছে, এক বৎসর পরে ওরা তিন ভাই সেই সরাইখানায় মিলিত হবে. তারপর এক সঙ্গে হাজির হবে সুলতানের সামনে। এখন এই দীর্ঘ সময় কোথায় কাটাবে সে!

পরদিন থেকে সে শহরের নানা প্রত্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলো। সারা সহরব্যাপী হিন্দুদের কত মজার মজার মন্দির। আর সেই সব মন্দিরে কত বিচিত্র রকমের সব মূর্তি। কোনওটা পিতলের কোনওটা তামার আবার কোনওটা বা সোনার তৈরি। সকাল সন্ধ্যায় ঘণ্টা-ধ্বনি হয়, নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজে, হাজার হাজার ভক্ত নর-নারীর সমাগম হয়। পুরোহিত সকলকে আশীর্বাদ করে, প্রসাদ হয়, ভক্তরা যে যা পারে প্রণামী দিয়ে চলে যায়।

আলী অবাক হয়ে দেখে সব। পুরোহিতগুলো বেতন পায় না। ভক্তদের প্রণামীর দাক্ষিণ্যে তাদের জীবিকা চলে।

হিন্দুদের বারমাসে তের পার্বণ। উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে। মাঝে মাঝেই মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে। আসে সওদাগররা। কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস কেনা বেচা হয়।

এইভাবে দেখতে দেখতে প্রায় বছরটা ফুরিয়ে আসে। আলী ভাবে এবার দেশে ফিরতে হবে। নফরটাকে সব গোছগাছ করে নিতে বলে। তারপর একদিন গালিচাখানা পেতে ওকে পাশে বসিয়ে দেশের সেই সরাইখানায় যাবার ইচ্ছা করে মনে মনে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ তিন মাসের দুর্গম পথ পলকে পার হয়ে এসে পৌঁছয় ওরা ঐ সরাইখানার সামনে।

বছর পুরতে আরও ক'দিন বাকী। আলী ঠিক করে এ' কটা দিন সে সরাইখানাতেই অপেক্ষা করবে ওর ভাইদের জন্য।

আলী-ওরা ভাইদের জন্য বসে থাক ওখানে, আমরা এবার মেজভাই শাহজাদা হাসানের কথা বলি।

চলতে চলতে হাসান পারস্যের এক শহরে গিয়ে পেঁছিল। সেখানকার সেরা সরাইখানাতে একখানা ঘর ভাড়া করে মালপত্র এবং নফরটাকে সেখানে রেখে হাসান বেরুলো শহর পরিক্রমায়। কত রকম সুন্দর সুন্দর শৌখিন জিনিসের কত সব দোকান। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হাসানের রূপে এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এক সওদাগর তাকে পাশে বসিয়ে খাতির যত্ন করতে থাকে। এমন সময় হাসান লক্ষ্য করলো এক অশীতিপর সদাশয় বৃদ্ধ হাতে একটা ছোট্ট হাতীর দাঁতের চোঙা নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে এগিয়ে আসছে, একেবারে পানির দামে বিকিয়ে গেল—মাত্র তিরিশ হাজার দিনারে দিয়ে দেব। পয়সা দিয়েও এ বস্তু বাজারে কিনতে পাবেন না কেউ। একেবারে মাটির দাম—মাত্র তিরিশ হাজার।

হাসান অবাক হয়ে সওদাগরকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা শেখ সাহেব, বৃদ্ধটি এসব কী আবল তাবল বকছে! লোকটি পাগল নয় তো!

দোকানী বলে, না না মালিক খুব সাচ্চা আদমী। আমরা বহুকাল দেখছি, কাউকে এক পয়সা ঠকায় না। ভুলেও মিথ্যে কথা বলে না কখনও। দামী দামী শখের জিনিসের দালালী করে খায়। ওর হাতে যে জিনিসটা দেখছেন ওটা ও কিনে আনেনি। কোনও সুলতান আমির ঘরের জিনিস বিক্রি করতে পাঠিয়েছে। বিক্রি হলে ও কিছু দালালী পাবে মাত্র।

হাসান বৃদ্ধকে কাছে ডাকে, আপনার ঐ হাতীর দাঁতের ছোট্ট চোঙাটার কী যাদু আছে, যে তিরিশ হাজার দিনার দাম চাইছেন?

বৃদ্ধ হাসে, ঠকিয়ে একটা ফুটো পয়সা নেব না মালিক। লক্ষ দিনার দিলে বাজারে মিলবে না এ-জিনিস। আমার মনিবও চল্লিশ হাজারের কমে বেচতে বারণ করেছে। কিন্তু সারা শহরটা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম, একটা শৌখিন মালদার মানুষ দেখতে পেলাম না।

—তা বস্তুটির অলৌকিক কী গুণ আছে শুনি?

চোঙাটা হাসানের হাতে দিয়ে সে বলে এতে একটা চোখ রেখে আপনি যা দেখতে বাসনা করবেন তাই দেখতে পাবেন, দেখুন না—

হাসান কৌতুক বোধ করে। অবিশ্বাস্য মনে হয় বৃদ্ধের কথা। চোখে ধরে সে নুর অল-নিহারকে দেখার বাসনা করে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাসাদের হারেমের সুরম্য হামামে বহু সখী-পরিবৃতা হয়ে বিবসনা নুরকে জলকেলী রত দেখতে পেয়ে রোমাঞ্চিত এবং বিস্মিত হয়ে ওঠে সে। এও কি সম্ভব? এমন অপার্থিব বস্তুও পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় এদেশে? হাসান বলে, আমার সরাইখানায় চলুন, এখুনি আপনার দাম মিটিয়ে দিচ্ছি। তিরিশ নয় চল্লিশ হাজারই পাবেন আপনি। এবং আপনার দালালী হিসেবে আরও এক হাজার বেশি দেব।

হাসান ভাবে, এমন এক আজব জিনিস সে হাতে পেয়েছে—তাকে আর হারায় কে? তার ভাইরা দেখলে হাঁ হয়ে যাবে না?

হাসানেরও একই সমস্যা হলো। বছর শেষের অনেক বাকী। কিন্তু তার

আগে দেশে ফেরাও যাবে না। তাই পারস্যেরই নানা দর্শনীয় জায়গা দেখে সে দিন কাটাতে লাগলো।

তারপর বছরের শেষের দিকে সময় হিসেব করে একদিন সে ঐ সরাইখানায় এসে হাজির হলো।

আপনারা সবাই জানেন তার আগে বড় ভাই আলী সেখানে পেঁছে গিয়েছে।

এবার ছোটজন হুসেনের কথায় আসি।

চলতে চলতে হুসেন এসে পেঁছল সমরখন্দে—জাঁহাপনার ছোট ভাই শাহজামান এখন যেখানে সুলতান হয়ে আছেন।

যথারীতি সেও শহরের এক সম্ভ্রান্ত সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিল।

একদিন শহর দেখতে পথে বেরিয়েছে হুসেন, এক ফেরিওয়ালার হাতে তরমুজ সদৃশ বিরাট আকৃতির একটি আপেল দেখে সে কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করলো, এত বড় আপেল তো কখনও দেখিনি গো? এটা কোন দেশের মাটিতে ফলে?

লোকটি হেসে বললো, না মালিক এ ফল গাছে ধরেনি। এক বিজ্ঞানী যাদুকরের তৈরি।

—কত দাম?

—মাত্র তিরিশ হাজার দিনার পেলে দিয়ে দেব। আমার মালিক চল্লিশ হাজারের কমে বেচতে বারণ করেছে। কিন্তু সারা শহর ঘুরে একজন সমঝদার মানুষ পেলাম না। তাই ঠিক করেছি, তিরিশ হাজারেই দিয়ে দেব।

হুসেন বলে, তুমি কী মস্করা করছো আমার সংগে? একটা ফলের দাম তিরিশ হাজার দিনার?

মস্করা কেন করবো, জনাব! আপনি এর আজব গুণের কথা জানেন না, তাই অবাক হচ্ছেন। এ আপেল খাওয়ার জন্য নয়, এর গন্ধ শুঁকলে দিল খুশ হয়ে যায়, দুরারোগ্য বিমারী সেরে যায়।

হুসেন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নাকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আপেলটায় আঘ্রাণ করতেই দেহের সকল অবসাদ কেটে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে ওঠে সে।

লোকটি বলে, কী অবাক হয়ে গেলেন? দাঁড়ান এখনও আসল প্রমাণ আপনাকে দিইনি।

একটা লোক এক কুষ্ঠরুগীকে পিঠে বেঁধে নিয়ে আসছিল। লোকটি আপেলটা ঐ পঙ্গু কুষ্ঠরুগীর নাকে নিয়ে গিয়ে ধরতেই রুগীটা চটপট করে ঝোলা থেকে লাফিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। হুসেন দেখলো, ওর দেহে আর কোনও ক্ষত বা দাগ কিছুই নাই। দিব্যি সুস্থ তাগড়াই একটি জোয়ান মানুষ।

হুসেনের মন আনন্দে নেচে উঠলো। এমন অলৌকিক বস্তু যদি তার হাতে থাকে তবে তাদের ভাইদের সে ডরাবে কেন? তারা যত চেষ্টাই করুক, এর

চেয়ে আজব জিনিস আর কী জোগাড় করতে পারে।

লোকটিকে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে একচল্লিশ হাজার দিনার গুণে দিয়ে আপেলটা সে কিনে নেয়।

বছরের বাকী সময়টা সমরখন্দের নানা জায়গা সফর করে যথাসময়ে একদিন সে সেই সরাইখানায় এসে বড় দুই ভাই-এর সঙ্গে মিলিত হয়।

একটা বছর পরে আবার একত্রিত হতে পেরে সকলেই খুব খুশি হয়ে আনন্দে আলিঙ্গন করে।

খানা-পিনা শেষ হলে বড় ভাই বলে, এবার আমরা কে কি সংগ্রহ করে এনেছি—এস দেখাই।

আলী তার আশ্চর্য গালিচা বের করে বলে, এর সাহায্যে পলকের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। এস আমরা তিন ভাই এর উপর চেপে বসি। তারপর দেখবে কোথায় নিয়ে যাবো তোমাদের।

পলকের মধ্যে দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পারের এক দেশে নিয়ে গেল আলী। এবং পর মুহূর্তেই আবার সরাইখানায় ফিরে এল তিনজন।

মেজ ভাই বের করলো সেই হাতীর দাঁতের চোঙাটা। বললো, জিনিসটা দেখতে অতি সাধারণ, কিন্তু এতে চোখ রেখে দুনিয়ার যা কিছু দেখতে চাইবে দেখতে পাবে। এই মুহূর্তে আমাদের বোন নুর কী করছে, দাঁড়াও, দেখে আমি বলে দিচ্ছি।

এই বলে হাসান চোঙাটা চোখে ধরেই ডুকরে কেঁদে উঠলো।

দুই ভাই বুঝতে না পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী? কী দেখলে?

হাসান বলে, আর কী হবে এসবে? নুর মৃত্যুশয্যায়। বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। তার চারপাশে হারেমের মেয়েরা ঘিরে আছে। তাদের সকলের চোখে মুখে কী নিদারুণ হতাশা। আমরা পেঁছিবার আগেই নুর হয়তো ইন্তেকাল করবে।

হাসান-এর হাত থেকে চোঙাটা নিয়ে আলী চোখে লাগিয়ে হাসানের কথার সত্যতা যাচাই করতে যায়।

—না না, আর তো দেরি করা যায় না, চল, এখুনি প্রাসাদে পেঁছে যাই। এস আমার গালিচায় বস তোমরা।

ঘোড়াগুলো সঙ্গে দিয়ে নফরদের রওনা করে দিয়ে তিনভাই গালিচায় চেপে তক্ষুনি প্রাসাদের হারেমে এসে পেঁছায়। নুর বিছানার সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। বাহ্যজ্ঞান সব লোপ পেয়ে গেছে। তা না হলে আজন্মের সাথী তিন ভাইকে সামনে দেখেও সে চিনতে পারে না? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হুসেন আপেলটা নাকের কাছে ধরতেই নুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। এক বছর বাদে তিনভাইকে এক সঙ্গে দেখে খুশিতে ডগমগো হয়ে বলে, বিদেশে সবাই ভাল ছিলে ভাইজান?

—আমরা ভালই ছিলাম। কিন্তু তোমাকে এমন বিমার দেখে আমরা তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যাক, এখন কেমন লাগছে?

নূর বলে, খুব ভাল, আমি তো আগের চেয়েও সুস্থ হয়ে গেছি। এখন আর আমার একটু অসুখ নাই, ভাইজান।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো দশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

তিন ভাই সুলতানের কাছে এসে তাদের নিজ নিজ সংগৃহীত পরমাশ্চর্য বস্তুর অলৌকিক গুণাবলী প্রদর্শন করলো। সুলতান হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনটি জিনিসই তিন দিক থেকে অনন্য সাধারণ। কোনও ভাবে কাউকে খাটো করে দেখতে পারি না আমি। সুতরাং এখন নতুন এক সমস্যার মধ্যে পড়লাম আমি। এ অবস্থায় তোমাদের কোন ভাই-এর হাতে নূরকে সঁপে দিতে পারি আমি? যাই হোক, আর একটা পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে। কাল সকালে পোলো মাঠে হাজির হবে তোমরা। তিন ভাইকেই তীর ছুঁড়তে হবে। যার তীর সবচেয়ে বেশি দূর যাবে, সেই পাবে নূরকে।

পরদিন সকালে যথাসময়ে তিন ভাই হাজির হলো পোলো মাঠে। আলী এবং হাসানের চেয়ে হুসেন অনেক বেশি দূর পাঠিয়ে দিল তার তীর। সুলতান এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক, এবারে একটা ফয়সালা হয়ে গেল। তোমাদের দুজনের মনে কোনও খেদ থাকার কারণ নাই, হাসানই নূরকে লাভ করার যোগ্যতম পাত্র। আর দেরি করতে চাই না, আজই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি, হাসানের সংগে নূর-এর শাদী হবে।

দুঃখে হতাশায় ভেংগে পড়লো আলী। প্রকাশ্যেই সে জানিয়ে দিল সুলতানকে, মসনদে তার লোভ নাই এতটুকু। ভোগ-বিলাস থেকে বিরত হয়ে সে দরবেশের বেশে পথে বেরিয়ে পড়লো।

ছোট ভাই হুসেন কিন্তু মনের দুঃখে বিবাগী হতে পারল না। ওর মনে একটা সংশয়-এর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে থাকলো। বড় ভাই আলীর তীর বেশি দূরে যেতে পারেনি। কিন্তু হুসেনের তীর দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সুলতান হাসানের তীর আরও বেশি দূরে গেছে বলে রায় দিলেন।

হুসেন ঠিক করলো তীরখানা খুঁজে বের করবেই। পোলো মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ। হুসেন তীরখানা খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর চলে গেল। কিন্তু না কোথাও দেখতে পেল না। অবশেষে সে মরিয়া হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কিন্তু না, কোথাও দেখতে পেল না সে তীর। হুসেন অবাক হয়ে ভাবে, কোথায় যাবে, আর কত দূরেই বা যেতে পারে? আরও খানিকটা ওপরে উঠতে একটা পার্বত্য পথের নিশানা পেয়ে সেইদিকে চলতে থাকলো সে। চলতে চলতে একটি বিশাল বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই দরজার পাল্লায় গেঁথে গেছে তীরখানা। আশ্চর্য! পোলো

মাঠ থেকে এত দূরে এ তীর এল কী করে !

যাই হোক, দরজা থেকে টান দিয়ে তীরখানা সে খুলে নিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজাখানা খুলে গেল ওর মুখের সামনে।

এক অলোক সামান্যা সুন্দরী বেরিয়ে এল বাইরে। তার সঙ্গে এক দঙ্গল সহচরী। তরুণীর বিলাসবহুল বেশবাস এবং রূপের জেল্লা দেখে হুসেনের বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ মেয়ে সাধারণ কেউ নয়, নিশ্চয়ই কোনও শাহজাদী হবে।

হুসেন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি প্রশ্ন করে, কী দেখছো, শাহজাদা হুসেন ?

হুসেন ! তার নাম সে জানলো কী করে ?

—আপনি কে ? আমি বুঝতে পারছি না, আমার নাম কী করে জানলেন আপনি ?

মেয়েটি বললো, উঁহু, এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে কোনও কথা নয়, আগে ভেতরে চল, তারপর তোমার সব কথার জবাব দেবো।

হাত ধরে শাহজাদী হুসেনকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। কক্ষের জাঁকজমকে চোখ ঝলসে যায়। একটা শৌখিন মখমলের গদীতে ওরা দুজনে পাশাপাশি বসলো। মেয়েটি বললো, তোমার প্রতীক্ষাতেই এতকাল এখানে বসেছিলাম। আমি জিন-সম্রাটের কন্যা। তোমার সঙ্গেই আমার ভাগ্য বাঁধা হয়ে আছে। আমারই অলৌকিক ক্ষমতায় তীরখানা আমার দরজায় এনে রেখেছিলাম। জানি, তুমি ঐ তীরের সন্ধান করতে করতে আমার এখানে আসবেই। আমার হিসেব কিন্তু নির্ভুল। দ্যাখো, সত্যিই তুমি এলে। আমারই যাদুবলে বিশানগড়ে গালিচা, সিরাজে হাতীর দাঁতের চোঙা এবং সমরখন্দে ঐ আপেল সংগ্রহ করতে পেরেছিলে তোমরা।

তোমাদের বোন নূর অল-নাহারকে পাওয়ার জন্য তোমরা পাগল হয়েছিলে। তোমার বড় ভাই আলী তো মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে ফকির দরবেশ হয়ে গেল। এখন তুমি কি করবে ? ঐ তীরখানা বুকে গেঁথে আত্মহত্যা করবে কী ?

জিন-সম্রাট-কন্যা হাসতে হসেতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, দ্যাখো, আমার দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দ্যাখো, হুসেন। আমি কী তোমার ভগ্নীর চেয়ে কিছু কম সুন্দরী ? কী, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না ? তুমি যদি অমত না কর, আমি তোমাকে শাদী করতে চাই, হুসেন। করবে আমাকে শাদী ?

মেয়েটির এই অচমকা প্রশ্নের কী জবাব দেবে হুসেন ? সত্যিই সে তুলনা-বিহীন পরমাসুন্দরী। নূর অল-নাহার-এর রূপের খ্যাতি দেশ-জোড়া। কিন্তু এর কাছে তার রূপ ম্লান হয়ে যায়। হুসেন বললো, কিন্তু তোমার মা বাবার মত হবে কেন ? তুমি জিন-সম্রাট-নন্দিনী, আবার আমি মানব-সন্তান, এ শাদীতে সম্মত হবে কেন তারা ?

আবার সুন্দর করে হাসল মেয়েটি, ওসব নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। মা বাবা কেউ নয়। আমি নিজেই আমার মালিক। আমার ইচ্ছা

অনিচ্ছাই সব। এখন তোমার মত কী, তাই বল।

হুসেন বলে তোমাকে পেলে আমি ধন্য হবো।

মেয়েটি আবার হাসে, কেন, তোমার ভগ্নী নূরের জন্য মন খারাপ করবে না?

—না। সে এখন আমার জীবনে মৃত। আর তা ছাড়া রূপে গুণে কোনও দিক থেকে সে তোমার সমকক্ষ হতে পারে না। তুমি বিশ্বাস কর, তোমাকে পেলে আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মেয়েটি এবার হুসেনকে দুহাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আশ্লেষে চুম্বন করে।

—এই আমাদের শাদী হয়ে গেল। এখন থেকে তুমি আমার স্বামী, আর আমি তোমার সহধর্মিণী। আচ্ছা, চল, এবার পাশের ঘরে যাই। খানা-পিনা সাজিয়েছে ওরা, খেয়ে দেয়ে শুতে যাবো আমরা।

পাশের ঘরটায় হাজারো রকমের খাবার-দাবার সাজানো ছিল টেবিলে। দুজনে পরিতৃপ্তি করে আহার পর্ব শেষ করে পাশের আর একখানা ঘরে এল। জিন-কন্যার শোবার ঘর। এমন সুন্দর করে সাজানো-গোছানো স্বপ্নপুরীর মতো বাসরঘর হুসেন কল্পনাও করতে পারেনি এর আগে।

সাকী মদ ঢেলে দিল সোনার পেয়ালায়। একটা পেয়ালা তুলে হুসেনের ঠোঁটে ধরলো জিনিয়াহ। বললো, চুমুক দাও।

হুসেনের সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। এমন অনাস্বাদিত আনন্দ সে এই প্রথম অনুভব করলো।

সুখের সায়রে ভাসতে ভাসতে দুটো মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন হুসেন বললো, অনেক দিন প্রাসাদ ছেড়ে এসেছি। বাবা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার।

জিনিয়াহ বললো, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে বাঁচবো কি করে? না না, একটা দিন, একটা পলও তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারবো না আমি।

হুসেন জিনিয়াহকে আদর করে চুমু খেয়ে বললে, আমি চিরকালের জন্য তোমারই গোলাম হয়ে গেছি সোনা। আমিই কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো? শুধু বাবার সঙ্গে একবার দেখা করেই আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে। কিন্তু তুমি না বললে তো আমি যেতে পারবো না।

জিনিয়াহ বললো, বেশ, মাত্র তিন দিনের জন্য তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি। আমার সশস্ত্র প্রহরীরা তোমার সঙ্গে যাবে। যদি কোনও বিপদ আপদ ঘটে, ওরা তোমাকে রক্ষা করবে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বারতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

আর একটা কথা, ভুলে কখনও তোমার বাবা বা অন্য কাউকে বল না, তুমি

একটি জিন-কন্যাকে শাদী করেছ। এবং আমার এই প্রাসাদের ঠিকানাও যেন তারা কেউ জানতে না পারে। শুধু তোমার বাবাকে বলবে, ভাববার কোনও কারণই নাই, তুমি খুব সুখ-সম্ভোগের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছো।

জিনিয়াহ হুসেনের নিরাপত্তার জন্য কুড়িজন সশস্ত্র ঘোড়-সোয়ার সৈন্য সঙ্গে দিয়ে রওনা করে দিল।

বেশি দূরের পথ নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই হুসেন সদলবলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো। অনেকদিন পরে পুত্রকে ফিরে পেয়ে সুলতান আনন্দে কেঁদে ফেললেন। পুরবাসীরা উৎফুল্ল, কলমুখর হয়ে উঠলো। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাশ্রুনয়নে সুলতান বললেন, আবার যে তোকে ফিরে পাবো, ভাবতে পারিনি, বাবা। ভেবেছিলাম মনের দুঃখে তুই বুঝি আত্মঘাতী হয়েছিস।

হুসেন বললে, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা মিথ্যে না, আব্বাজান। ভালবাসার শেকড় তো এক পলকে উপড়ে ফেলা যায় না! নূরকে হারানোর দুঃখ কি সহজে ভোলা সম্ভব? যাক, সে এখন আমার বড় ভাই-এর বেগম, তার সম্বন্ধে কোনও কামনা বাসনা পোষণ করা পাপ। আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এই ক'মাসে নূরকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পেরেছি, বাবা।

সুলতান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কী করে পারলে বাবা?

হুসেন বলে, এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আব্বাজান, বলতে পারবো না। বারণ আছে। আর জেনে রাখুন, আমি খুব সুখে আছি। আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর বেশি কিছু আর আমার চাইবার নাই।

সুলতান বললেন, শুনে খুব সুখী হলাম বাবা। কোনও পিতাই তার সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই জানতে চায় না। আমি চাই, যে কটা দিন বাঁচি, তুমি আমার পাশেই থাক। কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে তুমি পারবে না।

হুসেন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, আব্বাজান। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনাকে দেখে যাব। আপনার যখন দেখতে ইচ্ছে হবে তক্ষুনি এসে যাব আমি।

সুলতান ম্লান হাসলেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি করে জানতে পারবে তুমি। কোথায় কত দূর দেশে থাক তুমি তার তো কোন ঠিকানা দিতে চাও না তুমি। প্রয়োজন হলে কী করেই বা খবর দেব তোমাকে?

হুসেন বলে, আমি কসম খেয়ে এসেছি, ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে পারছি না, আব্বাজান। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, প্রায়ই আমি এসে আপনাকে দেখে যাবো। মাসে অন্তত একবার আসবই।

তিন দিন তিন রাত্রি প্রাসাদে কাটানোর পর চতুর্থ দিনে খুব ভোরে আবার সেই সদলবলে প্রাসাদ ছেড়ে পাহাড় উপত্যকায় জিনিয়াহর কাছে ফিরে এল হুসেন। বলা বাহুল্য, তারই পথ চেয়ে বসেছিল জিনিয়াহ। হুসেনকে পেয়ে খুশির বন্যায় ভেসে গেল সে। হাসি নাচে গানে মুখর হয়ে উঠলো

জিনিয়াহর প্রাসাদ। অমন অমর্ত্যলোকের আনন্দ হুসেন জীবনে কখনও উপভোগ করেনি।

এই আনন্দধারায় একটি মাস কেটে গেল। হুসেন মনে করলো, বাবাকে সে কথা দিয়ে এসেছে মাসান্তে অন্তত একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। দলবল নিয়ে সে রওনা হলো সুলতানের প্রাসাদ অভিমুখে।

এদিকে এই মাসখানেকের মধ্যে সুলতানের পার্শ্বচররা নিয়ত তাঁর কানে কুমন্ত্রণা দিতে কসুর করেনি।

—শাহজাদা হুসেনের জাঁকজমকের বহরটা লক্ষ্য করেছেন জাঁহাপনা? যে সাজ-পোষাক সে পরে এসেছিল, তেমন মহামূল্য বস্তু সারা আরব দুনিয়ার কোনও সুলতান বাদশাহর প্রাসাদে নাই। আর তা ছাড়া, আপনি তার পরমারাধ্য পিতা। কোথায় অবস্থান করছে, ঠিকানা জানাতে সে অস্বীকার করলো কেন? মনে হচ্ছে এর পিছনে কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে।

আর একজন পারিষদ বললে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, জাঁহাপনা? শাহজাদার দেহরক্ষী ঐ সৈন্যগুলো কেমন ঝকঝকে থাকে! ওদের জমকালো পোশাক-আশাকে এতটুকু ধুলোবালি লাগেনি। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সদ্য সেজেগুজে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এ থেকে বুঝতে কি অসুবিধে হয় যে শাহজাদা আমাদের শহর থেকে খুব বেশি দূরে কোথাও থাকে না।

উজির ঘাড় নেড়ে সায় দিল এ কথায়, হুঁ, ঠিক, ঠিক বলেছ। এই শহরেরই আশেপাশে কোনও গোপন ডেরায় সে আস্তানা গেড়েছে। মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্য মহৎ নয়, জাঁহাপনা।

সুলতান ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কী, কী বলতে চাও তোমরা?

উজির বললো, শাহজাদার আড়ম্বর এবং ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, সে প্রাচুর্যের মধ্যে বেশ বাদশাহী মেজাজেই দিন কাটাচ্ছে। এবং এও পরিষ্কার, এ শহর থেকে সে খুব বেশি দূরেও থাকে না। আমার ধারণা গোপনে গোপনে সে শক্তি সঞ্চয় করছে। এবং এখন সে জাঁহাপনার একান্ত অনুরক্ত থাকলেও খুব শিগ্গিরই একদিন তার নিজের স্বরূপ দেখাতে দ্বিধা করবে না।

সুলতান টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে ওঠে,—খামোকা এসব কথার মানে কী?

উজির বিনীতভাবে বলে, অর্থ একটাই জাঁহাপনা। এবং তা অত্যন্ত স্বচ্ছ। সময় এবং সুযোগ বুঝে সে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

—অসম্ভব। আমার হুসেনকে আমি চিনি। এসব তোমাদের মনগড়া আশঙ্কা।

উজির বলে, আপনার কথাই সত্যি হোক, ধর্মাবতার, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যেন মিথ্যাই হয়। কিন্তু একটা কথা আপনি ভেবে দেখুন, জাঁহাপনা, শাহজাদি নুর অল-নাহার তার নয়নের মণি ছিল। আপনি তার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছেন। আপনার বিচার যত সুক্ষ্মই হোক, শাহজাদা হুসেন কিন্তু তা উদার চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। তা হলে সে ঐ ভাবে প্রাসাদ থেকে অন্তর্ধান হয়ে যেত না।

এই ক'মাস বাদে আবার সে ফিরে এসেছিল আপনার কাছে, তা কিন্তু শুধু পিতৃ-ভক্তি বা ভালোবাসার টানেই নয়, তার পিছনে অন্য একটা সুপরিকল্পিত গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

—গূঢ় উদ্দেশ্য ?

সুলতান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে উজিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

—হ্যাঁ, জাঁহাপনা, গভীর এক কূট উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছিল আপনার কাছে। তাকে দেখা মাত্রই আপনার কি মনে হয়নি, অন্তত অর্থবলে সে আপনার চেয়ে অনেক বলীয়ান ? তার সাজ-পোশাকে যে মহামূল্য মণিরত্নাদি বসানো ছিল তার কিমত আপনার সমগ্র সলতানিয়তের চাইতেও বেশি।

সুলতান গম্ভীরভাবে বললেন, দেখেছি। হ্যাঁ, সে কথা একশোবার ঠিক। কিন্তু তাতে আমি ঈর্ষান্বিত হব কেন। বরং এ তো আমার গৌরবের কথা।

উজির বলে, আপনি বড় উদার মহৎ সরল প্রাণ। কিন্তু হুকুমমত চালাতে গেলে বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে তার ঐশ্বর্য দেখাতে এসে-ছিল। এবং একথা তো আপনি মানেন, পয়সা যার হাতে পৃথিবী তার পায়ে।

সুলতান বললো, এ তো সবাই জানে। মানবো না কেন ?

উজির বলে, তাহলে বুঝুন, পয়সা দিয়ে সে শৌর্য বীর্য বিক্রম সবই কিনতে পারে। সুতরাং আজ না থাকলেও কালক্রমে সে আপনার চেয়ে অনেক বলশালীও হতে পারে। এবং তখন যদি সে আপনাকে মসনদ থেকে নামিয়ে কারারুদ্ধ করে তাতে কী অবাক হবেন ?

—না না না, সে কখনও হতে পারে না। হুসেন—আমার হুসেন কখনও অমন কাফের হতে পারে না উজির।

—কিন্তু জাঁহাপনা, এই-ই ইতিহাস। যুগে যুগে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে আসছে—

—না না। ওসব বলে আমার সব গোলমাল করে দিও না তোমরা। হুসেন কখনও অমনটি হতে পারবে না।

উজির কুর্নিশ জানিয়ে বলে, গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, সুলতান মহানুভব, আমরা অধম হীনমনা মানুষ, কী বলতে কী বলে আপনার দুঃখের কারণ হলাম—এজন্য গভীর অনুতপ্ত বোধ করছি।

সুলতান উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, জানি না, কী বিশ্বাস করা উচিত আর কী বিশ্বাস করা উচিত নয়। যাই হোক, তোমাদের এই পরামর্শের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আমি সজাগ থাকবো এ ব্যাপারে।

সুলতান সেদিনের মতো তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিদায় করে দিলেন।

শাহজাদা হুসেন সুলতানের কাছে এসে ভক্তিভরে প্রণামাদি জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলো, আব্বাজান, আপনার শরীর ভাল ছিল তো এক মাস ?

সুলতান ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই যেদিন থেকে ভাল আছিস শুনেছি, সেদিন থেকে আমি খুব ভাল আছি বাবা।

ছেলেকে কাছে পেয়ে তাঁর মনের সকল সংশয় অন্তর্হিত হয়ে গেল নিমেষে। হুসেনের অপাপ-বিদ্ধ মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, ওরা মিথ্যেই সন্দেহ করেছে, না না, শিশুর মতো সরল এই হুসেন কখনও নৃশংস নির্মম হতে পারে না। মিথ্যে, মিথ্যে ওদের সব সন্দেহ।

পরদিন সকালে কিন্তু সুলতান শহরের এক নামকরা যাদুকরী বৃদ্ধাকে ডেকে এনে বললেন, দেখ বুড়ি, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। লোকে বলছে, আমার ছেলে হুসেন নাকি এই শহরের আশেপাশে কোনও গোপন ডেরায় বাস করে। সে তার ঠিকানা বলেনি আমাকে। তোমাকে এই কাজটি গোপনে করে দিতে হবে। কাল সকালে হুসেন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে। তুমি ঐ সময় তাকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যাবে।

বুড়ি বললো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা, সব নাড়ি নক্ষত্র আমি জেনে এসে বলবো আপনাকে।

মাসখানেক বাদে হুসেন আবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে জিনিয়াহর প্রাসাদ ছেড়ে সদলবলে বেরিয়ে পড়লো। একটু এগোতেই দেখতে পেল এক অশীতিপর বৃদ্ধা জরাগ্রস্ত রুগীর মতো এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। হুসেন এগিয়ে এসে ডাকলো, কে গো, এখানে শুয়ে কে ?

—আমি মালিক, আমি এক অথর্ব, জ্বরে ব্যথায় আর চলতে না পেরে এখানেই পড়ে আছি কাল থেকে।

হুসেন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে তুমি ?

যাবো তো শহরে। কিন্তু আমার যা শরীরের হাল, তাতে এক পা চলার সাধ্যি নাই। উঃ বাবাগো, ম'লাম!

হুসেন রক্ষীদের বললো, বুড়িকে প্রাসাদে নিয়ে চল। মনে হচ্ছে, কঠিন অসুখ করেছে। দাওয়াই পত্র না খেলে হয়তো আর বাঁচবে না।

দুজন রক্ষী বুড়িকে তুলে ধরাধরি করে পাহাড়-প্রাসাদে নিয়ে আসে। হুসেনকে ফিরে আসতে দেখে জিনিয়াহ ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, ফিরে এলে যে ?

হুসেন বলে, এই বৃদ্ধা পাহাড়ের নিচে একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর শুয়ে কাতরাচ্ছিল, মনে হচ্ছে ভারি অসুখ করেছে। ওকে একটু সেবা যত্ন করে সুস্থ করতে হবে।

বৃদ্ধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল জিনিয়াহ। তারপর হুসেনকে উদ্দেশ করে বললো, তোমার দয়ার শরীর, অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখলে তুমি আর ঠিক থাকতে পার না। যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, ওর কোনও রকম অযত্ন হবে না। মনে রেখো আমার নিজের অসুখ করলে যে ভাবে সেবা যত্ন হতো, তার চেয়ে কিছু কম করা হবে না ওর জন্য। তবে শোন, কে এই বৃদ্ধা, কী কী তার পরিচয়, কী উদ্দেশ্যেই বা ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং কেই বা পাঠিয়েছে, সব আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে চক্রান্তই

হোক, আমার ওপর ভরসা রেখ, কেউ তোমার এক কণা অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি মন্ত্রবলে আগে থেকেই সব জানতে পারি। কার কি মনের অভিসন্ধি সব আমি জানি। সে জন্যে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আমার পাকা করা আছে। তুমি নির্ভয়ে বাবাকে দেখতে যাও। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।

যাদুকরী বুড়িকে একটা পালংকে শুইয়ে দিল জিনিয়াহর সহচরীরা। একজন এক গেলাস জল এনে বুড়ির সামনে ধরে বললো, এই পানিটুকু খেয়ে নাও তো, সব বিমার এখুনি সেরে যাবে। সিংহ-ঝরনার পানি। এ পানি খেলে সব রোগ সেরে যায়।

বুড়ি জলটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে শুয়ে রইলো। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে অবাক হয়ে বললো, বাঃ চমৎকার দাওয়াই তো। শরীরটা একেবারে ঝরঝরে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। নিজে নিজেই সে পালঙ্ক ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো। পরিচারিকাদের বললো, তোমাদের মালকিনের কাছে নিয়ে চল আমাকে, তাকে আমার সুক্রিয়া জানাবো।

একটার পর একটা নয়ন-মনোহর কক্ষ পেরিয়ে সে এক বিশাল মহলে এসে দাঁড়ালো। দরবার মহল। ঠিক মাঝখানে এক সোনার সিংহাসনে বসেছিল জিনিয়াহ। বুড়ি আভূমি অবনত হয়ে কুর্নিশ জানালো জিনিয়াহকে।

—আপনার কৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি।

জিনিয়াহ বললো, আপনার যতদিন খুশি এ প্রাসাদে অবস্থান করুন। আমার মেয়েরা আপনার সেবা যত্ন করবে।

বুড়ি বললো, না মালকিন, আমি বেশ সেরে গেছি, এখন আমার ঘরে ফিরে যেতে চাই।

জিনিয়াহ বললো, বেশ আপনার যা অভিরুচি।

প্রাসাদের সবগুলি কক্ষের জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। এত ঐশ্বর্য কোথা হতে এল এখানে?

শহরে ফিরে এসে সুলতানকে সবিস্তারে সব জানালো সে। উজির আমিররা বললো, জাঁহাপনা, আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা তো মিথ্যে নয়! আপনি আর সাপ নিয়ে খেলবেন না। এবার শাহজাদাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন। না হলে সেই আপনাকে কারারুদ্ধ করবে।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি হুসেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুসেন এসে দাঁড়ালো। সুলতান বললেন, বেটা তোমার গরীব বাবার চেয়ে তুমি বিত্তে এবং বীর্যে অনেক বেশি বড় হয়েছ, এ আমার গর্বের কথা। আমি তোমার কাছে সামান্য একটা জিনিস উপহার চাইছি। লড়াই ক্ষেত্রে বাস করার মতো ভালো তাঁবু নাই আমার। তুমি যদি আমাকে একটা তাঁবু এনে দাও খুব খুশি হবো।

হুসেন বললো, এ এমন বেশি কি কথা আব্বাজান, আমি আজই এনে দিচ্ছি।

জিনিয়াহর প্রাসাদে ফিরে এসে হুসেন স্ত্রীকে বললো, বাবা আমার কাছে একটা তাঁবু চেয়েছেন।

জিনিয়াহ শুনে অবাক হলো, সে কি, এত বস্তু থাকতে সামান্য একটা তাঁবু চাইলেন তিনি? যাই হোক, এক্ষুনি আমি ভাঁড়ার থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।

খাজাঞ্চীকে ডেকে সে হুকুম করলো, সাইবাহকে বল, সে যেন একটা বিরাট বড় দেখে তাঁবু নিয়ে আসে এখানে। তাবুটা যেন খুব বড় হয়, যাতে গোটা একটা সেনাবাহিনী ঘুমোতে পারে।

একটু পরে সাইবাহ এসে হাজির হলো। লোকটার চেহারা বড় অদ্ভুত। লম্বায় সে বড় জোর এক হাত; কিন্তু লোকটার গোঁফজোড়া ইয়া বড়—তার দেহের চেয়েও বিরাট। তার এক কাঁধে একখানা গদা সদৃশ লোহার ডাণ্ডা। অন্য কাঁধে গুটানো একখানা তাঁবু। খুব ছোট্ট একটা পুটলির মতো।

জিনিয়াহ ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললো, এইটুকু একটা তাঁবু এনেছ? আমি তো বলেছিলাম অনেক বড় দেখে আনতে।

সাইবাহ কুর্নিশ জানিয়ে সবিনয়ে বললো, জী, বহুত বড়ই এনেছি।

এই বলে সে তাঁবুখানার ভাঁজ খুলে দেখালো, গোটা একটা সৈন্যবাহিনী দিব্যি শুয়ে বসে কাটাতে পারে তার ভিতর।

জিনিয়াহ খুশি হয়ে বললো, বাঃ বেশ এনেছ! এখন ওটা নিয়ে তুমি আমার স্বামীর সংগে তার বাবার প্রাসাদে যাও। সুলতানকে ভেট দিয়ে এস।

সাইবাহ বললো, জো হুকুম, মালকিন।

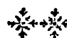
রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো চৌদ্দতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে:

সাইবাহকে সংগে নিয়ে হুসেন সুলতানের দরবারকক্ষে প্রবেশ করে। সুলতান তখন উজির আমির পরিবৃত হয়ে মসনদে আসীন ছিলেন। হুসেন বললো, আপনার তাঁবু এনেছি জাঁহাপনা, আপনি মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।

সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে হুসেনকে কাছে ডেকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আমার বয়স হয়েছে বাবা, এখন আমি মক্কায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান করবো। এখন থেকে তোমাকেই আমি সুলতান করলাম। তুমি আদর্শ শাসক হয়ে প্রজা পালন কর।

সেইদিন থেকে হুসেন সুলতান হয়ে দেশ শাসন করতে লাগলো।

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে :

খলিফা হারুন অল রসিদের পৌত্র অল মুতাবাকিল তস্য পৌত্র মুতাসিব বিল্লাহ অতিশয় বিনয়ী নম্র এবং প্রিয়দর্শন সুলতান ছিলেন। রূপে গুণে শৌর্যে কি বীর্যে বিক্রমে তার তুল্য নরপতি বড় একটা দেখা যায় না। কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া।

তাঁর দরবারে আটজন পরশ্রীকাতর উজির ছিল। তারাই হুকুমতের কাজকর্ম দেখাশোনা করতো। তাঁর সুবিশাল সলতানিয়ত বিস্তৃত ছিল একদিকে শ্যাম মরুভূমি সীমা থেকে শুরু করে মুর অধ্যুষিত অঞ্চল এবং অন্যদিকে খুরাসন পর্বতমালা থেকে ভারত ও আফগানিস্তানের পশ্চিম সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত।

খলিফা মুসতাবিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল আহমদ ইবন হামদুন। একদিন দুটি যুটি প্রাসাদ উদ্যানের এক শ্বেত পাথর নির্মিত চবুতরার উপর বসে সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়েছিল। বয়সে দুজনে নবীন নওজোয়ান। চোখে ওদের নানারকম রঙিন স্বপ্ন। কল্পনার ডানায় ভর করে দূর দিগন্তে ভেসে চলে ওরা। একজন বলে, আমরা যদি পাখিদের মতো সত্যই ওই নীল নভমণ্ডলে উড়ে বেড়াতে পারতাম। তা হলে কি ভালই না হতো বলো? অন্যজন বলে, দেখ, দুনিয়ার মানুষ কত কাজে সদা ব্যস্ত। এই যে প্রকৃতির অপরূপ শোভা—এদিকে নজর দেবার ফুরসুতই নাই কারো। তা না হলে এমন সুন্দর কুসুম সুরভিত বাগিচার ধারে কাছে একটি মানুষও পা বাড়ায় না! কাজ—শুধু কাজ জীবনে সব। জীবনকে মধুর করে তুলতে হলে খাওয়া পরা ছাড়াও তো আরও অনেক কিছু চাই বন্ধু।

মুসতাবিদ আর হামদুন বণিকের ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে ঐ বাগানের মধ্যে তরুণদ্বয়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের এইসব কথাবার্তা শুনছিলেন। মুসতাবিদ অবাক হয়ে ভাবলেন, এত অল্প বয়সে এরা এত সুন্দর সুন্দর ভাব-দর্শনের কথা সব বলতে পারছে কি করে? আমি দেশের সুলতান খলিফা, লোকে আমাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে জানে, কিন্তু এই শেষ বয়সেও এসব দর্শনের ভাবনা তো আমাকে কখনও আন্দোলিত করেনি। মুসতাবিদ বুঝতে পারে না কে এই তরুণ দুটি। এমন সুন্দর উদ্যান - তার সংলগ্ন প্রাসাদোপম বাড়ি! হামদুনকে তিনি বললেন, দোস্ত আমারই শহরে এই সুরম্য অট্টালিকা, নয়ন-মনোহর এই বাগিচা—এর মালিক কে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু জান?

হামদুন বলে, না, আমিও কিছু বলতে পারবো না ধর্মাবতার, তবে ছেলে দুটিকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে।

হামদুন এগিয়ে গিয়ে ছেলে দুটির সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আমরা পরদেশী বণিক। তোমাদের মালিককে একবার খবর দাও, আজ রাতে আমরা তার

মেহেমান হতে ইচ্ছুক।

ছেলে দুটি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বললো, মেহেরবানী করে যদি আমাদের সঙ্গে আসেন আপনারা।

ছেলে দুটিকে অনুসরণ করে খলিফা ও হামদুন প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। একটি সুসজ্জিত বিরাট কক্ষ। দুনিয়ার সেরা সেরা জিনিসপত্রে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো-গোছানো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহস্বামী এসে অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। সাজে-পোশাকে আদব-কায়দায় চেহারা-চরিত্রে বিশেষ একটা খানদানি ছাপ সুস্পষ্ট। ঘরে ঢুকেই সে সালাম সাবুদ জানিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বাদশাহী কেতায় বললো, অনেক পুণ্যের ফলে আজ আপনাদের দর্শন পেলাম জনাব। আপনাদের পদধূলিতে এ গরীবখানা তীর্থভূমি হয়ে গেল। এখন হুকুম করুন মালিক, কি ভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি।

ঘরের এক পাশের সারা দেওয়াল জুড়ে একখানা স্ফটিকের আয়না। আর সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলবাগিচার প্রায় পুরো দৃশ্য। বাগিচার ঠিক মাঝখানে একটি নিরন্তর নির্ঝর ঝর্ণা ঝরে পড়ছে। মুসতাবিদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন সেই অপরূপ শোভা। মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যেন একটি ফুলের বাগান আর একটি ঝর্ণা অনর্গল জলধারা সিঞ্চন করে চলেছে। মন-প্রাণ এক অপূর্ব পুলকে নেচে উঠতে চায়। খলিফা মনে মনে তারিফ করে, গৃহস্বামীর বাহারী রুচি আছে বলতে হয়। অর্থ অবশ্যই ব্যয়িত হয়েছে, কিন্তু শুধু পয়সা খরচ করলেই এ বস্তু বানানো যায় না। তার জন্যে চাই সূক্ষ্ম রুচিবোধ। মুসতাবিদ ভাবেন, আমি তো সুলতান, ইচ্ছা করলেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারি কিন্তু এমন সুন্দর পরিকল্পনা তো আমার মাথায় আসেনি কখনও।

বাগিচায় নানা রঙের নানা সুবাসের কত রকমের কুসুম। কেউ বা সব দল মেলে ধরেছে। কেউ বা আধো আধো লজ্জায় ফুটিফুটি করেও ফুটে শেষ হতে পারছে না। আবার কতকগুলো নেহাতই কলি-কুঁড়ি।

এ ছাড়াও আরও চারটি প্রস্ফুটিত কুসুম দল মেলে পাশাপাশি বিকশিত হয়ে আছে। তাদেরই অপরূপ শোভায় সুবাসে সারা বাগিচায় খুশির বান ডেকেছে।

এরা চারজনেই রূপসী যুবতী। সে রূপের বর্ণনা এখানে বাহুল্য। শুধু মনে মনে কল্পনা করে নিন, জাঁহাপনা, ওরাও চারটি সদ্য ফোটা ফুল।

গৃহস্বামী নিজের পরিচয় দেয়, আমার নাম আবু অল হাসান আলী ইবন আহমদ, খুরাসনে আমাদের আদি বাস।

খলিফা বললেন, এবার তাহলে আমার পরিচয় শোন, আমি স্বয়ং খলিফা মুসতাবিদ।

এই কথা শুনে গৃহস্বামী থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। আভূমি আনত হয়ে সে খলিফাকে কুর্ণিশ করলো।

—যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, যদি কোনও অসম্মান করে থাকি, শাহেনশাহ মহানুভব, গোলামের গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা।

খলিফা মৃদু হেসে বললেন, অমন সঙ্কুচিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। শুধু একটা কথা, তোমার গৃহের এই যে সব বৈভব এবং তোমার অঙ্গের এই যে সাজ-পোশাক দেখছি, এ সবই কিন্তু আমার ঠাকুর্দা মুতাবাকিল আলা আল্লাহর। ব্যাপারটা কি, খুলে বলতে পার আমাকে? এসব ছাড়াও কী তোমার কাছে আমার পূর্বপুরুষদের আরও অনেক ব্যবহার্য সংবাদপত্র আছে? এখানে এসব জিনিস দেখে আমি তাজ্জব বনে গেছি। যাই হোক, সমস্ত ঘটনাটা আমার জানা দরকার। আশা করি কোনও কিছু লুকো-ছাপা করবে না। তার পরিণাম ভাল হবে না।

খলিফার হুমকিতে গৃহস্বামী মৃদু হাসলো মাত্র।

—আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন, জাঁহাপনা। সত্য অন্তরের ভূষণ, বাইরের সজ্জাটার নাম আন্তরিকতা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে অবস্থান করুন, আমি আপনাকে সত্য ভাষণই শোনাব।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ষোলতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে:

একটা কুর্শিতে বসে আবু হাসান বলতে শুরু করলো: শুনুন, জাঁহাপনা, আমি কোনও শাহজাদা নই বা আমার পিতৃদেবও কোনও সুলতানের পুত্র ছিলেন না। কোনও ভাবেই আমার ধমনীতে শাহ-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সংঘটিত হয়েছিল, সেই বিচিত্র কাহিনীই বলছি। এই ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং আমার অঙ্গের সাজ-পোশাক দেখে আপনি স্বভাবতই সংশয়াচ্ছন্ন এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমার বলা শেষ হলে আপনার মনে আর কোনও খেদই অবশিষ্ট থাকবে না।

এরপর এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল আবু হাসান। হয়ত বা পুরোনো স্মৃতি মনে মনে একবার ঝালাই করে নিতে চাইলো।

যদিও আমির বাদশাহর বংশে জন্ম নয় তবু ধনে মানে আমার বাবাও কারো থেকে খাটো ছিলেন না। এক সময়ে এই বাগদাদ শহরে সম্ভ্রান্ত সওদাগর হিসাবে যথেষ্টই তার নাম ডাক ছিল। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু এই শহরের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব পারস্যের নানা দেশে তার বাণিজ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শহরের প্রায় প্রতিটি বাজারে আমার বাবার নানারকম কারবারের অনেকগুলো দোকান ছিল। কোনটা কাপড়ের, কোনটা ওষুধের, আবার কোনওটা বা পরদেশী মুসাফীরদের জন্য শখের সামানের। প্রত্যেকটি দোকানের দেখা-শোনার জন্য একটি করে সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন তিনি।

প্রত্যেক দোকানের পিছন দিকে একটি করে বিলাসকক্ষ নির্মাণ করেছিলেন বাবা। দুপুরের দাব-দাহে বাগদাদ যখন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে সেই সময় আমার বাবা সেই বিলাসকক্ষে সুশীতল পাখার বাতাসে আরামে নিদ্রা যেতেন।

আমি বাবার একমাত্র সন্তান—বড় আদরের ধন। সুতরাং কোনও ব্যাপারেই আমার ওপর কখনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেননি তিনি। আমার লেখাপড়া, খেলা-ধুলা, সাজ-পোশাক, আহার বিহার, কোনও বিষয়েই তাঁর কোনওরূপ কার্পণ্য ছিল না।

একদিন বৃদ্ধবয়সে বাবা দেহ রাখলেন। আমি তাঁর বিপুল বিত্তের একমাত্র মালিক হলাম। বাবাকে যা যা করতে দেখেছি, আমিও হুবহু তাঁরই পথ অনুসরণ করে যথাবিহিত দোকান-পাটের দেখা শোনা করে বহাল তবিয়তে দিন কাটাতে লাগলাম।

এই সময় আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা স্বভাবতই অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কিন্তু তাতে কি, আমার যা রোজগার তাতে ভালমন্দ খেয়ে-দেয়ে আর কত ফুরানো যায়!

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই অনেকবার বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছে কিন্তু আমি তাদের সে-সব প্রস্তাব সযত্নে পরিহার করে পাশ কাটিয়ে যেতে পেরেছি।

বন্ধুরা একে একে হতাশ হয়ে কেটে পড়লো। আমি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। কিন্তু তাতেও আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু কোনও মানুষের জীবনই সহজ-সরল পথে চিরকাল চলে না। তেমনি আমার জীবনেও একদিন জটিলতার সৃষ্টি হলো। চোদ্দ বছরের একটি মাত্র মেয়ে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

একদিন আমার এক দোকানে বসে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে লঘুরসের আলাপ-সালাপ করছি, এমন সময় একটি কিশোরী এসে দাঁড়ালো সেখানে। মেয়েটি জাতে জিপসী। নাচগান করে পয়সা রোজগার করাই তার পেশা। আমার সামনে লাস্যময়ী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বিলোল কটাক্ষ হানলো। বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, সেই মুহূর্তে আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। অমন সর্বনাশা যৌবনবতী মেয়ে আমি আর দেখিনি। ওর চোখে কি যাদু ছিল বলতে পারবো না। মুহূর্তেই আমি সম্মোহিত হয়ে গেলাম।

মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লো, এটা কি আবু অল হাসান সাহেবের দোকান?

কথাগুলো গান হয়ে আমার কানে বাজলো। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এটা আপনার বান্দারই দোকান।

মেয়েটি দোকানের ভিতরে এসে শাহজাদীর কেতায় একখানা কুর্শিতে উপবেশন করলো। সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি। মেয়েটি দ্বিধা-সঙ্কোচহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কোথায় সে?

আমি তখন উত্তেজনায় কাঁপছি, মুখ দিয়ে কথা সরতে চায় না। কোনও রকমে বলতে পারলাম, আমিই হাসান।

—ও, আচ্ছা আপনার লোককে বলুন সে যেন আমাকে তিনশো দিনার গুনে একটা থলেয় ভরে দেয়।

আমি যন্ত্রচালিতের মত আমার তহবিলদারকে বললাম, তিনশো দিনার ওজন করে এক তোড়ায় বেঁধে দাও।

আমার নির্দেশমতো তহবিলদার দিনারের তোড়াটা মেয়েটির সামনে রাখতেই সে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পলকের মধ্যে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

তহবিলদার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কার নামে খরচ লিখবো, মালিক ?

আমি তখনও তন্ময় হয়ে মেয়েটির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তারই কথা ভাবছিলাম, কর্মচারীর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম, এ্যাঁ। কার নামে লিখবে ? তা কার নামে লিখবে আমি কি করে বলবো ?

—কেন, ঐ কন্যাটির নাম জানেন না আপনি ?

—নাম ? না, না-তো।

—তবে ? তবে অতগুলো টাকা ওকে দিতে বললেন কেন, মালিক ?

আমি বললাম, ও যে চাইলো।

—বাঃ, এ কি কথা, চাইলো বলেই আপনি দিয়ে দেবেন ? দাঁড়ান আমি দেখছি।

এই বলে সে দোকান থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল মেয়েটির দিকে। কিন্তু একটুক্ষণ পরে একহাতে বাঁ চোখটা চেপে ধরে কাতরাতে কাতরাতে ফিরে এসে বললো, আমি মেয়েটির সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়াতেই ও আমার এই চোখের ওপর বেমক্কা একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। আমি চোখে আঁধার দেখে মাটিতে পড়েছিলাম, সেই ফাঁকে সে হাওয়া হয়ে গেল। উফ্, হাতের কী জোর! যেন কামারের হাতুড়ি। মনে হচ্ছে, চোখটা আমার খতম হয়ে গেছে।

পরদিন আবার এল সে। যথারীতি আবার শাহজাদীর মতো দোকানে ঢুকে একখানা কুর্শিতে বসে পড়ে বললো, গতকাল একটা ছোট্ট থলেয় কিছু দিনার দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি আপনি কাতর হয়ে পড়েছেন ?

আমি বললাম, না না, কে বললো আপনাকে ? মোটেই না। এ দোকান তো আপনারই জন্য। আপনাকে কিছু দিতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি, বলুন আর কি চাই ?

মেয়েটি সহজভাবেই বললো, তা'হলে আপনার লোককে বলুন, সে যেন আমাকে আজ পাঁচশো দিনার দেয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তহবিলদারকে নির্দেশ দিলাম। এবং স্বল্পক্ষণের মধ্যে সে পাঁচশো দিনারের থলেটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

সারাদিন রাত আমি অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলাম। এ কি জাদুকরীর পাল্লায় পড়লাম আমি। এভাবে চলতে থাকলে খুব শিগ্গিরই তো ফতুর হয়ে যাবো।

পরদিন সকালে বিষণ্ণ মনে দোকানে বসে মেয়েটির সম্মোহনের কথাই ভাবছি, এমন সময় আবার সে এসে বসলো আমার সামনে। এবার সে মুখে একটি কথাও উচ্চারণ করলো না! সামান্য একটু হাসলো মাত্র। তারপর চোখের ইশারা করে তাকে-রাখা একটা মখমলের বটুয়া চাইলো। আমিও নির্বোধের মতো মূল্যবান জড়োয়া অলংকার ভর্তি বটুয়া এনে তার হাতে তুলে দিলাম। একটি কথাও সে বললো না। বটুয়াটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো সতেরোতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

মুহূর্তে আমি আত্মস্থ হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ধাওয়া করলাম মেয়েটিকে।

মেয়েটিকে যখন দেখতে পেলাম তখন সে টাইগ্রিসের কূলে গিয়ে পৌঁচেছে। তার কাছে পৌঁছবার আগেই সে ঘাটে অপেক্ষমান ছোট্ট একখানা ডিঙিতে চেপে দাঁড় টানতে টানতে নদীর কিনার ছেড়ে দূরে চলে গেল। তীরে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে থাকলাম। ডিঙিখানা বেয়ে সে অন্য একটা ঘাটে ভিড়লো। সেই ঘাটের পাশে আপনার ঠাকুর্দার একখানা বিলাসমহল ছিল। মেয়েটি ডিঙি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লো সেই বাড়িটার ভিতরে।

ব্যাপারটা কি কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে চিন্তিত বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এসে আমার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। মা শিউরে উঠলেন, তুই ঠিক দেখেছিস বাবা, মেয়েটি খলিফার রঙমহলে গিয়ে ঢুকলো?

—ঠিক দেখবো না কেন মা?

—তা হলে বাবা, ওদিকে আর ভুলেও নজর দিসনি। সুলতান বাদশাহর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের থাকতে নাই। ওতে অনেক বিপদ বাড়ে। আমি দশ মাস পেটে ধরেছি, বুকে করে মানুষ করেছি, এই বুড়ো বয়সে তোকে হারাবার দুঃখ আমাকে দিসনি, বাবা। আমার কথা শোন।

আমি মাকে আদর করে বললাম, বৃথা আশঙ্কা করো না, মা। আমার নসীবে যা লেখা আছে তা কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। যা ঘটার ঘটবেই। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

পরদিন সকালে স্যাকরাপট্টিতে আমার গহনার দোকানে বসে আছি, আমার সংগে দেখা করতে এল আমার দাওয়াখানার প্রধান কর্মচারী। বয়সে প্রবীণ, দক্ষ লোক, আমার বাবার খুব প্রিয়পাত্র ছিল সে। তোমাকে এমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন? তোমার পিতাজী চলে যাওয়ার পর অনেক ঝড় ঝঞ্ঝাই গেছে কিন্তু তোমাকে তো এমনটা কখনও দেখিনি।

আমি বললাম, না চাচা শরীর আমার ভালই আছে, তবে দু-একটা ঘটনায় একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি।

—কি রকম?

—দু-তিন দিন হলো একটা ছোট্ট মেয়ে আমাকে বড় বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

এর পর পর কয়দিনের সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম।

—হুঁ, চিন্তাই বটে। যাক, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। এক দর্জি'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সুলতানের দরবারের উজির আমিরদের সে পোশাক বানায়। তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব আমি। তুমি যদি তাকে কিছু কাজ-টাজ দাও তাহলে সে তোমার উপকারে আসতে পারে।

এরপর সে আমাকে ঐ দর্জি'র কাছে নিয়ে গেল। প্রথম আলাপেই বুঝলাম লোকটি বেশ সদাশয়। আমার কামিজের একটা পকেট ছিঁড়ে গিয়েছিল, ভাব জমাবার জন্যেই বললাম, জেবটা একটু ঠিক করে দিন তো।

তখুনি সে সুন্দর করে জামাটা রিপু করে দিল। আমি খুশি হওয়ার ছল করে দশটা দিনার গুঁজে দিলাম তার হাতে। লোকটা একটু বোকা-সোকা ধরনের। চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, ওটা আপনি রাখুন। আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে, শেখ।

দর্জি বললো, আপনার সাজ-পোশাক দেখে তো বনেদী বণিক-সওদাগর বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ব্যবহারটা আসলে তাদের মতো নয়, মালিক।

কথাটার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বললাম, মানে?

সে বললো, দশ দিরহামের কাজ না পেলে এক দিরহাম হাত দিয়ে গলে না কোনও সওদাগরের, আপনি ফালতু ফালতু দশটা দিনার খয়রাতি করে দিলেন আমাকে? এ তো আমির বাদশাহ ছাড়া আর কেউই দেয় না। অবশ্য আরও একজন দেয়, কিন্তু সাহেব, আপনি কি প্রেমে পড়েছেন সদ্য?

আমি লজ্জা পেলাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন, শেখ। প্রথম দর্শনেই আমি মূর্ছা গেছি।

দর্জি মুচকি হেসে বলে, খরগোশ, না হরিণী।

—সে হরিণ-নয়না।

—তা হলে তো পোয়া-বারো। হরিণী শিকারের ওস্তাদী আমার বহুৎ আচ্ছা-তরা জানা আছে, মালিক, ঘাবড়াবেন না কিছু। কি নাম তার?

—খোদা জানেন। আর চেষ্টা করলে আপনি জানতে পারবেন।

—ঠিক আছে, কোই বাত নাই, কি রকম দেখতে, বলুন।

আমার সাধ্যমতো তার রূপ-যৌবনের বর্ণনা দিলাম।

আমার কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, এ তো মুক্তাবানু! খলিফার জলসা-ঘরে বাঁশী বাজায়। আমার কাছে তো তার খুদে খোজা নফরটা হামেশাই আসে।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই একটা সুন্দর ফুটফুটে ছোকরা এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। ঝুলন্ত একটা ছোট্ট কামিজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটার কত দাম নেবে শেখ আলী? চটপট বল, আমার দাঁড়াবার সময় নাই, দেরি হলে আবার মুক্তাবানু বকুনি লাগাবে।

জামাটা খুলে নিয়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও, তোমাকে

উপহার দিলাম এটা। আমি দাম দিয়ে দেব।

ছেলেটি মিষ্টি করে হাসলো। হঠাৎ ওর হাসির ঝিলিক আর কটাক্ষ দেখে আমার মুন্তাবাকিলের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অদ্ভুত মিল তো। তফাতের মধ্যে সে মেয়ে আর এ ছেলে।

—নিশ্চয়ই আপনি খুরাসনের আবু অল হাসান ইবন আহমদ।

ছেলেটি আমাকে চিনলো কি করে? অবাক হলাম। এবং প্রীত হলাম ছেলেটির ওপর। আমার হাতের একটা আংটি খুলে পরিয়ে দিলাম ওর আঙগুলে।

—তুমি তো ঠিকই চিনেছ, খোকা। কিন্তু কে তোমাকে বললো আমার নাম, কার কাছ থেকে শুনেছ?

—বাঃ, চিনবো না কেন, আমার মালকিন তো সারা দিন-রাতে হাজার বার আপনার কথা বলে। তার মুখ থেকে আপনার চেহারা চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনা শুনে শুনে আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি কি কচি খোকাটি আছি নাকি এখনও, বুঝতে পারি না, সে আবু অল হাসান আলীকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে? তবে মালিক, আপনিও যদি আমার মালকিনকে ভালবেসে থাকেন তবে খোদা কসম, আমার দিক থেকে যা করা দরকার তা আমি করবো।

আমি ওকে বললাম, তোমার মালকিনকে দেখার পর থেকে আমি ভালোবাসার আগুনে জ্বলছি। জানি না, তাকে না পেলে আমি জানে বাঁচবো কিনা।

ছেলেটি বললো, তা হলে ঠিক আছে, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো আঠারোতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

কিছুক্ষণ বাদে ছেলেটি ফিরে এল। তার হাতে একটা মোড়ক। বললো, এর মধ্যে খলিফা মুতাবাকিল আলা আল্লাহর সান্ধ্য পোশাক আছে। আর আছে এক শিশি আতর। খলিফা ঐ রঙমহলে আসেন এই পোশাক পরে। রঙমহলের দোরগড়ায় এই আতর ঢেলে দিলেই দরজা খুলে যায়। আপনি আজ সন্ধ্যায় সেজে-গুজে আসুন, তারপর যা যা করতে হয় আমি করবো।

ছেলেটি আর দাঁড়ালো না। মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে চলে গেল।

আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতার আকর্ষণও এড়াতে পারলাম না।

সন্ধ্যার পর সেজে-গুজে রঙমহলে চলে এলাম। জলসাঘর ছাড়িয়ে ওদিকে অন্দরমহল—হারেম। দুরু দুরু কম্পিত বুকে পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

হারেমের রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আতর ঢেলে দিলাম চৌকাঠে। সঙ্গে

সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না, এই সংশয়ে দুলছি, এমন সময় মচমচ পায়ের শব্দে চমকে পিছনে তাকিয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল। সর্বনাশ, স্বয়ং খলিফা মুতাবাকিল আলা আল্লাহ। তার দুইপাশে জনাকয়েক তাগড়াই দেহরক্ষী। তাদের সকলের হাতেই চিরাগ-বাতি। কি করবো, কি করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। পালাবারও পথ নাই। পিছনে সদলবলে সুলতান এগিয়ে আসছেন। সামনে হারেমের মহল। উপায়ান্তর না দেখে হারেমের ভিতরেই ঢুকে পড়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগলাম। এ ঘর ছেড়ে ও ঘর ছেড়ে অন্য এক ঘর। কিন্তু কোথায় লুকাবো কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

অবশেষে আর একটা ঘরে ঢুকে পড়লাম। একটি প্রায় বিবস্ত্রা পরমা-সুন্দরী মেয়ে আমাকে আচমকা দেখে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে পালঙ্কের শয্যায় নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি কি করবো কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। মেয়েটি মৃদু কন্ঠে বললো, আপনি তো আবু অল হাসান আলী। মুক্তাবানু আমার বোন, আপনি বসুন, কোনও ভয় নাই। এ ঘরে কেউ আসবে না। আমার বোন আপনাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু আপনার মনোভাব এখনও তার অজানা।

আমি বললাম, আমাকে বিশ্বাস করুন, এখন আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান আপনার ভগ্নী। সে ছাড়া আমি আর অন্য কোনও মেয়েকে ভাবতে পারি না।

মেয়েটি হাতে তুড়ি বাজাতেই সেই ছোট্ট ছেলেটি এসে দাঁড়ালো।

—শোন্, এখানে মুক্তাবানুকে নিয়ে আয়, বল্ পিস্তাবানু ডাকছে। যা, জলদি ডেকে নিয়ে আয়।

একটুক্ষণ পরে নীলরঙের রেশমী বোরখা পরে একটি মেয়ে এল। রাতের অস্পষ্ট আলোতেও বুঝতে অসুবিধে হলো না—সে এসেছে। আপনাকে বোঝাতে পারবো না তখন আমার কি অবস্থা। ভয়-উত্তেজনা মিশ্রিত সে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ। মুখে কোনও কথা বলতে পারলাম না। সেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো আমার সামনে। কোনও কথা বললো না। তারপর একসময় আমার বাহুর আকর্ষণে অথবা তারই স্বেচ্ছা-সম্পর্কে, দেখলাম সে আমার বুকের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে ওর অধরে এঁকে দিলাম গভীর একটি চুম্বন। ওঃ, সে কি মধুর, কি করে বোঝাই আপনাকে। মনে হলো শতবর্ষ পরমায়ু বেড়ে গেল আমার।

জানি না ঐভাবে একাত্ম হয়ে কতক্ষণ আমরা ছিলাম সেখানে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো উনিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আমরা যখন প্রেমালাপে মত্ত সেই সময় খলিফার আগমন সংবাদ পেয়ে আমি ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম। খলিফা আজ

ঠিক করেছেন পিস্তাবানুর ঘরে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে একটা বিরাট বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে ফেললো।

আমি বাক্সের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুনলাম, আপনার নানাজী বলছেন, এই যে মুক্তাবানু, তুমি যে এ সময়ে তোমার দিদির ঘরে? কই তোমাকে তো এ কদিন রঙমহলে দেখিনি! কোথায় গিয়েছিলে? সারা মহল তোমার গুঞ্জরণে মুখর হয়ে থাকে। অথচ ক'দিন একটা কলিও শুনিনি। যাক, আজ যখন সামনে পেয়েই গেছি, আমাকে একটা গান শোনাও, দেখি।

মুক্তাবানু জানতো, সুলতান তার বোন পিস্তাবানুকেই ভালবাসেন। মুক্তার কাছে তিনি শুধু গান শুনতেই ভালবাসেন।

মুক্তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন খলিফা। তারিফ করে বললেন, সত্যিই, কি গানে কি বাজনায় তোমার জুড়ি নাই, মুক্তো। আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে আমি ইনাম দিতে চাই, বল তুমি কি চাও? যা চাইবে তাই দেব, এমন কি আমার সলতানিয়তের অর্ধেকটাও চাইতে পার, দিয়ে দেব হাসিমুখে।

—খোদা ধর্মাবতারকে চিরজীবী করুন, আমার আর কোনও বাসনাই নাই জাঁহাপনা, আপনি আমাকে আর আমার বোন পিস্তাকে মেহেরবানী করে পায়ে ঠাঁই দেবেন, তা হলেই ধন্য হবো।

—সে তো ঠিক আছে। এ ছাড়া অন্য কিছু চাও—যা খুশি।

—জাঁহাপনার যদি এতই ইচ্ছা তবে বলছি, তিনি যেন আমাকে খালাস দিয়ে দেন। আর সেই সঙ্গে এই মহলের যাবতীয় পোশাক-আশাক আসবাবপত্র যা আছে সেগুলোও আমি নিতে চাই।

—তাই হলো, আজ থেকে এ সব তোমার। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যেতে পার। অথবা থাকতেও পার এখানে।

এরপর খলিফা আর সে-ঘরে অপেক্ষা করলেন না।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। পরদিন সকালে খোজাদের ডেকে রঙমহলের তামাম জিনিসপত্র সব এক এক করে বের করে নিয়ে এলাম আমার এই বাড়িতে। ঐ যে ওপাশে দেওয়ালের ধারে লম্বা বাক্সটা দেখছেন, ঐ কাঠের বাক্সটায় ওরা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল সেদিন।

সেইদিনই আমি মুক্তোকে শাদী করে আমার বিবি বানালাম।

এই হচ্ছে, জাঁহাপনা আমার কাহিনী। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার নানাজীর এই সমস্ত বাদশাহী আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম কি করে আমার ঘরে এল? আপনাকে যা বললাম, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়, খোদা কসম।

খলিফা মসতাবিদ বললেন, তোমার কথায় খুব প্রীত হয়েছি হাসান আলী। আমাকে এক-টুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম দাও। আমি তোমাকে কিছু উপহার দেব।

কাগজ কলম আনা হলে খলিফা হামদুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ফিরমানকে হুকুমনামা লিখে দাও, আজ থেকে হাসান আলী যতকাল জীবিত

থাকবে, তার সব কর মকুব করে দেওয়া হলো।

হামদুন লিখে খলিফার সামনে ধরতে তিনি দস্তখত করে দিলেন। এবং বললেন, এখন থেকে তুমি আমার দরবারের অন্যতম আমীর হলে হাসান আলী। এর ফলে প্রায় রোজই তোমার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটবে। দিনে দিনে আমরা আরও নিকট সৌহার্দ্যে পৌঁছতে পারবো।

সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আবু অল হাসান আলী আর খলিফার মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ ঘটেনি।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করলো। কিন্তু প্রভাত হতে তখনও দেরি ছিল। একটুক্ষণ পরে সে বললো, আর একটা কিসসা শুরু করছি, জাঁহাপনা। এবার সুলতান মামুদের কাহিনী শুনুন :

মিশরের জ্ঞানী-গুণী এবং বিচক্ষণ সুলতান হিসাবে সুলতান মামুদের নাম বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

বিশাল সলতানিয়ত এবং অপর্যাপ্ত ধন-গৌরবের মালিক হয়েও কিন্তু সুলতান বড় দুঃখী বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। প্রায় বেশির ভাগ সময়ই তিনি প্রাসাদের একান্ত নিরালা নিভৃত কক্ষে বিষাদ-বিষণ্ণ জীবন যাপন করতেন। আল্লাহ তাকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন, এবং দিয়েছিলেন ভোগ করার মতো সুন্দর সুস্থ স্বাস্থ্য যৌবন-দীপ্ত কামনা-বাসনা। তার শৌর্য বীর্য খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনও অভাব ছিল না। মিশর তখন দুনিয়ার সেরা শহর, তার প্রাকৃতিক শোভা নয়নাভিরাম। আর নারীসঙ্গ? তার তো কোনই অভাব ছিল না। নীলের জলের মতো সুন্দরী নারীর সমুদ্রে তিনি সাঁতার কেটে অবগাহন করতে পারতেন ইচ্ছা করলেই।

কিন্তু এসবই তাঁর কাছে তুচ্ছ বিষাদময় এবং সাহারা তুল্য ছিল। দরবারের কাজকর্ম শেষ হতে না হতে তিনি প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করতেন। তারপর সারা দিনে-রাতে তাঁর আর সাক্ষাৎ পেত না কেউ। অবশ্য কি যে তাঁর দুঃখ, কি যে তাঁর ব্যথা, সে কথা সারা দেশের একটি মানুষও জানতো না। সুলতান মামুদ নিজেই কি তা জানতেন?

একদিন তিনি নিজের নিভৃত কক্ষে বিষণ্ণ বদনে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর প্রধান উজীর এসে সভয়ে বললো, জাঁহাপনা, পশ্চিম সীমান্ত দেশ থেকে প্রবীণ প্রাজ্ঞ অলৌকিক গুণধর এক ব্যক্তি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য। শুনেছি তিনি নাকি আল্লাহর আশীর্বাদ-ধন্য এক ধন্বন্তরী হাকিম। কোনও কঠিন রোগই নাকি তাঁর কাছে দুরারোগ্য নয়। তাঁর দাওয়াই নাকি

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন তবে তাঁকে আপনার সামনে হাজির করতে পারি।

সুলতান মামুদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। উজির উৎফুল্ল হয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো কুড়িতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

প্রায় শতবর্ষের এক বৃদ্ধকে সংগে নিয়ে উজীর এসে দাঁড়ালো। চুল দাড়ি সব তুলোর মত শুভ্র। চোখ দুটি কোটরাগত, কিন্তু দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত।

বৃদ্ধ কুর্নিশ জানালো না। বিচিত্র এক কণ্ঠস্বরে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল করুন সুলতান মামুদ। আমার ভাই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমি তারই দোয়া বয়ে নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।

বৃদ্ধ সুলতানের হাতে ধরে তাকে একটা বন্ধ জানালার পাশে নিয়ে গেল। বললো, জানালাটা খুলে ফেল।

সুলতান মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানলাটা খুলে দিলেন।

বৃদ্ধ বললো, সামনে তাকিয়ে দেখ।

অদূরে একটা পাহাড়। তার মাথার ওপর থেকে একদল সৈন্য তরতর করে নিচে আসছে। দেখতে পেলেন সুলতান। সকলের হাতেই উন্মুক্ত তলোয়ার। তিনি বুঝতে পারলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ বিশাল সৈন্যদল তার শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ, আর বাঁচবার কোনও পথ নাই, আমার মৌউৎ এসে গেছে।

বৃদ্ধ ক্ষিপ্রহাতে জানালা রুদ্ধ করে দিলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার খুলে ফেললো। সুলতান দেখলেন সেনাবাহিনী অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাহাড়টা জনমানবশূন্য অনড় জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

এবার বৃদ্ধ ওঁকে আর একটা জানালার পাশে নিয়ে গেল। সে জানালা খুলতে দেখা যায় তার বিরাট শহরটা। বৃদ্ধের নির্দেশে তিনি জানালার কপাট খুলে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। শহরের চার শতাধিক মসজিদ, অসংখ্য প্রাসাদ ইমারত সব দাউ দাউ করে জ্বলছে। ধোঁয়ার কালো কুণ্ডলী গগনমণ্ডল ঢেকে ফেলেছে। দামাল হাওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা উল্কার বেগে প্রাসাদের দিকে তেড়ে আসছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড দাবদাহে তাঁর প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। হতাশায় শঙ্কায় ভেঙ্গে পড়লেন সুলতান। ভাবতে লাগলেন, তাঁর এমন সুন্দর শহর প্রাসাদ সব পুড়ে ছাই হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পাশের মরুভূমির সঙ্গে ওর আর কোনই ফারাক থাকবে না।

বৃদ্ধ জানালাটা বন্ধ করে আবার খুলে দিল। কি আশ্চর্য, সব আগুনের

শিখা কোথায় মিলিয়ে গেছে। শহরটা যেমন ছিল তেমনি আছে পূর্ববৎ।

বৃদ্ধ এবার টানতে টানতে তৃতীয় জানালার পাশে নিয়ে গেল সুলতানকে। এ জানালা খুললে নীল নদের মনোহর শোভা চোখে পড়ে।

জানালা খুলতে মামুদ শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ নদীর বাঁধ ভেঙে দুর্বার গতিতে জলস্রোত তেড়ে আসছে শহরের দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের তোড়ে তাঁর সুন্দর সাজানো শহরটা ভেসে যাবে। ঐ উত্তাল জলরাশি ঝাঁপিয়ে পড়লে শহরবাসীরা বাড়ির ছাদে উঠেও প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকায় থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি।

বৃদ্ধ জানালাটা ভেজিয়ে দিয়েই আবার খুলে ধরলেন, এই দ্যাখো, কিছু নাই। নদীর বাঁধ যেমনটি ছিল তেমনি অটুট আছে।

সুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ এবার তাঁকে চতুর্থ জানালাটির পাশে নিয়ে গিয়ে বলে, খোল।

সুলতান মামুদ পাল্লা খুলে ধরেন। তখন তিনি নতুন আশংকার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু জানালা খুলতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সামনে বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর। রাখাল বাঁশী বাজিয়ে পশুচারণে চলেছে। গাছে গাছে কত ফুল-ফলের সমারোহ। নির্মেঘ নীল আকাশে দল বেঁধে উড়ে চলেছে পাখীরা। মাথার ওপরের আকাশটা গোল হয়ে নিচে নেমে এসে দূর চক্রবালে মিশে গেছে।

সুলতান মামুদ ভাবতে পারেন না, তিনি জেগে, না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন? কিংবা এই বৃদ্ধ শেখ তাঁকে যাদু করেছে। নাকি তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

বৃদ্ধ এবারে তাঁকে পাশের ছোট্ট ফোয়ারাটার কাছে এনে দাঁড় করালো। বললো ঐ চৌবাচ্চাটার নিচে তাকিয়ে দেখ।

মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে তাকাতেই তিনি বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ তাঁকে চৌবাচ্চার জলে চেপে ধরেছে।

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলেন, বিরাট একটা সমুদ্রের পাশে একটা পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। নিচে একখানা জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। পাহাড়ের অন্য প্রান্তে কতকগুলো গুণ্ডাগোছের লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে খিক খিক করে হাসছে।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন সুলতান। বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তুমি একটা আস্ত শয়তান। আমাকে সমুদ্রে এনে জাহাজ ডুবি করে মজা দেখছ। তোমার শয়তানী আমি ঘুচিয়ে দেব। জান, আমি সুলতান মামুদ, ভাল চাও তো এখনও বলছি, ভাগো।

সুলতানের ক্রোধ এবং চিৎকারে লোকগুলো আরও মজা পেল। হো হো করে এক সঙ্গে হেসে উঠলো সকলে।

লোকগুলো কি ভীষণ দেখতে! হাসলে তার মুখমণ্ডল আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। হাঁ-গুলো সব এক একটা গুহার মতো। ওদের যে সর্দার, সে লোকটা এগিয়ে এসে সুলতানের মাথার মুকুট আর গায়ের কামিজ কুর্তা ছিনিয়ে নিয়ে

নিল। তারপর সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে নীল ডোরা-কাটা মোটা সুতীর একটা পোশাক পরিয়ে দিল তাকে। পায়ে পরতে দিল হলদে রঙের এক জোড়া বাজখাঁই চপ্পল। বললো, চল আমাদের দেশে নিয়ে যাব, সেখানে আমাদের মতো গায়ে গতরে খেটে খেতে হবে তোমাকে।

মামুদ আপত্তি জানিয়ে বলেন, কিন্তু আমি তো কাজ-কাম কিছু করতে পারি না।

ওদের একজন বললো, বেশ তো কাজ করতে না পার, গাধার মতো মোট বইবে। গাধা হতে তো আর কোনও বুদ্ধির দরকার হয় না।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো একুশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

লোকগুলো আসলে চোর-গুণ্ডা নয় কেউ। একদল খেটে-খাওয়া চাষী মানুষ। দিনের শেষে মাঠের কাজ-কাম শেষ করে তারা জাহাজ-ডুবি দেখতে এসেছিল।

চাষের হাল, কোদাল গাঁইতি প্রভৃতি নানারকম ভারি ভারি সাজ-সরঞ্জাম সব সুলতান মামুদের মাথায় চাপিয়ে দিল ওরা। বোঝার ভারে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছল ওদের আস্তানায়। ওরা ওকে শুকনো রুটি আর নুন লঙ্কা খেতে দিল। খিদের মুখে তাই বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে ফেললেন সুলতান।

পরদিন সকালে ওরা তাকে পুরোপুরি একটা গর্দভই বানিয়ে ফেললো। হাত দুখানা মাটিতে গেড়ে সোয়ার নেবার ঢংএ পিঠ পেতে দাঁড় করালো তাকে। জিন লাগম এনে চাপিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ওঠাতে লাগলো নানারকম যন্ত্রপাতি, বোঝা বোঁচকা। সুলতান আর নড়তে পারে না। কিন্তু কে যেন তার কান মলে দিয়ে বললো, 'ওহে বুড়ো খোকা, গতরটা এবার একটু নাড়াও। তোমার জন্যে তো আর আমরা এখানে বসে থাকবো না।' পাছার ওপরে সপাং করে কে যেন দু ঘা বসিয়ে দিল, কথা কানে যাচ্ছে না, বুঝি।

অগত্যা শরীরে না সইলেও মারের চোটে পা চলতে থাকলো।

এইভাবে দিনের পর দিন সুলতান মামুদকে দিয়ে মোট বওয়াতে লাগলো। দিনে-দিনে মাসে-মাসে বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

এখন আর তাকে ওরা মাঠে নিয়ে যায় না। কলুর ঘানিতে জুড়ে দিয়ে তেল তৈরি করে। দিন-রাত ধরে একই বৃত্তপথে তিনি নীরবে নিঃশব্দে ঘানি টেনে চলেন।

পাঁচ বছর পার হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ ঘানির জোয়াল ভেঙে পড়ে গেল। সেই মওকায় সুলতান সকলের অলক্ষ্যে ঘানিঘর থেকে বেরিয়ে গা ঢাকা দিয়ে কেটে পড়লেন।

চলতে চলতে অজানা অচেনা শহরে এসে উপনীত হলেন মামুদ। কেমন

ভয় ভয় করতে লাগলো তাঁর। পরদেশী মুসাফির দেখে এক দোকানের সদাশয় বৃদ্ধ মালিক ওঁকে তার বাসায় নিয়ে গেল সঙ্গে করে। বৃদ্ধ বললো, আমাদের শহর তোমার কেমন লাগলো, বেটা।

—খুব ভালো, বেশ চমৎকার সাজানো গোছানো।

বৃদ্ধ বলে, তোমার মতো নওজোয়ান ছেলেদের এখানে খুব কদর। থাকবে এখানে ?

আমার কোনও আপত্তি নাই। শুধু দয়া করে কাঁচা বীনগুলো খেতে দেবেন না। ওতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

—কাঁচা বীন ? সে কি! সে সব তো গাধা ঘোড়ার খাদ্য।

—বিশ্বাস করুন, পুরো পাঁচটা বছর আমাকে ঐ অখাদ্যই খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে।

বৃদ্ধ বলে, না না, তোমার জন্য নিত্য নানারকম মাংসের কাবাব কালিয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বীন কেন খেতে যাবে তুমি ? তোমার যা যা খেতে প্রাণ চাইবে তাই পাবে। আমাদের শহরে তোমার মতো জোয়ান ছেলেদের জন্য খানাপিনার অভাব নাই।

সুলতান মামুদ বললেন, ঠিক আছে, আমি এই শহরেই থাকবো। কী কাজ করতে হবে আমাকে।

কাল সকালে তোমাকে আমাদের শহরের হামাম বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দেব। ঐ হামামে যতগুলো মেয়ে ঢুকতে যাবে তাদের প্রত্যেককে একের পর এক প্রশ্ন করবে, 'তোমার কী শাদী হয়েছে ? প্রথম যে মেয়েটি বলবে না, আমি এখনও কুমারী, তারই স্বামী হয়ে যাবে তুমি। সেই মেয়ের সঙ্গেই তোমার ধর্মমতে শাদী হয়ে যাবে। এই হচ্ছে এ দেশের আইন। কিন্তু সাবধান, সতর্ক থেক, যতগুলো মেয়ে হামামে ঢুকতে যাবে পর পর সব মেয়েকে একই প্রশ্ন করবে। কাউকে বাদ দিতে পারবে না। প্রথম যে মেয়ে বলবে সে কুমারী সেই হবে তোমার স্ত্রী। ব্যস, তার পরে আর কোনও মেয়েকে কোনও প্রশ্ন করবে না। খেয়াল রেখ, পরপর যে মেয়েগুলো আসবে যতক্ষণ না কুমারী মেয়ের সন্ধান পাচ্ছ, কেউ যেন না বাদ পড়ে। তাহলে মহা বিপত্তি ঘটবে। এ-ও আমাদের দেশের আইনের এক কড়া অনুশাসন।

পরদিন সকালে সুলতানকে একটা হামামের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ দোকানে চলে গেল।

প্রথম মেয়েটি এক কিশোরী। বয়স বড়জোর তের হবে। বেশ সুন্দরী। সুলতানের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। মেয়েটিকে পেলে জীবন ভরে যাবে। এক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, মালকিন, আপনি কি কুমারী ?

—না। আমার শাদী হয়ে গেছে।

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব আসে। তারপর আর একটি কথা না বলে সে হন হন করে হামামে ঢুকে যায়।

পরের জন এক হত কুৎসিত-দর্শনা বৃদ্ধা। মামুদ শিউরে উঠলেন। কিন্তু উপায় নাই, প্রশ্ন করতেই হবে।

—আপনি কি বিবাহিতা ?

—হ্যাঁ।

যাক বাঁচা গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মামুদ।

বুড়িটা চলে যাওয়ার পর আর একজনের আবির্ভাব হলো। বিরাট দশাসই চেহারা। সারা অঙ্গ দামী সাজ-পোশাক আর জড়োয়া অলংকারে মোড়া এক মেদবহুল মুটকী। এর চেয়ে ঐ বুড়িটাও বুঝি দেখতে অনেক ভাল ছিল।

—আপনি কি বিবাহিতা ?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মামুদ। মেয়েটি আকর্ণ বিস্তৃত দন্তরাজি বিকশিত করে হেসে বললো, তুমি আমার চোখের মণি, তোমার পথ চেয়েই তো বয়সটা বিকেল হয়ে গেছে সোনা, সেই এলে, আর কটা বছর আগে আসতে পারলে না ? যাক, শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম, এই আমার ভাগ্য।

মেয়েটি মামুদের কাঁধে হাত রাখতে এগিয়ে আসে। কিন্তু মামুদ এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, আহা-হা, আমার গায়ে হাত দিও না, দেখছো না, আমি একটা গাধা। এই দেখ কলুর ঘানি টেনে টেনে কাঁধে আমার কড়া পড়ে গেছে। তুমি অমন খুবসুরৎ জেনানা, আমার মতো একটা গাধাকে শাদী করে জিন্দিগীটা বরবাদ করে দেবে কেন, চাচী ?

কিন্তু চাচী সে কথায় কর্ণপাত করলো না। হুমড়ি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জাপটে ধরলো মামুদকে। তারপর চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুললো সে।

মামুদ ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, আহা-হা, আস্তে-আস্তে, আমার ঠোঁট-ফোট ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল যে। বিশ্বাস কর, আসলে আমি মানুষের বাচ্চা নই, গাধা—কলুর ঘানি টানা একটা গাধা। এই দ্যাখো, আমার ঘাড়ে কি রকম জোয়ালের কড়া ? আঃ, ছাড় ছাড়, লাগছে—মরে যাবো যে—

প্রায় অমানুষিক জোর জোর করে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি ফোয়ারার চৌবাচ্চা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

সুলতান মামুদ অবাক হয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর নিজের প্রাসাদের মাঝখানে ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উজির আর হারেমের সুন্দরীরা। ওদের সকলের হাতে আতর, তেল, তোয়ালে, সাবান, শরবত ইত্যাদি। আর দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ ফকির।

বৃদ্ধ আশীর্বাদের ভংগী করে হাত তুলে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন, মামুদ। সব দুঃখ হতাশা কেটে যাবে তোমার মন থেকে।

এর পরই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ। কেউ আর তাকে দেখতে পেল না। আশ্চর্য!

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে শারিয়ারের দিকে তাকালো। সুলতান বলে, চমৎকার কিস্‌সা শাহরাজাদ। এ থেকে আমার অনেক শিক্ষা লাভ হলো।

শাহরাজাদ বললো, এরপর আর একটা কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

সে বলতে শুরু করে ঃ

আপনারা সবাই জানেন খলিফা হারুন অল রসিদের সদগুণের অবধি ছিল না। তাঁর মতো ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, উদার মহৎ নরপতি আর কেউই ছিল না। কিন্তু একটা জায়গায় তাঁর একটু খামতি ছিল। তাঁর মনে একটা বিষয়ে দারুণ অহমিকা ছিল। এবং প্রকাশ্যে সেকথা সবাইকে শোনাতেও তিনি কসুর করতেন না। তিনি বললেন, তাঁর মতো মুক্তহস্তে দান-ধ্যান করতে আর কেউই পারে না।

একদিন তিনি তাঁর নিজের কক্ষে অবসর-বিনোদন করছেন, এমন সময় প্রধান উজির জাফর এসে কুর্ণিশ জানালো তাঁকে। তারপর জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাতে থাকলো ঃ

ধর্মাবতার, আপনি আমাদের মাথার মণি, জগতের আলো। এই বান্দার গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা, আজ সে আপনার কাছে গলা চড়িয়ে দু-চারটে বাক্য শোনাবে।

একজন ধর্মবিশ্বাসীর প্রধান গুণ হবে সে আল্লাহর পায়ে নিজের কায়-মন-প্রাণ সমর্পণ করে দেবে। এবং সেই আত্ম-নিবেদনই রীতি-সম্মত গৌরব। দুনিয়ার যা কিছু বৈভব, এই যে প্রকৃতির অপরূপ দান, আর মানব আত্মার যে মহৎ উপাদান—এসবই সেই পরমপিতার অকৃপণ আশীর্বাদে সম্ভব হচ্ছে। এ জন্যে কোনও মানুষই আত্মম্ভরিতা করতে পারে না। তার যতটুকু বড়াই বা অহংকার—তার জন্য একমাত্র আল্লাহই দায়ী। একটি বৃক্ষ তার ফল-সম্ভারের জন্য অহঙ্কার করে? কিংবা সাগর কি বলে, দেখ দেখ, কি বিপুল জলরাশি আর রত্নমণির মালিক আমি? আকাশ কি কখনও অহঙ্কার করে বলে, আমার মতো উঁচু কি তোমরা কেউ হতে পার? না। সত্যিকারের যে বড়, মহৎ—সে কখনও বড়াই করে লোকের কাছে জাহির করে না। তাই বলছিলাম, ধর্মাবতার, আপনার বলতে যা কিছু আছে—সব পরার্থে বিলিয়ে দিন। দরিদ্র জনসাধারণ আল্লাহর পরম প্রিয়ভাজন। তাদের মধ্যে আপনার সম্পদ বিভক্ত হয়ে গেলে, তাঁর চরণে উৎসর্গীকৃত হবে, মনে করবেন।

আচ্ছা ধর্মাবতার, একটা কথা কি বান্দাকে বলবেন, এই যে বিশাল সলতানিয়ত বিপুল অর্থভাণ্ডার, আর অগণিত অট্টালিকা ইমারত প্রাসাদের যে বাহ্যাড়ম্বর, এ-সবের কি আপনি একাই মালিক? একাই সব করছেন, সেইজন্যই কি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এসব?

বসরাহ শহরে আবু অল কাসেম নামে এক বিরাট বিত্তশালী সওদাগর আছে। তার বিপুল ঐশ্বর্যের পরিমাপ সে নিজেও করতে পারে না। লোকে বলে তার বিত্ত-বৈভব যে-কোনও বড় সুলতান বাদশাহর চেয়েও বেশি। তবে শুধু এই কারণেই তার দেশজোড়া অত নাম-খ্যাতি হয়নি। তার মতো দরাজ

দিল এবং মুক্তহস্ত সারা আরব দুনিয়ায় কারো নাই। এমনকি স্বয়ং ধর্মাবতারও তার তুল্য দানশীল নন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজার গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো বাইশতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

জাফরের এবম্বিধ বক্তৃতা শুনতে শুনতে খলিফা হারুন অল রসিদের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠে।

—কুত্তাকা বাচ্চা। এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমার মুখের সামনে এই রকম বেয়াদপি করার দুঃসাহস কর! তুমি কি ভুলে গেছ, এই ধরনের মিথ্যাচার মানে অবধারিত মৃত্যু।

জাফর বলে, খোদা কসম, জাঁহাপনা, এক বর্ণও মিথ্যা বলিনি আমি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে বসরাহতে কাউকে পাঠিয়ে আপনি খবর নিন। আমি তার কথাই মেনে নেব। এর আগে আমি যখন একবার বসরাহতে গিয়েছিলাম তখন ঐ আবু কাসেমের বাড়িতেই অতিথি হয়ে উঠেছিলাম। যা বললাম, সে-সব আমার নিজের চোখে দেখা। অন্যের মুখের ঝাল খাইনি। তাকে জানার পর মুক্তকণ্ঠে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার মতো উদার এবং দানে মুক্তহস্ত মানুষ আজকের দুনিয়ায় আর দুটি নাই।

জাফরের কথায় খলিফা উত্তেজিত হয়ে প্রহরীকে হুকুম করলো, এই বেয়াদপকে গ্রেপ্তার কর।

প্রহরীরা জাফরকে হাতকড়া পরাবার জন্য এগিয়ে এল। খলিফা আর সেখানে থাকলেন না, ঘর ছেড়ে জুবেদার মহলের দিকে চলে গেলেন।

খলিফার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখে বেগম জুবেদা অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই কোনও খারাপ কিছু ঘটে গেছে।

খলিফা কোনও কথা না বলে গুম হয়ে বসে পড়লেন একটা আরাম-কেদারায়।

জুবেদা জানতেন এ অবস্থায় খলিফাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে নাই! এক গেলাস সুগন্ধি সরবৎ এনে খলিফার সামনে ধরলেন তিনি।

—নিন, খেয়ে নিন ধর্মাবতার। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। জীবনের দুটি রং আছে। একটি সফেদ সুন্দর, অন্যটি কালো, অন্ধকার। আপনাকে আমি সদা-সর্বদাই হাসি-খুশিই দেখতে চাই, জাঁহাপনা।

খলিফা বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু আজ আমার খুব খারাপ দিন, বেগম। ঐ বেতামিজ বারসাকী জাফর আমার মন মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। ওর এত বড় সাহস, আমার কাজের সমালোচনা করে?

বেগম জুবেদাকে তিনি সব কথা খুলে বললেন। জুবেদা বুঝতে পারলেন, জাফর বড় বেকায়দার কাজ করেছে। এর পরিণাম যে কি হতে পারে ভাবতে পারেন না তিনি। এ অবস্থায় খলিফাকে শান্ত করতে গেলে খোলাখুলি

জাফরকে সমর্থন করতে যাওয়া বিপদজনক। অথচ তাকে বাঁচাতে গেলে তার পক্ষ না নিলেও চলবে না। তাই তিনি কায়দা করে বললেন, বসরাহতে একটা দূত পাঠিয়ে খবরটা যাচাই করে নিলে কেমন হয়, জাঁহাপনা ? যতদিন না দূত ফিরে আসে ততদিন পর্যন্ত জাফরের সাজা দেওয়াটা না হয় মুলতুবিই রাখলেন। তবে এও জানি, সাজা সে এড়াতে পারবে না কোনও মতে।

জুবেদার কথায় খলিফা অনেকটা শান্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এ ব্যাপারে অন্য কোনও লোকজন পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। জাফর আমার দরবারের পুরোনো লোক। ওর বাবা, তার বাবা সকলেই আমাদের বংশের সেবা করে এসেছে। তাই এ ব্যাপারে অন্য কোনও লোকের ওপর তদন্ত করতে দিয়ে আমি স্বস্তি পাবো না। সুতরাং আমি নিজেই যাবো বসরাহয়। আবু কাসেমের সঙ্গে মোলাকাত করে নিজেই বিচার করবো। যদি বুঝি জাফর তার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেছে, রেহাই নাই, ওকে ফাঁসীতে ঝোলাবো।

জুবেদা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, একা যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু খলিফা সে-কথায় কর্ণপাত না করে তখুনি এক বণিকের ছদ্মবেশ ধরে বসরাহর পথে বেরিয়ে পড়লেন।

আল্লাহর দোয়ায় যথাসময়ে নিরাপদে বসরাহয় পেঁছে গেলেন তিনি। সেখানকার বড় সরাইখানায় একখানা ঘর ভাড়া করে উঠলেন। রাতে খানাপিনা সেরে নেবার আগে তাঁর ঘরের খানসামাকে জিজ্ঞেস করলেন খলিফা, আচ্ছা বাপু বলতে পার, এই শহরে নাকি আবু নামে একটি যুবক আছে। দান-ধ্যানের নাকি তুলনা হয় না ?

বৃদ্ধ খানসামা দুহাত কপালে তুলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে বললো, খোদা তাঁকে চিরজীবী করে রাখুন। সত্যি কথা বলতে কি, তার তুল্য মানুষ এ দুনিয়ায় দুটি নাই, জনাব। এই শহরে এমন একজনকেও পাবেন না যে তার নাম শুনে কপালে হাত না রাখবে। আমার যদি শতমুখ থাকতো তবে একসঙ্গে সব মুখ দিয়ে একই কথা বেরিয়ে আসতো, তার মতো মানুষ দুটি জম্মাবে না দেশে। তাঁর গুণগান করে আমরা নিজেরাই ধন্য হই। তাকে ধন্য করার স্পর্ধা কারো নাই।

পরদিন সকালে খলিফা সরাইখানা থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে থাকলেন। দোকানপাট তখনও খোলেনি, নানা পথ ধরে হেঁটে হেঁটে গোটা শহরটাকে দেখতে লাগলেন তিনি।

তারপর এক সময় বাজারে জনসমাগম হতে লাগলো। এক এক করে সব দোকানই খুলে গেল। এক দোকানের মালিককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এ শহরে আবু কাসেমের প্রাসাদটা কোন দিকে বলতে পারেন ?

দোকানী একটু কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। মনে হচ্ছে, আপনি পরদেশী। অনেক দূর দেশ থেকে আসছেন ? এখানে আবু কাসেমের প্রাসাদ একটা দুধের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে।

খলিফা স্বীকার করলেন তিনি বিদেশী। তখন দোকানী তার ছোকরা কর্মচারীকে সংগে দিয়ে বললো, এর সংগে যান, আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

আবু কাসেমের প্রাসাদটা দাঁড়িয়ে দেখার মতো বটে। দামী দামী নানা বর্ণের মার্বেল পাথরে আগাগোড়া প্রাসাদটা তৈরী। প্রাসাদ প্রাংগণে এক দঙ্গল খুদে পল্টন লড়াইএর মহড়া খেলায় মত্ত হয়েছিল। সুলতানের উপস্থিতিতে ওরা রণে ভংগ দিয়ে কাছে এগিয়ে এল। খলিফা বললেন, এ বাড়ির মালিকের সংগে মোলাকাত করতে এসেছি। একবার ডেকে দাও তাঁকে।

ছেলেদের একজন ছুটে ভিতরে ঢুকে গেল। এবং প্রায় তখুনি আবু কাসেম বাইরে বেরিয়ে এসে মুসাফির মেহেমানকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা মখমলের দিবানে বসালো। একটু পরে সাকীরা শরবৎ, খাবারের পেয়ালা পাত্র সাজিয়ে সোনার রেকাবীগুলো রাখলো তার সামনের মেজ-এ। বারটি চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দরী বাঁদী। সকলেই কুসুমাদপি পেলব-কোমল পঞ্চদশী।

খলিফা হারুণ অল রসিদ শরবতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তারিফ করলেন, বাঃ চমৎকার, এমন জিনিস তো আগে কখনও খাইনি?

এরপর নানা উপচারে আহারাদি সমাধা করলেন তিনি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন, প্রতিটি খাবারই বড় সুস্বাদু, মুখরোচক।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে গান-বাজনার আসর বসলো। খলিফা বুঝলেন আবু কাসেম সমঝদার মানুষ। প্রকৃত গুণী গাইয়ে বাজিয়েদের সে সংগ্রহ করে রেখেছে।

একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যার গান শুনে খলিফা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে যখন মনোনিবেশ করেছেন, সেই ফাঁকে আবু কাসেম অন্দরে চলে গেল। একটু পরে ছোট্ট একটা গাছ হাতে নিয়ে আবার ফিরে এল। গাছের গুঁড়িটা রুপোর, পাতাগুলো পান্নার, আর ফলগুলো সব পলার তৈরি। গাছটাকে সামনে বসিয়ে দিতে খলিফা দেখলেন গাছের মাথার উপরে একটা ময়ূর পেখম মেলে বসে আছে। ময়ূরটা সোনার। ময়ূরটার মাথায় মিশ-মিশে কালো রঙের একটা লাঠি দিয়ে মৃদু ঠোকা দিতেই সে পাখা দুটো ঝাপটাতে লাগলো, পুচ্ছটা উচ্চে তুলে নাচতে থাকলো। একটু পরে সে লাট্টুর মতো বন বন করে ঘুরতে আরম্ভ করলো। এত জোরে যে ময়ূরটাকে আর দেখা গেল না কিছুক্ষণ। সারা ঘর চন্দনের সুবাসে ভরপুর হয়ে উঠলো।

হারুণ অল রসিদ হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন সেই অবিশ্বাস্য আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ।

ইয়া আল্লাহ, এমন বস্তুও দুনিয়াতে থাকতে পারে। এ যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না?

আবু কাসেম ময়ূর-সুদ্ধ গাছটাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। খলিফা ভাবলেন, এ কি রকম ব্যবহার আবু কাসেমের? তার কি মনে হয়েছে ওর ঐ গাছ আর পাখীটা চেয়ে নেব আমি? তবে যে জাফর বড়াই করে বলেছিল, তার মতো

দাতা আর সারা দুনিয়ায় কেউ নাই ? আর যদি চাই-ই, তবে কি দিতে তার বুকে বাজবে ?

একটু পরে একটি ছোট্ট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল আবু কাসেম। একমাত্র সূর্যকিরণের সঙ্গেই ছেলেটির রূপের জেল্লার তুলনা চলে। সোনার জরির কাজ করা তার মূল্যবান সাজ-পোশাকে অসংখ্য বড় বড় মণিমুক্তো বসানো ছিল, ছেলেটির হাতে একটা পলার তৈরী পেয়ালা। সে পেয়ালাটি সোনালী মদে পরিপূর্ণ। প্রায় আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে মদের পেয়ালাটা খলিফার সামনে বাড়িয়ে ধরলো সে। ছেলেটির উপহার প্রসন্ন মনে হাত পেতে নিলেন তিনি। এবং এক চুমুকে সবটুকু সরাব নিঃশেষ করে শূন্য পেয়ালাটা ছেলেটির হাতে ফেরত দিতে গিয়েই থমকে গেলেন। একি। পেয়ালাটা সঙ্গে সঙ্গেই আবার পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এক চুমুকে মদটুকু খেয়ে নিয়ে আবার তিনি ফেরত দিতে যান, কিন্তু এবারও একই দৃশ্য। পেয়ালাটা পূর্ববৎ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। একি। এ যে ভুতুড়ে কান্ড !

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তেইশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

খলিফা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এ অদ্ভুত কান্ড কী করে সম্ভব হতে পারে।

আবু কাসেম বিনীত ভাবে বলে, সত্যিই, অবাক হওয়ার মতো কিছু নাই, মালিক। এক প্রবীণ দার্শনিক এটা বানিয়েছেন। দুনিয়ার মধ্যে সেরা পন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। এমন কোনও গুপ্তবিদ্যা ছিল না যা তাঁর অজানা।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খলিফা ক্রুদ্ধ হলেন, কি বেয়াদপ, আদব-কায়দার সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলো পর্যন্ত সে জানে না, বর্বর কোথাকার। এমনভাবে ছেলেটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল যেন আমি কেড়েকুড়ে নেব সব। এক এক করে যত সব অবাক অদ্ভুত বস্তু এনে হাজির করছে, আর কিছুক্ষণ ভেল্কিবাজী দেখিয়েই আবার অন্দরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসছে ? যখনই সে বুঝতে পারছে আমি বেশ মজা পেয়েছি তখনই সে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা। একে এককথায় কি বলা যায় ? কুৎসিত—অসৎ। দাঁড়াও জাফর, তোমার মউৎ-এর আব বেশি দেরি নাই। বাগদাদে ফিরে গিয়েই আমি তোমার ব্যবস্থা করছি।

কিছুক্ষণ বাদে আবু হোসেন আবার ফিরে এল। এবার তার সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে। খুব ফর্সা এবং পরীর মতো পরমাসুন্দরী। তার সাজ-পোশাকে এক গাদা হীরে বসানো। কিন্তু হীরেয় কি হবে, তার তন্বীদেহের রূপের ছটা আরও বেশি চমক লাগার মতো। সেই মুহূর্তে হারুণ সব বিস্মৃত

হলেন, এমন কি সেই গাছ, ময়ূর, পেয়ালা কিছুই তার মনে ঠাঁই পেল না। মেয়েটি তার সামনে বসে বাঁশীতে সুমধুর তান তুলে একনাগাড়ে চব্বিশটা রাগ-রাগিনী বাজিয়ে শোনালো। মুগ্ধ খলিফা আবু কাসেমকে বাহবা দিয়ে বললেন, সত্যিই সাহেব, তোমার সংগ্রহ বড় অসাধারণ, হিংসে করার মতো।

এই কথা শোনামাত্র আবু কাসেম আর দাঁড়ালো না সেখানে, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এবারে খলিফা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নাঃ, এ জিনিস আর বরদাস্ত করা যায় না।

আবু কাসেম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, মনের রাগ মনে চেপে তিনি যথাসাধ্য সৌজন্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আবু কাসেম, তোমার আতিথেয়তায় প্রীত হয়েছি। কিন্তু আর বেশি সময় তোমাকে বিব্রত করতে চাই না, এবার আমি চলি—

আবু কাসেম কিন্তু একবারও তাঁকে আরও কিছু সময় থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানালো না। বরং বিদায়ের শুভেচ্ছা জানানোর ঢঙে মাথাটা নুইয়ে সালাম জানিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে দিতে এল তাঁকে।

সরাইখানায় ফিরে আসতে আসতে খলিফা ভাবলেন, লোকটা হাড়-কিপ্পন। ঘর ভরা দৌলত থাকলে কি হয়, চড়ুই পাখীর মতো দিল। এর প্রশংসায় আমার উজির সাহেব পঞ্চমুখ। দাঁড়াও ব্যাটাকে আমি মজাখানা দেখাবো—বাগদাদে ফিরে গিয়ে।

কিন্তু খলিফাকে আরও বেশি অবাক করে দিল আর একটি ঘটনা। সরাইখানায় তার ঘরের দরজার সামনে দুটি কৃষ্ণ ক্রীতদাসের সঙ্গে সেই ছোট্ট পেয়ালা হাতে ছেলেটি এবং সেই বাঁশী হাতে কিশোরীটি আর চাকর দুটির হাতে সেই গাছটি আর ময়ূর। খলিফা সামনে আসতেই সুন্দরী কিশোরীটি একটুকরো চিঠি বাড়িয়ে দিল খলিফার দিকে।

খোদা ভরসা। আপনার বান্দা এই সামান্য উপহারগুলো পাঠাচ্ছে আপনাকে। আমার গরীবখানায় আপনার স্বল্পক্ষণের আতিথ্য সারাজীবন আমার স্মৃতি-পটে আঁকা থাকবে। এই তুচ্ছ কয়টি বস্তু আপনাকে মুগ্ধ করেছিল দেখে এগুলো আপনাকেই উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করে ধন্য করবেন এ অধমকে।"

চিঠিখানা পড়ে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেন না খলিফা। স্বপ্ন দেখছেন না তো তিনি? এ কি সেই আবু কাসেমের লেখা খৎ? একজন সামান্য যুবকের পক্ষে এত সব অমূল্য বস্তু সংগ্রহ করাই বা সম্ভব হলো কি করে? আর তারও চেয়ে বড় কথা, যে জিনিস কোনও অর্থের বিনিময়েই কিনতে পাওয়া যায় না তা অবলীলাক্রমে দান করে দিতে পারে কে? এমন দাতা তো ত্রিভুবনে কোথাও আছে বলে শুনিনি।

খলিফার আর ঘরে প্রবেশ করা হলো না, সেইখানেই দানসামগ্রী সব ঐ অবস্থাতেই ফেলে রেখে তিনি আবার ছুটলেন আবু কাসেমের প্রাসাদের দিকে। কী ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হলে এই অমূল্য সম্পদ তুচ্ছজ্ঞানে দিয়ে দিতে

পারে অন্যকে ? সেই তথ্যটি আজ তাঁকে জানতেই হবে।

দ্রুতপায়ে আবু কাসেমের প্রাসাদে আবার ফিরে এসে খলিফা কাসেমকে বললো, আমার দোষ যদি কিছু ঘটে থাকে, তবে নিজগুণে তুমি ক্ষমা কর সাহেব। আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি। হয়তো আমার আচার আচরণে কোন অসৌজন্য দেখিয়ে থাকতে পারি। আশা করি সে ত্রুটি মনে রাখবে না। আমি আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, একটি কারণে। এইভাবে তুমি যদি দুহাতে বিলাতে থাক তোমার বিত্ত বৈভব তবে বাদশাহর ভাঁড়ারও একদিন ফুরিয়ে যাবে যে। তোমার এই দানপত্র না কমালে তো একদিন তুমি ফতুর হয়ে যাবে! হয়তো তোমার সম্পদের পরিমাণ অনেক, কিন্তু তা বলে তো অফুরান নয়।

—এই যদি আপনার ফিরে আসার কারণ হয়ে থাকে তবে আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যেতে পারেন আপনার ঘরে। প্রতিদিন আমি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি, আমার ইহজগতের ঋণ যেন আমি পরিশোধ করে যেতে পারি। যখনই আমার দরজায় কোনও মেহেমান আসে তাকে দুহাত ভরে দিতে পেরে আমি ধন্য হই। সত্যি কথা বলতে কি, খোদা আমাকে অফুরন্ত ধন-সম্পদই দিয়েছেন। দু হাতে বিলিয়েও তা শেষ করা যাবে না কোনদিন। আপনাকে সব খুলে বললে আপনি হয়তো আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। সে কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ সন্দেহ নাই। তা হলে মেহেরবানী করে একটু বসুন এখানে, আপনাকে শোনাই সে কাহিনী।

খলিফা আসন গ্রহণ করলেন। আবু কাসেম বলতে শুরু করলো:

আমার বাবা আবদ অল আজিজ কাইরোর খুব নামজাদা জহুরী ছিল এক সময়ে। আমার বাবার বাবা এবং তার বাবাও বংশানুক্রমে মিশরের বাদশাহর আনুকূল্য লাভ করে অনেক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন। যদিও কাইরোতেই সারাজীবন কেটেছে তাদের তবু জন্মভূমি বসরাহকে তাঁরা কখনই ভোলেননি। বাদশাহর কাছ থেকে পাওয়া সব ধন-সম্পদই তাঁরা বসরাহয় নিয়ে এসে জমা করেছিলেন।

আমার বাবা একটি মাত্র কন্যাকেই শাদী করে জীবন কাটিয়ে গেছেন। এবং আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। সুতরাং বাবা যখন ইন্তেকাল করলেন, আমি একাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির পুরো মালিক হলাম।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো চব্বিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে:

আমার ভীষণ খরচের হাত ছিল বরাবরই। তাই ঐ বিপুল ঐশ্বর্য নিঃশেষ করতে দুবছরও সময় লাগলো না আমার। আল্লাহর দোয়াতে যা হাতে এসেছিল আবার তারই ইচ্ছায় তিনি তা ফিরিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিলেন আমাকে। এরজন্য মনে আমার অনুতাপ হয়নি কখনও।

বাড়ি ঘর-দোর সব বিক্রি করে দিয়ে একদিন বসরাহ ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লাম আল্লাহর নাম করে। কেমন করে জানি না, এক সওদাগরের দলের সংগে ভিড়ে পড়েছিলাম আমি। প্রথমে মশুল এবং পরে দামাসকাসে গেলাম আমরা। তারপর দুস্তর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে মক্কার পরে কাইরো শহরে গিয়ে পৌঁছলাম একদিন। এই কাইরোয় আমরা কিছুকাল অবস্থান করবো, ঠিক হলো।

কাইরোর সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা আর অসংখ্য ছোটবড় মসজিদ দেখে পুলকে নেচে উঠলো আমার মন। বাবার কথা মনে হলো, তিনি এবং তাঁর পিতৃপুরুষরা এই শহরেই কাটিয়ে গেছেন চিরটাকাল। কান্নায় চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে পড়লো, এই শহরে আমার বাপ-ঠাকুরদাদারা কি নবাবী চালে কাটিয়ে গেছেন, আর আমি তাদের বংশধর হয়ে দীন ভিখিরির মতো হাজির হয়েছি এখানে।

নীলনদের তীরে বসে নদীর শোভা দেখছিলাম। আমার পাশেই সুলতানের বিলাসমহল ঝকমক করছিল। মুগ্ধ নয়নে প্রাসাদের কারুকার্য লক্ষ্য করছি হঠাৎ একটা বাতায়নের পর্দা সরিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মুখ বাড়িয়ে দিল। আমার চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠলো। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। মেয়েটি জানালা থেকে সরে গেল। ওপরের দিকে তাকিয়ে সারাটা বিকেল শেষ হয়ে গেল, মনে আশা আর একবার হয়তো সে জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু না, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে থাকলো, মেয়েটি আর দর্শন দিল না।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সরাইখানায় ফিরে আসতে হলো। সারাটা রাত সেই মুখচ্ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

সকাল হতে না হতেই আবার আমি নদীর ধারে এসে প্রাসাদের পাশে বসে উন্মুখ, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকি। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে একটি বারের জন্য জানলার পর্দা সরিয়ে সে এসে দাঁড়ালো না। আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দিলাম না। তৃতীয়দিন বিকেলে জানলার পর্দা সরে গেল। সেই মুখখানি আবার দেখতে পেলাম। আমার সারা শরীরে সে যে কি এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ খেলে গেল, বোঝাতে পারবো না আপনাকে। কেন জানি না সেই মুহূর্তে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা গলা চড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, শোন সুন্দরী, আমি এ শহরে নবাগত মুসাফির। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ। এত পথ হেঁটে এই দূরদেশে আসা আজ আমার সার্থক হয়ে গেল তোমাকে দেখে।

আমি থামলাম। ভাবলাম মেয়েটি কিছু বলবে। কিন্তু ওর মুখে-চোখে দারুণ একটা ভয়ের ছাপ লক্ষ্য করে দমে গেলাম। একটু পরে সে খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিস করে আমাকে বুঝিয়ে দিল, এখন তুমি পালাও এখান থেকে। ঠিক মাঝরাতে এস।

জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। আনন্দে নেচে উঠলো আমার হৃদয়। কি ঘটতে পারে কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে সেইদিন মাঝরাতে এসে হাজির হলাম আবার

সেখানে। দেখলাম, জানলাটা থেকে একটা রেশমী দড়ি ঝুলছে। দড়িটা ধরে প্রাণপণ কসরতে একসময় জানালায় উঠে আসতে পারলাম আমি। ঘরের ভিতরে একখানা চাঁদীর পালঙ্কে শুয়েছিল সে। তার রূপের বর্ণনা দিতে পারবো না, তবে একথা বলতে পারি, ওধরনের সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

এরপরে সহজভাবেই যা ঘটা সম্ভব ছিল তাই সংঘটিত হয়েছিল সে রাতে। আমরা দুজনে গভীর আশ্লেষে একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু থাক সেসব কথা, প্রেমোপাখ্যান বিবৃত করার প্রয়োজন নাই এখানে। সে রাতে মেয়েটি তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছিল আমাকে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমি সুলতানের বেগম লুবিবাহ। এই বিলাসমহলে আজ আমি নির্বাসিতা। সুলতানের অন্যান্য বেগমরা শত্রুতা করে এই সর্বনাশ করেছে আমার। সুলতান আমাকে বিষনজরে দেখেন এখন। অথচ একদিন আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র নয়নতারা। আজ আমি বড় একা নিঃসঙ্গ। এই নিঝুম পুরীতে আজ আমি বন্দিনী। অথচ একদিন কি না আমার ছিল। আজ আমি বড় একা—অসহায়। মাঝে-মাঝে জানলায় দাঁড়িয়ে নীলের শোভা দেখে দেখে দিন কাটাই। একটা সঙ্গী সাথী নাই আমার, যার সঙ্গে দুটো মনের কথা বলতে পারি। এমন কাউকে কাছে পাই না যাকে আমার দেহ-প্রাণ-মন উজাড় করে দিতে পারি। বহুকাল পরে নদীর তীরে তোমাকে দেখে মনে বড় আশা হলো। তোমার সুঠাম সুন্দর যৌবন আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল, তাইতো তোমাকে আসতে বলেছিলাম আজ রাতে। তুমি এলে, অনেকদিনের অতৃপ্ত কামনা শান্ত করে দিয়েছ তুমি। কিন্তু আজকের রাতই কি শেষ সুখের রাত হবে গো? আর তুমি আসবে না আমার কাছে?

আমি বলতে পারলাম, চিরকাল—যতদিন বাঁচবো তোমাকে নিয়েই বাঁচতে চাই আমি।

ঠিক এই সময় কে যেন দরজায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারতে লাগলো। বেগম লুবিবাহ শিউরে উঠলো, সর্বনাশ, এতো সুলতানের করাঘাত। এখন উপায়?

জানালার কাছে গিয়ে দেখি রেশমী দড়িটা কেটে দেওয়া হয়েছে। ভয়ে আমি পালঙ্কের নিচে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু বিশজন কাফ্রি খোজার হাত থেকে কি পালঙ্কের তলায় পালিয়ে নিস্তার পাওয়া যায়? ওরা আমাকে টেনে বের করে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীলের জলে। শুধু আমাকেই নয়, আমার প্রাণাধিকা লুবিবাহকেও ওরা রেহাই দিল না। তাকেও ছুঁড়ে দিল আমারই পাশে।

সাঁতার জানা ছিল, তাই নীলের স্রোতে হারিয়ে গেলাম না। কোনরকমে সাঁতার কাটতে কাটতে এক সময় অপর পারে গিয়ে তীরে উঠতে পারলাম। কিন্তু সে যে কোথায় তলিয়ে গেল তার আর কোনও হদিস পেলাম না।

এর পর কাইরোয় থাকার বাসনা ত্যাগ করে বাগদাদে চলে গেলাম আমি। আমার কোমরের তোড়ায় তখন গুটিকয়েক মাত্র দিনার অবশিষ্ট ছিল। সেই

কটা টাকা দিয়ে একটা বারকোষ ভর্তি করে মেঠাই মাণ্ডা কিনে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে ফিরি করে বেড়াতে লাগলাম। আমার গলায় খুব মিষ্টি সুর ছিল। এবং এই কারণেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে খদ্দেরদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রতিদিন বারকোষ ভরে মেঠাই নিয়ে পথে বেরুই। কিন্তু দিনান্তে একটিও পড়ে থাকে না। এইভাবে দিনে দিনে যা লাভ হয় তার সামান্যই খরচ হয় খানাপিনা করতে। বাকীটা জমতে থাকে।

একদিন পথে পথে ঘুরতে এক দোকানের বৃদ্ধ মালিক আমাকে ডাকলেন। শেখ সাহেব কিছু মিঠাই কিনবেন। বারকোষখানা নামালাম তাঁর দোকানে। বৃদ্ধ আমার নাম ধাম জিজ্ঞেস করায় আমি কিঞ্চিৎ বিব্রত বা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, অতীতের স্মৃতিটা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে চাইনে শেখ সাহেব। সে বড় মর্মান্তিক মনে হয় আমার কাছে।

বৃদ্ধ আমাকে আর ঘাঁটালো না। দশটা দিনার হাতে গুঁজে দিল সামান্য মিঠাইএর জন্য। এটা দয়ার দান বুঝতে পেরেও, না করতে পারলাম না। বৃদ্ধকে খুশি করার জন্যই নিলাম।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো পঁচিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পরদিন আবার আমি ঐ বৃদ্ধের দোকানে গেলাম। সেদিনও তিনি সামান্য খানিকটা মিঠাই কিনলেন। তারপর আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন, কি আমার নাম, কোথায় আমার দেশ।

সেদিন আর আমি তাঁকে বিমুখ করলাম না। আমার সব কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম। বৃদ্ধ শুনে সাশ্রুনয়নে বললেন, বেটা তোমার বাবা আবদ অল আজিজ আমার প্রাণের দোস্ত ছিল। তার ছেলে হয়ে আজ তুমি পথে পথে ফিরি করে বেড়াচ্ছ? বাবা একটা কথা বলবো, আমি সারাজীবন অপুত্রক। তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, সেই অধিকারে তোমাকে আমি দত্তক গ্রহণ করতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার ছেলে হলে।

পরদিনই তিনি দোকানপাট বন্ধ করে আমাকে নিয়ে বসরাহয় রওনা হলেন। বসরাহতেই তাঁর আদি বাসগৃহ ছিল।

বসরাহয় এসে আমি বৃদ্ধের প্রাসাদে দারুণ আদর যত্নে দিন কাটাতে লাগলাম। বৃদ্ধ আমাকে বললেন, বাবা, বয়স হয়েছে। এবার যাবার সময় হলো। আমার মৃত্যুর পর আমার যা-কিছু বিষয়-আসয় সব তোমার হবে।

এরপরও তিনি বছরখানেক জীবিত ছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি আমাকে কাছে ডেকে বললেন, বাবা, যে সম্পদ আমি রেখে গেলাম তোমার জন্য তা দুনিয়ার তাবৎ সুলতান বাদশাহর কোষাগারেও নাই। এ আমাদের বংশানুক্রমে সঞ্চিত ঐশ্বর্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা জমিয়ে গেছেন এসব। আমিও যতটা পেয়েছি বাড়িয়েছি। আমার নানাজী মৃত্যুকালে

আমার বাবাকে যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন আমার বাবাও মৃত্যুশয্যায় আমাকে ডেকে সেই উপদেশই রেখে গেছেন। আমিও তোমাকে সেই কথাই কানে কানে বলে যাচ্ছি বেটা, প্রাণ খুলে মুক্ত হাতে দান ধ্যান করবে, তোমার ঐশ্বর্য কখনও ফুরাবে না। আর একটা কথা, সব অবস্থাতেই নিজেকে সুখী মনে করবে। আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন।

এই ছিল তাঁর শেষ কয়টি কথা। এবং সেই নির্দেশই আমি যথাযথ পালন করে চলেছি। আমাকে যারা গোড়া থেকে জানতো তারা ভেবেছিল, বাবা দাদার ঐ বিশাল ঐশ্বর্য যখন আমার হাতে পড়ে উড়ে গেছে, এ বিষয় সম্পত্তির মেয়াদও বেশি ছিল না। কিন্তু দুহাতে বিলিয়ে আজও একই রকম ঐশ্বর্যবান রয়ে গেছি দেখে তারা একটু যেন দমে গেছে।

আমার দান ধ্যানের বহর দেখে সরকারের শহর অধিকর্তাদেরও চোখ টাটাতে লাগলো। একদিন বড় কোতোয়াল সাহেব এলেন আমার প্রাসাদে। বেশ খানিকটা খোঁচা দিয়েই তিনি বললেন, আবু কাসেম সাহেব, চোখ কান তো আমাদেরও খোলা আছে, সবই দেখতে শুনতে পাচ্ছি। তা অত নবাবী চালে দুহাতে ধন দৌলত বিলিয়ে দিয়ে কতদিন চলবে? দিন দিন যা মাগ্গি-গণ্ডার বাজার হচ্ছে তাতে লোকে দুবেলা দুখানা রুটি জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তোমার এইরকম দান খয়রাতি কি শোভা পাচ্ছে, মালিক? এই দেখ না, আমি সরকারের উঁচু পদে বহাল থেকেও সংসার চালাতে পারছি না ঠিকমতো। রুটির দাম বেড়ে গেছে, এদিকে গাইগরুটা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে, কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, দিনে রুটি আর দুধের বাবদ কত খরচ হয় আপনার?

সে বললো, দিনে দশ দিনারের বেশি না। কিন্তু এই দশটা দিনারও আমি জোগাড় করতে পারছি না।

আমি বললাম, আপনাকে আপাতত একশো দিনার দিচ্ছি। মাস শেষ হলে আবার আসবেন, আমি আপনাকে আবার দেব।

লোকটি গদগদ হয়ে আমার হাতে চুমু দিতে এল। কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত করে বললাম, আমি যা দিচ্ছি সবই আল্লাহর জিনিস, এরজন্য আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নাই।

এর কয়েকদিন পরে বসরাহর সুবেদার সাহেব আমাকে তলব করলেন। আমি হাজির হতেই তিনি আমায় খুব খাতির যত্ন করে বসতে দিলেন। এবং বললেন, এই শহরের কিছু লোক বলছে, তোমার কাছে বিপুল ধন-সম্পত্তি আছে। এবং তুমি তা বেপরোয়া ভাবে অপাত্রে দান করে যাচ্ছ।

সুবেদারের মতলব বুঝতে আমার দেরি হলো না। বললাম, আপনি যা শুনেছেন তা অনেকখানিই সত্যি। তবে অপাত্রে দান করছি কিনা বলতে পারবো না। মোট কথা আমার কাছে যারা চাইতে আসেন আমি তাদের ফেরাতে পারি না।

সুবেদার বললেন, এই শহরে প্রায় দু'হাজার অত্যন্ত দরিদ্র ধার্মিক মানুষ আছে। তারা সৎভাবে আল্লাহর নাম গান করে। কিন্তু দুবেলার আহার জোটাতে পারে না। তুমি যদি প্রতিদিন দু'হাজার দিনার করে আমার হাতে দাও আমি ঐ সব ধর্মপ্রাণদের মধ্যে বিতরণ করতে পারি।

বুঝতে পারলাম গরীব মানুষদের নাম করে সুবেদার নিজের পকেট ভরতে চায়। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। প্রত্যেক দিন আমি আপনাকে দু হাজার দিনার পাঠিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য সুবেদার সাহেব এখন আমার প্রসংশায় পঞ্চমুখ।

খলিফা হারুন অল রসিদ আবু কাসেমের পাঠানো উপহারগুলো সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে ফিরে এলেন। জাফরকে ডেকে এনে বললেন, জাফর, তোমার কথা বিশ্বাস না করে আমি তোমার উপর অবিচার করেছি। আবু কাসেম সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে, আমি নিজে যাচাই করে এসেছি, আসলে সে তার চাইতে আরও অনেক বড়। তার ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। আমি তাকে পুরস্কৃত করতে চাই। কিন্তু সে তো আমার চেয়েও অনেক ঐশ্বর্যবান, ধন-দৌলতের উপহার নিয়ে সে কি করবে?

জাফর বললো, অর্থের প্রয়োজন জীবনে সীমিত, জাঁহাপনা। কিন্তু সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের বাসনা অনন্ত। আমার মনে হয় আবু কাসেমকে যদি আপনি বসরাহর সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন সেই হবে তার যোগ্যতম পুরস্কার।

খলিফা বললেন, যথার্থ বলেছ তুমি। আর কালবিলম্ব না করে তার অভিষেকের আয়োজন কর।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাগদাদ শহরে মহা সমারোহে দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে আবু কাসেমকে বসরাহর সুলতান পদে বহাল করে নিলেন খলিফা। নানা প্রকারের উপহার উপঢৌকনের মধ্যে সবচেয়ে সেরা একটি সুন্দরী বাঁদী তুলে দিলেন তিনি কাসেমের হাতে। কাসেম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো, একি পরম সৌভাগ্য তার! একদিন নীলের অতল জলে যে হারিয়ে গিয়েছিল সেই বেগম লুবিবাহ আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে!

লুবিবাহকে একটি জেলে উদ্ধার করে বাগদাদের বাঁদীবাজারে বিক্রি করে গিয়েছিল। এবং ঘটনাক্রমে সে খলিফার হারেমে এসে অবস্থান করছিল।

লুবিবাহকে ফিরে পেয়ে আবু কাসেমের জীবন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এত অর্থ, এত সম্মান মর্যাদা এত প্রেম ভালবাসা কজনের ভাগ্যে মেলে?

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো। দুনিয়াজাদ উঠে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, কি সুন্দর তোমার কিস্সা দিদি, আর কেমন মিষ্টি করেই না তুমি বলতে পার।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন তবে আজ রাত থেকে আর একটা কাহিনী শুরু করতে পারি।

শারিয়ার বললো, আমি তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তোমার কিস্সা শোনার জন্যেই বসে আছি, শাহরাজাদ। নাও শুরু কর।

শাহরাজাদ বলে, এবারে যে কাহিনী বলতে শুরু করছি, তার নাম বাদশাহী জারজ।

আরবের কোনও এক শহরে তিন বন্ধু বাস করতো। ওরা তিনজনেই কুলজী বিদ্যা বিশারদ। কারুরই কোনও চালচুলো ছিল না। বাস করতো একটা সস্তার সরাইখানায়। সারাদিন লোক ঠকিয়ে যা সংগ্রহ করে আনতো তাই তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিত। রোজগারের যৎসামান্যই আহার ও বিহার এবং বেশবাসে খরচ করতো, বেশির ভাগই উড়িয়ে দিত গাঁজা ভাঙ চরস খেয়ে।

সারাদিন পয়সার ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় তিন বন্ধু ফিরে আসতো সরাইখানায়। সেখানে বসতো মৌতাতের আসর। রাত যত বাড়তো নেশাও তত চড়তে থাকতো, আর সেই সময় সবাই মনের দরজা খুলে দিত দিলদরিয়া মেজাজে।

একদিন রাতে চরসের মাত্রাটা একটু বেশি মাত্রা চড়িয়ে ছিল ওরা। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ফলে গিয়েছিল। প্রথমে হাসি-মস্করা, পরে তা থেকে তর্ক বিতর্ক, এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পর্যবসিত হয়েছিল তাদের সেদিনকার সান্ধ্যসভা। বেদম নেশায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তিন বন্ধু বন্যজন্তুর মতো হিংস্র হয়ে এ ওকে তাড়া করতে করতে এক সময়ে সুলতানের প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলবাগিচার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল।

সে সময়ে সুলতান নৈশ-বিহারে বেরিয়েছিলেন। তিন বেয়াদপ বদমাইশের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে সঙ্গের প্রহরীদের হুকুম করলেন, ওদের ধরে আজ ফাটকে রেখে দাও, কাল সকালে আমার দরবারে হাজির করবে।

পরদিন দরবার শুরু হতে ঐ তিন কুলজী বিদ্যাদিগ্গজকে হাজির করা হলো সুলতানের সামনে। ওদের দেখেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, পাজি বদমাশ, কে তোমরা? এত বড় দুঃসাহস তোমাদের, নেশায় মাতাল হয়ে আমার প্রাসাদের পাশে এসে মাতলামি আরম্ভ করেছিলে?

—আপনি মহানুভব সম্রাট, আমরা কোনও অসৎ লোক নই, আমাদের তিন-জনেরই একই পেশা—কুলজী বিদ্যাবিশারদ আমরা।

—কুলজী বিদ্যাবিশারদ? সে কি রকম?

—জী, কুলজী বিদ্যা মানে, কোনও বস্তু বা প্রাণীর উৎপত্তি বা জন্মবৃত্তান্ত সব বলে দিতে পারি আমরা।

সুলতান ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না ব্যাপারটা, বললেন, যথা।

চরসখোরদের একজন এগিয়ে এসে বললো, আমি গ্রহরত্ন বিশারদ। হীরে চুনী পান্না বা অন্য যে-কোনও মণিরত্ন রাখুন আমার সামনে, আমি চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র বাঁ হাতের কড়েআঙুল স্পর্শ করে তার গুণাগুণ ঠিকুজী কুষ্ঠি সব বিচার করে বলে দেব।

সুলতান বললেন, তোমার কথা যদি ঠিক হয় তবে যথাযোগ্যই ইনাম পাবে, কিন্তু যদি মিথ্যে বল তবে গর্দান যাবে, মনে থাকে যেন?

—তাই হবে জাঁহাপনা।

দ্বিতীয় জন এগিয়ে এসে বললো, আমি পশুদের বংশ কুলজী বিশারদ। আপনি আমার সামনে একটা ঘোড়া এনে দাঁড় করান, আমি তার গতি, মা বাবা চৌদ্দপুরুষের সব খবর বলে দেব।

—আর যদি তা ঠিক না হয়?

—তবে জাঁহাপনার যা অভিরুচি সাজা দেবেন আমাকে।

তৃতীয় জনকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ বিদ্যায় বিশারদ।

—আমি, জাঁহাপনা, মানুষের জন্ম কুলজী সব বলতে পারি।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের তিনজনের কথাই শুনলাম। যথা-সময়ে আমি যাচাই করে দেখবো। কিন্তু পরীক্ষায় যদি দেখি তোমরা ধোঁকা দিয়েছ আমাকে, তা হলে রক্ষা থাকবে না। ফাঁসীতে ঝুলাবো।

এর কয়েকদিন পরে পাশের এক বন্ধুদেশের কাছ থেকে নানারকম উপহার ভেট-এর মধ্যে একটি বিরাট বড় আকারের হীরে পেলেন। সুলতান প্রথম জনকে ডেকে বললেন, এই যে হীরেটা দেখছ, এটা পরীক্ষা করে বলতে হবে আসল অথবা নকল।

হীরেটা তার হাতে তুলে দিতে গেলেন সুলতান। কিন্তু সে হাতে না নিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে টেবিলের ওপরে রাখুন, আমি শুধু আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা একবার স্পর্শ করবো মাত্র।

দুই চোখ বন্ধ করে সে অতি আলগোছে কনিষ্ঠা দিয়ে ছুঁয়েই তড়িতাহতের মত হাতখানা টেনে নিয়ে কাঁতরাতে কাতরাতে বললো, ওফ, পুড়ে গেল—পুড়ে গেল।

সুলতান চমকে উঠলেন, কী, কি হলো?

—জাঁহাপনা, একদম ঝুটা মাল। একেবারে কাঁচ।

সুলতান রোষে ফেটে পড়লেন, কী এত বড় কথা। আমার দোস্ত শাহেন শাহ আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন, ঝুটা জিনিস? এই, কে আছিস্, এই লোকটার গর্দান নিয়ে নে।

ঘাতক এগিয়ে এসে তাকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে টানতে টানতে হাড়িকাঠের কাছে নিয়ে গেল।

উজির দেখলেন, সুলতানের হুকুমে এখুনি ছেলেটির প্রাণনাশ হয়ে যাবে। তার কথার সত্যাসত্য যাচাই হলো না।

—জাঁহাপনা, আমার একটা নিবেদন আছে।

—বল।

—এই যুবক বলেছে হীরেটা ঝুটা। কিন্তু ওর কথাই যে মিথ্যে তার কি প্রমাণ আছে? আপনি কি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন, সে মিথ্যে বলেছে?

সুলতান আমতা আমতা করে বলতে থাকেন, তা বটে, কিন্তু এটা বুঝছো না কেন, এ জিনিসটা এসেছে আমার বন্ধুর কাছ থেকে। জেনে শুনে তিনি আমাকে নকল জিনিস পাঠাবেন, তা কি হতে পারে?

উজির বললো, জেনে শুনে তিনি নকল জিনিস পাঠাবেন না, এ কথা আমি একশোবার মানি, কিন্তু যার কাছ থেকে কিনেছেন বা পেয়েছেন সে তো তাকে ঠকাতে পারে। আর জহরত চেনার মতো বিদ্যে যে তার থাকবেই তা আপনি কি করে আশা করেন, জাঁহাপনা?

—হুম্, তুমি ঠিকই বলেছ উজির। আমি তো ওদিকটা তেমন ভেবে দেখিনি। যাই হোক, হীরেটা কি করে পরীক্ষা করা যায় বলতো?

উজির বললো, ঠিকমতো জানতে গেলে হীরেটার মায়া আপনাকে ত্যাগ করতে হবে জাঁহাপনা।

—কেন?

—না ভাঙলে এর আসল গুণাগুণ যথার্থভাবে নির্ণয় করা শক্ত। হীরেটাকে দ্বিখণ্ডিত করে হাতে ধরলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। যদি টুকরোগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তবে নকল। আসল হীরেয় যত আঘাত ঘর্ষণই করুন তা কখনও গরম হবে না।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, ভেঙেই ফেল। একটা হীরের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

উজির বললো, আমারও তাই মনে হয় জাঁহাপনা, নির্দোষকে নিহত করে পাপের দায় ঘাড়ে না নেওয়াই ধর্মাবতারের কাজ।

সুলতান ঘাতককে বললেন, এই হীরেটাকে এক কোপে দুখানা করে ফেল দেখি।

তরবারীর এক ঘায়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল হীরেটা। উজির হাতে নিয়ে সুলতানের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, ছেলেটি ঠিকই বলেছে, জাঁহাপনা, দেখেন কি গরম হয়ে উঠেছে—

সুলতান অবাক হয়ে তাকালেন ছেলেটির দিকে, এস, আমার কাছে এস বৎস। আচ্ছা, সত্যি করে বলতো, কোন্ যাদুবলে এই অলৌকিক জ্ঞান তুমি আয়ত্ত করেছ।

ছেলেটি বললো, আমার এই আঙুলটায় এক অদ্ভুত স্পর্শশক্তি আছে ছোঁয়ালেই আমি বুঝতে পারি।

সুলতান খুশী হয়ে উজিরকে নির্দেশ দিলেন, আজ থেকে এর বাদশাহী মর্যাদায় খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে।

কয়েকদিন পরে সুলতান একটি চমৎকার বাদামী রঙের আরবী ঘোড়া

কিনলেন। এবার ডাক পড়লো দ্বিতীয় যুবকের।

সুলতান বললেন, ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এই ঘোড়াটার বংশ পরিচয় তোমাকে বলতে হবে। যদি পার ঠিক ঠিক বাতলাও, না হলে, আলতু ফালতু কিছু বলবে না। তা হলে কিন্তু গর্দান যাবে।

ছেলেটি ঘোড়াটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো, আমার দেখা হয়ে গেছে, জাঁহাপনা।

—কি দেখলে ?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো আটাশতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে ঃ

ছেলেটি বলে ঃ জাঁহাপনা, ঘোড়াটা সত্যিই বড় চমৎকার জানোয়ার। এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং তাগদ-এর তুলনা মেলা ভার। সারা আরবে খুঁজলেও এর জুড়ি পাওয়া যাবে না, এ কথা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলবো। রূপে গুণে একে ঘোড়ার বাদশা বললেও অত্যুক্তি হবে না, তবে সামান্য একটু দোষ আছে এই আর কি।

এতক্ষণ প্রশংসা শুনে খুব খুশি হয়ে উঠছিলেন সুলতান। কিন্তু সামান্য একটু দোষের কথা শুনে তিনি অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠে বললেন, তুমি একটা জোচ্চোর, শয়তান, বেল্লিক। একটা সাচ্চা, সবচেয়ে সেরা তেজি ঘোড়ার মধ্যে খুঁত ধরছো। আমি তোমার গর্দান নেব।

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন সুলতান। উজির বোঝালো, ছেলেটা যা বলছে হয়তো তা মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু যথার্থ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি উচিত হবে জাঁহাপনা ?

—হুম, উজিরের কথায় চুপসে গেলেন তিনি, বললেন, ঠিক আছে, কি দোষ তুমি দেখলে, খুলে বল আমার কাছে।

ছেলেটি বলে, বাবার দিক থেকে ঘোড়াটা সাচ্চা আরবী বংশের। কিন্তু ওর মা ম্লেচ্ছ। এর পরের টুকু আমি আর বলতে চাই না, জাঁহাপনা।

সুলতান গর্জে ওঠেন, আলবাৎ তোমাকে বলতে হবে, এবং এক্ষুনি। তা না হলে ঐ যে ঘাতকের তলোয়ার দেখছ, তোমার গর্দানে বসে যাবে।

—ওরে বাবা, না না, আমি বলছি। জাঁহাপনা, এর মা সিন্ধুঘোটকের ঔরসজাত এক মাদী ঘোড়া।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে ঘামতে থাকলেন, উজির এক্ষুণি সহিস-সর্দারকে ডাক।

সহিস-সর্দার আসতে তিনি জানতে চাইলেন। এই ঘোড়াটা কোথা থেকে কেনা হয়েছে, সে লোকটাকে ধরে নিয়ে এস এক্ষুনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লোককে নিয়ে হাজির হলো সহিস-সর্দার। সুলতান

জিজ্ঞেস করলেন, এ ঘোড়াটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে ?

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বলে, ভাল জাতের ঘোড়ার বাচ্চা পয়দা করিয়ে বিক্রি করাই আমার ব্যবসা জাঁহাপনা।

—তাহলে সাফ সাফ বাতাও, এর বাবা কে আর মা-ই বা কে ?

লোকটি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, জাঁহাপনা, এর বাবা সম্পর্কে আমি বড় মুখ করে বলতে পারি আরবের সেরা এক তাজির ঔরসে জন্ম হয়েছে। কিন্তু এর মা সাচ্চা তাজি নয়।

—সাচ্চা তাজি নয় ?

সুলতান গর্জে ওঠেন। লোকটি বিনীত হয়ে করজোড়ে বলে, না, হুজুর, সিন্ধুঘোটকের ঔরসজাত এক মাদী ঘোড়া। সাধারণত এই সব মাদীগুলো জারজ হলেও আসল আরবী মাদীর চাইতে ঢের বেশি তাগড়াই হয়। এবং সেই কারণেই তার এই বাচ্চাও এমন জব্বর দেখতে হয়েছে। দো-তরফা আসল-জাতের আরবী ঘোড়া কখনই এরকম দর্শনধারী, টগবগ হবে না। আরব সাগরের কিনারে ঘোড়া ব্যবসায়ীরা তাঁবু খাটিয়ে মাদী ঘোড়া বেঁধে রাখে জায়গায় জায়গায়। দরিয়া থেকে সিন্ধুঘোটকরা মাদী ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়ে ওপরে উঠে এসে উপগত হয়ে আবার দরিয়ার পানিতে পালিয়ে যায়। তখন ব্যবসায়ীরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। যথাসময়ে তাদের বাচ্চা হয়। এবং সেই সব টাট্টু বাচ্চা চড়া দামে বাজারে বেচে দেয় তারা। আর মাদী বাচ্চা-গুলোকে পালন করে সাচ্চা তাজি ঘোড়ার সঙ্গে পাল খাওয়ায়। এদের গর্ভজাত বাচ্চাগুলোর বাজার দর অনেক বেশি। আসল তাজি ঘোড়ার তিন চারগুণ দাম পাওয়া যায়।

সুলতান মুগ্ধ হয়ে যুবককে বললেন, তোমার বিচার নিখুঁত। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, কি করে তুমি বুঝতে পারলে যে ঘোড়াটা জারজ ?

ছেলেটি হাসলো, সে কথা বুঝানো শক্ত। তবে জেনে রাখুন জাঁহাপনা, এই-ই আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, এই চর্চা করেই আমি খাই।

সুলতান উজিরকে বললেন, এর জন্যেও থাকা খাওয়ার এলাহী ব্যবস্থা করবে আজ থেকে। এমন গুণীজনের সমাদরে যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

এরপর সুলতান ভাবলেন এবার তৃতীয় জনের বিদ্যা যাচাই করে দেখতে হবে। একদিন তাকে ডেকে বললেন, ওহে বাপু, তুমি যা বলেছিলে মনে আছে তো ?

ছেলেটি সবিনয়ে বলে, সে-কথা ভুলবো কি করে, জাঁহাপনা। ওটাই তো আমার একমাত্র পেশা।

—ঠিক আছে, এস আমার সঙ্গে।

সুলতান ওকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেলেন হারেমে। সাধারণতঃ কেন, কোনও কারণেই বাইরের কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই হারেমে। একমাত্র হাকিমরা প্রয়োজন হলে সুলতানের সঙ্গে যেতে পারেন। তবু কোনও বেগম বাঁদীর মুখদর্শন করতে পারবেন না তারা। পর্দার আড়াল থেকে রোগের

বিবরণ শুনে দাওয়াই পত্রের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুলতান আজ সব নিয়ম বিধি তছনছ করে ছেলেটিকে নিয়ে একেবারে হারেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

সুলতানের সর্বাধিক প্রিয়তমা বাঁদীর ঘরে এসে দাঁড়ালেন। অসময়ে সুলতানকে দেখে খোজা নফর দাসী বাঁদীরা সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতান-প্রিয়া আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে আসন গ্রহণের আর্জি রাখলো। সুলতান সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুমি যদি চাও, আমি ওকে বোরখা খুলে দাঁড়াতে বলতে পারি, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ একে।

ছেলেটি বলে, না তার দরকার হবে না। আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে জাঁহাপনা।

—তাহলে চল বাইরে যাই। এখানে কোন কথা হবে না।

দরবারে ফিরে এসে সবাইকে সভা ত্যাগ করে চলে যেতে নির্দেশ করলেন সুলতান। শুধু উজিরকে বললেন, তুমি থাক এখানে।

সকলে প্রস্থান করলে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, আচ্ছা বিশারদ, এবার তোমার যা বলার বলতে পার আমাকে। আমি আমার বাঁদীর জন্ম কুলজী জানতে চাই।

ছেলেটি মাথা নিচু করে বলে, এমন নিখুঁত সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি জাঁহাপনা। কিন্তু আপনি আমাকে ওঁর জন্মবৃত্তান্ত বলতে হুকুম করবেন না।

সুলতান গর্জে ওঠেন, এই সব বুজরুকি শোনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি আমি। এখুনি তোমাকে বলতে হবে। এবং তার মধ্যে যদি কোনও মিথ্যাচার থাকে তবে তোমার গর্দান নেব আমি।

ছেলেটি বলে, আমি যা বলবো তা আপনার শুনতে ভাল লাগবে না জাঁহাপনা।

—তা হোক, তুমি বল।

এই মেয়ের বাবা সৎবংশ সম্ভূত। কিন্তু এর মা বারবনিতার গর্ভজাত ছিল।

সুলতান চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উজিরকে বললেন, বাঁদীর বাবাকে হাজির কর।

একটু পরে এক বৃদ্ধ এসে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ালো। সুলতান প্রশ্ন করলেন, তোমার মেয়ের প্রকৃত পরিচয় কী?

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমার বংশমর্যাদা খানদানী সম্বন্ধে আপনাকে যা বলেছি তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নাই।

সুলতান অধৈর্য হয়ে বলেন, তা আমি শুনেছি। সে সম্বন্ধে জানতে চাই না। তোমার বিবি, যার গর্ভে তোমার কন্যা হয়েছে, তার বংশ কুলজী কিছু জান।

বৃদ্ধ ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে রইলো। সুলতান হুঙ্কার ছাড়লেন, চুপ করে থাকলে চলবে না, সাফ সাফ সত্যি কথা বল, তা না হলে জ্যান্ত কবর দেব তোমাকে।

—জাঁহাপনা, একসময়ে আমি মক্কায় যাচ্ছিলাম হজ করতে। দুস্তর মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলেছি। পথের মাঝখানে একদল মজরোওরালী মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলো। তারাও মক্কায় চলেছিল। পথের মাঝখানে মুসাফিরদের মনোরঞ্জন করাই তাদের পেশা। একদিন সন্ধ্যায় একটি মরুদ্যানে আমরা তাঁবু গেড়ে রাত্রিটা কাটাবো স্থির করলাম। যাত্রীরা যে যার মতো তাঁবু ফেলে খানা-পিনা গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠলো। ঐ মেয়েগুলো তাঁবুতে যাত্রীদের চিত্তবিনোদন করতে থাকলো।

এমন সময় ঝড় উঠলো। বালীর ঝড়ে চারদিক উত্তাল হয়ে উঠলো। সেই নিদারুণ মরুঝঞ্ঝাবাত্যায় কে যে কোথায় ছিটকে চলে গেলাম কিছুই ঠাওর হলো না।

শেষ রাতে ঝড় থামলো। আমি পড়েছিলাম বালীর উপর মুখগুঁজে। সকাল হতে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সঙ্গী সাথী বা তাঁবুগুলোর কোনও চিহ্নমাত্র নাই। ঝড়ের তোড়ে কে যে কোথায় ভেসে গেছে তা আর হদিশ করতে পারলাম না। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম একটা গাছের গুঁড়ির কোটরের মধ্যে গুঁটিসুটি মেরে বসে আছে একটি ফুটফুটে কচি বালিকা। নেহাতই শিশু। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? তোমার মা বাবাই বা কোথায়?

সে আমার কথার জবাব দিতে পারলো না। পরে বুঝেছিলাম, কথা বোঝার মতো বয়স এবং বুদ্ধি তখনও তার হয়নি। সেই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আমি দেশে ফিরে আসি। আমার বাড়িতে আর পাঁচটা বালবাচ্চাদের সঙ্গে হেসে খেলে সে মানুষ হতে থাকে।

এইভাবে দিন কাটছিল। একদিন তার দেহে কিশোরীর উন্মেষ লক্ষ্য করলাম। এবং স্বভাবতই তার মনমোহিনী রূপ-যৌবনে আমি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিধি-সম্মতভাবে শাদী করে আমার বিবি বানিয়েছিলাম। জাঁহাপনার বাঁদী তারই প্রথম ফল। ধর্মাবতার বিচার করুন, আমার কি অপরাধ।

সুলতান বললেন, যাক আমি শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

সুলতান উজিরকে বললেন, একে খুব আদর যত্ন করে রাখবে।

সুলতানের অবাক লাগলো, কি করে এরা তিনজন এমন অসম্ভব বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছে! পরদিন তিনি তৃতীয় ছেলেটিকে ডেকে বললো, এবার তোমাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য জানাতে হবে।

ছেলেটি বললো, অবশ্যই বলবো, কিন্তু আমাকে অভয় দিতে হবে, জাঁহাপনা। অপ্রিয় সত্য বললে, আপনি কুপিত হয়ে আমাকে সাজা দেবেন না, কথা দিন।

সুলতান বললো, তোমার কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে সাজার বদলে ইনাম পাবে অনেক, তুমি নির্ভয়ে বল।

ছেলেটি বললো, তা হলে দরবারের সবাইকে চলে যেতে হুকুম করুন। এ কথা শুধু মাত্র আপনাকেই বলতে চাই আমি।

সুলতানের নির্দেশে উজিরসহ সকলে দরবার কক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

ছেলেটি তখন সুলতানের কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, জাঁহাপনা, আপনি একটি জারজ সন্তান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো তিরিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

ছেলেটির কথা কানে যেতেই সুলতানের শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে আসে। কে যেন তাঁর টুটিটা চেপে ধরলো সেই মুহূর্তে। বেশ কিছুক্ষণ তিনি মুখে কোনও আওয়াজ বের করতে পারলেন না। সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেল। নিঃশ্বাস দ্রুততর হতে থাকলো।

এক সময়ে তিনি নিজেকে সামলে নিতে পারলেন। বললেন, কিন্তু তোমার এ-কথার প্রমাণ কী?

ছেলেটি বললো, এখনও তো আপনার বৃদ্ধামাতা জীবিত আছেন। মেহেরবানী করে তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন। তিনি যদি সত্যিই আপনাকে স্নেহ করেন, আমার মনে হয়, কোনও কথা গোপন করবেন না।

—ঠিক বলেছ, তখুনি সুলতান তলোয়ার বাগিয়ে ধরে হারেমের দিকে ছুটলেন। আজ আমাকে এর একটা ফয়সালা করতে হবে।

ছেলেকে চণ্ডমূর্তিতে এসে দাঁড়াতে দেখে মায়ের প্রাণ কেঁপে ওঠে। কী হয়েছে বেটা, হঠাৎ তলোয়ার হাতে করে ছুটে এলে কেন?

সুলতান দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, সত্যি করে বল, আমার বাবা কে? মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে না মা, তাতে আখেরে তোমার ভাল হবে না। কিন্তু সত্যি কথা যদি খুলে বল, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিতে পারি।

বৃদ্ধা কেঁদে ফেললো, তুই আমাকে জানের ভয় দেখাস নি, বাবা। বাঁচার কোনও সাধ নাই আমার। তবে প্রশ্ন যখন করেছিস, সত্যি কথাই বলবো আজ। তবে শোন :

তোর বাবা আমাকে যখন বেগম করে এই হারেমে এনেছিল, তখন আমার ভরা যৌবন। খুব হৈ-হল্লা, আনন্দস্ফূর্তির মধ্যে দিন কাটতে লাগলো। আমার রূপের মোহে তোর বাবা প্রায় সব সময়ই আমার ঘরে পড়ে থাকতো। কিন্তু একটা বছর কেটে গেলেও আমার গর্ভে কোনও সন্তান এল না। আমার শাশুড়ি তোর ঠাকুমা চিন্তিত হলো। আমি তাকে বোঝালাম, আমার চেষ্টার কোনও কসুর নাই। আরও একটা বছর কেটে গেল। তোর বাবার সঙ্গে প্রতি

রাতেই আমার সহবাস হতো। কিন্তু দু বছরের মাথায় এসেও বুঝতে পারলাম আমি সন্তান-সম্ভবা হতে পারিনি।

আমার শাশুড়ি আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। আমাকে বাঁজা বন্ধ্যা বলে দূর ছাই, দূর ছাই করতে লাগলো। আমারও মনে কেমন খটকা লাগলো। হয়তো শাশুড়ির কথাই ঠিক।

কিছুদিনের মধ্যে হারেমে নতুন বেগম এল। পরমাসুন্দরী ডাগর যুবতী ছিল সে-ও। আমার কপাল পুড়লো। তোর বাবা দিন-রাত সেই নতুন বেগমকে নিয়ে পড়ে থাকে। ভুলেও আমার মহলে আসে না।

কিন্তু একটা বছর কেটে যাওয়ার পর শাশুড়ি তার ওপরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এর কয়েক মাস বাদে আরও এক সুন্দরী বেগম এসেছিল এই হারেমে। শাশুড়ির বড় আশা ছিল, এই ছোট বেগম বংশ রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু পুরো দুটি বছর পার হয়ে গেল, সে অন্তঃসত্ত্বা হতে পারলো না।

এবার আমি নিঃসংশয় হলাম, দোষ আমাদের কারো নয়, অক্ষমতা তোর বাবার। তার মরা বীর্যে সন্তান পয়দা হতে পারবে না। একথা জানার পর আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সর্বনাশ! এত বড় সলতানিয়ত—যদি তার কোনও উত্তরাধিকার না থাকে—সব ছারখার হয়ে যাবে যে! সেইদিনই আমি ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক বংশ রক্ষা করতে হবে। মসনদ যাতে অন্য লোকের হাতে চলে না যায়, তারজন্যে আমার নিজের সতীত্ব আমি বিসর্জন দেব।

হারেমে পরপুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। খোজা নফর আর দাসী বাঁদীরাই হারেমের সব কাজ দেখাশুনা করে। ভাবতে লাগলাম, কী ভাবে একটা জোয়ান মরদ জোগাড় করা যায়।

ইচ্ছে থাকলে উপায় একটা হয়ই। একদিন কায়দা করে হারেমের বাবুর্চিকে মহলে ডেকে আনলাম। লোকটার শরীর স্বাস্থ্য ছিল পাথরে কুঁদা। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাকে দিয়ে। সুতরাং সেইদিনই আমি তার সঙ্গে সঙ্গম করলাম। যাতে লোক জানাজানির কোনও আশঙ্কা না থাকে সেজন্য সেই রাতেই তাকে আমি নিজে হাতে খুন করে মাটি খুঁড়ে গোর দিয়েছিলাম। আমার একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচরী ছাড়া এব্যাপারটা আর কেউই জানতে পারেনি আজ পর্যন্ত। তুমি বিশ্বাস কর বাবা, এভাবে তোমার বাবার বংশ রক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার সামনে।

সুলতান একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। চোখের জল মুছতে মুছতে দরবার কক্ষে ফিরে এলেন। ছেলেটি তখনও সেখানে একাই বসেছিল। সুলতান এসে সিংহাসনে না বসে তার সামনে একটা কুর্শিতে বসে পড়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন।

এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেছে, এক সময় সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কি করে এই বিদ্যা তুমি আয়ত্ত করেছ, বেটা।

ছেলেটি বলে, ভাষায় ব্যক্ত করে তা বোঝানো সম্ভব নয়, জাঁহাপনা। এটা অনুভব করার জিনিস। আমিও জানি না, কি করে বলতে পারি। আপনা

থেকেই আমার মনে এসে যায় সব।

সুলতান তার বাদশাহী অঙ্গবাস খুলে ফেলে দিলেন। ছেলেটিকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এ তখতে আমার কোনও অধিকার নাই—লোভও নাই। এ ভার আমি আর বইতে পারবো না। তাই আজ থেকে তোমাকেই সুলতান পদে অভিষিক্ত করে ফকিরের বেশে আমি এ শহর পরিত্যাগ করে অন্য কোনও দূরে অজ্ঞাত দেশে চলে যাচ্ছি।

সেইদিনই উজির ও আমির ওমরাহ এবং দরবারের অন্যসব সভাসদদের ডেকে সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, আজ থেকে এই কুলজীবিদ্যা-বিশারদ যুবকই তোমাদের সুলতান হচ্ছে। আমি আশা করবো, একে যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা দেখাবে তোমরা।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুনিয়াজাদ দিলে রূপে রসে টইটম্বুর হয়ে উঠছে। আগে সে বাচ্চাদের মজাদার কিস্সা শুনতেই বেশি ভালবাসতো। কিন্তু এখন তার দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে, মনে বসন্তের রং ধরেছে, এখন সে বড়দের কাহিনী শুনতেই আগ্রহী হয়ে উঠছে। দিদির গলা জড়িয়ে ধরে সে বললো, তারপর কি হলো দিদি। সেই জারজ সুলতান মসনদ ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন?

সুলতান শাহরিয়ার এবার মুখ খুললো, তাহলে একথা তো জান শাহরাজাদ। আমি প্রত্যেক রাতে একটি করে মেয়েকে শাদী করে ভোরবেলায় তাকে আবার কেন মেরে ফেলতাম। আসলে মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করবে যে সেই ঠকবে। বল, ঠিক বলছি কিনা?

শাহরাজাদ বলে, সত্যি মিথ্যা আপনার কাছে, জাঁহাপনা। আমি গল্প শোনাবো ওয়াদা করেছি, নিছক গল্পই শোনাচ্ছি আপনাকে। বিচারের ভার আপনার। তবে মেহেরবানী করে কালকের রাত পর্যন্ত যদি বাঁচিয়ে রাখেন, তবে এ গল্পের শেষটুকু শোনাতে পারবো আপনাকে।

আটশো একত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

তৃতীয় কুলজীবিদ্যা-বিশারদকে মসনদে বসিয়ে নিজেকে ফকির দরবেশের বেশে সাজিয়ে সুলতান নিরুদ্দেশের পথে রওনা হলেন।

বেশ কয়েকদিন পরে একদিন তিনি কাইরো শহরে এসে পৌঁছলেন। কাইরো তখন দুনিয়ার এক সেরা শহর। সেখানকার সুলতান মাহমুদ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন। মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি তার প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলেন।

সুলতান মাহমুদ তাকে চিনতে পারলেন না। সুলতান যদি ফকিরের বেশ ধারণ করে কেইবা তাঁকে চিনতে পারে?

সুলতান মাহমুদ দরবেশকে খুব খাতির যত্ন করে বসালেন। সাধুজনের সঙ্গ তার বড় প্রিয় ছিল। মাহমুদ বললেন, আপনাদের মতো আল্লাহর পীরদের দেখা পেলে আমি ধন্য হই ফকিরসাহেব। আপনি যদি মনে কোনও দ্বিধা না রেখে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানান কৃতার্থ হবো আমি।

ফকিরবেশি সুলতান বললেন, আপনার অমায়িক আদর অভ্যর্থনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি আপনার কাছে। আমি ফকির মানুষ বিষয়-আসয়েরও কোনও বাসনা নাই।

সুলতান মাহমুদ বললেন, তাহলে আপনার সংসার ত্যাগের কাহিনীই শোনান আমাকে। ঘরবাড়ি আপনজন পরিত্যাগ করে কেনই বা এই ফকির দরবেশ হয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, আপনি এখনি দরবারের কর্তব্য সমাধা করুন। পরে নিভৃত আলাপের সময় আমার কাহিনী শোনাবো আপনাকে।

সুলতানের কাহিনী শুনে মাহমুদের প্রাণ মথিত হলো। দুহাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। বললেন, আপনার সংগে চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এতকাল। কিন্তু পাশাপাশি দেশের সুলতান হিসাবে আমরা বহুকালের বন্ধু। আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্ব আরও পাকা মজবুত হলো। আপনি আমার প্রাসাদে আমারই সমমর্যাদায় সুলতানের মতো বসবাস করতে থাকুন। আজ থেকে আপনি শুধু আমার বন্ধুই নন, আমার অগ্রজপ্রতিম বড় ভাইও বটে। আমার জীবনেও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা আছে। আপনাকে সময়ান্তরে শোনাবো সে-সব।

একদিন সুলতান মাহমুদ তাঁর জীবনের এক কাহিনী শোনাতে লাগলেন ঃ

আমার এ কাহিনী, আপনার থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের দোস্ত। আপনি জন্মাবধি বাদশাহী পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কালক্রমে সুলতান হয়ে মসনদে বসে প্রজাপালন করেছেন। আর আমার কাহিনী ঠিক তার উল্টো। প্রথমে আমি দরবেশ দিয়ে জীবন শুরু করি! পরে ঘটনাচক্রে আমি আজ এই মসনদের অধিকারী সুলতান হয়েছি।

আমার বাবা অত্যন্ত দীনদরিদ্র মানুষ ছিলেন। পথে পথে পানি দেওয়ার কাজ করে অতি কায়ক্লেশে কোনরকমে দুবেলার রুটির সংস্থান করতে পারতেন তিনি। আমি যখন বড় হলাম তখন আমার পিঠেও তিনি একটা ছাগলের চামড়ার ইয়া বড় এক মশক চাপিয়ে দিয়ে বললেন, যাও পানি ভরে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে পানি ফিরি করে বেড়াও। খোদা মেহেরবান,

নিশ্চয়ই তিনি তোমার রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন।

কিন্তু বাবার মতো তাগদ ছিল না আমার। ছোটবেলা থেকেই আমি খুব দুবলা শীর্ণকায় ছিলাম। অতবড় মশক ভর্তি পানি, বাবা অবলীলায় বয়ে বেড়ালেও, আমি কিন্তু বইতে পারলাম না। কয়েক পা চলতেই হাঁপিয়ে পড়তাম।

শেষে ঠিক করলাম কায়িক পরিশ্রমের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি ফকির দরবেশ হয়ে আল্লাহর নামগান গেয়ে বেড়াবো। অনুগ্রহ করে যে যা দেয় তা দিয়েই কোনও রকমে জীবন ধারণ করবো।

একটা ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে দোরে দোরে মেগে বেড়াই এবং চলতে চলতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লে এক মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। সারাদিন ধরে সামান্য যা কিছু সংগ্রহ হয় তা দিয়ে রাত্রে একবার মাত্র আহার করি। যে-দিন কিছু জোগাড় করতে না পারি দু আঁজলা পানি খেয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

মাঝে মাঝেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতাম কোনও মসজিদের এক প্রত্যন্তে। কেউ দয়াপরবশ হয়ে একটা দিরহাম দিয়ে গেলে তাই দিয়ে দু' একখানা রুটি কিনে খেতাম।

শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে জিভ একেবারেই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। আশায় আশায় থাকতাম, যদি কোনও পয়সাওলা মানুষ একটু দয়া দেখিয়ে গোটাকয়েক দিরহাম ছুঁড়ে দিয়ে যায় তবে ভালমন্দ কিছু খেয়ে পরিতৃপ্ত হবো। তেমন ঘটনা যে আদপেই ঘটতো না তা নয়, মাঝে মাঝে মোটামুটি ইনামও জুটে যেত কপালে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো বত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

একদিন কিছু পয়সা হাতে পেয়েই বাজারের দিকে ছুটে চললাম। অনেক দিন বাদে বেশ রসনা তৃপ্ত করে ভালমন্দ কিছু খাবো পেটভরে। বাজারে এসে পৌঁছতে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। একটা বাঁদরকে ঘিরে কয়েক শো মানুষ মজা দেখতে হুড়পাড় লাগিয়েছে।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারলাম বাঁদরটাকে দিয়ে নানারকম মজাদার তামাশা দেখিয়ে ওর মালিকটা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। উদ্দেশ্য বাঁদরটাকে সে বিক্রি করতে চায়।

আমার হাতে তখন পাঁচটা চকচকে দিরহাম। ভালমন্দ খাব বলে বাজারে এসেছি। সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করলাম লোকটা যদি পাঁচ দিরহামে রাজি হয় তবে বাঁদরটা আমি কিনে নেব তার কাছ থেকে।

দর কষাকষি করতে শেষ পর্যন্ত সে ঐ পয়সাতেই বাঁদরটাকে দিয়ে দিল আমাকে। বাঁদরটা সঙ্গে নিয়ে আমি মসজিদে ফিরে এলাম। কিন্তু আমার

বা তার কারুরই জায়গা হলো না সেখানে। অগত্যা আমার পরিত্যক্ত ভাঙগাচোরা বাড়িটাতে এসেই আবার আস্তানা গাড়তে হলো।

রাতটা কোনও রকমে কাটালাম, কিন্তু ক্ষুধা বড় পীড়া দিতে লাগলো। বাঁদরটাকে নিয়ে তামাশা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবো ধান্দা করেছিলাম। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, সেই মুহূর্তে মনে হলো পয়সাগুলো দিয়ে খাবার-দাবার না কিনে ঐ বাঁদর কেনাটা যুক্তিযুক্ত হয়নি।

আমি যখন এই সব ভেবে পস্তাচ্ছি, সেই সময় লক্ষ্য করলাম, বাঁদরটা গা-ঝাড়া দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বন্য জানোয়ার হয়ে গেল। এবং আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে পলকের মধ্যে সে আশ্চর্য সুন্দর এক নওজোয়ান যুবকে রূপান্তরিত হলো।

অমন খুবসুরত ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে সে আমাকে উদ্দেশ করে বললে, মাহমুদ সাহেব, শেষ কপর্দক দিয়ে আপনি আমাকে কিনেছেন, এখন এমন অবস্থা, আমাদের আহারাদির কোনও সংস্থান নাই আপনার।

আমি বললাম, খোদা হাফেজ, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু তুমি কে? কোথায় তোমার দেশ? এবং কেনই বা আমার কাছে এলে এইভাবে?

ছেলেটি বললো, অধৈর্য হবেন না, এক সঙেগ অত প্রশ্ন করবেন না? ঘাবড়ে যাবো। তার চেয়ে এই দিনারটা ধরুন, এটা দিয়ে আপাততঃ কিছু খাবার-দাবার সংগ্রহ করে আনুন। আগে খানাপিনা করা যাক। তারপর সব কথার জবাব দেব আপনাকে।

আমি আর কোনও বাক্য ব্যয় না করে দিনারটা হাতে নিয়ে বাজারে চলে গেলাম। যত রকম মুখরোচক খানাপিনা পাওয়া গেল সবই কিনলাম। ফিরে এসে দুজনে বসে প্রাণভরে তৃপ্তি করে খেলাম সব। দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকার জন্যই বোধহয় আহারের পর নিদ্রায় চোখ বুঁজে আসতে লাগলো। মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনে।

কিন্তু ঘুম ভাঙগতেই আবার অবাক হলাম আমি। কি আশ্চর্য, এতক্ষণ যে সুদর্শন যুবকটির সঙেগ আহার নিদ্রা সারলাম সে আবার যথাপূর্ব সেই বাঁদর হয়ে গেছে।

একটু পরে বাঁদরটারও ঘুম ভাঙগলো। এবং অদ্ভুত কায়দায় গা ঝাড়া দিতেই আবার সে সেই সুন্দর সুঠামদেহী যুবকে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

—মামুদ সাহেব, সে বললো, আমাকে যখন পেয়ে গেছেন, আপনার আর কোনও দুঃখ দুর্দশা থাকবে না। আপনি ইচ্ছে করলেই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারবেন। যাই হোক, প্রথমে এই পড়ো বস্তির আস্তানা ছেড়ে শহরের এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় একটি প্রাসাদোপম ইমারত ভাড়া করতে হবে। আর আপনার ঐ ফকির দরবেশের সাজ-পোশাক ফেলে দিয়ে শাহজাদার সাজে সাজতে হবে। যান আগে হামাম থেকে গোসল সেরে আসুন। আমি আপনার সাজ-পোশাক আনছি।

স্নানাদি সেরে ডেরায় ফিরে দেখি এলাহী ব্যাপার। ছেলেটি আমার জন্য বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান সেরা একটি পোশাক নিয়ে এসেছে। সে বললো, নিন চটপট সেজে নিন তো।

আমি তার হুকুম তামিল করলাম। ছেলেটি বললো, বাঃ, চমৎকার লাগছে! একেবারে শাহজাদা। মিশরের সুলতানের দুটি কন্যা ছাড়া কোনও পুত্র-সন্তান নাই। আপনি তার কাছে গিয়ে সালাম কুর্ণিশ জানান। তিনি যখন আপনার অভিপ্রায় জানতে চাইবেন, তখন তাঁর হাতে এই ভেটের বাক্সটা তুলে দেবেন।

আপনার উপহার সামগ্রী দেখে সুলতান মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নাই। কারণ খুব কম সুলতান বাদশাহর ঘরেই আছে এ বস্তু। তিনি আপনাকে তার পরমাসুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবেন। তখন আপনি কি বলবেন তাকে?

আমি বললাম, এ তো খুব আনন্দের কথা। আমি রাজি হয়ে যাব।

আমি আর দেরি না করে তখুনি সুলতানের প্রাসাদে চলে গেলাম। খোজা এবং প্রহরীরা আমার জমকালো সাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলো। আমি যখন বললাম, মহামান্য সুলতানের জন্য কিছু ভেট এনেছি, তখন তারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে দরবার-কক্ষে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। যথাবিহিত কুর্ণিশ সালাম জানিয়ে সুলতানের সামনে বাক্সটি স্থাপন করলাম আমি।

সুলতান মহানুভব, আমার এই ক্ষুদ্র সেলামীটুকু গ্রহণ করে বান্দাকে কৃতার্থ করুন, জাঁহাপনা।

সুলতান তাঁর উজিরকে বললেন, বাক্সটা খোল দেখি।

উজির বাক্সটির ডালা উন্মুক্ত করে সুলতানের সামনে ধরলো। তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, অমূল্য মণিরত্নরাজি-খচিত এক দুর্লভ অলংকার।

—বাঃ, চমৎকার! এবার বল তোমার কি অভিপ্রায়? আমি তোমার মনঃস্কামনা পূর্ণ করবো।

আমি বিস্ময়ানত হয়ে প্রার্থনা জানালাম, মুক্তহস্ত শাহেনশাহর জগৎ জোড়া খ্যাতি, কিন্তু এ অধমের আকাঙ্ক্ষা বেশি।

সুলতান বললেন যাই হোক, অসঙ্কোচে বল, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবো।

আমি বললাম, শাহেনশাহর পরমাসুন্দরী প্রথমা কন্যার পাণিপ্রার্থী আমি।

সুলতান এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে তিনি ছোট্ট করে বললেন, বেশ, তাই পাবে।

তারপর প্রধান উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শাহজাদার দাবি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত, উজির। আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নাই। ওর মুখের মধ্যে পরম সৌভাগ্যের ছবি দেখতে পেয়েছি আমি।

উজির বললো, তা বটে, পাত্র হিসাবে অযোগ্য সে নয়, জাঁহাপনা। তবে

জামাতা বলে কথা, আরও একটু ভেবে-চিন্তে দেখলে হয় না?

—কোন দিক থেকে ভাবার কথা বলছো?

—তার যোগ্যতার আরও কিছু নমুনা জানা দরকার। আপনি এক কাজ করুন জাঁহাপনা, ধনাগারের সমস্ত মণি-রত্নের মধ্যে সব থেকে যেটি সেরা সেটা দেখিয়ে ওঁকে বলুন, কন্যার দেনমোহর হিসাবে তার সমতুল্য একটি মূল্যবান রত্ন আপনার চাই। যদি তিনি তা এনে দিতে পারেন, নিঃসংশয়েই বলতে পারা যাবে, ইনিই আমাদের শাহজাদীর যোগ্যতম পাত্র।

উজিরের কথা শুনে আমার হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। সুলতানের হুকুমে কোষাগার থেকে সবচেয়ে বড় একটি হীরকখণ্ড এনে স্থাপন করলেন তাঁর সামনে। সুলতান আমাকে আরও কাছে ডেকে বললেন, ভাল করে দেখ এই হীরেটি। শাহজাদীর শাদীর দেনমোহর হিসেবে এর তুল্য একটি হীরে আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছি। যদি তুমি এনে দিতে পার, কথা দিচ্ছি, শাহজাদীকে তোমার হাতে সঁপে দেব তখুনি।

হীরেটাকে হাতে নিয়ে ভাল করে নেড়ে চেড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর আগামীকাল আসবো বলে, দরবার ছেড়ে চলে এলাম আমার ডেরায়।

বাঁদরটা স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলো, কী, খবর শুভ?

আমি বিষণ্ণ মুখে বলতে পারলাম, নাঃ, কোনও আশা নাই। সুলতান দেনমোহর হিসাবে ইয়া বড় একটা হীরে চান। ও বস্তু মিলবে কোথায়?

বাঁদর বললো, ঘাবড়াবার কিছু নাই, হতাশ হবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। এমন জিনিস এনে দেব, সুলতানের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। আজ রাত হয়ে গেছে, এখন আর বাইরে বেরুবো না। কাল আমি আপনাকে একটা কেন দশটা বড় বড় হীরে এনে দেব।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো তেত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন সকালে বাঁদর যুবকের রূপ ধরে সুলতানের বাগিচায় গিয়ে প্রবেশ করলো। এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে পায়রার ডিমের মত প্রকাণ্ড আকারের দশটা হীরে তুলে দিল আমার হাতে।

—দেখুন তো মালিক, সুলতানের হীরেটা এত বড় ছিল?

ঝলমলে হীরেগুলো দেখে আমি নেচে উঠলাম, না না, এগুলোর চেয়ে সেটা অনেক অনেক ছোট ছিল।

দরবারে এসে যথাবিহিত কুর্ণিশাদি জানিয়ে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে আমি বললাম, জাঁহাপনা দুনিয়ার মালিক, আমি অতি দীন—আমার এই সামান্য প্রণামী গ্রহণ করে ধন্য করুন, বন্দেগী।

ছোট একটি মীনাকরা কৌটো তার সামনে রাখলাম। সুলতান উজিরকে

ইশারা করতে সে কৌটোটা খুলে ধরলো তাঁর সামনে।

সুলতান বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর উজিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার—এখন কী করণীয় উজির?

উজির বললো, আর কোনও সংশয় নাই জাঁহাপনা। সত্যিই উনি বহুত বড় ঘরের সন্তান। আপনি শাদীতে সম্মত হোন। শাহজাদী ওঁরই প্রাপ্য।

তৎক্ষণাৎ কাজী এবং সাক্ষীসাবুদদের ডাকা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে শাদীনামা তৈরি করে আমার হাতে তুলে দিল তারা। আমি তো লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইনি জীবনে তাই আমার পরম সুহৃদ বাঁদর-যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। শাদীনামাটা তার হাতে দিয়ে বললাম, কি লেখা আছে পড়ে শোনাও।

আমার হয়ে সে শাদীনামার বয়ান উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করে সভাকে শুনিয়ে দিল। তারপর গলা খাটো করে আমার কানে কানে বললো, একটা কথা দিতে হবে।

আমি বললাম, দরকার হলে জান দিতে পারি।

সে বললো, আমি না বলা পর্যন্ত শাদীর পর কয়দিন আপনি শাহজাদীর সঙ্গে সঙ্গম করবেন না।

আমি বললাম, বেশ, তাই হবে।

যথা আড়ম্বরে শাদীপর্ব শেষ হলো। বাসরঘরে শাহজাদীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। নানা গল্প-গুজবের মধ্যে আমাদের শাদীর প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। বাঁদর-যুবকের কথামতো তার সঙ্গে সহবাস করলাম না। এর পরে আরও দুটি রাত্রি নির্জলা উপবাসেই কাটালাম।

প্রতিদিন সকালে শাহজাদীর মা বেগমসাহেবা এসে কন্যার খবরাখবর নিয়ে যান। কন্যার দেহ অক্ষত রয়েছে দেখে তিনি প্রসন্ন হতে পারেন না। চতুর্থ দিন সকালে এসেও যখন তিনি কন্যার মুখে শুনলেন, সেরাতেও তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন।

—হায় হায়, একি সর্বনাশ হলো আমার মেয়ের! এখন পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাব কি করে আমি?

বেগমসাহেবা সুলতানকে জানালেন মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা। ক্রোধে ফেটে পড়লেন সুলতান, কী, এইভাবে আমার মেয়ের জীবনটাকে বরবাদ করে দেবে সে? এ সব অনাচার আমি বরদাস্ত করবো না, বেগমসাহেবা। আজকের রাতটা শুধু দেখব, আজও যদি সে আমার মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম না করে তবে ওর মুণ্ডু কেটে ঝুলিয়ে দেব এই প্রাসাদের সিংদরজায়।

সুলতানের এই হুঁশিয়ারী শাহজাদীকে জানিয়ে গেলেন বেগমসাহেবা। এবং তার কাছ থেকে যথাসময়ে আমি জানতে পেয়ে শিউরে উঠলাম। ছুটে গেলাম বাঁদর-যুবকের কাছে, এখন উপায়? আজ রাতে যদি শাহজাদীর সঙ্গে সহবাস না করি আমার গর্দান যাবে যে?

বাঁদর যুবক হাসলো, ঠিক আছে, কোনও ভয় নাই। এখন যা করতে হবে

আমি বাৎলে দিচ্ছি। আপনি আপনার বেগমের কাছে যান। গিয়ে তাকে বলুন, শাহজাদী তোমার ডান হাতের বাজুবন্ধটা আমাকে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ তিনি তোমাকে ওটা দিয়ে দেবেন। ঐ বাজুবন্ধটা এনে আমাকে দিয়ে আপনি আপনার বেগমের সঙ্গে যত পারেন সঙ্গম সহবাস করবেন। আর আমার কোনও বাধা-নিষেধ থাকবে না।

রাত্রের আহারাদি শেষ হয়ে গেলে শাহজাদীর সখী সহচরীরা বিদায় নিল। এবার আমরা শুতে যাব। শাহজাদীকে নিভৃতে পেয়ে বললাম. শাদীর পর চারটে কুমারী রাত কাটিয়েছি আমরা। নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে আছ! কিন্তু কথা দিচ্ছি আজ আমরা আনন্দের সাগরে ভেসে বেড়াব। কী, রাজি?

শাহজাদী আরক্তিম হয়ে উঠলো। মুখে কিছু বলতে পারল না, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

এবার আমি বললাম, তোমার কাছে সামান্য একটা জিনিস চাই।

শাহজাদী কথার অর্থ বোঝার জন্য আমার মুখের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল। আমি বললাম, তোমার ডান হাতের ঐ বাজুবন্ধটা আমাকে দাও।

কোনও কথা না বলে তখুনি সে বাজুবন্ধটা খুলে আমার হাতে তুলে দিল। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

বাজুবন্ধটা নিয়ে সোজা চলে এলাম বাঁদর-যুবকের কাছে, এই যে সেই বাজুবন্ধ।

বাজুবন্ধটা দেখে ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে নেচে উঠলো, ঠিক আছে, এবার আপনি আপনার বেগমের ঘরে চলে যেতে পারেন।

সে রাতে আমরা সত্যিকারের মধুযামিনী যাপন করেছিলাম। সারারাত ধরে আমরা দুজনে দুজনের মধ্যে হারিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

রতিরঙ্গ শেষ করে এক সময়ে পালঙ্কের দুপাশে দুজনে ঢলে পড়েছিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারবো না; কিন্তু এক সময় বুঝতে পারলাম, কে যেন আমার দেহ থেকে শাহজাদার সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে আবার সেই দীন ভিখারী ফকির দরবেশের শতছিন্ন আলখাল্লা পরিয়ে রেখেছে। ঘরের স্তিমিত আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। না, আমার কোনও ভুল হয় নি, সত্যিই আমি আর শাহজাদা মামুদের শাহী সাজ-পোশাকে সজ্জিত নেই। কে যেন আমাকে ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখন। সত্যিই কি স্বচক্ষে দেখছি! না, এখন এসব স্বপ্নের ঘোর? কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি। অবশেষে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না। রাত তখনও শেষ হতে কিছু বাকী ছিল, আমি আর থাকতে না পেরে, শাহজাদীকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমে পড়লাম।

তখন আমি উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি কিছুই

জানি না। এলোপাতাড়ি চলতে চলতে এক সময় এক মুর যাদুকরের বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ মুর একটা টুলে বসেছিল। আমাকে কাছে ডেকে বললো, কি ব্যাপার, এই সাত সকালে কোথায় চলেছ ?

আমি তাকে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী খুলে বললাম. ঐ সুদর্শন বাঁদর যুবকটি আসলে কোনও মানব-সন্তান নয়। ও হচ্ছে জীন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ কন্যার ওপর লোভ ছিল অনেক দিন ধরে। কিন্তু কিছুতেই কায়দা করতে পারছিল না। তার কারণ, শাহজাদীর ডান হাতে একটা মন্ত্রঃপূত বাজুবন্ধ ছিল। সেই পবিত্র কবজের দরুণ সে তার কাছে ঘেঁষতে পারছিল না। তোমাকে দিয়ে অতি সুকৌশলে ঐ বাজুবন্ধটা সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। এখন তার পোয়াবার। শাহজাদীকে কব্জায় পাওয়ার পক্ষে আর কোনও অন্তরায় রইলো না। তোমাকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য হাসিল করার পর আবার তোমাকে দীন ভিখারী সাজিয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছে। এখন সে শাহজাদীকে মনের সুখে ভোগ করবে।

যাই হোক, আমি আশা করি ঐ শয়তান জীনটাকে শায়েস্তা করতে পারবো। ঐ আফ্রিদিটা আমাদের পরমপিতা সুলেমানের বিদ্রোহী বান্দাদের একজনের বংশধর। ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।

এই বলে সে একখণ্ড বহু বিচিত্র আঁকিবুকি কাটা তুলোট কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললো, এটা ধর। ভাল করে মন দিয়ে শোন, তোমাকে যা করতে বলছি, ঠিক ঠিক সেইমতো কাজটা সমাধা করে আসবে। সোজা এই পথ ধরে উত্তর মুখে চলে যাও। যেতে যেতে এক সময় দেখবে একদল ফৌজ নিয়ে এক ফৌজদার চলেছে। তুমি তাকে সালাম করে এই কাগজখানা তার হাতে তুলে দেবে। তারপর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার যা প্রাণ চায় আমাকে দিয়ে যেও।

বৃদ্ধকে সেলাম জানিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো হেঁটে চললাম সোজা উত্তর দিকে। সারাদিন সারারাত ধরে হেঁটে চললাম। পরের দিনও চলতে থাকলাম। আরও একটা দিন একটা রাত কেটে গেল। পথ চলা আর শেষ হয় না আমার। কত গ্রাম প্রান্তর পার হয়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এক বিশাল বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে এসে উপনীত হলাম। রাত্রের মতো কোথায় দেহ রাখবো ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো একখণ্ড মরুদ্যান। ঠিক করলাম ঐ গাছের তলাতেই শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেব।

কাছে যেতে বুঝতে পারলাম, যাকে দূর থেকে সুন্দর মরুদ্যান বলে মনে হয়েছিল আসলে তা কাশ আর উলুখাগড়ার এক ঘন বনবাদাড়। যাই হোক, উপায় নাই, ওখানেই একটু জায়গা সাফ করে বসলাম। নানা জাতের রাতচরা পাখীদের বিচিত্র আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল। মাঝে মাঝে দু একটা পাখী এমন বিদঘুটে শব্দ করতে লাগলো যেন মনে হয় মানুষ কিংবা দৈত্যরা মারামারি বা দাপাদাপি করছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। নির্ঘাৎ প্রাণটা এবার বেঘোরে

যাবে। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা করে চুপচাপ বসে রইলাম।

একটুক্ষণ পরে দেখি হাজার হাজার বাতির আলো আমার দিকেই ছুটে আসছে। আমি প্রমাদ গণলাম। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। এবার মউৎ সামনে এসে গেছে।

ক্রমশঃ আলোগুলো আমার সামনে এসে আরও ঘেঁষাঘেষি হয়ে গেল। সেই হাজার বাতির আলোকে তখন আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, এক সিংহাসন অধিরূঢ় সুলতান আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ভয়ে হিম হয়ে গেছে রক্ত। পা দুখানা ঠকঠক করে নড়ছে। সুলতান হাত বাড়িয়ে বললো, আমার সেই বৃদ্ধ মুর বন্ধুর কাগজখানা কোথায়?

আমি এবার খানিকটা ভরসা পেলাম। কাগজখানা তার হাতে তুলে দিতেই সে চটপট পড়ে নিয়ে তার সেনাপতিদের একজনকে হুকুম করলো, শোন আতবাস, তুমি এক্ষুনি কাইরোয় চলে যাও। ঐ শয়তান জীনটাকে শিকলে বেঁধে আমার সামনে এনে হাজির কর।

এর প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই বাঁদর যুবকটিকে শৃংখলিত অবস্থায় এনে দাঁড় করালো সুলতানের সামনে। সুলতান কঠিন কণ্ঠে বললো, কেন এই মনুষ্য-সন্তানটির সঙ্গে প্রতারণা করেছ তুমি? বল, কৈফিয়ত দাও? কেন তুমি তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ? কেন? কী জবাব তোমার দেবার আছে এ সম্বন্ধে?

উদ্ধত জীনটি কিন্তু সুলতানের ধমকানিতে বিচলিত হলো না এতটুকু। বললো, আমার হকের ধন আমি যেন তেন প্রকারেণ কব্জাগত করেছি। মনে করি না, তাতে কোনও অন্যায় হয়েছে আমার।

সুলতান বললো, ওসব কথা পরে শুনবো, আগে ঐ বাজুবন্ধটা একে ফিরিয়ে দাও তো।

বাঁদর যুবক বললো, আমি দেব না। ঐ শাহজাদীকে পাওয়ার জন্য আমি কত কষ্ট স্বীকার করেছি কতকাল ধরে। আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না বাজুবন্ধ। কারও ক্ষমতা নাই এটা ছিনিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে।

এই বলে সে কোমর থেকে বাজুবন্ধটা বের করে গপ করে মুখে পুরে গিলে ফেললো।

কিন্তু সুলতানও ছাড়বার পাত্র নয়। বাঁদর যুবককে সে এক হাতে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। পাক খেতে খেতে সে পড়লো মাটিতে। আবার তাকে ছুঁড়ে দিল, আবার সে আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে। এইভাবে কয়েকটা আছাড় দিতেই হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে অসাড় নিষ্প্রাণ হয়ে এলিয়ে পড়ে রইলো। আর উঠলো না। তখন সুলতান অদৃশ্য সেনাদের একজনকে বললো, ওর গলাটা চিরে বাজুবন্ধটা বের কর।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো চৌত্রিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

তারপর শুনুন ভাইসাহেব, ঐ বাজুবন্ধটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েই পলকের মধ্যে সেই সুলতান আর তার অদৃশ্য সৈন্যসামন্তরা কোথায় যে মিলিয়ে গেল, আর দেখতে পেলাম না। এবং তখুনি সেই রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বেশ বুঝতে পারলাম, আমি আবার সেই শাহজাদার সাজ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে গেছি। কি আশ্চর্য কাণ্ড! আরও অবাক হলাম, কোন্ যাদুবলে আমি আবার ফিরে এসেছি আমারই প্রিয়ার পালঙ্কশয্যায়। হাত বাড়িয়ে দেখলাম, রতি-সুখ অবসাদে অসাড়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে আছে সে। খুব সন্তর্পণে সযত্নে বাজুবন্ধটা পরিয়ে দিলাম ওর ডান হাতে। কিন্তু সে জেগে উঠে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

পরদিন সকালে বেগমসাহেবা এবং সুলতানের মুখে হাসি ফুটলো। তাঁদের প্রাণাধিক কন্যার কুমারীত্ব নষ্ট করেছি শুনে আমাকে অনেক আদর সোহাগ জানালেন।

এরপর আমরা প্রেম ভালবাসার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম। তারপর একদিন আমার শ্বশুর দেহ রাখলেন। মৃত্যুর আগে আমাকে তিনি মসনদে বসিয়ে সুলতান করে গেলেন। সেই থেকে আমি কাইরোর সুলতান হয়েছি, ভাইসাব। সবই আল্লাহর দোয়া।

সুলতান মামুদ তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। দরবেশ সুলতান মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। বললেন, সত্যিই বিধাতা যার কপালে যা লিখে দিয়েছেন তা কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

সুলতান মামুদের সৌহার্দ্য ও আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে কাইরোতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন দরবেশ সুলতান।

শাহরাজাদ বললো, এরপর তিনটি পাগলের কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

একদিন প্রহরীরা তিনজনকে ধরে এনে হাজির করলো সুলতান মামুদের সামনে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে?

তিনজনেই বললো, তারা কেউ পাগল নয়। প্রহরীরা ভুল করে তাদের পাকড়াও করেছে।

সুলতান বললেন, বেশ তোমাদের কাহিনী শোনাও দেখি।

একজন এগিয়ে এসে কুর্ণিশ করে বলতে শুরু করলো :

—জাঁহাপনা, আমি একজন রেশমী কাপড়ের সওদাগর। আমার বাবা, তার

বাবাও এই ব্যবসা করতেন। হিন্দুস্থান থেকে সুন্দর সুন্দর কাশ্মীর রেশমের পোশাক-আশাক এনে এখানকার আমির বাদশাহদের কাছে বেশ চড়া দামে বিক্রি করাই আমার একমাত্র নেশা। এতে বেশ মোটা লাভ থাকে।

একদিন দোকান খুলে বসে আছি আমি, এক সময় এক বৃদ্ধাকে সংগে নিয়ে এক খানদানি ঘরের সুন্দরী এলেন। ভাল ভাল দামী যা কাপড়-চোপড় আছে দেখাতে বললেন।

একখানা কাপড় বের করে দেখাতেই তার পছন্দ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন কত দাম।

শাঁসালো মক্কেল পেয়েছি, দামটা চড়িয়েই বললাম, পাঁচশো দিনার।

মেয়েটি কোনও দরদাম করলো না। বৃদ্ধাকে নির্দেশ করতে সে পাঁচশো দিনার গুণে দিয়ে দিল। আসলে কাপড়খানার দাম দেড়শো দিনার। মফতে সাড়ে তিনশো দিনার বাড়তি মুনাফা হয়ে গেল।

পরদিন আবার এল সুন্দরী। আর একখানা কাপড় দেখাতেই পছন্দ করে পাঁচশো দিনার গুণে দিয়ে নিয়ে গেল।

এরপর এক নাগাড়ে পর পর পনেরদিন সে আমার দোকানে এসেছিল। এবং প্রতিদিন একটি করে কাপড় পাঁচশো টাকা গুণে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। প্রতিটা কাপড়েই মোটা লাভ করে আমি ফুলে উঠেছি।

কিন্তু ষোল দিনের দিন মেয়েটি এসে একখানা কাপড় পছন্দ করার পর দাম দিতে গিয়ে দেখলো, দিনারের থলেটা আনতেই সে ভুলে গেছে। লজ্জিত হয়ে বললো, ইস টাকাই আনতে ভুলে গেছি। থাম, আজ আর নেব না। কাল নিয়ে যাব।

আমি বললাম, আহা, তাতে কি হয়েছে, নিয়ে যান। এর পরে যখন সুবিধে হয় দিয়ে যাবেন। আর যদি ভুলে যান আরও খুশি হবো।

মেয়েটি বললো, না তা হয় না। ধারে আমি নেব না। কাল নগদ পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবো।

আমি দেখলাম এর আগে পনেরখানা কাপড়ে যা বাড়তি মুনাফা করেছি তাতে এ-রকম দুচারখানা কাপড় বিনে পয়সায় দিলেও আমার কোন লোকসান নাই। তাই সৌজন্যের বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। নগদ না দিয়ে সে কিছুতেই নেবে না, আর আমিও তাকে না গছিয়ে ছাড়বো না। শেষে একটা রফা হলো। মেয়েটি বললো, নিতে পারি, একটা শর্তে। আপনি আমার সংগে যাবেন আমার গরীবখানায়। আমি দাম দেব আপনাকে। নিয়ে চলে আসবেন।

আমি হাসলাম, আপনার দৌলতখানায় নিয়ে যেতে চান, পা বাড়িয়েই আছি। হাজার বার যাবো। কিন্তু মহাজনের মতো পাওনা পয়সা আদায় করতে নয়।

মেয়েটি হাসলো, বেশ তো মেহেমান হয়ে চলুন। আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়লে ধন্য হবো আমি।

আর দ্বিধা না করে দোকান বন্ধ করে ওর পিছনে পিছনে অনুসরণ করে

চললাম আমি। এক সময় একটা গলির মুখে এসে মেয়েটি একখানা বড়সড় রুমাল বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, যদি কিছু মনে না করেন, চোখ দুটো বেঁধে এই বৃদ্ধার হাত ধরে আসুন একটুখানি পথ।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কী ব্যাপার?

মেয়েটি বললো, ও কিছু না, এই গলিটার দুপাশের বাড়ির জানলায় অনেকগুলো খুবসুরত লেড়কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের যাওয়া-আসা দেখে। তাদের কাউকে যদি আপনার নজরে ধরে যায় সেই ভয়েই বাঁধতে বলছি।

হো হো করে হেসে উঠলাম, ও, এই কথা। তা বেশ, শক্ত করেই বাঁধছি।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে :

কয়েক পা চলার পরই একটা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছলাম আমরা। মেয়েটি কড়া নাড়লো। কে যেন দরজা খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বৃদ্ধা আমার চোখের পটি খুলে দিল। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, এক সুরম্য প্রাসাদের ঝলমলে মহলে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। জীবনে কখনও ঐ রকম ঘরদোর প্রত্যক্ষ করিনি। গল্প কাহিনীতে অনেক সুলতান বাদশাহর নয়নাভিরাম প্রাসাদকক্ষের বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু সেদিন নিজের চোখে যা দেখলাম তা আমার কল্পনা-রসজারিত সেই সব মানস-প্রাসাদের বিলাস-ব্যসনকে হার মানিয়ে দিল।

বৃদ্ধা আমাকে একটি ছোট ঘরে বসিয়ে অন্দরে চলে গেল। সে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে পাশের বিশাল কক্ষের চোখ বাঁধানো বাহার দেখে মোহিত হয়ে গেলাম আমি।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ঐ ঘরের এক কোণে অবহেলা ভরে স্তূপীকৃত করে ফেলে রেখেছে আমার কাছ থেকে কেনা রেশমী কাপড়গুলো। অত দামী দামী দুষ্প্রাপ্য কাপড়গুলোর দশা দেখে বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগলো। আহা, এর একখানা কাপড় পেলে মেয়েরা কত যত্ন করে আলমারীতে তুলে রাখে। আর এতগুলো মূল্যবান কাপড় এমন অযত্ন করে দলা পাকিয়ে ফেলে রেখেছে ওখানে?

করুণ চোখে কাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দুটি মেয়ে পানির গামলা হাতে করে ঢুকলো ওঘরে। ঐ রেশমী কাপড়গুলো গামলার পানিতে চুবিয়ে চুপড়ি করে স্ফটিকের তৈরি ঘরের মেঝেটার জল মুছে ঝকঝকে তকতকে করতে থাকলো।

সত্যিই এ দৃশ্য অসহ্য। মানুষের পয়সা থাকলেই কি তা এইভাবে অপব্যবহার করতে হয়? কাপড়গুলো ওরা ফালা ফালা করে কেঁড়ে ফেলে ন্যাতা বানিয়ে ফেললো!

ধোয়া মোছা হয়ে গেলে মেঝেয় মূল্যবান গালিচা এনে পেতে দিল ওরা।

তারপর এক এক করে কেদারা কুর্শি, পালংক আসলে নিখুঁত এবং চমৎকার করে সাজিয়ে ফেললো কিছুক্ষণের মধ্যে।

এরপর সেই বুড়ী এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওই ঝকঝকে সাজানো গোছানো ঘরখানায়।

আমি ভাবলাম, এবার আর রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই এরা আমাকে মেরে ফেলবে। এখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু সেই সুন্দরী আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে এল আমার সামনে। মুখে হাসি, চোখে লাস্য। হাতে ধরে নিজের পাশে রাখলো আমাকে। আমি নিরুপায়, প্রতিবাদ করবো, সাধ্য কি! সুবোধ বালকের মতো বিনা প্রতিবাদে বসে পড়লাম তার গা ঘেঁষে।

মেয়েটি মধুর করে হেসে আমার কানে কানে বললো, কী, আমাকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না? আমি যদি তোমাকে সারা জীবনের মতো স্বামী করে পেতে চাই, পাবো না?

আমি বললাম, কিন্তু মালকিন, আমার মতো সাধারণ এক সওদাগর আপনার যোগ্য হবে কি করে? আমি যদি সুখ-স্বপ্নও দেখি—তবু তো আপনার নফর বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছুই কল্পনা করতে পারবো না।

সুন্দরী বললো, না, না, তোমার ওসব এড়িয়ে যাওয়ার কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে কথা দাও তুমি রাজি কিনা। ভেবো না, কোনও ঝোঁকের মাথায় এসব কথা বলছি। আমার প্রতিটি প্রত্যংগ তোমার সংগে মিলিত হতে চায়, আমি তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি, মেরি জান!

ভেবে পেলাম না দুনিয়াতে এত সুন্দর সুন্দর নওজোয়ান থাকতে আমাকে সে এত পছন্দ করলো কি দেখে। তবে এও ঠিক, ভালবাসা এমনই বস্তু যা কখনও যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না।

মেয়েটি আমাকে নীরব থাকতে দেখে বললো, চুপ করে থেক না। কথা দাও, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার মত পেলে এক্ষুনি আমি কাজীকে ডেকে পাঠাবো। আজই হবে আমাদের প্রথম মিলন উৎসব।

আমি না করতে পারলাম না। এবং সেই রাতেই আমাদের শাদী হয়ে গেল। এ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে।

পরপর কুড়িটি সুখ-সংগমের বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। বুড়ো মায়ের জন্য চিন্তিত হলাম আমি। বিবিকে বললাম, দেখ, বেশ কিছুদিন বাড়ি ছাড়া, আমার বুড়ো মা বেচারা বোধহয় কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। তাছাড়া দোকানপাটও বন্ধ আছে—ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠবে যে।

সে বললো, ঠিক আছে। প্রত্যেক দিন দোকানে যাবে, মাকে দেখে আসবে। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে একটা রাতও কাটাতে পারবো না আমি। রুমালে চোখ বেঁধে দেবো, আমার বুড়ি বাঁদীর সংগে যাবে, আবার তার সঙ্গেই ফিরে আসতে হবে।

প্রতিদিন সকালে চোখ বেঁধে বুড়ির হাত ধরে প্রাসাদের বাইরে বের হই।

গলি পার হয়ে বড় রাস্তার মুখে এসে সে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, আমি আর তোমার সঙ্গে যাবো না বেটা। এইখানেই বসে থাকি, সারাদিন শেষে সব কাজ সেরে যখন ফিরে আসবে আবার চোখ বেঁধে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাব।

এইভাবে তিনটি মাস কেটে গেল। আমার প্রতি এক বিন্দু আকর্ষণ কমলো না আমার বিবির। বরং আদর যত্ন সোহাগ চুম্বনের মাত্রাটা যেন দিন দিন বেড়েই চললো।

একদিন বাড়ির এক নিগ্রো দাসীকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মেয়ে, একটা কথা বলতে পার? তোমাদের মালকিন একজন পরমাসুন্দরী, পয়সাওলা ঘরের মেয়ে। কিন্তু আমার মধ্যে সে এমন কি অসাধারণ বস্তুর সন্ধান পেয়েছে যার জন্যে এত ভালবাসা এত দরদ দেখায়, এমন আড়াল করে আগলে রাখার চেষ্টা করে?

মেয়েটি জিব কেটে দু'কানে হাত রাখলো, সর্বনাশ, এ সব কি বলছেন মালিক? মালকিন জানতে পারলে আমার গর্দান যাবে।

আমি বললাম, কথা দিচ্ছি, তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কোন মানুষ জানবে না, বল।

দেখলাম নিগ্রো মেয়েটি আতঙ্কে সিটিয়ে যাচ্ছে। ফিস ফিস করে বললো, সে অনেক কথা। এখানে দাঁড়িয়ে টুক করে বলা যাবে না। এখন যান, যদি কখনও তেমন সময় সুযোগ পাই, বলবো আপনাকে। বহুৎ কেচ্ছা আছে ভিতরে, অনেক সময় লাগবে।

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না আমার সামনে। আমিও চলে এলাম নিজের ঘরে।

এর কয়েকদিন পরে দোকানে বসে আছি—এক সময় দেখলাম, রংদার সাজ-পোশাক পরা এক ষোড়শী আমার দোকানের সামনে এল। অবাক হলাম, মেয়েটি নির্লজ্জের মতো আমার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে অতি মন্থর পায়ে পার হয়ে গেল। একটু পরে দেখলাম মেয়েটি আবার ফিরে আসছে আমার দোকানের দিকেই। ভাবলাম কোনও খদ্দের হবে, উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতে সে দোকানের ভিতরে এসে বসলো। ওর হাতে একটা ছোট থলে।

মেয়েটি থলে থেকে একটা ছোট্ট সোনার মোরগ বের করে বললো, এর চোখ দুটো হীরের। খুব সখের জিনিস। কিন্তু দায়ে পড়ে বেচতে এসেছিলাম। তা এসব বাহারী জিনিসের সমঝদার আদমী আজকাল আর নাই। কেউ দরই দিতে চাইলো না। আপনাকে দেখে বড় বংশের ছেলে বলে মনে হলো, তাই ভাবলাম আপনি হয়তো দিলেও নিতে পারেন।

খেলনাটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম। সত্যিই ব্যবহারিক কোনও মূল্য নাই, তবে ঘর সাজাবার জন্য বড়লোক এবং সৌখিন ব্যক্তিরা নিলেও নিতে পারে। আমার বিবির ভাল লাগতে পারে ভেবে বললাম, একশোটা দিনার আমি দিতে পারি। যদি রাজি থাকেন দিয়ে যেতে পারেন।

মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বললো, একি বলছেন, আমির সাহেব। হাজার

দিনার যার দাম মাত্র একশো দিনারে তা কিনতে চাইছেন ?

—আমি জানি এর দাম এক হাজারেরও বেশি। কিন্তু আদপে আমার প্রয়োজন নাই এ জিনিসে। নেহাত আপনি দায়ে ঠেকেছেন, তাই একশোটা দিনার দিতে পারি। না হলে অন্য কোথাও দেখুন, যদি কারো নজরে ধরে যায় বেশি দাম পেলেও পেতে পারবেন।

মেয়েটি কিন্তু নড়লো না। বললো, বাজারের সব মক্কেলকেই যাচাই করে করে দেখে এলাম। কিন্তু ভোঁতা। সবাই ফোকো কাপ্তেন। কারো শখ নাই রুচি নাই। সে যাক আপনি আর কিছু দিতে পারেন কিনা, দেখুন।

আমি বললাম, না, একশোটা দিনারই দিতে পারি।

মেয়েটি কি যেন একটু ভাবলো, তারপর বললে, বেশ ওতেই রাজি, তবে আর একটা ছোট্ট জিনিস চাই। পয়সার জিনিস নয়।

—কী ?

—আপনার এই টুকটুকে গালে ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দিতে চাই।

অদ্ভুত প্রস্তাব তো! কেমন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলাম। অমন রূপসী তরুণীর চুম্বন,—সে তো আমারই বাড়তি লাভ। বললাম, বেশ আমি রাজি।

মেয়েটি তখন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখের নাকাব তুলে আমার বাঁ গালের ওপর অধর রাখলো। কিন্তু একি! মেয়েটি অমনভাবে দাঁত দিয়ে আমার গালের চামড়া কামড়ে ধরেছে কেন ?

নিজেকে ছাড়িয়ে দেবার জন্য একটু জোর দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমার গাল বেয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। যাবার সময় সে কিন্তু আমার দেওয়া দিনারের থলেটাও নিয়ে গেল না।

সোনার মোরগটা হাতে নিয়ে ভাবলাম, এর দাম একটি সুন্দরী নারীর দাঁতের দংশন!

ঘরে ফিরে এসে বিবির হাতে মোরগটা তুলে দিতে গিয়ে হোঁচট খেলাম।

—থাক আর ঢং দেখাতে হবে না।

—হঠাৎ এত রাগ কেন, মনি ? তোমার জন্যে আশা নিয়ে কিনে আনলাম।

এবার সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, কিনে আনলে ? কী দাম দিয়ে ? সুন্দরী নারীকে চুম্বন বিলিয়ে ? বেতমিজ বেল্লিক কোথাকার ?

প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলে সে আমার বাঁ গালের ক্ষতটার ওপর। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। তারপর পড়ে গেলাম মেঝেয়। আর মনে নাই।

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলো। স্ফটিকের মেঝের ওপর তখনও আমি পড়ে আছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সামনে একটা কুর্শিতে বসে আছে আমার বিবি। ইশারা করতেই চারটি মেয়ে ধরাধরি করে একটি মেয়ের লাস এনে রাখলো আমার পাশে। আঁৎকে উঠলাম আমি। দোকানে যে মেয়েটি

আমার গালে দংশন করে এসেছিল সেই মেয়েটি। ছোরার আঘাতে আঘাতে সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত। অমন সুন্দর লাবণ্যময়ীর একি বীভৎস চেহারা? আবার আমি সংজ্ঞা হারালাম। তারপর থেকে মাথাটা আমার বিগড়ে গেছে। নিজেকে আর কিছুতেই সাহস করতে পারি না। যখনই ঐ মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত চেহারা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, তখনই কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। আর মাথা ঠিক রাখতে পারি না, আবোল তাবোল বকি, অকারণে অন্যাকে আঘাত করি, কিংবা কোনও রকম অশোভন আচরণে মত্ত হয়ে উঠি।

সুতরাং বুঝতে পারছেন, জাঁহাপনা, আসলে আমি দুষ্ট লোক নই। নেহাতই নসীবের ফেরে এই রকম হয়ে গেছি। তাই আমার আর্জি জাঁহাপনা, এ বান্দার জানটা আপনি রক্ষা করুন।

সুলতান মামুদ উজিরকে বললেন, বড় তাজ্জব কি বাত উজির। কী ব্যাপার বলতো? এই রমণীটি কে? কেনই বা এই সওদাগর বেচারাকে সে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আদর সোহাগ করেছিল, আর কেনই বা আবার তাকে কুকুর বেড়ালের মতো মারধোর করে পথে নামিয়ে দিয়েছে—একেবারে পাগল বানিয়ে? চল, ওকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধান করতে হবে। আসল ঘটনা আমাকে জানতেই হবে।

উজির বললো, তা হলে আপাতত বাকী দুজনকে ছেড়ে দেওয়া যাক, জাঁহাপনা। আমার মনে হয় একে সঙ্গে নিয়ে সেই গলিটার মুখে গেলে হদিশ একটা মিলে যাবে।

সুলতান এবং উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগর যুবক এক সময় সেই গলির মুখে এসে দাঁড়ালো, এই সেই গলি, জাঁহাপনা, এখানেই আমার চোখে ফেটি বাঁধা হতো। তাই এর পরের নিশানা আর বলতে পারবো না আমি।

সুলতান বললেন, এ গলির ভিতরে প্রাসাদতুল্য একটিমাত্র ইমারতই আছে। এবং সেখানে তো আগের সুলতানের একটি বিধবা বৃদ্ধা বেগম তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বসবাস করে। তাহলে কি ঐ শাহজাদীই এই সওদাগরকে শাদী করেছিল।

উজির বললো, অসম্ভব নয়।

সুলতান বললেন, চল এগোন যাক।

কয়েক পা আসার পর একটি দরজায় কড়া নাড়লেন সুলতান মামুদ। একটি খোজা নফর এসে দরজা খুললো। সুলতানকে দেখেই সে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে ছুটে অন্দরমহলে চলে গেল খবর দিতে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো সাঁইত্রিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে:

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরী হারেম থেকে বেরিয়ে এসে সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে সাদর অভ্যর্থনা করে অন্দরে নিয়ে গেল।

আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন কে এই সুন্দরী। সুলতান

মামুদ—সুলতানের বড় মেয়েকে শাদী করেছিলেন। এটি তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। সুলতান মামুদ তাঁর শ্যালিকাকে বোঝালেন, ঘর-সংসার করতে গেলে ছোটখাট অসংগতি কিছু ঘটেই থাকে তার জন্যে কেউ শাদী করা স্বামীকে পরিত্যাগ করে না। আমি কথা দিচ্ছি, এরপর তোমার স্বামী অন্য কোনও মেয়েকে চুমু খাওয়ার জন্য গাল পেতে দেবে না। ওকে তুমি গ্রহণ করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর। আমি ভায়রাকে আমার দরবারের আমির করে নিলাম আজ থেকে!

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামলো একটু, তারপর বললো, যদি অনুমতি করেন তবে এবার বাকী দুই পাগলের কাহিনীও শোনাতে পারি, জাঁহাপনা।

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, বেশ তো, শোনার জন্যই তো আমি রাত জেগে বসে আছি শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ দ্বিতীয় পাগলের জবানীতে কাহিনী শুরু করে ঃ

আমিও এক সওদাগর। আমার বাবাও সওদাগর ছিলেন। এই শহরেই স্যাকরা বাজারে আমার দোকান। সব রকম অলংকারই বিক্রি করি আমি। বিশেষ করে আমার দোকানের বাহারী বাজুবন্ধের খ্যাতি শহরের সকলেই জানেন।

ছোটবেলা থেকেই আমি ভীষণ লাজুক প্রকৃতির ধর্মপ্রাণ ছেলে। নরনারীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি না কখনও। আমার স্বভাব চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে শাদীর জন্য কত কন্যার মায়েরা আমার মাকে ধরাধরি করতে আসতো। কিন্তু একেবারে উঠতি বয়স, মা রাজী হতেন না। ছেলে আর একটু বড় হোক তারপর শাদীর কথা ভাবা যাবে।

আমারও ভি শাদী নিকা সম্বন্ধে তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না। আমার নিত্যসংগী কোরাণ নিয়েই সময় কেটে যেত বেশ সুন্দরভাবে।

একদিন আমার দোকানে একটি বেঁটে মুটকী নিগ্রো তরুণী এলো। হাতে তার একখানি খৎ। বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার মালকিন দিয়েছেন, মেহেরবানী করে পড়ে জবাব লিখে দিন।

খুলে দেখলাম, একখানি রগরগে প্রেমপত্র। প্রেমপত্র না বলে কামপত্র বলাই সঙ্গত। প্রতিটি ছত্র কুৎসিত কামনার বিকৃতির ছবি। গা জ্বলে গেল। দাঁত কড়মড় করতে করতে চিঠিখানি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে পায়ের তলায় পিষে দিলাম।

নিগ্রো মেয়েটির চোখে মুখে তখন বিস্ময় আতঙ্ক। ওর কান ধরে হিড় হিড় করে দরজার কাছে নিয়ে এসে পাছায় একটা লাথি মেরে দোকানের বাইরে বের করে দিলাম।

নির্লজ্জ বেহায়া বেয়াদপ বেশরম মাগী, দূর হ, আমার দোকান থেকে। ফের যদি এ মুখো কখনও হো'স, মেরে বদন বিগড়ে দেব। যা, তোর ঐ খানকী মালকিনকে গিয়ে বলগে, বেশ্যাবৃত্তি করার সাধ জাগে যদি তবে পট্টিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিক। অনেক মক্কেল জুটবে। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে গেলে বিপদ হবে।

আমার দৃপ্ত চরিত্রের দার্ঢ্য দেখে আশেপাশের সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন বয়স আমার মাত্র ষোল, এর অনেক পরে বুঝেছিলাম সে দিনের সেই আদর্শ চরিত্রের অহঙ্কার কতই না অসার ছিল। বয়স বাড়ার সংগে সংগে নানা ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেলাম। তখন জানতে পারলাম চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে এতদিন যা করে এসেছি আসলে তার কোনও মানে হয় না।

আমি যুবক। যৌবনের মধুর স্বাদ আমাকে পাগল করেছে। এ বস্তু কৈশোরে কি করে অনুভব করা যাবে? আজ আমি ভালবাসার আলোয় উদ্ভাসিত হতে পেরেছি। কিন্তু তখন কৈশোর কালে অবোধের মতো তাকে পায়ে দলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

যৌবনের মধুপ আমাকে জানিয়ে দিল, এবার সময় হয়েছে, শাদী কর। আল্লার ইচ্ছায় শাদীও আমি করেছিলাম।

একদিন বিকেলে গোটা পাঁচ-ছয় ফর্সা বাঁদী নফরানী এসে ঢুকলো আমার দোকানে। তাদের সংগে একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী মালকিন। ভাব-সাব দেখে মনে হলো যেন এক শাহজাদী। বেশ গুরুগম্ভীর চালে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সে, আপনার দোকানে ভাল গহনাপত্র কিছু আছে?

আমি বললাম, যা আছে দেখাতে পারি, যদি আপনার পছন্দ হয়—

সে বললো, আমাকে এক জোড়া তাগা দেখান তো?

বেশ ভারি ওজনের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা এক জোড়া তাগা বের করে দিলাম। আমার দোকানের সবচেয়ে দামী অলংকার।

মেয়েটি বললো, হাতে হবে কিনা একবার পরিয়ে দেখান। বাঁদীরা এসে বোরখা তুলে শাহজাদীর দুখানা হাত-এর আস্তিন গুটিয়ে বাহুমূলে সরিয়ে দিল। তাগা পরাবো কি, আমি ঐ হাতের নিখুঁত গড়ন এবং পেলব কোমলতা দেখে হতবাক হয়ে গেছি তখন। কোনও মানুষের হাত যে এমন সুন্দর ছাঁচে ঢালা হতে পারে ভাবতে পারিনি।

আমার ভারি ওজনের তাগাটা ও হাতে আদৌ মানায় না। লজ্জিত হয়ে বললাম, মাফ করবেন শাহজাদী ও হাতের যোগ্য তাগা আমার দোকানেই নাই।

তখন সে বললো, ঠিক আছে, পায়ের একজোড়া মল দিন। বলা বাহুল্য

আমার দোকানের সেরা জিনিসই বের করলাম। বাঁদীরা শাহজাদীর গোড়ালি থেকে শালোয়ার-এর হেমটা হাটু পর্যন্ত উঠিয়ে ধরলো, নিন, পরিয়ে দিন?

আমি লজ্জিত হলাম এবারও। বললাম, ঐ হুরীর মতো সুন্দর পায়ে এ মল মানাবে না।

মেয়েটি বললো, ঠিক আছে আমার গলার একটি নেকলেস আর বুকের মাপের একটা সাতনরী দিন।

মেয়েরা এগিয়ে বললো, দাঁড়ান আগে মাপ নেবেন তো, তা না হলে বুঝবেন কি করে কোনটা জুৎসই হবে?

এই বলে বাঁদীরা শাহজাদীর অঙ্গবাস এক এক করে খুলে ফেলতে লাগলো।

সবই খোলা শেষ হয়ে গেছে, বাকী রয়েছে মাত্র পাতলা একটা রেশমী শেমিজ।

আমি ঘামতে থাকলাম। দুটি সুন্দর সুগঠিত স্তন উদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়ে এল আমার বুকের কাছে। শাহজাদীর চোখে লাস্য, অধরে দুর্বোধ্য হাসি। শেমিজটা নিজেই খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, কই, হাত দুখানা দিয়ে মুঠি করে ধরে মাপটা নিন ভাল করে?

আমার তখন বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বললাম, থাক থাক, আমি আন্দাজেই মাপ নিতে পারবো, আপনি ঢাকুন।

—কেন, ঢাকবো কেন? আমি কি সত্যিই এত কুৎসিত, কুরূপা!

আমি প্রতিবাদ করে বলি, কুৎসিত? আপনার মতো সুন্দরী বেহেস্তের পরীরাও নয়, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

তবে যে আমার বুড়ো বাবা আমাকে দিনরাত, কানি, বাঁদরমুখী, লেংড়ী, কুঁজি বলে গালাগাল করে। বলে, তোর মতো মত কুৎসিত মেয়েকে শাদী দিতে আমার জান শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা বলুন না সাহেব, সত্যিই কি আমার শাদী নিকা কিছু হবে না?

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কি? আপনার মতো সুন্দরী কন্যা সারা দেশে কটা আছে? মুখ ফুটে চাইলে আপনি অনেক সুলতান বাদশাহর ছেলেকে পাবেন।

মেয়েটি বললো, না না, আপনার চোখে রং ধরেছে, তাই এসব কথা বানিয়ে বানিয়ে শোনাচ্ছেন আমাকে। আমার বাবা—শেখ ইসমাইল কত চেষ্টা করছে, কিন্তু সুলতান বাদশাহ দূরে থাক একটা বণিক সওদাগর পাত্রও জোটাতে পারছে না।

আমি বললাম, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

মেয়েটি অসঙ্কোচে বললো, তাহলে আপনিই রাজি হয়ে যান না। আমার একটা হিল্লে হয়ে যায় তা হলে।

—আমি? আমাকে শাদী করবেন আপনি? আমি তো সামান্য একজন স্যাকরা। আপনার মতো সুন্দরী পত্নী আমি আশা করবো কি করে।

—আহা, ওসব রাজি না হওয়ার বাহানা।

আমি বললাম, আমি রাজি।

মেয়েটি বললো, তা হলে আমার বাবার কাছে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করুন। বলবেন, আপনার একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী আমি। তার সম্বন্ধে আমার সবকিছুই জানা হয়ে গেছে।

বাবা তবু আমার গুণের কথা শোনাতে ছাড়বেন না আপনাকে। বলবেন, আমার মেয়ের মতো কালো কুৎসিত মেয়ে আরবে দুটি নাই। আপনি তখন বলবেন, আমি তা জানি, এবং সব জেনেশুনেই শাদী করতে চাইছি। বাবা তবু আপনাকে নিরুৎসাহ করার জন্য বলবেন, তার তো একটা চোখ কানা, লাঠিতে ভর দিয়ে লেংড়িয়ে চলে, কোমরে বাত, পিঠে ইয়া বড় কুঁজ, চিৎ হয়ে শুতে পারে না। যত রকম অঙ্গহানি ঘটতে পারে মানুষের দেহে তার সব রকম ফিরিস্তি তিনি শুনিয়ে দেবেন আপনাকে। তাঁর আসল মতলব আপনাকে নিরুৎসাহ করে ফিরিয়ে দেওয়া।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এতে তার কি ফয়দা হবে। এভাবে পাত্রদের ফেরাতে থাকলে তো কোনও দিন আপনার শাদী দিতে পারবেন না তিনি।

—আমার তো শাদী দিতে চান না তিনি। আমি তাঁর ভীষণ আদরের দুলালী। এক পলক চোখের আড়াল করতে পারেন না! অথচ মেয়ে ডাগর হয়েছে, শাদী দিতে না চাইলে সমাজে নিন্দে হবে। তাই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন।

আমি বললাম, কিন্তু ও চালে তো এ ভবি ভুলবে না, মালকিন! যেভাবে উনি আমাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করুন আমি শুধু বলবো, আমি সব জানি, সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছি। আপনি শাদীর আয়োজন করুন, আপনার এই কন্যাকেই শাদী করবো আমি।

—বহুত আচ্ছা, মেয়েটির চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। তা হলে শুভ কাজে আর দেরি করবেন না, আমি ঠিকানা বাৎলে দিচ্ছি, আজই আপনি আমার বাবা শেখ ইসমাইলের বাড়িতে চলে যান।

মেয়েটি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে যেতে আমি দোকানপাট বন্ধ করে শেখ ইসমাইলের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

বাড়িটা বেশ বড়সড়। খানদানি কিনা জানি না, তবে বেশ পয়সাওলা লোকের ইমারত বলে মনে হলো।

দরজায় নিগ্রো নফর ছিল, তাকে বলতেই সে আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। দেখলাম, গালিচার ওপর বসে এক অশীতিপর পলিতকেশ বৃদ্ধ কোরান পাঠ করছেন। বয়সের ভারে দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। একটা চোখ কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত। বুঝলাম, যে-কোন কারণেই হোক চোখটা হারিয়েছেন তিনি।

সালাম আদান প্রদানের পর তিনি আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে

চাইলেন। আমি বললাম, আপনার একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে এসেছি আমি। যদি আমাকে অপছন্দ না হয় তবে তাকে শাদী করতে পারি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার দিক থেকে আপত্তির কোনও প্রশ্ন ওঠে না। মেয়েকে আমি পার করতে পারলে উদ্ধার পাই। কিন্তু তেমন উদারচেতা পাত্র কোথায় পাব বাবা—যে সব জেনে-শুনে আমার ঐ কুরূপ কুৎসিত, কানা-কুজি লেংড়ি, বামন জরাগ্রস্ত মেয়েকে শাদী করবে?

আমি জানতাম শেখ সাহেব কন্যার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি যা যা বলবেন সব আমার জানা, শেখজী। সব জেনে-শুনেই আপনার কন্যাকে শাদী করতে এসেছি আমি। এখন আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সব নির্ভর করছে।

বৃদ্ধ অবাক হলেন। দেখলাম, একটু পরে তাঁর দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বুঝলাম, এবার নিশ্চিতভাবে মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে হবে জেনে তিনি আর শোক সামলাতে পারছেন না। এবং মুখ ফুটে বলেও ফেললেন, ঠিক আছে বাবা, শাদী আমি দেব। কিন্তু এই বৃদ্ধের একটি আর্জি আছে, বাবা।

আমি বিব্রত বোধ করলাম, আহা অমনভাবে বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আর্জি কেন, আদেশ করুন, কী করতে হবে।

শেখ ইসমাইল বললো, শাদীর পর, যতদিন না সে সুস্থ হয়ে চলা ফেরা করতে পারে ততদিন আমার এই বাড়িতেই তোমরা বসবাস করবে। আমি কথা দিচ্ছি, জামাই হিসাবে কোনও অনাদর হবে না আমার কাছে।

আমি বললাম, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব!

বৃদ্ধ শেখ সেই রাতেই কাজী ডেকে শাদীনামা লেখালেন। যথাসময়ে শাদীর আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল।

এবার আমাদের মধুযামিনী শুরু হবে। মনে অনেক রঙিন কল্পনা। কি ভাবে প্রিয়তমাকে আদর-সোহাগ চুম্বন সহবাস করবো, তারই মহড়া দিয়েছি সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যে।

কিন্তু সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে। বাসরঘরে ঢুকে পাত্রীকে দেখে আমি মাথাঘুরে পড়ে গেলাম। শেখ ইসমাইল এতটুকু মিথ্যে বলেননি। বরঞ্চ নিজের কন্যা বলেই বোধহয়, তার কুরূপের যথার্থ বর্ণনা দিতে পারেননি।

কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে যে কেটেছিল রাত্রিটা তা বোঝাতে পারবো না। মনে হতে লাগলো, আমি বুঝি বা পাগল হয়ে যাব।

খুব সকালে উঠে দোকানে চলে এলাম। দোকান খুলে গুম মেরে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছি এমন সময় আমার একদল ইয়ারদোস্ত এসে মজাক মস্করা করতে শুরু করলো।

– কী হে দোস্ত, এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজটা সারলে? তা বেশ, শাদী করেছ ভালই করেছ, এখন মিঠাই-মণ্ডা, খাওয়াও দেখি।

ওদের নানারকম কাঁচা রসিকতায় মনটা আরও বিষিয়ে উঠলো। কিন্তু কি করবো, নিরুপায়, নীরবে সব সহ্য করে যেতে হলো। নাছোড়বান্দা বন্ধুদের

মিষ্টিমুখও করাতে হলো।

দুপুর গড়িয়ে গেল।

একসময়ে সখী বাঁদী পরিবৃত হয়ে আবার এসে উপস্থিত হলো সেই সুন্দরী শাহজাদী। চোখে-মুখে তার হাসির ঝিলিক খেলে যাচ্ছিল।

—কী সাহেব, সোহাগ-রাত কাটলো কেমন?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো একচল্লিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে :

আমি চিৎকার করে উঠলাম, আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ করবেন, শয়তানী কোথাকার! তোমার মতো বাজারের বেবুশ্যার পাল্লায় পড়ে আজ আমার জানটাই বরবাদ হয়ে গেল। তবে এও বলে দিচ্ছি, অহেতুক একটা নিরীহ লোকের অনিষ্ট করে তোমার দোজকেও ঠাঁই হবে না।

—অহেতুক কোনও লোকের অনিষ্ট করা আমার পেশা নয় সাহেব। তবে জেনে রাখুন একদিন আমার মহব্বতকে আপনি অবজ্ঞা করেছিলেন, আমার প্রেমপত্রকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আমারই নিগ্রো বাঁদীর সামনে পায়ে দলে ছিলেন, এ তারই প্রতিশোধ।

মেয়েটির চোখে আগুনের ঝলকানী দেখলাম। নিমেষে সব ব্যাপারটা পানির মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল আমার সামনে। ওর পাছাটা জড়িয়ে ধরলাম আমি, না জেনে যে অন্যায় করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি, শাহজাদী। তুমি আমাকে ঘৃণা করে চলে যেও না।

আমার কথায় সে নরম হলো। বললো, তোমাকে খানিকটা শিক্ষা দেবার সাধ হয়েছিল আমার। এবং তা আমি যথার্থ ভাবেই মিটিয়ে নিয়েছি। এবার আর কোনও রাগ নাই। বেশ, তুমি যদি রাজি থাক, তবে যাও, ঐ শেখ ইসমাইল-এর বাড়ি গিয়ে তোমার নব-পরিণীতাকে বয়ান তালাক দিয়ে এস। দেনমোহর যা লাগে আমি দেব। তারপর সন্ধ্যাবেলায় আমার নফর এসে তোমাকে নিয়ে যাবে আমার প্রাসাদে।

তার কথামতো বিশ হাজার দিনার দেনমোহর গুনাগার দিয়ে তখুনি শেখ ইসমাইলের কন্যাকে তালাক দিয়ে এলাম আমি।

সেই রাতেই শাহজাদীর সঙ্গে শাদী হলো আমার।

এরপর পুরো একটা মাস সোহাগ সম্ভোগের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম আমরা। কিন্তু আমার বিবি ভীষণ কাম-কাতর। দিনে দিনে বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গম-ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসছে। এতে সে ক্ষুব্ধ হতে লাগলো। শেষে একদিন যখন শরীর খারাপের অজুহাতে আমি তার সঙ্গে সহবাসের অক্ষমতা জানালাম সে আমাকে বেদম প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেললো। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলাম, আমি পাগলা গারদে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে আছি।

এই হচ্ছে আমার কাহিনী, জাঁহাপনা।

সুলতান মামুদ বললেন, তোমার বিবির প্রাসাদ চিনে যেতে পারবে।

দ্বিতীয় পাগল বললো, হ্যাঁ, পারবো, জাঁহাপনা।

তখন সুলতানের ইশারায় তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হলো। সুলতানকে সংগে নিয়ে সে তার বিবির প্রাসাদে এসে হাজির হলো। শাহজাদী সুলতানকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো।

সুলতান মামুদ বললেন, তুমি হচ্ছো আমার এক শ্যালিকা। আর এ হচ্ছে আমরা ভায়রা। দাম্পত্য-জীবনের অনেক গরমিল মানিয়ে চলতে হয়। নিজের স্বামীকে কি কেউ একটা তুচ্ছ কারণে পরিত্যাগ করে। তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার কর এই আমি চাই। আজ থেকে আমার এই ভায়রাটিকে দরবারের অন্যতম আমীর করে নিলাম।

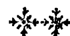
শাহজাদী কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য, জাঁহাপনা। এরপর থেকে আপনার ভায়রার প্রতি আর কোনও খারাপ আচরণ করবো না, কথা দিচ্ছি।

সুলতান বললো, যাক তুমি আমার বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নামিয়ে দিলে।

শাহরাজাদ থামলো। শারিয়ার বললো, এরপর আর একজনের কাহিনীটা শোনাবে না?

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা—হুকুম করলেই শোনাতে পারি।

এরপর শাহরাজাদ তৃতীয় পাগলের ইতিবৃত্তান্ত বলতে শুরু করে:

তৃতীয় পাগল তার কাহিনী বলতে শুরু করলো:

আমি যখন খুব ছোট, সেই সময় আমার বাবা-মা মারা যায়। নিতান্তই গরীব ছিল আমার বাবা। সুতরাং অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে বড় হতে লাগলাম আমি।

লেখা-পড়া শেখা হলো না। দয়া করে তারা যা খেতে-পরতে দিত তাই খেয়ে-পরে কোনও রকমে পরগাছার মতো বাড়তে থাকলাম। এইভাবে বারোটা বছর কেটে গেল।

একদিন একটা পড়োবাড়ির ভিতরে ঢুকে চড়ুইপাখী তাড়া করতে করতে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধকে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। এরকম একটা জনমানব-বর্জিত নির্জন পুরীতে কোনও মানুষ বাস করতে পারে, ভাবতে পারলাম না। মনে হলো, নিশ্চয়ই ওটা কোনও জীন দৈত্য হবে। ভয়ে পালাবার জন্যে ছুট দিতে গিয়ে বাধা পেলাম।

—এই খোকা, শোন শোন, ভয় কি ? এদিকে এস। আমি কি বাঘ ভালুক নাকি ? তোমাকে খেয়ে ফেলবো ?

ছুটে পালাতে গিয়েও বৃদ্ধের কথায় থমকে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ আবার ডাকলো, কাছে এস।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

আটশো তেতাল্লিশতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে :

বৃদ্ধ কাছে ডেকে বললো, আমাকে ভয় করছ কেন অত। দেখছ না, আমি একজন বুড়ো ফকির মানুষ। ভাবছ, কোন জীন দৈত্য কিনা ? না না, ওসব কিছু নই। তোমারও কোনও ভয় নাই। আমার কাছে এস।

আমি ভরসা পেয়ে এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধ বলতে থাকলো, বুড়ো হয়েছি, বাবা। আজ বাদে কাল মরে যাবো। কিন্তু মুখে একটু পানি দেবার মতো আপনজন কেউ নাই আমার। তুমি আমার কাছে থাকবে বেটা। তোমাকে আমি নিজের ছেলে বলে বুকে টেনে নেব। তোমাকে আমি আমার বিদ্যা শিখিয়ে যাবো। আমি যা জানি সব তোমাকে দিয়ে যাবো।

বৃদ্ধের স্নেহ আদরে আমার মাতৃ-পিতৃহারা হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। সেই থেকে আমি ঐ পড়োবাড়িতে ওর আশ্রয়ে রয়ে গেলাম।

একদিন বৃদ্ধ আমাকে ভিক্ষে করে কিছু আহার্য সংগ্রহের জন্য মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললো। যারা নামাজ পড়তে আসে তারা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য দীন-দুঃখীদের দু চার দিরহাম দান-খয়রাত করে থাকে।

সেদিন মসজিদের সামনে ভীষণ ভীড়। লোকে লোকারণ্য। সুলতানের সিপাই সান্ত্রীরা জনতার ভীড় সরাতে ব্যস্ত। আমি উৎসুক হয়ে নিগ্রো খোজার ধমক উপেক্ষা করে আরও খানিকটা গিয়ে ফটকের একপাশে খাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল এক অপ্সরী তুল্যা সুলতান কন্যা। তার রূপের বর্ণনা কি দেব, জাঁহাপনা। আমার চোখ ঝলসে গেল সেই মুহূর্তে। উফ্, সে কি রূপের জেল্লা ! সমস্ত হৃদয়মন উদ্বেল হয়ে উঠল আমার। কেন জানি না, এই বয়সেই আমার দেহে কামনার বহ্নি জ্বলে উঠলো ওকে দেখে। ভাবলাম, বৃথাই আমার জীবন। দুনিয়াতে ভোগ করার এমন সব বস্তু আমাদের একেবারে নাগালের বাইরে।

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম পড়োবাড়িতে। কেন জানি না, কিছুই আমার ভাল লাগছিল না। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করতে লাগলো।

আমার অবস্থা আঁচ করে বৃদ্ধ আমাকে কাছে ডেকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো, কি বেটা কি হয়েছে ? অমন মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন ?

আমি বললাম, না, কিছু না।

বৃদ্ধ কিন্তু সে কথায় তুষ্ট হলো না, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করো

না, বাছা। আমি সব জানতে পারি।

এবার আমি কেঁদে ফেললাম। সব কথা তাকে খুলে বললাম।

—এর পর শাহজাদীকে না পেলে আমি আর বাঁচবো না; বাপজান। কেন বলতে পারবো না, আমার দেহমন অসাড় হয়ে আসছে তাকে দেখার পর থেকে।

বৃদ্ধ আমাকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো, ওরা আমির বাদশা, আর আমরা ফকির দরবেশ। ওদের দিকে নজর রাখতে নাই বাবা। তাতে কখনও শুভ হয় না। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। দুটো আলাদা জাত। একসংগে মল খায় না কোনও দিন। আমরা যেমন দীন দরিদ্র—তেমনি সামানায় সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমাদের।

আমি বললাম, তা কেন হবে? আমিও তো মানুষ?

—কিন্তু গরীব যে! ওরা সুলতান বাদশাহ—আমির আদমী, প্রচুর আছে ওদের। তাই ওদের সংগে আমাদের খাপ খেতে পারে না। তুমি নিজেকে সংযত কর বাবা। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন দেখো না।

আমি গোঁ ধরে রইলাম, না, বাপজান। আপনার কথা মানতে পারছি না। প্রাণ যায় যাক, আমার একমাত্র পণ ঐ শাহজাদীর সংগে অন্তত একটিবার আমি মিলিত হবো।

বৃদ্ধ প্রমাদ গুণলো। ছেলে নাছোড়বান্দা, তাই সে আমাকে তুষ্ট করার জন্যই বললো, আমি একটি তুক জানি। সুর্মা আছে আমার কাছে। ওটা চোখে লাগালে তোমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সোজা তুমি প্রাসাদের হারেমে ঢুকে যেতে পারবে। তোমার দেহমন আকুল হয়ে উঠেছে শাহজাদীর সংগে মিলিত হওয়ার জন্য। তাই এ সুর্মা মাত্র এ কবারের জন্য তোমাকে আমি পরিয়ে দেব। কিন্তু কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর বেটা। আমার ইন্তেকালের দিন এগিয়ে এসেছে। সামনের জুম্মাবার আমি দেহ রাখবো। এই পড়ো বাড়িই একপ্রান্তে আমাকে সমাহিত করবে তুমি। তারপর এই সুর্মা চোখে লাগিয়ে শাহজাদীর ঘরে চলে যেও। তবে খেয়াল রেখ, যে রাতে যাবে সেই রাতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে আবার রাতের অন্ধকারেই বেরিয়ে চলে আসবে, কেমন?

আমি বললাম, তাই হবে বাপজান।

এর পর শুক্রবার দিন সকালে বৃদ্ধ-তার কথামতো দেহ-রক্ষা করলো। আমিও আমার ওয়াদা মতো ঐ ভাংগা বাড়িরই একপ্রান্তে তাকে সমাহিত করলাম।

সেইদিনই সন্ধ্যার পরে সেই সুর্মা চোখে লাগিয়ে পথে বের হলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চলতে চলতে এক সময় প্রাসাদের প্রধান ফটকে এসে হাজির হলাম। প্রহরী তখন চরস খেয়ে বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছিল। তার কাছে ঘেঁষে আমি ওর ঘাড়ের নিচে সুড়সুড়ি দিলাম। লোকটা বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে তাকালো। একবার আশে-পাশে দেখে নেবার

চেষ্টা করলো, কেউ আছে কিনা। কাউকে দেখতে না পেয়ে, একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে উঠলো, অদৃশ্য মশাদের উদ্দেশে, তেরি—

আমার তখন সে কি আনন্দ! সোজা হারেমে ঢুকে পড়লাম। বাইরে সে কি কড়া প্রহরা। কিন্তু তখন আর কাকে পরোয়া করি? কেউ তো আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারছে না।

সোনার পালঙ্কে মখমল-শয্যায় শায়িতা ছিল সে। একটি মাত্র ফিন ফিনে পাতলা শেমিজ ছাড়া পরনে কোনও অঙ্গবাস ছিল না ওর। খুব ভাল করে নজর না করলে সে-শেমিজও চোখে পড়বে না কারো।

কি সুন্দর ওর নগ্ন নির্জন দেহখানি। যেন একখানি বেহালা। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ওর পীনোন্নত ছোট ছোট স্তন দুটির দিকে। অজান্তেই কখন আমার হাত দু'খানা ওর বুকে রেখেছিলাম বুঝতে পারিনি। চৈতন্য ফিরে পেলাম, শাহজাদীর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশংকায় টুক করে হাত দু'খানা সরিয়ে নিলাম আমি। একবার মাত্র সে চোখ মেলে তাকিয়ে বন্ধ করে নিল। আবার একটু পরেই ঘুমে এলিয়ে পড়লো আবার।

এবার আমি অতি সন্তর্পণে পালঙ্কের উপরে উঠে পড়লাম। আলতোভাবে শাহজাদীর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝলাম সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তখন—

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি শাহজাদীর পাশে শুয়ে আছি আমি। ভেবেছিলাম, বেশ খানিকটা অন্ধকার থাকতে সকলের অজান্তে প্রাসাদ থেকে কেটে পড়বো। কিন্তু তা আর হলো না।

দরজা ঠেলে শাহজাদীর সহচরীরা ভিতরে ঢুকলো। আমি পালঙ্ক ছেড়ে নিচে নেমে ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শাহজাদীকে ঘুম ভাঙ্গাতে এসে প্রধান পরিচারিকা আঁৎকে উঠলো।

—সর্বনাশ! একি কান্ড! শাহজাদীর জঙ্ঘায় রক্তের দাগ! সঙ্গে সঙ্গে হারেমের বুড়ি সর্দারণীকে ডাকা হলো। সে পরীক্ষা করে বললো, শাহজাদীর সতীচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই হারেমে এ কান্ড ঘটলো কি করে? এখানে পরপুরুষ এল কোথা থেকে?

শাহজাদীকে জাগানো হলো। সে-ও বললো, কি জানি, রাতের অন্ধকারে ঘুমের ঘোরেই আমি বুঝতে পারছিলাম, কে যেন আমার শরীরের ওপরে চেপে বসেছে। ছাড়াবারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

ভয়ে বুক দুরু দুরু করতে লাগলো সহচরীদের। এখন যদি সুলতান জানতে পারেন, গর্দান যাবে তাদের।

একজন বাঁদী শাহজাদীর খাবারের থালাটা এনে মেলে ধরলো, কাল রাতে শাহজাদীর জন্যে খানা-পিনা এনে রেখেছিলাম। কিন্তু শাহজাদীর তবিয়ত ভাল ছিল না বলে তিনি কিছু খেলেন না। থালাখানা টেবিলের ওপরে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। এখন দেখছি, সবই খেয়ে গেছে কে!

বুড়ি বললো, এ নির্ঘাৎ কোনও জীন দৈত্যের কান্ড। তা ছাড়া কার সাধ্য

এই দুর্ভেদ্য হারেমে ঢুকতে পারবে। তবে বাছাধন, মনে হচ্ছে, এখন পালাতে পারেনি। এই ঘরেরই কোনও খানে লুকিয়ে আছে। তোমরা এক কাজ কর, উটের গোবর-ঘুটে এখানে ডাই কর এই ঘরের মাঝখানে। তারপর আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সর্দারণীর আদেশে কয়েক ঝুড়ি উটের গোবর-ঘুঁটে এনে স্তূপীকৃত করা হলো ঘরের মেঝে। বুড়িটা নুড়ো জেবলে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারাঘর ভরে গেল। বুড়ি বললো, দরজা জানলা সব বন্ধ করে শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। তারপর আমি যখন ডাকবো তখন আসবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ার গমকে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমার। চোখ দুটো জবলতে লাগলো। আমি দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ডলতে লাগলাম চোখের পাতা।

এবং এরপর যা অবশ্যম্ভাবী ফল হতে পারে তাই হলো। আমার হাতের ডলায় চোখের সুর্মা গেল মুছে। আর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল আমার তুক। আমি দৃশ্যমান হয়ে পড়লাম।

বুড়ি আমাকে দেখতে পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো, কে আছ, শিগ্গির ছুটে এস, জীন ধরা পড়েছে।

হুড়পাড় করে একপাল নিগ্রো খোজা খাড়া উঁচিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরে। তখন আমার অবস্থাটা কি হতে পারে। আশা করি আঁচ করতে পারছেন, জাঁহাপনা।

নিগ্রো নফরগুলো আমাকে জাপটে ধরলো।

—কে তুমি? সত্যি করে বল? না হলে এখুনি কোতল করে ফেলবো।

আমি বললাম, আমাকে তোমরা মেরো না। নেহাত ঘটনাচক্রে আজ আমি তোমাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমাকে যদি জানে মারো, তবে এও বলে রাখছি, আমার ভাই জীন-সম্রাট তোমাদের বংশ নির্বংশ করে দেবে।

দেখলাম আমার এই মিথ্যে শাসানীতে ওরা একটু থতমত খেয়ে গেল। বুড়ি বললো, ঠিক আছে, ওকে জানে মারার দরকার নাই। তবে মারিস্থানে কয়েদ করে রেখে দাও আপাততঃ। পরে বিচার করা যাবে।

তৃতীয় পাগল তার কাহিনী শেষ করে সুলতান মামুদের দিকে করুণভাবে তাকালো। আমার গুস্তাকী মাফ করুন, জাঁহাপনা। কামনার বশে যে অপরাধ আমি করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত।

সুলতান ওকে শৃঙ্খল মুক্ত করার আদেশ করলেন।

—তুমি যার সঙ্গে সহবাস করেছ, সে আমার সবচেয়ে ছোট্ট শ্যালিকা। যাই হোক্, তোমার দ্বারা যখন তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে তখন তোমাকে শাদী করতে হবে ওকে। এই আমার হুকুম।

—জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য।

সুলতান মামুদ বললেন, আজ থেকে তুমিও হবে আমার দরবারের এক মহামান্য আমির। কি, ঠিক আছে?

—সুলতানের যা অভিরুচি—

শাহরাজাদ বললো, তিন পাগলের কাহিনী এখানেই ইতি। এরপর আপনাকে নতুন কিস্‌সা শোনাবো, জাঁহাপনা আলিবাবা ও চল্লিশ চোর।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে :

অনেক অনেক দিন আগে পারস্যের কোনও এক শহরে কাসিম ও আলিবাবা নামে দুই ভাই বাস করতো।

ওদের বাবা নেহাতই এক সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ছিল। সে যখন মারা গেল, দুইভাগে সামান্যই পেল ওরা পিতৃসম্পদ!

কিছুদিন পরে দুই ভাই-ই একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো। দিনান্তে দুখানা রুটির সংস্থানও আর রইলো না।

বড় ভাই কাসিম এক ছোকরা পাগলা বুড়োর নেকনজরে পড়ে গেল। তার দৌরাত্ম্য সহ্য করে দাঁত মুখ কামড়ে সে পড়ে রইলো বুড়োর লেজুড় ধরে। বুড়োটা কাসিমকে সত্যিই ভালবাসতো। তাই, তার নিজের বলবীর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারলো সবই ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেছে তখন সে সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে কাসিমকে শাদী দিয়ে দিল। মেয়েটির সঙ্গে সে নগদ বেশ কিছু অর্থ এবং বাজারে একখানা সওদাগরী দোকানেরও মালিক হয়ে গেল। এইভাবে সে দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল একদিন।

আলিবাবা একটু ভিন্ন ধাঁচের ছেলে। সে সৎভাবে খেটে খেতে চায়। তাই সে বনে বনে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে আহার্য সংগ্রহ করতে লাগলো।

আলিবাবার কোনও বাবুগিরি ছিল না। খুব মিতব্যয়ী ছেলে সে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যা রোজগার করে তার নামমাত্র খানা-পিনায় খরচ করে বাড়ীটা যে সযত্নে জমিয়ে রাখে।

কিছুদিন বাদে আলিবাবা তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি গাধা কিনলো। কিছুদিন পরে আর একটি এবং তারও কিছুদিন পরে আরও একটি গাধার মালিক হলো সে।

প্রতিদিন গাধা তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে সে বনে যায়। তাদের পিঠে চাপিয়ে বেশ মোটা মোটা কাঠ লকড়ি নিয়ে শহরে ফিরে আসে।

তিন তিনটি গাধার মালিক হওয়ার পর কাঠুরেদের মধ্যে ভীষণ আদর ইজ্জত বেড়ে গেল আলিবাবার। এক সতীর্থ কাঠুরে তার কন্যাকে শাদী করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলো আলিবাবার কাছে। বললো, দেনমোহর হিসেবে ঐ গাধা তিনটে শাদীনামায় লিখে দিলেই যথেষ্ট হবে

বাবা বিশেষ গরীব, শাদীর সময় মেয়েকে কিছুই দিতে পারলো না কাঠুরে। যাক্, ও নিয়ে ভেবে কি লাভ। আল্লাহর মেহেরবানী থাকলে গরীবের বড় লোক হতে আর কতটুকু সময় লাগে?

শাদীর কয়েক বছরের মধ্যে আলিবাবার বেশ কয়েকটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাকাচ্চা হলো। আনন্দে ভরে উঠলো ওদের সংসার। নাই বা থাকলো প্রাচুর্য, যা জুটছে, তাই যদি খুশি চিত্তে ভোগ করতে পারা যায় তার চাইতে বেশি আনন্দ আর কোথায় মিলবে?

একদিন আলিবাবা যথা নিয়মমতো বনে ঢুকে গাধা তিনটিকে চরতে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কাঠের সন্ধানে। ঘুরতে ফিরতে এক সময় গভীর গহনে ঢুকে পড়লো। অবশ্য সেখান থেকেও সে বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল গাধাগুলোর সুললিত কণ্ঠস্বর।

কিন্তু একটুক্ষণ পরে গর্দভ রব ছাপিয়ে অশ্বখুরধ্বনি শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো আলিবাবা। এই বনাঞ্চলে এমন অশ্ববাহিনীর আগমন ঘটতে পারে কি উদ্দেশ্যে? আলিবাবা আঁচ করতে পারে না। ভয়ে শিউরে উঠলো সে। নিশ্চয়ই কোনও দুর্ধর্ষ দস্যুদল অথবা ফৌজবাহিনী হতে পারে।

তাড়াতাড়ি একটা ঝাঁকড়া গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল সে। একটা শাখা-ডালে বসে, নিজেকে পাতার আড়ালে ঢেকে, নিচের বনপ্রদেশ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

একটু পরে দেখল, একদল ডাকাত এসে থামলো তার গাছের নিচে। টুপটাপ করে নেমে পড়লে তারা গাছতলার তৃণ-ঘন সবুজ শয্যায়।

লোকগুলোর চেহারা দেখলে পিলে চমকে ওঠে। উফ্, কি তাদের দৈত্য-সদৃশ আকৃতি। চোখগুলো যেন সব জ্বলন্ত ভাঁটা। সকলের দাড়িই দুভাগ করে দু গালের দিকে পাকানো, মুখের চোয়াল কঠিন। ভয়াল ভয়ঙ্কর ওদের চাহনি। মনে হয়, অনেক চুরি ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার ফেরারী আসামী এরা। ওদের যে সর্দার তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না আলিবাবা। অমন কুৎসিত কদাকার বীভৎস মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারেনি সে।

জীনে ঝোলানো গোটাকয়েক থলে খুলে আনলো তারা। এক গোছা যবের শুকনো রুটি। গোগ্রাসে সবাই খেতে লাগলো সেগুলো। গাছের ওপর থেকে আলিবাবা গুণে দেখলো ওরা মোট চল্লিশজন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বাহান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

খানাপিনা শেষ করে চল্লিশ চোর ঘোড়ার পিঠ থেকে বাক্স প্যাঁটরাগুলো নিজের নিজের মাথায় তুলে গভীর জঙ্গল ভেঙ্গে এগোতে লাগলো বনের মধ্যে। আলিবাবা গাছের শাখায় বসে দেখতে থাকলো ডাকাতগুলোর ক্রিয়াকাণ্ড।

বন যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা ছোট পাহাড়। সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে থামলো তারা। সবাই সামানপত্র নামিয়ে সার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোর সর্দার পাহাড়ের দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠলো, 'চিচিং ফাঁক'।

এবং তখুনি দেখা গেল পাহাড়ের তলদেশ থেকে মাটি দু ভাগ হয়ে সরে গেল খানিকটা। সর্দারের নির্দেশে এক এক করে সব সাকরেদরা সামানপত্র তুলে নিয়ে ফাটলের গর্তে ঢুকে গেল! সব শেষে নামলো সর্দার। আবার আওয়াজ উঠলো 'চিচিং বন্ধ্'।

আর কি আশ্চর্য, আলিবাবা প্রত্যক্ষ করলো ফাটল বন্ধ হয়ে জোড়া লেগে গেল পলকের মধ্যে।

আলিবাবা ভাবলো, যাক বাবা, ওরা তাকে লক্ষ্য করেনি, এই যা রক্ষে!

একই ভাবে গাছের ডালে বসে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

অনেকক্ষণ পরে প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। আলিবাবা দেখলো, পাহাড়ের তলার ঐ জায়গাটা আবার দুভাগ হয়ে গেছে। এবং এক এক করে ঐ চল্লিশ জন চোর তাদের খালি বাক্স প্যাঁটরাগুলো নিয়ে আবার ওপরে উঠে আসছে।

সকলে উঠে আসার পর সর্দার গুণে দেখলো, ঊনচল্লিশ জনই উঠে এসেছে কিনা। তারপর সে আবার হাঁক ছাড়লো, 'চিচিং বন্ধ্'।

তৎক্ষণাৎ ফাটলের মুখ জোড়া লেগে গেল।

ডাকাতগুলো আবার আলিবাবার গাছের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর। যদি কোন রকমে ওরা আলিবাবার অবস্থিতি টের পায় তবে আর রক্ষা রাখবে না, একেবারে কোতল করে দেবে।

কিন্তু না লোকগুলো এসে ওদের ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে আবার বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

প্রাণে ভয়, অথচ অদম্য কৌতূহল মনে। আলিবাবা সেই মুহূর্তে ভুলে গেল ওর তিনটি গাধার কথা, ভুলে গেল ওর বিবি-বাল-বাচ্চাদেরও। গাছ থেকে নেমে সে উঁকি ঝুঁকি মেরে এদিক ওদিক খুব ভাল করে দেখে নিল। নাঃ, কেউ কোথাও নাই। ডাকাতগুলো এতক্ষণে বন পেরিয়ে শহরের সীমায় পেঁছে গেছে হয়তো বা।

পায়ে পায়ে সে জঙ্গল ভেঙ্গে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোথাও তো ফাটলের রেখামাত্র দেখতে পেল না আলিবাবা। কিন্তু সে নির্ঘাৎ জানে, স্বচক্ষে দেখেছে, ঠিক এইখানেই চোরগুলো এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং এখানেই একটা গর্তে নেমে গিয়েছিল তারা।

তবে কি পুরো ব্যাপারটাই ভেল্কি! তবে কি 'চিচিং ফাঁক' কথাটার মধ্যেই যাদুটা লুকিয়ে আছে? সেই মুহূর্তে আলিবাবা সব শঙ্কা ভয় ঝেড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলো, 'চিচিং ফাঁক'।

দুটি মাত্র শব্দ। কিন্তু তারই কি আশ্চর্য যাদু, সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাটি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। আলিবাবা দেখলো, বিরাট একটা গুহার মুখ উন্মুক্ত

হয়ে গেছে ওর সামনে। কিন্তু ভিতরটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

ভয়ে কেঁপে উঠলো আলিবাবা। দৌড়ে পালাবে কিনা ভাবলো। কিন্তু ভাগ্যই তাকে আটকে রাখলো সেখানে।

সাহস করে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো।

একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। নিচে একটা প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের দেওয়াল-গুলো পাথর কুঁদা। কে বা কারা পাহাড়ের কঠিন শিলা কেটে বানিয়েছে।

আল্লাহর নাম স্মরণ করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। ওপরের ছাদটাও এবড়ো খেবড়ো পাথরের।

ঘরের ঠিক মাঝখানে রাশি রাশি সামানপত্র পালা দেওয়া ছিল। গাঁট গাঁট দামী রেশমী কাপড়, কতকগুলো বাক্সে চাঁদীর চাঁই ভর্তি, কতকগুলোয় সোনার দিনার। এছাড়া আরও কতশত দামী দামী সাজপোশাক, অলঙ্কার, নানাবিধ শখের সামগ্রী এবং খাবার-দাবার।

আলিবাবা দেখতে পেল ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে হাজার হাজার জড়োয়া গহনা, মূল্যবান মণিমাণিক্য ইত্যাদি।

এক কথায় সারা ঘরময়ই ঐশ্বর্যের মেলা। পা ফেলতে গিয়েও পায়ে জড়িয়ে যায় দামী দামী হার, পায়ের মল, মাথার টায়রা, আরও কত কি! আলিবাবা ভেবে পায় না, কত সহস্র লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী বৃত্তাকারে পড়ে রয়েছে ঘরময়। এ সব ওরা পেল কোথা থেকে? সবই চুরি ডাকাতির ধন? ভাবতেও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। এ সব সংগ্রহ করতে কত শত সহস্র নিরীহ মানুষকেই না খুন জখম করেছে তারা। তা না হলে এই বিপুল ঐশ্বর্য, যা কোনও সুলতান বাদশাহর ভাণ্ডারেও দুর্লভ, ওরা পাবে কোথায়?

আলিবাবা ভাবে, মাত্র চল্লিশ জন দস্যু সারাজীবন ধরে ডাকাতি রাহাজানি করে এই পর্বত প্রমাণ সম্পদ সংগ্রহ করবে কি করে? অসম্ভব, এ ধনভাণ্ডার দু' এক পুরুষের সংগ্রহে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে বহু পুরুষ ধরে এসব জমা করা হয়েছে এখানে। মনে হয় ঐ ডাকাতগুলো ব্যাবিলনের সেই কুখ্যাত দস্যুদেরই বংশধর।

গুহা অভ্যন্তরে ঐ অনন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সেইক্ষণে আলিবাবার মনে হলো, যে ধনের সন্ধান সে পেয়েছে তা বোধহয় সম্রাট সুলেমান বা আলেকজান্দারও চোখে দেখেননি কখনও।

আলিবাবা ভাবলো, তার সত্য নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবারের পরিজনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং আল্লাই তাকে এই অপ্রতুল ইনাম-এর দরজা খুলে দিয়েছেন। এ সম্পদ আহরণের ইতিহাস অবশ্যই রক্তে রাঙা। কিন্তু যে-শয়তান দস্যুরা ভোগ করবে বলে নির্বিচারে নরহত্যা করে ধনরত্ন ছিনিয়ে আনে তা তাদের মতো পাপাচারীদের ভোগবিলাসে আসে না কখনও। আলিবাবা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, পাপীদের ভোগ করার কোনও অধিকার রাখেননি আল্লা। দুনিয়ায় তামাম সুখসম্পদ পুণ্যাত্মাদের জন্যই বরাদ্দ করে রেখেছেন তিনি। সুতরাং এ সব আমার। আমার বিবি-

বাল-বাচ্চাদের সুখের জন্যই এ ধনরত্ন এখানে জমা হয়ে আছে।

একটা থাবার ভর্তি থলে মেঝেয় উপুড় করে ঢেলে দিয়ে সোনার দিনারে ভরে নিল আলিবাবা। চাঁদী-টাঁদীর দিকে সে নজর দিল না। কারণ এক বস্তা সোনার দিনার বয়ে নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর, অন্য কিছু নেবে কি করে?

বস্তাটা কাঁধে তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে আলিবাবা। গুহার মুখের ধাপে নামিয়ে রেখে আবার নিচে নেমে যায়। আরও একটা বস্তা খালি করে সোনার মোহর এবং হীরে মণিমাণিক্য বোঝাই করে। এইভাবে এক এক করে অনেকগুলি বস্তা সে মহামূল্যবান ধনরত্নে বোঝাই করে সিঁড়ির ওপরের ধাপে নিয়ে আসে। আলিবাবা ভাবে, আর না, তিনটে গাধা এর বেশি ভার বইতে পারবে না। আজ এই পর্যন্ত থাক। পরে আবার আসা যাবে।

এর পর সে হাঁক ছাড়ে 'চিচিং ফাঁক'।

আর সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখটা খুলে যায়।

আলিবাবা ওর গাধা তিনটাকে নিয়ে আসে। বস্তাগুলো সমান ভাগ করে চাপিয়ে দেয় ওদের পিঠে। তারপর, 'চিচিং বন্ধ' বলতেই গুহার মুখ নিখুঁতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গাধা তিনটেকে নানারকম শ্রুতি-সুখকর আদর সোহাগের সম্বোধন করে তাড়াতে তাড়াতে শহরে ফিরে আসে সে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তিপ্পান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

বাড়ির সামনে এসে আলিবাবা দেখলো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কেন জানি না, আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'চিচিং ফাঁক'। আর তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। গাধাগুলোকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো আলিবাবা। পিছন ফিরে বললো, 'চিচিং বন্ধ'। এবং তখনি বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আলিবাবার বিবি গাধার সুমধুর আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে এসে তাজ্জব বনে গেল।

হায় আল্লা, সদর তো নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম আমি, তুমি ঢুকলে কি করে গো?

আলিবাবা বিবির প্রশ্নে জবাব না দিয়ে বললো, এই বস্তাগুলো আল্লাহর দেওয়া ইনাম, বিবিজান। একটু হাত লাগাও, এগুলোকে ঘরে তুলি।

আলিবাবার বিবি বস্তায় হাত দিয়েই বুঝতে পারে, টাকায় ভর্তি। সব যে সোনার মোহর ভাবতে পারে না সে। মনে করে হয়তো বা তামার চাকতি হবে। ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। তবে কি তার স্বামী কোনও ডাকাত দলের সামিল হয়েছে? সর্বনাশ!

—একি করেছ গো, শেষ পর্যন্ত চোর ডাকাতের দলে নাম লিখিয়েছ? কেন মোটা ভাত মোটা কাপড় কি আমাদের জুটছিল না? না, গতরে তোমার ঘুন ধরেছে! হায় আল্লাহ, এ কি করলে তুমি, আমার দুধের বাচ্চারা এবার না

খেতে পেয়ে মরবে যে ? এত পাপ কি সইবে ভেবেছ, কতকাল তুমি সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কাটাতে পারবে ?

আলিবাবার বিবি কপাল চাপড়াতে থাকে। আলিবাবা রাগে দাঁত কড়মড় করে ওঠে, চুপ কর শয়তান মাগী, কী আবল তাবল বকবক করছিস ?

—এমন অলক্ষুণে জিনিসপত্র ঘরে আনলে কেন তুমি ? এত পাপ কি সইবে ? আমার বালবাচ্চাদের অমঙ্গল হবে যে গো—না না, আমার কথা শোন, আবার এগুলোকে গাধার পিঠে চাপিয়ে তুমি বাড়ির বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এস। আমি তোমার দুটি পায়ে ধরছি চাচার পো, আমার মিনতিটুকু রাখ।

আলিবাবা আর ধৈর্য রাখতে পারে না, ইয়া আল্লা, এ কি নির্বোধ মেয়েছেলের হাতে পড়েছি আমি। আচ্ছা, তোমার কি ধারণা, এই বস্তাগুলো আমি চুরি করে এনেছি ? এমন জঘন্য নীচ ধারণা তোমার জন্মালো কি করে বিবিজান ? তবে জেনে রাখ, তেমন কোনও অধঃপতন আমার ঘটেনি। আজ সকালে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে এগুলো পেয়ে গেছি আমি। নাও ধর, এগুলো ঘরে তুলি আগে, তারপর তোমাকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলছি।

ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছিয়ে বস্তাগুলো সব ঢেলে দিল আলিবাবা। তারপর সেই মোহরের টিলার মাথায় উঠে বসে গর্বে বুক ফুলিয়ে ঐ রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের কাহিনী সবিস্তারে শোনালো তার বিবিকে।

সব শোনার পর বিবির মন থেকে ভয়ের কুয়াশা কেটে গেল। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো সে।

ওঃ, কত টাকা ! কত সোনা ! মোহর ! উফ্, আমরা আর গরীব থাকবো না, না গো ? খু—ব, খুব, বড়লোক হয়ে যাবো তাই না ? খোদা মেহেরবান, দেখ, সৎপথে খেটে রোজগার করে খেলে আল্লাহ্ এমনি ভাবে দুহাত ভরে দেন একদিন। কিন্তু আমি ভাবছি, এত টাকা পয়সা ঐ শয়তানরা কত মানুষজনকে জখম করেই না জমিয়েছিল ! তা অত পাপের সম্পত্তি কি ভোগে লাগে ?

আলিবাবার বিবি একটা একটা করে মোহরগুলো গুনতে বসে যায়। আলিবাবা হাসে, দূর পাগলী, ও কি করছো ? ঐভাবে সারাদিন রাত ধরে গুনেও তুমি শেষ করতে পারবে না। রাখ, ওসবের দরকার নাই। এখানে ঘরের মেঝেয় এভাবে ফেলে রাখলে তো চলবে না। এক কাজ কর রসুইঘরের মেঝেয় একটা বড় করে গর্ত কর। ওখানে পুঁতে রাখবো সব। চটপট কর, তা না হলে বলা যায় না হুট করে হয়তো পড়শীদের কেউ এসে পড়তে পারে। তা হলেই পাঁচ কান হতে হতে কোতোয়ালের কাছে চালান হয়ে যাবে খবর।

কিন্তু আলিবাবার বৌ সে কথায় তেমন কোনও গুরুত্ব দিল না। তার দারুণ কৌতূহল, সে জানতে চায়, কত টাকার সে মালিক হয়েছে আজ।

ঠিক আছে, গুনতে না পারি ওজন করে দেখে নিই ? তুমি একটু দাঁড়াও, পাশের বাড়ি থেকে একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসি আমি। তুমি ততক্ষণে গর্তটা খুঁড়তে থাক, তোমার খোঁড়া শেষ হতে হতে আমি মেপে শেষ করে দেব।

রোজ রোজ তো আর গর্ত খুঁড়ে তোলা যাবে না, ছেলেমেয়েদের জন্যে কি সম্পত্তি কতটা রেখে দিলাম তার হিসেব তো একটা জানা থাকা চাই !

যদিও ব্যাপারটা নিরর্থক, তবু বিশেষ প্রতিবাদ করলো না আলিবাবা। বললো, ঠিক আছে ! ছুটে যাও, নিয়ে এসে চটপট ওজন করে ফেল, আমি গর্তটা খুঁড়ে ফেলছি তাড়াতাড়ি। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, কাউকে কিছু বলবে না, কাকপক্ষীটি টের পায় না যেন।

আলিবাবার বৌ সোজা কাসিমের বাড়িতে যায়। কারণ ওর বাড়িটাই ওদের লাগোয়া। কাসিমের বৌটা কুৎসিত কদাকার। যেমন দেখতে তেমন রুচি প্রকৃতিতে। ভুলে সে কখনও আলিবাবার বাড়ির দিকে পা মাড়ায় না। তার প্রধান কারণ, আলিবাবা গরীব, যদি কখনও কিছু চেয়ে বসে !

আলিবাবার বিবি সেধেই আলাপ জমাতে যায়। কিন্তু কাসিম-গৃহিণী তেমন পাত্তা দেয় না। ভাবে, হয়তো বা কিছু চাইতে এসেছে।

—তোমাদের দাঁড়িপাল্লাটা একটু দেবে দিদি ? এখুনি দিয়ে যাবো।

কাসিমের বৌ দাঁড়িপাল্লার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে মুখ তোলে, অবাক হয়, সে জানে আলিবাবা ভীষণ গরীব, দিন আনে দিন খায়। আজ হঠাৎ দাঁড়িপাল্লার কি দরকার পড়লো তার !

—কি এমন সুলতান বাদশাহর ধন ঘরে এনেছে রে তোর সোয়ামী, যে দাঁড়িপাল্লার দরকার হলো ? তা ছোট পাল্লাটা নিবি না বড়টা দেব ?

কাসিম-বিবি বাজিয়ে দেখে নিতে চায়, আলিবাবা কি পরিমাণ মালপত্তর ঘরে এনেছে।

—ছোটটা হলেই চলবে দিদি।

কাসিমের বৌ রসুইখানায় ঢোকে পাল্লাটা বের করার জন্য। মেয়েটা শয়তানের ধাড়ি। প্যাঁচে প্যাঁচে বদবুদ্ধি। একটুখানি আটারডেলা দাঁড়ির পাল্লায় এঁটে দিল সে। উদ্দেশ্য আলিবাবা যে দানা শস্য ওজন করবে তার দুচারটে পাল্লায় আটকে থেকে যাবে। এবং তা দেখে সে জানতে পারবে কি বস্তু সে ওজন করেছিল, অথবা আদৌ করেনি কিছু।

—এই নে ভাই। ওপরের মই-এ তোলা ছিল, তাই পাড়তে একটু দেরি হয়ে গেল।

আলিবাবার বিবি পাল্লাটা এনে চটপট মাপতে লেগে গেল। এক একটা পাল্লা মাপা হয় আর এক একটা কাঠকয়লার দাগ কাটে সে মেঝেয়। এইভাবে অনেক তাড়াহুড়া করে মাপা সত্ত্বেও সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়। আলিবাবার গৃহিণী ভাবতে পারেনি ওজন করতে এত সময় লাগবে। কাসিম-বৌকে সে বলে এসেছিল একটু পরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ইস্, বৌটা কি ভাবছে তার সম্বন্ধে।

যাই হোক, ওজন শেষে রসুইখানার গর্তে বোঝাই করে মাটি চাপা দিয়ে দিল দুজনে। তারপর পাল্লাটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল সে কাসিমের বাড়িতে।

—এই যে দিদি। বড্ড দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করো না যেন।

আলিবাবার বিবি ঘরে ফিরে এল, কিন্তু সে বুঝতেই পারলো না কাসিমের বৌ-এর কারসাজির ফাঁদে সে পা দিয়েছে। পাল্লায় লেপে দেওয়া আটার সংগে আবদ্ধ হয়ে গেছে একটি স্বুবর্ণমুদ্রা।

আলিবাবার বিবি ফিরে গেলে কাসিমের ধূর্ত বৌটা পাল্লাটা মেলে ধরে দেখলো, না, গম নয়, যব নয়, ভূট্টাও নয়, আটার সংগে সেঁটে একটি সোনার মোহর ঝলমল করছে।

ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতার আগুন দপ করে জ্বলে উঠলো তার বুকের পাঁজরায়।

—সোনার মোহর! এত টাকার মালিক সে, গুনে শেষ করতে পারবে না, পাল্লা দিয়ে ওজন করতে হয়? ওরে বাবা,—আমার কি হবে রে—

কাসিমের বৌ-এর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। হা-হুতাশে পুড়ে যেতে থাকে কলিজাটা। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায় চোখ মুখ। অনর্গল অভিসম্পাত নিসৃত হতে থাকে মুখ দিয়ে, খোদা, একমাত্র তুমিই এর বিহিত করতে পার। ঐ ছাঁটা বেহুদাটা এত সোনা পেল কোথায়? ওর সব যেন উচ্ছন্নে উড়ে পুড়ে যায়, আল্লাহ। তাহলে পীরের দরবারে সিন্নি দিয়ে আসবো আমি।

সারা বাড়িময় দাপাদাপি করতে লাগলো সে। প্রায় উন্মাদিনীর মতো অবস্থা।

কাসিম সন্ধ্যার অনেক পরে দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি ফেরে। ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈয-ধরে সে বসে থাকতে পারবে না। তাই তখুনি সে দোকানে চাকর পাঠালো, শিগ্গির যা ডেকে নিয়ে আয় তোর মনিবকে। বল গে আমার শরীর খারাপ।

কাসিম অসময়ে দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে। তাকে দেখা মাত্র কাসিমবিবির ক্রোধ, ক্ষোভ, আক্রোশ শতগুণ হয়ে শিলাবৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকে।

বিবি কেন এত উত্তপ্ত কিছুই আঁচ করতে পারে না কাসিম। কাছে এগিয়ে এসে গলায় খুব দরদ ঢেলে জিজ্ঞেস করতে যায়, কী, কি হয়েছে জান, তোমাকে এত উত্তেজিত দেখছি কেন?

—থাক অত আর শুকনো সোহাগ জানাতে হবে না। বলি চোখ কানের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ নাকি?

—কেন, কী হয়েছে কী?

—আমার মাথা হয়েছে। এই দ্যাখো, কী হয়েছে।

এই বলে সোনার মোহরটা সে কাসিমের নাকের ডগায় ছুঁড়ে মারলো।

—দেখ, চোখ মেলে চেয়ে দেখ। তোমার গুণধর ভাইটির বাড়ি থেকে খয়রাতি এসেছে আমার ঘরে। তুমি তো একখানা দোকানের মালিক হয়ে গরবে মাটিতে পা রাখ না। তোমার অহঙ্কার, তোমার মতো রোজগার আর করতে পারে না কেউ। কিন্তু ভুল, ভুল, সব তোমার মিথ্যে অহঙ্কার। তোমার ভাই-এর মাত্র তিনটে গাধা। জ্বালানীর লকড়ি বেচে খায়। তার ঘরে আজ

টাকা রাখার জায়গা নাই। এত টাকা হাতে গুনতে পারে না—আমার কাছ থেকে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে গিয়ে ওজন করে দেখতে হয়! আর তুমি? তুমি একটা অপদার্থ। আমার বাপের তৈরি করা একটা দোকান হাতে পেয়েও সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মোটা পয়সা ঘরে আনতে পার না?

কাসিম ভেবে পায় না একথার কি জবাব দেবে সে। কিন্তু জাঁহাবাজ বৌ ছাড়বার পাত্রী নয়। হিংস্র বাঘিনীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তার স্বামীর ওপর।

—না, চুপ করে মুখ বুজে সহ্য করা চলবে না। যাও, তোমার ভাই রত্নটিকে গিয়ে জেরা কর, কোথায় পেল সে এত মোহর! কী তার সূত্র, আমি জানতে চাই। সে না তোমার ভাই?

বিবির যুক্তিতর্কে কাসিম বুঝতে পারলো যে-কোনভাবেই হোক তার ভাই আলিবাবা নিজের ভাগ্য বিবর্তন ঘটিয়েছে। ভাই-এর সৌভাগ্যের কথা শুনে সেও কিন্তু খুশি হতে পারলো না। হিংসায় কাতর হয়ে পড়লো সে।

একটু পরে প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সে আলিবাবার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো চুয়ান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

আলিবাবা তখন কোদালটা সাফ করছিল। কোনও রকম সভ্যতা-ভব্যতার বালাই না দেখিয়ে রাগে গরগর করতে করতে কাসিম বলে, কি রে গাধার বাপ, কী, ব্যাপার কী? আমার সঙ্গে তুই বড়লোকী দেখাতে যাস কোন সাহসে? তোর না হয় পয়সা-কড়ি হয়েছে, তা বলে দাঁড়ির পাল্লায় মোহর গুঁজে দিয়ে নবাবী চাল মারবি? এত বড় আস্পদ্দা তোর?

আলিবাবা হকচকিয়ে যায়। ভয়ে বুক দুরু দুরু করে ওঠে। সে জানে কাসিম আর তার বিবি কি লোভী আর ধূর্ত।

—খোদা কসম, তুমি কি বলছো, বড়ভাই, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। একটু খোলসা করে বলবে, ব্যাপারটা কী? তুমি আমার সহোদর ভাই, রক্তের সম্পর্ক আছে তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ কতকাল একটিবার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে আস না। আজ হঠাৎ এসেই এইভাবে রাগারাগি করছো কেন, বড় ভাই। ঠিক আছে, কী জানতে চাও বল, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছে কিছু গোপন করবো না।

—আলিবাবা, গর্জে ওঠে কাসিম, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। তুমি কিছু জান না বলে ন্যাকামি সাজলে তো আমি শুনবো না। আমি জানি, কি তুমি লুকাতে চেষ্টা করছো আমার কাছে।

এই বলে সে আলিবাবার নাকের ডগার সামনে সেই মোহরটা মেলে ধরে

বললো, দেখো, চিনতে পারছো? এরকম চিজ কতগুলো বাক্সে ভরেছ? চোর কাঁহিকা—। তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক, কুলাঙ্গার।

আলিবাবা কি বলবে কিছুই ভেবে পায় না। তার বিবির হঠকারিতার জন্যই এই অপকর্মটি হয়ে গেছে।

—বড় ভাই, সব খোদার মেহেরবানী। তিনি দিলে ঘরে রাখার ঠাঁই হয় না। আর কেড়ে নিলে বাদশাহর ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়।

এরপর সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী খুলে বললো কাসিমকে। শুধু সেই চিচিং ফাঁক-এর মাহাত্ম্যটুকু গোপন রাখলো।

—তুমি আমার সহোদর ভাই, তোমার সঙ্গে আমার লুকোছাপা কিছু থাকতে পারে না, দাদা। আমি যা পেয়েছি, যা ঘরে এনে তুলেছি তাতে আমার যেমন অধিকার তোমারও তেমনি সমান অধিকার আছে। তুমি এস, ঘরের ভিতরে এস দাদা, সমান আধাআধি বখরা করে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে খুশি মনে দিয়ে দিচ্ছি।

কাসিম কিন্তু ভীষণ লোভী, সে আলিবাবার প্রস্তাবে সম্মত হলো না। বললো, না না, ওসবে আমার দরকার নাই। তুই বল, সেই গুহার মধ্যে কি উপায়ে আমি ঢুকতে পারি। তোকে আর কিচ্ছু করতে হবে না। আমার যা দরকার আমি নিজেই নিয়ে আসবো ওখান থেকে। কিন্তু হুঁশিয়ার, আমাকে ভুল পথের নিশানা বলে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করবি না। তা হলে জানে খতম করে দেব একেবারে। সোজা গিয়ে কোতোয়ালীতে এজাহার দিয়ে আসবো তোর নামে। তুই একটা মহাচোর। চুরির মাল তোর ঘরে খুঁজে পেলে তোর কি অবস্থা হবে একবার ভাব।

আলিবাবা সম্যক্ বুঝতে পারলো, কাসিমের অসাধ্য কিছুই নাই। চুরির দায়ে সে তাকে অতি সহজেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। এবং তা যদি ঘটে, তবে তার বৌ-বাল-বাচ্চাদের কি হাল হবে—ভাবতেও তার বুক কেঁপে ওঠে।

আলিবাবা আর দ্বিধা না করে ঐ গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি সেই চিচিং ফাঁক এবং চিচিং বন্ধ যাদুমন্ত্র দুটি কাসিমকে বলে দিল।

কাসিম আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করলো না সেখানে। রাতারাতি কোটিপতি কুবের বনে যাবার খোয়াবে তখন সে মশগুল। আলিবাবার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে হন হন করে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল।

পরদিন সকাল হতে না হতে কাসিম দশটা খচ্চরের পিঠে কুড়িটা খালি জালা ঝুলিয়ে সেই জঙ্গল প্রান্তে এসে হাজির হলো। আলিবাবার পথ-নির্দেশ মতো এগোতে এগোতে এক সময় সেই পাহাড় পাদদেশের নির্দিষ্ট স্থানটিও খুঁজে পেল সে।

কাসিমের সর্বাঙ্গ এক অভূতপূর্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের সামনে এসে পড়েছে সে। এবং এই কুবের সম্পদ সবই তার হবে। সে হবে জগতের সবচেয়ে সেরা ধনী মানুষ। উফ্, ভাবতেও সারা

শরীর শির শির করে ওঠে।

আলিবাবার বর্ণনামতো গুহামুখের চিহ্নটিও সে আবিষ্কার করতে পারলো। কাসিম আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে উঠলো—চিচিংফাঁক।

আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড় পাদদেশের মাটিতে ফাটল ধরলো। ক্রমশ সে ফাটল বিস্তৃত হতে হতে একটি গর্তের মতো হয়ে গেল।

কাসিম ঝুঁকে পড়ে দেখতে পেল, একটা পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। আলিবাবা যেমনটি বর্ণনা করেছিল হুবহু একই রকম সব মিলে গেল। কাসিম আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। তড়বড় করে নেমে গেল নিচে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফাটলটা জোড়া লেগে গুহার প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তা যাক, কাসিম ভাবে, খোদার যাদুও তো তার জানাই আছে. ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই। এখন দেখতে হবে কোথায় কী কী ধনদৌলত জড়ো করা আছে চারদিকে। এবং কী ভাবে সেগুলোকে বস্তাবন্দী করে ওপরে উঠানো যাবে, তারই ফন্দি ফিকির ভাঁজতে থাকলো সে।

গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র মণি-মাণিক্যের জেল্লায় চোখে ধাঁধাঁ ধরে গেল কাসিমের। দুনিয়াতে এত ধনদৌলত থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি।

একের পর এক বস্তা বোঝাই করতে থাকলো কাসিম। শুধু সোনার মোহর, আর দামী দামী রত্ন মণি ছাড়া অন্য কিছু সে নিল না। কতই বা নিতে পারবে সে। মাত্র দশটা খচ্চর সঙ্গে এনেছে, ওরা কত ভারই বা বইতে পারবে।

বস্তাগুলো ভরে এক এক করে টেনে এনে সিঁড়ির তলায় রাখলো কাসিম। এবার গুহার মুখ খুলে বাইরে বেরুবার পালা। কিন্তু সেই যে কী ফাঁক—দুর ছাই কিছুতেই তো মনে পড়ছে না! সর্বনাশ!

অনেক চেষ্টা করেও চিচিং শব্দটা সে কিছুতেই মনে করতে পারে না।

মুহূর্তে কাসিমের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ভয়ে গলা কাঠ হয়ে আসে। জোরে সে চিৎকার করে ওঠে, সীম ফাঁক—

কিন্তু দরজা একটুও ফাঁক হয় না।

কাসিম আবার গর্জন করে, লাউ ফাঁক, শসা ফাঁক, ক্ষীরা ফাঁক।

কিন্তু দরজা ফাঁক হয় না। কাসিম ঘামতে শুরু করে। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। দাঁত মুখ খিঁচে সে প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে সে চিচিং শব্দটি। কিন্তু দুনিয়ার যত রাজ্যের বস্তুর নাম মনে আসে শুধু ঐ চিচিং ছাড়া।

অসহায় ভাবে সে দুহাতে কপাল চাপড়াতে থাকে। ইয়া আল্লাহ, একি হলো আমার, একটু আগেও যা মুখের ডগায় ছিল এখন দারুণ প্রয়োজনে সে কথা মনে পড়ছে না কেন? কেন?

পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় না।

হতাশায় চোখে অন্ধকার নেমে আসে। দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়। নেতিয়ে

পড়ে যায় সে পাথরের মেঝেয়। ক্লান্তিতে শরীর অসাড় হয়ে যায়। চোখে তন্দ্রা নামে।

কিন্তু সে স্বল্পকালের জন্য। আবার সে উঠে দাঁড়ায়। স্মৃতির সঙ্গে মনের লড়াই চলে অনেকক্ষণ ধরে। কত শব্দ মনে পড়ে। কত ফলের নাম, কত শস্যের নাম, কত সব্জীর নাম, কিন্তু আসল বস্তুটির নাম আর মুখে আসে না।

কাসিম বুঝতে পারে, এ আল্লাহরই কারসাজি। তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যই তার স্মৃতি থেকে শব্দটিকে লোপাট করে নিয়ে গেছেন। তার অত্যধিক লোভ লোলুপতার জন্য এ সাজার বিধান করেছেন খোদা।

ইয়া আল্লাহ, আমাকে মার্জনা কর প্রভু, আমি আর লোভ করবো না কখনও। আমাকে এই সোনার কয়েদখানা থেকে মুক্তি দাও তুমি। আমি কথা দিচ্ছি, কসম খাচ্ছি, এই সোনাদানা মণি রত্ন কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না। আমাকে বিশ্বাস কর খোদা, আমি তোমাকে মিথ্যে ধাপ্পা দিচ্ছি না। সত্যিই আমি আর কোনও সম্পদে লোভ করবো না। একটি বার—শুধু একবারের জন্য আমাকে ক্ষমা কর, মুক্তি দাও।

কিন্তু কাসিমের খোদা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। গুহামুখ উন্মুক্ত হলো না।

এরপর কাসিম-এর অবস্থা উম্মাদের মতো হয়ে উঠলো। বড় বড় হীরে জহরত গুলো মুঠি ভরে নিয়ে পাথরের দেওয়ালে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকলো।

কিন্তু তাই বা কতক্ষণ। অবসাদে এলিয়ে পড়ে দেহ। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে চোখ। সেই এবড়ো খেবড়ো পাথরের মেঝের ওপরেই অসাড়ে পড়ে ঘুমাতে থাকে সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে, হঠাৎ কারা যেন গুহামুখ খুলে দিয়েছে। এক ঝলক সূর্যালোক এসে পড়েছে তার মুখে। ওঃ কি আরাম! এই অন্ধ কারার মধ্যে একি মুক্তির আশ্বাস! কিন্তু ও কাদের পায়ের শব্দ! মনে হয়, একদল জাঁদরেল মানুষ সশব্দে নিচের দিকে নেমে আসছে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো পঞ্চান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে তেতে পুড়ে এসে হাজির হলো চল্লিশ চোর। পাহাড়ের পাদদেশে, ঠিক গুহামুখের পাশে। অদূরে দশটা খচ্চর বাঁধা দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো ওরা। এই নির্জন বন-প্রান্তরে এই জানোয়ারগুলোকে এখানে নিয়ে এল কে? তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে এদিকে ওদিক তন্ন তন্ন করে তল্লাস করতে থাকলো সকলে। কিন্তু কোথাও কোনও মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। সর্দারটি বললো, সর্বনাশ! আমাদের ডেরার সন্ধান পেয়ে গেছে কেউ।

অন্য একজন বললো, কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কী ? ঢুকবার চাবিকাঠি জানবে কি করে।

সর্দার বলে, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের পিছু ধাওয়া করে সবই দেখে শুনে জেনে নিয়েছে। যাক আর দেরি না, এবার তোমরা সব তলোয়ার বাগিয়ে নিচে নেমে পড়। চিচিং—ফাঁক।

গুহার মুখ খুলে গেল। এবং শাণিত অস্ত্র কাঁধে চেপে এক এক করে সবাই নিচে নেমে গেল।

সিঁড়ির মুখে বস্তা বস্তা মোহর আর হীরে জহরত দেখে বুঝতে আর বাকী রইলো না চোরের ওপর বাটপাড়ি করার জন্য কেউ প্রবেশ করেছে ভিতরে।

গর্জে উঠলো সর্দার, দুশমন কো খতম করো।

সর্দারের সিংহ-গর্জনে কাসিমের ঘুম ছুটে যায়। স্বপ্ন টুটে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে সে। কিন্তু উঠে আর দাঁড়াতে পারে না। সর্দারের এক ঘায়ে ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়।

শয়তান, চোট্টা কাঁহিকা।

যদিও একবার মাত্র আর্তনাদ করেই কাসিম স্তব্ধ হয়ে পড়ে গেল তবু ক্রুদ্ধ সর্দার নিরস্ত হলো না, নিষ্প্রাণ ধড়টার ওপর কোপের উপর কোপ বসিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে থাকলো কাসিমের দেহটাকে। তারপর সাকরেদদের হুকুম করলো, ইসকা লাসকো বাহারমে ফেক দে।

এইভাবে কাসিমের মৃতদেহটা ছয় টুকরো আকারে একটা বস্তাবন্দী অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়ে গুহা মুখের কাছেই পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে রইলো। এই তার পরিণতি !

কাসিমকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার চোররা গুহাভ্যন্তরে গিয়ে বস্তাগুলো খালি করে আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে গোল হয়ে বসে মতলব আঁটতে থাকে।

কিন্তু অনেক জল্পনা কল্পনা করেও কেউই কোনও সূত্র উদ্ভাবন করতে পারে না। কে এই লোকটা, কী করেই বা সে তাদের অনুসরণ করে গুহার দরজা খোলার গুপ্ত মন্ত্র জেনে নিয়েছিল কিছুই আঁচ করতে পারে না। লোকটার পেশাই বা কী, থাকতোই বা কোথায়, কিছুই অনুমান করতে পারে না কেউ। সর্দার বললো, এই জঙ্গলের পরে ফাঁকা মাঠ। মাঠ পার হলে শহর। এ ছাড়া এদিকে কোনও জনবসতি নাই। আমার ধারণা ব্যাটা ঐ শহরেরই কোনও অঞ্চলে বসবাস করতো, নিশ্চয়ই সেখানে তার বৌ-ছেলে মেয়ে বা অন্য আত্মীয়স্বজন আছে। তারা চিন্তিত হয়ে বসে আছে তার জন্য। এখন আমাদের কাজ তাদের খুঁজে বের করা।

সর্দারের একথায় সকলে বলে উঠলো। অত বড় শহর কত শত সহস্র মানুষের বাস। কত জনপথ, অলিগলি—ইয়ত্তা আছে। তার মধ্যে কে বা কারা আপনজনের প্রতীক্ষায় ম্রিয়মাণ হয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, কি করে আন্দাজ করা যাবে।

অন্য একজন বললো, আর তাছাড়া শয়তানকে তো খতমই করে ফেলা হয়েছে। এখন আর খোঁজাখুঁজি করে কী ফয়দা ?

সর্দার একথায় সায় দেয়, তা ঠিক, যে ব্যাটা আমাদের এই গুপ্ত গুহার সন্ধান পেয়েছিল তাকে তো সাবাড় করেই দিয়েছি।

সুতরাং এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কিছু নাই। তবে এখন থেকে আরও সাবধানে সতর্ক হয়ে গুহার দরজা খুলতে হবে।

এরপর সকলে গুহা থেকে বেরিয়ে চিচিং বন্ধ বলে দরজা বন্ধ করে আবার নতুন ধান্ধায় বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিরীহ খচ্চরগুলোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে যেতে কসুর করলো না ওরা।

কাসিমের মৃত্যুর জন্য তার শয়তান বৌটাই একমাত্র দায়ী। সে যদি ঐ মোহরটা দেখিয়ে তার স্বামীকে প্রলুব্ধ না করতো তা হলে এইভাবে প্রাণ হারাতে হতো না তাকে।

কাসিমের বৌ নানারকম মুখরোচক খানা পাকিয়ে স্বামীর পথ চেয়ে বসে রইল। তার চোখে লোভ লকলক করছিল। সারাক্ষণ সে একটা কথাই ভাবছিল—স্বামী দশ দশটা খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে জালা জালা সোনাদানা নিয়ে আসছে। উফ্, কী আনন্দ। অত সোনা সে রাখবে কোথায় ? কী ভাবে রাখবে ?

এই সব রঙিন চিন্তায় চিন্তায় দিনটা শেষ হয়ে যায় এক সময়। রাতের কালো ঘনিয়ে আসতে থাকে। এবার বৌটা চিন্তিত হয়ে ওঠে। এই অন্ধকারে ঐ জঙ্গলে তো জনমানুষ থাকতে পারে না! হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের আড্ডা হয় সেখানে। বেশি রাত করে ফিরতে গেলে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে পড়বে না তো মানুষটা!

কথাটা মাথায় আসতেই শিউরে ওঠে সে। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় আলিবাবার বাড়িতে। আলিবাবা তখন দাওয়ায় বসে কুঠারে শান দিচ্ছিল।

—শোনও ছোট শেখ, রাত এক প্রহর উৎরে গেল, কিন্তু তোমার বড় ভাই এখনও ফিরলো না। কী ব্যাপার বলতো! বড় চিন্তা লাগছে মনে। আলিবাবা বলে, ও এখনও ফেরে নাই বুঝি! তা চিন্তার কিছু নাই বিবিজান, অমন ধন-দৌলত নিয়ে দিনের আলোয় ফেরার অনেক ঝুঁকি আছে। লোক জানাজানি হয়ে গেলে সরকারের কানে চলে যেতে পারে খবরটা। বড় ভাই আমার এদিকে দারুণ হুঁশিয়ার আদমী। এই সব সাতপাঁচ ভেবেই বোধহয় একটু বেশি রাত করে রওনা দেবে সে।

আলিবাবার কথায় যুক্তি ছিল, খানিকটা আশ্বস্ত হতে পারে বৌটা। আলিবাবা বলে, তা এখানেই বসো না একটু। আমার মনে হয় এখুনি এসে পড়বে।

রাত আরও বাড়তে থাকলো, কিন্তু কাসিম ফিরলো না। বৌটা আবার অধৈর্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে আলিবাবাকে জিজ্ঞেস করে, এখনও কী তুমি মনে করছো এই নিশুতি রাতে সে ফিরে আসবে ?

আলিবাবা বললো, না বিবিজান আজ আর তার ফেরার কোনও আশা নাই। আমার মনে হচ্ছে মালপত্র বস্তাবন্দী করতেই তার সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। জঙ্গলটা জব্বর, সাপ খোপ তো আছেই, মানুষ-খেকো জন্তু-জানোয়ারদেরও অভাব নাই। তাই বোধহয় সে গুহা থেকে বের হয়নি রাতের মতো। ঠিক করেছে কাল সাত-সকালে কাকপক্ষী জাগার আগেই সবার অলক্ষ্যে সে ঘরে এসে পৌঁছাবে। তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করো না বৌ, কাল সকালেই বড় ভাই ফিরে আসবে। তুমি মিলিয়ে নিও আমার কথা।

কিন্তু আলিবাবার ধারণা সত্য হলো না। পরদিন অনেক বেলা হলো, তবু কাসিম ফিরে এল না দেখে আলিবাবাও চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—নাঃ, আর তো চুপচাপ ঘরে বসে থাকা যায় না বৌ, আমি একবার দেখে আসি, কী হলো তার।

খচ্চর তিনটাকে সঙ্গে করে জঙ্গলের পথে রওনা হয়ে যায়।

পাহাড়ের কাছে এসে কাসিমের দশটা খচ্চরের বিচ্ছিন্ন দেহ আর রক্তের ঢল দেখে সে আঁৎকে ওঠে। সর্বনাশ তবে তো তার ভাই আর জীবিত নাই। নিশ্চয়ই ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ে তার জান শেষ হয়েছে। ভীত কম্পিত কণ্ঠে সে কোন রকমে উচ্চারণ করতে পারে চিচিং ফাঁক।

সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তর তর করে নিচে নেমে যায় আলিবাবা। সিঁড়ির নিচেই চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আলিবাবার বুঝতে অসুবিধা হয় না ডাকাতরা কাসিমকে কেটে ফেলেছে। কিন্তু সারা গুহা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার লাশের সন্ধান পায় না সে। বিষাদে মুহ্যমান হয়ে উপরে উঠে আসে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অদূরে একটা রক্তমাখা বস্তা দেখতে পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে যায়।

বস্তাটার মুখ খুলতেই সে শিউরে ওঠে। ডাকাতরা তার দাদাকে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় পুরে ফেলে রেখে গেছে।

চটপট সে বস্তাটাকে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়।

আলিবাবার কেনা বাঁদী মরজানা বয়সে তরুণী শক্ত সামর্থ্য দেহ-বল্লরী শাণিত তলোয়ারের মতো। বাড়ির দরজায় পৌঁছেই আলিবাবা মরজানাকে ডাকে।

মনিবের সাড়া পেয়ে ছুটে আসে মরজানা। আলিবাবা বলে, বস্তাটায় একটু হাত লাগা তো, মা।

দুজনে ধরাধরি করে কাসিমের খণ্ডিত দেহভর্তি বস্তাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে। বুদ্ধিমতী মরজানা পলকে বুঝে নেয় ব্যাপারটা কী?

আলিবাবা বলে, মা জননী আমি জানি তোর অনেক বুদ্ধি। এখন যে-বিপদ সামনে তাকে সামলাবার মতো মগজ আমার নাই। তুই মা একটা উপায় বাৎলা, যাতে সব দিক রক্ষা হয় ঠিকমতো।

মরজানা বলে, আপনি, কিছু চিন্তা করবেন না আব্বাজান, সব আমি সামাল দিয়ে দেব।

আলিবাবা বলে, দাদার দেহটাকে কবর দিতে হবে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এই টুকরো টুকরো করা লাস দেখলে পাড়াপড়শীরা আঁৎকে উঠে হাট বসিয়ে দেবে বাড়িতে।

মরজানা বলে, আপনি কি পাগল হয়েছেন, আব্বাজান, এই অবস্থায় গোর দেওয়া যায় তাকে? আমি সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি, ভাল মুচি ডেকে এমন নিখুঁতভাবে সেলাই করিয়ে নেব যা দেখলে আপনিই তাজ্জব বনে যাবেন, সেলাই-এর জোড়া খুঁজে পাবেন না।

কাসিমের বৌ খণ্ডিত দেহ স্বামীকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠতে চায়। মরজানা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, একদম কাঁদবেন না এখন চাচী, সর্বনাশ হয়ে যাবে। দাঁড়ান আগে আমি বিধি-ব্যবস্থা করি তারপর যত পারেন কাঁদবেন খ'ন।

কাসিমের বৌ ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যায়। মরজানা দ্রুত পায়ে পাড়ার হাকিমের দাওয়াখানায় চলে আসে।

—হাকিম সাহেব আমার চাচার বহুত বিমার, বুকে কফ জমেছে, দরদ আছে ভাত বন্ধ হয়ে গেছে, জলদি দাওয়াই দিন মেহেরবানী করে।

হাকিম আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে এক শিশি ওষুধ দিল, মরজানাকে। বললো, বিমার বড় খারাপ বেটি, আজ রাতটা যদি টিকে তবে আশা আছে, খানিকটা। যাই হোক কেমন থাকে কাল সকালে আমাকে জানিয়ে যেও।

পরদিন সকালে মরজানা কাঁদতে কাঁদতে দাওয়াখানায় ঢুকে বলে, না হাকিম সাহেব কোনও উপকার হলো না। রুগী আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনি আরও ভাল দাওয়াই দিন।

হাকিম বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, দাওয়াইতে আর কোনও কাজ হবে না মা। এবার খোদার নাম জপ করতে বল গে।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ছাপ্পান্নতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে:

মরজানা ঘরে ফিরে এসে কাসিমের বৌকে বলে, চাচী নাও, এবার মরা কান্না কাঁদতে শুরু কর।

এই বলে সে নিজেও কাঁদতে বসে গেল।

মরার খবর বাতাসের আগে যায়। মুহূর্তে পাড়াপড়শীরা সবাই জেনে গেল আলিবাবার বড় ভাই কাসিম মাত্র দুদিনের বিমারে ইন্তেকাল করেছে।

মরজানা ভাবলো একটা পর্ব তো চুকলো; কিন্তু এখন আসল কাজটাই বাকী। হন হন করে সে ছুটলো শহর প্রান্তের সুদক্ষ কারিগর এক মুচির বাড়িতে। লোকটার হাতের কাজ বড় চমৎকার। এর আগে সে ওর দোকান থেকে জুতো বানিয়ে এনেছে—যেমন গড়ন তেমনি সূক্ষ্ম সেলাই।

মুচি তখন তার দোকানে বসে জুতো তৈরি করছিল। মরজানা মুখে মধু

ঢেলে বলে, শেখ মুস্তফা, আজ তোমাকে আমার বড় দরকার। আমার বাড়িতে গিয়ে একটা খুব দরকারী কাজ করে দিয়ে আসতে হবে। তবে হ্যাঁ, তার জন্য আমি তোমাকে পুষিয়ে দেব।

এই বলে সে গোটা একটা মোহর বাড়িয়ে দেয় মুচির দিকে। সোনার মোহরটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না মুচি বেচারা! সারা মাস ধরে খাটলে দুটো মোহর রোজগার হয় না আর একদিনের একটা কাজের ইনাম আস্ত একটা মোহর। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে মরজানার মুখের দিকে, রসিকতা কিনা বুঝতে পারে না, তাই হাত পেতে নিতেও ভরসা হয় না তার। মরজানা বুঝতে পেরে মোহরটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, নাও আর দেরি করা চলবে না—এখুনি যেতে হবে। এটা তোমার কাজের আগাম দিলাম। কাজ শেষ করে দিলে পুরো মজুরী পাবে।

মেয়েটা বলে কী? একটা কাজের জন্য এই মোহর ছাড়া আরও পারিশ্রমিক দেবে সে? কী এমন কাজ?

মরজানা বলে, কাজটা কিন্তু খুব গোপনীয়। কসম খেয়ে বলতে হবে শেখ এ জিন্দগীতে কাউকে সে কথা বলতে পারবে না কখনও। এবং এই কারণেই তোমার যা যোগ্য মজুরী তার অনেক বেশি তোমাকে দেব।

মুচি দুকানের লতি টিপে ধরে বলে, তোবা তোবা, আপনি বারণ করছেন সে কথা কি কাউকে বলতে পারি কখনও। এই কসম খাচ্ছি, যদি কাউকে বলি জিভ আমার খসে পড়বে।

মরজানা বলে, তা হলেও বিশ্বাস নেই বাপু, তুমি এক কাজ কর। এই ফেটিখানা দিয়ে চোখ দুটো বেঁধে নাও। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, আবার সঙ্গে করে দিয়ে যাবো এখানে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি চাই না তুমি আমার বাড়ির ঠিকানা জেনে রাখ।

মুচি ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক আছে, তাই ভাল হবে চাঁদবানু। কি দরকার ঠিকানা পত্র মনে রেখে। হয়তো কে জানে কখন মনের খেয়ালে ফস করে বলে ফেলব। তার চেয়ে এই-ই ভাল, আমার ইচ্ছে থাকলেও কাউকে বলতে পারবো না।

মরজানা বলে, তাহলে এস আর দেরি করো না। আমি নিজে হাতে তোমার চোখ দুটো ভাল করে বেঁধে দিই।

মুচি মাথাটা এগিয়ে দিল। মরজানা সঙ্গে করে একখানা কালো রঙের বড় রেশমী রুমাল এনেছিল। তাই দিয়ে সে মুচির চোখ দুটো বেঁধে সঙ্গে করে রাস্তায় বেরুলো।

এ গলি সে গলি করে অনেক গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক সময় সে মুচিকে নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছল।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে মরজানা মুচির চোখের পটি খুলে দেয়। বলে, এই দেখ, একটা লাশের ছখানা টুকরো। এমন নিখুঁত হাতে নিখুঁতভাবে সেলাই করতে হবে যাতে তুমি নিজেই পরে জোড়া খুঁজে

না পাও, বুঝলে ? আমি তোমার হাতের কাজ জানি। সারা দেশের মধ্যে তোমার মতো খলিফা চমৎকার আর দুটি নাই। নাও, আর দেরি করো না, কাজ শুরু কর। আর হ্যাঁ, এই দিনার দুটো রাখ। কাজ দেখে খুশি হলে আরও বকশিশ দেব।

মুচি কম্পিত হাতে মোহর দুটো মুঠোয় ধরে ট্যাঁকে গোঁজে। তারপর কাজে মন দেয়।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে কাসিমের দেহের টুকরোগুলো সুন্দরভাবে জোড়া লাগিয়ে দেয় মুচিটা। মরজানা খুশি হয়ে বলে, বাঃ চমৎকার হাত তোমার শেখ। এই নাও ধর তোমার বকশিশ।

মুচি তাকিয়ে দেখলো, আর দুটি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতের তালুতে এসে পড়েছে।

আবার যথারীতি চোখে কালো রেশমী রুমালের ফেটি বেঁধে এ গলি সে গলি ঘুরিয়ে মুচিকে তার বাড়িতে ফেরত দিয়ে এল মরজানা।

এরপর শোক মিছিলের পর্ব। পাড়াপড়শিরা কাসিমের মরদেহ গোরস্তানে বয়ে নিয়ে চললো। তাদের পিছনে পিছনে মরজানা তার চাচার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে সারা হতে থাকলো।

এইভাবে যথানিয়মে কাসিমের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেল।

এদিকে মাসখানেকের পরে চল্লিশ চোর চুরি ডাকাতির পাট শেষ করে নিজেদের ডেরায় ফিরে এল একদিন। কিন্তু কি আশ্চর্য, পাহাড়ের পাদদেশে এসে তারা কাসিমের লাশের টুকরো ভর্তি বস্তাটাকে যথাস্থানে খুঁজে পেল না।

এবার সর্দার হুংকার ছাড়ে, হুম্, দুশমনেরা দেখছি শেষ হয়নি। আমরা যাকে খতম করেছি, সে যে এক নয় এখন তো তোমরা তার প্রমাণ পেলে ? তা হলে ? পিছনে শত্রু রেখে আমরা কি করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি বল ?

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, খুঁজে বের করতেই হবে। শত্রুর লেশ রাখতে নাই। যে ভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করবোই।

সর্দার বললো, শোন, এই পাশের শহরেরই বাসিন্দা তারা। তাদের বাড়ির ঠিকানা আমার চাই। সবংশে নিধন করতে হবে ওদের সকলকে। তা না হলে আমাদের ধন-দৌলত কিছুই রক্ষা করা যাবে না এখানে। এমনকি জানেও বেঁচে থাকতে পারবো না। সুতরাং আজ থেকে জান প্রাণ লড়িয়ে দিতে হবে তাদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করার জন্য। আচ্ছা এবার কে আগে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও বল। তাকে আজই ছদ্মবেশে শহরে ঢুকে পড়তে হবে। তার মনে থাকে যেন, ভুল খবর এনে আমাকে ফালতু হয়রানি করবে না কিছুতেই। তাহলে আমি গর্দান নেব, বল, কে যাবে ?

সর্দারের এই শর্ত মেনে নিয়ে চোরদলের একজন এগিয়ে এসে বলে, আমি যাব। আমিই খুঁজে বার করবো তাকে, সর্দার।

দরবেশ-বেশি চোরটা সারা শহরের নানা বসতবাড়ি দোকানপাট ঘুরতে

ঘুরতে কয়েকদিন পরে সেই মুস্তাফা মুচির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার এক হাতে ভিক্ষাপাত্র, অন্য হাতে ধুপদানী।

মুচি তখন নিবিষ্ট মনে এক জোড়া জুতো সেলাই করছিল। দরবেশ চোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার নিপুণ হাতের কারুকার্য দেখতে থাকে।

এক সময় মুচি মুখ তুলে দরবেশকে দেখে স্বাগত জানায়। দরবেশ চোর বাহবা দিয়ে বলে, বাঃ এই বয়সেও তোমার হাতের কাজ তো বড় সুক্ষ্ম দেখছি!

মুস্তাফার অহংকার জেগে ওঠে, তা ফকির সাহেব, খোদার মেহেরবানীতে এখনও একবারেই সুচে সুতো পরাতে পারি। হাতের কাজ বলছেন? তা একটা মানুষকে ছ' টুকরো করে কেটে দিন, আমি এমন নিপুণভাবে সেলাই করে জোড়া দিয়ে দেব যে হাজার খুঁজেও আপনি তার জোড়া ধরতে পারবেন না।

দরবেশ চোর সূত্র-সন্ধানের সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে ওঠে। বলে, হুঁ, তোমার হাতের কাজের নমুনা দেখেই বুঝতে পারছি। বহুত গুণী কারিগর তুমি। তবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া লাগাতে পার কিনা তা অবশ্য জানি না।

মুস্তাফা বাধা দিয়ে বলে, এতো আর আন্দাজে বলছি না, দরবেশ সাহেব। নিজে হাতে করে দেখেছি আমি। জোড়া লাগাবার পর আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে গেছি নিজের কাজ দেখে। খোদা কসম, বিশ্বাস করুন, শত চেষ্টা করেও আমার নিজের হাতের সেলাই-এর জোড় আমি ধরতে পারিনি।

দরবেশ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, একটা মানুষের ছ' খণ্ড দেহ সেলাই দিয়ে জোড়া দিয়েছ? কোথায়? কবে?

মুস্তাফা বলে, বানিয়ে বলছি না ফকির সাহেব। এই মাসখানেক আগে এক জানানা এসেছিল আমার দোকানে। আমার চোখ দুটো রুমাল দিয়ে বেঁধে বোরখা পরিয়ে নিয়ে গিয়েছেল তার বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি একটা লোককে ছ' টুকরো করে কাটা হয়েছে। মেয়েটি আমার হাতে ঝকঝকে মোহর গুঁজে দিল গোটাকতক। বললো, খুব সুক্ষ্মভাবে সেলাই করে জুড়ে দিতে হবে। কাজ ভাল হলে বকশিশ পাবে।

আমিও দেখিয়ে দিলাম আমার কেরামতি! এমন কাজ করে দিলাম, দেখে খুব তারিফ করলো সে। আমাকে আরও কয়েকটা মোহর দিয়ে আবার চোখ বেঁধে পৌঁছে দিল এখানে।

দরবেশ চোর ন্যাকার মতো প্রশ্ন করে, তা তোমাদের এ দেশের বুঝি এই রকমই প্রথা? কোনও লোক মারা গেলে তাকে ছ' টুকরো করে কেটে তারপর সেলাই দিয়ে জুড়ে গোর দিতে হয়?

মুস্তাফা হো হো করে হেসে ওঠে, আরে না না, দরবেশজী, ও রকম উদ্ভট প্রথা কেন থাকবে? ব্যাপারটা যে কী তা আজ পর্যন্ত আমি ঠাওর করতে পারিনি। কেই বা সে লোক? কেনই বা তাকে ছ' টুকরো করে কাটা হয়েছিল, কেই বা কেটেছিল—কিছু জানি না আমি। জানবার কোনও উপায়ও ছিল না।

আমার সঙ্গে শুধু কাজের সম্পর্ক ছিল ওর। আমার আশার অতিরিক্ত পয়সা দিয়েছে সে, যেমনটি কাজ করতে বলেছে, করে দিয়েছি। এর বেশি কিছু জানবার চেষ্টাও করিনি, জানতেও পারিনি। তা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী ফয়দা, বলুন?

দরবেশ চোর বলে, তা বটে, কিন্তু মুস্তাফাজী, আমার কিন্তু বড় কৌতূহল জাগছে। এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী করে ঘটতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ করতে পার? আমাকে নিয়ে যেতে পার ঐ বাসাটায়?

—এই দেখুন, বললাম না, রুমালে কষে বেঁধে দিল আমার চোখ দুটো তারপর বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে নিয়ে গিয়েছিল সে সঙ্গে করে। কী করে বলবো আপনাকে, কোথায় কোন বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি?

দরবেশ চোর বলে, ঠিক আছে। আমিও তোমার চোখ বেঁধে দিচ্ছি। তারপর তুমি হাতড়াতে হাতড়াতে চল আমার সঙ্গে। মনে করার চেষ্টা কর, কত দূর সোজা গিয়ে কোনদিকে বাঁক নিয়েছিলে। তারপর আবার কতটা চলার পর কোনদিকে ঘুরেছিলে। আমার মনে হয়, ঠিক মতো ইয়াদ করলে বাড়িটা তুমি খুঁজে বের করতে পারবে।

মুস্তাফা বলে, হুঁ, ঠিকই বলেছেন পীরসাহেব। যাদের চোখ নাই—অন্ধ, তারা তো আন্দাজেই হাতড়ে হাতড়ে সারা শহর দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। চোখে দেখতে না পেলেও তারা মন দিয়ে দেখে।

দরবেশ চোর উৎসাহ দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ, চোখে না দেখলেও অনুভবে দেখে তারা। তুমিও পারবে—নিশ্চয়ই পারবে। তা আমার এ খেয়াল মেটাতে তোমাকে খেসারত দিতে হবে কেন? অনেকটা সময় তোমার কাজের ক্ষতি হবে। সেইজন্যে এই নাও, ধর, এই মোহরটি রাখ।

একটা চকচকে সোনার মোহর গুঁজে দিল সে মুচির হাতে। মুচির চোখ নেচে ওঠে, দরবেশকে আপ্যায়ন করে বসায়, বলে, আপনি এক পলক বসুন, পীরসাহেব। আমি দোকানটা বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে বেরুচ্ছি এখুনি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো সাতান্নতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

চোর দরবেশ মুচির চোখ রুমালে বেঁধে দেয়। মুচি অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলে। এপথ সেপথ ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে চোরকে সঙ্গে নিয়ে এক বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, এই-এই সেই মকান।

চোর দরবেশ মুচির চোখের বাঁধন খুলে দেয়। তারপর একখণ্ড চকখড়ি দিয়ে দরজার গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দেয়। মুচির হাতে দুটো দিনার গুঁজে দিয়ে বলে, এই নাও তোমার বকশিশ। এখন থেকে আমাদের যা জুতো লাগবে সব তোমার দোকান থেকে কিনবো, বুঝলে?

মুচি গদগদ হয়ে বলে, সেলাম সাহেব, আচ্ছা তা হলে আমি চলি।

চোর ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে চলে যায়। সর্দারকে সব বলে।

মরজানা দোকানের সওদা কিনতে বাড়ির বাইরে বেরুতেই দেখতে পায় দরজার গায়ে সেই সাদা খড়িমাটির চিহ্ন। সন্দিগ্ধভাবে সে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে। ভেবে পায় না, কে এবং কেন এই অদ্ভুত ধরনের চিহ্নটি এঁকে দিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কোনও দুরভিসন্ধি আছে এর পিছনে।

মরজানা এক টুকরো সাদা চক এনে পাড়ার সবকটি বাড়ির দরজায় অবিকল ঐ একই ধরনের চিহ্ন এঁকে দেয়।

পরদিন সকালে ঐ চল্লিশ চোর দুজন দুজন করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু প্রতিটি বাড়ির দরজায় একই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকে তারা। ক্রোধে ফেটে পড়ে সর্দার। যে চোরটাকে সন্ধান করতে পাঠিয়েছিল তার ওপর ভীষণ ক্ষেপে ওঠে।

—ব্যাটা ধাপ্পাবাজ, শয়তান, আমার সঙ্গে ইয়ারকি! দাঁড়াও ডেরায় ফিরে গিয়ে তোমার মজা দেখাচ্ছি আমি।

বলাবাহুল্য, জঙ্গলে ফিরে গিয়ে সর্দারের তরবারির এক কোপে গুপ্তচর লোকটার প্রাণান্ত ঘটেছিল।

সর্দার এবার আর একজনকে পাঠালো সেই মুচির কাছে। সে-ও যথারীতি মুচির চোখ বেঁধে তার পিছনে পিছনে এসে হাজির হলো আলিবাবার বাড়ির সামনে। মুচির চোখের বাঁধন খুলে যথাবিহিত ইনাম বকশিশ দিয়ে গুপ্তচরটি একখণ্ড নীল রঙের খড়িমাটির সাহায্যে দরজার গায়ে নতুন ধরনের এক সংকেত চিহ্ন এঁকে দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে চোরগুলো দুই-দুইজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আবার শহরাভ্যন্তরে এসে পেঁছিয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেদিনও তারা প্রতিটি বাড়ির দরজায় একই চিহ্ন অঙ্কিত দেখে বিভ্রান্ত এবং ক্রোধান্বিত হয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়ে গুপ্তচরের প্রাণ সংহার করলো।

চোর সর্দার এবার আর অন্য কাউকেই ভরসা করতে না পেরে নিজেই দরবেশের ছদ্মবেশে মুচির দোকানে এসে হাজির হয়। একই ভাবে মুচি তাকেও আলিবাবার বাড়ির দরজায় নিয়ে যায়। সর্দার তাকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করে। তারপর একখণ্ড লাল চকখড়ি দিয়ে দরজার গায়ে মোহর এঁকে দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়।

সর্দার বুঝেছিল শুধু খড়িমাটির চিহ্ন এঁকে গেলেই যথেষ্ট হবে না। কারণ নিশ্চয়ই কেউ আড়াল থেকে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রত্যেক বাড়ির দরজায় একই চিহ্ন এঁকে রাখে। তাই সে যাবার আগে আলিবাবার বাড়িটার আশেপাশের বাড়িঘর, গাছপালা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদি মনে গেঁথে নিয়ে চলে যায়।

গুহার ডেরায় ফিরে এসে সে সাঙ্গপাঙ্গদের বলে, এবার আর চোখে ধাঁধা দিতে পারবে না আমার। এমন চিহ্ন মনে এঁকে নিয়ে এসেছি যা কক্খনো

ভুল হবার নয়। যাক, এবার তোমরা এক কাজ কর। বাজার থেকে আটত্রিশটা বড় বড় মাটির জালা কিনে নিয়ে এস। বেশ চওড়া মুখ আর পেট মোটাওলা হওয়া চাই। একটায় শুধু জলপাই তেল ভরতে হবে। আর বাকীগুলো খালি থাকবে, যাও, জলদি বেরিয়ে পড় তোমরা।

সর্দারের হুকুমে চোররা সকলে ঘোড়ায় চেপে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দারের নির্দেশমত একটি জালায় জলপাই তেল ভর্তি করে এবং বাকী সাঁইত্রিশটা শূন্যাবস্থায় কিনে ফিরে এল।

সর্দার বললো, প্রত্যেক ঘোড়ার দুই পাঁজরে দুটি জালা ঝোলাতে হবে। তার আগে তোমরা সকলে সাজপোশাক খুলে ফেলে একেবারে উদোম হও। শুধু মাথায় থাকবে পাগড়ী আর পিঠে ঝুলবে নাগরা।

সর্দারের হুকুম শিরোধার্য, তৎক্ষণাৎ সকলে বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। সর্দার বললো, প্রথমে একজন এস, এই তেলের জালাটা এক পাশে থাকবে, আর এক পাশে আরেকটি জালার ভিতরে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে বসতে হবে একজনকে। তা হলে দু পাশের ভার সমান হবে। বাকী তোমরা ছত্রিশজন ছত্রিশটা জালার মধ্যে ঐ একই ভাবে গুটিসুটি মেরে বসে পড়। তার আগে রসি দিয়ে জোড়া জোড়া জালার গলা বেঁধে এক একটা ঘোড়ার পিঠের দুপাশে ঝুলিয়ে দাও।

সর্দারের কথামতো চোরগুলো প্রথমে প্রত্যেকটি ঘোড়ার দুই পাঁজরে দুটি শূন্য জালা ঝুলিয়ে দিল। তারপর এক একটিতে এক একজন ঢুকে পড়লো।

প্রতিটি জালার মুখে হাল্কা করে নারকেলের ছোবড়া গুঁজে তালপাতার ঢাকা দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে দিল, যাতে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে ফেলতে খুব একটা অসুবিধা না ঘটে। তারপর সে প্রতিটি জালার গায়ে একখানা ভোজালী এবং একখানা ডাণ্ডা বেঁধে দিয়ে তৈল সহযোগে নানা বিচিত্র ধরনের আঁকিবুকি এঁকে দিল।

এরপর সে ঘোড়াগুলোকে শহরের পথে চালিয়ে নিয়ে চললো।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আলিবাবার বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো সর্দার। সে সময় আ লবাবা তার ফটকের দোরগড়ায় আয়াস করে বসে জিরোচ্ছিল।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো আটান্নতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

চোর সর্দার বিনয়ের অবতার হয়ে আলিবাবাকে সালাম সওগাত করে বলে, আমি এক সামান্য তেল ব্যবসায়ী, মালিক। এ শহর আমার একেবারে অচেনা, এই প্রথম এসেছি। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, এখন কোথায় রাতটা কাটাই সেই সমস্যায় পড়েছি। যদি কিছু মনে না করেন এ বান্দা আজকের রাতটা আপনার আশ্রয়েই কাটাতে চায়। আপনার বাড়ির আঙিনাটাও বেশ বড়সড়। আমার ঘোড়াগুলোও আরামে থাকতে পারবে।

আলিবাবা সদাশয় মানুষ, তখুনি সে বিনীত হয়ে বললো, আপনি

পরদেশী, মুসাফির, আমার ঘরে অতিথি হতে চান, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও কারণ নাই, মেহেরবানী করে অন্দরে আসুন। এ ঘর আপনার নিজের ঘর বলেই মনে করুন, আমি ধন্য হবো।

সর্দারের হাত ধরে সে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসে।

—মরজানা, ও মরজানা, দেখ কে এসেছে আমাদের ঘরে।

মরজানা ছুটে আসে। আলিবাবা বলে, মুসাফির মেহেমান। খুব আদর যত্ন করবে। দেখো যেন কোনও ত্রুটি না হয়। ঘোড়াগুলোকে ভিতরে নিয়ে এস। তেলের জালাগুলো সব সাবধানে নামিয়ে রাখ এক পাশে। আর ঘোড়াগুলোকে জাবনা দাও।

সকলে মিলে ধরাধরি করে মাটির জালাগুলোকে অতি সন্তর্পণে নামিয়ে চত্বরের একপাশে সারবন্দি করে বসানো হলো। ঘোড়াগুলোকে যব আর ছোলা খেতে দিল মরজানা। আলিবাবা মহামান্য অতিথিকে নিয়ে আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে রইলো।

বাড়ির বড় শোবার ঘরটায় চোর সর্দারের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হলো। নানারকম ভুরিভোজে পরিতৃপ্ত করে চোর সর্দারকে শয্যা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে আলিবাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান মালিক, এ ঘর আপনার নিজের ঘর বলে মনে করবেন।

সর্দার বলে, ও নিয়ে আপনি ভাবনা করবেন না শেখ সাহেব। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। শুধু রাতের বেলায় পায়খানা প্রস্রাব পেলে কোথায় যাবো, জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিয়ে যান।

আলিবাবা সর্দারকে আঙিনার একপাশে এসে পায়খানাটা দেখিয়ে বলে, দরকার হলে এখানে চলে আসবেন, মালিক।

সর্দার দেখলো, পায়খানার পাশেই জালাগুলো রাখা হয়েছে। বললো, বহুত আচ্ছা, আর কোনও অসুবিধে হবে না। এবার আপনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন শেখ সাহেব।

আলিবাবা চলে গেলে চোর সর্দার জালাগুলোর কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, শোন সাঙ্গাতরা, আমি যখন জালার গায়ে ছোট একটা ঢিল ছুঁড়ে আওয়াজ করবো তৎক্ষণাৎ তোমরা তড়িঘড়ি জালা থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের দিকে ছুটে আসবে। বুঝতে হবে তখনি শুরু হবে খতমের পালা।

আর ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এল সর্দার। মরজানা তখন একটা স্বল্পালোকের চিরাগ বাতি এনে ঘরের এক প্রান্তে রেখে সর্দারকে শুভ-রাত্রি জানিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মরজানা লক্ষ্য করে তেল-সওদাগর পালঙ্কে শোয়ামাত্র নাক ডাকাতে শুরু করেছে।

মরজানার তখনও অনেক কাজ বাকী। রসুইখানায় ঢুকে সে বাসনপত্র ধোয়ামোছা করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মরজানার চিরাগের তেল ফুরিয়ে আসে। আলোটা নিভু-নিভু হয়। কিন্তু তখনও সব কাজ তার শেষ হয়নি। সন্ধ্যাবেলায় দোকানে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু ঘরে অতিথি এসে পড়ায় আর তেল কিনে আনা হয়ে ওঠেনি।

নিভন্ত চিরাগ হাতে সে আলিবাবার ঘরে আসে, এখন কী হবে মালিক. ঘরে এক ফোঁটা তেল নাই। সন্ধ্যাবেলায় দোকানে যাওয়ার ফুরসত পাইনি।

আলিবাবা হাসতে হাসতে বলে, দূর বোকা মেয়ে। ঘরে তেল নাই কি বলিস. জলজ্যান্ত আটত্রিশটা তেলের জালা বসানো আছে আঙিনায়। তোর আর কতটুকু তেল লাগবে ? এখন যা, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়গে। কাজ কাম যা বাকী আছে কাল সকালে সারলেই হবে।

মরজানা আলিবাবাকে আর বিরক্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পাশের বড় ঘরটায় তখন মহামান্য মেহেমান সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে নাসিকা গর্জন করে চলেছে। মরজানা আঙিনায় নেমে আসে জালাগুলোর কাছে। একটুখানি তেল সে চিরাগে ভরে নেবে। কিন্তু একটা জালার মুখের ঢাকা খুলতে তেলের বদলে নারকেলের ছোবড়া দেখে ভড়কে যায়। যাই হোক ছোবড়াগুলো টেনে তুলতেই আরও অবাক হয়ে যায়। ঘাড় মুখ গুঁজে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা দামড়া লোক। ভয়ে শিউরে ওঠে মরজানা। সর্বনাশ, একি! তাড়াতাড়ি সে জালার মুখটা ঢাকা দিয়ে পাশের আর একটা জালার কাছে যায়।

এক-এক করে সাঁইত্রিশটা জালা পরীক্ষা করে একই বস্তু প্রত্যক্ষ করে তাজ্জব বনে যায়। এ যে একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র তা আর বুঝতে বাকী থাকে না তার।

শেষের জালাটিতে তেলের সন্ধান পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে ওর চোখ। রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে খানিকটা কাঠ ভরে দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করার বিরাট কড়াটা চাপিয়ে দেয়। তারপর তেলের জালাটা টেনে এনে কড়াতে সবটা তেল ঢেলে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে কড়া আগুনের জ্বালে টগবগ করে ফুটে ওঠে কড়ার তেল। আস্তাবল থেকে একটা বালতি আর মগ নিয়ে আসে মরজানা। সেই ফুটন্ত তেল বালতিতে ভরে নিয়ে জালার কাছে আসে সে।

প্রথম জালাটার ঢাকনা খুলে ছোবড়া তুলে চোরটার মাথায় একটা গাঁট্টা মারতেই লোকটা ক্যাঁক করে আওয়াজ তুলে ওপরের দিকে মুখ বাড়ায়। এবং তৎক্ষণাৎ মরজানা তার মুখের হাঁর ভিতরে ঢেলে দেয় এক মগ ফুটন্ত তেল। লোকটা অদ্ভুত এক আর্তনাদ তুলে স্তব্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে।

মরজানা আর একটা জালার কাছে এগিয়ে যায়।

এইভাবে এক এক করে সাঁইত্রিশটা জালার জঠরে তৈলদগ্ধ হয়ে সাঁইত্রিশ-জনেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

এর পরের ঘটনার জন্য মরজানা রসুইখানায় ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে।

বেশ কিছু পরে, তখন মাঝ রাত হবে, মহামান্য অতিথি সাহেবের নাক ডাকার আওয়াজ থেমে যায়। মরজানা বুঝতে পারে সর্দারজীর ঘুম ভেঙেগছে। এবার তার খেলাটা শুরু হবে।

এক মুঠো পাথরের নুড়ি সঙ্গে এনেছিল সর্দার। এক এক করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে জালাগুলো লক্ষ্য করে। লক্ষ্য অব্যর্থ, সবগুলো জালার গায়েই টঙ্কার তোলে। কিন্তু সর্দার অবাক হয়, তার সাঙ্গাতরা কেউই মাথা তুলে দাঁড়ায় না। বিশ্রী ভাষায় সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, শালা হারামীকা বাচ্চা, সব ঘুমে লটকে পড়েছে। দাঁড়া মজাটা আমি দেখাচ্ছি।

মরজানা রুদ্ধশ্বাসে দেখতে থাকে, সর্দারটি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে জালাগুলোর কাছে আসে। কিন্তু পোড়া তেল আর কাঁচা মাংস ঝলসানোর বিশ্রী গন্ধে নাকটা কুঁচকে ওঠে।

ধীরে ধীরে সে একটা জালার মুখের ঢাকনা খুলেই আঁৎকে ওঠে, সর্বনাশ, তার সব ফন্দী ফিকির ফাঁস হয়ে গেছে। এ যে তার জালার তেলেই তার সঙ্গী সাথীদের সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে এরা।

কয়েকটা জালার মুখ খুলে যখন একই দৃশ্য দেখতে পেল আর এক তিল সে দাঁড়ালো না। ঝটপট সদর খুলে চোঁচা দৌড় দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই নিশুতি নিঃশব্দ রাতের অন্ধকারে মরজানা একা একা হেসে লুটোপুটি হতে থাকলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো উনষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

মরজানা বুঝেছিল আপাতত রাতের মতো বিপদ কেটে গেছে। তাই সে রাতে সে আর আলিবাবার ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা জানাবার দরকার মনে করে না।

খুব সকালে আলিবাবার ঘুম ভাঙে। দরজা খুলে সে বাইরে এসে দেখে মরজানা ঘরের কাজ সারছে।

—কী রে মরজানা, এই সাত সকালে উঠে পড়ে কাজে লেগেছিস।

মরজানা মুখে কোনও কথা না বলে ইশারায় জালাগুলোর কাছে আসতে বলে আলিবাবাকে।

—আপনি নিজে হাতে এই জালাগুলোর ঢাকা খুলে দেখুন মালিক, কাল রাতে কাকে আপনি মেহেমান বলে আপ্যায়ন করে ঘরে তুলেছিলেন।

তাবৎ দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে আলিবাবা। মরজানার উপস্থিত বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার কথা ভেবে অবাক হয়ে যায় সে।

—মরজানা, তুমি যা করেছ তার কোনও জবাব নাই। আজ থেকে আমার এই সংসারের সব দায়-দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি। আমি জানি, তুমি যেভাবে চালাতে পারবে তা আর কেউ পারবে না।

আবদাল্লার সহযোগিতায় সেইদিনই ঐ সাঁইত্রিশ চোরের লাস সমাধিস্থ করলো আলিবাবা। বাড়ির পাশেই একটা বাগান, সেই বাগানের মাঝখানে পেল্লাই বড় একটা গর্ত খুঁড়ে সবগুলো মড়াকে একসঙ্গে গণসমাধি দেওয়া হলো।

আলিবাবার বড় ছেলে এখন কাসিমের দোকানে বসে। একদিন বাবাকে বললো, আমি তো দোকান-পাটের কিছুই জানতাম না আব্বাজান, আমাদের বাজারের হুসেনসাহেব আমাকে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়ে পড়িয়ে লায়েক করে তুলেছেন। এত ভাল মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। দিন দিনই তার কাছে বড্ড বেশি ঋণী হয়ে যাচ্ছি। প্রায়ই সে আমাকে তার সঙ্গে খানা-পিনা করতে ডাকে। আমি না বলতেও পারি না। কিন্তু বড় লজ্জা করে। কারণ আমি তো তাকে কোনও দিন খানা-পিনায় ডাকতে পারি না! আব্বাজান, আমার মনে হয়, ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো দরকার।

আলিবাবা বলে, একশোবার দরকার। বেটা, তুমি আগে বলনি কেন, এমন সদাশয় লোকের পায়ের ধুলো পড়লেও বাড়ি পবিত্র হয়। না না, আর দেরি করো না, কালই আমি ভোজের আয়োজন করছি, তুমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কাল জুম্মাবার, শুভদিন তোমাদের দোকানপাটও বন্ধ থাকবে, বিশ্রামের দিন,—সেই ভাল হবে। তাকে আমার তরফ থেকে নিমন্ত্রণ জানাবে। তাতে যদি সে লজ্জা বা বিনয় করে কোনও অজুহাত দেখাতে চেষ্টা করে তুমি তার কোনও ওজর শুনবে না, ধরে নিয়ে আসবে।

সুতরাং পরদিন সকালে আলিবাবার পুত্র হুসেনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এল। আলিবাবা সাদর অভ্যর্থনা জানালো নতুন সওদাগরকে। হুসেনের বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, মুখে চাপ দাড়ি। আলিবাবা আলাপ করে বড় প্রীত হলো।

হুসেন বিনয়াবনত হয়ে বলে, আপনার আদর অভ্যর্থনায় আমি আহ্লাদিত হয়েছি, মালিক। কিন্তু খানা-পিনা থাক ও সবে আমার আবার অনেক বাছ-বিচার, থাক ওসব, এই যে আলাপ পরিচয় হলো, এর তো কোনও তুলনা নাই।

আলিবাবা অবাক হয়ে বলে, খানা-পিনায় যদি বাছ-বিচার থাকে, বেশ তো সে সব জিনিস বাদ দিয়েই না হয় খাবে। কি কি খেতে মানা বল, আমি সেই মতোই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আমার গরীবখানায় যখন পায়ের ধুলো দিয়েছ, শুধু মুখে যেতে দেব না, বাবা।

হুসেন বলে. আমার মানত আছে বাড়ির বাইরে যদি কোথাও মাংসাদি খাই নুন দিয়ে খাব না।

—বেশ তো এ আর বেশি কথা কী! নুন ছাড়াই তোমার জন্যে খানা পাকাতে বলছি। কোনও অসুবিধে হবে না।

আলিবাবা ছুটে রসুই ঘরে গিয়ে মরজানাকে বলে, আজকের খাবারে কোনও রকম নুন দিও না মরজানা। মেহেমান নুন খাবে না।

কথাটা শুনে মরজানার কেমন খটকা লাগলো। এ কেমন কথা। খাবারে

নুন খাবে না কেন সে ?

সন্ধ্যায় খাবার সাজানো হলো টেবিলে। আমন্ত্রিত অতিথি হুসেনকে পাশে নিয়ে খেতে বসলো আলিবাবা আর তার পুত্র। মরজানাই পরিপাটি করে পরিবেশন করলো সকলকে। মরজানা বেশ বুঝতে পারলো, সওদাগরটি বয়সে প্রবীণ হলে কী হবে, ক্ষণেক্ষণেই সে মরজানার রূপ-যৌবন দেখে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

খানাপিনা শেষ হয়ে গেল। তিনজনে বসে তখন খোশ গল্প করছিল। এমন সময় অপরূপ নর্তকীর সাজে সজ্জিত হয়ে মরজানা প্রবেশ করলো ঘরে। শুধু হুসেন নয়, আলিবাবা এবং তার পুত্রও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল মরজানার সাজ-সজ্জার বাহার দেখে। সুর্মা কাজলে এঁকেছে চোখ, পরণে দামী রেশমী শালোয়ার, কোমরে সোনার কোমরবন্ধ, একপাশে সোনার খাপে ঝোলানো একখানা ছোট্ট ভোজালী। গায়ে জমকালো কামিজ। তার ওপরে নানা মণিমুক্তো খচিত একটি খাটো জ্যাকেট। মাথায় সুন্দর একটি কাজ করা টুপী। এক কথায় বুকে আগুন ধরানো রূপ।

মরজানার পিছনে তরুণ আবদাল্লা—তার হাতে নাচের বাদ্যযন্ত্র। হাতের যাদুতে সে অপূর্ব এক নৃত্যতাল বাজাতে শুরু করেছে। সে তালে তাল মেলাতে চাইবে না এমন বেরসিক কেবা আছে। আপনা থেকেই সে ছন্দে হৃদয় নেচে ওঠে—পা তাল ঠুকতে শুরু করে।

মরজানা প্রথমে আলিবাবার সামনে এসে কুর্নিশ করে শ্রদ্ধা জানালো। তারপরই পাখীর মতো ফুড়ুৎ করে চলে গেল ঘরের অপর প্রান্তে।

শুরু হলো নাচ। অপূর্ব তাল-মান-লয় জ্ঞান তার। একেবারে নিখুঁত। তিনজনের সকলের মুখের ভাষা গেছে হারিয়ে। অপলক চোখে তারা মরজানার অপরূপ নৃত্যকলা দেখে মুগ্ধ হতে থাকে।

একটানা কতক্ষণ নাচতে পারে মরজানা ? মেয়েটির সারা অঙ্গের প্রতিটি মাংসপেশী নাচতে থাকে। নাচতে থাকে সেই ঘরের প্রতিটি ধূলিকণা, বাতাস।

কত রকম নৃত্যই যে সে দেখাতে থাকলো তার সীমা সংখ্যা নাই। কখনও সে ইহুদীদের নাচ নাচে, কখনও জিপসী নাচ ধরে, আবার কখনও গ্রীক, কখনও পারসী, কখনও বা ইথিওপিয়ার গ্রাম্য নাচে মেতে ওঠে।

তিন দর্শক যখন নিজেদের সত্তা ভুলে গিয়ে মরজানার তালে তাল মিশিয়ে দিয়েছে সেই সময় মরজানা ভোজালী নৃত্য শুরু করে। ছোরা হাতে সে নাচতে নাচতে ছুটে আসে দর্শকদের সামনে। আবার পলকে ঘরের অপর প্রান্তে ছিটকে পালিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই সে বুকে তুফান তোলা ছন্দে নাচতে নাচতে আবার ফিরে আসে ওদের সামনে। ছোরাটা বাগিয়ে ধরে আলিবাবার পুত্রের বুকে। মনে হলো, এই বুঝি বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু না তক্ষুণি সে পলকে পালিয়ে চলে যায় অপর প্রান্তে।

পলে পলে উত্তেজনা, আশঙ্কা, শিহরণ—সব মিলে মরজানা এমন এক

রোমাঞ্চকর নৃত্যকলা রচনা করে চলেছে যা মনপ্রাণ উত্তাল করে তোলে।

ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো ছোরা হাতে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসে মরজানা। এমনভাবে ছোরাটা সে বাগিয়ে ধরে আসে যে, মনে হয় এই বুঝি কারো বুকে বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু ওদের সামনে এসেই মরজানা ভোজালীটা মুহূর্তের মধ্যে নিজের বুকেই বাগিয়ে ধরে। মরজানার দেহটা ময়ূরীর পেখমের পিছন দিকে বেঁকে নুইয়ে পড়তে থাকে। ডান হাতের মুঠিতে ধরা ছোরাটা তখনও তার নিজের বুকেই তাক করা।

আলিবাবা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সর্বনাশ, যদি কোনও কারণে মরজানার পা ফসকে যায় তবে ছুরিটা আমূল বসে যাবে তার বুকের মধ্যে। একি সর্বনেশে নাচরে বাবা! দম বন্ধ হয়ে আসে।

মরজানার চোখের ইশারায় আবদাল্লাহ পেয়ালার পাত্র মেলে ধরে দর্শকদের সামনে। আলিবাবা ভাবে মরজানা বকশিশ না পেলে এই আত্মহত্যার নাচ থামাবে না। তাই সে জেব থেকে একটা মোহর বের করে আবদাল্লাহর পাত্রে ছুঁড়ে দেয়। বাবার দেখাদেখি ছেলেও একটি স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দেয়। মহামান্য অতিথি হুসেন সাহেবই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকে কি করে। সেও কোমর থেকে তোড়া খুলে তার মধ্যে হাত ঢোকায়। এবং সেই মওকায় মরজানা ঝাঁপিয়ে পড়ে হুসেনের ওপর। কোনও রকম সুযোগ না দিয়েই সে ভোজালীখানা আমূল বসিয়ে দেয় সে হুসেনের কলিজায়। এবং প্রায় সংগে সংগেই গগন-ভেদী আর্তনাদ তুলে হুসেন গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়।

আলিবাবা এবং তার পুত্র দুজনেই শিউরে ওঠে? একি সাংঘাতিক কাণ্ড? মরজানার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল?

—না মালিক, মরজানা শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে, মাথা আমার ঠিক আছে। আপনারা যাকে মহামান্য অতিথি মনে করে ঘরে এনেছিলেন আসলে সে কোনও সদাশয় সওদাগর নয়—ঐ শয়তান ডাকু সর্দার। এর আগে সে এসেছিল তেল ব্যবসায়ী হয়ে।

আলিবাবা অবাক হয়ে বলে, কিন্তু তার তো দাড়িগোঁফ ছিল না কিছু?

—এ দাড়িগোঁফও এর নিজের নয় মালিক, পরচুলা। এই দেখুন আমি টেনে খুলে দিচ্ছি, এবার নিশ্চয়ই চিনতে অসুবিধে হবে না?

পিতাপুত্র উভয়েই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলো সেই তেল-ব্যবসায়ীই বটে!

কৃতজ্ঞতায় রুদ্ধ হয়ে এল আলিবাবার কণ্ঠ।

—বেটি, তুমি দু' দুবার আমাদের গোটা পরিবারের জান বাঁচিয়েছ। তোমার বুদ্ধি বিচক্ষণতার তুলনা হয় না। আমি চাই তুমি আমার সংসারের মণি হয়ে চিরকাল এই সংসারেই বাস কর। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। তুমি আর আমার কেনা বাঁদী রইলে না। এবার তুমি স্বাধীন। আমার প্রস্তাব আমার ছেলেকে শাদী করে তুমি যদি আমার ঘর আলো করো, মা জননী, আমি খুব সুখী হবো।

মরজানা লজ্জায় মাথা অবনত করে বলে, আপনাকে সুখী করা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনও চিন্তা নাই, আব্বাজান।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো ষাটতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

আলিবাবার পুত্রের সঙ্গে মরজানার শাদী হয়ে যাওয়ার পরে অনেকদিন মরজানা আলিবাবাকে সেই পর্বত গুহায় যেতে দেয়নি। তার কারণ চল্লিশ চোরের বাকি দুজন হয়তো তখনও ঐ গুহাভ্যন্তরেই রয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওরা কি করে ভাববে সে দুজনকে চোরসর্দারই নিজের হাতে হত্যা করেছিল।

এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেছে। আলিবাবা ছেলেকে সঙ্গে করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায় আর ঘরে থাকে মরজানা।

একদিন আলিবাবা বায়না ধরলো, ঢের দিন চলে গেছে মা জননী, আমার মনে হয় ওদের আর কেউ বেঁচে বর্তে নেই দুনিয়ায়। তাহলে কি আমাদের বেয়াৎ করতো সহজে। এবার তুমি অনুমতি দাও, আমি একবার গুহায় গিয়ে ধনরত্নগুলো ঘরে এনে তুলি?

মরজানা বলে, ঠিক আছে আব্বাজান, কাল সকালে আপনাদের সঙ্গে আমিও যাবো ঐ গুহা দেখতে।

পরদিন তিনজনে অতি সন্তর্পণে গুহা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। মরজানা সূক্ষ্ম বুদ্ধি-সম্পন্না মেয়ে। সে দেখলো, গুহার দিকে যাওয়ার পথটা লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে সমাকীর্ণ হয়ে গেছে। ভাল করে লক্ষ্য করে বোঝা যায় এ পথে বহুদিন কোনও জন-মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। চোর দুটো যদি সত্যিই জীয়ন্ত থাকতো তবে নানা কারণেই তারা বাইরে আসতে বাধ্য হতো। এবং তাদের যাওয়া আসার একটা ছাপ অবশ্যই আঁকা থাকতো এখানে। মরজানা বললো, চলুন আব্বাজান, গুহার ভিতরে ঢোকা যাক। আমি নিশ্চিত, এখন আর এখানে কেউ যাতায়াত করে না। আমরা নির্ভয়ে ঢুকতে পারি এখন।

আলিবাবার মনে তখনও ভয়ের কালো মেঘ দানা বেঁধে ছিল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সে হাঁক ছাড়ে 'চিচিং ফাঁক'।

সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

তিনজনেই নিচে নেমে যায়। আলিবাবা দেখে যেমনটি সে দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমন রয়েছে সবকিছু। কেউ কিছু সরিয়ে নিয়ে যায়নি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মণিরত্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওরা তিনজনে সবচেয়ে মূল্যবানগুলো তিনটি বস্তায় ভরে নিয়ে বাড়ি চলে এল।

এরপরে আর তারা কখনও ঐ রত্নগুহায় যায়নি। যাওয়ার দরকারও হয়নি। যে ধনরত্ন তারা নিয়ে এসেছিল সেদিন তারই কল্যাণে সারা মুলুকে তাদের

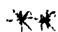
মতো ধনী মানুষ আর কেউ ছিল না। আলিবাবা বলতো, এই আমাদের অফুরান, আর বেশি সম্পদে কাজ নাই। আল্লাহর কৃপা থাকলে কোনও কিছুরই অভাব হয় না। তিনি হাত গুটিয়ে নিলে সোনামুঠিও ধুলো হয়ে যায়।

মহানুভব শাহেনশাহ, এই আমার কিস্‌সা। জানি না কেমন লাগলো আপনার।

শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শাহরিয়ার বলেন, সত্যিই বড় চমৎকার তোমার কাহিনী শাহরাজাদ, তুলনা হয় না। আজকের দিনে মরজানার মতো বুদ্ধিমতী বিচক্ষণা নারী চোখে পড়ে না। কিন্তু আমি নিত্য নতুন নারী-সম্ভোগ করে তার শিরচ্ছেদ করি। এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে হয়তো কোনওদিন তেমন এক মেয়ে আমার সামনে এসে এর সমুচিত জবাব দিয়ে যাবে।

শাহরাজাদ দেখলো, সুলতান কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাই সে নতুন কাহিনী শুরু করতে দ্বিধা করতে লাগলো।

কিন্তু পরক্ষণেই সুলতান নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, তাহলে নতুন কিস্‌সা শুরু কর, শাহরাজাদ, রাত এখন অনেক বাকী।

একদিন জাফর আর মাসরুরকে সঙ্গে করে খলিফা হারুণ অল রসিদ টাইগ্রীসের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় তিনি একটা সেতুর ওপরে এসে দেখলেন এক অন্ধ পদ্মাসন হয়ে বসে ভিক্ষে মেগে চলেছে। সুলতান হাত বাড়িয়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিল তার ভিক্ষাপাত্রে। অন্ধটি সঙ্গে সঙ্গে দাতার হাতখানা চেপে ধরে, আপনার এই দান-এর যোগ্য প্রতিদান আপনি পাবেন মালিক। আল্লাহ আপনাকে সবচেয়ে সেরা বস্তু দান করবেন। আমার একটা অনুরোধ আছে, আপনাকে রক্ষা করতে হবে।

খলিফা ঈষৎ বিরক্তই হলেন। বলেন, বেশ তো কী অনুরোধ, বল শুনি।

—আমাকে যারা দান করেন তাদের হাতের একটা ঘুষি না পেলে আমি কিছুই গ্রহণ করতে পারি না। তাই আপনাকেও আমার অনুরোধ, যদি দিতেই চান তবে আমার মুখে একটা ঘুষি লাগিয়ে দিন।

খলিফা অবাক হন, সে কি কথা, তুমি অন্ধ আতুর মানুষ। আমি দয়াপরবশ হয়ে তোমাকে সাধ্যমতো কিছু দান করবো, তা ঘুষি দিতে যাবো কেন?

—তা যদি না-দিতে পারেন মালিক, আপনার দান আপনি ফিরিয়ে নিন। আমার শপথ আছে, নিতে পারবো না।

বৃদ্ধ অন্ধটার একগুঁয়েমী দেখে খলিফা বেশ বিরক্তই বোধ করেন। কিন্তু লোকটা দান গ্রহণ করবে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার কানের গোড়ায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে রেহাই পান।

একটু দূরে গিয়ে জাফরকে বলেন খলিফা, ইয়া আল্লাহ একি আজব মানুষ। নিশ্চয়ই ওর জীবনে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্যে এই ধরনের এক

অদ্ভুত শপথ নিতে হয়েছিল। যাও লোকটার কাছে গিয়ে বলে এস আগামীকাল দুপুরে তাকে খলিফার দরবারে হাজির হতে হবে।

জাফর ফিরে এলে আবার খলিফা হাঁটিতে থাকেন। কিছু দূরে গিয়ে আর এক ভিক্ষুকের দেখা পান। লোকটি খঞ্জ! মুখের এক পাশ কাটা। সেও ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে ধরলো। খলিফা সহজভাবে একটি দিনার দিলেন তার পাত্রে। স্বর্ণমুদ্রা দেখে লোকটির চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, ওরে বাবা, গোটা একটা মোহর? যখন মাদ্রাসার মৌলভী ছিলাম তখনও এক সঙ্গে একটা গোটা মোহর চোখে দেখিনি কখনও।

—লোকটা বলে কি, হারুণ অল রসিদ বিস্ময়াহত হয়ে বলেন, একটা মাদ্রাসার মৌলভীর এই দীন ভিখারীর দশা হলো কি করে? জাফর, লোকটা কি সত্যিই বলছে? সে কি কোনওকালে শিক্ষক ছিল তোমার মনে হয়? যাই হোক, মনে হচ্ছে, এরও জীবনের ঘটনাস্রোত সোজা পথে বয়ে চলেনি। তা না হলে আজ সে ভিক্ষে করে খাবে কেন? তুমি একেও কাল দুপুরে আমার দরবারে হাজির করবে!

জাফর বলে, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

এরপরে ওরা তিনজনে আরও খানিকটা এগোতে অন্যতম ভিখারীর উচ্ছ্বসিত আশীর্বাণী শুনতে পেলেন। সুলতান দেখলেন, এক বৃদ্ধ সওদাগর বেশ মুঠিভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দান করেছে ভিক্ষুকটিকে এবং তাতে সে দিশাহারা হয়ে কি ভাবে তাকে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। খলিফা লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধ সত্যই বেশ মোটা অঙ্কের মুদ্রা দরাজহাতে দান করেছে তার পাত্রে। খলিফা অবাক হলেন এই ভেবে, একজন সাধারণ নাগরিক যা দান করতে পারে তিনি নিজে সুলতান হয়েও তা পারেন না। জাফরকে বললেন তিনি, শোন সাহেবকে কাল দুপুরে খলিফার দরবারে হাজির হতে বল।

আরও একটু এগোতে খলিফা দেখলেন রাস্তার দু পাশের মানুষজন সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, আর এক অশ্বারোহী সেনাপতি হাঁক ছাড়ছে। এই, খবরদার, পথ ছেড়ে দাঁড়াও। চীন-সম্রাটের রাজকুমারীর স্বামী আসছেন! হট যাও, তফাত যাও, মহামান্য চীন-সম্রাটের জামাতা হিন্দুস্তানের সম্রাট আসছেন এই পথে।

দেখা গেল একটি প্রিয়দর্শন যুবক রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে অশ্বারোহী সেনাপতিটির পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে।

খলিখা জাফরকে বললেন, আমার শহরে এমন মেহেমান এসেছেন। নিশ্চয়ই আলাপ-পরিচয় করা দরকার। জাফর, তুমি ঐ মিছিলের পিছনে পিছনে ধাওয়া কর। দেখ, তারা কোথায় গিয়ে ওঠে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই আমার এই শহরেই কোথাও রাত্রিবাস করবে। তুমি কাল দুপুরে আমার দরবারে তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে। আমি আজ মাসরুর প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি। এদের খোঁজ খবর নিয়ে তুমিও ফিরে এসে জানাও আমাকে। এদের খবরা-খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবো আমি।

আরও খানিকটা এগোতে খলিফা দেখলেন, এক যুবক একটা সুন্দর মাদী ঘোড়ায় চেপে সাঁই সাঁই করে চাবকাচ্ছে আর ঘোড়াটি তারস্বরে চিঁহি চিঁহি করে চিৎকার ছাড়ছে। কিন্তু যুবকের কি অমানুষিক খেলা! গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে ঘোড়াটাকে সে একটানা বেদম প্রহার করেই চলেছে। উঃ কী নৃশংস!

একটুক্ষণের মধ্যেই সাদা ঘোড়াটার গা ফেটে লাল রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো, কিন্তু তবুও ছেলেটি ক্ষান্ত হতে চায় না।

খলিফা নিজে এক অশ্বপ্রিয় ব্যক্তি। ঘোড়াকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে দেখলে তিনি ঠিক থাকতে পারেন না। পথচারীদের অনেককে ডেকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপারটা কী? সাহেব এত ক্ষেপে গেছেন কেন?

কিন্তু খলিফার প্রশ্নের কেউই জবাব দিতে পারে না। বলে, খোদা জানেন, আমরা কি করে বলবো? তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, এই যুবক নিয়ম করে প্রতিদিন ঠিক এই সময় ঘোড়ায় চেপে এখানে আসেন এবং এলোপাতাড়ি পিটাতে পিটাতে রক্তের বন্যা বইয়ে দেন। কেন, কী কারণে তা কেউ জানে না।

খলিফা মাসরুরকে বললেন, যাও ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর কেন সে এইরকম ভাবে এক নিরীহ জানোয়ারের ওপর অত্যাচার করে। যদি সহজ কথায় জবাব না দেয় ওকে গ্রেপ্তার করে কাল দুপুরে আমার দরবারে হাজির করবে।

এরপরে হারুণ অল রসিদ প্রাসাদে ফিরে এলেন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো একষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন দুপুরের নামাজ শেষে খলিফা দরবারে এলেন। জাফর সুলতানের সামনে ঐ পাঁচজনকে হাজির করলেন। সকলে যথাবিহিত কুর্ণিশ জানিয়ে সুলতানের মসনদের সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকলো। খলিফা ইশারায় তাদের বসতে আদেশ করলেন।

তখন খলিফা সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার যুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কাল বিকেলে নিজের চোখে দেখেছি তুমি একটি বোবা জানোয়ারের পিঠে চেপে নির্মমভাবে তাকে প্রহার করছিলে। কিন্তু কেন, কারণ কী? তুমি তোমার ঘোড়ায় চাপবে তাতে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু একটা অসহায় জানোয়ারকে ঐ ভাবে প্রহার করা অমানুষিকতা। সহ্য করা যায় না। আমি এও লক্ষ্য করেছি সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই তোমার ত্রাসে আতঙ্কিত। কেউ কিছু জানে কি না জানি না, কিন্তু আমার বারবার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও তারা মুখ খুলতে সাহস করলো না। এরই বা কারণ কী? আমার এমনই ক্রোধ জন্মেছিল, নিজের ছদ্মবেশের কথা ভুলে গিয়ে তখুনি তোমাকে সমুচিত শিক্ষাদানের কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে কোনও রকমে ঘটনাস্থল থেকে চলে এসেছি। কিন্তু তা বলে ব্যাপারটা আমি ভুলতে পারিনি আদৌ। আজ তোমাকে ডাকা হয়েছে তার উপযুক্ত

কারণ দর্শাবার জন্য। তোমার সব কথা শোনার পর আমি যদি সন্তুষ্ট হই তবেই তুমি রেহাই পাবে ; নচেৎ যোগ্য সাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। নাও, দেরি কোরো না তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে দ্বিধাহীন চিত্তে তা পেশ করতে পার এখানে।

খলিফার ফরমান শুনে ঘোড়সওয়ার বাবাজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঘাড় গুঁজে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। দু' গাল বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা।

যুবককে কাঁদতে দেখে খলিফা কিছুটা নরম হয়ে বললেন, তোমার কিচ্ছু ভয় নাই। তুমি ভুলে যাও, তোমার সামনে স্বয়ং খলিফা বসে আছেন। নাও, খোলসা করে বল দেখি কাহিনীটা কী? ঠিক আছে, আমি তোমাকে জবান দিচ্ছি, তোমাকে কোনও সাজা দেব না। অবশ্য যদি সত্যি কথা সব খুলে বল।

জাফরও ভরসা দেয়, ভয় নাই, জাঁহাপনা যখন অভয় দিচ্ছেন তখন নির্ভয়ে সত্যি কথা বলতে পার তুমি।

এরপর যুবকটি চোখের জল মুছে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসে।

শুনুন ধর্মাবতার, আমার নাম সিদি নুমান। আজ যে কাহিনী বলার জন্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন তা আমাদের পরিবারের ধর্মবিশ্বাসের কাহিনী।

অল্পক্ষণের জন্য যুবকটি নীরব হলো। হয়তো বা সে কাহিনীটা মনে মনে একবার ঝালাই করে নিতে চাইলো।

আমার বাবা যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর বিশাল বিত্তের আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী হলাম। যে-কোনও মানুষের কাছে সে ধনসম্পদ কেবলমাত্র যথেষ্ট নয়—প্রচুর। এক কথায় অতুলনীয়ও বলা চলে। আমাদের এলাকায় আমার চেয়ে ধনীমানুষ আর কেউ নাই।

ছোটবেলা থেকেই, আমাদের বংশমর্যাদা বা আভিজাত্য অহঙ্কারের জন্যেই বোধহয় আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। পাড়া প্রতিবেশী কারো সঙ্গে মেলামেশা করা নিষেধ ছিল। তাই ছোট থেকেই আমি নির্বান্ধব অবস্থায় মানুষ হয়েছি। এবং বড় হয়েও সে অভ্যাস কাটাতে পারিনি। কোনও বাধা নিষেধ অবশ্য ছিল না তখন, কিন্তু আমার নিজেরই ভাল লাগতো না কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে। নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত একা একা থাকতেই আমার বেশি ভাল লাগে।

এবং বোধহয় এই কারণে এখনও আমি অবিবাহিত। কাউকে শাদী করে আমার জীবন-সঙ্গিনী করবো, সেকথা ভাবতেই পারি না আমি। আমিই আমার একমাত্র মালিক, তার ওপর কেউ ভাগ বসাতে আসবে সে আমি সইতে পারবো না। সেই কারণে আজও আমি অকৃতদার। বিবি বন্ধু ইয়ারবিহীন একা একা থাকায় যে কী মজা তা কী করে বোঝাবো আপনাকে। যে যাই

বলুক, আমার মতে নিঃসঙ্গ মধুর জীবনের চেয়ে আর কিছুই সুন্দর হতে পারে না।

এই ছিল আমার আজন্মের ভাবনা। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে আমার এতকালের ধ্যান ধারনার অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটে গেল। ভাবতে শুরু করলাম, এই একঘেয়ে জীবনের গতি ফেরাতে হবে। শাদী করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করবো। জগতে এত ভোগের সামগ্রী আছে তা যদি সময়কালে আস্বাদ করেই না দেখলাম তবে তো জীবনটাই সেই 'আঙ্গুর ফল কি' শৃগালের মতো হয়ে যাবে।

কিন্তু শাদী কী করে সম্ভব? আমাদের যা বংশমর্যাদা, তার সমকক্ষ অভিজাত পরিবারই বা তামাম আরব দুনিয়ায় কটা আছে? আর দু চারটে থাকলেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগই বা ঘটতে পারবে কী উপায়ে? এ ছাড়া অন্য নিচু বংশের কোনও মেয়েকে ঘরের বিবি করার প্রশ্নই উঠতে পারে না আমাদের পরিবারে।

কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, যার কড়া শাসনে কেটেছে এতকাল সেই বাবা তো গত হয়েছেন। এবার আমার পরিবারের আমিই তো মাথা। আমি যদি ঐ সব নীল রক্তের বাধা না মানি কে আমার গর্দান নেবে?

তাই ঠিক করলাম, বাঁদী-হাট থেকে পরমাসুন্দরী দেখে একটি মেয়ে কিনে আনবো আমার জন্য। তারপর যদি মনে ধরে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শাদী করে বিবি বানাবো। না হলে, যেমন বাঁদী তেমনি বাঁদীই সে থেকে যাবে। ক্ষতি কী?

পরদিন সকালে আমি বাঁদীবাজারে গেলাম। খবর পেয়েছিলাম সম্প্রতি নানা দেশ থেকে পরমাসুন্দরী মেয়েরা সব এসেছে। আমাকে দেখেই দালাল এবং নিলামদাররা ছেঁকে ধরলো। এক এক করে অনেক মেয়েকে দেখালো তারা। আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। যাকেই দেখি তাকে ডানাকাটা পরী বলে মনে হতে লাগলো। এক সঙ্গে এতগুলো পরমাসুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখিনি কখনও। তাই বাঁশবনে ডোম কানার মতো দিশাহারা হয়ে পড়লাম।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বাষট্টিতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে:

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরেও আমি ঠিক করতে পারলাম না কাকে কিনবো। অথচ বাড়ি থেকে পণ করে বেরিয়েছি, খালি হাতে ফিরবো না। একটি বাঁদীকে আনবোই ঘরে। তাই শেষমেশ সব চেয়ে বয়সে ছোট যে মেয়েটি তাকেই পছন্দ করে দাম জিজ্ঞেস করলাম। তার রূপের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নাই তবে বলতে পারি অমন রূপসী কন্যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

যাই হোক তারই হাত ধরে আমি ঘরে ফিরে এলাম। ওর শান্ত বিনয়

নম্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু অসুবিধায় পড়লাম, সে আমার ভাষা বোঝে না, আমিও তার ভাষা জানি না। তাই আমি তাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারি না, সেও কিছু বলতে সমর্থ হয় না। তবুও আমার বেশ ভাল লেগেছিল। নাই বা বুঝলো সে আমার মুখের কথা, মনের ভাষা পড়তে তো শুধু ভালবাসার দরকার হয়। আমরা যদি দুজনে দুজনকে ভালবাসতে পারি তবে মুখের ভাষা কোনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

মেয়েটি কিন্তু আমার সংগে ঘনিষ্ঠ হতে চায় না। আকারে প্রকারে নানা ভাবে তাকে কাছে টানার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু কিছুতেই সাড়া দেয় না সে।

আমার স্বভাব প্রকৃতি জন্মগত ভাবেই একটু ভিন্ন ধাঁচের। জোর জুলুম গায়ে পড়ে ভাবসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিশেষ আর বিরক্ত করলাম না তাকে।

সে নিজের খেয়ালেই চলাফেরা করে। বলতে গেলে আমার সামনেই আসতে চায় না সে। আমিও ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই না।

এইভাবে দিন দশেক কেটে গেল। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেংগে গেল। আমার বাঁদী পাশের ঘরে শোয়। ভাবলাম দেখে আসি তো কেমন সে ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু অবাক হলাম, পাশের ঘরের সামনে যেতেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি ঐ নিশুতি রাতেও বিছানায় শোয় নি। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি অস্থির পায়ে পায়চারী করে চলেছে।

মনে হলো, মেয়েটিকে কিনে আনা আমার উচিত হয় নি। কেনার আগে ওর মত জানা উচিত ছিল।

যাই হোক, কতক্ষণ সে ঐ ভাবে না ঘুমিয়ে কাটায়, আমার দেখা দরকার। হয়তো এই গৃহ ওর কাছে কয়েদখানার মতো মনে হয়েছে। তা যদি হয় তবে তো ওকে আর এখানে বন্দী করে রাখা ঠিক হবে না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি দরজা খুলে বাইরে বেরুলো। আমি নিজেকে আড়াল করবার জন্য অন্য পাশে সরে গেলাম। মেয়েটি ধীর পায়ে চলতে চলতে বাড়ির সদর ফটক ছাড়িয়ে পথে নামলো। আমি অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ করে চললাম। সে বুঝতে না পারে সেইভাবে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পিছনে পিছনে যেতে থাকলাম।

আমাদের বাড়ির অদূরে একটি কবরখানা। মেয়েটি সোজা গিয়ে প্রবেশ করলো ঐ গোরস্থানে। বেশ সহজ এবং সাবলীল গতিতে এমন ভাবে ঢুকলো যা দেখে আমার মনে হলো, এ জায়গা যেন তার কতকালের চেনা।

মেয়েটি কবরখানার মাঝখানে গিয়ে একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু পরে দেখলাম, একটি ছায়ামূর্তি উঠে এল ঐ কবর থেকে। তারপর মেয়েটিকে হাতে ধরে একটা বেদীর ওপর বসে পড়লো।

আমি একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনকে দেখতে

থাকলাম। ছায়া মূর্তি কবরের তলা থেকে একটি মানুষের মাথা তুলে মেয়েটির হাতে দিল। আমি শিউরে উঠলাম।

মেয়েটি মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলো। এই দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। আমার চিৎকারে ওরা দুজন তেড়ে এল আমার দিকে। আমি তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছি।

মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন সব বলতে থাকলো। এবং প্রায় সংগে সংগেই বুঝতে পারলাম আমি একটি কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে গেছি।

এরপর ঐ ছায়ামূর্তি আর মেয়েটি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় লাথি মারতে মারতে কবরখানা থেকে বাইরে বের করে দিল। আমি প্রাণভয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

কিন্তু শহরের যে পথেই যাই অন্য সব কুকুররা আমাকে দেখামাত্র মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। আমি আরও জোরে ছুটে পালাতে থাকি। কিন্তু পালাবো কোথায়, শহরের সব পথেই নেড়ি কুত্তার দল। তারা আমায় দেখামাত্র তাড়া করতে থাকলো।

অবশেষে এক কষাইখানায় এসে ঢুকে পড়লাম। আমার পিছনে পিছনে কুকুরগুলোও ঢুকতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দোকানীর ডান্ডার তাড়া খেয়ে পিছু হটে গেল তারা।

বাকী রাতটুকু ঐ দোকানেরই এক কোণে কুঁকড়ে পড়ে রইলাম আমি। দোকানী হয়তো বুঝেছিল ঐ রাতে আমাকে বের করে দিলে কুকুরগুলো আমাকে ছিঁড়ে খাবে। তাই সে-রাতের মতো সে আর আমাকে কিছু বললো না। কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই আমাকে পথে বের করে দিল সে।

অন্য কুকুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে গুটি গুটি চলতে চলতে এক সময় এক রুটির দোকানের সামনে এসে পেঁছিলাম। দোকানের মালিক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ এক শেখ। সকালের নামাজ সেরে সবে সে তখন নাস্তা করতে বসেছে। আমাকে দেখে বোধ হয় প্রাণে দয়া হলো তার, তাই এক টুকরো রুটি একটু বেগুনের কোপ্তা জড়িয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

সারারাত ধরে অনেক ছুটাছুটি করতে হয়েছে, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিল। তাই আর দ্বিধা না করে বেশ সাগ্রহেই খেলাম সেই রুটিখানা।

পথে অন্য কুকুর আসছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে আমি বৃদ্ধের দোকানের এক কোণে ঢুকে কুঁকড়ে রইলাম। দোকানী বুঝতে পারলো, আমার অসহায় অবস্থা। পথের কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিল সে।

দুপুরে দোকান বন্ধ করে আমাকে সংগে নিয়ে সে তার বাড়িতে এল। বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা আমাকে দেখামাত্র বোরখার নাকাবে মুখ ঢেকে ফেললো। বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো; কী ব্যাপার বেটি, সংগে তো আমি বাইরের কোনও পুরুষ মানুষকে নিয়ে আসিনি, তা এত শরম করছো কেন?

মেয়েটি বললো, দাঁড়াও আব্বাজান, আমি আসছি।

এই বলে সে পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরে একটা ছোট্ট পাত্রে খানিকটা জল এনে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে কি যেন সব মন্ত্র আওড়াতে থাকলো। আর কী আশ্চর্য, আমি তখনি, আবার আমার নিজের রূপ ফিরে পেলাম। বৃদ্ধ অবাক হলো ততোধিক। বললো, এসব কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মা?

মেয়েটি বললো, তুমি যাকে কুকুর বলে ঘরে এনেছো আব্বাজান, আসলে সে এক খানদানী ঘরের নওজোয়ান। এক মায়াবিনীর যাদুতে ঐ অবস্থা ঘটেছিল ওর।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আগাগোড়া ব্যাপারটা বৃদ্ধকে খুলে বললাম আমি। শুনে মর্মাহত হলো সে। মেয়েটি বললো, ঐ শয়তানীটা এখনও তোমার বাড়িতে আস্তানা গেড়ে আছে। আবার দাঁও পেলেই তোমাকে যাদু করে অনেক তখলিফ্ দেবে। তুমি এক কাজ কর, এই মন্ত্রপূত পানির খানিক আমি তোমাকে দিচ্ছি। বাড়িতে গিয়ে ঐ মেয়েটাকে দেখামাত্র সে কিছু করার আগেই তার গায়ে ঐ পানিটুকু ছিটিয়ে দিয়ে বলবে, 'আল্লা এই শয়তানীকে তুমি একটা মাদী ঘোড়া বানিয়ে দাও।' দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সে একটা সফেদ মাদী ঘোড়া বনে গেছে। এর পর তোমার কাজ হবে প্রতিদিন ঐ ঘোড়ায় চেপে তুমি তাকে নৃশংস ভাবে চাবকাতে থাকবে। তোমার চাবুকে চাবুকে ওর গা থেকে দর দর করে ঝরতে থাকবে খুন। মুখে ফেনা উঠবে। তখন তাকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে আস্তাবলে আটকে রাখবে। এইভাবে একটানা অত্যাচার চালাতে থাকবে নিয়ম করে। যাতে ঐ শয়তানী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে সে কি করেছিল।

যুবকটি একবার খলিফার দিকে তাকিয়ে বললো, সেইদিন থেকে আমি ঐ মেয়েটির হুকুম তামিল করে চলেছি, ধর্মাবতার। জানি না, আপনি আমাকে কি সাজা দেবেন এসব শুনে।

খলিফা বললেন, বড় অদ্ভুত তোমার কাহিনী, বেটা। আমি এখন দেখছি, বেইমানকে শায়েস্তা করার জন্য মেয়েটি তোমাকে যা করতে বলেছে তার মধ্যে একটুও বাড়াবাড়ি নাই। ঠিকই করছো তুমি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আটশো ছেষট্টিতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

দুনিয়াজাদ বলে, এবার ঐ চীন-সম্রাটের জামাতা ভারত রাজপুত্রের কাহিনীটা শোনাও দিদি।

শাহরাজাদ বলে, হ্যাঁ এবার তো খলিফা তাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন:

রাজকুমার, তোমাকে দেখে আমার প্রত্যয় হয়েছে অতি সদ্বংশ জাত তুমি। আমার এই শহরে কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন যদি বল, আমি খুশি হয়ে শুনবো।

যুবরাজ যথাবিহিত কুর্ণিশাদি জানিয়ে অতি বিনয় সহকারে বলতে শুরু করে :

ধর্মাবতার আমি কোনও রাজদূত হয়ে আসিনি আপনার মুলুকে। অথবা কোনও কৌতূহল চরিতার্থের বাসনা নিয়েও আমার আগমন নয় এখানে। শুধু আর একবার আমার জন্মভূমিকে দুচোখ ভরে দেখার জন্যই আমি এসেছি আপনার শহরে। আমার কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। বুঝতে পারছি শোনার জন্য চিত্ত আপনার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঠিক আছে আমি আর বিলম্ব করবো না।

এই বাগদাদ শহরে আমার জন্ম। এক দরিদ্র কাঠুরিয়া পরিবারে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও আমার বিবি আর আমার গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারতাম না।

একে অভাবের তাড়না তার ওপর আমার দজ্জাল স্ত্রীর অষ্টপ্রহর লাঞ্ছনা গঞ্জনা জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বৌটার না ছিল রূপ, না ছিল এক ফোঁটা গুণ। কিন্তু যত রকম বজ্জাতি এবং শয়তানীতে সে ছিল মহা ওস্তাদ।

সারাদিন খেটেখুটে ঘরে ফিরে এসে যে একটু শান্তি পাবো তার জো ছিল না। প্রতি মুহূর্তেই সে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসতো।

প্রতিদিন বাড়ি ঢোকার সংগে সংগে সে আমাকে তল্লাশী করে দেখে নিত কাঠ বেচার সব পয়সা তাকে দিয়েছি না দু একটা আধলা কোথায় লুকিয়ে রেখেছি।

একদিন বৌকে ভয়ে ভয়ে বললাম, কিছু পয়সা দাও তো, একগাছা দড়ি কিনতে হবে?

পয়সার কথা শোনামাত্র ক্ষেপে গেল সে।

—পয়সা? দড়ি কেনার জন্য পয়সা? কেন দড়ি কি হবে, গলায় দিয়ে ঝুলবে নাকি? তোমার মতলব আমি বুঝি না বলতে চাও। যেই পয়সাটি হাতে পাবে অমনি তো বাপ্দাদের বেবুশ্যে মাগীদের পাড়ায় ছুটবে। তোমাকে চিনতে আমার বাকী আছে?

আমি বলি, আরে না না, ওসব ভাবছো কেন? একটা মোটা রসি কেনা দরকার। তা না হলে বড় গাছ কেটে নামানোর খুব অসুবিধে হচ্ছে। আর বড় গাছপাট করতে না পারলে পয়সা কড়িই বা রোজগার হবে কি করে?

আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকলো সে। তারপর বললো, তোমার চালাকী আমি বুঝি, ওসব ভড়কি দিয়ে আমার কাছ থেকে পয়সা বের

করতে পারবে না। তা বেশ তো বাজারে চল, আমি নিজে পছন্দ করে তোমার দড়ি কিনে দেব। কিন্তু উঁহু, তোমার হাতে একটি কানাকড়ি দেব না।

আমাকে প্রায় হিড় হিড় করে টানতে টানতে সে বাজারে নিয়ে গেল। আমি চেয়েছিলাম একটা মোটা রসি কিনতে। কিন্তু তার দাম একটু বেশি. সে বললো, অত পয়সা খরচ করতে পারবো না।

এই বলে সে আমার মতামত অগ্রাহ্য করে একগাছি সরু দড়ি কিনে বাড়ি ফিরে এল।

আমি বললাম, দড়িটা কিনলে বটে কিন্তু কোনই কাজে লাগবে না।

—কাজে লাগবে না? কেন কাজে লাগবে না?

—অত বড় ভারি গাছ-এর ভার কি টেনে রাখতে পারবে ঐ দুবলা দড়ি? ফালতু পয়সা নষ্ট করলে তুমি?

খাণ্ডারনি বৌটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, মেলা ব'কো না তো। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। চল আজ তোমার সঙ্গে যাবো আমি। দেখবো তোমার গাছ কত মোটা।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি যাবে পাহাড়ের জঙ্গলে?

—কেন? যাবো না কেন? তোমার আপত্তি কিসের? না, সেখানে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার ব্যবস্থা সব পাকা আছে, আমি গেলে সব ভেস্তে যাবে?

মেয়েছেলেটার কথার প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তি হলো না। বললাম, ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।

গাধার পিঠে চেপে বসলো সে। আমি পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম।

পাহাড়ের দুর্গম পথ, পুরুষমানুষই উঠতে নামতে হাঁপিয়ে যায়, কিন্তু আমার বিবি মরদের বাড়া, দিব্যি সে গটমট করে উঠে গেল পাহাড়ের মাথায়।

আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ এই মেয়েছেলেটার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার এই কাজের স্থলেও যদি সে এসে আমার কর্মসঙ্গিনী হয় তা হলে তো পাগল হয়ে যাবো।

পাহাড়ের মাথায় ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মাঝখানে একটি শুখো কুয়ো ছিল। আমার মাথায় বদ বুদ্ধি খেলে গেল একটা।

বৌকে বললাম, শোন বিবিজান, আসল কথাটা সত্যিই তোমাকে বলিনি। তা তুমি যখন নাছোড়বান্দা হয়ে সঙ্গেই এলে তখন আর লুকিয়ে রেখে ফয়দা ওঠাতে পারবো না।

বৌটা বিজ্ঞের হাসি হাসতে হাসতে বললো, হুঁ হুঁ বাবা, সে কি আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছো? চোখ দেখলে আমি পুরুষমানুষের বজ্জাতি ধরতে পারি।

আমি বললাম, আহা বজ্জাতির কথা বলছো কেন? এই কুয়োটার মধ্যে অনেক ধনরত্ন আছে, শুনেছি। সেই জন্যে একটা দড়ি কিনতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কুয়োটার তলা থেকে অনেক ধনরত্ন তুলে নিয়ে গিয়ে তোমাকে

হঠাৎ তাক লাগিয়ে দেব।

—আহা থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে ধনদৌলত তুলে নিয়ে গিয়ে তোমার পেয়ারের মাগীর ঘরে তুলতে। সে কি আর আমি বুঝি না? যাক, ওসব ছেঁদো কথা রাখ, তোমাকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। আমি নিজে নামবো এই কুয়ার নিচে। ধনরত্ন যা পাবো নিজে হাতে তুলে আনবো। তুমি আমাকে দড়িতে বেঁধে নিচে নামিয়ে দাও।

আমিও তাই চেয়েছিলাম। ওর কোমরে দড়ি বেঁধে কুয়ার নিচে নামিয়ে দড়িটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি করেছ এতকাল, এই তার সাজা। থাক এইখানে, আমি চললাম।

আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে। বনের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম কাঠ কাটতে।

দুটো দিন বেশ শান্তিতেই কাটলো।

কিন্তু মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগলো। তিন দিনের দিন সকালে বাজার থেকে আর একটা দড়ি কিনে নিয়ে পাহাড় জঙ্গলে গেলাম।

পুরো দুটো দিন মেয়েটা না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। এবার ওকে ওপরে তুলতে হবে। না হলে মরে যাবে নির্ঘাৎ।

কুয়ার ধারে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলতে থাকলাম, শোন ও ভাল মানুষের মেয়ে, আশা করি তোমার যোগ্য শিক্ষা হয়েছে। এর পর হয়তো আর আমার সঙ্গে ঐ রকম দুর্ব্যবহার করবে না।

কিন্তু নিচে থেকে কোন সাড়া এল না। ভয় হলো, তবে কি মেয়েটা মরে গেছে? দড়িটা নামিয়ে দিলাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম সে আঁকড়ে ধরেছে। প্রাণপণ শক্তিতে আমি টেনে তুলতে থাকলাম।

কিন্তু বিবির বদলে উঠে এল বিশালকায় এক আফ্রিদি দৈত্য। ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার দাখিল হলো, কিন্তু আফ্রিদি আমাকে অভয় দিয়ে বললো, ভয় করো না। আজ যে উপকার তুমি করলে আমার, জীবনে তা ভুলবো না কখনও। এক দৈত্যের শাপে আমি আকাশে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েছি। কিন্তু পায়ে হেঁটে বায়ু বেগে চলতে পারি। অনেক কাল আগে এক দৈত্য এই কূপে ফেলে দিয়ে গেছে আমাকে। সেই থেকে মুক্তির দিন গুণছিলাম। আজ তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। আমি অকৃতজ্ঞ নই, এর পুরস্কার তোমাকে দেব আমি।

দৈত্যের কথা শুনে খানিকটা ধাতস্থ হতে পারলাম আমি। সে বলতে থাকলো, হিন্দুস্তানের সুলতানের এক পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যা আছে। তার সঙ্গে আমি তোমার শাদী করিয়ে দেব।

আমি হাসলাম, বাগদাদের এক দরিদ্রতম কাঠুরে আমি। সে হবে হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাতা?

আফ্রিদি বললো, ভরসা রাখ, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। ফিকিরটা আমি বাতলে দিচ্ছি শোন।

আমি ভারত শাহজাদীর দেহে প্রবেশ করে তার মুখ দিয়ে এমন সব কথা-বার্তা বলাতে থাকবো যাতে তাকে পাগলী বলে মনে করবে সবাই। সুলতান কন্যার চিকিৎসার জন্য দেশ বিদেশের নানা হাকিম বদ্যিকে ডেকে আনবে। কিন্তু আসলে তো আর শাহজাদী পাগলী নয়, তাই তাদের দাওয়াই পত্রে কিছুই সুরাহা হবে না। তখন প্রাণ-প্রতিম কন্যার রোগমুক্তির জন্য সম্রাট যে-কোনও সর্তের ফরমান জারি করবেন। মেয়ের জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যও ছেড়ে দিতে কুণ্ঠা করবেন না। কিন্তু তাতেও কেউ তাকে রোগমুক্ত সুস্থ করে তুলতে পারবে না। সুলতান আবার ঘোষণা করবেন, যে তাঁর কন্যাকে সারিয়ে তুলতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব এবং শাহজাদীর সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবেন। এইবার তুমি সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে বলবে, আমি সারিয়ে দিতে পারি আপনার কন্যাকে।

আমি দৈত্যাকে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আমি কি করে সারাবো? আমি তো হকিমির কিছুই জানি না?

সে বললো, সে সব জানার কোনই দরকার নাই। শুধুমাত্র এক পাত্র পানি হাতে নিয়ে শাহজাদীর সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার ঐ পানি ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে মুখে যাহোক একটা কিছু আওড়াবে। ব্যস, বাজীমাত হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ শাহজাদীর অঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাবো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। রাজদরবারে, দেশে বিদেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে তোমার নামে। সুলতান তোমাকে জামাতা করে মসনদে তাঁর নিজের পাশে বসিয়ে রাখবেন।

আফ্রিদি বললো, আমি আজই হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাচ্ছি। তুমিও তৈরি হয়ে আজই বেরিয়ে পড়। আমার যেতে একদিনও লাগবে না। কিন্তু তোমার পৌঁছতে পুরো দুমাস সময় লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু আমার বিবি যে এই কুয়ার নিচে ছিল, তার কি হয়েছে?

আফ্রিদি বললে, তোবা তোবা ঐ নষ্ট খান্ডারনিটা তোমার বিবি ছিল। সে আমার ওপর জোর জুলুম আরম্ভ করেছিল। মানুষের মেয়ে যে এত কামুক হয় আমার জানা ছিল না, আমি তাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও সে আমাকে ছাড়তে চায় না। কিল চড় ঘুষি মেরে মেরে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলো সে। তাও আমি মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম। কিন্তু গত রাতে আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম সেই সময় সে আমার কোমরের ওপরে বসে পড়েছিল, তখন আর সহ্য করতে পারিনি, মেয়েছেলেটাকে এক হাতে ধরে আছাড় দিয়েছি। আর সে ওঠেনি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাজার হলেও শাদী করা বউ তো। আমার মনের অবস্থা আঁচ করে আফ্রিদি বললো, দুঃখ করো না। ভ্রষ্টা নারীর চেয়ে শূন্য ঘর অনেক ভাল। আমি তাকে মেরে ফেলার জন্য আছাড় দিইনি, কিন্তু কি করবো, আমার ছোট্ট আছাড়টাও সে সহ্য করতে পারেনি।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও ঘরে ফিরে এসে সেইদিনই হিন্দুস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

এর পরের ঘটনা যথারীতিই সংঘটিত হয়েছিল। শাহজাদীর ভুয়া ব্যাধি সারাতে আমার একদিনও সময় লাগেনি। সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ওয়াদা পূরণ করলেন। সেই থেকে আমি সুলতান-কন্যাকে শাদী করে হিন্দুস্তানের ভাবী উত্তরাধিকারী হয়েছি।

অনেক কাল দেশ ছাড়া। জন্মভূমিকে দেখার জন্য মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাই গতকাল আপনার শহরে এসেছি, জাঁহাপনা। এতকালের পিতৃপুরুষের ভিটেয় পা দিতে পেরে জীবন সার্থক হয়ে গেছে আমার।

যুবকের কাহিনী শেষ হলে খলিফা মসনদ ছেড়ে নেমে এসে নিজে হাতে ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন।

তারপর খলিফা দরবারের সমবেত আমির উজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল সন্ধ্যায় এক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধকে মুক্তহস্তে দান করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আজ সে-ও এখানে হাজির আছে. এবার তার জবানী থেকে কিছু শোনা যাক।

সেই বৃদ্ধ শেখ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো খলিফাকে।

—জাঁহাপনা, ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো।

খলিফা হাত তুলে বললেন, নির্ভয়ে বল।

বৃদ্ধ বললেন, আপনার অভয় রুমাল একখানা চাইছি. জাঁহাপনা।

খলিফা একখানা মোহরাঙ্কিত রেশমী রুমাল ছুঁড়ে দিলেন।

বৃদ্ধ বলতে শুরু করলো ঃ

ধর্মাবতার, আমাদের জাত ব্যবসা দড়ির। আমার বাবা তার বাবা বংশ-পরম্পরায় দড়ি বানিয়ে বিক্রি করে এসেছে, আমিও তাই করি। সারাদিন খেটে যা রোজগার হয় তাতেই আমাদের বেশ ভালভাবে চলে যায়। সংসারে আমি আর আমার বিবি এই দুটি মাত্র প্রাণী। প্রয়োজন সামান্যই। সেইটুকু রোজগার হলেই আমরা সন্তুষ্ট। তার বেশি আমাদের প্রয়োজন নাই। যদি বাড়তি কিছু পাই তা দানখয়রাত করে দুঃস্থজনের মধ্যে বিলিয়ে দিই। আল্লাহর এই নির্দেশ।

একদিন আমি আমার দোকানে বসে আছি, দেখলাম দুজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি এসে আমার দোকানের বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। হামেশাই অনেক মানুষ এসে সেখানে বসে কিছু সময় কাটিয়ে

যায়। খোলা মেলা জায়গা, মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যেও অনেকে আসে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো ঊনসত্তরতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

ওরা খুব দুজনে দুজনের জিগরী দোস্ত। আমারও বিশেষ পরিচিত। কাছে এসে সালাম সাবুদ জানালেন। আমিও তাদের সাদরে বসতে বললাম। একজনের নাম সাদ আর এক জনের নাম সাদী। সাদ সাদীকে বললেন, দেখ দোস্ত, আমার বিশ্বাস মানুষের দুটো হাত আছে। এক ধনী আর এক গরীব। ধনীরা বুদ্ধিমান, তারা বুদ্ধি খাটিয়ে ধন রোজগার এবং সংরক্ষণ করতে পারে। কিন্তু গরীবরা মূর্খ। তারা যেমন রোজগারও করতে পারে না তেমনি রোজগার করলেই তা যত্ন করে সঞ্চয় করতে পারে না। সেই কারণে বংশগতভাবে তারা নিরন্ন দরিদ্র। এবং সেইটাই তাদের ভাগ্য।

সাদী বলে, শোনও ভাই সাদ, তোমার কথার আমি প্রতিবাদ করতে চাই না, তা বলে তোমার অভিমত আমার অভিমত নয়। এ কথা সবাই জানে দারিদ্র্যের চেয়ে সচ্ছলতা ঢের ভাল। কিন্তু ধনীর অর্থগৃধ্নুতা খুবই জঘন্য। আমার অপর্যাপ্ত আছে। অথচ তার এককণা আমি আমার গরীব প্রতিবেশীদের দেব না, এ মহা অপরাধ। এই যে আমাদের এই দোস্ত হাসান এর কথাই ধর না? সারাদিন সৎপথে দড়ির কারবার করে পয়সা রোজগার করে। কিন্তু নিজের প্রয়োজন ছাড়া সে কিছুই যখের ধনের মতো জমিয়ে রাখে না। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই এই শিক্ষা নেওয়া উচিত। মোটকথা, আল্লাহ যাকে দয়া করে দেন তা কখনও ফুরায় না। তা না হলে শত চেষ্টা করেও তিল মাত্র সঞ্চয় করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই শোনাই জাঁহাপনা :

আমি সামান্য দড়ির কারবার করে সংসার চালাই। এমন কিছু রোজগার হয় না যা দিয়ে আমি বড়লোক হতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, সে সাধও আমার ছিল না কোনও কালে। সচ্ছলভাবে সংসার চলে যাবে এর চেয়ে বেশি কি আর দরকার হতে পারে মানুষের? তাই অর্থের প্রতি লোভ ছিল না আমার, আজও নাই। যদিও আল্লাহর দোয়ায় আজ আমি শহরের সেরা ধনী। সামান্য ছোবড়ার দড়ির কারবার করি, তাতে কিই বা রোজগার হতে পারে, ভাবছেন, কেমন করে আমি শহরের সব চেয়ে বিত্তবান হলাম।

তা হলে শুনুন জাঁহাপনা :

জীবনে সৎভাবে থেকেছি চিরটাকাল, কাউকে কখনও ঠকাইনি জ্ঞাতসারে। জীবনে অনেক অভাব অনটনের মধ্যে অনেক দিন কাটিয়েছি। কিন্তু তা নিয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করিনি কখনও। যা পেয়েছি তাই নিয়ে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। তাই বুঝি খোদাতালা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য অগাধ

অর্থ ঢেলে দিলেন আমার ঘরে।

একদিন সন্ধ্যায় দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরছি, চলতে চলতে রাতের অন্ধকারে কি যেন শক্ত মতো একটা বস্তু পায়ে ঠেকলো। হাতে তুলে দেখলাম একটা সীসার তৈরি জালের কাঠি। যদি কোনও জেলের কাজে লাগে এই ভেবে কোমরে গুঁজে ঘরে এলাম।

খানা-পিনা সেরে শুতে যাবার আগে সাজ-পোশাক ছাড়তে গিয়ে ঐ সীসার বস্তুটা ঠক করে মেঝেয় পড়ে গেল। এতক্ষণ এই তুচ্ছ কাঠিটার কথা স্মরণেই ছিল না। যাই হোক কুলুঙ্গীতে রেখে দিলাম ওটা।

রাত তখনও বেশ বাকী। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে অবাক হলাম। এই রাতে কে আবার কড়া নাড়ে। বিরক্ত হয়ে সদরে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার প্রতিবেশী এক জেলে।

—কী ব্যাপার, এই রাত দুপুরে তুমি?

জেলে বলে, শেখ সাহেব, বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। মাছ ধরতে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। জালখানা কাঁধে নিতে গিয়ে দেখি একটা কাঠি খোয়া গেছে। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক টুকরো সীসা পেলাম না। কিন্তু না পেলেও তো জাল ফেলতে পারবো না। ঘরে আমার অনেকগুলো বালবাচ্চা, আমি একমাত্র রোজগেরে মানুষ, একদিন জাল না ফেললে ওরা না খেয়ে থাকবে। তাই বাধ্য হয়েই এই নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। যদি মেহেরবানী করে একটু খুঁজে পেতে দেখেন, যদি এক টুকরো সীসে বা লোহা একটা কিছু ভারি বস্তু পাওয়া যায় তবে জালখানা জলে ফেলতে পারি—

আমি বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও।

কুলুঙ্গী থেকে জালের কাঠিখানা এনে তার হাতে দিয়ে বললাম, দেখ তো চলবে?

জেলে যেন হাতে চাঁদ পেল; চলবে মানে? এই তো আসল জিনিস। আচ্ছা শেখ সাহেব, বহুত শুক্রিয়া, এখন আমি চলি আর দেরি করবো না। আল্লাহর কাছে আমার নামে দোয়া মাঙগুন, আজ যেন আমার জালে ঢাই ওঠে। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি শেখ সাহেব, যে মাছই উঠুক, তার মধ্যে যে মাছটা সব চেয়ে স্বাদের সেইটেই আপনাকে নিবেদন করে যাবো। আপনার এ উপকার কি আমি জীবনে ভুলবো কোনও দিন।

আমি বললাম, আচ্ছা আচ্ছা সে সব পরে হবে। এখন ঘাটে যাও তো, মন দিয়ে মাছ ধর গিয়ে।

লোকটি বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে বিদায় নিল। আমি বিছানায় ফিরে এসে ভাবলাম, ওরা গরীব, কত সামান্য কারণে ওরা কি দারুণ খুশি হতে পারে। কত সহজে ওরা নিজেদের দরাজ দিল খুলে মেলে ধরতে পারে। একখণ্ড তুচ্ছ জালের কাঠি। সীসার তৈরি। এক আধলায় এক কুড়ি পাওয়া যায়। সেই বস্তু আমার কাছ থেকে পেয়ে সে কেমন কৃতার্থ হয়ে চলে গেল।

আবার বলে গেল, জালের সেরা মাছটা আমার বাড়িতে দিয়ে যাবে। আহা, গরীব মানুষ মাছটা বাজারে বেচলে দুটো দিরহাম পেতে পারবে কিন্তু এক কথায় সে এত বড় একটা খয়রাতির ওয়াদা করে গেল। ওর তো কিছুই নাই, তবু সে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা রেখে যায়। কিন্তু আমরা মুঠি ভরে পেয়েও তো কাউকে প্রাণে ধরে কণামাত্র দিতে কুণ্ঠাবোধ করি। সেই নিদ্রা নিশুতি অন্ধকার রাতে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আকুতি জানালাম, খোদা ওকে কী ধাতুতে গড়েছ তুমি—কত সুন্দর ওর হৃদয়খানা। আমাকেও যদি ঐ রকম করে বানাতে—

পরদিন সকালে জেলেটা এসে একটা বেশ লাগসই মাছ দিয়ে গেল। বলে গেল, টাইগ্রীসের সেরামাছ শেখ সাহেব। শুধু ভাজা খেয়ে দেখবেন, কি সোয়াদ?

আমি বলতে গেলাম, তা এত দামের মাছ দিতে গেলে কেন জেলের পো?

—কী যে বলেন, মালিক। আপনি দয়া না করলে আজ আমাদের উপবাসে থাকতে হতো। বিশ্বাস করেন, আজ যা মাছ উঠেছে, একদিন এত মাছ জীবনে আমি ধরতে পারিনি কোনও দিন।

জেলে চলে গেলে, বিবিকে ডেকে বললাম, সামান্য একটা জালের কাঠির দৌলতে কত বড় মাছ জুটে গেল, দেখ বিবিজান। কিন্তু সমস্যা হলো এত বড় মাছটা রাঁধবে কি করে।

বিবি বললো, টুকরা টুকরা করে না কাটলে তো কড়াইএ চাপানো যাবে না!

আমি বললাম, দাঁড়াও আমার ভোজালীখানা দিয়ে কেটেকুটে বানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

মাছটাকে প্রথমে দুখণ্ড করতে গিয়েই দেখতে পেলাম, ওর পেটের মধ্যে একটা রঙিন পাথরের নুড়ি। বেশ ঝকমক করছিল। ভাবলাম, সমুদ্রের মাছ এসে ঢুকেছে নদীতে। আর সামুদ্রিক মাছরা অনেক সময় নাকি খাদ্যভ্রমে পাথরের টুকরো গিলে ফেলে।

যাই হোক, পাথরটা দেখতে সুন্দর, ঘর সাজানোর কাজে লাগতে পারে ভেবে ধুয়ে ঘরের টেবিলে এনে রেখে দিলাম।

সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতেই বিবি উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসে আমাকে একটা আজব খবর শোনালো।

—হ্যাঁ গো, যে পাথরটা মাছের পেট থেকে পাওয়া গিয়েছে ওটা দিয়ে রোশনাই বেরুচ্ছে।

—কী রকম?

—তুমি তো টেবিলে রেখে গিয়েছিলে। দিনের আলো শেষ হতে আমি ঘরে ঢুকে দেখি আলোয় আলোয় ঘরখানা ভরে গেছে!

আমি ছুটে গেলাম শোবার ঘরে। সত্যিই তাই। পাথরটা থেকে আলোর ছুরি ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সেই আলোয় আলোময় হয়ে গেছে সারা ঘর।

আমার বিবির দৌলতে সারা পাড়ায় খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না।

দলে দলে কৌতূহলী প্রতিবেশীরা এসে সেই আশ্চর্য প্রদীপ প্রত্যক্ষ করে গেল।

পরদিন সকালে ইহুদী জহুরীর বিবি এল। শুনতে পেলাম আমার বিবির সঙ্গে সে ভাব জমাচ্ছে। একথা সে কথার পর সে আসল কথা পাড়লো, আমার বেটার বৌর ন' মাস চলছে। এই আমাদের ঘরে প্রথম নাতি আসবে। এক গণৎকার এসেছিল আমাদের বাড়িতে। সে একটা পাথরের মাদুলী দিয়ে গেছে। বলেছে ঐ রকম আর একটা পাথর দরকার। দুটো এক সঙ্গে কার-এ বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যতদিন না প্রসব হয়। তাহলে আর শয়তানের নজর লাগবে না। শুনলাম ভাই, তোমার বাড়িতে ঐ রকম একটা পাথর আছে। তা যদি কিছু দাম নিয়ে দাও তবে বৌটা ভূতের ভয় থেকে রক্ষা পায়। জিনিসটা কেমন একবার দেখাতে পার শেখের বিবি ?

আমার স্ত্রী ইহুদী ঘরণীকে সঙ্গে করে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। একটু পরে বাইরে এসে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই একটা রঙিন পাথর সে দিয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এটা তার জোড়া হতে পারবে। কী দাম নেবে বল ? আমি এখুনি নগদ কিনে নিয়ে যাবো।

আমার বিবি বলে, কী করে বলবো বল, কত দাম হবে। আমরা তো পয়সা দিয়ে কিনিনি। মাছের পেটে পেয়েছি। তুমিই বল, কী দাম দেবে ?

আমি স্বকর্ণে শুনলাম, ইহুদী বৃদ্ধা বললো, দশ দিনার দেব।

এক কথায় দশ দশটা সোনার মোহর ? ইহুদীর মেয়ে একটা আধলা দিরহাম প্রাণে ধরে খরচ করে না। সে কিনা ছেলের বৌ-এর গলায় তক্তি ঝোলাবার জন্য দশটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করবে ?

তখুনি আমি বিবিকে ডেকে বললাম, তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। যাক, আমি এখন দোকানে বেরুচ্ছি, ঐ বুড়ি তোমাকে যতই লোভ দেখাক আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও দামের বদলে ওটাকে হাতছাড়া করো না। মনে হচ্ছে পাথরটা অনেক দামী।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে দেখি ইহুদী বিবি আবার এসেছে। আমাকে দেখে সে বারবার সালাম সওগাত জানিয়ে বললো, শেখ সাহেব আপনার জন্যেই বসে আছি।

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, আমার জন্যে ? কেন, কী দরকার।

—ঐ পাথরটা যদি বিক্রি করেন, আমার বৌটার একটু উপকার হয়। বেচারী ভূতের ভয়ে রাতে ঘুমায় না।

—তা কত দাম দেবেন !

—একশো দিনার নিন, আমি সঙ্গে করে এনেছি।

আমি বললাম, না। ওটা সামুদ্রিক রত্ন, ওর অনেক দাম।

ইহুদী বিবি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, না, ওটা একটা রঙচঙে খেলনা পাথর মাত্র। নেহাত আমার বেটার বৌর জন্য দরকার তাই আপনাকে এত সাধাসাধি করতে এসেছি। আমার বৌটার মুখের দিকে চেয়ে মেহেরবানী করে ওটা আমাকে দিয়ে দিন, শেখ সাহেব।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, অবশ্যই দেব, তবে এক লাখ দিনারের কমে দেব না। আমি জানি ওর দাম দশলাখেরও বেশি।

বৃদ্ধা কেমন মিইয়ে গেল। আমি তো জহুরী নই, ওসব কারবার আমার স্বামী করে। তা হলে ওকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে, এখন আসি?

—হ্যাঁ আসুন। আর আপনার স্বামীকে বলবেন যদি কিনতেই হয় তবে যেন তিনি লক্ষমুদ্রা সঙ্গে করে আনেন।

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার স্বল্পক্ষণ পরেই ইহুদী জহুরীর আবির্ভাব ঘটলো। লোকটা একেবারে বিনয়ের অবতার। কথায় কথায় আব্রাহাম জ্যাকবের নাম উচ্চারণ করে দুহাত কপালে ঠেকায়।

সেও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, আসল রত্ন আর নকল কাঁচের মধ্যে দৃশ্যত বিশেষ কোনও ফারাক বোঝা যায় না। আমরা বেশির ভাগ সময়ই নকল কাঁচকে আসল রত্ন বলে ভ্রম করি। তা অত মূল্যবান বস্তু কি পথেঘাটে গড়াগড়ি যায়? ওটা ঝুটামাল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

লোকটার কথা শুনে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আমার শোবার ঘরে গিয়ে পাথরটা নিয়ে এলাম। দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে পাথরটাকে ইহুদীর সামনে টেবিলের ওপর রাখতে লোকটার লোভাতুর চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। আলোর বিচ্ছুরণে সারা ঘর আলোকিত হয়ে গেছে তৎক্ষণে। ইহুদীর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, ওরে বাবা, এ যে সাতরাজার ধন। এত বড় বৈদুর্যমণি সারা দুনিয়ায় নাই।

—কী বললেন? সারা দুনিয়ায় এর জুড়ি নাই।

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে সে কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে, না, মানে, না—বৈদুর্যমণির মতোই দেখতে। আসলে ঝুটা মাল—

আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। পাথরখানা কামিজের পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালাম, ঝুটা মাল বেচে আপনাকে ঠকাতে চাই না। আপনি আসুন—

আমার আচরণে ইহুদীটা কাঁচুমাচু মুখ করে বলতে থাকে, আহা রাগ করছেন কেন, শেখ সাহেব। আমি তো সে কথা বলিনি, বাজারে আজকাল ঝুটা মালের আমদানী বেশি; দাম কম বলে তার কদরও বেশি। আসল চীজ আর কজনে উচিত মূল্য দিয়ে কিনতে চায় বলুন? তাই বলছিলাম, যদি একটু বিবেচনা করেন—

—বেশি বিবেচনা করে বললে তো দশ লাখ দিনার বলতে হয়। কিন্তু তা তো চাইনি। আমার দাবি এক লাখ। একবার যখন মুখ থেকে জবান বের করেছি তার নড়চড় হবে না। তবে এই মুহূর্তে এখুনি যদি আপনি সওদা শেষ না করে চলে যান, পরে ফিরে এলে কিন্তু এ দাম থাকবে না। তখন দশ কেন বিশ লাখও চাইতে পারি।

ইহুদী নিরুপায় হয়ে বলে, না না, আমি এখুনি সওদা শেষ করে নিয়ে যেতে চাই। এই ঘরের ভিতরে নিয়ে আয় বস্তাটা।

বাইরে ইহুদীর নফর গাধার পিঠে একটা বস্তা চাপিয়ে অপেক্ষা করছিল। মনিবের সাড়া পেয়ে সে বস্তাটা ভিতরে এনে ঘরের মেঝেয় ঢেলে দিল। সোনার মোহরে ভরে গেল ঘর। উফ্ এত সোনা জীবনে দেখিনি কখনও।

সেইদিনই রাতারাতি আমি বড় লোক হয়ে গেলাম। ওকে আপনি আল্লাহর দান ছাড়া আর কী বলতে পারেন, ধর্মাবতার। সারা জীবন ধরে সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এত অর্থ তো মানুষে রোজগার করতে পারে না। সেই কারণে আমার বিশ্বাস একমাত্র দেনেওলা তিনিই। এবং আমরা যারা তার করুণায় বিত্তবান হয়ে অহঙ্কারের অহমিকায় ধরাকে সরাজ্ঞান করি তারা সকলেই মূর্খ। একথা ভুলেও ভাবি না। আমার বাক্সে যে ধন-দৌলত ভরা আছে তার আসল মালিক তিনিই। আমি শুধু রক্ষক মাত্র।

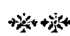
তাই প্রতিদিন নিয়ম করে আল্লার দান আমি তারই সৃষ্ট দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করি। এতে আমার নিজের কোনও গৌরব নাই। তাঁর জিনিস তাঁরই ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করি।

খলিফা বললেন, এতক্ষণে বুঝলাম তোমার ঐ মুক্তহস্তে দানের আসল কারণ। খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। সব কাহিনী আমি মন দিয়ে শুনেছি। তোমার ধর্মমতি দেখে খুব আনন্দ হলো আজ। চিরকাল যেন এইভাবে আল্লাহর বান্দা মনে করতে পার, নিজেকে সেই প্রার্থনা জানাই।

তারপর খলিফা বললেন, ঐ ইহুদী তোমার কাছ থেকে পাথরখানা লক্ষ মুদ্রায় কিনে সেইদিনই আমার কাছে দশলক্ষে বিক্রি করেছে। এখনও আমার কোষাগারে রাখা আছে ওটা।

খলিফা এবার খঞ্জ মাদ্রাসা শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, মৌলভী সাহেব এবার তোমার পালা। শোনাও তোমার কাহিনী।

লোকটি কুর্ণিশ জানিয়ে বলতে শুরু করে ঃ

ধর্মাবতার, আমি ছিলাম এক দরিদ্র মাদ্রাসা-মৌলভী। চব্বিশটি ছাত্রকে নিয়ে চালাতাম আমার বিদ্যালয়টি। এই ছেলেদের নিয়েই আমার কাহিনী।

শিক্ষক হিসাবে আমি ভীষণ কড়া মানুষ ছিলাম। ছেলেরা আমাকে দেখে ভয়ে কাঁপতো। সারাদিনের মধ্যে এক দণ্ডও বিশ্রাম দিতাম না তাদের। সেই সকালে আসতো তারা। আর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে যেত। তার মধ্যে ছুটি বলে কিছু থাকতো না।

একদিন সবে আমি মাদ্রাসায় এসে ছাত্রদের নিয়ে পাঠ শেখাতে বসেছি, এমন

সময় একটি ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললো, মৌলভী সাহেব, আপনার মুখখানা কেমন হলুদবর্ণ হয়ে গেছে কেন ?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিই, আর ডেঁপোমি করতে হবে না। চুপ করে বসো।

ছেলেটি মাথা হেঁট করে বসে পড়লো কিন্তু আমার সহকারী এক শিক্ষক এগিয়ে এসেও ঐ একই কথা বললো, সত্যিই মৌলভীজী, আপনার সারা মুখে কে যেন হলুদ বেটে লাগিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে আপনার কোনও অসুখ হয়েছে। আপনি ঘরে চলে যান, আজ আমিই আপনার ছাত্রদের পাঠ শিখিয়ে দেব।

এরপর প্রতিটি ছাত্রই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন আঁৎকে উঠতে লাগল তা দেখে সত্যি সত্যিই আমি ঘাবড়ে গিয়ে অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

মনে ভয় ধরে গেল, তবে কি আমার ন্যাবা হয়েছে ? দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এলাম। বিবিকে বললাম, আমার জন্য একটু শরবত বানাও তো। তবিয়তটা ভাল ঠেকছে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বাহাত্তরতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটু পরে আমার সহকারী শিক্ষক এল। চব্বিশটা দিরহাম তুলে দিল আমার হাতে, আপনার ছাত্ররা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে। আপনার ভাল পথ্যের যাতে ব্যবস্থা করা হয় তা দেখতে বলেছে আমাকে।

আমি ওদের এই সহৃদয় বদান্যতায় বড় স্পর্শকাতর হয়ে উঠলাম। আহা, ওরা কত ভাল, আর ঐ দুধের বাচ্চাগুলোর ওপর কি নির্দয় অত্যাচারই না করি আমি। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে গেল।

—কাল ওদের সারাদিন ছুটি দিয়ে দিও। আচ্ছা একটা দিন ওরা ছুটি পায় না, এক দম খেলাধুলোর সময় পায় না।

পরদিন সকালে আমার সহকারীটি আবার এল আমার বাসায়।

—একি আজ যে আপনি আরও বেশি হলুদ বর্ণ হয়ে গেছেন ? না না, একদম নড়া চড়া করবেন না। একটানা বিশ্রাম করুন। ছাত্রদের নিয়ে কোনও দুর্ভাবনা করবেন না, সে আমি সামলাবো।

ওর কথা শুনে আমি আরও কাহিল হয়ে পড়ি। আমি নিজে এখনও তেমন কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু রোগের প্রকাশ যখন হয়েছে তখন ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা করে দেবে সে। আমি বললাম, ছেলেদের পড়াশুনাটা একটু দেখো। মনে করো আমি মাদ্রাসার কুর্শিতেই বসে সবাইকে লক্ষ্য করছি।

এইভাবে একটা সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আমার সহকারী নিত্য এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। সপ্তাহান্তে আবার সে চব্বিশটা দিরহাম দিয়ে গেল

আমার হাতে। আমার ছাত্ররা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে। খুশিতে মন ভরে উঠলো। আহা, ওরা কত ভাল।

দিন কাটে। কিন্তু নিজেকে একটুও অসুস্থ মনে হয় না আমার। ভাবলাম এইভাবে আর রুগীর মতো বিছানায় পড়ে থাকবো না। ঘরে বসে ঐ সব ভাল ভাল খানা-পিনা কি আর রোজ রোজ মুখে রুচে। সত্যি কথা বলতে কি অত সব ভালমন্দ খাবার-দাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার কোনও কালে নাই। তাই, প্রথম প্রথম দু-একদিন চোর্ব্য চোষ্য করে খেলেও পরে আর আদৌ ভাল লাগলো না।

কিন্তু ছাত্ররা আমার কথায় কর্ণপাত করলো না। তাদের ধারণা আমি ওঠা হাঁটা করলেই মরে যাবো।

এরও কয়েকদিন পরে একদিন সকালে আমার তাবৎ ছাত্ররা দেখতে এল আমাকে। আমি সবে ঘুম থেকে উঠেছি তখন। ছেলেরা আমার মুখের দিকে কতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে। তারপর একজন বললো, একি চেহারা হয়েছে আপনার? মুখখানা কেমন ফোলা ফোলা লাগছে। শুনলাম আপনি নাকি চোয়াল নাড়াচাড়া করতে পারছেন না?

এই সময় আমার বিবি দুটো সিদ্ধ ডিম আর কয়েক টুকরো রুটি রেখে গেল সামনে। আমার নিত্যকার প্রাতরাশ। আমি বাধা দিয়ে বললাম, কারা এসব গুজব রটায়? কে বললে আমি চোয়াল নাড়তে পারি না?

এই বলে ওদের সামনে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে দু দুটো ডিম একই সঙ্গে মুখে পুরে ফেললাম। কিন্তু সদ্য সিদ্ধকরা খোসা ছাড়ানো প্রচণ্ড গরম ডিমের ভাপ মুখের অভ্যন্তরের নরম মাংসল মণ্ডল সইতে পারবে কেন? মনে হলো সারা মুখের ভেতরটা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। কিন্তু তখন সেই অবস্থায় ছেলেদের সামনে মুখ থেকে ডিম দুটোকে আবার বের করে ফেলি কিরূপে। তাতে যে সপ্রমাণ হয়ে যাবে, তারা যা শুনেছে তা তাহলে সত্যিই।

কিন্তু দু দুটো আস্ত ডিম এক সঙ্গে মুখে পুরে এগাল ওগাল করা সম্ভব কী? আর জাবর কাটতে না পারলে গিলবোই বা কি করে। তাই সদ্যসিদ্ধ ধোঁয়াওঠা ডিমজোড়া অনড় অচল হয়েই রয়ে গেল আমার মুখগহ্বরে।

এরপর যা অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটতে পারে তাই ঘটেছিল। গরম ডিমের স্যাঁকা লেগে দু গালের নরম মাংস পুড়ে ঘা হয়ে গেল। এবং সে ঘা আর শত চেষ্টা করেও সারাতে পারলাম না। তারই পরিণতি আজ এই রকম হয়েছে। দু পাশের চোয়াল পচে পচে খসে খসে পড়ছে এখন। বিশ্রী দুর্গন্ধে কোনও মানুষ আমার কাছে ভিড়তে পারে না।

মুখের ঘা নিয়েও আমি কিছুদিন মাদ্রাসা চালিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকদিন শাসন না করার ফলে ছেলেগুলো বড় বেয়াড়া হয়ে পড়েছিল। আগে যেমন আমাকে জুজুর মতো ডরাতো তখন কিন্তু আর তেমনটা করতো না।

যাই হোক, কোনও রকমে দিন কাটছিল, কিন্তু নসীবে যা লেখা আছে তা খণ্ডন করবে কে? গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো। একে দুগালের

দুরারোগ্য ক্ষত তারপর একখানা পা খোঁড়া হয়ে গেল।

একদিন দুপুরে প্রচণ্ড দাবদাহে দুনিয়া জ্বলছে। ছেলেরা বললো, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পানি খাব।

মাদ্রাসায় যেটুকু পানি ছিল খতম হয়ে গেছে অনেক আগেই। বড় মায়া হলো, আহা এইটুকু কচি কচি বাচ্চারা পানি পান করতে না পেয়ে কষ্ট পাবে? ওদের বললাম, ওপাশে গাছতলায় একটা কুয়া আছে কিন্তু পানি তোলার পাত্র তো কিছু নাই এখানে। ঠিক আছে, তোমরা সবাই আমার সংগে চল, দেখা যাক কি করে ওঠানো যায় কুয়ার পানি।

আমার দারুণ বুদ্ধি ছিল। ছেলেদের বললাম, তোদের সব টুপিগুলো খুলে আমাকে দে।

আমার নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ওদের বললাম, তোদের টুপিগুলো নিয়ে এই পাগড়ীর একপ্রান্ত ধরে আমি কুয়ার নিচে নেমে যাবো। তারপর টুপিগুলো ভরে পানি নিয়ে আসবো। কিন্তু সাবধানে নামিয়ে দিবি, আবার টেনে তুলবি আমাকে।

যথারীতি ওরা আমাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিচ্ছিল নিচে। আর খানিকটা নামালেই পানি স্পর্শ করতে পারতাম। কিন্তু তা আর হলো না। কুয়ার নিচে থেকে বুঝতে পারলাম, ওপরে কিসের যেন সোরগোল পড়েছে। ঘোড়া কিংবা গাধা কিছু একটা তাড়া করেছিল ছেলেদের। এবং সেই ভয়ে তারা হাতের পাগড়ী ছেড়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেছে। আর আমি পড়ে গেছি তলায়।

কুয়াতে বেশি গভীর পানি ছিল না। সে দিক থেকে ডুবে যাওয়ার আশংকা ছিল না। কিন্তু আচমকা আছাড় খাওয়ায় এই পা-টায় বিষম চোট পেলাম। তখন অবশ্য অতটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে মালুম হলো। প্রচণ্ড ব্যথা হলো, পা-খানা ফুলে ঢোল হয়ে গেল। পরে ফোলাটা কমলেও ব্যথাটা চির সংগী হয়ে থেকে গেল আমার কাছে।

তারপর থেকে লাঠি ভিন্ন চলাফেরা করতে পারি না, জাঁহাপনা।

মাসরুর লোকটিকে ধরে বসতে সাহায্য করলো।

এরপর উঠে দাঁড়ালো সেই অন্ধ ভিখিরি।

যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে সে বলতে শুরু করলো।

যৌবনে আমি এক তুখোড় উট চালক ছিলাম। আমার নিজের গুণেই আমি একটা থেকে পরপর আশীটা উটের মালিক হতে পেরেছিলাম। এই সব উট-

গুলো আমি ভাড়া খাটিয়ে রোজগার করতাম। লাভের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে উট কিনতাম। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই আমার সমব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ধনী বলে পরিচিত হলাম।

একবার বাগদাদ থেকে এক ব্যবসায়ীর মাল নিয়ে বসরাহয় গিয়েছিলাম। যথাসময়ে মালপত্তর খালাস করে দিয়ে দেশে রওনা হলাম।

চলতে চলতে বেলা বেড়ে গেল। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড খর তাপে দুনিয়া দগ্ধ হচ্ছে। মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় দুপুরের খানা-পিনা সারবো বলে উটগুলোকে শোয়ালাম।

এই সময় এক দরবেশ এল সেখানে। আলখাল্লা পরনে, আজানু-লম্বিত শুভ্র দাড়ি, সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় আল্লাহর পায়ে সর্বস্ব নিবেদন করে মুক্তপুরুষ হয়েছেন তিনি।

সাদর অভ্যর্থনা করে বসালাম তাঁকে। এক সঙ্গে বসে খানা-পিনা করলাম। তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন, আমিও করলাম।

বেলা পড়ে এল। রোদের ঝলক অনেকটা হালকা হয়ে আসছিল। দরবেশ বললেন বাবা আবদাল্লাহ, তুমি সংসারী মানুষ আর আমি ফকির। তুমি শুধু অর্থের ধান্দাতেই দেশ বিদেশ চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই, তবে অর্থের নয়, পরমার্থের সন্ধানে।

কথাটার মর্ম বুঝতে পারলাম না, আপনার হয়তো অপ্রতুল অর্থ সঞ্চিত আছে, তাই আর তার পিছনে ছুটতে হয় না। কিন্তু আমি তো এখন সে অর্থ সঞ্চয় করতে পারিনি, ফকির সাহেব। তাই আমাকে তারই জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়।

দরবেশ বললেন, টাকা চাও তুমি? কত টাকা? কত টাকা পেলে তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটবে, বাবা আবদাল্লাহ?

আমি বললাম, ফকির সাহেব সংসারে বাঁচতে গেলে বেশ কিছু অর্থ চাই।

—তার পরিমাণ কত? কত পেলে তুমি খুশি হবে? দুশো—পাঁচশো—হাজার কোটি মোহর?

আমি ঢোক গিলে বলি, অত টাকার কি দরকার? লাখপতি হলেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো।

দরবেশ বললেন, তা হলে এখুনি আর তোমার বাগদাদ রওনা হওয়া হলো না বাবা আবদাল্লাহ, আমার সঙ্গে এস তুমি। আমি তোমাকে এক গুপ্ত ধনাগারে নিয়ে যাবো। সেখান থেকে তোমার প্রয়োজন মত ধনরত্ন বোঝাই করে নিও তোমার উটের পিঠে। তারপর তুমি চলে যেও তোমার দেশে, আমি চলে যাবো বসরাহয়।

দরবেশের কথায় লুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমার আশীটা উটকে তাড়িয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকলাম।

অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর এক পর্বত পথের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা। দরবেশ বললেন, এই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এই যে দেখছো, এই পথ

দিয়ে তুমি আর আমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবো, কিন্তু তোমার উটগুলো যেতে পারবে না। সুতরাং ওদের ওখানেই এই পাহাড়ের পাদদেশে শুইয়ে রেখে চল।

তাঁর কথামতো একটা সাফ জায়গা দেখে উটগুলোকে শুইয়ে দিলাম। দরবেশ বললেন, শুধু হাতে গিয়ে কি ফয়দা হবে। ধনরত্ন আনবে কিসে, বস্তাটস্তা কিছু সঙ্গে নাও।

আমি একখানা বস্তা হাতে করলাম। দরবেশ হাসলেন, ব্যস একখানাতেই সন্তুষ্ট হবে?

আমি বললাম, এই একটা বস্তাতেই লাখ টাকার সোনাদানা আঁটতে পারে। আর বেশি কি দরকার, ফকির সাহেব?

দরবেশ বললেন, পাগল ছেলে, বার বার তো আর এখানে আসা হবে না, আজই যতটা পার নিয়ে নিতে হবে। তুমি এক কাজ কর, তোমার প্রত্যেকটা উটের পিঠের জন্য একটা করে বস্তা নাও।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আশী বস্তা ধনদৌলত পাওয়া যাবে সেখানে?

দরবেশ হাসলেন, যাবে। তারও বেশি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অত নেবার অনেক অসুবিধে, তুমি আশীখানাই নাও। যা উদ্ধার করে আনা হবে তার অর্ধেক তুমি নেবে আর বাকী অর্ধেক আমি নেব, কী, রাজী?

আমি বললাম, অত ধনে আমার কাজ কী? তবে আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

পার্বত্য সরু পথ পেরিয়ে ওপারে চলে গেলাম আমরা।

আর একটা পাহাড়। খাড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। কোথাও পা রাখার জায়গা নাই। উপরে ওঠার জো কী? সেই মুহূর্তে আমি ভেবে পেলাম না এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পাদদেশে এসে কি লাভ হলো?

দরবেশ তাঁর ধূপদানীতে এক মুঠো সুগন্ধি দ্রব্য ছিটিয়ে দিতেই গল গল করে ধূম্রকুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে থাকলো। একটুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল সামনেটা। পাহাড়টা আর নজর করতে পারলাম না তখন।

একটু পরে ধোঁয়া কেটে গেলে দেখলাম, পাহাড়ের নিচে একটা গুহামুখ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দরবেশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

আমার দুচোখ ধাঁধিয়ে গেল। বিশাল বিস্তৃত এক ময়দান ক্ষেত্র। যে দিকে তাকাই রাশি রাশি মোহর, তাল তাল সোনা রুপা স্তূপাকার হয়ে আছে চারদিকে।

আমি দিশাহারা হয়ে একটা বস্তায় সোনার মোহর ভরতে লেগে গেলাম। দরবেশ আমাকে বাধা দিলেন, ওসব তুচ্ছ সোনার মোহর ভরে বস্তাগুলো শেষ করে কী লাভ। এমন বস্তু ভরে নাও, যা ওজনে হালকা অথচ মূল্যে সহস্রগুণ হতে পারে। এদিকে দেখ, কত মূল্যবান মণিরত্ন। এর এক এক টুকরো লক্ষ লক্ষ মোহরের সমান। এগুলো না ভরে তুমি আহম্মকের মতো ঐ সোনার

মোহরগুলো বস্তা বন্দী করতে লেগেছ।

আমি লজ্জিত হলাম, তাইতো, যেখানে অফুরান নেবার মতো সেখানে বাছাই করে সেরাগুলো নেওয়াই সংগত।

এক এক করে আশীটা বস্তায় হীরে জহরত মণিমুক্তায় বোঝাই করে উটের পিঠে এনে চাপালাম। রত্নগুহা ত্যাগ করার আগে লক্ষ্য করলাম দরবেশজী একটি সোনার জালার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটি সোনার কৌটো বের করে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। আমার কৌতূহল হলো, চারদিকে এত রত্ন সম্ভার, কিন্তু কোনও কিছু তিনি স্পর্শ করে দেখলেন না। শুধু এই ছোট্ট কৌটায় তাঁর কি দরকার পড়লো? জিজ্ঞেস করলাম, কী আছে ওতে দরবেশজী।

দরবেশ হাসলেন, ও কিছু না। খানিকটা মলম আছে ওতে।

মনেব খটকা গেল না। যাই হোক আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হলো না। উটের দল নিয়ে আবার আমরা সেই মাঠের মাঝে গাছতলায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে পথটা একদিকে বসরাহ অপরদিকে বাগদাদ চলে গেছে। আমি যাবো বাগদাদে আর তিনি বসরাহর যাত্রী।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো পঁচাত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

ফকির সাহেব বললেন, এবার তাহলে, বাবা আবদাল্লাহ আমার ভাগেরটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি বসরাহয় চলে যাই।

আমার তখন মনের অবস্থা অন্যরূপ। বললাম, দেখুন দরবেশজী, আপনি ফকির মানুষ, এত ধনরত্ন নিয়ে আপনার কি কাজে লাগবে।

—তুমি সত্য কথাই বলেছ, তুমি সংসারী লোক, ধনরত্ন তোমার প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। তুমি যা নিয়ে যাবে, তা তোমার এবং তোমার আত্মীয়-পরিজনদের ভোগে লাগবে। কিন্তু আমি ফকির, আমার নিজের জন্য কোনও অর্থের প্রয়োজন নাই। তবে যারা দুস্থ অসহায় তাদের মুখে আহার্য যোগানোই আমার ব্রত। তুমি যা দেবে তা আমি আল্লাহর দরিদ্র ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করবো। তুমি শুধু তোমার পরিবারের প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটার জন্য ধনরত্ন সংগ্রহ কর। আর আমি করি খোদাতালার বিরাট দুঃস্থ পরিবারের অন্ন যোগাবার জন্য।

এতেও কিন্তু আমি ওঁকে ওয়াদা মতো ওঁর প্রাপ্য অংশ দিতে কুণ্ঠিত হলাম। তিনি আমার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, ঠিক আছে, আধাআধি যদি দিতে প্রাণ না চায় তবে যতটা দিতে চাও তাই দাও।

আমি বললাম, আপনি কুড়িটা বস্তা নিন। বাকি ষাটটা আমি নেব।

দরবেশ হাসলেন, বেশ তাই হোক, তবে আমার তো বইবার উট নাই।

কুড়িটা বস্তা দিলে কুড়িটা উটও দিতে হবে তোমাকে।

আমি প্রসন্ন চিত্তে না হলেও রাজী হলাম।

দরবেশ কুড়িটা উট নিয়ে রওনা হয়ে গেল, আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, শুধু শুধু অতগুলো ধনরত্ন হাত ছাড়া হয়ে গেল।

ছুটে গেলাম দরবেশের সামনে। বললাম, দেখুন ফকির সাহেব, এই কুড়িটা উট বাগে আনা আপনার মতো পীরের কাজ নয়। এরা আমাকে না দেখে বেগড়বাই করে আপনাকে অনেক নাজেহাল করবে। আপনি বরং সংখ্যাটা কমিয়ে দশ করুন।

দরবেশ হেসে বললেন, বুঝেছি, প্রাণে ধরে দিতে পারছো না এতটা। ঠিক আছে তাই কর, দশটা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

দশটা উট আমাকে দিয়ে বাকী দশটা নিয়ে তিনি রওনা হলেন। কিন্তু তাতেও আমার চিত্ত প্রসন্ন হলো না। মনে হলো ঐ ফকির কোনও পরিশ্রমই করেনি। যা কিছু খাটুনি আমিই খেটেছি। তাছাড়া এই দুর্গম পথে উটের বাহন না থাকলে এ বোঝা কে বয়ে নিতে পারতো।

আবার আমি ছুটে গিয়ে দরবেশকে ধরলাম।

—দরবেশজী আপনি তো ইচ্ছে করলেই তামাম দুনিয়ার ধনভাণ্ডার উজাড় করে আনতে পারবেন। কিন্তু আমি তো আর এ সুযোগ পাবো না কোনওদিন।

—তুমি কি বলতে চাও ?

আপনি সবটাই আমাকে দিয়ে দিন। আপনার দরকার হলে আর একবার গিয়ে নিয়ে আসবেন সেখান থেকে।

দরবেশ বললেন, তুমি যদি এতেই সন্তুষ্ট হও, তাই হোক। এ দশটাও নিয়ে যাও। কী, খুশি তো ?

আমি তখনও লোভীর মতো দরবেশের হাতের সোনার রেকাবীটার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বোধহয় আমার মনের অভিপ্রায় উপলব্ধি করলেন। থালাখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও।

আমি এতই হীনমনা যে একবারও বলতে পারলাম না, না থাক, ওটা আপনার খাবার থালা, ওটা রাখুন আপনি। নির্লজ্জের মতো হাত পেতে নিলাম।

দরবেশের মুখে মিষ্টি মধুর হাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এবার তো সব পেয়েছ ? তা হলে খুশি মনে ঘরে ফিরে যাও ?

আমার চোখ তখন দরবেশের বুকের ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। মুখ ফুটে বলেই ফেললাম, আপনার বুকের মধ্যে ঐ ছোট্ট কৌটাটা আমাকে দেবেন ?

তৎক্ষণাৎ তিনি কৌটাটা বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আর তো কিছু নাই আমার কাছে, কী বল ?

আমি বললাম, এই কৌটোয় এক প্রকার মলম আছে বলেছেন। নিশ্চয়ই সে বস্তু মহা মূল্যবান। কী কাজে লাগে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয়

একবার বলে দিন।

এতক্ষণ আমি বিনয়ের মুখোশ এঁটে ওঁর সঙ্গে গদগদ হয়ে কথা বলছিলাম। কৌটোটা হাতে পাওয়ার পর কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার গলার স্বরটা ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠলো।

দরবেশ বললেন, অবশ্যই বলে দিচ্ছি। তা না হলে এই কৌটোটা নিয়ে তুমি করবে কী? এর ভেতরে কিছুটা মলম আছে। একটুখানি আঙ্গুলে নিয়ে বাঁ চোখে সুর্মা কাজলের মতো করে লাগাবে তাহলেই বিশ্বের যত গুপ্ত ধনের দেখা পেয়ে যাবে তুমি। তবে সাবধান ভুলেও কখনও ডান চোখে লাগাবে না—তা হলে দুচোখই অন্ধ হয়ে যাবে।

আপনার কথা শুনে আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না, মেহেরবানী করে আমার চোখে লাগিয়ে দিন একটু।

দরবেশ আমার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে ঢাকনা খুলে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে করে খানিকটা মলম তুলে নিয়ে আমার বাঁ চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, ডান চোখটা বন্ধ কর।

ডান চোখ বন্ধ করতেই আমি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। দুনিয়ার পাহাড় পর্বত সমুদ্রতল এবং মাটির তলায় যেখানে যত ধনরত্ন আছে এক এক করে সব ছবি ভেসে উঠতে লাগলো আমার চোখের সামনে। সে সব দেখে আমি আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। দুনিয়াতে এত ধনদৌলত থাকতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

আমি ভাবলাম, একটা চোখে লাগাতেই যদি এই গুপ্তধনের হদিশ মেলে তবে দু চোখে লাগালে না জানি কি হবে।

আমার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই এই দরবেশ আমাকে পুরো সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। বেশ রুষ্ট ভাবেই বললাম, আপনি আমার সঙ্গে চালাকী করছেন। ডান চোখে লাগালে আমি দুনিয়ার তামাম ধনরত্নের মালিক হতে পারবো।

দরবেশ শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ অমন কাজটি করো না। তা হলে জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যাবে তুমি।

—মিথ্যে কথা। আপনি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন। আমি আরও বেশি ধনদৌলতের মালিক হই তা আপনি চান না।

দরবেশ আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার ভালর জন্যই আমি বলছি, এ মলমটা ভুলেও ডান চোখে লাগাবে না। তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সেই সর্বনাশই আমার হলো। দরবেশের সে কথা আমি না শুনে তাকেই বাধ্য করালাম আমার ডান চোখে মলমটা লাগিয়ে দিতে।

আপনি আমার কথা যদি না শোনেন আপনার ভাল হবে না ফকির সাহেব। আপনি যত পুণ্যবান পীরই হোন, দেহ-বলে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী বলবান। সোজা কথায় যদি কাজ না হয় আমি আপনার ওপর জুলুম করবো।

এখনও বলছি ভালয় ভালয় লাগিয়ে দিন আমার ডান চোখে।

দরবেশ আর একটি কথাও বললেন না, আমার হুকুম মতো আমার ডান চোখে ঐ মলমের কাজল পরিয়ে দিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার দু'চোখে ঝাপসা, এবং একটু পরে ঘন অন্ধকার নেমে এল। আমি আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। কিন্তু দরবেশ আর কোনও সাড়া দিলেন না। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলাম, কিন্তু কোনও ফল হলো না। শুধু বুঝতে পারলাম, আমার উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আমি অসহায়ভাবে পড়ে রইলাম সেখানে। তারপর একদিন বাগদাদের এক সওদাগরের করুণায় দেশে ফিরে আসতে পারলাম। সেই থেকে আমি ভিক্ষে করে খাই। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনও গতি নাই। তাই রোজ সকালে গিয়ে বসি ঐ পুলের ওপর। হাত পেতে বসে থাকি, যদি কোনও মহান দাতা দু একটা দিরহাম দান করেন। যারা আমাকে কিছু দেন আমি তাদের সবাইকে অনুরোধ জানাই তারা যেন আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে যান। আসলে দয়ার বদলে থাপ্পড়টাই আমার একমাত্র পাওনা।

অন্ধের কাহিনী শেষ হলে খলিফা বললেন, তোমার জীবনের দুঃখজনক ঘটনার জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী। সীমাহীন লোভই তোমার এই দশা ঘটিয়েছে। যাক, আমি দপ্তরে নির্দেশ দিচ্ছি তোমার এবং খাজা মাদ্রাসা শিক্ষকের জন্য প্রতিদিন দশ দিরহাম করে খয়রাতি দেওয়া হবে।

এবং এছাড়া খলিফা সাদা ঘোড়ার সওয়ার যুবক, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ, হাসান এবং হিন্দুস্তান সুলতানের জামাতাকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য ইনাম প্রদান করলেন।

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এরপর আপনাকে আর এক কিস্সা শোনাবো।

কোন এক সময়ে এক গ্রামে ঈশ্বর-বিশ্বাসী এক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ বাস করতো। সংসারে তার বিবি এবং দুটি পুত্র কন্যা ছিল। ছেলেটি একেবারে আহাম্মক গবেট। মেয়েটির দেহের তুলনায় পাদুখানা ছিল খুব ছোট।

মৃত্যুকালে বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলে গেল, দেখ, আজ বাদে কাল আমি মরে যাবো। আমার সংসারের সব ভার তোমার ওপরেই দিয়ে যাচ্ছি। কারণ ছেলেটি একেবারে একগুঁয়ে এবং নির্বোধ। একটা কথা, আমার মৃত্যুর পর ছেলেটার কোনও কাজে তুমি বাধা দিও না। ওর যা প্রাণ চায় করবে, তাতে যদি মহা অনিষ্টও ঘটে, মুখ বুঁজে সহ্য করো তুমি।

স্বামীর শেষ ইচ্ছা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করে একদিন বিবিও দেহ রাখলো। মৃত্যু শয্যায় সে মেয়েকে কাছে ডেকে স্বামীর শেষ ইচ্ছার কথা শোনালো, মা, তোমার ভাই বুদ্ধিতে খাটো এবং ভীষণ একরোখা। তোমার বাবা মারা যাবার সময় আমাকে দিয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলেন যাতে আমি তোমার ভাই-এর কোনও কাজে বাধা না দিই। তিনি গত হয়েছেন, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাবার আগে তাই তোমাকেও বলে যাচ্ছি মা, সে যত অন্যায়ই করুক, তার কোনও কাজে তুমি বাধা দিও না। মেয়েটি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করলো, সে তার দাদাকে মান্য করে চলবে। তার কোনও কাজে বাধা দেবে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো একাশীতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মায়ের মৃত্যুর পরে গবেটচন্দর বোনকে বললো, জানিস বহিন, এই যে আমাদের ঘরবাড়ি বিষয় সম্পদ যা কিছু দেখছিস আমি সব আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব ঠিক করেছি।

দাদার কথা শুনে বোন শিউরে ওঠে, সে কি কথা রে দাদা। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা সে ভুলে গেল সেই মুহূর্তে, তা হলে আমরা বাঁচবো কি করে, খাবো কী ?

গবেটচন্দর গোঁ ধরে বললো, ওসব আমি জানি না, আমার ইচ্ছে হয়েছে করবো। তাতে যদি তুই বাধা দিতে চাস, আমি মানবো না।

এই বলে সে তখুনি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। এবং লেলিহান অগ্নি শিখা নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো বাড়ির সর্বত্র। গরু বাছুর, দানাশস্য পোশাক আসাক আসবাব বিছানা যা কিছু ছিল সব ছাই হয়ে গেল।

মেয়েটি দাদার চোখে ধুলো দিয়ে কিছু দামী জিনিসপত্র পাড়া-পড়শীদের কয়েকটি বাড়িতে সরিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু গোঁয়ার গবেট সে খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিবেশিদের ঘরেও আগুন লাগিয়ে দিল—সেইদিনই মাঝ রাতে।

পাড়ার তাবৎ লোক মারমুখী হয়ে ছুটে এল ভাইবোন দুটোকেই সাবাড় করে ফেলবে বলে। মেয়েটি বিপদ বুঝে দাদাকে এক রকম প্রায় জোর করে হিড়হিড় করে টানতে টানতে, সেই রাতেই চোরের মতো গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের বাইরে বেরিয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে থাকলো।

একটানা সারারাত ধরে ছুটার পর সকালবেলায় তারা এসে পৌঁছল এক নতুন অচেনা মুলুকে। চলতে চলতে তারা এক চাষীর খামারবাড়ি দেখতে পেল। মেয়েটি গৃহস্বামীকে বললো, আমরা দুই ভাইবোন অনেক দূর দেশ থেকে আসছি। আমাদের বাবা মা কেউই বেঁচে নাই। ঘরবাড়ি বিষয়সম্পদ

যা ছিল সব আগুনে পুড়ে গেছে। এখন একেবারে সহায়-সম্বলহীন অবস্থা। যদি দয়া করে আপনি আশ্রয় দেন আমাদের, আমরা দুই ভাইবোন গায়ে গতরে খেটে আপনাদের কাজ উঠিয়ে দেব।

ওদের অসহায় অবস্থার কথা শুনে এবং দুজনের ভদ্রবংশজাত চেহারা ও আদব-কায়দা প্রত্যক্ষ করে চাষী বললো, ঠিক আছে, তোমরা আমার বাড়িতে থাকো। তোমাদের কিই বা এমন বয়েস, কাজ-কাম বিশেষ কিছুই করতে হবে না. আমার নিজের তিনটি ছেলে আছে তোমাদেরই বয়েসের, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করবে. লেখা-পড়া শিখবে, কেমন?

মেয়েটি বললো, আপনি পরম দয়ালু, তাই একথা বলতে পারলেন।

চাষীর আশ্রয়ে দুই ভাইবোন তোফা দিন কাটাতে থাকলো। মেয়েটি নিজে থেকেই সেধে কিছু কাজ-কাম করে কিন্তু তার দাদা গবেটচন্দর খায় দায় আর গুলতানী করে বেড়ায়।

একদিন সে চাষীর তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বললো—চল আমরা মাঠে যাই। ঐ বাগানের মধ্যে আমরা লড়াই লড়াই খেলবো। তোরা তিন ভাই একদিকে আর আমি একাই একদিকে।

লড়াই-লড়াই খেলাতে কোন্ ছেলের না উৎসাহ থাকে। চারজনে লাঠিসোটা সঙ্গে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে মেয়েটির কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। তার দাদাকে সে হাড়ে হাড়েই জানে। তিনটি কচি দুধের বাচ্চাকে নিয়ে মাঠের বাগানে গেছে অনেকক্ষণ, এখনও ওরা ফিরলো না কেন?

অজানা ভয়ের আশঙ্কায় মেয়েটি প্রায় ছুটতে ছুটতেই বাগানের দিকে চলে গেল।

ভাই-এর কাণ্ড দেখে আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটি, একি সর্বনাশ করেছিস দাদা? একেবারে জানে মেরে ফেলেছিস তিনজনকে!

গবেটচন্দরের হাতে ধরা একটা মোটা লাঠি, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, মারবো না, ওরা যে আমার শত্রুপক্ষ, আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমি যদি না ওদের খতম করতাম, ওরা কি আমাকে সোহাগ করতো? তুই একটা আস্ত উজবুক, লড়াই-এর এই তরিকা, হয় মারো নয় তো মর।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দেখ দাদা, ওসব বুজরুকি থামা। এবার যদি জানে বাঁচতে চাস তো চল আর দেরি নয়, এখান থেকেই পালাই। না হলে এখুনি ওর মা-বাবা খবর পেয়ে যাবে। তারপর আমাদের দুজনকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে।

গবেটচন্দর তখন সাফাই দিতে চায়, কেন কাটবে আমাদের? আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো লড়েছি। হারা জেতা বাঁচা মরাই তো বড় কথা নয় সেখানে—

—তুই থাম দাদা, আর মস্করা করতে হবে না। ঐ শোন্ ওরা বোধ হয় খবর পেয়ে গেছে, গাঁ শুদ্ধ লোক বোধ হয় তেড়ে আসছে এইদিকে। কেমন

হৈ হৈ রব শুনতে পাচ্ছিস না ?

গবেটচন্দর এতক্ষণে বুঝতে পারে বিপদ ঘনায়মান। আর তিলমাত্র দেরি না করে সে বোনকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

গ্রামবাসীরাও তীর ধনুক সড়কী বর্শা নিয়ে পিছনে পিছনে তাড়া করে চলে ওদের। কিন্তু মেয়েটি ভীষণ বুদ্ধিমতী, সে সোজা পথে না গিয়ে বন বাদাড় জঙ্গল ভেঙ্গে দাদাকে নিয়ে পালাতে থাকে।

সারাটা দুপুর বিকেল ধরে দৌড়তে দৌড়তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওরা দুজনে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর পেরিয়ে একটি বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

ছোট বড় নানা জাতের অনেক গাছপালার বাগান। মেয়েটি বলে, দাদা, রাত হয়ে আসছে। এখন অন্ধকারে পথ চলা যাবে না। আর এই জঙ্গলের এখানে সেখানে সাপ খোপ জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে, তাই মাটিতে থাকা নিরাপদ হবে না, এস আমরা ঐ বড় গাছটার ওপরে উঠে যাই! ওর ডালগুলো বেশ মোটা মোটা। আর তাছাড়া বেশ ঝাঁকড়াও আছে। ঐ ডালে বসে থাকলে চট করে কেউ নজরও করতে পারবে না।

গবেটচন্দর বোনের বুদ্ধির তারিফ করে, তোর তো দারুণ মাথা রে! ঠিক আছে, চল ওই গাছটারই উপরে ওঠা যাক। রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে রওনা দেওয়া যাবে।

একটু পরেই আরও ঘন আঁধার ঘনিয়ে এল। গাছের ডালে বসে বুঝতে পারলো ওরা, গাছতলায় কারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি দাদার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো, চুপ; একটি কথাও আর বলবি না এখন। মনে হচ্ছে, আমাদের খুঁজতে খুঁজতে ওরা এই গাছের তলাতেই এসে পড়েছে।

সকালবেলায় দিনের আলোয় মেয়েটি পরিষ্কার দেখলো, সেই গৃহস্বামী এবং তারই কয়েকজন প্রতিবেশী সহচর গাছতলায় শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাদের পাশে রাখা তীর ধনুক বর্শা বল্লম প্রভৃতি নানা মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র।

মেয়েটি গবেটচন্দরকে জাগিয়ে নিচের দৃশ্যটি দেখিয়ে ফিস ফিস করে বললো, ওরা এখন ঘুমে অচৈতন্য। চল দাদা, গাছ থেকে নিঃশব্দে নেমে চুপি-সারে কেটে পড়ি।

গবেটচন্দরের মাথায় তখন অন্য বদ-বুদ্ধির খেলা শুরু হয়ে গেছে। বললো, তুই থাম দিকিনি, ঐ শয়তানগুলোর মুখে আমি পেচ্ছাব করে দেব।

বোনটি অনেক কাকুতি মিনতি করেও দাদাকে নিরস্ত করতে পারলো না। গবেটচন্দর কল কল করে জল ছেড়ে দিল তাদের মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে ধড় মড় করে উঠে পড়ে সবাই। ব্যাপারটা কি হতে পারে কিছুই ঠাওর করতে পারে না কেউ। একজন বলে, এ নিশ্চয়ই শয়তানের কাণ্ড। এই বাগানে হয়তো ওরা থাকে।

আর একজন তীর ধনুক হাতে তুলে নিয়ে বলে, শয়তানই হোক, আর জীন আফ্রিদিই হোক, আমার তীরের ফলার কাছে কেউই জ্যান্ত থাকবে না।

মেয়েটি ফিস ফিস করে গবেটচন্দরকে বলে, গাছটা আকাশ-ছোঁয়া উঁচু আছে, দাদা, যদি বাঁচতে চাস আরও উপরে উঠি চল। তা না হলে ওরা আমাদের তীরে গেঁথে ফেলবে।

গবেট বললো, ঠিক আছে তাই ওঠ, পারবি তো?

মেয়েটি বলে, গাছের ডালে ডালে চড়ে বেড়ানো আমার ছোটোবেলার অভ্যেস, তুই কি জানিস না?

ওদের ওপরে উঠে যাওয়ার সময় স্বভাবতই খস্ খস্ আওয়াজ ওঠে। নিচের একজন-এর চোখে পড়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে, ওই যে ওরা গাছের মাথায় উঠে গেল। চালাও তীর —

কিন্তু গ্রাম্য চাষীর ধনুকের তীর অত ওপরে উঠতে পারলো না। আমরা গাছে উঠে ধরবো। ওদের গৃহস্বামী বললো, তাতেও বিপদ হতে পারে। আমরা জানি না, ওদের সঙ্গে কী কী অস্ত্র আছে। ওরা ওপরে আমরা নিচে। আঘাত করার সুযোগ ওদেরই বেশি। সুতরাং তার দরকার নাই, এস আমরা গাছটাকেই কেটে মাটিতে ফেলে দিই। তারপর ওরা পালাবে কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়ায় কুড়ুলের ঘা পড়তে থাকলো। মেয়েটি দাদাকে বললো, এবার আর বাঁচবার কোনও পথ নাই দাদা একটু পরেই গাছটাকে ওরা মাটিতে শুইয়ে দেবে। নে, এবার খোদার নাম কর, মউৎ সামনে এসে গেছে আমাদের।

গবেটচন্দর গম্ভীর হয়ে খুব ভারিক্কি চালে বললো, হুম্ আমার জন্যেই দেখছি তোর জানটাও খতম হয়ে গেল।

কুড়ুলের ঘায়ে ঘায়ে গাছের গুঁড়ির অর্ধেকের বেশি কাটা হয়ে গেছে ততক্ষণে। আর একটু পরেই পাহাড় প্রমাণ গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে যাবে নির্ঘাৎ। মেয়েটি হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দাদাকে জড়িয়ে ধরে, এ তুই কি করলি দাদা, এইভাবে জান হারাতে হলো?

গাছটা হেলে গেছে। পলকেরই মধ্যে মাটিতে পড়ে যাবে। এমন সময় বিরাট এক বকপাখী আকাশ থেকে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল গবেটচন্দর আর তার বোনটিকে। এবং সেই মুহূর্তেই বন-কাঁপানো আওয়াজ তুলে পড়ে গেল গাছটা।

বকের থাবায় দুই ভাইবোন আকাশ পথে উড়ে যেতে থাকলো। মেয়েটি ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু গবেটচন্দরের ভয়ডর বলে কিছু নাই। বকপাখীর বুকে সুড়সুড়ি দিয়ে মজা অনুভব করতে লাগলো সে। বোনটি আঁৎকে উঠলো, সর্বনাশ, একি করছিস দাদা, পাখীটা যদি এই আকাশ থেকে ফেলে দেয় আমাদের, তা হলে যে একেবারে ছাতু হয়ে যাবো। দোহাই দাদা, ওসব করিসনে।

গবেটচন্দর সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে, কিন্তু আমার যে ভারি মজা লাগছে। দেখছিস না, সুড়সুড়ি খেয়ে পাখীটা কেমন ছটফট করে উঠছে!

একটা পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উড়ছিল পাখীটা। মনে হলো একটা

জায়গায় বসবে সে। কিন্তু কী খেয়াল হলো বসতে বসতেও সে বসলো না। আবার মহাশূন্যে উঠে তীরবেগে ছুটে চললো।

প্রাণে বাঁচার ক্ষীণ একটু আশা হয়েছিল মেয়েটির কিন্তু তাও নিমেষে মিলিয়ে গেল। পাহাড় ছাড়িয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উড়তে থাকলো পাখীটা।

এই সময় গবেটচন্দর এমনভাবে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করলো যে, পাখীটা আর থাবায় ধরে রাখতে পারলো না ওদের। একেবারে ঝপাত সমুদ্রজলে।

তবে রক্ষে এই, তীর থেকে বেশি দূরে নয়। দুই ভাইবোনই সাঁতার জানতো, তাই প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে একসময় কূলে এসে ভিড়লো ওরা।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। দুই ভাইবোন সমুদ্র-সৈকতে বসে শীতে কাঁপতে লাগলো। বোনটি বললো, এভাবে ভিজা জামাকাপড়ে সারারাত কাটাতে হলে নিমুনিয়া ধরে যাবে দাদা, একটা উপায় বাৎলা।

গবেটচন্দর বললো, দাঁড়া ব্যবস্থা করছি। এই বলে সে এক রাশি শুকনো ডালপালা নিয়ে এসে জড়ো করলো সেখানে। তারপর দুখানা পাথরের নুড়ি হাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালালো।

সেই আগুনের তাপে জামা কাপড় শুকিয়ে ফেললো ওরা। মেয়েটি বললো, বারে দাদা, তোরও মাথায় কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে দেখছি!

সারাটা রাত আগুনের ধুনী জ্বালিয়ে রাখার জন্য গবেটচন্দর গাছের মোটা মোটা ডালপালা এনে ধুনীর ওপরে ফেলতে লাগলো। ফলে, রাত্রির ঘন তমসা কেটে গিয়ে সেই সমুদ্রবেলার অনেকটা অঞ্চল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রাত তখন এক প্রহর, হঠাৎ বিকট গর্জন কানে এল। মনে হলো, হাজার হাজার মোষ তাড়া করে আসছে তাদের দিকে।

একটু পরে এক বিশাল কালো দৈত্য এসে দাঁড়ালো ওদের ধুনীর সামনে। এই দৈত্যটা আলো সহ্য করতে পারে না। সারা দেশটাকে এতকাল ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। এখানে বহুকাল সূর্য ওঠে না। ঐ দৈত্যটা সূর্যকে পিঠ দিয়ে আড়াল করে রেখে দেয়।

দৈত্যটা আগুনের কুণ্ডুটাকে নিভিয়ে দেবে আর গবেটচন্দর তা কিছুতেই হতে দেবে না। এই নিয়ে বেধে গেল তুমুল লড়াই। অগ্নিদগ্ধ জ্বলন্ত গাছের ডাল নিয়ে বার বার আক্রমণ করতে থাকলো সে। কিন্তু প্রতিবারই দৈত্যটা তা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গবেটেরই জিৎ হলো। একবার সে অতর্কিতে একটা জ্বলন্ত ডাণ্ডা সোজা ঢুকিয়ে দিলো তার হায়নার মতো মুখগহ্বরে। মেদিনী কাঁপিয়ে আওয়াজ তুলে সে লুটিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো। গবেট এবার আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে অন্ধ করে দিল ওর চোখ দুটো। তারপর পিটাতে পিটাতে সাঙ্গ করে দিল ওর ইহলীলা।

বোনটা অদূরে পাহাড়-এর কন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। দৈত্য নিধন করার পর সে পাহাড়-কন্দরে এসে বোনের দেখা পেয়ে বললো, কিরে খুব ভয়

পেয়েছিলি ?

মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে তাকায় দাদার দিকে, তোর গায়ে এত শক্তি, তাতো জানতাম না দাদা। অত বড় একটা বাঘা দানব, তাকে খতম করে দিতে পারলি!

গবেটচন্দর বুক ফুলিয়ে বলে, ওসব দৈত্য দানব আমার কাছে নস্যি! নে, সর একটু শোয়া যাক। উফ্, খুব একটা ধকল গেছে আজ।

সকালে সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়লো কোন এক মহাবীর দুষমন দৈত্যকে নিধন করে ফেলেছে! সম্রাট তাঁর সেনাপতিদের বললেন, যে দৈত্যের অত্যাচারে আমরা এতকাল ঘন তমসার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলাম সেই দুরাচারকে যে বীর নিহত করেছে সে নিশ্চয়ই দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিধর। তোমরা যাও তার অনুসন্ধান করে মহা সম্মানে নিয়ে এস তাকে আমার প্রাসাদে। আমি স্বহস্তে তাকে জয়তিলক পরিয়ে বরণ করবো!

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের চর এবং সৈন্যসামন্তরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খুঁজতে খুঁজতে একসময় তারা সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছায়। একজন সেনাপতি এক পায়ের চটি দেখতে পেয়ে হাতে তুলে নেয়।

—নিশ্চয়ই এই চটি যাঁর, তিনিই নিহত করেছেন এই দৈত্যকে। নিশ্চয়ই তিনি আশেপাশেই কোথাও আছেন, খুঁজে দেখ তোমরা।

খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের সেই কন্দরে দুটি কিশোর-কিশোরীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেল ওরা।

সৈন্যদের পদশব্দে মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যায়। সৈন্যরা তাকে জিজ্ঞেস করে এ চটি কার ?

মেয়েটি ভীত চকিত হয়ে বলে, আমার। দৈত্যের সাড়া পেয়ে ভয়ে ছুটে আসার সময় খুলে পড়ে গিয়েছিল।

—দৈত্যটাকে নিধন করেছে কে ?

—মেয়েটি তার দাদাকে দেখিয়ে বলে, এই আমার দাদা।

এরপর গবেটচন্দর আর তার বোনকে মহা সমাদরে সম্রাটের দরবারে হাজির করলো তারা।

সম্রাট গবেটচন্দরকে বাদশাহী মর্যাদায় বীরোচিত অভ্যর্থনা করলেন।

আপন কন্যার সঙ্গে শাদী দিলেন ; এবং অর্ধেক সলতানিয়তের সুলতান করে দিলেন তাকে। এবং গবেটের বোনকে শাদী করে হারেমের বেগম-এর মর্যাদা দিলেন তিনি।

এরপর শাহরাজাদ তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

কোনও এক শহরে তিন বোন বাস করতো। ওরা সবাই একই পিতার সন্তান। কিন্তু মা ভিন্ন ভিন্ন।

তিন বোন একই সঙ্গে থাকতো। শনের কাপড় বুনে অন্ন সংস্থান করতো।

তিনজনেই দেখতে শুনতে অপরূপ ছিল। বিশেষ করে ছোটটির রূপের জেল্লার কোনও তুলনা হয় না। হাতের কাজও তার নিখুঁত। অন্য দুই বোনের কাপড় বোনার সঙ্গে তার বোনার আকাশ পাতাল তফাত ছিল। ফলে ওদের বোনা কাপড় যে দামে বিকাতো তার অনেক বেশি দামে বিক্রি হতো ছোটর বোনা কাপড়। এই সব কারণে বড় দুই বোন প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার চোখে দেখতো তাকে।

একদিন ছোট বোন বাজার থেকে একটা ছোট্ট চিনেমাটির ফুলদানী কিনে নিয়ে এল। জিনিসটা দেখতে সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু মেহনতের সীমিত পয়সা খরচ করে এমন শৌখিন বস্তু আবার কেউ কিনে নাকি! বড় বোন ঠোঁট উল্টে চোখ নাচিয়ে মেজকে বলে, যতসব আদিখ্যেতা। মেজ বলে ঢং দেখে আর বাঁচি না। পেটে খেতে কুলায় না, এদিকে ফুলে সাজাবেন ঘর।

ছোট বোন ওদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে আহত হলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। নিজের ঘরে গোলাপ ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখলো ফুলদানীটি।

আসলে এই ফুলদানীটি একটি অভিনব যাদু বস্তু। ফুলদানীর সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখরোচক খানাপিনা বা সুন্দর সুন্দর জমকালো সাজ-পোশাক বা অন্য যা কিছু চাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সে সব এসে হাজির হয়। কিন্তু ছোট বোন ফুলদানীর এই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা সযত্নে গোপন করে রাখে। ওরা জানতে পারলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে।

রাতে যখন অন্য দুই বোন ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে, ফুলদানীর কাছে ভালো ভালো খাবার-দাবার সাজ-পোশাক গহনা চায়। এবং তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয় সব। তৃপ্তি করে খানাপিনা করে সে। তারপর সেই বন্ধ ঘরে একা একাই বাহারী সাজে অলঙ্কারে সেজে-গুজে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে পুলকিত হয়। আবার সকাল হতে না হতে অন্য দুই বোন ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই সাজ-পোশাকটি ছেড়ে ফেলে ফুলদানীকে বলে, ছোট ফুলদানী, ছোট ফুলদানী, এ সবগুলো এখন তুমি নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-পোশাক অলঙ্কারাদি অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং দুই বোন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পায় না।

এইভাবে কয়েকটা মাস কেটে যায়, বড় দুই বোনের সামনে সে নিতান্ত গরীব-সরীবের মতো থাকে। কিন্তু রাতের বেলায় নিজের ঘরে সে শাহজাদী বনে যায়।

একদিন সুলতানের পেয়াদা বরকন্দাজরা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সারা শহরবাসীকে

শাহজাদীর শাদীর নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। বড় দুই বোন ছোটকে বললো, তুই আর গিয়ে কি করবি, বাড়িটা পাহারা দে, আমরা দুজনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসি।

ছোট আহত হলো, কিন্তু মুখে কোনও প্রতিবাদ করলো না।

ওরা নিজেদের সেরা সাজ-পোশাক যা ছিল তাই বের করে সেজে-গুজে সুলতানের প্রাসাদে রওনা হয়ে গেল। ছোট তখন ফুলদানীকে বললো, আমার জন্য এমন সাজ-পোশাক এনে দাও যা দেখে প্রাসাদের বেগম বাঁদীরাও ভিরমি খেয়ে যায়। আমার দুহাতের জন্য চাই দশটা হীরে চুনী পান্না মুক্তোর সুন্দর সুন্দর আংটি, তুরস্কের রংদার বাজুবন্ধ এবং পায়ের জন্য ছোট ছোট হীরে-খচিত মল।

ফুলদানীটি তখুনি ছোটবোনের চাহিদা পূরণ করে দিল। খুব সুন্দর করে শাহজাদীর মতো সেজেগুজে সে প্রাসাদে এসে হাজির হলো। তার সাজের বাহারে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আমন্ত্রিতরা। এ ওর কানে ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগলো, নিশ্চয়ই কোনও আমীর বাদশাহর কন্যা হবে।

সাজ-পোশাক এবং অলঙ্কার আভরণের চাকচিক্যে ছোটর চেহারা এতই চমৎকার দেখাচ্ছিল যে নিজের বোনরাও তাকে চিনতে পারলো না সেখানে।

খানাপিনা শেষ হতেই শুরু হলো জলসা, নাচ গানের আসর যখন জমজমাট, সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা, সেই সুযোগে সবার অলক্ষ্যে ছোট প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে। গান বাজনা শেষ হলেই তার বোনরা বাড়ি ফিরে আসবে। তাই তার আগেই সাজ-পোশাক গহনাপত্র আবার ফুলদানীর কাছে জমা করে দেবে, সেই জন্যে ত্বরিতপদে ঘরে ফিরে এল সে। কিন্তু গহনাপত্র খুলতে গিয়ে দেখলো বাঁ পায়ের মলখানা কোথায় খুলে পড়ে গেছে! মনটা ঈষৎ খারাপ হয়ে গেল, তা যাক, ফুলদানীর কাছে চাইলে তো আর অভাব হবে না কিছু!

প্রতিদিন সকালবেলায় শাহজাদা প্রাতঃভ্রমণে বেরোয়। সেজেগুজে তার তাজি ঘোড়াটায় চাপবে বলে আস্তাবলে আসতেই দেখে সহিসরা কী একটা বস্তু দেখতে ভিড় জমিয়েছে। শাহজাদাকে দেখে তারা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে পালাতে থাকে। শাহজাদা দেখতে পায় একজনের হাতে একটি রত্নালংকার।

—এই—এদিকে শোন ; তোর হাতে ওটা কি রে?

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমার কোনও গুণাহ নাহী হুজুর, এটা আমি আস্তাবলের দরজার সামনে কুড়িয়ে পেয়েছি, বিশ্বাস করুন।

এই বলে সে অলংকারটি শাহজাদার হাতে তুলে দেয়। শাহজাদা দেখে বুঝতে পারে কোনও বাদশাহজাদীর সাধের মল। চলতে চলতে চরণ থেকে স্খলিত হয়ে গিয়ে থাকবে। মলটি মহামূল্যবান হীরকতারকা খচিত বলে নয়, আশ্চর্য হলো সে এত ক্ষুদ্রাকৃতির মল যে চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছিল, না জানি সে সুন্দরী দেখতে কেমন অপরূপ। নানা ভাবে সে কল্পনায় তার মুখচ্ছবি আঁকতে চেষ্টা করে। কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হয়। বুকের মধ্যে এক

অদম্য বাসনা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অদর্শনাকে দেখার জন্য, প্রাণের প্রিয়তমা রূপে একান্ত আপন করে পাওয়ার জন্য বুকের মধ্যে উথাল পাথাল শুরু হয়ে যায়।

শাহজাদার এই প্রেম-জ্বরের কাহিনী সুলতানের কর্ণগোচর হতে বেশি সময় লাগে না। একমাত্র পুত্রের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সুলতানের চেষ্টার অন্ত নাই। শাহজাদার অভিপ্রায় জানার পর উজিরদের ডেকে বললো, সারা শহর তোলপাড় করে খোঁজার ব্যবস্থা কর। একটি মূল্যবান হীরের মল পাওয়া গেছে আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। অনুমান করছি শাহজাদীর শাদীর সময় আমন্ত্রিত হয়ে যারা এসেছিল তাদেরই কারো হবে সেটি। যারই হোক, সেই মালকিনকে হাজির করো আমার প্রাসাদে।

সুলতানের হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সিপাই সান্ত্রীরা সন্ধান করতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বাদশাহর পেয়াদা বরকন্দাজের সামনে মুখ খুলবে কে? সুলতানের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। মল-মালকিনের সন্ধান পাওয়া গেল না। এই সংবাদে শাহজাদা বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে শয্যা নিল। পুত্রের মুখ চেয়ে শাহবানু সুলতানকে প্রস্তাব দিলেন, অলঙ্কারটি একটি মেয়ের সুতরাং তাকে খুঁজে বের করতে গেলে প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

সুলতান বললেন, বেশ তাই কর। ঘরে ঘরে মেয়েদের পাঠাও। তারা প্রতিটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে জেনে আসুক।

খুঁজতে খুঁজতে সুলতানের নারীচররা অবশেষে তিন বোনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। পায়ের গোড়ালীর সরু গোছ দেখে তারা বুঝতে পারে ঐ ছোট্ট মলটির মালকিন তিন বোনের ছোটজন ছাড়া আর কেউ নয়! জেরার মুখে পড়ে সে স্বীকার করতেও বাধ্য হয়, হ্যাঁ মলটা তারই। প্রাসাদে নিমন্ত্রণ সেরে ফেরার পথে তার পা থেকে খসে পড়ে গেছে।

শাহবানুর চররা মহা সমাদরে ছোট বোনকে প্রাসাদে নিয়ে যায়। শাহবানু তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলে, বাঃ কি সুন্দর দেখতে তুমি, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার শাদী দেব।

সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। শাদীর উৎসবে মুখর হয়ে উঠলো সারা শহর।

ঈর্ষা-কাতর বড় দু'বোন জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ছোটর সৌভাগ্যে খুব যেন খুশি হয়েছে এমনি ভাব দেখাতে থাকে। ছোট সরলমতি মেয়ে, সে ওদের মনের কুটিলতা ধরতে না পেরে খুশির বন্যায় গা ভাসিয়ে বলে, সুলতানের অতবড় প্রাসাদে আমি একা-একা দিন কাটাবো কি করে দিদি, তোমরাও চল আমার সঙ্গে।

ওরা পা বাড়িয়েই ছিল, তখুনি রাজি হয়ে গেল দু'জনে। মহা ধুমধামে শাদী পর্ব সমাধা হয়ে গেল। একটানা চল্লিশ দিন আনন্দে উৎসবে উত্তাল হয়ে কাটাল সারা শহরবাসী।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তিরাশিতম রজনী :
আবার সে বলতে শুরু করে :

চল্লিশটা দিনের আনন্দমুখর সুখ-সম্ভোগে ছোট বোন আত্মহারা হয়ে বড় দুই বোনকে সেই আশ্চর্য যাদু ফুলদানীর গুপ্ত রহস্য বলে ফেলে। এখন সে সুলতানের পুত্রবধূ, সুতরাং ঐশ্বর্যের আর অভাব কী? সুতরাং ঐ ফুলদানীটা তার দিদিরাই নিক।

কিন্তু কাল হলো সেই। চল্লিশ দিনের শেষ দিনে সে হামাম থেকে গোসলাদি সেরে ঘরে ফিরে এসে দিদিদের সামনে চুল বাঁধতে বসে। বড় বোন সযত্নে পরিপাটি করে কেশ পরিচর্যা করে একটা খোঁপা বেঁধে তার চার পাশে সোনার কাঁটা গুঁজতে থাকে। একটা একটা করে আটখানা কাঁটা গোঁজা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোনটি, কি আশ্চর্য হঠাৎ একটি ঝুঁটি বাঁধা বুলবুলি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দু'বোন তখন হাতের তুড়ি বাজিয়ে পাখিটিকে প্রাসাদকক্ষের বাইরে তাড়িয়ে দেয়। ছোট বোন পাখি হয়ে মনের দুঃখে জানলার ফাঁক দিয়ে উড়ে গিয়ে সামনের বাগিচার একটা ফুলগাছের ডালে গিয়ে বসে।

এর পর দুই বোন আনন্দে নাচতে নাচতে প্রাসাদ ছেড়ে নিজেদের ঘরে ফিরে আসে।

সন্ধ্যায় শাহজাদা শয্যাকক্ষে এসে দেখে তার প্রাণ-প্রতিমা অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রথমে সারা প্রাসাদ, তারপর সারা শহর তোলপাড় করেও কোনও সন্ধান করতে পারা গেল না। বড় দুই বোন শোকের ভান করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে, ওরে বাবারে, এ আমাদের কি হলো গো! এত আদরের পিয়ারের বোন তুই, কেন বা তুই শাহাজাদার বেগম হতে গেলি—

শাহাজাদা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের ঘরে পড়ে থাকে। আর পাখিটা জানলার ওপর এসে বসে কিচির মিচির আওয়াজ তুলে কত কী বলে। প্রথম প্রথম শাহজাদা বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু দিন কয়েক পরে, রোজ দেখে দেখে পাখিটার ওপর কেমন মায়া বসে যায় তার।

আদর করার জন্য সে জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, ভয় পেয়ে বুঝি পালিয়ে যাবে পাখিটা। কিন্তু না, ভয় সে পায় না, বরং শাহাজাদার হাতের স্পর্শ পেয়ে আদরে গলে যায় সে।

অনেক শোক তাপের মধ্যে এই পাখিটাকে পেয়ে শাহজাদা মনটাকে একটু হালকা করতে পারে। নিজে হাতে করে সে তাকে খাওয়ায়, আদর করে।

পাখিটার মাথায় সুন্দর একটি খোপার মতো ঝুঁটি। শাহজাদা ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হাতে শক্ত কী যেন অনুভব করে কৌতূহলী চোখে ঝুঁটিটার দিকে বিশেষ ভাবে নজর করে।

আশ্চর্য তো! পাখির মাথার ঝুঁটিতে সোনার কাঁটা! একটা একটা করে

কাঁটাগুলো ওঠাতে থাকে সে। সাতটা কাঁটা তোলার পর অষ্টম কাঁটাটি টেনে তুলতেই বুলবুলিটা তার আসল রূপ ফিরে পেয়ে শাহাজাদাকে সালাম করে দাঁড়ায়।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

তার সৌভাগ্যের ঈর্ষায় কাতর হয়ে বড় দুই বোন, তারই কাছ থেকে উপহার পাওয়া যাদু ফুলদানীর কাছ থেকে ঐ যাদুকরী সোনার কাঁটাগুলো চেয়ে নিয়েছিল।

এর পরে অনন্ত সুখ-সম্ভোগের সায়রে গা ভাসিয়ে ওরা দুজনে সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছিল। অনেক সুন্দর সুন্দর সন্তানের জনক-জননী হতে পেরেছিল ওরা। আর ঐ দুষ্টপ্রাণ দুই বোন হিংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে মরেছিল।

সে রাত শেষ হতে তখনও অনেক বাকী। তাই শাহরাজাদ অন্য একটি কাহিনী শুরু করলো ঃ

এক সময়ে ভারতের এক প্রদেশে এক মুসলমান সুলতান দারুণ দক্ষতার সঙ্গে প্রজা পালন করতেন। তার কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না। কিন্তু সে জন্য সুলতানের কোনও ক্ষোভ ছিল না। কারণ তিনটি পরমাসুন্দরী কন্যা-সন্তান লাভ করেছিলেন তিনি।

দিনে দিনে দল মেলে ওরা কোমল কুঁড়িটি থেকে সুবাসিত প্রস্ফুটিত কুসুম হয়ে ওঠে। আরও সহজ করে বলা যায়, কচি কাঁচা আপেল তিনটি ক্রমশঃ রসালো ডাগর হতে থাকে।

একদিন সুলতান শাহবানুকে বললেন, মেয়ে তিনটির শাদীর বয়েস হলো, এবার ওদের একটা বিধি-ব্যবস্থা করতে হয়? যথাযোগ্য পাত্র সন্ধান করে তাদের হাতে সমর্পণ করাই তো এখন বিধেয়, কি বল?

শাহবানু বল্লেন, এ তো খুবই ভাল কথা, মেয়েদের সময়কালে শাদী দেওয়া মা বাবার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমার মতে বংশমর্যাদার কোনও কথা নয়, মেয়েদের নিজেদের পছন্দই প্রধান হওয়া উচিত। ওরা যাকে পেয়ে জীবনে সুখী হতে পারবে বলে মনে করবে, তাকেই শাদী করুক। তোমার কী মত?

সুলতান বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে একমত। ওরা নিজেরাই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিক।

সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হবে। যে সব পাত্র আগ্রহী তারা যথা নির্দিষ্ট দিনে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে পারে।

যথা দিনে দেশ-বিদেশের শতশত আমীর বাদশাহজাদারা সুলতানের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলো। প্রাসাদের ওপরতলার বাতায়ন-কক্ষে বসেছে শাহজাদীরা। উপস্থিত পাত্রদের পর্যবেক্ষণ করে বড় দুইবোন তাদের রুমাল নিক্ষেপ করলো দুজনের গায়ে। অর্থাৎ ঐ দুজন শাদীর পাত্র বলে নির্বাচিত হলো বড় দুজনের জন্য।

এরপর ছোটজন রুমাল নিক্ষেপ করলো। কিন্তু হাওয়ার টানে রুমালখানা উড়তে উড়তে প্রাসাদের আঙিনার বাইরে অবস্থানরত একটি রামপাঠার গায়ে গিয়ে পড়লো।

এমন অশুভ সূচনায় সুলতান বিষণ্ণ হলেন। কন্যাকে পুনরায় তিনি রুমাল নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। কিন্তু কপালের এমনই ফের, পরপর তিনবারই রুমাল গিয়ে পড়লো ঐ রামপাঠারই গায়ে। সুলতান বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হলেন। ছোট কন্যা বললো, বাবা, এই বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা। সুতরাং একে অস্বীকার করে কোনও লাভ নাই।

সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তা বলে একটা রামপাঠা? এর চেয়ে তোর মরা মুখ দেখাও ভাল।

সুলতানের ক্ষোভে শাহজাদী কান্নায় ভেঙে পড়ে, বাবা তুমি বৃথাই রাগ করছো, এই আমার অদৃষ্টের লিখন, একে এড়াবো কি করে। তার চেয়ে বিধাতার বিধান মেনে নিয়ে ঐ রামপাঠার সঙ্গেই আমার শাদী দিয়ে দাও। আমি অখুশি হবো না।

বড় দুই বোন ছোটর এই দুর্ভাগ্যে পুলকিত হয়ে ওঠে। ছোট তাদের চেয়ে রূপবতী বলে সহজাত হিংসা ছিল তার ওপর। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে একটি রামপাঠাকে পতিত্বে বরণ করতে হচ্ছে শুনে তারা মনে মনে বেশ খুশিই হলো।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত সুলতান ছোট কন্যার কথা মেনে নিয়ে সাড়ম্বরে তিন কন্যার শাদী দিয়ে দিল।

সন্ধ্যায় তিন কন্যার বাসরঘরগুলো সুন্দর করে সাজানো হলো। যথাসময়ে পাত্ররা উপস্থিত হলো বাসরঘরে।

রামপাঠা পাত্রকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিতেই ছোট কন্যা দরজা বন্ধ করে দিল। রামপাঠাটি এক অদ্ভুত কায়দায় গা ঝাড়া দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে এক সুঠামদেহী সুকুমার নওজোয়ান পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শাহজাদী হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। যুবকটি শাহজাদীকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, আসলে আমি পাঠা নই শাহজাদী, কপালদোষে আজ আমি শাপগ্রস্ত। কিন্তু তোমার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ এই গোপন সংবাদ তুমি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করো না কখনও। তাহলে আমাকে হয়তো চিরকালের মতো হারাবে তুমি।

শাহজাদী বলে, না, একথা কাউকেই বলবো না আমি? কিন্তু তুমি কে? কী তোমার আসল পরিচয়? আর কেনই বা এমন দশা হয়েছে তোমার?

যুবক বলে, আমি কে, জানতে চেও না প্রিয়তমা। কেন আমার এই দশা সে কথাও এখন বলতে পারবো না তোমাকে। তবে এটুকু জেনে রাখ, বিত্তে এবং বলে আমি তোমার প্রবল পরাক্রান্ত পিতার চেয়েও অনেক বড়। যাদের সঙ্গে তোমার অন্য দুই বোনের শাদী হয়েছে কোনও দিক দিয়েই তারা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

অনেক দিন ধরেই আমি তোমাদের এই প্রাসাদের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আসল কারণ, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। অহর্নিশ আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছি, তোমাকে যেন জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাই। তা খোদা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাকে লাভ করেছি। এখন আমাদের এই বন্ধন যাতে চিরস্থায়ী হয় সেজন্য তোমাকে একটি হলফ নিতে হবে?

—কী সে হলফ?

তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর সব মানুষ জানবে, আমি একটি রামপাঁঠা, জন্তু মাত্র। যত সাংঘাতিক ব্যাপারই ঘটুক, যে অবস্থাতেই পড় না কেন, আমার প্রকৃত পরিচয় কোনও ক্রমেই তুমি প্রকাশ করে দেবে না এই আমার একমাত্র অনুরোধ। তা যদি কর, সে যে কারণেই হোক, আমাকে আর খুঁজে পাবে না।

শাহজাদী আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করলো, কোনও কারণেই সে তার আসল পরিচয় ফাঁস করে দেবে না। তার জন্যে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে হয়, দ্বিধা করবে না সে।

এরপর ওরা দুজনে গভীর প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে সারাটা রাত সুখ-সম্ভোগে কাটিয়ে দিল।

সকাল হতেই শাহাজাদা আবার রামপাঁঠায় রূপান্তরিত হয়ে বাসরকক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

রীতি অনুসারে সকালে শাহবানু এলেন কন্যার খোঁজ খবর নিতে। শাদীর প্রথম রাতে কন্যা কীভাবে পাত্রদ্বারা গৃহীত হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্যই পাত্রীর মা বাসরঘরে আসেন।

শাহবানু ঘরে ঢুকেই কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বলেন, তুই এখনও জিন্দা আছিস, মা? আমরা তো সারারাত কেঁদে ভাসিয়েছি ঐ জানোয়ারটা বোধহয় তোকে আর আস্ত রাখেনি।

মেয়ের মুখে হাসির খৈ ফুটে, তুমি যে কি বল, মা। জিন্দা থাকবো না কেন? এই দেখো তোমার মেয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে এখনও বেঁচে আছে।

শাহবানু অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকায়, কী যেন বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েকে খুশির বন্যায় উচ্ছ্বসিত দেখে কেমন যেন সে ঘাবড়ে যায়।

—তা হলে, তুই সুখী হয়েছিস মা?

বাঃ রে, সুখী হবো না কেন? তোমার জামাই কত আদর সোহাগ জানে মা, কী করে তোমাকে বোঝাবো সে কথা। মোট কথা এর চেয়ে ভাল বর আমি কল্পনা করতে পারিনি মা।

মা কেমন চুপসে গিয়ে বললেন, তা তুই যখন সুখী হয়েছিস, তার বাড়া তো আর কিছু নাই। তোর মুখে হাসি দেখলেই আমাদের দিল খুশ হবে মা। আচ্ছা তুই সুখে থাক, আমি এখন চলি ?

মাস কয়েক পরে সুলতান এক বিরাট পোলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করলেন। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় দুই জামাই অংশ নিতে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু সুলতান তাঁর ছোট জামাতা রামপাঁঠাকে আর হাজির করলো না পোলো মাঠে। কারণ, তিনি জানতেন, তাতে উপস্থিত দর্শকদের হাসির খোরাকই জোগানো হবে মাত্র।

বড় দুই জামাই ঘোড়ার পিঠে চেপে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই লাঠি হাতে নিয়ে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছুটোছুটি করে পাঁয়তারা ভাঁজছিল। কে কাকে কেমন করে ঘায়েল করবে তারই কায়দা কসরত কষছিল। এমন সময় এক তৃতীয় বীরপুরুষের আবির্ভাব ঘটলো সমরক্ষেত্রে।

বীরপুরুষই বটে! সুঠাম সুন্দর চেহারার এক নওজোয়ান। লাঠি হাতে ঘোড়ার পিঠে চেপে বিশ্ব-বিজেতার মতো এসে উপস্থিত হলো সে। তড়িৎ বেগে বনবন করে ঘুরিয়ে লাঠির দুটি ঘায়ে দুই জামাতা-পুঙ্গবকে ধরাশায়ী করে সে বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়ালো সুলতানের বাতায়ন সম্মুখে।

উপস্থিত দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে নওজোয়ানকে বীরোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকলো। সুলতানও মুগ্ধ হলেন যুবকের অসামান্য বীরত্বে। শুধু বীর্যে কেন, এমন অলোক-সামান্য রূপবান পুরুষই বা কে কোথায় দেখেছে ?

বড় দুই বোন তাদের স্বামীদের পরাজয়ে যুবকের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু কনিষ্ঠার মুখমণ্ডল খুশির আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মাথার খোঁপায় গোঁজা একটি গোলাপ নিক্ষেপ করে দেয় সে যুবকের দিকে।

আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কে এই নওজোয়ান। আমাদের কনিষ্ঠা কন্যার বর রামপাঁঠাই নিজের স্বরূপ ধারণ করে আজকের এই লড়াই-এ বাজীমাত করেছে।

কন্যার এই অশোভন আচরণ সুলতান এবং শাহবানুর নজর এড়ায় না। মনে মনে বিরক্ত হলেও তার বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখের কথা বিবেচনা করে মুখে কিছু বলেন না তাঁরা।

দ্বিতীয় দিনেও ঐ যুবক পোলো ক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় গৌরবের উল্লাস অভিনন্দন আদায় করে সুলতানের বাতায়ন-পথে এসে কুর্নিশ জানায়।

সে দিন সুলতান কনিষ্ঠা কন্যার অভব্য আচরণ দেখে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। হতচ্ছাড়ি সাধ করে একটা জানোয়ারকে শাদী করে নিজের জিন্দগী বরবাদ করে এখন পরপুরুষকে দেখে বেহায়া নির্লজ্জের মতো ঢলাঢলি করতে আরম্ভ করেছে।

তৃতীয় দিনের লড়াই শেষে আবার যখন সে বিশ্ব-বিজেতার মতো এসে দাঁড়ালো তখন ছোট মেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। বিরাট একটি

ফুলের মালা সুতোয় বেঁধে নামিয়ে দিল তার গলায়।

—শয়তানীটা কামের তাড়নায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আজ আমি ওকে নিজের হাতে খুন করবো।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুলতান তেড়ে গেলো ছোট মেয়ের দিকে। চুলের মুঠি ধরে আছাড় মেরে মেঝেয় ফেলে দিলেন, বল বেয়াদপ দুশ্চরিত্রা, কেন তুই এইভাবে আমার মুখে চুনকালি দিলি। আজ তোকে আমি শেষ করে ফেলবো। হাজার বারণ সত্ত্বেও একটা রামপাঁঠাকে শাদী করে আমার এই বাদশাহী খানদানীতে কলঙ্ক লেপে দিয়েছিস, তাতেও তোর সাধ মেটেনি। এখন প্রকাশ্যে পরপুরুষকে ঘরে টেনে কামনা মেটাতে চাস এত বড় সাহস তোর। না, ঢের হয়েছে আর তোর এই বেলেল্লাপনা সহ্য করবো না আমি। আজই এখুনি নিজের হাতে তোকে গলা টিপে খতম করে দেব।

সুলতান দুহাত দিয়ে কন্যার গলাটা চেপে ধরেন। উদ্দেশ্য শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলবেন তাকে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মেয়েটি কাতর কাকুতি করে বাবার কাছে, বাবা আমাকে ছেড়ে দাও, জানে মেরো না। আমি কোনও দোষ করিনি, কোনও পাপ করিনি—

—চোপ রও, পরপুরুষকে লুব্ধ করার চেষ্টা করে যে নারী, সে দোজাকের কীট।

—না বাবা, না, আমি স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের দিকে কখনও নজর দিই না। তুমি যাকে পরপুরুষ মনে করেছ সে তোমার জামাই। বলছি, সব তোমাকে খুলে বলছি বাবা। আমাকে তুমি জানে মেরো না, আমি সব খুলে বলছি তোমাকে। আসলে সে কোনও জন্তু জানোয়ার নয়। কোনও কারণে আজ সে ঐ রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই সে তার নিজের রূপ ফিরে পেতে পারে। প্রতিদিন রাত্রে সে আমার সঙ্গে মানুষ হয়ে মিলিত হয়। আবার সকাল হতে না হতেই, কেউ দেখে ফেলার আগে, আবার ঐ জন্তুর রূপ ধরে। আসলে সে বিরাট শাহেনশাহর পুত্র সুন্দর সুপুরুষ নওজোয়ান।

সুলতান শাহবানু এবং বড় বোনরা একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা কে শুনেছে কবে?

সেইদিন থেকে রামপাঁঠাকে আর কেউ দেখতে পেল না। রাতের পর রাত কেটে যায়, ছোট কন্যা বাসর সাজিয়ে বসে বসে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কিন্তু তার স্বামী আর আসে না।

সুলতান চারদিকে চর পাঠালেন। তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালানো হলো সর্বত্র। কিন্তু কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না ছোট জামাতার।

এইভাবে দিনে দিনে মাস বয়ে যায়। মাসে মাসে বৎসরও অতিক্রান্ত হয়ে চলে। ছোট কন্যা বুঝতে পারলো, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে বলে আর তার স্বামী ফিরে আসবে না। কিন্তু স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত হয়ে জীবন ধারণেরই বা কি প্রয়োজন? তাই সে ঠিক করলো, আত্মঘাতী হয়ে মরবে।

কিন্তু মরার আগে তার দেখতে সাধ হলো, এই দুনিয়ায় তার চেয়ে হতভাগী

মেয়ে আর কেউ আছে কিনা। সকলের অলক্ষ্যে একদিন সে প্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

চলতে চলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে আবার প্রাসাদেই ফিরে এল। পথ চলা আর জনে জনে জিজ্ঞেস করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবে আপাতত গৃহ-ত্যাগের পরিকল্পনা বাতিল করে শহরাভ্যন্তরে এক অনিন্দ্যসুন্দর সুরম্য হামাম গৃহ বানাবার বাসনা করলো।

বহু অর্থব্যয়ে একদিন সে হামাম গৃহ তৈরিও হয়ে গেল। লোকে দেখে শত মুখে প্রশংসা ছড়াতে লাগলো, এ রকম স্নানাগার তামাম হিন্দুস্তানে আর দুটি নাই।

ঘোষণা করে দেওয়া হলো, সর্বস্তরের নারীদের জন্য ঐ হামামের দ্বার অবারিত থাকবে। কোনও পয়সাকড়ি লাগবে না। তবে একটি মাত্র শর্তে। যে নারী গোছল করতে আসবে সেখানে তাকে তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখ বেদনার সত্য কাহিনী বিবৃত করতে হবে। সুলতান-দুহিতা সকর্ণে তা শুনবেন। যাদের জীবনে কোনও দুঃখ বেদনা ছায়াপাত করেনি, হামামে তাদের প্রবেশ অধিকার নাই। সারা দেশের ভাগ্য-বিড়ম্বিত শোক দুঃখ তাপে দগ্ধ নারীর সংখ্যা অগণিত। সেই সব মেয়েরা দলে দলে আসতে থাকলো শাহজাদীকে তাদের দুঃখ বেদনার কাহিনী শোনাতে।

কেউ তার স্বামীর অত্যাচারের কাহিনী শোনায়, কেউ বলে কী ভাবে তার স্বামী অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়ে তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে, আবার কেউ বা প্রতারক স্বামীর খপ্পরে পড়ে নিজের যথাসর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের দুঃখ বেদনাকে অনেক বড় করে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু শাহজাদী নিজের দুর্ভাগ্যের চেয়ে কারো কাহিনীই আরও বেশি বেদনাদায়ক বলে মনে করতে পারে না।

একদিন এক অশীতিপরা লোলচর্ম দীনাতিদীন বৃদ্ধা হামামে প্রবেশ করলো। শাহজাদীর হাতে চুম্বন করে সে বললো, মা জননী, আমার বয়সের গাছপাথর নাই, এবং আমার দুঃখের কাহিনীরও সীমা সংখ্যা নাই। সে-সব কাহিনী শোনাতে শোনাতে জিভ আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। অত কথা বলতেও পারবো না, শোনার মতো ধৈর্যও তোমার হবে না। তার চেয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে শেষ দুঃখের কাহিনীটা তোমাকে শুনিয়ে যাই। এবং আমার মনে হয়, এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে দুঃখজনক কাহিনী, কারণ এর ফলে দুঃখের কোনও অনুভূতি আমি বোধ করতে পারিনি। দেহ মন সব অসাড় হয়ে গেছে একেবারে। ঘটনাটা সবে গতকাল ঘটে গেছে। তাই এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, কী আমার ঘটেছে। এবং তাতে কতটা আমার দুঃখ পাওয়া উচিত। সে যাই হোক, হুবহু যা ঘটেছে সেই কাহিনীই বলি ঃ

মা জননী, এই যে আমার গায়ে কামিজটা দেখছো, এই একটিমাত্র নীল রঙের জামাই আমার সম্বল, গরীব মানুষ আর একটা বানাবো তার পয়সা জোটাতে পারি না। কামিজটা ময়লায় তেল-চিটচিটে হয়ে গেছে, গায়ে যখন

আর রাখতে পারি না, তখন পুরুষমানুষের নজর এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে নদীর কোনও কিনারে বিবস্ত্র হয়ে তড়িঘড়ি জামাটা সাবান-কাচা করে তখুনি গায়ে পরে নিই।

গতকালও কামিজটা সাবান-কাচা করতে সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে গিয়েছিলাম। একটা নির্জন ঘাটে নেমে জামাটা কেচেকুচে একটা পাথরের চাই-এর ওপর মেলে দিয়ে তার আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলাম। হাওয়াতে খানিকটা শুকিয়ে গেলেই গায়ে চাপিয়ে চলে আসবো, এই রকমই মতলব ছিল, কিন্তু খানিকটা দূরে একটা খচ্চরকে ঝিমুতে ঝিমুতে এগিয়ে আসতে দেখে আমি খপ করে কামিজটা তুলে নিয়ে গায়ে গলিয়ে দিলাম। ভয় হয়েছিল, গাধাটার পিছনে নির্ঘাৎ তার সহিসও আছে! সে যদি আমার উদোম অবস্থা দেখে ফেলে—ছিঃ ছিঃ কি শরম-কি-বাত ?

কিন্তু আশ্চর্য, দেখলাম গাধাটার পিঠে বোঝাই একগাদা ছাগল ভেড়ার কাঁচা ছাল। দিব্যি গজেন্দ্রগমনে মাথা দোলাতে দুলাতে সে আমার সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সহিসের প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু না, গাধাটার পিছনে কোনও মানুষজন কেউ নেই। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হলো। কৌতূহল এড়াতে না পেরে গাধাটার পিছু ধাওয়া করলাম। বেশ কিছুটা পথ আসার পর নদীর ধারেই একটা ছোট্ট টিলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো গাধাটা। তারপর একখানা পা দিয়ে একটা জায়গায় আচড়াতে থাকলো। একটু পরে অবাক হয়ে দেখলাম জায়গাটার মাটি দু ভাগ হয়ে সরে গেল খানিকটা। এবং সেই ফাঁক দিয়ে গাধাটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও কৌতূহল চাপতে না পেরে ঐ ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

একটু এগোতেই দেখি একটা গুহামুখ। গাধাটা তেমনি হেলতে দুলতে সেই গুহার ভিতরে চলে গেল। আমিও তাকে লক্ষ্য করে পিছু পিছু চলতে থাকলাম।

কি বিশাল গুহাপ্রাসাদ। কত সুন্দর সুন্দর দামী দামী আসবাবপত্র ঝকঝক-তকতক করে সাজানো গোছানো সব। চোখ জুড়িয়ে যায়।

পায়ে পায়ে আরও ভিতরে এগিয়ে গেলাম। সুন্দর খানার খুশবু ভেসে এল নাকে। এক-পাশে তাকিয়ে দেখি থরে থরে সাজানো সব পেয়ালা পিরিচ, কাঁটা চামচে এবং নানা ব্যঞ্জনের ঢাকা দেওয়া হরেক রকমের ছোট বড় সব পাত্র। একটি পাত্রের ঢাকা খুলে দেখি মাংসের কাবাব। আমার তখন জিভে জল এসে গেছে। লোভ সামলাতে না পেরে একটুখানি নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছি মাত্র। অমনি একটা গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল : হাত ওঠাও। এ খানা আমাদের মালকিনের জন্য। খবরদার ছুঁয়েছো কি মরেছো। আমি তৎক্ষণাৎ সশব্দে ঢাকনাটা নামিয়ে রাখি। তারপর আর ওখানে না দাঁড়িয়ে অন্য দিকে, অন্য একটা ছোট্ট কুঠরীতে ঢুকে পড়ি। সেখানে দেখলাম চমৎকার সব গরম গরম রুটি তাওয়ায় বসানো হয়েছে। তন্দুরীগুলো ধীরে ধীরে ফুলছে, কোনটা বা বেশ তৈরি হয়ে এসেছে। আরও কতকগুলো রুটি সাঁকা শেষ হয়ে

গেছে। সেগুলো, মনে হলো সদ্য তন্দুর থেকে তুলে টেবিলে সাজানো হয়েছে। একখানা রুটির দিকে হাত বাড়াতেই আবার সেই গুরুগম্ভীর স্বর ভেসে এল: খবরদার হাত ওঠাও। এ সব খানা আমাদের মালকিনের জন্য। হাত দিয়েছ কী মরেছো।

ভীত চকিত হয়ে আমি ছুটে পালালাম সেখান থেকে। ছুটতে ছুটতে অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলাম এক শ্বেত পাথরের বিশাল মহলে। আমার মনে হয়, সে ধরনের জমকালো ঘর একমাত্র তোমার বাবার প্রাসাদেই থাকা সম্ভব। সেই দরবারকক্ষের ভিতরে পর পর চল্লিশটা তখত্—প্রতিটি সোনার তৈরি। প্রাসাদের মনোহর দৃশ্যাবলী দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে।

একটু পরে দেখলাম ঘরের ভিতরে চল্লিশটা রামপাঠা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে তাগড়াই সে মাঝখানের সবচেয়ে বড় মসনদটিতে চেপে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে বাকী পাঁঠাগুলো বাদশাহী কেতায় কুর্ণিশ জানিয়ে এক এক আসনে এক একটি উঠে বসলো।

এর পর ওরা সবাই একসঙ্গে গা ঝাড়া দিতেই, আমি হতবাক হয়ে দেখলাম, ঐ চল্লিশটি পাঁঠা ফুলের মতো সুন্দর সুন্দর সব নওজোয়ান হয়ে গেল। ওদের শরীর থেকে যুঁইফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরময়।

তারপর দেখলাম, সবচেয়ে বড় মসনদে যে ছেলেটি বসেছিল, হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগলো সে। এবং তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে অন্য ছেলেরাও একই ভাবে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদিতে লাগলো: কোথায় গেলে গো, আমাদের মালকিন, কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে। তোমার বিরহে আজ আমরা ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছি। তুমি এস—আমাদের কাছে এস। তুমি না এলে আমরা তো তোমার কাছে যেতে পারবো না। আমাদের একান্ত আবেদন, তুমি আমাদের কাছে চলে এস।

এর পর ওরা সিংহাসন থেকে নেমে তিনবার গা ঝাড়া দিতেই আবার সকলে রামপাঁঠায় রূপান্তরিত হয়ে দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই সব দেখে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর সেখানে দাঁড়ালাম না। এ সিঁড়ি সে সিঁড়ি ভেঙে এ ঘর ও ঘর ডিঙিয়ে অবশেষে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে সোজা তোমার হামামের দিকে ছুটে আসছি। আমার মনে হয় এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে দুঃখজনক কাহিনী। কারণ, ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও সামনে নানারকম সুস্বাদু খানাপিনা পেয়েও তা স্পর্শ করতে পারিনি। তা ছাড়া যে সব দৃশ্য দেখে এলাম তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না কিছু। এর চাইতে দুঃখের আর কি হতে পারে, বল মা জননী?

বৃদ্ধার কাহিনী শুনতে শুনতে শাহজাদীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। বলা শেষ হতে না হতে ওর বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকলো, হাত পা অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। তার আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, ঐ প্রধান রামপাঁঠাই তার

প্রিয়তম স্বামী। বৃদ্ধাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে বলতে লাগলো, তুমি আমার মা, তোমার কাছে আমি চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবো। তুমি যা চাও, দুহাত ভরে দেব তোমাকে। শুধু একটিবার, আমাকে ঐ গুহার ভিতরে নিয়ে চল, মা। আমি তোমার কেনা হয়ে থাকবো সারা জীবন।

বৃদ্ধার পিছনে পিছনে সেই নদীর ধারে টিলাটার সামনে এসে পৌঁছল শাহজাদী। একটুক্ষণ পরে একটি খচ্চর পিঠে কাঁচা-চামড়ার ডাই নিয়ে হেলতে দুলতে এসে দাঁড়ালো সেখানে। তারপর পা দিয়ে একটা জায়গা আঁচড়াতেই একটা গর্ত হয়ে গেল এবং সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল সে। বৃদ্ধা শাহজাদীকে সংগে করে খচ্চরের পিছনে পিছনে গর্তের নিচে নেমে গেল। আবার সেই গুহামুখ। ওরা দুজনে খচ্চরকে অনুসরণ করে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেল অনেকটা। বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে দেখালো, ঐ দ্যাখো মা, কত সব জিভে জল আসা খানা-পিনা ঢাকা দেওয়া আছে ওখানে। কিন্তু খবরদার ওদিকে যেও না, এখুনি মেরে ফেলবে তোমাকে।

শাহজাদী বলে, তা মারুক, দেখাই যাক না কি বলে।

একটা পাত্রের ঢাকনা খুলতেই কাবাবের সুগন্ধে প্রাণ মন ভরে গেল। সংগে সংগে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, মালকিন, মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন, আপনার জন্যেই তো সাজিয়ে বসে আছি আমরা।

শাহজাদী কিন্তু গ্রহণ করলো না কিছু। পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখলো—সুন্দর সুন্দর সব তন্দুরী থরে থরে সাজানো। আবার সেই কণ্ঠ ভেসে আসে, একটু কিছু আস্বাদ করে আমাদের কৃতার্থ করুন, মালকিন। আমরা কতকাল ধরে খাবার সাজিয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

এরপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে এল ওরা। সেই সুরম্য শ্বেতপাথরের দরবার মহল। চল্লিশটি সোনার সিংহাসন। যেমনটি বৃদ্ধা বর্ণনা করেছিল, অক্ষরে অক্ষরে একই দৃশ্য দেখতে পেল শাহজাদী।

বৃদ্ধা বললো, এরপর মা, তুমি এখনই ঐ মহলে যাও। আমি আড়াল থেকে তোমাকে লক্ষ্য রাখবো।

এরপরে যা ঘটতে পারে তাই ঘটলো। অনেক দিন বাদে স্বামীকে ফিরে পেয়ে শাহজাদী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন সেই পাতালপুরীতে সুখবিহার করার পর ওরা দুজনে একত্রে ফিরে এল সুলতানের প্রাসাদে। কন্যা এবং জামাতাকে ফিরে পেয়ে আনন্দ হাসি গানে আবার মুখর হয়ে উঠলো প্রাসাদ। সুলতান ও শাহবানু প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন ওদের।

এরপর ওরা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে একটুক্ষণ থামলো। তারপর আর এক কাহিনী বলতে শুরু করলো ঃ

এক সময়ে কাইরো শহরে এক ফেরিওয়ালা বাস করতো। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে সে মুরগীর ডিম বিক্রি করে বেড়াতো।

ফেরিওয়ালার তিনটি কন্যা। তিনজনেই ফুটফুটে সুন্দরী। তার মধ্যে ছোট জাইনাহ শুধু রূপে নয়, বিদ্যাবুদ্ধিতেও চৌকস।

ফেরিওয়ালা কষ্ট করেও মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল পাত্রের যোগ্য করে তুলেছিল। সূক্ষ্ম সূচীশিল্প শেখার জন্য প্রতিদিন সকালে ওরা এক বৃদ্ধার বাড়িতে যেত। ওদের যাওয়ার-আসার পথের মাঝে সুলতানের প্রাসাদ। প্রতিদিন তিন বোন লক্ষ্য করে সুলতানের একমাত্র পুত্র জানলার ধারে বসে তাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়, এই যে ফেরিওয়ালার মেয়েরা, ভাল আছ তো?

বড় এবং মেজ বোন মৃদু হেসে ঈষৎ ঘাড় নেড়ে শাহজাদাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। কিন্তু ছোট বিন্দুমাত্র সাড়া না দিয়ে অন্যদিকে তাকাতে তাকাতে প্রাসাদ-চত্বর পার হয়ে যায়।

ছোটর অবজ্ঞা অবহেলার ভাবভঙ্গীতে শাহজাদা মনে মনে ক্ষুব্ধ ও কিছুটা রুষ্ট হয়। যতই দিন যায় ক্রমশ সে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভাবে, মেয়েটার তো জব্বর সাহস। সে কিনা সুলতানের পুত্র। তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এক সামান্য ফেরিওয়ালার মেয়ে? ঠিক আছে এমন শিক্ষা দিতে হবে তাকে, যাতে জিন্দগী ভর ইয়াদ থাকে তার। সে শাহজাদা—তার যে কতখানি ক্ষমতা থাকতে পারে ঐ মূর্খ মেয়েটার কোনও জ্ঞান নাই। একবার ওকে মজাটা দেখিয়ে দিতে হবে।

একদিন সে ফেরিওয়ালাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, যে তিনটি মেয়ে রোজ আমার প্রাসাদের সামনে দিয়ে যায় আসে ওরা কি তোমার মেয়ে?

—জী হুজুর।

ভয়ে ফেরিওয়ালার গলা কাঠ হয়ে যায়।

—হুম্, শাহজাদা গম্ভীর চালে হুকুম জারি করে, কাল সকালে নামাজের সময় তোমাকে হাজির হতে হবে এখানে। আমি তোমার সাজ-পোশাক খুলতে আবার পরতে, মুহূর্তে হাসতে এবং পর-মুহূর্তেই কাঁদতে, ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নেবে পড়তে—যখন যেমন হুকুম করবো পলকের মধ্যে সে-সব তামিল করতে হবে তোমাকে? যদি এক তিল এদিক ওদিক হয়, এক পল দেরি হয় তবে তোমার গর্দান যাবে, মনে থাকে যেন।

শাহজাদার এই রকম ক্রোধান্বিত ফরমাস শুনে ফেরিওয়ালার হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ কেতা জানিয়ে বলে, জো হুকুম মালিক।

বিষণ্ণবদনে ঘরে ফিরে আসে ফেরিওয়ালা। মেয়েরা বাবাকে দারুণ

চিন্তিত দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বাবা, তোমাকে এমন দেখছি কেন?

. ফেরিওয়ালা শাহজাদার উদ্ভট হুকুমের কথা সব খুলে বললো মেয়েদের।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো উননব্বইতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

সে বলতে থাকেঃ

ছোট কন্যা জাইনাহ বাবার কাছ থেকে সব শোনার পর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, ও হো হো, এই সব বলেছে শাহজাদা তোমাকে, বাবা? যাক্ তোমার একটুও ঘাবড়াবার কিছু নাই, আমার কথা শোন—আমি যা বলি সেইভাবে কাজ করে যাবে, দেখবে তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। এক কাজ কর, জেলেপাড়া গিয়ে একখানা মাছধরা জাল নিয়ে এস। আমি তোমাকে অনেক কায়দা করে জালখানা পরিয়ে দেব। শাহজাদার সামনে দাঁড়ালে সে বুঝবে তুমি একই সঙ্গে পোশাক পরে আছ আবার উলঙ্গ হয়েও আছ। আর সঙ্গে নিয়ে যাবে একটা পেঁয়াজ। শাহজাদার সামনে দাঁড়াবার আগে পেঁয়াজটার রস চোখে লাগিয়ে দেবে। তাহলেই তুমি একই সঙ্গে হাসতেও পারবে, কাঁদতেও পারবে। একটা খুদে গাধার ওপর চেপে তুমি হাজির হবে সেখানে। তোমার পা দুখানা নিচে নামালেই মাটিতে ঠেকে যাবে। তা হলে একই সঙ্গে গাধার পিঠে চড়াও হবে আবার মাটিতে দাঁড়ানোও যাবে। এরপর খোদা ভরসা, নসীবে যা থাকে হবে।

জাইনাহর বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায় ফেরিওয়ালা। মেয়েকে আদর করে তার যথা পরামর্শ মতো সেজেগুজে গাধার পিঠে চেপে প্রাসাদের দিকে রওনা হয় পরদিন প্রত্যুষে।

শাহজাদা ফেরিওয়ালার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা দেখে অবাক হয়। মনের ক্ষোভ মনেই চেপে গজরাতে থাকে। ফেরিওয়ালার কোনও খুঁতই ধরতে পারে না সে।

ঘরে ফিরে এসে কন্যাকে আদর করে চুমু খেয়ে বলে, মা, তোর বুদ্ধির জোরে আমি আজ মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে জান নিয়ে ফিরে আসতে পারলাম।

জাইনাহ ভাবে, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই ইতি হবে না। এর পরে শাহজাদা তার ওপর প্রতিশোধ তোলার চেষ্টা করবে। যাই হোক, আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। বাবাকে সে বলে, বাবা, আমার জন্য লোহার বর্মপোশাক বানিয়ে দাও, তুমি। মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধরনের বর্ম পরে ঠিক সেই রকম। আর দেরি করো না, আজই তুমি কামারকে বায়না করে এস, যেন সে কালকের মধ্যেই বানিয়ে দিতে পারে।

পরদিনই বর্ম তৈরি হয়ে এল। জাইনাহ রণরঙ্গিনী সাজে সাজালো নিজেকে।



হাতে নিল একখানা কাঁচি, একখানা ক্ষুর আর একখানা ইয়া বড় কাঁটাচামচ। গট গট করে রওনা হলো প্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

প্রাসাদের সদরে প্রহরীরা চমকিত হয়ে ফটক ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। জাইনাহ বীরাঙ্গনার মত সদর্পে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলো। সোজা চলে এল সে শাহজাদার কক্ষে।

জাইনাহর ভয়ংকর মূর্তি দেখে শাহজাদার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার দাখিল। কি করবে সে কিছুই ঠিক করতে না পেরে জাইনাহর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে, দোহাই ইফ্রিত সাহেবা, আমাকে জানে মেরো না আমি কোনও দোষ করিনি।

জাইনাহ গম্ভীর স্বরে হুকুম করে, ঠিক আছে সোজা হয়ে বস। আমি তোমার মাথার চুল আর গোঁফ কামিয়ে দেব। একটু নড়া-চড়া বা বেয়াদপি করবে না। তাহলে এই দেখছো কাঁটা-চামচে একেবারে গেলে দেবো তোমার চোখ দুটো।

শাহজাদা তৎক্ষণাৎ সুবোধ ছেলের মতো বসে বসে মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, না না, এক চুল নড়বো না আমি। দোহাই তোমায় আমাকে অন্ধ করে দিও না।

জাইনাহ কাঁচি দিয়ে মাথার আধখানা এবং ক্ষুর দিয়ে ভুরু আর গোঁফের আধখানা কামিয়ে দিল শাহজাদার। তারপর মুখে লেপে দিল গাধার গোবর।

তারপর শাহজাদা এবং তার কম্পমান চেলা-চামুণ্ডা খোজা নফরদের সামনে থেকে আবার বীরাঙ্গনার মতো প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে ফিরে এল সে।

পরদিন সকালে আবার যথারীতি তিন বোন সেজেগুজে সেলাই শিখতে বেরিয়ে পড়ে। এদিন আর ওরা বোরখার নাকাব তুলে রাখে না। একেবারে ঢেকে ঢুকে মাথা নিচু করে প্রাসাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়।

শাহজাদা সেদিনও বসেছিল তার ঘরের জানলার পাশে। তিন বোন সামনে আসতেই গলায় মধু ঢেলে সে জিজ্ঞেস করে, কি গো তোমরা কি সেই ফিরিওয়ালার মেয়েরা?

এবার ছোটজন নাকাব তুলে শাহজাদার দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার আধখানা ভুরু আর আধখানা গোঁফ কে কামিয়ে দিয়েছে, শাহজাদা?

জাইনাহর এই বাক্যবাণে মুষড়ে পড়ে শাহজাদা। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। মাথাটা আপনা-আপনি ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে। জাইনাহ খিল খিল করে হেসে ওঠে, আহা অত সরম হচ্ছে কেন, শাহজাদা? তা গাধার গোবর খেতে কেমন স্বাদের? ভাল হজম হয়েছিল তো?

তিনজনের উচ্চকিত হাসির অট্টরোলে শাহজাদার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার কাছে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। দাঁত কড়মড় করে সে সিংহনাদ করতে চায়। কিন্তু ততক্ষণে পাখিরা অনেক দূরে।

পার হয়ে গেছে।

ক্রোধে সারা অঙ্গ জ্বলতে থাকে শাহজাদার। কিন্তু নিরুপায় হয়েই নিজের ঘরে বন্দী-জীবন কাটাতে হয় তাকে। অপেক্ষা করতে হয় ততদিন, যতদিন না তার গোঁফ, ভুরু, চুল গজিয়ে বাকী অর্ধেকের সমান হয়ে ওঠে।

আবার একদিন ফেরিওয়ালাকে ডেকে পাঠালো শাহজাদা।

—শোন ফেরিওয়ালা, আমি তোমার ছোটকন্যাকে শাদী করতে চাই। আশা করি তোমার অমত হবে না? তাকে দেখা অবধি আমি মহব্বতে মজে গেছি। আমার কথায় যদি সায় না দাও, তবে তোমার গর্দান যাবে, ফেরিওয়ালা—হুঁশিয়ার!

ফেরিওয়ালা বললো, এ তো খুবই আনন্দের কথা, তবে কি জানেন মালিক, মেয়ে বড় হয়েছে, তার তো মতামত বলে একটা কথা আছে। আপনি যদি আমাকে কিছু সময় দেন তবে তার মতামত জেনে আপনাকে জানাতে পারি, হুজুর।

শাহজাদা বলে, শুনে সুখী হলাম। একশোবার, তোমার মেয়ের মতামতই তো সব! ঠিক আছে আমি তোমাকে তিন দিনের সময় দিলাম। কিন্তু একটা কথা ইয়াদ রেখ, তোমার মেয়ে যদি রাজি না হয় তাহলে তুমিও বাঁচবে না, তোমার কন্যাও কোতল হবে।

বেচারা ফেরিওয়ালা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। জাইনাহকে কাছে ডেকে শাহজাদার বাসনার কথা বলে।

—তুই যদি অমত করিস মা, বাপ বেটি দুজনকেই সে কোতল করবে।

জাইনাহ খিল খিল করে হেসে ওঠে, তুমি কি ভীতু, বাবা। মন থেকে ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেল তো, দেখো, কিচ্ছু বিপদ হবে না আমাদের। এরকম শাদী তো তোমার মেয়ের পরম ভাগ্যেরই কথা, বাবা! আমি রাজি। তুমি তাকে কথা দিয়ে এস গে।

ফেরিওয়ালা শাহজাদাকে জানিয়ে এল তার কন্যার সম্মতি। শাহজাদা তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে নৃত্য করতে লাগলো।

বাবা প্রাসাদের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলে জাইনাহ বাজারের এক মিঠাইওলার দোকানে গিয়ে একটা চিনির পুতুল বানাবার বায়না দিয়ে এল। পুতুলটা হবে একটি সুন্দরী কিশোরীর মাপের। দেখতে হওয়া চাই অবিকল জাইনাহর মতো।

ময়রা বললো, আমার নিজের হাতের কাজের প্রশংসা নিজে করবো না, মালকিন। তবে চিনির পুতুলটা যখন আপনার পাশে দাঁড় করিয়ে দেব তখন আপনার জন্মদাতা বাবাও ঠিক চিনে নিতে পারবেন না কোনটি তার আসল মেয়ে।

পরদিন শাদীর রজনী। বাসর ঘরে বড় দুই বোন জাইনাহর চিনিনির্মিত প্রতিমূর্তিটাকে সোনার পালঙ্কে মখমলের শয্যায় সযত্নে শুইয়ে দিয়ে আবক্ষ চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। শাহজাদা বাসরঘরে এলে বড় দুই বোন বললো,

আমাদের ছোট বোনটির শরীর চিনির পুতুলের মতো। সারাদিনের ধকল সইতে না পেরে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শাহজাদা নিজগুণে তার গুস্তাকী মাফ করবেন।

এই বলে তারা দুইবোন ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। শাহাজাদার সুপ্ত ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। কোটিবন্ধ থেকে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বসিয়ে দিল সে চিনির পুতুলের গলার ওপর। মুহূর্তে মুণ্ডুটা ছিটকে গিয়ে পড়লো মেঝেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, এতো জাইনাহর মুণ্ড নয়!

চিনির মন্ডুটা মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে ততক্ষণে।

শাহজাদা আর একবার বুদ্ধু বনলো জাইনাহর কাছে। রাগে ক্ষোভে সে দিশাহারা হয়ে নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজেকেই শেষ করে দিতে উদ্যত হলো।

কিন্তু সেই মুহূর্তে—পর্দার আড়াল থেকে পিছনে ছুটে এসে শাহজাদার হাতের তরবারি চেপে ধরে জাইনাহ, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমাকে। মারতে হয় আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু দোহাই তোমার, নিজে আত্মঘাতী হয়ো না। তা হলে সে পাপ আমি রাখতে পারবো না!

আবার চমক লাগলো শাহজাদার। নতুন করে জানলো জাইনাহকে। এ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মেয়ে। সব ক্রোধ, সব ক্ষোভ মুহূর্তে উবে গেল কোথায়। তলোয়ার ফেলে দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো জাইনাহকে বুকের মধ্যে।

এইবার বুঝি দুটি হৃদয়ে নতুন করে ভালোবাসার জন্ম হলো।

এক সময়ে দামাসকাস শহরে এক পরম রূপবান নওজোয়ান সওদাগর সারা শহরের তাবৎ কুলকন্যা বিবিবেগমদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল। দোকান খুলে বসা মাত্র নানা কারণে অকারণে সওদা করার ছল-ছুতোয় কুমারী তরুণী বিবাহিতা বিবি বাঁদীরা এসে ভীড় জমাতে থাকতো।

এমনি একদিন সকালে সে দোকান খুলে বসেছে, এমন সময় এক রমণী এসে প্রবেশ করলো। উদ্দেশ্য কিছু কেনা-কাটা করা।

যথাবিহিত সৌজন্য স্বাগত জানিয়ে সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসতে দিল।

মেহেরবানী করে আদেশ করুন, বান্দা আপনার কি কাজে লাগতে পারে।

মেয়েটি কেমন চঞ্চল বিহ্বল হয়ে বললো, না না, তেমন বিশেষ কিছু না। এই নিন টাকার তোড়া, আজকের মতো যাহোক কিছু একটা দিন, আসল সওদা

করতে কাল আসবো আমি। আশা করি আমাকে খুশি করতে পারবেন।

এই বলে সে তাড়াহুড়ো করে দু একটা তুচ্ছ জিনিসপত্র টেনে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন আবার ঠিক একই সময়ে দোকানে এসে দাঁড়ালো। এবার সে একা নয়। সংগে একটি খুব অল্পবয়সী ডাগর ডাসা মেয়ে. পরমাসুন্দরীই বলা যায়। সওদাগর যুবকের চোখ এই ষোড়শীর দিকেই নিবদ্ধ হয়ে রইলো। আগের দিনের খন্দের তার সঙ্গিনীর দিকে সে ফিরেই তাকালো না আর।

একটুক্ষণ পরে বয়স্কা রমণী সওদাগর যুবকের কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, তোমার কি একে পছন্দ? বল, কোনও সংকোচ নাই। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, এ আমার নিজের মেয়ে।

সওদাগর যুবক কৃতার্থ হয়ে বলে, সবই আপনার হাতে বিবিসাহেবা। আমি আপনার কন্যাকে দেখামাত্র আসক্ত হয়ে পড়েছি। এখন আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তবেই আমার দেহমন তৃপ্ত হতে পারে। তবে এও ঠিক আপনার কন্যার যা রূপ তাতে আমার সংগে ঠিক মানায় না। আর তা ছাড়া ওর যোগ্য দেনমোহরই কি দিতে পারবো?

বিবিসাহেবা বললো, না না, সে জন্য তোমার চিন্তা করার কোনও কারণ নাই। ও আমার মেয়ে, আমি যা বলবো তাই হবে। দেনমোহর? সেজন্য কিচ্ছু আটকাবে না। টাকা-পয়সার দিকে থাই নাই আমাদের। তোমার যা খুশি তাই দিয়ে ওকে ঘরে তুলে নাও, বাবা। তাও যদি তোমার সাধ্যে না কুলায়, বল, আমি শাদীর সব খরচা তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। শুধু আমি দেখতে চাই, আমার আত্মজা তোমার ঘরে গিয়ে সুখের নীড় খুঁজে পেয়েছে। আল্লার কুদরতে আমার অঢেল আছে। তবে এও ঠিক, শুধু অর্থ দিয়েই সব পাওয়া যায় না। সুখ অন্য বস্তু, শান্তি আরও দুর্লভ এবং মহব্বত শুধুমাত্র ভাগ্যবান পুণ্যাত্মারা লাভ করে। তোমাকে দেখা মাত্র আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, বাবা। ভেবেছি, তোমার কাছে থাকলে আমার মেয়েটি সুখে শান্তিতে ভালোবাসায় দিন গুজরান করতে পারবে।

সওদাগর যুবক বললো, ঠিক আছে, আমি রাজি।

এই সময় রজনী প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো নব্বইতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

তখুনি ঠিক হয়ে গেল কোনও রকম জাঁকজমক না করে খুব শিগ্গিরই এক শুভলগ্নে শাদীপর্ব সমাধা হয়ে যাবে।

যথানির্দিষ্ট তারিখে কাজী এসে শাদীনামা তৈরি করে দিয়ে গেল। মা কন্যার হাত ধরে পাত্রের বাসরঘরে পেঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তোমাদের জীবন সুখের হোক, বেটা।

সে দিন দামাসকাস শহরের এক নিভৃত কক্ষে দুই তরুণ-তরুণী কপোত-কপোতীর মতো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে বাসররাত্রি অতিবাহিত করলো।

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করে সওদাগর যুবক যথাসময়ে দোকানে চলে গেল। সারাদিন কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখলো, তার সদ্য-পরিণীতা বিবি পর্দার আড়ালে অন্য এক তরুণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে প্রেমালাপ করছে।

নিমেষে সারা দুনিয়া আঁধার হয়ে এল তার চোখের সামনে। তড়িতাহতের মতো ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

দরজার সামনে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হলো। জামাইকে উদ্ভ্রান্ত দেখে সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, কি হয়েছে, বাবা?

—কী হয়েছে? ঘরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখুন—

ক্রোধে ফেটে পড়তে চায় সওদাগর।

শাশুড়ী খুব শান্ত সহজ গলায় বলে, ও তুমি ঐ ছেলেটির কথা বলছো? যে ছেলেটি তোমার বিবির পাশে শুয়ে আছে? তা বাবা, কী করবে বল, শাদী তো বিনা দেনমোহরে সমাধা হয়েছে। কিন্তু সুন্দরী বিবিকে ষোলআনা পেতে গেলে কি মুফতে হয়? তার চেয়ে বরং দুজনে ভাগাভাগি করে নাও ওকে। কী, আমি খারাপ বললাম কিছু?

এ কথার জবাব দেবে কি সে। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তিন তালাক উচ্চারণ করে বললো, আমি ওকে বয়ান তালাক দিলাম। অমন বিবিতে আমার দরকার নাই।

বাইরে দারুণ বাকবিতণ্ডা শুনে ততক্ষণে মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে দোরগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যেই সে তার স্বামীর মুখ থেকে বয়ান তালাক শুনলো অমনি বোরখার নাকাব দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। কারণ এখন আর সে তার স্বামী নয়, পরপুরুষ মাত্র।

পলকের মধ্যেই ঘটে গেল এই সব ব্যাপার। কিন্তু সওদাগর যুবক হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো, তার বিবির পাশে আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে! তার অঙ্গের সাজপোশাক বিলকুল এক নওজোয়ান যুবকের মতো!

সওদাগর হতবুদ্ধি নির্বোধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বয়স্কা রমণী হাসতে হাসতে বললো, তোমাকে বোকা বানিয়ে তিন তালাক করিয়ে নেবার জন্য আমি দুঃখিত, বাবা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

সওদাগর তরুণ আরও অবাক হয়ে বলে, মানে?

—মানে আর কিছু নয়, আমার এই মেয়েটির কয়েকদিন আগে একটি যোগ্য খানদানী পাত্রের সঙ্গে যথাবিহিত জাঁকজমক করেই শাদী হয়েছিল। কিন্তু এমনই নসীব, শাদীর পরদিনই ঠিক একই ভাবে সেও ভুল বুঝে তাকে বয়ান তালাক দেয়। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। এর একমাত্র কারণ আমার এই ছোট কন্যা। ওরা দুজনে পিঠোপিঠি

বোন। কিন্তু ছোটটির শখ সব সময় ছেলে সেজে থাকা। আজকের মতো সে দিনও সে তার বোনের পাশে শুয়েছিল ছোকরা সেজে। তার স্বামী দেখা মাত্র ক্রোধে অন্ধ হয়ে সংগে সংগে বয়ান তালাক দিয়ে দেয়। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে কি তার কান্নাকাটি। কিন্তু হাদিসের বিধান কী করে অগ্রাহ্য করা সম্ভব। তাই তোমাকে একটি রাতের জন্য বর সাজতে হয়েছিল বাবা।

সওদাগরের মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে, বর নয়, বর্বর বলুন।

এই বলে সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে। ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়লো।

এরপর শাহরাজাদ আর একটি কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এক সময়ে বাগদাদ শহরে দুটি প্রায় সমবয়সী তরুণ-তরুণী গভীর প্রেমে দিন কাটাচ্ছিল। সম্পর্কে তারা খুড়তুতো ভাইবোন। তাদের মা বাবারও খুব ইচ্ছে ওদের দুটির শাদী হোক। ওরা হেসে খেলে এক সংগে মানুষ হচ্ছে ছোট থেকে। ওদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব সাব। শাদী দিলে সুখেই থাকবে ওরা।

এইভাবে আরও বছরখানেক কেটে গেল। ইতিমধ্যে সময়ের ফেরে ছেলেটির বাবা ব্যবসায় সর্বস্ব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লো। মেয়ের বাবা মেয়ের শাদীর জন্য পয়সাওলা পাত্রের সন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে ভুলে গেল তার জবানের কথা।

অবশেষে বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ সওদাগরের সংগে পাকাও হয়ে গেল শাদীর কথা। কিন্তু কন্যা হাবিবা তার প্রিয় হাবিবের সংগে একবার শেষ বারের মত দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রিয়তমের বিরহে দুনয়নে অবিরত অশ্রু ঝরতে থাকলো তার। নিভৃত কক্ষের বন্দীশালায় সে তার দয়িতের উদ্দেশে আকুতি জানাতে লাগলো, তুমি তো জান, হাবিব, জন্মাবধি তোমাকে বই অন্য কাউকে আমি ভাবতে শিখিনি। আমার বাবা মাও তোমার হাতেই তুলে দেবেন, কথা ছিল। কিন্তু আজ তারা সে-সব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অন্য এক অজানা পাত্রের সংগে আমাকে শাদী দিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। ওরা যাই করুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সোনা। জীবনে মরণে আমি তোমারই।

হাবিবার আকুল আহ্বান বুঝি শুনতে পেয়েছিল হাবিব। শাদীর আগের দিন সে গোপনে হাবিবার সংগে দেখা করলো। তার অন্তরের বাসনা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লো হাবিব। কিন্তু এই মুহূর্তে কীই বা উপায়। হাবিবাকে সে বললো, শাদী যেমন ঠিক হয়েছে হয়ে যাক। তারপর আমি তোমার স্বামীর

ঘরে গিয়ে দেখা করবো। তারপর কি করে আমরা আবার মিলিত হতে পারি তার ফিকির করবো।

শাদীর রাতে বাসরঘরে ঢুকে বৃদ্ধ সওদাগর দেখলো তার সদ্য শাদী করা বিবি হাপুস নয়নে কাঁদছে।

আহা বেচারী লাজুক মেয়ে। মা বাবাকে ছেড়ে এসে মন খারাপ করছে বোধহয়। তাই কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, এরকম হয়, দুদিনেই সব সয়ে যাবে। তখন স্বামী ছেড়ে বাপের ঘরে যেতে চাইবে না আর। আদর আর ভালবাসার মলম দিলে সব আপসে মোলায়েম হয়ে আসবে।

একি নয়নতারা কেঁদে কেঁদে তোমার সুন্দর ডাগর ঐ চোখ দুটো যে ফুলিয়ে ফেলেছ! ছিঃ কাঁদে না মণি! দুঃখের কি আছে। এই তো তোমার ঘর, আসল জায়গা। এখানেই তো তোমাকে থাকতে হবে চিরকাল, আপন করে নিতে হবে সব। দেখবে কত ভাল লাগবে তোমার। আর আমি? আমি কি তোমার ভালবাসার পাত্র হবো না? বাজি রেখে বলতে পারি, বিবিজান, এমন দিন খুব শিগ্গিরই আসবে, এক দন্ড তুমি আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইবে না।

সওদাগরের কথা শুনে আরও উচ্চৈস্বরে কেঁদে ওঠে হাবিবা! বৃদ্ধ বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে তাকে, তুমি যদি চাও তোমার মা বাবার সঙ্গে দেখা করবে, এখুনি আমি তাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, চল।

হাবিবা মাথা নেড়ে বলে, না না সেজন্য নয়।

— তবে? তবে তোমার ভাইবোন কারও জন্য মন খারাপ করছে?

হাবিবা আবার মাথা নেড়ে বলে, না সে জন্যও নয়।

বৃদ্ধ সওদাগর আবার বলে, তা হলে কি তোমাদের বাড়ির কোনও পোষা পাখি বা কোনও জন্তু জানোয়ারের জন্য মন খারাপ করছে?

হাবিবা এবারও আগের মতো মাথা নেড়ে বলে, না ওসব কিছুর জন্যে নয়।

তবে কিসের জন্য? এই ঘর সংসার নতুন বলে তোমার মন বসতে চাইছে না? না আমি বুড়ো হাবড়া বলে তোমার মন বিরূপ হয়েছে। তা আগে কেন তোমার মা বাবার কাছে বল নি মণি, আমি জানতে পারলে তোমাকে কি জোর করে শাদী করতাম!

হাবিবা বিচলিত হয়ে বলে, দোহাই আল্লাহ, সে জন্যে নয়। আপনার মতো সদাশয় স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

—তা হলে কি কারণে কাঁদছো, সোনা? আমাকে খুলে বল, আমার কাছে সংকোচ করার কোনও কারণ নাই তোমার। এটুকু বিশ্বাস কর কোনও কারণেই আমি তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না।

হাবিবা কুণ্ঠিত হয়, সে কথা আপনাকে বলতে পারবো না আমি। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন।

—খোদা কসম, তোমার কোনও কথাতে বিন্দুমাত্র রুষ্ট হবো না আমি। বরং যদি প্রাণ খুলে বল, তার একটা সহজ সমাধান করে দিতে পারবো।

হাবিবা ভরসা পেয়ে বলতে থাকে, আমার চাচার ছেলে হাবিবের সঙ্গে ছোট

থেকে হেসে খেলে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি আমি। আমাদের দুজনেরই মা বাবারও ইচ্ছে ছিল দুজনের শাদী হবে। কিন্তু নসীবের ফেরে হাবিব আজ বড় গরীব হয়ে গেছে। তাই আমার মা বাবা আর তাদের ওয়াদা পূরণ করলেন না। আপনার সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলেন আমার। এখন আপনিই বলুন, এতটা বয়স পর্যন্ত যাকে ধ্যান জ্ঞান করে এসেছি স্বামী হিসেবে পাবো বলে, তাকে যদি হারাতে হয় তা হলে কেমন লাগে ? হাবিব ছাড়া আমার জীবনে দ্বিতীয় কোনও পুরুষ আমি কল্পনাও করিনি।

হাবিবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল বৃদ্ধ। তারপর বললো এসব কথা তো আমার জানা ছিল না হাবিবা। যাই হোক, আমি জীবনে কখনও কোনও অধর্ম করিনি। আজ তোমাকে শাদী করে ঘরে এনেছি বলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এখানে কয়েদ করে রাখবো না। তাতে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না।

একটু থেমে আবার সে বললো, আজ থেকে তুমি আমার আর বিবি নও, হাবিবা। এখন থেকে তোমাকে আমি নিজের কন্যা বলে গ্রহণ করলাম। আমি অপুত্রক। আমার মৃত্যুর পর আমার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির একমাত্র তুমিই মালিক হবে। যদিও শাদী করেছি তবু তুমি অপাপবিদ্ধ; আমি তোমাকে স্পর্শ করিনি। আমার ইচ্ছা এই রাত ভোর হবার আগেই সকলের অলক্ষ্যে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে তোমার প্রিয়তমের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে। তোমাদের মিলনেই প্রকৃত ধর্মরক্ষা হবে আমার।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। পরদিন প্রত্যুষে হাবিবা বৃদ্ধ সওদাগরের ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে।

হাবিব শোকে দুঃখে কেঁদে কেঁদে নিজেকে শেষ করতে উদ্যত হয়েছিল। হাবিবাকে ফিরে পেয়ে আবার সে নতুন করে বাঁচার আশায় আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

এর পর শাহরাজাদ আর একটা গল্প বলতে শুরু করে:

এক সময়ে কাইরো শহরে এক সুদর্শন মেধাবী যুবক জন্মেছিল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তথাকার এক পুলিশ বাহিনীর সর্দারের বিবি তাকে ভালবাসা করে রেখেছিল। এই পুলিশ সর্দারের বীর্য এবং বিক্রম ছিল অনন্যসাধারণ। তার পৌরুষ দেখে কাইরোর বিবি বেগমরা পাগল হয়ে উঠতো। কিন্তু সর্দারের নষ্টচরিত্রা বিবি এ হেন স্বামীসঙ্গ পেয়েও তৃপ্ত ছিল না। উঠতি বয়সের জোয়ান ছেলে দেখলেই সে খলখল করে উঠতো। এবং যেন তেন প্রকারে তাকে

শয্যাসঙ্গী করে নিত।

একদিন পুলিশ সর্দার গুজবাসি তার বিবিকে বললো, শোনও আজ আমরা কয় ইয়ার দোস্ত মিলে এক বাগানবাড়িতে বনভোজন করতে যাচ্ছি, ফিরতে কিছু রাত হতে পারে, সাবধানে থেক। যদি বিশেষ কোনও কারণে আমাকে তোমার প্রয়োজন হয় তবে চাকরটাকে বলো। সে জানে আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে খবর দেবে।

গুজবাসি-বিবি এক গাল হাসি ছড়িয়ে বললো, তুমি যাচ্ছ ফূর্তি করতে, ঘরের ভাবনা মাথায় রেখ না, আমি তোমাকে কোনও কারণেই বিরক্ত করবো না, তাতে তোমার আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে তুমি যদি খানিকটা আমোদ আহ্লাদই কর সে তো আমারই করা হবে।

বিবির সোহাগে গদগদ হয়ে গুজবাসি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবং প্রায় তক্ষুণি ভ্রষ্টা রমণীটি বাচ্চা নফরটাকে বললো, যা, ছুটে যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয় শিগ্গির। উফ্ ঐ বুনো শুয়োরটার হাত থেকে একটা বেলাও অন্তত নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে।

খুদে খোজা নফরটা মালকিনের বাধ্য ছিল। হুকুম পাওয়া মাত্র সে ছুটলো ছেলেটির বাড়িতে। কিন্তু সেখানে তাকে পেল না সে। চাকরটা কিন্তু দমলো না। শহরের সম্ভাব্য জায়গাগুলো তল্লাশ করে করে ফিরতে লাগলো। অবশেষে তার দেখা পেল সে এক নাপিতের দোকানে।

যুবক তখন মাথাটা বাড়িয়ে দিয়েছে নাপিতের ক্ষুরের নিচে। চাকরটাকে দেখেই তার সারা শরীরে এক শিহরণ খেলে যায়। সে বুঝতে পারে সংবাদ শুভ।

—আপনি আর দেরি করবেন না সাহেব, বাড়ি খালি। মালকিন আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন।

চাকরটা কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো। যুবক অধীর হয়ে নাপিতকে বললো, আজ থাক শেখ, এখন আমাকে যেতে হবে।

নাপিত বলে, কিন্তু এ যে আধা খ্যাচড়া হয়ে রইলো!

যুবক বলে, তা থাক, কাল আসবো—কাল বেশ মিল করে দিও। আজ আর দেরি করতে পারবো না, এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে।

এই বলে সে গোটা একটা দিরহাম গুঁজে দিল নাপিতের হাতে। তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নফরটাকে সঙ্গে নিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

না কামিয়েই গোটা একটা দিরহাম পেয়ে নাপিত-এর চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। ওরে বাস্, এ কোন আমির বাদশাজাদা এসেছিল তার দোকানে। এমন মক্কেলকে তো হাতছাড়া করা চলে না। খদ্দেরটাকে খুশি রাখতে পারলে অনেক ইনাম মিলতে পারে।

সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে নাপিতটা দোকান ফেলে যুবকের পিছু ধাওয়া করলো। উদ্দেশ্য তার বাড়িটা চিনে আসা। সময় মতো তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। খদ্দেরটা বাঁধা হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে যুবকটি গুজবাসির বাড়িতে এসে পৌঁছল। কড়া

নাড়তেই দরজা খুলে গুলজবাসি-বিবি আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার হাত ধরে ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলো।

কেউ দেখে ফেলতে পারে এই ভেবে যুবকটি কিছুটা বিব্রত হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই ঐ নাপিতটাকে রাস্তার ওপারে দণ্ডায়মান দেখে তাজ্জব হয়ে গেল! এখানে সে এল কী করে? কেনই বা এল?

নাপিতটা কিন্তু হাত তুলে তাকে আদাব জানালো, খুদা হাফেজ, গরীবকে ইয়াদ রাখবেন মালিক। আমার দোকানে যাবেন আমি আপনাকে শাহজাদার মতো কামিয়ে দেব।

—নিশ্চয়ই যাবো। কালই যাবো। তোমার হাতের কাজ তো সারা শহরের লোক প্রশংসা করে। নিশ্চয়ই যাবো। তোমার দোকান ছাড়া আমি আর অন্য কোথাও কামাবোই না শেখ।

নাপিত বলে, পণ্ডিত ব্যক্তিবলে গেছেন, 'যে জায়গাটা তোমার মনের মতো হয়েছে সেটা ফেলে অন্য একটার ধান্দায় বেরিও না।' আশা করি আপনি আমার দোকানটা চিনতে ভুল করবেন না।

যুবক তখন কাম-যন্ত্রণায় কাতর, কোনও রকমে নাপিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। গলা চড়িয়ে বলে, তোমার দোকান তো আমার নখদর্পণে। আঁধার রাতেও চলে যেতে পারি। যাক, এবার তুমি এস, কেমন?

নাপিতের মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

দোকানে ফিরে না এসে নাপিতটা ঐখানেই বসে পড়লো। এমন আমিরি খদ্দের কি হাত ছাড়া করতে পারে সে! আমার দোকানে ঢুকবে বলে হঠাৎ যদি আর কোনও নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ে? তবে কি সে বানচোৎ ওকে ছেড়ে দেবে আর?

গুলজবাসি যথাসময়েই বাগানবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। তার বন্ধু তাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বললো, এমন দিনে তোমাকে ডাকলাম—একটু আমোদ-প্রমোদ করতে পারলাম না, দোস্ত। কিছুক্ষণ আগে আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর কবরের কাজে যেতে হবে আমাকে, তোমাকে তখলিফ দিলাম বলে অত্যন্ত দুঃখিত।

গুলজবাসি, এ তুমি কি বলছ ইয়ার, ফুর্তির দিন তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। মায়ের শেষ কাজটাই এখন সবচেয়ে বড়। যাও, সব যাতে নিখুঁতভাবে সমাধা হয় তার ব্যবস্থা কর তো। তোমার বৃদ্ধ মা-এর আত্মার শান্তি হোক, ভাই! আচ্ছা এবার তা হলে আমি ঘরে চলি—

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তিরানব্বইতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

বাড়ির সামনে এসে গুলজবাসি দেখলো একটা নাপিত জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আছে তার ঘরের জানলার দিকে।

—এ্যাই কুত্তা কা বাচ্চা অমন হাঁ করে কী দেখছিস ওদিকে।

গুজবাসিকে দেখে নাপিতটা আভূমি আনত হয়ে সালাম ঠুকে।

—সালাম হুজুর, সালাম বড় সাহেব—সালাম—সালাম।

—থাক থাক অত ভণ্ডামীতে দরকার নাই। এখন সাফ সাফ বলু, এখন এখানে আমার বাড়ির জানলার দিকে কেন তাকিয়ে আছিস? বেয়াদপ বাঁদর কাঁহিকা—এক গোত্তায় তোর কাল্লা ফাটিয়ে দেব, শয়তান—

নাপিত করজোড়ে কাকুতি করে, অপরাধ নেবেন না হুজুর, নেহাতই আমার রুটির ব্যাপার। তা না হলে এখানে কেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

—রুটির ব্যাপার মানে? এখানে তোকে খাওয়াবে কে?

—জী আমার এক শাঁসালো মক্কেলকে চোখে চোখে রাখছি। যা ছুল্লুপনা চলছে আমাদের কারবারে হুজুর। এর খদ্দের ও ভাগাচ্ছে, ওর খদ্দেরকে আর একজন টানাটানি করছে। তাই এমন আমিরি মক্কেলকে আমি চোখের আড়াল করতে পারি না, বড় সাহেব।

এবার গুজবাসি সাহেব ক্রোধে ফেটে পড়ে, উজবুকের মতো কী সব বলছিস? তোর শাঁসালো মক্কেলের খোঁজে আমার বাড়ির জানলায় ওৎ পেতেছিস কেন?

— জী উনি তো অন্দরেই আছেন—

—চোপরাও বতমিজ বদমাস। মুখ সামলে কথা বল, দাঁত খুলে নেব তোর।

দোহাই হুজুর, অমন করে ধমকাবেন না, আমার পিলে চমকে যাচ্ছে। আপনার বিশ্বাস না হয় ভিতরে ঢুকে নিজের চোখেই যাচাই করে দেখুন, আমি ঝুট বলছি কিনা। আপনি পুলিশের বড় সাহেব, আপনার সঙ্গে চালাকি করে আমি কি জানে বাঁচবো। আপনি কি আমাকে এমনই বুড়বাক ভাবলেন হুজুর। ভিতরে গেলে দেখতে পাবেন এক খুবসুরৎ নওজোয়ান একেবারে আমির বাদশাহর ছেলের মতো।

গুজবাসি নাপিতটার ঘাড় মটকে ধরেছিল, ঘুসি চালাবে বলে। কিন্তু না মেরে ছেড়ে দিয়ে দরজায় গিয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলো।

গুজবাসি আর নাপিতের মধ্যে যখন কথা চালাচালি চলছিল তখন জানলার ফুটোয় চোখ রেখে সবই প্রত্যক্ষ করেছিল বৌটা। বিপদ আসন্ন দেখে সে চটপট যুবকটিকে পায়খানার সানকীর মধ্যে বসিয়ে শিকল তুলে লুকিয়ে রাখলো।

একটু পরে স্বামীর করাঘাতে দরজা খুলে অবাক হওয়ার ভান করে বললো, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, তবিয়ৎ ঠিক আছে তো?

গুজবাসি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আমার শরীর ভালই আছে। তোমার হাল কি রকম? অন্দরে কি অন্য কোনও লোক আছে?

এই কথা শোনামাত্র ছলনাময়ী দু কানে আঙগুল দিয়ে বলে, তোবা তোবা, একি বেসরমকা বাত। একি তোমার বিবির ইজ্জতের কথা হলো। তুমি কি এই সাতসকালে নেশাভাঙ্গ করে বেহেড হয়ে গেছ নাকি?

গুজবাসি কিন্তু সে কথার জবার না দিয়ে গটগট করে অন্দরে ঢুকে গেল। এ ঘর ওঘর এদিক ওদিক কি যেন তলাশ করলো। কিন্তু অভিনব কিছুই ; নতুন কোনও মানুষকেই দেখতে না পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। পর-মুহূর্তেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেল বাইরে। শয়তান নাপিতটাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—ওরে ছুঁচো বেল্লিক, একটা খানদানের ওপর ঐ রকম নোংরা কথা বললি কি করে তুই? তোকে আমি আজ জ্যান্ত কবর দিয়ে দেব।

গুজবাসি নাপিতটার টুঁটি চেপে ধরে। লোকটা ঢোক গিলে বলে, কিন্তু বড সাহেব, খোদা কসম, আমি মিথ্যে বলিনি। নিজের চোখে দেখেছি আমার, এক সুপুরুষ নওজোয়ান খদ্দের এই দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে। তারপর আমি একভাবে এই দিকে তাকিয়ে আছি। দরজাও খোলেনি, সেও বেরোয় নি। জানি না আপনার বাড়ির অন্য কোন খিড়কী দরজা আছে কি না।

বেসক্ নাই। দরজা এই একটাই। বুঝতে পারছি, তুই আমার সঙ্গে দিল্লাগী করছিস। কিন্তু আমাকে তুই চিনতে পারিস নি। এর পরিণাম অনিবার্য মৃত্যু। তা থেকে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তোকে জানে মারার আগে আর একবার ভাল করে খানাতল্লাসি করে দেখতে হবে। আমার বিচারে কোনও ভুল রাখবো না আমি। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চল।

প্রায় ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই নাপিতকে বাড়ির ভিতর ঢোকালো গুজবাসি। বাড়িটার আদ্যপান্ত খানাতল্লাসি করে দেখতে থাকলো। এক এক করে সব ঘরদোর আঙিনা বারান্দা তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু অন্য কোনও পুরুষের সন্ধান মিললো না। গুজবাসির চোয়াল কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে আসে চোখ। নাপিত বুঝতে পারে, এখনই গর্জে উঠবে গুজবাসি! কিন্তু নাপিত নিশ্চিত তার মক্কেল এই বাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে।

—সবই দেখা হয়েছে বড়সাহেব, কিন্তু পায়খানার সানকীটা পরীক্ষা করা হলো না!

বৌটা দেখলো বিপদ ঘনায়মান। পাশের ঘর থেকে সে মারমুখী হয়ে তেড়ে এল, তুমি কি গো, একটা বেজন্মা বজ্জাত তখন থেকে তোমার খানদানে চুনকালি মাখাবার চেষ্টা করছে আর হাবার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই তুমি হজম করে যাচ্ছ। তোমার শরীরের খুন কী টগবগ করে উঠছে না ওর যাচ্ছেতাই নোংরা কথাগুলো শুনে। লোকটাকে তুলে একটা আছাড় দিতে পারছো না? তুমি পুলিশের বড় সাহেব? ছোঃ।

গুজবাসি ঘাড় নেড়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, বিবিজান। লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার, নাঃ, আর সহ্য করা যায় না এসব।

শোন রে খানকির বাচ্চা, তোর জন্যই আজ আমার খানদানে বদনাম হলো।

আমার সতীসাধ্বী বিবির চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছিস, আমি তোকে রেয়াৎ করবো না কিছুতেই।

বৌটা রসুইঘরে গিয়ে একখানা ছুরি উনুনে পুড়িয়ে কাছে নিয়ে এল। গুজবাসি নাপিতটাকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেই ছুরি দিয়ে ওর বিচি দুটো কুচ করে কেটে নিল।

লোকটা ত্রাহিত্রাহি ডাক ছেড়ে ককিয়ে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে যথাকর্তব্য সমাধা হয়ে গেছে। নাপিতটার অর্ধঃ অচৈতন্য দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে রাস্তার একপাশে ফেলে দিয়ে এল গুজবাসি।

এরপর হয়তো কোনও পথচারী দয়াপরবশ হয়ে ওকে ওর দোকানে পৌঁছে দিয়েছিল একসময়।

এদিকে গুজবাসি দপ্তরে চলে গেলে বৌটা তার নাগরকে সানকী থেকে বের করে বাড়ির বাইরে পার করে দিয়েছিল সুযোগ বুঝে।

একদিন এক সুলতান তার দোতলার খোলা ছাদের উপর বসে মুক্তবায়ু সেবন করছিলেন। উপরে নীল আকাশ। সামনে বাগিচা—সহস্র ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ অন্য বাড়ির ছাদের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান এক আলোক-সামান্যা সুন্দরীকে দেখতে পেয়ে সুলতান অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন রূপসী নারী ইতিপূর্বে তিনি কখনও দেখেন নি। আশে পাশের তাঁবেদারদের জিজ্ঞেস করলেন সুলতান, ও বাড়িটা কার হে?

জী হুজুর, আপনার দাসানুদাস নফর ফিরুজের। আর ঐ রমণীটি ওর বিবি।

সুলতান টলতে টলতে নিচে নেমে গেলেন। যেন এক মদমত্ত মাতাল। ফিরুজকে ডেকে বললেন, তোমাকে আজই এক্ষুণি আমার খৎ নিয়ে পাশের কয়েকটা দেশে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও।

ফিরুজ তৎক্ষণাৎ কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, বান্দা প্রস্তুত, জাঁহাপনা।

চিঠিপত্র বুঝে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল ফিরুজ। সে রাতটা সে বিবিকে নিয়েই ঘুমালো। তারপর পরদিন খুব সকালে উঠে বিদেশ রওনা হয়ে গেল।

ফিরুজ চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই সুলতান ছদ্মবেশ ধারণ করে ফিরুজের দরজায় এসে করাঘাত করলেন।

—কে?

অন্দর থেকে ফিরুজের বিবির প্রশ্ন আসে। সুলতান জবাব দেন, দরজা খোল। আমি তোমার স্বামীর মনিব।

দরজা খুলে দেয় ফিরুজ বিবি। সুলতান ঘরে ঢুকে একখানা কুর্শিতে বসলেন।

—আমি বেড়াতে এলাম তোমাদের বাড়িতে।

সুলতানের কথায় ফিরুজ বিবি প্রসন্ন হতে পারে না। বলে, আমার স্বামীর অবর্তমানে আপনার এই আগমনে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমার আশঙ্কা এর দ্বারা কোনও শুভ হতে পারে না।

সুলতান আকুল হয়ে বলে, তুমি বুঝতে পারছ না কেন সুন্দরী, আমি তোমার স্বামীর মনিব, তোমাদের অন্নদাতা! মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে আন্দাজ করতে পারছো না বোধহয়!

মেয়েটি কিন্তু এবার কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, না হুজুর, আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনতে পেরেছি। সেদিকে আমার একবিন্দু ভুল হয়নি। কিন্তু কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কেন আপনি এসেছেন আমার ঘরে? কী আপনার অভিপ্রায়? জাঁহাপনা, আপনি ঝরনার এঁটো পানি গণ্ডুষ ভরে পান করতে অভিলাষী?

সুলতান হতবাক হয়ে গেলেন ফিরুজবিবির কথায়। আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। যেমন এসেছিলেন তেমনই ক্ষিপ্রবেগে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের জুতোজোড়াও পরে নিতে ভুল হয়ে গেল তাঁর।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ ফিরুজের খেয়াল হলো রাত্রে শোবার সময় সুলতানের চিঠিপত্রগুলো সব বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিল, তাড়াহুড়ো করে বেরুবার সময় সেগুলো সঙ্গে নিতে সে ভুলে গেছে।

সুতরাং আবার তাকে ফিরতে হলো।

বিদেশযাত্রার ইনাম স্বরূপ একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন সুলতান। ফেরার পথে বাজার থেকে ঐ মুদ্রায় একটি সুন্দর জড়োয়া হার কিনে নিল সে বিবির জন্য। গহনাটা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। বিবির গলায় পরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সে আহ্লাদে ঢলে পড়বে তার বুকে।

এই রকম নানা সুখচিত্র আঁকতে আঁকতে সে একসময় বাড়িতে ফিরে এল। বিবির গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে বললো, ওহো, বেহেস্তের পরীর মতো লাগছে তোমাকে বিবিজান। কিন্তু এমন দামী গহনা আর তোমাকে এ বাড়িতে একা রেখে বিদেশ যেতে আমার সাহস হচ্ছে না গো। তুমি এক কাজ কর, আমি যদ্দিন না ফিরি তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাক। সরকারী কাজ, ফিরতে কত দেরি হবে কে জানে। অতদিন তুমি এ বাড়িতে একা থাক, আমি চাই না। চারদিকে লোভী কুকুরের দল ঘুরঘুর করছে।

ফিরুজ বিবি বলে, তা মন্দ বলনি। বাবাকে অনেক কাল দেখিনি। এই সুযোগে তার কাছে কদিন বেড়িয়ে আসা যাবে।

যাবার পথে ফিরুজ বিবিকে তার বাবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিদেশ রওনা

হয়ে গেল।

গোটা একটা মাস কেটে যায়। কিন্তু ফিরুজ ফিরে আসে না এবং কোনও খবর পাঠায় না।

অবশেষে ফিরুজের শ্যালক সন্ধান করতে করতে এক শহরে ভগ্নিপতির সন্ধান পেল। কিন্তু ফিরুজ তখনও ঘরে ফিরতে নারাজ দেখে সে জানতে চাইলো, আসল ব্যাপারটা কি বলতো, ভাইসাব। মনে হচ্ছে আমার বহিনের সঙ্গে তোমার যেন বনিবনাও-এর অভাব ঘটেছে? কেন, কী কারণে তোমার গোসা হয়েছে, আমাকে খুলে বলবে?

তবু তাকে নিরুত্তর দেখে আবার শ্যালক বললো, ঠিক আছে আমাকে বলতে না চাও বলো না। কিন্তু দেশে ফিরে চল, সুলতানের দরবারে পেশ কর তোমার আর্জি। তিনি ন্যায্য বিচার করে দিতে পারবেন।

ফিরুজ বলে, তোমাদের যদি অভিপ্রায় জাগে তোমরা এ নিয়ে সওয়াল করতে পার। কিন্তু আমি কোনও জবাব দিতে পারবো না।

এবার শ্যালকটি রাগে ফেটে পড়ে। ঠিক আছে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে যদি তোমার অহংকারে বাধে, আমি কোনও প্রশ্ন করবো না তোমাকে। কিন্তু কী কারণে আমার নিরীহ নিরপরাধ বোনটিকে পরিত্যাগ করবে, সুলতানের দরবারে তার জবাবদিহি তোমাকে করতেই হবে, ফিরুজ।

সুলতান সভা পারিষদ পরিবৃত হয়ে দরবারে বসেছিলেন। এমন সময় শালা ভগ্নীপতি হাজির হলো সেখানে। আভূমি অবনত হয়ে কুর্নিশ জানালো দু'জনে।

শ্যালকটি যখন জানালো, তার বোনের প্রতি অকারণে বিরূপ হয়েছে ফিরুজ, তার জন্য সে সওয়াল জবাব প্রার্থনা করছে, তখন সুলতান বললেন, দরবারে কাজী হাজির আছে, তোমাদের আর্জি তার কাছে পেশ কর।

তখন শ্যালকটি যুক্তকরে কাজীকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করলো। আপনি আমাদের পুণ্যাত্মা জাঁহাপনার ন্যায়াধিকার। অধীনের বিনীত নিবেদন এই ঃ

আমাদের এক সুন্দর ফুলবাগিচা ছিল। চারদিক ঘেরা, সুদৃঢ় সুরক্ষা ছিল। সযত্নে লালন করেছি তাকে। বহু বিচিত্রবর্ণের ফুলের সুবাসে সদাই ভরপুর হয়ে থাকতো। কিছুকাল আগে এই যুবকের হাতে সে বাগিচা রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু অতি অল্প কালের মধ্যেই ঐ বাগিচার সব ফুল আহরণ করে নিয়েছে এ। সব ফল ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। এখন তা বলতে গেলে, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়ে আছে। দেখে মনে হয় কোনও এক কালবৈশাখীর তান্ডবে সব যেন বিধ্বস্ত তছনছ হয়ে গেছে। এখন এই যুবক তার শর্ত ভেঙে ফেলে ঐ রিক্ত বাগিচা ফেরত দিতে উদ্যত হয়েছে। আমাদের দাবি ফেরত দাও আপত্তি নাই। কিন্তু যেমন কচিকাঁচা সুন্দর সবুজটি দিয়েছিলাম, ঠিক তেমনটি চাই।

কাজী জিজ্ঞেস করে, এবার তোমার কী বলার আছে যুবক?

ফিরুজ জবাব দেয়, আমি রাজি হুজুর। ফুলবাগিচাটি যে অবস্থায়

পেয়েছিলাম, তারও চেয়ে ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে দেব আমি।

কাজী প্রশ্ন করলো, তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কি তুমি স্বীকার কর?

—বিলকুল না, হুজুর। আমি ফিরে তাকে প্রশ্ন করতে চাই, কেনই বা সে ঐ বাগিচা ওয়াপশ নিতে চায়। আমি ঐ বাগিচায় প্রবেশ করতে এখন ভীত শঙ্কিত। কারণ একদা এক অসতর্ক মুহূর্তে এক প্রবল বিক্রম সিংহ সেখানে প্রবেশ করেছিল। আমার আশঙ্কা, আবার সে কখনও বা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি সামান্য হীনবল মানুষ, সিংহের থাবার সঙ্গে লড়বো কি করে? সেই কারণে নিজের অধিকার আঁকড়ে না থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওটা ফিরিয়ে দিতে চাই।

এই সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো চুরানব্বইতম রজনীতে
আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

এতক্ষণ সুলতান সবই শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ফিরুজ আমি তোমাকে ইসলামের নামে শপথ করে বলছি, তোমার বাগিচা নির্মল পবিত্র। আজ পর্যন্ত কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। অমন সুরক্ষিত সুরভিত ফুলবাগিচা আমার সারা সলতানিয়তে আর দুটি নাই। মনে কোনও সন্দেহ অবিশ্বাস পুষে রেখ না। ও বাগিচার ফুল ফল লতাপাতায় একমাত্র তোমারই অধিকার। অন্য কেউ শত চেষ্টা করেও তার একটি পাপড়ি ছিঁড়তে পারবে না। আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, নিঃশঙ্ক নির্ভয়ে তুমি তোমার বাগানের মালী হয়ে থাকতে পার।

সুলতানের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না ফিরুজের। খুশি মনে সে বিবির কাছে ফিরে যায়।

কিন্তু না কাজী, না উজির আমির কেউই আসল ঘটনা আঁচ করতে পেরেছিল। শুধু জেনেছিল সুলতান, ফিরুজ আর তার শ্যালক এই তিন ব্যক্তি মাত্র।

এ কাহিনীর এখানেই ইতি। কিন্তু শাহরাজাদ অন্য এক নতুন গল্প ফেঁদে বসলো!

আল্লাহর কি অপার লীলা, তিনি যেমনটি ইচ্ছা করেছেন তেমনটি বানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষকে। কিন্তু একটা কথা ভাবলে

অবাক হতে হয়, সিরিয়ার প্রতিটি নরনারীকেই তিনি নীচ প্রকৃতির হিংসুটে লোভী পরশ্রীকাতর এবং ভ্রষ্ট চরিত্রের করে সৃষ্টি করেছেন। সারা সিরিয়া ঢুঁড়লে একটি মানুষকেও পাওয়া ভার যে দোষের চেয়ে গুণে বেশি মহীয়ান।

কাইরোর অধিবাসীরা অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী এবং ধর্মপরায়ণ। আর ইরাকের তো তুলনাই নাই। তাদের মতো আদর্শ চরিত্রের মানুষ আর কোন্ দেশে আছে। যে সব সৎগুণ থাকলে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলতে পারি তার সবই তাদের আছে। তা ছাড়া শিক্ষা দীক্ষা মেধায় তাদের মতো পারঙ্গম আর কোন্ দেশের মানুষ?

কিন্তু সিরিয়াবাসীরা হীনমন্য, নীচ অর্থগৃধ্নু। তারা অতিথির সম্মান জানে না। প্রতারণা ছল চাতুরী জালিয়াতি জোচ্চরীতে ওদের সমকক্ষ আর কেউ নাই। শয়তানী বদমাইশিতে তাদের জুড়ি নাই তামাম দুনিয়ায়।

একদিন কাইরো শহরে এসে হাজির হলো এই ধরনের এক সিরিয়াবাসী। শহরের মধ্যভাগে বড় বাজারের পাশে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তার বাণিজ্যের সামানপত্র গুদামজাত করলো। দামী দামী রেশমী সাজ-পোশাকের পণ্যসম্ভার সংগে এনেছে সে। উদ্দেশ্য চড়া দামে কাইরোর বাজারে বিক্রি করে মোটা মুনাফা লুটে নিয়ে যাবে।

পরদিন সকালে উঠেই সে বড় বড় সওদাগরী দোকানে হানা দেয়। নানাভাবে তার পণ্যের গুণ-কীর্তন করে সওদাগরদের কাছে।

দিন কয়েক পরে।

একদিন সে একটা পথ ধরে চলছিল। কিন্তু চোখ ছিল তার রাস্তার দুপাশের বাড়ির দরজা জানালার দিকে। চলতে চলতে একসময় সে দেখলো তিনটি প্রিয়দর্শনা তরুণী কলহাস্য মুখরিত হয়ে পথ চলছে। ওদের উজ্জ্বল যৌবনের মাদকতায় বিদেশীর রক্তে তুফান ওঠে। নিজেকে সে আর সামলে রাখতে পারে না। মেয়েগুলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে, ওগো সুন্দরীরা, আমি বাজারের পাশের বড় সরাইখানায় উঠেছি। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে এস না, আজ সন্ধ্যায়। একটু খানাপিনা মৌজ করা যাবে? অথবা যদি বল তোমাদের বাড়িতে যেতে হবে—তাও যেতে পারি আমি।

মেয়েগুলো হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, না না, আমাদের বাড়িতে নয়, আমরা তোমার সরাইখানাতেই যাবো সন্ধ্যায়। আমাদের বাড়িতে গেলে, তুমি কি ভেবেছ, আমাদের স্বামীরা তোমাকে মুসাফির মেহেমান ভেবে যত্ন-আত্তি করে খেতে-শুতে দেবে? ঠিক আছে আমরাই যাবো তোমার ঘরে।

মেয়েগুলো চলে গেলে লোকটা বাজার থেকে নানারকম দামী দামী খানা এবং দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কিছু মদ্য কিনে সরাইখানায় ফিরে গেল।

সন্ধ্যা নামতে না নামতে মেয়ে তিনটি এসে হাজির হলো সরাইখানায়। সারা অঙ্গে রংদার সাজ-পোশাক দামী রেশমী বোরখায় আপাদমস্তক মোড়া।

কিন্তু বিদেশীর ঘরে ঢুকেই ওরা মুহূর্তে বে আব্রু উলঙ্গ হয়ে সাজ-পোশাকগুলোকে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটার সামনে এসে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো।

বিদেশী তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। দামী মদ আর মাংসের খানাপিনা সাজিয়ে দিল সে ওদের সামনে। মেয়েগুলো গোগ্রাসে উদরস্থ করতে থাকলো সব।

ক্রমশঃ মদের নেশায় মদির হয়ে উঠলো সকলে। তারপর শুরু হলো ঢলাঢলি গলাগলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরাবের নেশায় উত্তাল হয়ে উঠলো ওরা। সমানে চললো নাচন-কুদন, চেঁচামেচি চিৎকার শীৎকার। তারপর আরম্ভ হলো জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি।

লোকটিও সমানে তাল দিতে থাকলো ওদের সঙ্গে। একসময় সে জিজ্ঞেস করলো এর আগে কখনও তোমরা আমার মতো এত আমুদে লোকের সঙ্গ পেয়েছ?

তিনজনেই একসঙ্গে সোর তোলে, না না, কক্ষণো না। তুমি অপরূপ, অদ্ভুত সুন্দর। এমনটি আর কখনও দেখিনি।

তিনটি উলঙ্গ তরুণীকে এপাশে ওপাশে নিয়ে সারা মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে থাকলো লোকটা। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সে মদের পেয়ালা পূর্ণ করে এনে ধরে মেয়েগুলোর মুখে। আর ওরা এক এক চুমুকে এক এক পেয়ালা নিঃশেষ করে দেয়।

রাত গভীর হতে থাকে। লোকটা বদ্ধ মাতাল হয়ে গেছে তখন। মেয়ে তিনটি ওর মাথার পাগড়ী খুলে নিয়ে গাধার টুপি বানিয়ে মাথায় পরিয়ে দেয়। তারপর ওর ঘরের সোনা-দানা এবং যা কিছু মূল্যবান ধনরত্ন পেল সব হাতিয়ে নিয়ে এক সময় কেটে পড়লো ওরা।

পরদিন সকালে বেশ বেলা হলে বিদেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে পায় সারা ঘর লণ্ডভণ্ড-তছনছ হয়ে আছে। কিন্তু মেয়েগুলো নেই।

একটু পরেই সে বুঝতে পারলো মেয়েগুলো তাকে সর্বস্বান্ত করে চলে গেছে। তার সমস্ত টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, হীরে-জহরত সব লোপাট করে নিয়ে গেছে তারা। কপাল চাপড়ে সে ডুকরে উঠলো, ইয়া আল্লাহ্, একি হলো আমার? আমি যে একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেছি।

লোকটা আর এক মুহূর্ত মিশরে অপেক্ষা না করে সেইদিনই নিজের দেশ সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

শাহরাজাদ হাসতে হাসতে বললো, অপরিণামদর্শী সিরিয়া সওদাগরের সমুচিত শিক্ষাই হয়েছিল সেদিন। বিদেশে এসে যে লোক বেলেল্লাপনায় মত্ত হয়ে ওঠে তার এইভাবেই শিক্ষা হওয়া দরকার। যাক, ছোট ছোট গল্প অনেকগুলো শোনালাম, এবার আপনাকে একটি বড় কিসসা শোনাবো. জাঁহাপনা যাদু কিতাবের কাহিনী বলছি শুনুন ঃ

ছোট বোন দুনিয়াজাদ নিচে থেকে উঠে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, যাদু কিতাব? সে কী, দিদি!

শাহরাজাদ বলে, সেই কাহিনীই তো বলছি, শোন ঃ

একদিন গভীর রাতে খলিফা হারুন অল রসিদের হঠাৎ নিদ্রা টুটে গেল। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। তারপর ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। কিন্তু বুকের বোঝা হালকা হলো না। চোখে আর ঘুম নেমে এল না। দেহরক্ষী মাসরুরকে তলব করলেন।

মাসরুর হাজির হলে তাকে বললেন, শোন্ বান্দা, আজ আর ঘুম আসবে না মনে হচ্ছে। বুকে যেন পাষাণ চেপে বসেছে। যাহোক একটা উপায় বের কর।

মাসরুর বললো, তাহলে আর প্রাসাদে থেকে কাজ নাই। চলুন পথে বেরিয়ে পড়ি। মুক্ত বাতাসে হয়তো হাল্কা হতে পারবেন কিছুটা।

কিন্তু হারুন অল রসিদ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন, না, আজ রাতে আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন আটশো পঁচানব্বইতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

মাসরুর বলে, জাঁহাপনা, আপনার হারেমে তিনশো ষাটটি বাঁদী আছে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তাদের কারো ঘরে গেলে হয় না ?

কিন্তু হারুন অল রসিদ তাতেও সায় দিলেন না, না না, তুই এক কাজ কর। ছুটে যা, জাফরকে নিয়ে আয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাফর এসে হাজির হলো। খলিফা বললেন, জাফর, বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি, ঘুম আসছে না। একটা কিছু ব্যবস্থা কর, যাতে আমার কষ্টের লাঘব হয়।

জাফর বলে, জাঁহাপনা, যখন নারীসঙ্গ বা প্রাকৃতিক শোভা মনকে প্রফুল্ল করতে পারে না তখন একটি মাত্র পথই খোলা থাকে—কিতাব পাঠ।

সুলতান ঘাড় দুলিয়ে বলেন, তুমি যথার্থই বলেছ, জাফর। কিন্তু কোন্ কিতাব পড়বো ? কোথায় আছে সে বই যা পড়ে মনের ক্লেদ দূর হবে ? নিয়ে এস সে কিতাব।

মাসরুর আলো ধরলো, আর জাফর বইয়ের আলমারীতে বই খুঁজতে লাগলো। অনেকগুলো তাক খুঁজেপেতে কতকগুলো বই বের করে এনে খলিফার সামনে রাখলো জাফর। সুলতান এক একখানা বই হাতে নিয়ে দু'চার পাতা ওলটাতে থাকেন, দু চার ছত্র পড়েন। পড়তে পড়তে কখনও হো হো করে হেসে ওঠেন, কখনও বা পড়তে পড়তে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখে

ভরে আসে অশ্রু। বই-এর পাতা ঝাপসা হয়ে যায়। আর পড়া হয় না। পড়া যায় না! কিতাব বন্ধ করে আবার শয্যায় ফিরে আসেন।

জাফর বুকে সাহস এনে জিজ্ঞেস করে, জাঁহাপনা, এইমাত্র আপনি অমন করে হাসলেন আবার এখনই আপনার চোখে দেখছি পানি—কী ব্যাপার?

জাফরের এ কথায় খলিফা রুষ্ট হলেন।

—তুমি তো দেখছি ভারি বেয়াদব হে! আমি হাসি বা কাঁদি তাতে তোমার কী কুত্তার বাচ্চা?

একটুক্ষণ থেমে আবার তিনি বললেন, শোন এখন তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে এমন একজন লোককে এখানে হাজির করা যে বুঝিয়ে বলতে পারবে কেন আমি একই সময়ে হেসেছি এবং কেঁদেছি। কী আছে ঐ বই-এ যা একই সংগে কাঁদাতে এবং হাসাতে পারে মানুষকে? যাও, নিয়ে এস সেই সূত্রধরকে—যে বুঝিয়ে দিতে পারবে আমাকে সে কথা। কিন্তু শোনও জাফর, তেমন গুণী ব্যক্তিকে যদি হাজির না করতে পার তবে তোমার গর্দান যাবে নির্ঘাৎ—এ আমি আগাম বলে রাখলাম।

জাফর আনত হয়ে বলে, বান্দার গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, মাফ করার কোনও প্রশ্ন নাই। আমার সামনে সেই লোককে হাজির কর, নতুবা তোমার গর্দান যাবেই।

জাফর বিনয়ের অবতার হয়ে বলে, সর্বশক্তিমান খোদাতালা ইচ্ছে করলে এক লহমায় এই তামাম দুনিয়া পয়দা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, সারা বিশ্ব সৃষ্টি করতে পুরো দুটি দিন সময় অতিবাহিত করেছেন। আর আমি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ নর, এত বড় বিশ্বে কোথায় কোন প্রান্তে তেমন গুণীজন আছে খুঁজে বের করতে অন্তত তিনটি দিন সময় দিন আমাকে!

হারুন অল রসিদ বললেন, মঞ্জুর। ঠিক আছে তিন দিনই সময় দিলাম তোমাকে।

জাফর বললো, তাহলে আমি আর বিলম্ব করবো না হুজুর, আজ্ঞা করুন এখনই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

হারুন অল রসিদ বললেন, অবশ্যই যেতে পার।

জাফর বিষণ্ণ বদনে ঘরে ফিরে এসে তার বৃদ্ধ বাবা ইয়াহিয়া এবং ভাই অল-ফাদলকে তার সঙ্কটের কথা জানালো।

—যারা শুধু হাতে তীক্ষ্ণ তরবারীর সংগে লড়তে যায় তাদের হাতই কাটা যায়। আর যারা ক্ষীণবল হয়ে সিংহের সঙ্গে যুঝতে দুঃসাহসী হয় তারা নিজেদের তাল হারায়। তোমরা জান খলিফার সিংহবিক্রম। তাকে সামাল দেওয়া আমার অসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিতে বলে একমাত্র পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই।

কিন্তু জাফরকে বাবা এবং ভাই দুজনেই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বারণ করলো।

—তোমার অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই। দুদিন বাদে খলিফা নিজগুণেই

তোমাকে মার্জনা করে দেবেন।

জাফর বললো, না না, তোমরা বুঝতে পারছ না, তিনি কসম খেয়েছেন। তাঁর জবান দুরকম হয় না। ভেবে দেখ, তাঁর যা বায়নাক্কা তা পূরণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য।

বাবা বললো, তুমি ঠিক বলেছ, জাফর। আর দেরি না করে সোজা দামাসকাসে চলে যাও।

—কিন্তু বাবা, আমার বিবি বাচ্চাদের কী হবে?

—সেজন্যে তুমি চিন্তা করো না, বাবা। তাদের নসীবে যা লেখা আছে তা কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। ওসব ভেবে লাভ নাই। তুমি আর কাল-বিলম্ব না করে এখুনি বেরিয়ে পড়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ছিয়ানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাবার উপদেশ শিরোধার্য করে জাফর দামাসকাস রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সঙ্গে নিল হাজারখানেক স্বর্ণমুদ্রা। কোমরে বেঁধে নিল তলোয়ার। সঙ্গে কোনও চাকর নফর না নিয়ে একাই একটা খচ্চরে চেপে রওনা হয়ে গেল সে।

একটানা দশ দিন ধরে নানা শহর, মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে অবশেষে একদিন দামাসকাসের কাছে মার্জনামক এক শস্যশ্যামল গ্রামে এসে পেঁছিল জাফর।

মার্জপল্লীর অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। সুন্দরী সব দেহাতি মেয়েরা পানি ভরতে নদীর ঘাটে যাচ্ছে। গাছে গাছে কতরকম নাম না জানা পাখির নাচানাচি। যে দিকে তাকায় শুধু সবুজের মেলা; নানা রঙের ফুলের কি বিচিত্র সমারোহ।

আরও কিছুটা এগোতে একটি ছোট্ট প্রাচীন শহর। এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জাফর, আচ্ছা ভাইসাব, এ শহরটার কী নাম?

—এর নাম পুরানা জিল্লিক। এইটেই আদি দামাসকাস। আরও আদি নাম শাম—সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দর দেশ।

যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায় জাফরের। সত্যিই সুন্দরী শাম; তুলনা হয় না এ রূপের। মনের সব বোঝা নিমেষে হালকা হয়ে যায় ওর। খচ্চর থেকে নেমে শহরের পথ ধরে হাঁটতে থাকে সে। দুপাশে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, মসজিদ।

চলতে চলতে একসময় সে দেখতে পেল, কুয়ো থেকে জল তুলে রাস্তা ভেজাচ্ছে কিছু লোক। কিছুটা দূরে একটা বিরাট বাগান। আর সেই বাগানের ঠিক মাঝখানে একখানি মনোহর তাঁবু পাতা। আরও কাছে যেতে নজরে পড়লো তাঁবুর ভিতরটা দামী খুরাসনের গালিচায় মোড়া। নানারকম বাহারী আসবাব

পত্রে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো গোছানো।

তাঁবুটার ভিতরে একটি প্রিয়দর্শন যুবক সঙ্গী-সাথী পরিবৃত হয়ে মৌজ করে মৌতাত করতে বসেছে। যুবকের প্রায় গা ঘেঁষে বসেছে একটি ডানাকাটা তরুণী। তার হাতে এক বাদ্যযন্ত্র সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে। সে গানের মূর্চ্ছনায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে।

জাফর তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে সেই সুমধুর সঙ্গীত। পায়ে পায়ে আরও দুচার কদম এগিয়ে যায় তাঁবুর দিকে।

হঠাৎ একবার যুবকের নজরে পড়ে যায় জাফর। সে তার এক সঙ্গীকে বলে, দেখ তো বাইরে মনে হচ্ছে এক বিদেশী মুসাফির এসে দাঁড়িয়েছে। যাও, ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস এখানে।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ছুটে বাইরে এসে জাফরকে বললে, গুস্তাকী মাফ করবেন মালিক, আমাদের সাহেব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। মেহেরবানী করে যদি একবার তাঁবুর ভিতরে চলেন—

তাঁবুর ভিতরে যেতেই যুবক উঠে দাঁড়িয়ে জাফরকে স্বাগত জানিয়ে বললো, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন, মালিক। আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন আমাদের তাঁবুতে।

নানারকম খাদ্য ও পানিয়ে পরিতৃপ্ত করলো সে জাফরকে। বিনয় করে বললো ; আপনি হঠাৎ এসে পড়েছেন গরীবের আস্তানায়। তাই যোগ্য সমাদর করতে পারলাম না আপনার। আগে যদি জানতাম আপনি আসবেন তবে নিজের কলিজা অথবা আমাদের সন্তানের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতাম আপনাকে।

খানাপিনা শেষ হলে নিজে হাতে জল ঢেলে দিল সে জাফরের হাতে। তারপর মদের পেয়ালা পূর্ণ করে এগিয়ে দিল সামনে।

আবার শুরু হলো গান বাজনা। একটানা অনেকক্ষণ চললো।

আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল জাফর। মনের বোঝা অনেকটা লাঘব হয়ে এসেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে খলিফার সেই কথা স্মরণ করে কেমন যেন মুষড়ে পড়তে লাগলো সে।

যুবকের দৃষ্টি এড়ালো না কিছুই। সে নানাভাবে জাফরকে উৎফুল্ল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকলো।

—মালিক, আমাদের অক্ষমতা, দীনতা আমরা স্বীকার করছি। এমন কোন আয়োজন এখানে নাই যা দিয়ে আপনাকে তৃপ্ত করতে পারি। তবু আমার একান্ত অনুরোধ, সব দোষত্রুটি ক্ষমা করে আপনি একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠুন।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন আটশো... রজনী।

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সব গান শেষ হলে যুবকটি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে দামাসকাসের সুলতানের প্রাসাদে এল। জাফর দেখলো বেহেস্তের মতো অনুপম এক উদ্যান। তার মাঝখানে এক মনোরম প্রাসাদ।

যুবক বললো, এই প্রাসাদ আপনার নিজের প্রাসাদ জ্ঞান করবেন, মালিক। আপনার এ শহরে আগমনের কি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে জনাব ? আপনার নামটা কি জানতে পারি।

জাফর বলে, আমি খলিফা হারুণ অল রসিদের এক সেনাপতি। থাকি বসরাজ্যে। সম্প্রতি খলিফার সঙ্গে আমার কিছু মতের অমিল হওয়ায় তার কাছে ইস্তফা দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি। অন্য কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আমার নাই। আমার নাম আর আপনার নাম একই।

যুবক বললো, তা হলে আপনার নামও হাসান অল দিন। বাঃ চমৎকার হলো। এরপর থেকে আপনাকে মিতা বলেই ডাকবো। নিন এখন বিশ্রাম করুন, কোনও অসুবিধে বোধ করলে তুড়ি বাজাবেন, বান্দা হাজির থাকবে আপনার পাশেই।

পরদিন সকালে জাফর শয্যাত্যাগ করে ওঠেনি দেখে যুবক এসে দাঁড়ালো ওর পালঙ্কের পাশে।

কাল রাতে কি আপনার ঘুম হয়নি মালিক ?

জাফর বললো, না, কেন জানি না অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে বুকে, কিছুতেই ঘুম আসেনি।

যুবক উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, সে কি। আমি এখুনি হাকিমকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

শহরের সবচেয়ে নামকরা হাকিম এল। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলো সে। তারপর বললো, না, দেহে কোনও ব্যাধি নাই। যা কিছু সবই দুশ্চিন্তার জন্য। মন থেকে চিন্তা ভাবনা সরিয়ে ফেলে হাসিখুশির মধ্যে থাকতে হবে। সুন্দরী রমনী সঙ্গ, মদ্যপান এবং আনন্দ বিহারই এর একমাত্র দাওয়াই। অন্য কোনও দাওয়াই-এ কোনও কাজ হবে না।

হাকিমের ব্যবস্থাপত্র শুনে যুবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যাক্ বাবা বাঁচা গেল, আমি তো ভয়ে মরি, না জানি কি কঠিন অসুখে পড়লেন আপনি!

জাফর ভাবে, না, আর লুকিয়ে রাখা উচিত নয়, এমন পরম সুহৃদের কাছে অন্তরের সব গোপন কথা খুলে বলা দরকার।

—শোনও মিতা, আমি তোমাকে আজ আমার মনের কথা খুলে বলছি। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মতো বন্ধু পাওয়া পরম ভাগ্যের। তাই কিছুই লুকাবো না তোমার কাছে।

জাফর নিজের পরিচয় জানালো হাসানকে। কিন্তু অন্য কাউকে জানাতে

বারণ করে দিল।

হাসানের একমাত্র চেষ্টা কী উপায়ে জাফরকে উৎফুল্ল রাখা যায়। প্রায় সব সময়ই সে তার সঙ্গে সঙ্গে কাটায়। খানাপিনা নাচ গান হৈ-হল্লার মধ্যে ভুলিয়ে রাখতে চায় সে জাফরকে।

একদিন বাগানের একপাশে বসে দুই বন্ধু বাক্যালাপ করছিল, এমন সময় এক পরমাসুন্দরী তরুণী জলের ঝারি হাতে বাগানে ঢুকে ফুলগাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করতে লাগলো। মেয়েটিকে দেখামাত্র জাফরের সারা অঙ্গে এক শিহরণ খেলে গেল। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে তরুণীর দিকে।

হাসান বললো, কী দেখছেন মিতা?

—বাঃ কি সুন্দর, যেন বেহেস্তের পরী।

—আপনার খুব পছন্দ ওকে?

জাফর বলে, পছন্দ হলেই বা কী? আমি পরদেশী। আমার হাতে দেবে কেন এমন মেয়েকে?

হাসান বলে, সে আমি ব্যবস্থা করে দেব। আপনি রাজি কিনা বলুন।

জাফর বলে, এ নারীর সঙ্গ সহবাস পেলে দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ মনে হবে আমার।

হাসান বলে, আপনি কোনও খেদ করবেন না, মালিক। আমি কথা দিচ্ছি ঐ নারী আপনারই অঙ্কশায়িনী হবে।

জাফর অবাক হয়ে বলে, এমন জোর দিয়ে একথা বলছেন কি করে দোস্ত? ও আপনার কে?

হাসান বলে, ঐ রূপসী আমার নিজের বিবি। কিন্তু আপনি আমার মেহেমান। দুনিয়াতে তার চেয়ে বড় বস্তু আর কিছু নাই। আমি ওকে তিন তালাক দিয়ে দেব। আমার চাচাকে বলে রাজি করাবো, সে যাতে আপনার হাতে তুলে দেয় তাকে। আপনি নিকা করে দেশে নিয়ে যাবেন তাকে।

জাফর কেমন আড়ষ্ট, অপ্রস্তুত হয়ে যায়, এ কেমন কথা হলো দোস্ত, তোমার শাদি করা বিবিকে তালাক দেবে তুমি? কেন? কী তার অপরাধ?

—অপরাধ? সে কোন অপরাধ করতে পারে না মালিক। অপাপবিদ্ধ সে, আমাকে জান প্রাণ দিয়ে মহব্বত করে।

—তবে তাকে কেন পরিত্যাগ করবেন?

হাসান হাসে, অতিথি সৎকারের চেয়ে বড় কাজ কিছু থাকতে পারে না কোনও মুসলমানের। আপনি আমার পরম প্রভু। আপনার আত্মা অতৃপ্ত হলে দোজকেও ঠাঁই হবে না আমার। এই মাত্র আমি ঠিক করলাম, বিবিকে তালাক দিয়ে আমি সংসার ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যাবো চিরদিনের মতো। সেখানে কাবাহ আশ্রয় করে পড়ে থাকবো। আল্লাহ যদি প্রসন্ন হন, আমাকে কোলে টেনে নেবেন।

জাফর বাধা দিয়ে বলে, তা হয় না হাসান। তুমি ক্ষান্ত হও।

ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয় মালিক। আপনাকে তৃপ্ত করতে পারাই

একমাত্র লক্ষ্য আমার। আপনি আর 'না' করবেন না। আমি আপনার শাদির ব্যবস্থা করছি।

জাফর বলে, আমি মুসাফীর। শাদির দেনমোহর কোথায় পাবো এখানে?

হাসান বলে, সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার প্রচুর অর্থ আছে, আমি দেব আপনাকে। ঋণ নয়, দান নয় এ আমার অতিথি সংকারের দক্ষিণা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

হাসান তার শ্বশুরকে সমস্ত খুলে বললো। সব শুনে সে জামাতাকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসান তার সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে রইলো।

সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে শ্বশুর রাজি না হয়ে পারলো না। সেইদিনই হাসান তার বিবিকে তিন তালাক দিয়ে দিল। তার তিনদিন পরে সকলের অগোচরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে তার তালাক দেওয়া বিবির সঙ্গে জাফরের শাদি হয়ে গেল।

হাসান বললো, আপনার বিবিকে নিয়ে আপনি কি এখানেই থাকবেন, না বাগদাদে ফিরে যাবেন।

জাফর বললো, আমি খলিফার উজির, এখানে বসে থাকলে তো চলবে না ভাই। আমাকে এখনি দেশে ফিরতে হবে।

হাসানই যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিল। নতুন বিবিকে সঙ্গে করে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে গেল সে।

কয়েকদিনের মধ্যে বাগদাদে এসে পৌছল জাফর। সংবাদ পেয়ে খলিফা স্বয়ং নিজে দেখা করতে এলেন জাফরের সঙ্গে। বিলম্বের কারণ কী, জানতে চাইলেন। তখন জাফর তার দামাসকাস সফরের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনালো খলিফাকে। সব শুনে হারুন অল রসিদ গম্ভীর হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, না-না, জাফর কাজটা ভাল করনি মোটেই। যে তোমাকে এত আদর অভ্যর্থনা করেছে, তার ঘরের বিবিকে বেহাত করে নিয়ে আসা তোমার মত বিচক্ষণ বিবেচক ব্যক্তির উচিত হয়নি জাফর। আমার ইচ্ছা যার জিনিস তাকে তুমি ফেরত পাঠিয়ে দাও।

জাফর বললো, আপনার হুকুম শিরোধার্য, জাঁহাপনা। কিন্তু এখনই আমি আবার দামাসকাসে যাবো কি করে? তার চেয়ে বরং হাসানকে আমি ডেকে পাঠাই। ও এলে ওর হাতে তুলে দেব ওর বিবিকে। যতদিন সে এসে না পৌছয় ততদিন মেয়েটি আমার হেফাজতেই থাক।

এদিকে জাফরকে বিদায় দেবার পর সারা দামাসকাস শহরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো, যিনি এসে হাসানের মেহেমান হয়েছিলেন তিনি আর কেউ নয় স্বয়ং খলিফার উজির জাফর। জাফরের সঙ্গে হাসানের যা দোস্তি হয়েছে তাতে নায়েবের নায়েবী আর বেশি দিন থাকবে না। খুব শিগ্গিরই বাগদাদ থেকে ফরমান আসবে হাসানকে নায়েব করার। সে-ই পরবর্তী নায়েব হবে, সে বিষয়ে কারো আর সন্দেহ রইলো না।

কথাটা ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে নায়েবের কানে গেল। রেগে আগুন হয়ে সে সিপাইদের হুকুম করলো, লোকটাকে বেঁধে নিয়ে এস আমার সামনে।

নায়েবের লোকজন হাসানের বাড়ি চড়াও হয়ে বেদম প্রহার করল ওকে। তারপর হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে টানতে টানতে এনে হাজির করলো নায়েবের সামনে।

হাসানকে দেখামাত্র নায়েব গর্জে উঠলো, শয়তান বদমাইশ, তোমার পেটে এত বুদ্ধি। আমাকে গদি থেকে নামাতে চাও? তোমার নায়েব হওয়ার সাধ হয়েছে। দাঁড়াও সাধ তোমার মিটিয়ে দিচ্ছি।

নায়েব হুকুম দিল, লোকটার গর্দান নাও।

নায়েবের সিপাইরা হাসানের অঙ্গবাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। কালো কাপড় দিয়ে চোখ দুটো কষে বেঁধে দিল ওরা। তারপর তরবারী উদ্যত হলো হাসানের ধড়মুণ্ড আলাদা করার জন্য। এই সময় এক আমির নায়েবকে পরামর্শ দিল, আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো করে এখনি এ কাজটা না করাই ভাল। হাজার হলেও সে উজির জাফরের দোস্ত। এর ফল কী শুভ হবে আপনার পক্ষে? আপনাকে যারা একাজে উৎসাহ দিচ্ছে, আপনি ভেবে দেখুন, তারা আপনার বন্ধুরূপী শত্রু ছাড়া কিছু নয়। এও ঠিক, আজ হোক কাল হোক আপনার এই কার্যকলাপ জাফরের কর্ণগোচর হবেই। তখন তার ঠেলা কি সামলাতে পারবেন আপনি? সেদিন যদি আপনার ঘাড় থেকে মাথা নেমে যায় তখন কি আপনার এইসব শুভানুধ্যায়ীরা ঠেকাতে পারবে?

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো দুইতম রজনী।

আবার সে বলতে থাকে:

আমিরের কথায় চৈতন্য হলো ক্রোধ-উন্মত্ত নায়েবের। তৎক্ষণাৎ সে জহ্লাদকে অসি সংবরণ করতে বললো, থাক, এখন থাক। ওকে বরং ফাটকে আটক রাখ।

হাসানের পায়ে শিকল বেঁধে শহরের পথ দিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললো সিপাইরা। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ তুললো হাসান। কিন্তু কে শোনে তার কান্না? অন্ধকার কারাকক্ষে হাসানকে নিক্ষেপ করলো তারা।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় কয়েকটা শুকনো রুটি আর খানিকটা জল দিয়ে যায় প্রহরী। তাই খেয়ে হাসান দিন কাটায়। আর আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে আবেদন জানায়, তুমি তো জান প্রভু, জীবনে কখনও আমি কারো অনিষ্ট চিন্তা করিনি। তবে—তবে কেন এ শাস্তি বিধান করলে আমার জন্য।

খোদাতালা বোধহয় নিরপরাধ হাসানের আবেদন শুনছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় যথারীতি খানাপিনা রেখে গেছে। হাসান লক্ষ্য করলো লোকটা রোজকার মতো ফটকের দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছে।

রাত্রি গভীর হয়ে এল। সবাই যে যার মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসানের চোখে ঘুম নাই। সদরের প্রহরীটা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করে পাহারা দিচ্ছে। সুযোগ বুঝে, পাহারাদার অন্য প্রান্তে চলে যেতেই টুক করে সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়েই গুটি গুটি এপাশ ওপাশ কাটিয়ে বেমালুম সটকে পড়তে পারলো।

বাকী রাতটা গা-ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দিল হাসান। তারপর ভোরে শহর প্রান্তের প্রধান ফটক খোলামাত্র আর পাঁচজন পথচারীর ভিড়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে এল সে।

এরপর আর পিছনে নয়, সোজা সে আলেপ্পের পথে ছুটে চলতে থাকলো। বহু কষ্টে অনেক পথ পার হয়ে এক সময় আলেপ্পোতে এসে পেঁছাল হাসান। সেখানে একদল বাগদাদ যাত্রীর দেখা পেয়ে তাদের দলে ভিড়ে গেল সে।

একটানা কুড়িটা দিন চলার পর অবশেষে বাগদাদ শহরে এসে পেঁছিতে পারল। যাক, এতদিনের দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে তার। এখানকার খলিফার দরবারের প্রধান উজির তার প্রাণের বন্ধু। সে নিশ্চয়ই হাসানকে বুকে টেনে নেবে।

পথচারীদের জিজ্ঞেস করে করে জাফরের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো হাসান। ফটকের প্রহরী হাসানের দীন ভিখিরির মতো ছিন্ন-ভিন্ন সাজ-পোশাক দেখে তাকে দূর করে দিতে চাইলো, এই ব্যাটা কে তুই? সদরে ঢুকতে চাস কোন সাহসে? জানিস এটা কার প্রাসাদ।

হাসান বিনীত কণ্ঠে বলে. হ্যাঁ ভাই জানি, উজির জাফর বারমাচীর প্রাসাদ।

তবে? কী মতলবে ঢুকতে চাস? ভাগ—

হাসান বলে, বিশ্বাস কর, কোনও বদ মতলব আমার নাই। শুধু একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বামন হয়ে চাঁদে হাত! তুই একটা রাস্তার ভিখিরি, খলিফার পেয়ারের উজির সাহেব তোর সঙ্গে দেখা করে ধন্য হয়ে যাবে ভেবেছিস নাকি? যা ভাগ শিগ্গির, নইলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

শুধু মুখের কথা নয়, সত্যি সত্যিই লোকটা একটা গোত্তা বসিয়ে দিল হাসানের পিঠে। নিরুপায় হয়ে হাসান আবার পথে নামলো। সামনেই একটা কাগজের দোকান দেখতে পেয়ে দোকানীর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে জাফরকে উদ্দেশ করে একখানা চিঠি লিখলো সে ঃ

জাফর ভাই, নসীবের ফেরে আজ আমি সর্বহারা। অত্যাচারিত হয়ে তোমার দরজায় এসেছি। যদি মেহেরবানী করে একটিবার দর্শন দাও বড় ভাল হয়।

তোমার ভাই

এরপর আবার সে ফিরে এল জাফরের প্রাসাদ-প্রহরীর সামনে। চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বললো, যদি একবার তাঁর কাছে পেঁছে দাও ভাই, খুব উপকার হয়।

চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে রাগে ফেটে পড়লো প্রহরী, কী এতবড় সাহস তোর, উজীর সাহেব তোর ভাই ?

এই বলে সে বেদম প্রহার করতে লাগলো হাসানকে। মারের চোট সামলাতে না পেরে হাসান লুটিয়ে পড়লো পথের ধুলোয়। সারা অঙ্গ কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখে অন্য এক প্রহরী ছুটে এল ফটকে, আহা বেচারাকে অমন করে মারছো কেন ? মরে যাবে যে—

—মারবো না, এই রাস্তার ভিখিরিটা বলে কি না সে উজির জাফরের ভাই, এতবড় আস্পর্ধা—

দ্বিতীয় প্রহরী বলে, তাতে দোষ কী, সব মানুষই সব মানুষের ভাই। এই তো খোদার বিধান।

তারপর হাসানকে হাতে ধরে তুলে দাঁড়িয়ে সে বললো, কী তোমার প্রয়োজন, বল তো ভাই।

হাসান বলে, এই চিঠিখানা শুধু জাফর ভাই-এর হাতে পেঁছে দাও, আর কিছু চাই না আমি।

দ্বিতীয় প্রহরী বলে, ঠিক আছে তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি এখুনি তাকে দিচ্ছি তোমার চিঠি।

লোকটা অন্দরে চলে গেল।

জাফর তখন তার ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে বসে মৌতাত করছিল। সাকী ঢেলে দিচ্ছিল সরাব। সুন্দরী বাঁদী সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে। আর জাফর জাঁকিয়ে জীবনের পরম অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছে বন্ধুদের। সেই দামাসকাস বাসের সুখস্মৃতির দিনগুলোর কাহিনী।

জাফর বলছিল, হাসান আমার ভাই, হাসান আমার বন্ধু, তার মতো সৎ মহান মানুষ সারাজীবনে আমি আর দুটি দেখিনি। আমি কেন, বাজি রেখে বলতে পারি, কেউই দেখেনি। হাসানের মতো উদার মহৎ প্রাণ তামাম দুনিয়ায় আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ।

জাফর কথা শেষ করে বেশ বিরক্ত হয়েই প্রহরীর দিকে তাকালো, কী, কী ব্যাপার। তোদের কি সময় অসময় জ্ঞান নাই। যখন তখন এসে মৌতাতটা মাটি করে দিবি।

প্রহরী চিঠিখানা বাড়িয়ে দিল জাফরের দিকে। জাফর চিঠিখানা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলালো। কিন্তু মদের নেশায় তখন সে অন্য জগতের মানুষ, অতটা তলিয়ে দেখতে পারলো না। চাইলোও না। চিঠিখানার অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে এক রকম প্রায় ক্ষিপ্তই হয়ে উঠলো সে।

—কী খাতা নিয়ে এসেছিস, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। হাতের পেয়ালাটা সে ছুঁড়ে মারলো দেওয়ালে। মুহূর্তে টুকরো হয়ে গেল। একখানা টুকরো ছিটকে এসে লাগলো জাফরের কপালে। কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। হাতের চিঠিখানা ছুঁড়ে দিয়ে কপালটা দুহাতে চেপে ধরলো।

জাফর। ক্রোধ এবার শতগুণ হয়ে গর্জে উঠলো, এই ঘোড়ার ডিমের চিঠিখানার জন্যই এমনটা ঘটলো। যা, ঐ লোকটাকে এখুনি গিয়ে পাঁচশো ঘা বেত লাগিয়ে কোতোয়ালের হাতে তুলে দে। কয়েদ করে রাখুক ওকে।

উজিরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। বেত্রাঘাতে জর্জরিত হলো হাসানের দেহ। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল সারা অংগ। কোতোয়াল তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।

দুটি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হাসান কারাগারে পচছিল। হঠাৎ একদিন কোতোয়াল এসে কয়েদখানার সমস্ত বন্দীকে খালাস করে দিয়ে বললো, যা তোদের বরাত ভাল ছাড়া পেয়ে গেলি। খলিফা পুত্রসন্তান লাভ করেছে। সেই উপলক্ষে তোদের রেহাই করে দিয়েছেন তিনি।

ছাড়া পেয়ে হাসান আরও সমস্যায় পড়লো। সে এখন কোথায় যাবে কী খাবে? নিজের দেশ বিশ দিনের পথ। সেদিকে রওনা হলে পথেই মরে পড়ে থাকবে সে। কিন্তু এই বেদেশী শহর বাগদাদে সে বাঁচার মতো রুটি জোগাড় করবে কী করে? ভিক্ষা? কিন্তু সে পরদেশী, তাকে তো এ শহরে ভিক্ষে করতে দেবে না কেউ। তবে? তবে কী উপায় হবে।

সারাটা দিন সে শহরের এক মসজিদ-প্রাঙ্গণে বসে নানাভাবে প্রাণে বেঁচে থাকার উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনই কূল কিনারা করতে পারল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

মসজিদে রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। একমাত্র আল্লাহর উপাসকরাই সেখানে অবস্থান করতে পারে। সুতরাং রাতের মতো কোনও একটা ডেরায় চলে যেতে হবে তাকে।

হাসান মসজিদ থেকে বেরিয়ে শহর-প্রান্তের একটা পোড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়িটায় কোনও জনমানুষ বাস করে না। একেবারে পরিত্যক্ত। সে ঠিক করলো রাতটা এই বাড়ির মধ্যে কোনও রকমে কাটাবে।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা মানুষের দেহে হাত ঠেকতে চমকে উঠলো, হাসান। একি, একটা লোক, সারা দেহে রক্ত কেন এত? তবে কি কেউ একে খুন করে রেখে গেছে? একখানা রক্তমাখা ভোজালী পায়ে ঠেকলো। ভয়ে শিউরে উঠলো হাসান।

ইতিমধ্যে হাসানের হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। সেই হাত সে তার অংগের পোশাকে মুছলো।

এ অবস্থায় কী করা উচিত ভাবতে থাকে হাসান। শেষে ঠিক করলো ঝামেলায় জড়ানোর চেয়ে পথে বেরিয়ে পড়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু পথে আর বেরুনো হলো না তার। মশালের আলো দেখে চমকে উঠলো সে।

কয়েকজন সিপাই ঢুকে পড়েছে সেখানে। হাসানের রক্তমাখা পোশাক, মৃত মানুষের লাস এবং ভোজালীখানা দেখে তাদের বুঝতে অসুবিধে হলো না খুনী কে?

—এ্যাই বদমাশ, বল, কেন একে খুন করেছিস ?

হাসানের পিঠে ডাণ্ডার বাড়ি পড়লো। এ কথার কী জবাব দেবে হাসান ? আর দিলেই বা বিশ্বাস করবে কে ? বিশ্বাস করার মতো ব্যাপার তো নয়।

আবার কারাগার। কিন্তু মাত্র একটি রাতের জন্য। পরদিন সকালে কোতোয়াল উজির জাফরের সমীপে গত রাতের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিল। এবং বললো মুলজিমকে আমি ধরে ফাটকে রেখেছি, হুজুর। এখন আপনি বিচার করে বলুন কী করতে হবে।

জাফর দ্বিধা না করে বললো, গর্দান নেবে লোকটার।

দরবারের সময় হয়ে এসেছে। জাফর প্রাসাদ অভিমুখে চলেছে। চৌমাথার কাছে আসতে হাজার লোকের জমা দেখে জাফর অবাক হয়ে ভিড়ের কাছে এগিয়ে গেল। কোতোয়াল তখন ঘাতককে হুকুম দিচ্ছিল মুলজিমকে দাঁড় করিয়ে তার চোখ বেঁধে দাও, তারপর আমার ইশারা পাওয়া মাত্র মুণ্ডু নামিয়ে দেবে এক কোপে।

হাসানের চোখ বাঁধা শেষ, এবার জহ্লাদ তরবারী বাগিয়ে ধরে কোতোয়ালের ইশারার অপেক্ষায় অপলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এমন সময় জাফর এগিয়ে এসে কোতোয়ালকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এখানে এত জমায়েত কেন ?

কোতোয়াল কুর্নিশ জানিয়ে বললো, কালকের রাতের ঐ খুনীটাকে কোতল করা হচ্ছে হুজুর।

জাফর বললো দাঁড়াও একটুখানি সবুর কর। আমি লোকটাকে একবার দেখতে চাই।

জাফর এগিয়ে যেতেই উৎসুক জনতার ভীড় সরে গেল। আসামীকে প্রত্যক্ষ করলো জাফর।

—কে তুমি ? মনে হচ্ছে পরদেশী ?

হাসান নয় কোতোয়াল জবাব দেয়, জী হুজুর, লোকটা দামাসকাস থেকে এসেছে। কাল রাতে এই লোকটাই একটি যুবককে খুন করেছে। হাতে নাতেই ধরেছে আমার লোক। কিন্তু ব্যাটার মুখ থেকে একটি বাতও বের করতে পারা যায়নি। বলবে কী, বলার আছেই বা কী। সাক্ষী প্রমাণ তো ওর পোশাক-আসাকেই দেখতে পাচ্ছেন, হুজুর।

জাফর কিন্তু হাসানকে চিনতে পারলো না। কি করেই বা পারবে। যে হাসানকে দেখেছিল সে, এ হাসান তো তার প্রেতাত্মা। এমন দীনহীন ক্লিষ্ট চেহারা তার হতে পারে জাফর ভাববে কী করে ?

—তোমার দেশ কোথায় ?

জাফর প্রশ্ন করে। হাসান বলে, দামাসকাস।

— সদর শহরে না গ্রামাঞ্চলে ?

—শহরেই।

—আচ্ছা সেখানে হাসান নামে কোনও ব্যক্তিকে তুমি চেন ? সেখানকার

প্রতিটি মানুষ হাসানকে চেনে। তার মতো উদার মহৎ অতিথিপরায়ণ দয়ালু ব্যক্তি খুব একটা জন্মায় না জগতে।

আপনি যখন দামাসকাসে তার আতিথ্যে কাটিয়েছিলেন তখন আমি তাকে চিনতাম বই কি। যখন আপনারা দুজনে প্রাণের দোস্ত হয়ে তার বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তখন আমি তাকে চিনতাম। যখন সে আপনাকে খুশি করার জন্য তার নিজের বিবিকে তালাক দিয়ে আপনার সঙ্গে শাদি দিয়েছিল তখন আমি তাকে ভাল করেই চিনতাম। সে যখন আপনাকে বিদায় জানাতে আলেপ্পো পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিল তখন আমি তাকে অবশ্যই চিনতাম। আর সেই সব স্মৃতি সুখকর মধুর মুহূর্তগুলি যা একই মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মূর্ত হয়েছিল তখন আমি হাসানকে ভাল করেই চিনতাম।

জাফর বলে, আচ্ছা বলতে পার, আমি চলে আসার পর হাসান ভাই কেমন ছিল বা এখন সে কেমন আছে, কোথায় আছে।

হাসান বলে, মালিক, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ সে অত্যাচারিত। প্রাণভয়ে সে স্বদেশ পরিত্যাগ করে এই বাগদাদ শহরে এসেছিল একটু আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু বিধি বাম, তার কপালে আর সুখ ছিল না, তাই সে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আজ ফাঁসীর আসামী হয়েছে। নিয়তির লেখা কে খণ্ডন করতে পারে বলুন।

এর পরও জাফর যখন তাকে চিনতে পারলো না, তখন হাসান চিৎকার করে উঠলো, জাফর ভাই এখনও কি তুমি আমাকে ইয়াদ করতে পারছ না?

এতক্ষণ সংশয়ের দোলায় দুলছিল জাফর। হাসানের চিৎকারে সব স্বচ্ছ হয়ে গেল তার চোখের সামনে। হাসানকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে থাকলো।

সে কি অভূতপূর্ব দৃশ্য। কে বর্ণনা দিতে পারে তার?

এই সময় একটি প্রৌঢ় লোক জাফর-এর সামনে এসে স্বীকার করলো, গত রাত্রে যে ছেলেটি খুন হয়েছে তার জন্য সেই একমাত্র দায়ী। এই ব্যক্তির কোনও অপরাধ নাই। সুতরাং একে ছেড়ে দিয়ে যা সাজা দেবার আমাকে দিন, হুজুর।

জাফর বললো, এমন নৃশংস কাজ করেছ, তোমার কী ধর্মের ভয় মনে জাগেনি।

প্রৌঢ় বলে, ঐ ছেলেটি প্রতিদিনই আমার যা-কিছু রোজগার কেড়ে-কুড়ে নিয়ে নিত। তা নিক, তাতেও আমার তেমন দুঃখ ছিল না। কিন্তু হুজুর ঐ পয়সা নিয়ে সে জুয়া খেলতো, মদ খেত, মেয়েমানুষের কাছে যেত। এসব আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। কিন্তু কিছুতেই দাঁও পাচ্ছিলাম না। কাল সন্ধ্যায় ওকে বেকায়দায় পেয়ে আমি আমার জ্বালা জুড়িয়েছি হুজুর। এত বড় পাপ জিন্দা থাকা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়েছিল, তাই আমার নিজের ঔরসের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমি ওর জান খতম করেছি।

জাফর ভাবলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, যাও তোমাকে রেহাই দেওয়া

হলো। কারণ মামলা শুনে আমার মনে কিছু সংশয় জেগেছে। সন্দেহবশে কাউকে সাজা দেওয়া উচিত মনে করি না। সত্যিই যদি তোমার কিছু অপরাধ ঘটে থাকে, আল্লাহ তার নিখুঁত বিচার করবেন।

প্রৌঢ় চলে গেলে হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জাফর হামামে গেল। খুব ভাল করে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাক পরিয়ে খলিফার সামনে এনে হাজির করলো।

ধর্মাবতার, এই সেই মহানুভব হাসান। এর কথাই আপনাকে আমি বলেছিলাম।

খলিফা হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তোমাকে এমন কৃশ এবং অসুস্থ মনে হচ্ছে কেন?

এই কথায় কেঁদে ফেললো হাসান। তার ভাগ্য-বিড়ম্বনার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত করলো সে। খলিফা এবং জাফর হতবাক হয়ে শুনলো সব। খলিফা বললেন, ঐ নায়েবটাকে গ্রেপ্তার করে হাজির কর আমার সামনে। আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেব।

উজিরকে উদ্দেশ করে বললেন, এর কি বিষয়-আসয় দেনা-পাওনা ছিল সেখানে?

জাফর বললো, আমি ব্যক্তিগতভাবে এর কাছে তিরিশ লক্ষ্য দিনার ঋণী। সে টাকা আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি আজই। আর ওর প্রিয়তমা বিবি যে আমার কাছে অক্ষত অবস্থাতেই আছে তাকেও তুলে দেব এর হাতে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো চারতম রজনী

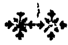
আবার সে বলতে শুরু করে:

খলিফার আদেশে দামাসকাসে এক সেনাপতিকে পাঠানো হলো। নায়েবকে বন্দী করে হাজির করা হলো তার সামনে। খলিফা হুকুম দিলেন, লোকটাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

এরপর বহুদিন বাগদাদে সুখ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত করার পর হাসান তার নিজের দেশ দামাসকাসে নায়েবের পদে বহাল হয়ে চলে গেল।

বিচারে আগের নায়েবের প্রাণদণ্ড হলো।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে বললো, এরপর, জাঁহাপনা, আপনাকে শাহজাদা হীরার কাহিনী শোনাবো।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

এক সময়ে এক দেশে এক ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তার নাম সামস্ শাহ। তার একটি মাত্র পুত্র-সন্তান। আচারে ব্যবহারে তার তুল্য শাহজাদা খুব কমই ছিল সে সময়।

একদিন শাহজাদা হীরা সুলতানকে বললো, আব্বাজান মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে, আমি দু' একদিনের জন্যে শিকারে যাবো ভাবছি।

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তার ইচ্ছা পূরণের কোনই ত্রুটি করলেন না সুলতান। লোকলস্কর সঙ্গে দিয়ে দিনক্ষণ দেখে ছেলেকে শিকারে পাঠিয়ে দিলেন।

শাহজাদা হীরা তার দলবল নিয়ে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলো। একটা বিশাল বটবৃক্ষের নিচে ছাউনি গাড়লো সে। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, সামনে কল্লোলিনী ঝরণা অবিরত ঝরে চলেছে।

এক সময় একটি খরগোশ তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে এল সেখানে। শাহজাদার ইশারায় তার দলের লোকেরা খরগোশটিকে ধরবার মতলব করলো। কিন্তু খরগোশটি ওদের চাতুরী বুঝতে পেরে পানি পানের আশা পরিত্যাগ করে প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো। হীরাও ছুটলো তার পিছনে। কিন্তু খরগোশের গতি রুদ্ধ করতে পারলো না শাহজাদার তাজি ঘোড়া। পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে এক সময় শাহজাদা এসে পৌঁছল এক জন-মানব শূন্য মরুপ্রান্তরে।

এক সময় এক বালীর পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল খরগোশটি। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো শাহজাদা। শেষ চেষ্টা করার জন্য সে বালী-পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলো। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পরও কোনও হদিশ করতে পারলো না খরগোশের।

পাহাড়ের ওপারে শস্যশ্যামল প্রান্তর দেখে শাহজাদা নিচে নেমে যায়। নানারকম গাছপালার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এক সময় সে এক মনোরম উদ্যানে এসে উপস্থিত হয়। একটা গাছের নিচে একটি সিংহাসন দেখে সেই দিকে এগিয়ে যায়। সিংহাসনে আসীন ছিলেন এক মুকুটধারী নরপতি। তার অঙ্গে মূল্যবান সাজ-পোশাক, কিন্তু কি আশ্চর্য তার পা দুখানা নগ্ন।

শাহজাদা হীরা-সম্রাটকে সালাম জানায়।

সম্রাট জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও সুলতান বাদশাহর সন্তান তুমি। কিন্তু এই জন-মানুষের অগম্য স্থানে কী করে এলে তুমি। এখানে তো বনের পাখিও কখনও উড়ে আসার সাহস করে না।

শাহজাদা তার খরগোশ অভিযানের কাহিনী বললো তাকে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু মহারাজ আপনি এই সিংহাসনে একা একা বসে আছেন কেন এখানে? মনে হচ্ছে আপনার কাহিনী আরও বিচিত্র।

সম্রাট বললো, হ্যাঁ, সত্যিই বড় অদ্ভুত সে কাহিনী। আমাকে সে সব কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করো না। তোমার তা শোনা উচিত হবে না, বাবা। শুধু শুধু তুমি মনে দুঃখ পাবে।

শাহজাদা বললো সেজন্য আপনি বিচলিত হবেন না সম্রাট, মেহেরবানী করে বলুন, আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

সম্রাট ক্ষণকাল মৌন থেকে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তা হলে শোনো, বাবা ঃ

এই মরূদ্যানে আসার আগে অগণিত পাত্রমিত্র সভাসদ এবং হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রবল পরাক্রমে ব্যাবিলনে রাজত্ব করতাম আমি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাতটি পুত্র-সন্তানের জনক হতে পেরেছিলাম। বিপুল বিত্ত-বৈভব ধনদৌলতের মালিক হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে রাজত্ব করছিলাম।

সবই সুন্দর যথাযথভাবে চলছিল। কিন্তু বিপর্যয় ঘটলো, যখন আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বহু দূর দেশ সিন মাসিনের রাজকুমারীর সাহচর্যে এল। তার পিতা সম্রাট তামুজের পুত্র সম্রাট কামুস। সে সময়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ নরপতি হিসাবে বিশ্ববন্দিত ছিলেন তিনি। রাজকুমারীর রূপের জেল্লার কাছে আকাশের চাঁদ ম্লান হয়ে যেত।

একদিন এক পর্যটক এসে উপস্থিত হলো আমার দরবারে। তার বিবরণ থেকে জানতে পারলাম সম্রাট কামুস-কন্যা বিয়ে করবে, সেই নিমিত্ত পর্যটক পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। দেশে দেশে ঘুরে সে সমস্ত রাজা বাদশাহদের কাছে এই শুভ বার্তা বিতরণ করে বেড়াচ্ছে।

রাজকুমারী বিবাহ করবে। কিন্তু পাত্র তার মনের মতো হওয়া চাই। মনের মতো বলতে কি বোঝাতে চায় পর্যটক, জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, না কোনও পরম রূপবান বীরপুরুষ বা অতুল ঐশ্বর্যের মালিক সে চায় না; তার যে স্বামী হবে তাকে একটি মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাতলে দিতে হবে।

—কী সে প্রশ্ন ?

পর্যটক জানালো রাজকুমারীর প্রশ্ন ঃ সাইপ্রাস এবং ফারকোনের মধ্যে সম্পর্ক কী ? এই প্রশ্নের যিনি প্রকৃত উত্তর করতে পারবেন রাজকুমারী তাঁরই গলায় মালা দেবেন। কিন্তু একটা শর্ত, যদি কোনও যুবরাজ তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন তবে তিনি তাঁর শিরশ্ছেদ করবেন।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বললো, আমি রাজি বাবা। রাজকুমারীর প্রশ্নের জবাব আমার জানা আছে। আপনি আমাকে সিন মাসিনে যাত্রা করার অনুমতি দিন।

পুত্রের নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তা না হলে সে এই ধরনের শর্তে রাজি হয়ে মৃত্যুর দিকে হাত বাড়াতে চায়। হাকিম বদ্যিদের ডেকে এনে তাকে পরীক্ষা করালাম। কিন্তু কেউই তাকে সুস্থ করে তুলতে পারলো না। আমি পুত্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার একই গোঁ, সিন মাসিনে সে যাবেই এবং সেই উদ্ভট প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে সম্রাট-দুহিতাকে বিবাহ

করে আনবে। কোনও ভাবেই যখন তাকে বিরত করা গেল না তখন আমি তাকে পাল্টা প্রস্তাব দিলাম, শোনো বাবা, সেই রাজকুমারীকে বিয়ে করার বাসনা যদি তুমি পরিত্যাগ করতে না পার তবে এক কাজ কর। সিন মাসিনে তুমি যাত্রা কর আমি তাতে বাধা দেব না কিন্তু একা তুমি যেও না সেখানে। আমি আমার এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। বীরের মতো গিয়ে সম্রাট কামুসের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যাকে দাবী কর। তাতে যদি সে সম্মত হয় ভাল রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সে যদি রাজি না হয় তা হলে যুদ্ধ করে তাকে বন্দী করবে। তাতে প্রয়োজন হলে আমার সমস্ত শক্তি আমি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবো না। ভেবে দেখ এই-ই হচ্ছে রাজধর্ম।

কিন্তু আমার পুত্র এ কথায় সম্মত হলো না।

—আপনি ঠিক বলছেন না বাবা। সিন সম্রাট তো আমাদের মর্যাদার কোনও হানি করেন নি। তাঁর প্রস্তাব যথেষ্ট সম্মানজনক। এখানে যুদ্ধের কথা আসে কি করে। না বাবা, আপনি বাধা দেবেন না, সিন মাসিনে আমি একাই যাবো। এ পরীক্ষা তো শৌর্যের বীর্যের না, এ প্রমাণ হবে আপনার পুত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। আমাকে সেই শিরোপা আদায় করে নিতে অনুমতি দিন, বাবা।

আমি বুঝতে পারলাম নিয়তি তাকে টানছে। বাধা দিতে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। আমি তার যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলাম। যথাসময়ে সে সিন মাসিনে রওনা হয়ে গেল।

যথা সময়ে খবর পেলাম, আমার পুত্র রাজকুমারীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে পারেনি বলে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। শোকে কাতর হয়ে শয্যা নিলাম আমি। সারা রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এল।

এরপর আমার দ্বিতীয় পুত্রের মাথাতেও সেই এক ভূত ভর করলো। আমার হাজার বরণ সত্ত্বেও তাকে বিরত করতে পারলাম না। সেও গেল সিন মাসিনের সম্রাট-কন্যার আশায়। কিন্তু অনিবার্য কারণেই তারও একই পরিণতি ঘটলো।

এইভাবে এক এক করে আমার বাকী পাঁচ পুত্রেরও জীবনান্ত ঘটলো ঐ সিন মাসিন সম্রাটের তরবারীর আঘাতে।

এ আঘাত আমি সহ্য করতে পারলাম না। সাম্রাজ্যের দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গেল, বিত্ত বৈভব বিক্রম সব তুচ্ছ মনে হলো আমার কাছে। তাই সব পরিত্যাগ করে বিরাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। চলতে চলতে অবশেষে একদিন জনমানবশূন্য এই মরূদ্যানে এসে আশ্রয় নিলাম। আজ আমি রিক্ত নিঃস্ব একা—বাদ্যবিহীন সম্রাট।

শাহজাদা হীরা সম্রাটের এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে চোখের জল রোধ করতে পারলো না।

ব্যাবিলন সম্রাটের কথা এখনকার মতো থাক, এবার শাহজাদা হীরার কাহিনী শুনুন:

খরগোশটা তাড়া করার সময় শাহজাদা হীরা তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নিতে চায়নি। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তবু শাহজাদা ফিরে এলো না দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। এদিক ওদিক সন্ধান করতে করতে এক সময় তারা বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তরে এসে উপনীত হলো। কিন্তু শাহজাদার সন্ধান করতে না পেরে প্রাসাদে ফিরে সুলতানকে সংবাদ জানানো প্রয়োজন মনে করলো।

এদিকে শাহজাদা হীরা ছাউনীতে ফিরে এসে তার দল-বলের কাউকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে প্রাসাদের উদ্দেশে ফিরে চললো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ছয়তম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুলতান সামস শাহ পুত্রকে ফিরে পেয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন বারংবার। কিন্তু শিকারে গিয়েও তার মনের দুঃখ একটুকু লাঘব হয়নি দেখে চিন্তিত হলেন।

হীরা বাবার কাছে সেই মর্মান্তিক কাহিনীটি খুলে বললো। শাহ বললেন, তুমি শান্ত হও বাবা, এমন কাহিনী শুনলে স্বভাবতই মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি আজই আমার দূত পাঠাচ্ছি সিন মাসিন সম্রাট কামুসের কাছে। আমি তাঁর কন্যাকে এখানে পাঠানোর জন্য দাবী জানিয়ে খৎ লিখছি। আমার ইচ্ছা ঐ রাজকন্যার সঙ্গে তোমার শাদি দেব। তার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি বহু মূল্যবান রত্ন মণি-মাণিক্য উপঢৌকন পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে। সে যদি আমার উপহার গ্রহণ করে তার রাজকন্যাকে সমর্পন করতে সম্মত হয় তবে কোনও ঝামেলাই থাকবে না। কিন্তু তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য। আর সে যুদ্ধে সম্রাট কামুসের লাশ লুটিয়ে পড়বে মসনদের নীচে। সে যদি সত্যিই বিচক্ষণ হয় তবে আমার প্রস্তাবে অমত করবে না।

শাহাজাদা হীরা বললো, না বাবা দূত পাঠিয়ে দরকার নাই। আমি নিজেই যাবো সম্রাট কামুসের সামনে। আমার বুদ্ধির জোরে রাজকুমারী মুরাকে জয় করে আনবো আমি। আপনি আমাকে অনুমতি করুন।

সুলতান গুম হয়ে থাকলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, তুমি আমার বংশের একমাত্র সলতে, আমার নয়নের মণি। তোমাকে আমি ঐ পর্যন্ত রাজার সামনে যেতে দিতে ইচ্ছা করি না। ঐ অসম্ভব আজগুবি প্রশ্নের জবাব দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সেধে মৃত্যুর কাছে মাথা নুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

শাহজাদা হীরা কিন্তু বাবার এ কথায় নিবৃত্ত হলো না। তার একচোখা মনোভাবের কিছুতেই পরিবর্তন করতে পারলেন না তিনি। বাধ্য হয়ে তিনি ছেলেকে সিন মাসিনে রওনা করে দিলেন।

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শাহজাদা সিন মাসিনে এসে উপস্থিত হলো একদিন। রাজার প্রাসাদ বহু দূরে থেকে নজরে আসে। পাহাড়ের চেয়েও উঁচু তার চূড়া।

প্রাসাদের সিংহদরজায় প্রবেশ করতে গিয়ে সোনার হরফে লেখা একটি সতর্কবাণী দেখলো শাহাজাদা। যদি কেউ রাজকুমারীকে লাভ করতে চায় তবে তাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে হবে।

প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সিংহদরজার সামনে বাঁধা ছিল বিশাল একটা দামামা। শাহজাদা দামামায় আঘাত করে আকাশ বাতাস কাঁপানো আওয়াজ তুললো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা। সশস্ত্র প্রহরী নমস্কার জানিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল।

সম্রাট বসেছিলেন সিংহাসনে। শাহজাদা হীরাকে দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কত শত যুবরাজ নিজের প্রাণ বলি দিয়ে গেল তাতেও তুমি চৈতন্য লাভ করতে পারলে না, প্রাণ দিতে এলে বাবা? আমার কথা শোন, তোমার ঐ অসম্ভব আশা পরিত্যাগ কর। তোমাকে দেখে প্রত্যয় হচ্ছে তুমি খুবই অভিজাত কোনও শাহবংশের সন্তান। আমি তোমাকে আমার দরবারের উচ্চপদে বহাল করছি। তুমি সানন্দে তা গ্রহণ করে নিজের প্রাণ রক্ষা কর! আমার কন্যা কি ধাতুতে গড়া আমি নিজেও জানি না বাবা, ঈশ্বর তাকে এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি দিলেন কেন তাও বুঝতে পারি না। কয়েক শ' রাজপুত্র তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে নিজেদের প্রাণ খোয়ালো, এ তো আমার ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু কি করবো, আমার কন্যার এক পণ, তাকে যে তর্কে হারাতে পারবে শুধু তাকেই সে বরণ করে নেবে স্বামীত্বে।

শাহজাদা হীরা বললো, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি এখানে তা থেকে বিচ্যুত হবো না কিছুতেই। আপনি রাজকুমারীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের আয়োজন করে দিন, আমি তাকে পরাস্ত করবো।

সম্রাট কামুস বললেন, পথশ্রমে এখন তুমি ক্লান্ত, উত্তেজিত। এখানে তিনদিন বিশ্রাম কর, খুব ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বার বার চিন্তা করে দেখ। তারপরও যদি তোমার মত না পালটায় অবশ্যই আমাকে তর্কযুদ্ধের আসর বসাতেই হবে।

সম্রাটের কথামতো শাহজাদা হীরা প্রাসাদে অতিথি হয়ে রইলো তিনদিন। রাজসিক আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলেন না সম্রাট। শাহজাদা হীরা বিকালে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে পায়চারী করে বেড়ায়। প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখে দুচোখ জুড়িয়ে যায় তার।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি সুন্দর ঝরণা দেখে সেইদিকে এগিয়ে যায় হীরা। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। ঝরণার জলে ভিজিয়ে দেয় তার সারা অঙ্গ।

অনেকক্ষণ ধরে ঝরণাধারায় সিক্ত হয়ে এক সময় সে উঠে এসে বসে এক

খোলা জায়গায়। গায়ে রোদ লাগিয়ে পরনের সাজ-পোশাক শুকোতে থাকে। যেদিকে তাকায় শুধু ফুল আর ফুল। কত শত বিচিত্র বর্ণের ফুলে ফুলে ভরা সারা বাগিচাটা। আর কত না নাম না জানা সুন্দর সুন্দর পাখি। গাছের ডালে ডালে নাচানাচি করে খেলে বেড়াচ্ছে। দেখে দেখে মন প্রাণ পূর্ণ হয়ে ওঠে।

অনেক পরে এক সময় হীরা উঠে প্রাসাদের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ তার চোখ পড়ে ঝরণার পাশে এক গালিচায় অর্ধশায়িতা এক বেহেস্তের হুরীর মতো পরমাসুন্দরী এক তরুণীর ওপর। তার চারপাশে বসে আছে তার প্রিয়সখিরা।

হীরা নিজেকে একটা গাছের গুঁড়ির আড়াল করে লুকিয়ে লুকিয়ে সুন্দরীর রূপ-সুধা পান করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। এমন সময় সম্রাট-নন্দিনীর এক সখি তাকে দেখে ফেললো।

—দেখুন রাজকুমারী, ঐ গাছের আড়ালে যেন এক যুবককে দেখতে পাচ্ছি।

সবাই চমকে ওঠে। রাজকুমারী মুরা নিজেকে আড়াল করার জন্য ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সখিদের সামনে দাঁড় করায়।

রাজকুমারী মুরার সবচেয়ে পেয়ারের সখি মতিয়া। সে বলে, আমার মনে হচ্ছে, এই অপরূপ সুন্দর যুবক ইহজগতের কেউ নয়। হয়তো স্বর্গ থেকে ধরায় নেমে এসেছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো সাত রাত্রিতে

আবার সে বলতে শুরু করলো ঃ

মুরা উঁকি দিয়ে দেখলো হীরাকে। মতিয়া বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই এমন রূপবান পুরুষ এর আগে সে দেখেনি কখনও।

প্রথম দর্শনেই ভালবাসা—কথাটার অর্থ বুঝতে পারতো না সে এতকাল। আজ হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করলো এই মুহূর্তে। এক পলকের মধ্যে তার সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল। বুকের মধ্যে কেমন যেন আকুপাকু করতে থাকলো। এরই নাম কি প্রেম ?

মুরা ক্রমশঃ অস্থির অশান্ত হয়ে ওঠে। কাটা মুরগী যেমন ছটফট করতে থাকে সেই রকম আর কি।

হীরার দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারে না। মতিয়া ঠাট্টা করে বলে, তাহলে রাজনন্দিনীর পণ এতদিনে ভাঙ্গলো ?

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায় মুরা। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, না না না, তা কিছুতেই হবে না, হতে পারে না। আমার দাবী পূরণ না হলে কেউ আমাকে পাবে না। কারো নিছক প্রেমে নিজেকে হারিয়ে দেবার পাত্রী আমি নই, মতিয়া। দাঁড়া, তোরা এখানে দাঁড়া, আমি নিজেই ওর সামনে যাচ্ছি।

রাজকুমারী মুরা শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হীরার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। ধীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে, আপনি আমাদের পরম আরাধ্য অতিথি। আপনার জন্য সমাদর মণ্ড ব্যবস্থা করা আছে। অনুগ্রহ করে সেখানেই আপনি সুখ-বিলাসে সময় অতিবাহিত করুন, ভদ্র। এ উদ্যানে আমরা বিহার করছি। এখানে আপনার থাকা শোভা পায় না।

রাজকুমারী মুরাকে কাছে পেয়ে হীরা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। খপ করে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বলে, অতসব কি হিসেব করে চলে জীবনটা অঙ্ক নয়, রাজকুমারী—

রাজকুমারী মুরা জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় হীরার গালে। তারপর হনহন করে হেঁটে বাগান থেকে বেরিয়ে চলে যায় প্রাসাদের অন্দরমহলে।

হীরা ব্যর্থ বিষণ্ণ হয়ে নিজের কক্ষে ফিরে আসে। সেখানে কিন্তু প্রায় সারা দিন-রাত রাজকুমারীর সখীরা তার পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে নিয়ত। তার পালংকে শয্যা রচনা করা, নানা উপচারে খানাপিনা সাজিয়ে দেওয়া, সুমধুর সংগীত-বাদ্যে মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা প্রভৃতিতে কোনই ত্রুটি রাখলো না তারা।

পরদিন একসময় মতিয়া হীরাকে একা পেয়ে প্রেম-নিবেদন করলো তার কাছে, আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য নই, তবু তোমাকে দেখা মাত্র আমি ভালবাসার আগুনে জ্বলছি। শুধু একটু দয়া কর, তোমার প্রেমের ভিখারিণী আমি, আমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না তুমি। অবশ্য তার বদলে আমি-তোমার অনেক উপকার করবো। তুমি যে ফাঁদে এসে পা রেখেছ, এ ফাঁদে কত শত রাজা-বাদশার ছেলে প্রাণ দিয়ে গেছে এর আগে জানো বোধ হয়। তোমারও সেই একই দশা হবে। এ অনিবার্য! একমাত্র আমিই পারি তোমাকে বাঁচাতে!

হীরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী ভাবে?

হীরার কিন্তু সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজকুমারী মুরাই মেয়েটিকে পাঠিয়েছে চর হিসাবে। মতিয়া বলে, রাজকুমারী মুরার দুঃসাধ্য প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে বহু শত প্রাণ বলি হয়েছে। আমি জানি ঐ কঠিন প্রশ্নের জবাব তুমিও দিতে পারবে না, এবং তোমারও ঐ একই দশা হবে। আমাকে বিশ্বাস কর শাহজাদা, আমি তোমাকে বাঁচার উপায় বাৎলে দেব। কিন্তু একটা শর্ত—আমাকে বিয়ে করে তোমার অংকশায়িনী করতে হবে। আমি হবো তোমার বেগমদের প্রধান। বল, রাজি?

হীরা তৎক্ষণাৎ মতিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললো, আমি রাজি।

মতিয়া বলে, আমাদের রাজকুমারীর পালংকের তলায় একটা হাবশী আছে। লোকটা এসেছে ওয়াকাক থেকে। ঐ লোকটার মাথা থেকে বেরোয় যতসব উদ্ভট প্রশ্ন। সবই ফিরকোন এবং সাইপ্রাস সম্বন্ধে। সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কেউ। দেওয়া সম্ভবও না। যদি তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে চাও তবে তোমাকে আগে যেতে হবে সেই ওয়াকাক দ্বীপে। সেখানে

গেলেই তুমি তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে। কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম। তবু তোমাকে যেতেই হবে সেখানে।

মতিয়ার কাছ থেকে পথ-নির্দেশ নিয়ে হীরা ওয়াকাকের পথে ঘোড়া ছুটালো।

চলতে চলতে এক মরূদ্যানে এসে এক গাছের তলায় এক দরবেশের দেখা পেল হীরা। তার পরিধানে সবুজ আলখাল্লা, পায়ে হলুদ রঙের চপ্পল। ঘোড়া থেকে নেমে যথাবিহিত সালাম সম্মান জানিয়ে হীরা জিজ্ঞেস করলে, মেহেরবানী করে আমাকে ওয়াকাকের পথ বলে দিন, পীরসাহেব।

পুণ্যাত্মা দরবেশ ক্ষণকাল মৌন হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, বেটা, তুমি শাহেনশাহর পুত্র, ঐ মানুষের অগম্য স্থানে তুমি যেতে পারবে না, অত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে না তুমি। ওপথে গেলে কেউ আর ফিরতে পারে না প্রাণ হারাতে হয়। তাই বলছি, বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

হীরা যুক্তকরে মিনতি করে, আপনি মহানুভব পীর, আপনার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য করেই বলছি, ফিরে যাওয়ার জন্য আমি পথে বেরোইনি। আপনি আমাকে পথ বলে দিন।

দরবেশ বুঝলেন শাহজাদাকে নিরস্ত করা যাবে না। তাই বললেন, শোন বাছা ওয়াকাক দুস্তর কাফ পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে। আমি জানি না ঐ দুর্গম গিরিসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে কি করে সেখানে পৌঁছতে পারবে তুমি। তুমি কি জান, ঐ কাকে একমাত্র জিন পরীরাই বসবাস করে? সেখানে কোনও মানব-সন্তান অদ্যাবধি পৌঁছাতে পারেনি। এখান থেকে যাওয়ার তিনটি পথ আছে। কিন্তু তার মধ্যে একটিমাত্র পথ কিছুটা চলার উপযোগী। আর দুটি একেবারেই দুর্লঙ্ঘ্য। যদি তুমি যাবেই ঠিক করে থাক তবে কাল অতি প্রত্যূষে এই ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে যাবে। যেতে যেতে এক সময় এক পাহাড়-পাদদেশে পৌঁছে একখণ্ড শিলালিপি দেখতে পাবে। লেখাটা কিউফিস কায়দায় প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করা আছে। সহজেই পড়তে পারবে সে লেখা। তা থেকেই তুমি যথাযথ নির্দেশ পেয়ে যাবে।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করে যথাসময়ে সে এক পাহাড়-পাদদেশে পৌঁছে সেই প্রস্তরফলক দেখতে পেলো। পাথরে খোদাই করে তিনটি কথা লেখা ছিল ঃ

যদি তুমি বাঁদিকের পথ ধরো, তবে তোমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যদি তুমি ডানদিকের পথ ধরে চলো, তবে পরিশেষে অনুতাপ করতে হবে। আর যদি মাঝের রাস্তায় যাও তবে দেখবে সে কি দুর্গম ভয়াল ভয়ংকর পথ।

শিলালিপি পাঠান্তে শাহজাদা হীরা মাঝের দুর্গম পথই বেছে নিল। এক মুঠি ধরণীর মাটি বুকে করে নিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। 'আল্লা যদি চান আমি ঐ পাহাড়চূড়ায় ওঠার আগেই ভূপতিত হয়ে রেণু রেণু হয়ে যাবো।'

পুরো একটা দিন আর রাত্রি পার হয়ে গেল। ভোরের আলো ফুটতেই চোখে পড়লো এক বেহেস্তের মনোরম দৃশ্য। লতাপাতা তরুশাখায় পল্লবিত কুসুমিত এক অনিন্দ্যসুন্দর উদ্যান। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আরও কাছে এসে বুঝতে পারলো বাগানের প্রবেশদ্বার এক বিশাল পাথরের চাই-এ অবরুদ্ধ করা আছে। এবং তার পাশেই প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে এক দৈত্যাকৃতি বিকট বিশাল নিগ্রো। তার মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে লৌহবর্ম, বুকে ঢাল এবং হাতে শাণিত খড়্গ। লোকটা চিৎপাত হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

শাহজাদা হীরা নির্ভয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। ঘোড়াটাকে নিগ্রোর মাথার কাছে খুঁটো করে পাথরের চাই বেয়ে ওপরে উঠে বাগানের মধ্যে নেমে গেল সে।

খানিকটা এগিয়ে যেতে হীরা দেখতে পেল একটি সুন্দর কুটীর। দরজা হাট করে খোলা। ঘরের ভিতরে এক রূপসী কন্যাকে দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেল হীরা।

মেয়েটিও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কে গো তুমি সুন্দর, এখানে এই বাগানে একটা পাখি পর্যন্ত উড়ে এসে বসতে সাহস পায় না, আর তুমি একজন মানুষ হয়ে কী করে প্রবেশ করলে ?

এই কন্যার নাম লতিফা। হীরা আভূমি আনত হয়ে অভিবাদন জানালো ওকে।

—কে তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী, জানি না। আমার নাম শাহজাদা হীরা। আমার বাবা···

নাম ধাম বংশ পরিচয় এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি একটানা সব গড় গড় করে বলে গেল হীরা।

সব শোনার পর লতিফা শাহজাদা হীরার হাত ধরে নিজের পাশে বসালো।

—কী ভীষণ কাজে তুমি পা বাড়িয়েছ সুন্দর, এতে যে তোমার প্রাণসংশয় হবে। এমন মরণফাঁদে পা দিতে গেলে তুমি ? হায় হায়, এখন কী করে এ সর্বনাশা পথ থেকে রেহাই পাবে তুমি ? এ যে কী সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর কাজ কী করে বোঝাবো তোমাকে। যদি তোমার নিজের জীবনের প্রতি এতটুকু দরদ থাকে তবে তুমি আর এগিও না, এখানেই বিরত হয়ে আমার দেহ-মনের একমাত্র মালিক বনে থাক আমার কাছে। আমাকে সুখের সায়রে ভাসিয়ে রাখ, এই আমার কামনা। আমার মনে হয় এক ভয়াল ভয়ঙ্কর কালোছায়ার কবলে পড়ে জান কবুল করার চেয়ে আমার মতো এক সুন্দরী মদালসার বুকে আশ্রয় নিয়ে সুখ-সম্ভোগে জীবন পরিপূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ তোমার পক্ষে।

হীরা বললো, তোমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখতে চাই না সুন্দরী, কিন্তু সবই সম্ভব হতে পারে যদি আমি ঐ ওয়াকাক দ্বীপে গিয়ে ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস

আমি সে কাজ সমাধা করে সশরীরে ফিরে আসবোই। তারপর তোমাকে সুখ দিতে আমার বাধা থাকবে না, সুন্দরী। কিন্তু এখন আমার চলার পথে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কথা দিচ্ছি, ফিরে এসে তোমাকে হৃদয়ের মণি করে রাখবো আমি। তোমার সব কামনা বাসনা চরিতার্থ করবো।

লতিফা আর্তনাদ করে ওঠে, না-না সে হবে না, হতে পারে না, ঐ মৃত্যুর গহ্বরে তোমাকে প্রবেশ করতে দেব না আমি—কিছুতেই না।

লতিফার ডাকে তার সখী-সাথীরা এসে বসলো চারধারে। মদের পেয়ালা পরিপূর্ণ করে নিজে হাতে তুলে ধরলো লতিফা, নাও তৃষ্ণা নিবারণ কর, সোনা।

হীরা একচুমুকে নিঃশেষ করে দিল পাত্রটি। আবার লতিফা ভরে দিল পেয়ালা।

সঙ্গীতে বাদ্যে মুখর হয়ে উঠলো কুঞ্জবন। লতিফা হীরার কণ্ঠলগ্ন হয়ে লাস্যময় কণ্ঠে মিনতি করলো, এত সুন্দর বেহস্ত ছেড়ে কোথায় যেতে চাও, সোনা?

হীরা এতক্ষণ সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। লতিফাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললো, এবার আমাকে যেতে হবে, সুন্দরী। বিদায় দাও। আর যদি কিছুক্ষণ এখানে আমি থাকি তবে মহব্বতের যে-আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাইছ আমার বুকে, তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আমার সব প্রতিজ্ঞা শপথ ছাই করে দেবে। সুতরাং আর নয়, এবার বিদায় দাও শাহজাদী। খোদা যদি ইচ্ছা করেন, তবে আবার আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে। সেদিন তুমি আমাকে যেমন ভাবে চাও প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেও, আমি 'না' বলবো না।

লতিফা ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো ফণা মেলে রুখে দাঁড়ালো, না, তা হবে না। আমি তোমাকে ছাড়বো না কিছুতেই।

এই বলে সে বিড় বিড় করে কী যেন সব মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে সামনে এগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে এক ঘুষি বসিয়ে দিল হীরার বুকে।

এই অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হীরা চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে দু তিনবার গড়াগড়ি খেল। ব্যস, তার পরই সে সুন্দর একটি হরিণ শাবকের আকার ধারণ করলো।

লতিফা ওর শিং-এ একটি মহামূল্যবান রত্নবলয় পরিয়ে দিয়ে বললো, কী কেমন লাগছে সখা? ঐ দ্রাক্ষাবনে তোমার মতো আরও অনেক হরিণ-শাবকরা চরে বেড়াচ্ছে, যাও তাদের সঙ্গে গিয়ে খেলা কর গে, সোনা।

পিঠে মৃদু করাঘাত করে হরিণ-শাবক হীরাকে আঙুরক্ষেতের দিকে পাঠিয়ে দিল লতিফা।

হীরা কিন্তু অন্য হরিণদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলো না। সুযোগ বুঝে টুক করে এক সময় বাগানের দেওয়ালের দিকে চলে গেল। এক জায়গায় প্রাচীরটা বেশ নিচু দেখে এক লাফে বাগানের বাইরে গিয়ে পড়লো হীরা। তারপর দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলতে লাগলো সে। সামনের

বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে হাওয়ার বেগে উড়ে চলতে থাকলো সে।

কিন্তু হায় একটানা বহুক্ষণ তীরবেগে ছোটার পরও সে বুঝতে পারলো, যেখান থেকে পালিয়েছিল ঘুরে ফিরে আবার সেই বাগানেরই গোলকধাঁধায় এসে পড়েছে সে।

আবার সে বাগান টপকে বাইরে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য সেবারও সে ফিরে আসে ঐ বাগানেরই খাঁচায়। এইভাবে পর পর সাতবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বাগানের গণ্ডী কাটাতে সক্ষম হলো না হীরা।

প্রায় হতাশ হয়ে সে বাগানের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এক জায়গায় এসে সে প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি মতো দেখতে পেয়ে তার মধ্যে দিয়ে শরীরটাকে চালান করে দিল।

এবার সে দেখতে পেল এক সুরম্য প্রাসাদ।

প্রাসাদের এক গবাক্ষে বসেছিল এক পরমাসুন্দরী শাহজাদী। হরিণ-রূপী হীরাকে দেখতে পেয়ে সে আনন্দে নেচে ওঠে। হাত নেড়ে নেড়ে আদর জানিয়ে কাছে ডাকতে থাকে হীরাকে।

হীরা জানলার দিকে এগিয়ে যায়। সুন্দরী তখন বাইরে বেরিয়ে এসে হীরার সামনে এক মুঠো ঘাস ধরে ডাকে, আয় আয়।

হীরা ক্ষুধার্তের মতোই শাহজাদীর কাছে ছুটে যায়। হাতের নাগালের মধ্যে আসতেই শাহজাদী জামিলা খপ করে চেপে ধরে হরিণটাকে।

এই জামিলা শাহজাদী লতিফার কনিষ্ঠা। ওদের দুজনের বাবা এক কিন্তু মা আলাদা।

একগাছি রেশমি রশিতে বেঁধে হরিণ-হীরাকে সে প্রাসাদের অন্দরমহলে নিয়ে গেল। সেখানে সে হীরাকে নানারকম মিষ্টি মিষ্টি ফলমূল খাওয়ালো। এবং হীরা যতটা পারলো পেটপুরে খেয়ে নিল সব।

খাওয়া শেষ হলে হরিণ-হীরা তার মাথাটা জামিলার কাঁধের ওপর রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। শাহজাদী ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো খুব।

এর পর হীরা তার মাথাটা শাহজাদীর পায়ের ওপর রেখে আবার কাঁদতে লাগলো।

—কী? কী হয়েছে, অমন করে কাঁদছো কেন তুমি? না না, অমন করে কেঁদ না সোনা, তোমার চোখে পানি আমি সইতে পারছি না। আমি তোমাকে জান দিয়ে ভালবাসবো, আদর যত্ন করবো। আমাকে ছেড়ে পালাবে না তো?

হীরার কান্না আরও বেড়ে যায়। নানা ভাবে সে মনের ভাষা ব্যক্ত করে বোঝাতে চেষ্টা করে জামিলাকে। জামিলার কেমন খটকা লাগে, বনের পশু এমন মানুষের মতো আচরণ শিখবে কী করে? নিশ্চয়ই এ কোন যাদু করা মানব-সন্তান। কেউ তাকে মন্ত্র দিয়ে হরিণ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু লতিফা ছাড়া এ যাদু তো এখানে আর কেউ জানে না। তবে কি তারই

দিদির অপকর্ম এটা।

লতিফাকে সে বাঘের মতো ভয় করে, তবু সব ভয় তুচ্ছ করে জামিলা তার দিদির ছোট্ট রত্ন-কৌটোটাকে তার ঘরের কুলুঙ্গী থেকে হাতিয়ে নিয়ে এল। তারপর প্রথামতো মুখ হাত ধুয়ে নতুন সাজ-পোশাকে খুব সুন্দর করে সাজগোজ করলো সে।

কৌটোটা খুলে তার ভেতর থেকে খানিকটা মন্ত্রপূত মণ্ডা তুলে নিয়ে হরিণটার মুখের মধ্যে পুরে দিল জামিলা। আর কি আশ্চর্য সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা গা ঝাড়া দিয়ে হীরা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো দশতম রজনীতে

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আভূমি আনত হয়ে জামিলাকে কুর্নিশ জানায় হীরা। বলে, তুমি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছ সুন্দরী, কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, কী ভাবে তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো, বুঝতে পারছি না।

জামিলা বললো, ও সব থাক, এখন এস তোমাকে মনের মতো করে সাজাই।

শাহজাদার সাজে পরিপাটি করে সাজালো সে হীরাকে।

- কেনই বা তুমি এদেশে এসেছিলে, আর কেনই বা তুমি আমার যাদুকরী দিদির জালে ধরা দিয়েছিলে ?

শাহজাদা হীরা আদ্যোপান্ত সব কাহিনীই খুলে বললো জামিলাকে।

সব শোনার পর জামিলা আতঙ্কিত হয়ে বললো, না না, ও মতলব তুমি ত্যাগ কর সোনামণি। অমন মরণফাঁদে ঝাঁপ দিতে যেও না তুমি। তোমার মতো এমন সুন্দর মূল্যবান প্রাণ এভাবে নষ্ট করে দিও না। তার চেয়ে বরং এখানেই তুমি সুখে সম্ভোগে সারাটা জীবন কাটিয়ে দাও। আমি তোমার পেয়ারের বাঁদী হয়ে থাকবো চিরকাল। তোমার জীবনের কোনও সাধই অপূর্ণ রাখবো না আমি। আমি যা বলছি সুবোধ ছেলের মতো কান পেতে শোন। এর চেয়ে ভাল আর কিছুতেই হবে না তোমার।

হীরা বললো, তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না কোনও দিন। তুমি অনুগ্রহ করে আবার আমাকে মানুষ না করে দিলে হয়তো যতদিন বাঁচতাম হরিণ-শাবক হয়েই বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হতো। তারপর হয়তো কোনও দিন কোনও এক হিংস্র বন্য জানোয়ারের পেটে চলে যেতাম। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি তোমার কাছে কয়েকটা দিনের ছুটি প্রার্থনা করছি, সুন্দরী। তুমি আমাকে খুশি মনে বিদায় দাও। ওপরে মেহেরবান আল্লাহ আছেন, তার দোয়ায় আবার আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে। তুমি আমাকে বাধা দিও না, ওয়াকাক দ্বীপে আমাকে যেতেই হবে। সেখান থেকে আনতে হবে ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্পর্কের জটিল সূত্র। ওয়াকাক থেকে ফিরে আসার পর আমি তোমাকে বুকে করে সারাটা জীবন সুখে কাটাবো ; কথা দিচ্ছি।

শাহজাদী জামিলা বুঝতে পারলো হীরাকে কিছুতেই বিরত করা যাবে না। সুতরাং বাধা দিয়ে কোনও লাভ নাই।

—শোন সোনা, নিয়তিকে কেউই এড়াতে পারে না। তোমার নিয়তি তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় জানি না। যাবে যখন পণ করেছ, আমি তোমাকে আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তিনটি বস্তু উপহার দেব। ওগুলো সঙ্গে রাখলে অনেক বিপদ এড়াতে পারবে তুমি।

একটা সিন্দুক খুলে একখানা সোনার তীরধনুক বের করলো জামিলা। আর বের করলো চীনা ইস্পাতের তৈরি একখানা শাণিত তলোয়ার এবং ঝকঝকে একটি তীক্ষ্ণ ফলা ভোজালী।

জামিলা বললো, এই যে সোনার তীরধনুক দেখছো, এটা ব্যবহার করতেন পয়গম্বর সালিহ্। এই তলোয়ারখানার নাম বজ্রবিছা—এটা ছিল সুলেমানের। এর এমন ধার পাথরের চাঁইও এক কোপে সাবানের মতো কেটে নেমে যেতে পারে। আর এই ভোজালীখানার মালিক ছিলেন পরমাত্মা তামুজের। এর ফলা পূত পবিত্র মন্ত্রে শোধন করা আছে। তাই, এই অস্ত্র হাতে থাকলে সম্মুখসমরে কেউই পরাজিত করতে পারবে না তোমাকে। এগুলো তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। ভালয় ভালয় ফিরে এসে আবার আমাকে ফেরত দিও। কিন্তু সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে ঐ ওয়াকাক দ্বীপে তুমি পৌঁছবে কি করে। ওখানে কি কোনও মানব-সন্তান পৌঁছতে পারে কখনও ? তবে হ্যাঁ. আমার চাচা সিমুর্গ যদি তোমাকে সাহায্য করেন তবে তুমি যেতে পারবে। একমাত্র তাঁরই জানা আছে ঐ পথঘাট। শোনো তোমাকে কানে কানে একটা কথা বলছি, খুব খেয়াল করে শুনবে।

এখান থেকে একটানা একদিন চলার পর একটা ঝরণা দেখতে পাবে। সেই ঝরণার পাশে দেখবে এক বিশাল প্রাসাদ। সেখানকার নরপতি এক নিগ্রো সম্রাট। তাঁর নাম টাকটাক। তার চারপাশে চল্লিশটি দৈত্যাকৃতির লালমুখো ইথিওপিয়ার জাঁদরেল সেনাপতিরা ঘিরে আছে। তাদের প্রত্যেকের অধীনে নিগ্রো-সম্রাটের পাঁচ হাজার সৈন্যের এক একটি বাহিনী আছে।

তোমাকে দেখে নিগ্রো-সম্রাট তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন। তার কারণ যে সব মহাস্ত্র তোমাকে আমি দিলাম সেগুলো দেখে তিনি মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়ে যাবেন।

অবশ্য তুমি তাঁর আতিথ্যে দুটো দিন কাটাবে সেখানে। তারপর তিনি তোমাকে আমার চাচার প্রাসাদে পাঠিয়ে দেবেন। আমার এই চাচাই একমাত্র মানুষ যিনি ওয়াকাকের সঠিক রাস্তা বাৎলে দিতে পারবেন। কিন্তু সোনা, যা বললাম তার এক চুল এদিক ওদিক কিছু করবে না, তাতে প্রাণ সংশয় ঘটতে পারে। কিন্তু আল্লা না করুন, সে রকম যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তবে আমার এ জীবন আমি আর রাখবো না। আমার দেহ মন প্রাণ সব তোমাকে সঁপে দিয়েছি। এখন থেকে তুমি ছাড়া আমার কোনও দ্বিতীয় চিন্তা থাকবে না। যতদিন তুমি না ফিরে আস, তোমায় পথ চেয়ে বসে থাকবো আমি। মুখে

খানাপিনা রুচবে না, চোখে নিদ আসবে না! দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটবে আমার দিবস-রজনী। শুধু এইটুকু ভেবে তুমি খুব সাবধানে সতর্কভাবে আমার কথামতো চলবে।

জামিলা হীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকলো।

জামিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পুরো একটা দিন চলার পর টাকটাক-সম্রাটের প্রাসাদে এসে পৌঁছল হীরা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো এগারোতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে :

প্রাসাদের দ্বাররক্ষী ইথিওপিয়ার হাবসী পালোয়ানদের একজন শাহজাদা হীরাকে দেখে দাঁত বের করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, যাক বাবা এতদিন বাদে একটা ফলার হবে মনে হচ্ছে। একেবারে নধরকান্তি শাহজাদা, তেল-চকচকে শরীর, ওহো বেড়ে স্বাদের হবে মাংস—

অন্য এক প্রহরী বলে, আর দেরি নয়, চটপট ওকে কাঁধে তুলে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক, কি বল?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশবারজন প্রহরী ঘেরাও করে ফেললো হীরাকে। শাহজাদা বুঝতে পারলো বিপদ আসন্ন। তৎক্ষণাৎ সে তরবারী কোষমুক্ত করে বাঁই বাঁই করে চালাতে লাগলো চতুর্দিকে। এবং সুলেমানের আশ্চর্য তরবারীর এক এক কোপে কচুকাটা হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলো সেই সব বীরপুরুষরা।

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে গিয়ে একজন সম্রাটকে ঘটনার বিবরণ জানালো।

সম্রাট তো ক্ষেপে আগুন হলেন। প্রধান সেনাপতি মাকসাককে হুকুম করলেন, এই মুহূর্তে পাকড়াও করে নিয়ে এস তাকে আমার সামনে।

এই মাকসাক বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা। তাকে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রাসাদ-ফটকে ছুটে এসে সে হীরাকে দেখতে পেয়েই বিকট আওয়াজ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কিন্তু হীরা তৈরিই ছিল! পলকের মধ্যে সে তামুজের ভোজালীখানা সোজা ঢুকিয়ে দিতে পারলো মাকসাকের কলিজায়। একটা পাহাড় যেন খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেল, গগন-বিদারী আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো প্রধান সেনাপতি সাহেব। আর উঠলো না।

প্রধান সেনাপতির পতন দেখে তার সাঙ্গপাঙ্গরা যে যার প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হীরা পিছু ধাওয়া করে তাদের জনাকয়েককে কোতল করে ফেললো পলকের মধ্যে।

মাকসাক নিহত হয়েছে শুনে সম্রাট টাকটাক ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁর তাবৎ সেনাপতিদের হুকুম করলেন, তোমরা এখনও এখানে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছ? যাও, এক্ষুণি লোকটার মুণ্ডু এনে হাজির কর আমার সামনে।

সম্রাটের হুকুম সত্ত্বেও একটি সেনাপতিও কিন্তু এক পা নড়লো না সেখান থেকে। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকল সকলে।

শাহজাদা হীরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাইরের ফটকে। আশা করেছিল আবার হয়তো কোনও বীরপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু তা হলো না দেখে সে পায়ে পায়ে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলো।

একটি দরজায় টোকা দিতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো। হীরা প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে। মেয়েটি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

সম্রাট টাকটাক রুখে এলেন হীরাকে খতম করে দেবার জন্য। তাঁর হাতে উদ্যত খড়্গ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হীরা বুঝতে পারলো ঐ বিশাল অস্ত্রের সংগে সম্মুখসমরে লড়াই করা তার পক্ষে শক্ত। তাই সে হাতে নিল সালিহর তীরধনুক।

অব্যর্থ লক্ষ্য। একটি মাত্র বাণে সম্রাট টাকটাক ধরাশায়ী হলেন। মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠলো. বাবা—

হীরা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, কেঁদ না রাজকুমারী, কেঁদ না! ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। এইভাবে আমার হাতে তোমার বাবা নিহত হবেন এই তাঁর লিখন ছিল। সেই কারণেই তা ঘটেছে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। মৃত্যু তাঁর হতোই আজ, ইহজগতের মেয়াদ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁকে চলে যেতে হলো। এ তো আনন্দের কথা, সুখের কথা, তুমি বৃথা শোক করো না, সুন্দরী।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী, সুন্দর?

ইসলামই আমার একমাত্র ধর্ম, রাজকুমারী।

—আপনার ধর্মের মূল মন্ত্র কী, শাহজাদা?

হীরা বললো, এককথায় বলতে গেলে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর বাণী: আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি। যারা মনে-প্রাণে ইসলামে বিশ্বাস করে তারাই প্রকৃত মুসলমান। এছাড়া বিধর্মীরা কাফের। তাদের অনন্তকাল দোজকবাস হয়।

রাজকুমারী আজিজা ইসলামে অনুরক্ত হয়ে পড়লো। বললো, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম, তোমার পথই আমার পথ, শাহজাদা। আজ থেকে আমি ইসলামধর্মে দীক্ষা নিলাম।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বারতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

এবার আপনি আমাকে আপনার বেগম করে নিন, শাহজাদা। আমি আপনার সংগে চলে যেতে চাই।

হীরা বললো, রাজকুমারী তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করে ধন্য হবো। কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব না। তার কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি এখানে, আগে সেই কাজ সমাধা করতে হবে। তারপর অবশ্যই তোমাকে আমি শাদি করে দেশে নিয়ে যাবো। আমার মা এবং বাবা শাহেন-শাহ সামস শাহ আমার পথ চেয়ে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন। সুতরাং আগে কাজ সমাধা করে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। ওয়াকাক দ্বীপ না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার অন্য কোনও চিন্তা নাই। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। আমি কথা দিচ্ছি, আমার কাজ শেষ হলে তোমাকে শাদি করে সঙ্গে নিয়ে যাব। বলতে পার কোথায় আমি দেখা পাবো জামিলার চাচা সিমুর্গ-এর। একমাত্র তিনিই আমাকে দুর্গম ওয়াকাকের পথ-নির্দেশ দিতে পারেন।

রাজকুমারী আজিজা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না শাহজাদা হীরা। আজিজা বুঝতে পারলো চোখের জল ফেলে শাহজাদার শপথ ভঙ্গ করা যাবে না। তাই সে বললো, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন আমি সিমুর্গ-এর কাছে নিয়ে যাবো আপনাকে।

প্রাসাদের পিছনে বিশাল বাগিচা। আজিজার পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলে হীরা।

বাগানের মাঝখানে এক বিশাল বটবৃক্ষ। তার নিচে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে এক বিশাল-বপু ঈগল। হীরার কানে কানে ফিস ফিস করে আজিজা বললো, এই সেই সিমুর্গ, জামিলার চাচা। ঐ বিরাট বিরাট ডানা মেলে অবাধে আসমান পথে উড়ে উড়ে চলে। ঘুম ভাঙ্গার পর ও যদি প্রথমে ডান চোখ খুলে তোমাকে দেখে তবে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। তুমি যা বলবে অবাধে তাই সে করে দেবে। কিন্তু যদি কপাল মন্দ হয় তবে ঘুম ভাঙ্গলে প্রথমে বাঁ চোখ মেলে দেখবে তোমাকে এবং তোমার সব আশা-ভরসার ইতি হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। আর হাজার চেষ্টা করেও ওকে আকাশে ওড়াতে পারবে না। এখন দেখ, আল্লাহ তোমার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন।

এই বলে আজিজা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাগান থেকে প্রাসাদের দিকে ফিরে চললো। হীরা একাই সেখানে দাঁড়িয়ে সিমুর্গের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

প্রায় এক ঘন্টা পরে সিমুর্গ আড়মোড়া ভেঙ্গে ডান চোখ খুলে তাকালো হীরার দিকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো। তুমি এক মানব-সন্তান, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, এই নির্বিন্ধ দেশে এসে পৌঁছলে কী করে?

তখন শাহজাদা হীরা তার সব কাহিনী খুলে বললো সিমুর্গকে। সিমুর্গ বললো, জামিলা যখন তোমাকে পাঠিয়েছে তবে আর কথা নাই। ঠিক আছে, অপেক্ষা কর, দানাপানির আগে বন্দোবস্ত করে নিই তারপর তোমাকে নিয়ে আকাশে উড়বো। অনেক দিনের পথ, তাই গোটাসাতেক বন্য গাধা মেরে তার

মাংসের কাবাব বানিয়ে নিচ্ছি আমি। ঐ কাবাব আর খানিকটা পানি সংগে নিলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না।

তখুনি সে উঠে গিয়ে জংগল থেকে সাতটা বুনো গাধা শিকার করে আনলো। আচ্ছা করে পুড়িয়ে কাবাব বানানো হলো। এক জালা জল আর কাবাবগুলো গলায় বেঁধে হীরাকে বললো সে, এসো, আমার পিঠে চেপে বস। তোমাকে নিয়ে আমি উড়ে যাবো ওয়াকাক দ্বীপে।

হঠাৎ এক লাফ দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলো সিমুর্গ। শোঁ শোঁ করে একটানা উঠে গেল মেঘের ওপরে। তারপর দিক্-নির্ণয় করে বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকলো। পাখির মত উড়তে উড়তে অবাধে অনেক সমুদ্র পর্বত হ্রদ নদী-প্রান্তর পার হয়ে চললো ওরা। চলতে চলতে ক্ষুধার্ত হলে এক সময় ক্ষণকালের জন্য ধরায় নেমে আসে, খানাপিনা শেষ হলে আবার আকাশ পথে যাত্রা শুরু হয়।

রাত্রির অন্ধকার কেটে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে আবার চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো চোদ্দতম রজনীতে
আবার সে বলতে থাকে

এইভাবে সাতটা দিনরাত্রি অতিক্রান্ত হয়। হঠাৎ ওদের নজরে পড়লো এ ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রার মতো একটি চমৎকার শহর। নানারকম তরু বৃক্ষ লতা-পাতায় ঘেরা একটি রাজ্যপাট।

সিমুর্গ বললো, তুমি আমার পুত্রতুল্য হীরা। তোমার জন্য এই পথশ্রম আমার কাছে আনন্দেরই হয়েছে। এবার তোমাকে আমি এক বিশাল প্রাসাদের ছাদের ওপর নামিয়ে দেব। এই হচ্ছে সেই ওয়াকাক শহর। রাজকুমারী মুন্নার পালঙ্কের নিচে যে হাবশীটি অবস্থান করছে, এই তার স্বদেশ, জন্মভূমি। এখান থেকেই তোমাকে ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

প্রাসাদের ছাদে নামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ সিমুর্গ তার মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে হীরার হাতে দিয়ে বললো, যদি কখনও খুব প্রয়োজন হয় এই চুলে আগুন ধরিয়ে দিও। যেখানেই থাকি বায়ুবেগে ছুটে আসবো তোমার কাছে।

এই বলে সে আবার শূন্যালোকে উঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছাদের ওপর বসে বসে একমনে ভাবছিল হীরা। হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ পড়লো এক মধুর কণ্ঠস্বরে।

—কে আপনি নরবর, আমার এই প্রাসাদে পদার্পণ করে ধন্য করেছেন আমাকে? আপনার মতো রূপবান মানুষ আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। জানি না মানব-সন্তান এমন নিখুঁত সুন্দর হতে পারে কিনা। আপনি কি বেহেস্তলোকের কোনও জীন?

শাহজাদা হীরা বলে, না না আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ধরারই মনুষ্য-সন্তান। নিয়তিই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

নওজোয়ান যুবক হীরার হাতে ধরে সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদের নিচে নেমে গেল।

অতিথিশালার এক সুসজ্জিত মনোরম কক্ষ। হীরা মুগ্ধ চোখে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। যুবক বললো, এই আপনার থাকবার ঘর। যদি আদর-যত্নের কোনও ত্রুটি ঘটে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

দুজনে বসে একত্রে আহারাদি সমাধা করলো। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হতে থাকে।

যুবকের নাম ফারাহ, ওয়াকাক সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

কথায় কথায় হীরা বলে, দোস্ত ফারাহ, তোমার কথায় বুঝতে পারলাম সম্রাট তোমাকে বিশেষ নেকনজরে দেখেন। তাহলে এও নিশ্চয়ই সম্ভব, তাঁর সাম্রাজ্যের বহু গোপন বিষয়ও তোমার গোচরে এসেছে।

ফারাহ বললো, অবশ্যই। তোমার কী কী জানা প্রয়োজন, বল। আমি যেভাবেই পারি তা সংগ্রহ করে দেব তোমাকে।

হীরা বললো, মাত্র একটি প্রশ্নেরই সঠিক জবাব আমি জানতে চাই, ফারাহ। তা হলো : ফিরকোন এবং সাইপ্রাসবাসীদের প্রকৃত সম্পর্ক কী? শুধু এই উত্তরটুকু পেলেই আমার এত শ্রম সার্থক হবে। এই সংগে তুমি আমাকে আর একটি রহস্যের সন্ধান করে দাও, এখানকার এক নিগ্রো যুবক কেনই বা সিন মাসিন সম্রাট-দুহিতা মুরার শয্যাকক্ষে পালংকতলায় অবস্থান করছে?

হীরার এই কথা শুনে ফারাহর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভূত দেখার মতো দু পা পিছিয়ে গেল সে।

—না না, ও কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, দোস্ত। অন্য যে কোনও কথা জানতে চাও আমি এখুনি তোমাকে বলে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই তোমার, এই গোপন তথ্য তুমি জানতে চেও না আমার কাছে! আমাদের সম্রাটের ফরমান যদি কোন বিদেশীর কাছে কেউ সাইপ্রাস বা তার সম্রাজ্ঞী ফিরকোন সম্বন্ধে কোনও কথা উচ্চারণ করে তার ফাঁসী হবে। নিগ্রো এবং রাজকুমারী মুরার ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যদি তুমি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি যদি তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়ে কিছু বলেন সে কথা আলাদা।

হীরাকে সংগে করে যুবক সাইপ্রাস সম্রাটের সামনে এসে অভিবাদন জানালো। হীরাকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন হীরার দিকে। হীরা তার গলা থেকে লাল মুক্তোর মহা-মূল্যবান হারটা খুলে সম্রাটের হাতে তুলে দিল। এ তার ভেট। সম্রাট বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, হারটা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য অমূল্য রত্ন দিয়ে তৈরি। তাঁর সারা ওয়াকাক সাম্রাজ্যের তাবৎ সম্পদের চেয়েও দামী। সম্রাট হীরার উপহার সানন্দে গ্রহণ করে বললেন, এর প্রতিদানে তুমি যা চাও, তাই আমি দিতে পারি যুবক, বল কী চাও?

হীরা বললো, আপনি মহানুভব সম্রাট, আপনি আপনার নিজগুণে

মহিমান্বিত। যদি অভয় দেন তবে আমার আর্জি পেশ করতে পারি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো পনেরতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সম্রাট অভয় দিয়ে বললেন, কোনও ভয় নাই, দ্বিধা না করে নির্ভয়ে তুমি বল। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

হীরা মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, মহা-রাজাধিরাজ, অন্ধ ও বধিররাই এ জগতে সুখী। কারণ দুনিয়ার যা কিছু দুরাচার তা তারা দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। আমি আপনাকে আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করছি, আপনি নিজগুণে আমাকে মার্জনা করবেন।

এই বলে হীরা তার ওয়াকাক আসার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলো সম্রাটের সামনে।

—বলতে পারেন, আমার নিয়তিই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আপনার সামনে। এবার আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন নরপতি, এই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আপনি বলুন, আমাদের মহানুভব সম্রাটের সঙ্গে মহিয়সী সম্রাজ্ঞী ফিরকোনের প্রকৃত সম্পর্ক কী? আর রাজকুমারী মুরার শয্যাকক্ষে অবস্থান করছে সেই নিগ্রোটাই বা কে?

সাইপ্রাস-সম্রাট ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। পলকে পরিবর্তিত হয়ে গেল তাঁর মুখমণ্ডল। সে অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর। মনে হলো এখুনি বুঝি সে চিৎকার করে গগন ফাটিয়ে দেবে। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তাঁর সারা শরীর। ঘেমে নেয়ে উঠলেন তিনি।

—কে তুমি পরদেশী যুবক! নেহাতই আজ আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, না হলে যে কথা তুমি উচ্চারণ করেছ, তারপর এতক্ষণ তোমার ঘাড়ে মাথাটা থাকতো না।

প্রচণ্ড জোরে তিনি একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন সিংহাসনের হাতলে।

হীরা যুক্তকরে মিনতি জানায়, অধমের ঔদ্ধত্য মার্জনা করুন, প্রভু। আপনি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাই প্রশ্ন তুলতে সাহস করেছি আমি। আপনি কথা দিয়েছেন আমার অভিলাষ অপূর্ণ রাখবেন না।

নিরুপায় সাইপ্রাস-সম্রাট হতাশায় ভেঙে পড়লেন। নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। এখন কিছুতেই মুক্তি নাই তাঁর।

সম্রাট বললেন, শোনো শামস শাহজাদা, কেন তুমি এ কথা জানতে চেয়ে আমাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চাইছ? তার চেয়ে এ প্রশ্ন তুলে নিয়ে অন্য কোনও কিছু যাচ্ঞা কর আমার কাছে। আমি তোমাকে আমার রাজত্বের অর্ধেকও দিয়ে দিতে পারি খুশি মনে। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর জানতে

চেও না আমার কাছে।

হীরা বললো, আপনার ধন-দৌলত, নারী, সাম্রাজ্যে কোনও অভিলাষ নাই আমার। আমি শুধুমাত্র ঐ দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রার্থনা করি আপনার কাছে।

সম্রাট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বেশ, তাই হবে। আমি যখন তোমাকে কথা দিয়েছি, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদা, আমার গুপ্ততথ্য শোনার পর তোমার মৃত্যু অবধারিত হয়ে যাবে। তাকে অতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব না কিছুতেই।

হীরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুতাপ থাকবে না আমার মহারাজাধিরাজ। আমি ঐ গোপন তথ্য জানার পর এ মাথা নিজেই আমি পেতে দেব আপনার ঘাতকের খড়্গতলে। যে কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এত দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করে আপনার দরবারে এসেছি সেই কৌতূহল চরিতার্থ হলেই আমি ধন্য হবো। জীবনের প্রতি আমার কোনও মোহ নাই। আজ হলেও মরতে হবে, কাল হলেও মরতে হবে। এ দুনিয়ায় কেউ চিরকালের জন্য আসেনি।

সম্রাট গভীর মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন। মাথা নিচু করে নীরব হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর ইশারা করে সবাইকে দরবারকক্ষ ত্যাগ করে বাইরে যেতে নির্দেশ করলেন।

দরবারকক্ষ খালি হয়ে গেল নিমেষে। একটু পরে বারজন ইথিওপিয়ার লালমুখো সশস্ত্র ফৌজ-এর সঙ্গে একটি পরমাসুন্দরী তরুণী এসে দাঁড়ালো সেখানে। তার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা।

একটি বিরাট গালিচার এক প্রান্তে বসেছিল হীরা। মেয়েটি গিয়ে বসলো তার অপর প্রান্তে। একটি সোনার রেকাবীতে করে একটি নিগ্রোর কাটামুণ্ডু এনে স্থাপন করা হলো তরুণীর সম্মুখে। দেখে মনে হয় নরমুণ্ডুটি সদ্য কেটে আনা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়, এক ধরনের লবণের আরক দিয়ে জারিত করে রাখা হয়েছে মাথাটা। তার ফলে কোনও বিকৃতি ঘটেনি বা পচে যায়নি।

সাইপ্রাস সম্রাট বললো, এই আমার রাণী ফিরকোন।

হীরা বললো, মহারাজ, মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে এখানে উপস্থিত না করলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। আমি তার দর্শন প্রার্থনা করিনি। আপনার কাছে শুধু জানতে চেয়েছি আমার প্রশ্নের উত্তরটুকু মাত্র।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো ষোলতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

হীরার কথা শুনে মহারাণী ফিরকোন হাসলেন একটু, এর পরক্ষণেই কেঁদে ফেললেন। আর কী আশ্চর্য, তার কান্নার অশ্রু পান্না হয়ে ঝরে পড়লো, এবং হাসির সংগে সংগে রাশি রাশি গোলাপ ফুলে ভরে গেল তার সামনেটা।

সাইপ্রাস সম্রাট বলতে থাকেন: একদিন আমি শিকারে বেরিয়ে এক ধু ধু করা মরুপ্রান্তরের মধ্যে দারুণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলাম। এদিক ওদিক হন্যে হয়ে ছুটতে থাকলাম এক গণ্ডুষ জলের জন্য। কিন্তু ঐ তপ্ত বালীর রাজ্যে জল কোথায় পাবো? ক্রমশঃ আমি ভীত আতঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত যদি তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে না পারি তবে নির্ঘাৎ বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে এই মরুভূমির মধ্যে।

খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে একটা বিরাট ইন্দারা মতো দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বহু প্রাচীন এক কূপ। অতীত কালে কোনও প্রবল পরাক্রান্ত শাহ বাদশা বহু জনবল প্রয়োগ করে এই মরুভূমির তলদেশে জল সন্ধান করেছিলেন।

দেখে আন্দাজ করতে পারলাম, জল আছে। কিন্তু সে প্রায় পাতালের কাছাকাছি। অত নিচে থেকে ওপরে তোলার সরঞ্জাম বলতে তো আমার সঙ্গে নেই কিছু।

অবশেষে আমার মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিলাম কুয়ার নিচে। ধাতু-নির্মিত শিরস্ত্রাণ জল স্পর্শ করলো বুঝতে পারলাম, আশায় দুলে উঠলো বুক। যাক, এবার পিপাসার জল পাবো, প্রাণে মরবো না এই মরুদেশে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এই ছোট একটি ধাতুর পাত্র প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওপরে আর ওঠাতে পারলাম না। তুচ্ছ জলের ভার এর কারণ নয়, খটকা লাগলো, নিশ্চয়ই অন্য কোনও বিপত্তি ঘটেছে!

এদিকে ক্রমশই তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে গলা, ছাতি ফেটে যায় যায় প্রায়। আমি তার-স্বরে চিৎকার করে উঠলাম, কে আছ কুয়ার তলায়, তুমি জিনই হও আর দৈত্য-দানবই হও, দয়া কর আমাকে। আমার তৃষ্ণার জলটুকু ছেড়ে দাও। না হলে এখনই আমার প্রাণ যাবে।

বার বার আবেদন করার পর সাড়া মিললো। কুয়ার নিচ থেকে আর্তকণ্ঠ ভেসে এল, মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। শোনো খোদার বান্দা, যদি এই কূপ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করতে পার, আমরা তোমাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দেব। মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকা শ্রেয়ঃ, সুতরাং কোসিস্ কর, আমাদের বাঁচাও।

সেই মুহূর্তে তৃষ্ণার কষ্টের কথা ভুলে গেলাম আমি। জানি না, কোথা থেকে অত শক্তি আমি আহরণ করতে পারলাম, প্রাণপণ চেষ্টায় দড়ি টেনে টেনে আমার শিরস্ত্রাণ আঁকড়ে থাকা দুটি বৃদ্ধা অন্ধ নারীকে টেনে তুলতে পারলাম ওপরে।

—তোমরা এখানে আটকা পড়েছিলে কীভাবে?

বৃদ্ধারা জানালো, তারা তাদের সম্রাট জীনের কোপে পড়েছিল। তাই শাস্তি হিসাবে তাদের অন্ধ করে এই কূপে নিক্ষেপ করেছেন তিনি। তুমি আমাদের উদ্ধার করে মহা উপকার করেছ। এবার যদি আমাদের চক্ষুদান করতে পার

তাহলে আরও খুশি হবো।

আমি বললাম, কিন্তু আমি কী করে তোমাকে চক্ষুদান করতে পারবো ?

—পারবে, একজন বৃদ্ধা বললো, এখান থেকে সামনের দিকে খানিকটা এগোলে এক নদী পাবে। সেই নদীর ধারে একটি গাভী দেখতে পাবে। ঐ গাভীর গোবর যদি আমাদের চোখে মেখে দিতে পার তবে আমরা চক্ষুষ্মান হতে পারবো। কিন্তু সাবধান, ঐ গাভী যেন কোনক্রমেই তোমাকে দেখে না ফেলে। তা হলে তা তোমার পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হবে।

ওদের কথামতো খানিকটা পথ এগোতে একটা নদীর তীরে এসে পেঁছিলাম। কিন্তু এদিক ওদিক খুঁজেপেতেও কোন গরুর সন্ধান পেলাম না। যাই হোক বৃদ্ধাদের কথামতো একটি গুপ্ত স্থান বেছে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে জল থেকে ওপরে উঠে এল ধবধবে সাদা একটি গরু। গরুটা সবুজ ঘাসের ওপর চরে বেড়াল খানিকক্ষণ, তারপর গোবর ছেড়ে আবার নদীর জলে নেমে তলিয়ে গেল।

তক্ষুণি আমি ঐ গোবরের খানিকটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম সেই ইন্দারার কাছে। বৃদ্ধা দুটির চোখে কাজলের মতো লাগিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দৃষ্টি ফিরে পেল।

—মালিক, আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা আমার হাত জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো, আজ তোমার দয়ায় আমরা জান ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম আমাদের চোখের দৃষ্টি। কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা নাই। কী দিয়ে তোমার এই উপকারের প্রতিদান দিতে পারি, বল মালিক। ধনদৌলত চাও ? অথবা কোনও রূপসী পরী ?

আমি বললাম, ঈশ্বরের কৃপায় শৌর্য বীর্য বা সম্পদের অভাব নাই কিছু। কিন্তু ঐশ্বর্য বা বল-বিক্রমই জীবনের সব অভাব পূরণ করতে পারে। হৃদয় পরিপূর্ণ হতে পারে একমাত্র নারীর ভালবাসায়। তা যদি দিতে পার, আমি সানন্দে গ্রহণ করতে পারি, মাসী। অন্য কিছু চাই না।

বৃদ্ধারা এমন এক রূপসী কন্যার বর্ণনা দিল যা চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না—তেমন কোনও নারী আদৌ কোথাও থাকা সম্ভব কিনা।

—ও আমাদের জিন-সম্রাটের কন্যা। তার রূপের কাছে পূর্ণচাঁদ ম্লান হয়ে যায়। তাকে দেখলে সূর্য নিজের দীপ্তির দৈন্য ঢাকতে মেঘের আড়ালে মুখ লুকায়। মা বাবার মাথার মণি সে। সেই কন্যাকে তোমার হাতে তুলে দেব আমরা। আমরা আশা করি, তাকে পেয়ে তোমার জীবন-যৌবন ধন্য হয়ে যাবে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো সতেরতম রজনীতে
আবার গল্প শুরু হলো :

—কিন্তু একটা কথা, কোনক্রমেই যেন জিন-সম্রাট তোমাকে না দেখে ফেলে। তা হলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে তোমায়। যাই হোক তেমন কোনও বিপদ যাতে তোমার না ঘটে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তোমার সারা অঙ্গে একপ্রকার তেল মালিশ করে দেব আমরা। তার ফলে হাজার বছর ধরে যদি তুমি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে শুয়ে থাক, তোমার একগাছি লোমও পুড়বে না, কোনও তাপ লাগবে না। বরং মনে হবে ইরানের কোনও শাহেনশাহর বিলাসবহুল হামামে বসে সুগন্ধী আতরখানির মধ্যে বসে গোসল করছ?

এইভাবে প্রলুব্ধ এবং সতর্ক করে ওরা আমাকে জিন-সম্রাটের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুললো।

প্রাসাদের অন্দরে সম্রাট-নন্দিনীর মহলে এনে হাজির করলো আমাকে। সত্যিই আমি অবাক হলাম। পালঙ্কে নিদ্রিতা স্বল্পবাস সুন্দরীকে প্রত্যক্ষ করে জীবন ধন্য হয়ে গেল আমার। উদগ্র কামনার বহ্নিতে দগ্ধ হতে লাগলো দেহমন। মনে হতে লাগলো এই-ই পুরুষের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। এ মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করতে না পারলে জীবনে বেঁচে থাকার আর কোনই মানে থাকবে না।

ওর ফুলের মতো সুন্দর মুখশ্রীর দিকে একভাবে অপলক চোখে কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম জানি না—সম্বিত ফিরে পেলাম সুন্দরীর সুমধুর ভর্ৎসনায়, তুমি তো দেখছি মনুষ্য-সন্তান। কিন্তু এখানে আসার দুঃসাহস তোমার কী করে হলো, সুন্দর? কে তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে? তোমার কী জীবনের ওপর এতটুকু মায়া নাই? জান কি, একটু পরেই তোমার দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?

তার কথায় আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত বা শঙ্কিত না হয়ে বললাম বিলক্ষণ জানি সুন্দরী। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার যে রূপসুধা পান করলাম তার বিনিময়ে অবহেলায় দিতে পারি এ জীবন। খোদা হাফেজ, তুমি আমারই জন্য জন্মেছ প্রিয়া। আমিও তোমারই জন্য জন্মেছি। তোমার কাজল-কালো চোখের মণিতে সে কথা লেখা আছে, পড়ে দেখ। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে আমার সঙ্গে চল, সুন্দরী।

হঠাৎ মেয়েটি শয্যাত্যাগ করে ছুটে এল আমার বাহুবন্ধনে। দারুণভাবে জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে। চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে। তারপর প্রায় টেনে হিঁচড়েই নিয়ে এসে ফেললো আমাকে তার পালঙ্কশয্যায়।

এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তাৎক্ষণিক বিচার-বুদ্ধিই আমাকে সব বলে দিল কী ভাবে কী করতে হবে।

সেই নির্জন কক্ষে আমি সে আর ঈশ্বর ছাড়া চতুর্থ কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব

ছিল না। সারাটা দিন, সারাটা রাত অমৃতসুধা পান করতে থাকলাম আমরা। আমার দেহ মন প্রাণ তার মধ্যে লীন করে দিয়ে অমর্ত্যলোকের আনন্দসায়রে ভেসে বেড়াতে থাকলাম।

এইভাবে পুরো একটা মাস সুখ-সম্ভোগের দিবস-রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অবশেষে দুঃখের দিন সমাগত হলো। একদিন অতি প্রত্যুষে জিন-সম্রাট কন্যা-সন্দর্শনে তার কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

এর পরের ঘটনা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো শাহজাদা। জীন-সম্রাটের প্রহরীরা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল এক কাঠের গাদার সামনে। আমি বুঝতে পারলাম, ঐ কাঠের চিতায় আমাকে পোড়ানো হবে।

ইতিমধ্যে সারা প্রাসাদে খবর চাউর হয়ে গেছে। বৃদ্ধা দুটি আমার কাছে এসে বললো, ভয় নাই। এখুনি তোমার সারা দেহে ঐ তেল মালিশ করে দেবে এক নফর।

এবং তাই করে দিল একটি নিগ্রো বান্দা। একটু পরে কাঠের গাদায় আগুন দেওয়া হলো। লেলিহান শিখা মেলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো অগ্নিকুণ্ড। আমাকে নিক্ষেপ করা হলো তার মধ্যে।

মুহূর্তের মধ্যে গনগনে আগুনের শয্যায় শুয়ে পড়লাম আমি। আর কী আশ্চর্য, দেহে কোনও উত্তাপ অনুভব করলাম না। তার বদলে মনে হতে লাগলো আমি যেন কোনও এক শাহেনশাহর হামামে স্নান করছি।

সারাদিন রাত ধরে চুল্লীতে কাঠ ফেলা হলো। সম্রাট হুকুম করলেন এবার চিতা নিভিয়ে দিয়ে লোকটার হাড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করে আবার তা চিতায় চাপিয়ে দে।

প্রহরীরা চিতা নিভিয়ে অবাক হয়ে গেলো, আমি পুড়ে তো ছাই হই-ই নি বরং তাজা ফুলের মতো আরও সরেস, সজীব হয়ে উঠেছি।

আমার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে জিন-সম্রাট হতবাক হয়ে গেলেন। এমন কাণ্ডও যে ঘটতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। এমন এক পাত্রের সংগে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। যখন তিনি আমার বংশপরিচয় শুনলেন তখন আর কোনও আপত্তি রইল না।

এইভাবে আমি জিন-সম্রাট-কন্যাকে বিবাহ করে প্রাসাদে নিয়ে এলাম।

শাহজাদা হীরা তুমি যাকে তোমার সামনে দেখছো এখানে এই সেই জিন-সম্রাট-নন্দিনী, আমার প্রিয়তমা রানী।

আমার প্রাসাদে আসার পর, কেন জানি না সম্রাট-কন্যা ফিরকোন অসুস্থ হয়ে পড়লো।

—তোমাকে খুব অসুস্থ দেখছি, রানী?

রানী ফিরকোন বললো, ও কিছু নয়, মহারাজ। আমি বেশ ভাল আছি। সংগে সংগে সে উঠে পড়লো। হাত মুখ ধুয়ে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লো, এবং যথারীতি আমার দেহ কামনা প্রশমিত করলো।

এর কয়েকদিন বাদে আবার সেই একই ঘটনা। ঘরে ঢুকে দেখলাম, প্রায়

নেতিয়ে পড়া একটা ঠাণ্ডা সাপের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে সে। সে দিনও আমি বললাম, কী শরীর খারাপ নাকি?

সে ধড়মড় করে উঠে বসলো শয্যায়। বললো, কই না তো!

তারপর মুখহাত ধুয়ে এসে যথারীতি আমার সঙ্গে রতিরঙ্গ করলো সে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন কিন্তু আর পুরোপুরি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না সে।

আমার মনে কেমন খটকা লাগলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে শাহরাজাদ।

নয়শো উনিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

আমার রানী ফিরকোনকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। এমন ঠাণ্ডা মেয়ে তো সে ছিল না। হঠাৎ এই রকম নিরাসক্ত হয়ে গেল সে কি করে?

একদিন রাতে ঘরে এসে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এই রকম ভান করে শয্যায় ঢলে পড়লাম। ফিরকোন আমাকে কাছে টানার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, আজ আর শরীর বইছে না রানী, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

ফিরকোন আর বিরক্ত করলো না আমাকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার নাসিকা গর্জন শুরু হলো। ইচ্ছে করেই এমনটা করেছিলাম সে রাতে।

একটু পরে বুঝতে পারলাম শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ফিরকোন। ঘাপটি মেরে দেখতে থাকলাম, পরিপাটি করে সাজগোজ করলো ফিরকোন। সুরমা কাজল পরলো চোখে, দাঁতে ঘষলো হিন্দুস্তানের মিসি। হীরা চুনী পান্না মুক্তোর রত্ন আভরণ পরলো অঙ্গে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পা টিপে টিপে।

আমিও উঠে পড়লাম। খুব সন্তর্পণে ওকে অনুসরণ করে চললাম।

ঘোড়াশালে ঢুকলো সে! এবং একটু পরে একটা তাজা ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদ ছেড়ে সড়কের পথ ধরলো। আমিও আর কাল-বিলম্ব না করে আমার প্রিয় ডালকুত্তাটাকে সঙ্গে নিয়ে এক সাধারণ ফৌজের ছদ্মবেশ পরে অন্য একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চেপে বসলাম।

ফিরকোন ছুটে চলেছে বায়ুবেগে, আমিও চলেছি তার পিছনে পিছনে।

একটানা দুঘণ্টার পথ অতিক্রম করে এক নিগ্রো মহল্লায় এসে ঘোড়ার গতি ঈষৎ শ্লথ করলো ফিরকোন। অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গায় বস্তি ধরনের একটা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো সে। আমিও বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ফিরকোন ঘোড়া থেকে নেমে সটান ঢুকে গেল বাড়িটার অন্দরে। আমিও হন-হন করে ছুটে গেলাম দরজার দিকে। কিন্তু হায়! ততক্ষণে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু ভাংগাচোরা বাড়িটার একটা নড়বড়ে জানলার ফুটোয় চোখ রেখে সব কান্ডকারখানাই দেখতে পারলাম।

ঘরের ভিতরের নারকীয় দৃশ্য দেখে গা গুলিয়ে গেল। চারপাশে ছড়ানো পচা মাংসের হাড় আর হাড়িয়ার দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল চাপা দিলাম আমি। কিন্তু অবাক কান্ড আমার ফুল-সোহাগী রানী ফিরকোনকে এতটুকু নাক সিটকোতে দেখলাম না। ঘরে ঢুকেই সে কাঁচুমাচু হয়ে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলো, আজও দেরি হয়ে গেল মালিক, কিন্তু কি করবো বল, আমার স্বামী হতচ্ছাড়াটা কিছুতেই ঘুমাতে চায় না। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে তো আসবো।

—চুপ কর হারামজাদী, তোর অমন বাহানা আমরা রোজই শুনি।

ঘরের ভিতরে সাতটা আবলুস কালো মহিষাকৃতির নিগ্রো। প্রত্যেকের হাতে হাড়িয়ার পাত্র। ফিরকোনকে এলোপাতাড়ি পিটতে লাগলো সকলে মিলে, বল্ শালী, আর কোনও দিন দেরি করবি?

আমি হতবাক হয়ে দেখলাম, যে মেয়েকে দেখে মনে হয়েছিল ফুলের আঘাত সহ্য করতে পারবে না সে যে আজ সাত-সাতটি নিগ্রোর বেদম প্রহার হাসিমুখে সয়ে গেল? ফিরকোনের মুখ দেখে মনেই হলো যে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়েছে এই মাত্র।

নিগ্রোরা এবার ওর সুন্দর সাজ-পোশাক পাশবিক হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেঁড়ে বিবস্ত্রা উলংগ উদাম করে মাটিতে ফেলে দিয়ে এক সংগে সবাই মিলে রতিরংগে লিপ্ত হলো। ফিরকোন একা মেয়ে আর তার দেহের ওপর চেপে বসেছে সাত-সাতটা মহিষাসুরের মতো নিগ্রো দানব। আমি তো শিউরে উঠলাম, ফিরকোনের হাড়গোড় বুঝি সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। সংগে সংগে স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে এক ঘুষিতে জানলাটাকে ভেংগে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর।

আমাকে ঐভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে পাঁচজন জিন জিন বলে চিৎকার তুলে দরজা খুলে উর্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। বাকী দুজনকে আমি গড়মড় করে চেপে ধরেছিলাম। তার মধ্যে একজন আমার কব্জা থেকে ছাড়িয়ে ছুটে পালালো কিন্তু অন্যজনকে প্রচণ্ড এক ঘুষিতে কাবু করে মাটিতে ফেলে দিলাম আমি। এরপর ফিরকোনকে তোলবার জন্য হাত বাড়ালাম। কিন্তু বজ্জাত মেয়েছেলেটা ততক্ষণে আমার তলপেটে এক লাথি বসিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড আঘাতের ব্যথায় ক'কিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। সেই মস্তকায় নিগ্রোটা আমার বুকের ওপর চেপে বসে দুহাতে গলাটা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে আমাকে খতম করতে মরীয়া হয়ে উঠলো। সেদিন আমার এই ডালকুত্তাটা না বাঁচালে ঐ নিগ্রোর হাতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিগ্রোটার টুটি চেপে ধরলো তৎক্ষণাৎ। আত্মরক্ষার জন্য সে তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুকুরটাকে ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু পারলো না।

ক্ষত-বিক্ষত নিগ্রোটা মরার মতো নেতিয়ে পড়লো। আমি ওকে ঘোড়ার লেজের সংগে বেঁধে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রাসাদে নিয়ে এলাম। ঘোড়ার পিঠে চড়বার আগে ফিরকোনকে এইভাবে পিছ-মোড়া করে বেঁধে আমার সামনে বসিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। সেই থেকে ওর হাতের বাঁধন আর খুলে দিইনি। নিগ্রোটাকে আমি নিজে হাতে কোতল করেছি। এই যে তোমার সামনে রেকাবীতে কাটা মুণ্ডু দেখছো—এটা তারই। লবণের আরক দিয়ে জারিয়ে রেখেছি, তাই দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য বুঝি কাটা হয়েছে ওকে।

যে নিগ্রোটা আমার কব্জা থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে পেরেছিল সে এখন আছে সিনমাসিনে সম্রাট কামুসের প্রাসাদে। সে এখন তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে তাঁর কন্যা মুরার শয্যাকক্ষে অবস্থান করছে। রাজকুমারী মুরার সে এখন পেয়ারের নাং। তার কথাতেই সে ওঠে বসে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বিশতম রজনী :

আবার সে গল্প শুরু করে :

এই হলো আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত গোপন কাহিনী। এ রাজ্যের দ্বিতীয় কোনও মানুষ এ কাহিনী জানে না। এবং আমার কড়া হুকুম আছে যদি কোনও ভাবে কেউ জানতে পেরে থাকে এ ঘটনা, তাকে কোনও মতেই জিন্দা রাখা হবে না। তোমার কাছে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন তথ্য বললাম। এরপর তো আমি তোমাকে সশরীরে এই দরবার-কক্ষের বাইরে যেতে দিতে পারি না, শাহজাদা হীরা। তোমার শির এখানে রেখে যেতেই হবে। কারণ আমি চাই না, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক।

হীরা অবিচলিত কণ্ঠে বললো, আমি আপনার দণ্ড মাথা পেতে নেব, মহারাজ। কিন্তু তার আগে আমাকে খোলসা করে বুঝিয়ে দিন, ঐ সপ্তম নিগ্রোটা দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে ঐ সিনমাসিন সম্রাটের কাছেই বা আশ্রয় ভিক্ষা করতে গেল কেন? এবং কী করেই বা সে রাজকুমারী মুরার অত নেক-নজরে পড়তে পারলো—যাতে সে তাকে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো তার শোবার ঘরে? এই ব্যাপারটায় কেমন একটু ধাঁধা লাগছে আমার। দয়া করে এই ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলে আমার সংশয় দূর করুন, নরপতি। তারপর আমি আপনার খড়্গতলে মাথা পেতে দেব হাসিমুখে।

শাহজাদার এই অদ্ভুত কৌতূহল দেখে সাইপ্রাস-সম্রাট অবাক হয়ে বললেন, তোমারই বা এতসব খুঁটিনাটি জানার এত আগ্রহ কেন যুবক? পৃথিবীতে কত আজব ঘটনাই নিত্য ঘটে। তা নিয়ে ক'জনই বা নিজের মাথা ঘামায়? তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, শাহজাদা। এটা আমার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য একান্ত গোপনীয়। একথাটা বলা হলে আমার তথ্য

আমার সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে পারে। সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না তোমাকে। তার বদলে আমি তোমাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলাম। এ দরবার, এদেশ ছেড়ে যেখানে খুশি তুমি চলে যেতে পার, আমি তোমার কোনও স্বাধীনতাতেই বাধা দেব না।

হীরা কিন্তু সম্রাটের কথায় দরবার ত্যাগ করার কোনও ইচ্ছাই প্রকাশ করলো না। সম্রাট অধৈর্য হয়ে বললেন: এখন এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মার্জনা করেছি, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে বিদায় নাও। কি জানি হয়তো পরে আবার আমার মতের পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

এবার আর চুপ করে বসে থাকতে সাহস করলো না হীরা। সম্রাটকে যথা-বিহিত অভিবাদন করে দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

আসল কাজ সমাধা হয়েছে এবার ফিরে যাবার পালা। সিমুর্গের দেওয়া চুলটায় আগুন ধরিয়ে দিতেই অল্পক্ষণের মধ্যে সে এসে হাজির হলো তার সামনে। হীরা বললো, আপনার অনুগ্রহে আমি কার্যোদ্ধার করতে পেরেছি। এবার আমাকে দয়া করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

সিমুর্গ তাকে পিঠে চাপিয়ে আকাশপথে উড়ে আজিজার প্রাসাদে এনে নামিয়ে দিল। হীরার বিরহে আজিজা কাতর হয়ে পড়েছিল। প্রিয়তমকে ফিরে পেয়ে আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

কয়েকটা দিন আজিজার সঙ্গে মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে চাঙ্গা হয়ে উঠলো হীরা। সিমুর্গের কাছে গিয়ে বললো, কাকা, আপনি আমাদের দুজনকে আপনার ভাতিজার গৃহে নিয়ে চলুন দয়া করে।

সিমুর্গের পিঠে চেপে ওরা জামিলার প্রাসাদে এসে নামল। জামিলাও হীরার শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। হীরার সঙ্গ পেয়ে আবার সে হাসি গানে উচ্ছল উদ্দাম হয়ে উঠল।

সিমুর্গ বললো, কিন্তু লতিফা তোমার সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা ক্ষমা করা যায় না বেটা। তার উপযুক্ত সাজা হওয়া দরকার। শয়তান মেয়েটাকে গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে শকুনি দিয়ে খাওয়ান দরকার।

আজিজা বললো, না ওসব করে দরকার নাই। যা করেছে তার জন্য সে যদি অনুতপ্ত হয় তবে তাকে এবারের মতো মার্জনা করে দেওয়া দরকার।

আজিজার কথায় জামিলাও সায় দিল, ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল সে অবশ্যই করেছে। তা বলে ঐ ভাবে তাকে জানে মেরে ফেলাটা উচিত হবে না।

দুই বেগমের ইচ্ছায় হীরা লতিফার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকেও শাদি করে সঙ্গে নিল।

এবার তারা যাবে সিনমাসিনে কামুসের সাম্রাজ্যে। তার কন্যা মুরার সঙ্গে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে তাকে।

সিনমাসিন শহরের প্রবেশ দ্বারে তাঁবু গেড়ে সেখানে তিন বেগমকে রেখে হীরা একাই সম্রাট কামুসের প্রাসাদে চলে এল।

খবর পেয়ে মতিয়া ছুটে এল দেখা করতে। হীরা বললো, শহরের বাইরে

আমি তাঁবু গেড়েছি। সেখানে আমার আরও তিন বেগমকে রেখে এসেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে এখুনি সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

মতিয়া তক্ষুণি এক বস্ত্রে হীরার সঙ্গে তাঁবুতে চলে এল। অন্যান্য বেগমদের সঙ্গে মতিয়ার আলাপ করিয়ে দিল।

এরপর আসল কাজের উদ্দেশ্যে হীরা প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে এসে সেই দামামায় আঘাত করলো।

যথারীতি সিংহদরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। সশস্ত্র প্রহরী অভিবাদন জানিয়ে শাহজাদা হীরাকে সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য অভ্যর্থনা জানালো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো একুশতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

সম্রাট কামুস শাহজাদা হীরাকে দেখা মাত্র চিনলেন।

—ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, বেটা। এখনও কি তুমি আমার কন্যার প্রশ্নের মুখোমুখি হবার বাসনা ত্যাগ করতে পারনি ?

হীরা বললো, আল্লাহর দোয়ায় আমি তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারবো মহারাজ, আপনি চিন্তিত হবেন না। যে গোপন তথ্য একমাত্র আপনার কন্যাই জানেন বলে অহঙ্কার করছেন তার সে অহঙ্কার আমি চূর্ণ করে দেব। আসল চাবিকাঠির আমি হদিশ পেয়েছি। আপনি আসরের আয়োজন করে দিন, সম্রাট।

সম্রাট কামুস হতাশ হয়ে বললেন, হায় বেচারা! মউৎ তোমার সামনে হাজির হয়েছে। নিয়তিরই নির্দেশ, কী করে তুমি তাকে এড়াবে, বল ?

যথাসময়ে মণ্ডাসরে উপস্থিত হলো মুরা। হীরা পূর্বাহ্নেই সেখানে আসন দখল করে রাজকুমারীর আগমন প্রতীক্ষা করছিল।

আড়চোখে একবার দেখে নিল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। চমকে উঠলো মুরা। এই না সেই শাহজাদা, এর আগে একবার এসেছিল এ প্রাসাদে, তার আতিথ্যের সময় ফুলবাগিচায় মোলাকাতও হয়েছিল একবার। সেবার সে কায়দা করে সটকে পড়েছিল। কিন্তু এবার ? এবার সে আবার এসেছে প্রাণ খোয়াতে ? এবার সে বাঁচবে কী করে ?

শাহজাদা হীরার প্রতি সে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবান হানলো, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ ? সাইপ্রাস সম্রাট আর ফিরকোনের আসল সম্পর্কটা কী ? জান এর উত্তর ?

হীরা নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল, অবশ্যই জানি। ওদের সম্পর্ক খুবই খারাপ। সম্রাটের মহারানী কতকগুলো নিগ্রোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, এই অপরাধে সে আজ বন্দিনী। তার দু'হাত পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছেন সাইপ্রাস-সম্রাট।

রাজকুমারী মুরা শিউরে উঠলো। সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই জোর করে নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে বললো, তুমি মিথ্যা বলছ না, তার প্রমাণ কী?

হীরা বললো, যদি তুমি আমাকে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করতে বাধ্য কর, অবশ্যই আমি তা বলবো। তার আগে বল, তুমি এক কুমারী কন্যা হয়ে এই তথ্য কোথায় কার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছে। নিশ্চয়ই, ওয়াকাক শহরের এমন কোনও মানুষের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে, যে তোমাকে এই একান্ত গোপন বার্তা জানিয়েছে?

এরপর হীরা সম্রাট কামুসকে উদ্দেশ করে বললো, মহামান্য সম্রাট আপনি আপনার এবং আপনার কন্যার ইজ্জতের জন্য রাজকুমারী মুরাকে সব সত্য ঘটনা অকপটে খুলে বলতে আজ্ঞা করুন!

সম্রাট কামুস মুরাকে খবরের উৎস জানাবার জন্য ইশারা করলেন। কিন্তু রাজকুমারী নিরুত্তর হয়ে রইলো।

হীরা তখন উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে আমাকে রাজকুমারীর শয়নকক্ষে নিয়ে চলুন, সম্রাট। আমিই সব ধাঁধার অবসান ঘটিয়ে দিচ্ছি।

হীরাকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট মুরার শোবার ঘরে এলেন। হীরা পালঙ্কের তলা থেকে নিগ্রোটাকে টেনে বের করে সম্রাটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, এই সেই শয়তান, সাইপ্রাস সম্রাটের কব্জা থেকে পালিয়ে এখানে এসে আপনার কন্যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এরা সাতটি নিগ্রো মিলে সাইপ্রাস সম্রাটের মহারানী ফিরকোনকে উপভোগ করতো।

লজ্জায় অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলেন সম্রাট কামুস। মৃদু কণ্ঠে হীরাকে বললেন, আর কোনও প্রমাণের দরকার নাই বাবা। আমি সব বুঝতে পেরেছি। মুরাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। এখন থেকে তুমিই তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইচ্ছা করলে ওকে জিন্দা রাখতে পার, ইচ্ছা করলে ওকে জ্যান্ত কবরও দিতে পার। আমার কোনও আপত্তি থাকবে না। তবে এই আমার শেষ কথা, ঐ রকম ব্যাভিচারী মেয়ের জীবনে আর মুখদর্শন করবো না। তার কোন কণ্ঠস্বর যেন না আমার কাছে পৌঁছয় কখনও। বাবা হীরা, তোমার কাছে আমার আবেদন, এই মুহূর্তে তুমি তাকে আমার প্রাসাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা!

সেইদিনই নিগ্রোটাকে শূলে চাপানো হলো।

শাহজাদা হীরা রাজকুমারী মুরার হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে তার তাঁবুতে নিয়ে এল।

সিমুর্গ ওদের ছয়জনকে পিঠে করে উড়ে চললো শাহেনশাহ শামস শাহর শহর অভিমুখে এবং যথাসময়ে এসে নামিয়ে দিল শহরের প্রবেশ দ্বারে। এরপর সিমুর্গ চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়ে আবার আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারা শহরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে। পুত্র হীরা ফিরে এসেছে শুনে শামস শাহ আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে নগরপ্রান্তে এসে হাজির হলো শাহজাদা হীরাকে স্বাগত জানাবার জন্য।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো বাইশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

শাহজাদা হীরা তার অভিযানের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলো পিতার কাছে। সব শুনে শামস শাহ বললেন, যাকে লাভ করার জন্য মন-প্রাণ আকুল হয়েছিল তোমার, সে আজ তোমার করায়ত্তে এসেছে। এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি বেটা!

—কিন্তু বাবা, হীরা বললো, ঐ ব্যভিচারিণীকে পেয়ে আমার কী ফয়দা হবে? তার চেয়ে আপনি আদেশ করুন, আমি ওকে চরম সাজা দিই।

শাহেন শাহ জানতেন হীরা রাজকুমারী মুরা সম্পর্কে কতখানি দুর্বল, বললেন, তোমার কথা ঠেলে ফেলবার নয় বাবা। তবু বলবো, অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে জীবন বিপন্ন করে যাকে ঘরে এনেছ হঠাৎ কোনও উত্তেজনাবশে তাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত কর এখনি, তা আমি চাই না। অনেক কষ্টে সমুদ্রমন্থন করে যে মুক্তো হাতে পেলে তা যদি প্রথম বিচারে ঝুটা বলেও প্রমাণিত হয় তাকে তখুনি পানিতে নিক্ষেপ করো নাঃ এই আমার অভিমত। তাছাড়া, আরও একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি যখন তার বাগিচায় প্রবেশ করে তার হাত চেপে ধরেছিলে তা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম হয়েছিল। তোমার কৃতকর্মের জন্য রাজকুমারী তখনি তোমাকে প্রাণদণ্ডের সাজা দিতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। সে কথা ভেবেও তার অনেক দোষ ক্ষমার চোখে দেখতে পার তুমি।

পিতার এই পরামর্শে শাহজাদা হীরার চৈতন্য হলো। তখনি সে মন স্থির করলো মুরাকে যে শাদী করে বেগমের মর্যাদা দেবে।

এরপর হীরা পাঁচটি বেগম নিয়ে সুখে সম্ভোগে দিন কাটাতে থাকলো।

গল্প শেষ হলো। শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শাহরিয়ার বললেন, চমৎকার—চমৎকার তোমার কিসসা শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, এরপরে আরও চমৎকার কাহিনী আপনাকে শোনাবো, জাঁহাপনা।

একসময়ে কাইরো শহরে গোহা নামে এক মজার লোক বাস করতো। কাজ-কাম বলতে সে কিছুই করতো না। সারাদিন রাত পড়ে পড়ে শুধু সে ঘুমাতো।

একদিন তার ইয়ার-বন্ধুরা এসে বললো, ওহে গোহা, সারাটা জীবন এই অলসভাবে শুয়ে শুয়ে কাটাবে নাকি ?

গোহা বললো, কেন, কাজ তো আমি করি মাঝে মাঝে। এই তো সেদিন বিরাট একটা বককে ধরেছিলাম আমি। বেচারা ডানা মেলে নীল আকাশে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতো। তার ডানা দুখানা কেটে দিয়ে আমি ওকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু পাখীটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল !

গোহা দাঁত বের করে খিক খিক করে হাসতে লাগলো।

বন্ধুরা বললো, আল্লা তোমার গুনাহ মাফ করবেন না। তোমার এই নিষ্ঠুরতার হেতু কী ?

গোহা বললো, বকটা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ও আমার চোখ উপড়ে নিয়ে পালাবে।

আর একদিন গোহা তার বন্ধুদের বললো, জান ভাই, আল্লাহ কেন উট আর হাতিদের পাখা দেননি ?

বন্ধুরা বললো, না, জানিস তো ! কেন, বল দেখি।

গোহা বললো, ঐ রকম ভারী জন্তুদের যদি পাখা থাকতো তবে তারা উড়ে গিয়ে অন্যের বাগানের গাছপালা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিত।

একদিন এক বন্ধু এসে গোহাকে বললো, তোমার গাধাটা একবার ক'দিনের জন্য দেবে ভাই, আমি একটা শহরে যাবো !

গোহা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নিশ্চয়ই দিতাম ভাই। কিন্তু ক'দিন আগে তো গাধাটাকে আমি বেচে দিয়েছি।

ঠিক তখুনি পাশের আস্তাবল থেকে গাধাটার মধুর কণ্ঠ-সঙ্গীত ভেসে এল।

বন্ধু বললো, কিন্তু ভাই, গাধা তো দেখছি তোমার আস্তাবলেই আছে !

গোহা বললো, তুমি যদি একটা গাধার কথা শুনেই বিশ্বাস করে বসলে, তাহলে আমার কিছু করার নাই।

একদিন এক সন্ধ্যায় গোহা গিয়েছিল এক প্রতিবেশীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। একটা গোটা মুরগীর তন্দুরী তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুরগীটা এতই বুড়ো. যে, মাংস আর টেনে ছিঁড়তে পারলো না সে। তখন সে মুরগীটাকে উদরস্থ করার বায়না ত্যাগ করে তাকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম জানাতে থাকলো।

গৃহস্বামী অতিথির এই আচরণে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো কী হলো, এত বস্তু থাকতে একটা রান্না করা মুরগীকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রার্থনা করছো কেন বাবা ?

গোহা বললো, না চাচা, আপনি ভুল করছেন। এই মুরগীটাকে একটা সাধারণ মুরগী ভেবে আপনি জবাই করেছিলেন। আসলে সে খোদার পেয়ারের পুণ্যাত্মা ভক্ত জীব। তাই আপনি তাকে কেটে মসলাপাতি মেখে ঠিকমতো গনগনে আগুনে পুড়িয়েও এতটুকু দগ্ধ করতে পারেন নি। এর দেহের মাংস রান্না করার আগে যেমনটি ছিল পরেও ঠিক তেমনি অবিকৃত রয়ে গেছে। পাপীরা দগ্ধ হয়, কিন্তু আগুনের উত্তাপ পুণ্যাত্মা ভক্তদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না।

গোহা একবার এক কাফেলার সহযাত্রী হয়েছিল। কিন্তু পথের মধ্যে তাদের দানাপানি প্রায় ফুরিয়ে গেল। গোহা স্বভাবত একটু পেটুক মানুষ। কিন্তু খাবার সময় সে তার ভাগের একটা পুলি আর একটিমাত্র সিদ্ধ ডিম পেল। গোহা তা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, খোদা কসম, এ আমি খেতে পারবো না বরং আপনারা কেউ পেটপুরে খান।

গোহা একদিন কসাইয়ের দোকানে গিয়ে বললো, আজ আমাদের বাড়িতে কিছু লোকজন খাবে, খুব ভাল দেখে কিছু মাংস দাও তো, ভাইসাব। কসাই তাকে বেশ খানিকটা মাংস ওজন করে বেঁধে দিল।

মাংসের মোড়কটা বাড়িতে এনে বিবির হাতে দিয়ে বললো, খুব ভাল করে কাবাব বানাও তো। আমি একটু বেরুচ্ছি, ঘুরে এসে খাব।

সন্ধ্যা হতে না হতে গোহা ঘরে ফিরে এল কাবাবের টানে। কিন্তু খেতে বসে রুটি সবজি আর কিছু পনির ছাড়া কিছুই সে দেখতে না পেয়ে বিবিকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার কাবাব কোথায় ?

বৌটা বললো, আর বলো না, কাবাবগুলো বানিয়ে আমি গোসল করতে গেছি। ফিরে এসে দেখি মুখপোড়া বেড়ালটা সব সাফ করে দিয়েছে।

রাগে ফেটে পড়লো গোহা, কোথায় সে বেড়াল। এঘর ওঘর খুঁজে একটা বেড়ালকে ধরে নিয়ে এসে সে বললো, এইটুকু বেড়াল অতগুলো মাংসের কাবাব খেয়েছে ? মাংসের তো বেশ ওজন ছিল, কিন্তু বেড়ালটা তো দেখছি পলকা পাখীর মতো হাল্কা। তা হলে মাংসগুলো গেল কোথায় ?

একদিন গোহা-বিবি তার তিন মাসের বাচ্চাটাকে গোহার কোলে তুলে দিতে দিতে বললো, ছেলেটাকে একটু ধরতো, গো। আমি খানাটা পাকিয়ে নিয়েই নিচ্ছি।

এই সব মেয়েলী কাজ গোহার একদম পছন্দ নয়। কিন্তু উপায় কী ? ছেলেটাকে নিয়ে সে নাচাতে লাগলো, একটু পরে বাচ্চাটা বমি করে তার সদ্য কাচানো কাফ্‌তানটা ভাসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে বাচ্চাটাকে ধপাস করে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে তার মাথায় থুথু ছিটাতে লাগলো।

মা ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে স্বামীকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো,

একি তোমার ব্যবহার, কত আদরের ধন আমাদের এই বাছা, তার গায়ে তুমি থুথু দিলে।

গোহা তখনও রাগে গরগর করছে, আদরের ধন না হাতি! ও সব ছেলেই নয়। দেখগে অন্য কারো হয়তো হবে।

এই বলে আর সে দাঁড়ালো না, হনহন করে বেরিয়ে গেল।

একদিন গোহার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই বলতে পার, দ্বিতীয়ার চাঁদ অমন ক্ষীণ হয় কেন?

গোহা খুব বিজ্ঞের মতো বললো, মাদ্রাসায় দেখছি কিছুই তোমাকে লেখা পড়া শেখায়নি। আরে বোকা এও জান না, যে কদিন চাঁদ সরু থাকে সে কদিন আল্লাহ চাঁদের দেহ দিয়ে আসমানের তারা গড়েন!

গোহা একদিন তার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে ভেড়ার কাল্লা সিদ্ধ করার জন্য একটা পাতিল ধার চাইল। প্রতিবেশি শেখ তাকে হাঁড়িটা দিয়ে বললো, মনে করে কাল সকালে দিয়ে যেও ভাই।

পরদিন সকালে কথামতো হাঁড়িটা ফেরত দিতে এল। গৃহস্বামী অবাক হয়ে দেখলো তার হাঁড়ির মধ্যে অন্য একটা ছোট্ট হাঁড়ি বসানো আছে।

—কী ব্যাপার, এটা কার?

গোহা বললো আমি তো ভাই বলতে পারবো না। নির্ঘাৎ তোমার হাঁড়িটাই কাল রাতে বাচ্চা পেড়েছে!

গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিল গোহার কথায়, হুঁ, তা অবশ্যই হতে পারে।

এই বলে সে পাত্র দুটি তাকে সাজিয়ে রেখে দিল।

পরদিন গোহা আবার এল পাত্রটি ধার করতে। প্রতিবেশি ভাবলো একটা দিলে দুটো পাওয়া যায়, দুটো দিলে নিশ্চয়ই চারটে ফেরত পাওয়া যাবে। সে দুটো হাঁড়ি এনে গোহার হাতে দিয়ে বললো, একটাতে নাও হতে পারে, ব্যাপারের বাড়ি, দুটোই নিয়ে যাও ভাই।

গোহা নির্বিবাদে দুটো হাঁড়ি বগলদাবা করে চলে এল।

এক এক করে অনেকদিন পার হয়ে গেছে। গোহা আর হাঁড়ি দুটো ফেরত দিতে আসে না। কিন্তু প্রতিবেশি ভাবে গোহার মতো সাচ্চা মানুষ হয় না, সে নিশ্চয় অন্য কাজে কর্মে ব্যস্ত আছে। সময় পেলেই দিয়ে যাবে।

প্রতিবেশি ও নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে না। কিন্তু দেখতে দেখতে অনেক মাস কেটে গেল দেখে একদিন শেখসাহেব গোহার বাড়িতে এসে একথা সেকথার পর হাঁড়ি দুটোর কথা তুললো, আমার হাঁড়ি দুটো ফেরত দাও ভাই।

গোহা যেন আকাশ থেকে পড়লো, হাঁড়ি? কোন্ হাঁড়ি বল তো ভাইসাব।

প্রতিবেশি বলে কেন, মাস কয়েক আগে আমার বাড়ি থেকে দুটো হাঁড়ি ধার নিয়ে এলে, মনে নাই?

—ও হো হো, সে কথা বুঝি তোমাকে বলিনি। এই দ্যাখো একেবারে ভুলো মন আমার, কিছুই মনে থাকে না আজকাল। তোমার হাঁড়ি দুটোর বদহজম হয়েছিল ভাইসাব। পরদিন ভোর রাতেই কলেরায় মারা গিয়েছিল।

শেখসাহেব অবাক হয়ে বললেন, বল কী, হাঁড়ি পাতিলের কলেরা—তারা আবার মারা যায় না কি ?

—বারে ! আল্লাহর পয়দা-করা বস্তু চিরকাল দুনিয়ায় থাকবার জন্যে আসে নাকি । মেয়াদ ফুরালেই তাকে মারা যেতে হবে না । জন্মিলেই মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে, ভাই ?

একদিন এক খামারের মালিক গোহাকে একটা মোটা-সোটা মুরগী উপহার দিল । গোহা খুশি হয়ে তাকে তার সঙ্গে খানা-পিনা করতে আমন্ত্রণ জানালো । খামার-মালিক সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো । এবং সেইদিন রাতে তারা দুজনে বসে খুব তৃপ্তি করে মুরগীকে উদরস্থ করলো ।

এর কয়েকদিন পরে গোহার দরজায় করাঘাত হলো । দরজা খুলে এক অপরিচিত মেহেমানকে দেখে গোহা স্বাগত জানালো, আসুন আসুন, আমার কী সৌভাগ্য ! তা আপনার পরিচয়টা জানতে পারি ভাইসাব !

লোকটি বললো, আমি হচ্ছি ঐ খামার-মালিকের দোস্ত । আপনার আতিথেয়তার তিনি খুব প্রশংসা করছিলেন, তাই চলে এলুম, ভাবলাম আমার বন্ধুর ভাগ্যে যখন জুটেছে, আমার ভাগ্যেও কি কিছু জুটবে না !

গোহা হেসে বলে, তা বেশ করেছেন, বসুন ।

গোহা সেদিন অচেনা অতিথিকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করে খানাপিনা দিল । খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে করতে সে চলে গেল ।

এর কয়েকদিন পরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিল গোহা ।

—আপনি কে ভাইসাব ?

আগন্তুক বললো, আমি—আমি হচ্ছি আপনার খামার চাষী-বন্ধুর বন্ধু । শুনেলাম আপনি খুব অতিথিপরায়ণ মানুষ, তাই চলে এলাম—

—ওঃ, তা আসুন আসুন ভিতরে এসে বসুন ।

লোকটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে গোহা অন্দরে চলে গেল । একটু পরে এক বাটি ধোঁয়া ওঠা গরম জল এনে বসিয়ে দিল তার সামনে । জলের ওপরে কয়েক ফোঁটা তেল ভেসে বেড়াচ্ছিল শুধু । লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইলো গোহার মুখের দিকে ।

—এ বস্তুটি কী ভাইসাহেব ?

গোহা বললো, ও, বুঝতে পারছেন না ? এ হচ্ছে সেই পানি, যে পানিতে ঐ মুরগীটাকে সিদ্ধ করা হয়েছিল তার খুড়তুতো বোনের মাসতুতো বোন ।

একবার গোহার বন্ধুরা গোহাকে নিয়ে একটু মজা করতে উদ্যোগী হয়েছিল । সকলে একটা একটা ডিম সঙ্গে নিয়ে গোহার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব করলো, চলো দোস্ত আজ সবাই মিলে একসঙ্গে গোসল করে আসা যাক ।

গোহা বললো, বেশ চলো ।

দল বেঁধে একটা হামামে ঢুকলো ওরা । সাজ-পোশাক খুলে রেখে উলঙ্গ হয়ে সবাই একসঙ্গে স্নানের ঘরে প্রবেশ করলো । একজন প্রস্তাব করলো,

আচ্ছা বল, আমাদের মধ্যে কে কে ডিম পাড়তে পারে এখানে। একা গোহা ছাড়া সবাই বললো, তারা ডিম বের করতে পারবে। গোহা বললো, অসম্ভব। গলে ঝাড়ার আর জায়গা পেলে না!

অবশেষে সাব্যস্ত হলো যে, যে ডিম দিতে পারবে তাকে হামাম খরচা দিতে হবে না। যে দিতে পারবে না, তাকে সে ভার বহন করতে হবে। গোহা বললো, আমি রাজি।

এরপর গোহা ছাড়া আর সবাই একটা একটা করে ডিম বের করে দিল যথাস্থান থেকে।

এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে গোহা প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ক'ক্ ক'ক্ ক'ক্ করতে করতে এক একজনকে তাড়া করে করে নাস্তানাবুদ করতে থাকলো।

একজন বললো, কী ব্যাপার দোস্ত, অমন ক্ষেপে গেলে কেন, হলো কী তোমার?

গোহা বললো, একা আমি মোরগ, তোমরা সবাই মুরগী। এতগুলো মুরগীকে এক জায়গায় পেয়ে কি আর মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব, বল?

প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গোহা ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ রুজু করে নামাজে বসে। নামাজান্তে আল্লাহর কাছে প্রতিদিনই সে একটিমাত্র প্রার্থনা জানায়, খোদা আমাকে তুমি একশোটি দিনার পাইয়ে দাও। গোনাগুনতি একশোটি—একটা বেশিও চাই না, একটা কম হলেও চলবে না আমার। ও আমি নেব না।

এক ইহুদী পড়শি প্রতিদিন গোহার ঐ একই বায়না শুনে শুনে একদিন মনে মনে ঠিক করলো, লোকটাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

পরদিন সকালে গোহা যখন মুদিত-নয়নে প্রার্থনায় বসেছে, সেই সময় ইহুদীটা একটা তোড়ায় নিরানব্বইটা দিনার ভরে ঘরের জানলা গলিয়ে তার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইলো।

চোখ খুলে গোহা তোড়াটা দেখে আনন্দে নেচে উঠলো। কিন্তু এক এক করে দিনারগুলো গোনার পর মুখ কালো করে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি যে আমার প্রার্থনা শুনেছ আল্লাহ, এ জন্য আমি ধন্য। কিন্তু তোড়াতে তো একশো দিনার নাই। একটা কম আছে। এতে তো আমার কাজ হবে না। সুতরাং তোমার এ দান আমি গ্রহণ করতে পারছি না, খোদা। আমাদের পাশের বাড়িতে এক গরীব ইহুদী বাস করে। বেচারার বড় কষ্টের সংসার। অনেকগুলো বালবাচ্চা, সবাইকে ভাল করে খাওয়াতে পারে না। আমি ভাবছি তোমার এই নিরানব্বইটা দিনারের তোড়াটা ওকেই দিয়ে দেব! লোকটা বড় সৎ, বড় ভাল।

এই বলে সে তোড়াটা ইহুদীর বাড়ির জানলা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে হাওয়া হয়ে গেল।

ইহুদী তাজ্জব হয়ে গেল মুসলমানটার সত্যনিষ্ঠায়।

পরদিন সকালে আবার সে গোহাকে পরীক্ষা করার জন্য আর একটা দিনার ভর্তি তোড়া ছুঁড়ে দিল তার ঘরে। এবার সে একশো একটা দিনার ভরেছিল। গোহা দিনারগুলো গুনে-টুনে সকৃতজ্ঞভাবে আল্লাকে প্রণিপাত জানালো, তোমার দান আমি খুশিমনে গ্রহণ করে ধন্য হলাম, আল্লাহ্।

এই বলে সে তোড়াটা কোমরে বেঁধে পথে বেরুলো। ইহুদী ছুটে গিয়ে গোহার পথ আগলে দাঁড়ালো, আমার তোড়া ফেরত দাও।

গোহা বললো, তোমার তোড়া? কীসের তোড়া?

—দিনারের তোড়া, দাও ফেরত, একশো একটা দিনার আছে ওতে।

গোহা বললো, দেখ ইহুদী-সন্তান, ভাল চাও তো পথ ছাড়। তুমি কি ভেবেছ আল্লাহর কাছ থেকে রোজ যা পাবো সবই তোমাকে দেব? এই নাও, একটা দিনার বেশি আছে, এটা তুমি পেতে পার।

একটা চকচকে স্বর্ণমুদ্রা ইহুদীর নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে নিজের কাজে চলে গেল।

একদিন গোহা মসজিদে বসে ইমামের উপদেশ শুনছিল: প্রত্যেক প্রকৃত ইসলামী স্বামীর প্রতিরাতে যথাকর্তব্য পালন করা উচিত। তাতে খোদার কাছে ভেড়া কোরবানীর পুণ্য লাভ হয়। দিবসকালে ধর্মপত্নীর সঙ্গে সহবাসের ফলে বান্দা মুক্তিদানের পুণ্য সঞ্চয় হয়। আর যে ব্যক্তি মধ্য রাত্রে বিবির সঙ্গে সহবাস করে একটি উট কোরবানীর সুফল পায় সে।

ঘরে ফিরে এসে বিবিকে ইমামের উপদেশের বাণী শোনায়। সেইদিন রাতে যথারীতি গোহা বিবিকে পাশে নিয়ে শুয়েছে। একটু পরে বৌটা দেখলো গোহা রতি-সঙ্গ করতে এগিয়ে আসছে না। তখন সে নিজে গোহাকে দুহাতে কাছে টানতে টানতে বলে, কী নেতিয়ে পড়লে কেন, এস, ওপরে এস। ভেড়া কোরবানীর পুণ্য লাভ কর।

গোহা বিবির ডাকে সাড়া দিয়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করে আবার শুয়ে পড়লো পাশে।

মাঝ রাতে বৌটা আবার গোহাকে টেনে তুললো, এস ওপরে এস। উট কোরবানীর পুণ্য করবে না?

ঘুমে জড়িয়ে আসছিল গোহার চোখ। কিন্তু নাছোড়বান্দা বিবি। অগত্যা ঐ অবস্থাতেই কাজকাম সেরে বিছানায় ঢলে পড়লো সে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো চব্বিশতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

সকাল হতে না হতে বৌটা গোহাকে জাগিয়ে দেয়, দেখ দেখ, কত বেলা হয়ে গেছে। এখন তো রোদভরা সকাল। এস, এস ওপরে এস, একটা বান্দা মুক্ত করার পুণ্য কি কম? এস, পুণ্য সঞ্চয় করে নিই আমরা।

গোহা বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

মুখে সম্মতি জানালো, কিন্তু কাজে ব্রতী হলো না। যেমনটি পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল বিছানায়।

বৌটা ততক্ষণে কামার্ত হয়ে চড়া সুরে হুকুম করছে, কই, কাপ মেরে পড়ে রইলে কেন, এস? বান্দা মুক্ত করার পুণ্য লাভ কর?

গোহা হাই তুলে বললো, আজকের মতো পুণ্যটা তুমি একাই সঞ্চয় কর সোনা! এ বান্দাকে মুক্তি দাও।

একদিন জগৎ বিখ্যাত তৈমুরলঙ তার সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে শহর উপান্তে এসে তাঁবু গাড়লো। শহরবাসীরা তটস্থ হয়ে উঠলো। তখন গোহা বললো, হতে পারে সে প্রবল পরাক্রমশালী, কিন্তু তা বলে আমি ডরাই না। তার কাছে যাবো আমি।

সাজ-পোশাক সেরে মাথায় মসলিনের পাগড়ী বাঁধলো একটা ইয়া মস্ত বড়। বাজারের সমস্ত দোকানে যত মসলিন ছিল একত্র করে পাগড়ী জড়ালো সে মাথায়।

তাতার-সম্রাট অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কীসের এই পাগড়ী, এত বিরাট।

গোহা বিনয়ের অবতার হয়ে বললো, জী, এটা আমার রাতের সাজের ছোট টুপী, দুনিয়া মালিক। আসল টুপীটা তাড়াহুড়োয় পরে আসতে পারলাম না। ওটা ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

প্রবল প্রতাপ তৈমুরলঙ ভাবলো, এ তো সাধারণ মানুষ নয়। এত বড় পেল্লায় টুপীটা যার রাতের সংক্ষিপ্ত সাজ, না জানি আসল জাঁকজমক তার কেমন!

আর ক্ষণকাল সেখানে অবস্থান করা সংগত মনে করলো না তৈমুর। তাঁবু খুলে লোকলস্কর সংগে করে সেইদিনই সে সেদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল।

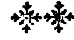
একদা গোহা সস্ত্রীক নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় পা পিছলে বৌটা স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেল। গোহা আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণপণে উজানে যাবার চেষ্টা চালাতে থাকলো। পথচারীরা এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, ও সাহেব, উজান-সাঁতার দিয়ে ওদিকে যাচ্ছো কেন, তোমার বিবিজান তো স্রোতের টানে উল্টোদিকে চলে গেছে।

গোহা বললো, সাধারণতঃ কোন মানুষ ডুবে গেলে অতি স্বাভাবিক কারণেই স্রোতের টানে ভাটার দিকে চলে যায়, কিন্তু আমার বিবিকে তো আমি হাড়ে হাড়ে জানি; সব সময় সে উল্টোদিকে ছাড়া চলতে পারে না।

গোহার চুটকীগুলো শোনাবার পর শাহরাজাদ একটু থেমে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে সপ্রশ্ন চোখে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো জাঁহাপনা?

—চমৎকার—চমৎকার তোমার বলার কায়দা শাহরাজাদ। ভারি আনন্দ পেলাম শুনে।

এরপর শাহারাজাদ আবার নতুন কাহিনী বলতে শুরু করলো।

সুলতান হারুন অল রসিদের সভা-গায়ক ছিল সংগীতের যাদুকর-মন্ডলের স্বনামধন্য ওস্তাদ ইশাক অল নাদিম। খলিফার প্রিয়পাত্র ছিল সে। হারুণ অল রসিদের হারেমের জন্য পরমাসুন্দরী বাঁদীদের সংগ্রহ করে এনে প্রথমে ইশাকের কাছে গান-বাজনার তালিম নিতে পাঠানো হতো। যে সব মেয়েরা ইশাকের শিক্ষার গুণে সংগীত-সুধাকরী হতে পারতো তাদের সে খলিফার সামনে হাজির করতো গান শোনাবার জন্য। সুলতান সন্তুষ্ট হলে তারা হারেমে প্রবেশের অধিকার পেত। কিন্তু যে সব বাঁদীরা গান শুনিয়ে সুলতানের মন ভোলাতে সমর্থ হতো না আবার তাদের ফিরে যেতে হতো ওস্তাদ ইশাকের প্রাসাদে।

একদিন খলিফার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। কিছুতেই কিছু ভাল লাগছিল না। তখন তিনি উজির জাফর, ওস্তাদ ইশাক, দেহরক্ষী মাসরুর, জাফরের ভাই অল ফাদল এবং ইউনুসকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে পথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। সকলেরই একই রকম বেশবাস। কাউকে দেখে চেনার উপায় ছিল না, কে বাদশা, কে বান্দা আর কে বা উজির অমাত্য।

চলতে চলতে তাঁরা এক সময় টাইগ্রিস উপকূলে উপস্থিত হলেন। এবং একখানা ছোট পানসী ভাড়া করে আল্-তাকের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

আল-তাকে পেঁছে নৌকা ছেড়ে তীরে নেমে আবার ওঁরা এক অলক্ষ্য অভিযানের যাত্রী হয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে থাকলেন।

চলতে চলতে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। ইশাকের সামনে দাঁড়িয়ে সে সংগীতগুরুকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলাম। এই বান্দা প্রাসাদের কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। আপনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি অনেকবার। কিন্তু সামনে যাবার সুযোগ পাইনি কখনও।

বোঝা গেল বৃদ্ধ মৌলভী একমাত্র ইশাক ছাড়া আর কাউকেই চিনতে পারেনি। বৃদ্ধ বলতে থাকে, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে, মালিক।

ইশাক বলে, বেশ তো, বল না—

—আমার বাড়িতে একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী বাঁদী আছে। তাকে আমি গান-বাজনা শিখিয়ে সুলতানের হারেমের যোগ্য করে তুলতে চাই। আপনি যদি মেহেরবানী করে আপনার ঘরানায় তাকে ভর্তি করে নেন তবে আমি ধন্য হয়ে যাই। আর যদি আপনি না করেন তা হলে আর কী করবো। ও মেয়েকে তো আমার গরীবখানায় মানাবে না। অগত্যা কোনও সওদাগরের কাছেই বেচে দিতে হবে। যদি আপনার এক পল ফুরসত হয় তবে মেয়েটাকে একবার আপনি স্বচক্ষে দেখুন, মালিক, এই আমার আর্জি।

ইশাক একবার অপাঙ্গে খলিফার দিকে তাকালো। এবং খলিফার ইশারা বুঝতে পেরে বৃদ্ধকে বললো, বেশ তো কোথায় তোমার ঘর, চল যাওয়া যাক। আমার সঙ্গে এই বন্ধুরা রয়েছেন এঁরাও যাবেন।

বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না। সে যেন হাতে চাঁদ ধরে ফেলেছে। বললো, এই কাছেই। ঐ যে দেখছেন গিরিমাটি রঙের বাড়িটা—ওটাই আমার গরীব-খানা। মেহেরবানী করে আপনারা সকলেই চলুন।

বাড়িটা নেহাত ছোটখাট নয়। বেশ ঝকঝকে তকতকে। পরিপাটি করে সাজানো গোছানো।

একখানা সুসজ্জিত বড় ঘরে বসালো সে। একটুক্ষণ পরে তানপুরা হাতে এসে বসলো একটি নবযৌবন-উদ্ভিন্না অলোক-সামান্যা সুন্দরী তরুণী। আভূমি আনত হয়ে অভ্যাগত অতিথিদের সালাম জানালো সে। তারপর গালিচার ওপর বসে একটি গান ধরলো।

কেমনে তরাবো বল, এ অকুল দরিয়া।
যৌবন বিফলে গেল, তোমারে স্মরিয়া।।

কী অপূর্ব সুললিত কন্ঠ। খলিফা ছটফট করে ওঠেন। কিন্তু নিজের ছদ্মবেশের কথা ভেবে মুখ ফুটে বাহবা জানাতে পারেন না। মনে মনে তারিফ করতে থাকেন, সুন্দরী, যেমন তোমার রূপ তেমনি তোমার গুণ। এমন কোকিলকন্ঠ কোথায় পেলে তুমি? খোদাতালার তুমি এক অপূর্ব সৃষ্টি!

ইশাক পঞ্চমুখে মেয়েটির মধুর কন্ঠের গুণগান করতে থাকে। আত্ম-প্রশংসা শুনে আরক্ত হয়ে কানে হাত চাপা দিয়ে উঠে আসে সে ইশাকের সামনে। গড় হয়ে পায়ের ওপর মাথা ঠেকায়।

—আপনি দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ, আপনার সামনে বসে আপনাকে গান শোনাবে এ যে আমার কল্পলোকের বাসনা ছিল এতকাল। বাস্তবে তাই আজ ঘটে গেল দেখে নিজেকে আর সহজ ভাবে ধরে রাখতে পারছি না, ওস্তাদ! সাবা শরীর আমার টলমল করে কাঁপছে যেন। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। আজ এই মুহূর্তে আমি বুঝি আর একটাও গান শোনাতে পারবো না। আপনারা আমাদের ঘরে মেহেমান হয়ে এসেছেন। আমার গান শুনতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি, একি হলো আমার, আর এখন গান শোনাতে পারবো না আপনাদের।

এই বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মেয়েটি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতাশতম রজনীতে
আবার সে বলতে শুরু করে :

মেয়েটার মর্মবেদনায় ইশাক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে।

—তুমি আল্লাহর আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছে মেয়ে, এতে দুঃখ করার কী আছে। তোমার প্রকৃত পরিচয় কী সুন্দরী?

মেয়েটি লজ্জায় মাথা নত করে বসে থাকে। একটিও কথা বলে না। ইশাক বুঝতে পারে, এত মানুষের সামনে হয়তো সে মুখ খুলতে চায় না।

—তোমার যদি সকলের সামনে বলতে আপত্তি থাকে তবে চল আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি, কেমন?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

পাশের ঘরে ইশাককে একা পেয়ে মেয়েটি সহজ হয়ে বোরখার নাকাব সরিয়ে দেয়। মেয়েটির নিখুঁত মুখাবয়ব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে ইশাক। এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সে খুব কমই দেখেছে জীবনে।

—এবার তুমি নির্ভয়ে বল বাছা, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ এখানে? আর কেনই বা তোমার চোখভরা অশ্রু আর মুখ এমন বিষণ্ণ বেদনা-মধুর?

মেয়েটি বলে, আমার দীর্ঘসময়ের প্রতীক্ষা আজ সফল হয়েছে। আপনার পথ চেয়েই আমি দিন গুনছিলাম। অবশেষে আজ আপনার দর্শন পেয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারিনি, ওস্তাদ। কান্না আমার নিত্য সঙ্গী। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোজ আমি শুয়ে শুয়ে কাঁদি। কেঁদে কেঁদে চোখের কোলে হয়তো আমার কালি পড়েছে। মুখের লাবণ্য ঝরে যেতে বসেছে।

ইশাক বাধা দিয়ে বলে, ওকথা সত্যি নয়, বাছা। তোমার রূপের জেল্লার কাছে চাঁদও হার মানবে। এমন অপরূপ রূপ-লাবণ্য এর আগে আমি কোথাও দেখিনি। নিজের দেহ-সৌন্দর্যকে এত ছোট করে ভাব কেন তুমি? তোমার মতো ফরসা সুন্দরী কন্যা কটা আছে দুনিয়ায়?

মেয়েটি বলে, সত্যিই আমি সুন্দরী ছিলাম, ওস্তাদ। কিন্তু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে মাসের পর মাস কাটছে আমার। এত চিন্তা ভাবনা মাথায় থাকলে কী মানুষ বাঁচে? হরবখত আমাকে নীলামে দাঁড়াতে হয়। কত দালাল সওদাগর দর দিয়ে যায়। কবে কোথায় যে বিক্রি হয়ে যাবো তার ঠিক নাই। কার হাতে গিয়ে যে পড়বো শেষপর্যন্ত কিছুই জানি না। সে মানুষ কেমন হবে, কী ভাবে আমাকে গ্রহণ করবে কে জানে?

আমার জীবনের একমাত্র সাধ আপনার সঙ্গীত-পাঠশালায় আমি গান শিখবো। তার জন্যে যে-কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি আমি। যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে সম্মত আছি। আপনি আমাকে দয়া করে আপনার পায়ে আশ্রয় দিন, ওস্তাদ।

এই সময় বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করলো। ইশাক তাকে জিজ্ঞেস করলো, কত দাম নেবে এর? তার আগে বল, এর নামটা কী?

বৃদ্ধ বলে, ওর নাম তুফা অল কুলুব। কিমত অন্ততপক্ষে দশ হাজার দিনার। এই দাম অনেকেই দিয়ে গেছে। কিন্তু দামটাই সব নয়। মেয়ের সম্মতিই আসল। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই মেয়েকে রাজি করাতে পারিনি। ওর একমাত্র বায়না আপনার কাছে গান-বাজনা শিখবে। আপনি যদি সম্মত হন তবে ঐ দশ হাজারেই আমি দিয়ে দেব আপনাকে। টাকাটাই এখানে বড় নয়

ওস্তাদজী। ওকে মানুষ করতে আমার তার চেয়ে বেশিই খরচ পড়েছে।

ইশাক হেসে বললো, ঠিক আছে, দশ হাজার কেন, আমি বিশ হাজারই দেব তোমাকে। আমি জেনেছি, এ মেয়ের মূল্য আরও অনেক বেশি হতে পারতো। ঠিক আছে, তা হলে ঐ কথাই রইলো, একে আমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দাও। টাকাটা হাতে হাতেই দিয়ে দেব!

এরপর ইশাক ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে এসে খলিফাকে সব জানালো। খলিফা শুনে পুলকিত হলেন। তারপর তাঁরা বৃদ্ধের বাড়ি ছেড়ে নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ তুফা অল কুলুবকে ইশাকের প্রাসাদে পেঁছে দিয়ে নগদ বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এল।

ইশাকের খুদে খোজা-নফররা তুফাকে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে ঘষে মেজে সুগন্ধী আতরজলে গোসল করালো। তার মূল্যবান সাজ-পোশাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। পরিয়ে দিল নানারকম রত্ন আভরণ।

ইশাক ফিরে এসে তুফাকে বাদশাহী সাজ-পোশাকে সজ্জিতা দেখে প্রথমে যেন চিনতেই পারে না। আহা এমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটি মাত্র কয়েকটা মাস থাকবে তার কাছে। তার পাঠশালায় গান বাজনা শিখবে। তারপর যথাস্থানে সুলতানের হারেমে পাঠিয়ে দিতে হবে!

ভাবতেও মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় ইশাকের। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা এই সুগন্ধী পুষ্পটি লালন করে প্রস্ফুটিত করারই শুধু দায় আছে তার। ওকে আঘ্রাণ করার অধিকার একমাত্র খলিফা হারুন অল রসিদের, আর কারুর নয়।

ইশাক তার খোজা-নফরদের নির্দেশ দিল তুফাকে খুব আদর-যত্নের মধ্যে যেন লালন করা হয়।

একদিন বিকালে তুফা প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে আপন মনে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় সেখানে ইশাক এসে উপস্থিত হলো। তুফা কিন্তু ইশাকের উপস্থিতি বুঝতে পারলো না।

সংগীতের সুললিত সুরে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইশাক। এমন গান যার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে পারে নিশ্চয়ই সে কোনও মানবী নয়! তার পাঠশালায় এসেছে; সে গানের পাঠ নিতে। কিন্তু এ সংগীত যার কণ্ঠে, তাকে সে কী শেখাবে, কী শেখাতে পারবে? সংগীতের উচ্চমার্গে যে বিচরণ করছে তাকে সে আর কী শেখাতে পারবে?

হঠাৎ ইশাককে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুফা ছুটে যায় তার কাছে, কী ব্যাপার, আপনি এমন মনমারা হয়ে শুকনো মুখে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ওস্তাদ? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

ইশাক সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, এমন গান তুমি কোথায় শিখেছ, তুফা?

তরুণী তুফা লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। কোনও জবাব দিতে পারে না।

ইশাক বলে, তোমার গলায় যাদু আছে, বাছা। এ বস্তু শুধু তালিম নিয়ে রপ্ত করা যায় না।

তুফা বলে, আপনি আমার ওস্তাদ। আপনার আশীর্বাদেই যা কিছু সম্ভব হয়েছে।

—ও কথা বলো না, তুফা। তুমি যে সংগীত-সুধার অধিকারিণী আমি আজ তা সংগ্রহ করতে পারিনি। তোমার সংগীতের মূল্য যদি দিনার হয়, আমার সংগীতের দাম হতে পারে মাত্র একটি দিরহাম। তুমি নিজেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তোমাকে শেখাবার মতো স্পর্ধা আমার নাই। চল আর কালবিলম্ব না করে এখুনি তোমাকে খলিফার হাতে তুলে দিয়ে আসি। তাঁর অনুগ্রহে তুমি হারেমের সেরা বাঁদী হয়ে দিন কাটাতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। কিন্তু তখন এই অধম ইশাককে তুমি ভুলে যেও না, তুফা।

তুফা কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে, এ কি কথা মুখে আনছেন ওস্তাদ, আপনিই আমার ঝর্নার একমাত্র উৎস। তাকে আমি ভুলে যাবো?

ইশাক একখানা কোরান এনে তুলে দিল তুফার হাতে। কোরানখানা মাথায় ঠেকিয়ে তুফা শপথ করলো, জীবনে যতদিন বাঁচবো, কোনও দিন আপনাকে ভুলবো না, ওস্তাদ।

ইশাক বললো, তোমার অদৃষ্টের লিখন অপূর্ব। এবং তারই ফলে আজ তুমি খলিফার অংকশায়িনী হতে চলেছ। আমি প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও। এবার আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ কর তুফা। এইমাত্র যে গানটি তুমি গাইছিলে, যাবার আগে, আর একবার ঐ গানটি আমাকে শুনিয়ে দাও। আর একটা কথা, খলিফার সামনে যখন তুমি উপস্থিত হবে এই গানটাই তাকে শুনিয়ো প্রথমে।

তুফা আবার ধরলো গানটি। শেষও করলো এক সময়। ইশাক কিন্তু মুদিত-নয়নে তন্ময় হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, এবার তোমার জীবনের কাহিনী শোনাবে না, তুফা? আমি জানি যেখানে তুমি ছিলে এতকাল, সে তোমার প্রকৃত জায়গা নয়। কিন্তু কী করে কক্ষচ্যুত হয়ে তুমি অমর্ত্যলোক ছেড়ে অতি সাধারণ এক দরিদ্র ঘরে এসে উঠেছিলে?

তুফা মৃদু হেসে বলতে থাকে, আপনি আমার মালিক, প্রভু, ওস্তাদ। আপনার কাছে লুকাবার আমার কিছুই থাকতে পারে না। তবে আমার জীবনের কাহিনী বড়ই বিচিত্র—পুঁথির পাতায় লিখে রাখার মতো। তবে আজ নয়, সময় মতো আর একদিন, শোনাবো আপনাকে। এখন চলুন সুলতানের প্রাসাদে যাই আমরা।

একটু পরে জমকালো সাজপোশাক পরে ইশাকের সামনে এসে দাঁড়ালো তুফা।

সুলতানের প্রাসাদে এসে বিরাট একটা সুসজ্জিত কক্ষের মাঝে তুফাকে বসিয়ে ইশাক বললো, এখানে তুমি বসো। আমি খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।

খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে ইশাক নিবেদন

করলো, বেহেস্তের এক ডানাকাটা পরীকে নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, যাকে আমরা সেই বৃদ্ধের বাড়িতে দেখেছিলাম ? যার মধুর গান শুনেছিলাম ?

—হ্যাঁ, জাঁহাপনা, আপনার স্মরণ আছে দেখছি !

—তাকে কি ভোলা যায় ইশাক ? সে যে সকালবেলার শিশির, সন্ধ্যাকালের শুকতারা। তার গান একবার যে শুনেছে, সে কি কখনও তাকে ভুলতে পারে ? যাও যাও, শিগ্গির তাকে নিয়ে এস এখানে। তার গান শুনে জীবন সার্থক করি।

এই সময় রাত্রিও প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো ঊনত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটু পরে ইশাক তুফাকে সঙ্গে করে খলিফার সামনে এসে দাঁড়ালো। খলিফার চোখ প্রজ্জ্বল হলো। হৃদয় নেচে উঠলো। খলিফা দেখলেন সুন্দরী তাকে কুর্ণিশ জানাচ্ছে। তিনি আশীর্বাদ জানালেন, খোদা তোমাকে চিরসুখী করুন, সুন্দরী।

মসনদ ছেড়ে নেমে এসে তুফার হাত ধরলেন খলিফা। তারপর তার বোরখার নাকাবটা নামিয়ে দিলেন নিজের হাতে। এর অর্থ এখন থেকে সে সুলতানের হারেমের বাঁদী হলো।

এরপর হাতে ধরে মসনদে নিয়ে গিয়ে তুফাকে তার পাশে বসালেন খলিফা।

গান শুরু হলো। সেই গান।

সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছনায় খলিফা বিমোহিত হয়ে পড়লেন।

—এমন সঙ্গীত তুমি কোথায় পেয়েছ, সুন্দরী ?

খলিফার প্রশংসায় অন্তর নেচে ওঠে তুফার। কিন্তু লজ্জায় মাথা তুলে তাকাতে পারে না।

খলিফা বলতে থাকেন, তুমি হলে আল্লার শ্রেষ্ঠ অবদান।

তারপর ইশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, একি হে ইশাক, এ যে গুরুমারা বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছ তোমার ছাত্রীকে ! আমার তো মনে হয় এ গান তুমিও এমন করে গাইতে পারবে না।

—আপনি যথার্থই বলেছেন জাঁহাপনা, এমন মধুর গান আমার কণ্ঠ থেকে বেরুবে না। আল্লাহর দোয়ায় যা কিছু আমি পেয়েছি, শিখেছে তার সবটাই, তুচ্ছ হয়ে গেছে এই সঙ্গীতের কাছে। এখন ভাবছি, এত যে আমার দেশ জোড়া নাম, তার কিই বা মূল্য আছে।

খলিফা বললেন, বহুত আচ্ছা। এতদিন পরে তোমার দম্ভ ভাঙলো তাহলে, ইশাক। স্বীকার করলে, তুমি যা জান তাই শেষ কথা নয় ?

—এ গান শোনার পর সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠা নাই আমার ধর্মাবতার।

সত্যিই আমি এতকাল ধরে সঙ্গীত-সাগরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম মাত্র।

তুফা আর একটি গান গেয়ে শোনালো। খলিফা মাসরুরকে বললেন, যা, একে হারেমে নিয়ে যা। দেখিস যেন আদর যত্নের কোনও রকম ত্রুটি না হয় কখনও।

তুফা মাসরুর সঙ্গে অন্দরমহলে চলে গেলে খলিফা ইশাককে বললো মেয়েটি অসাধারণ রূপ-গুণেরই অধিকারিণী নয়, রুচিও বড় সুন্দর। কেমন সুন্দর করে সেজেছে। আর অত জমকালো সাজ-পোশাকই বা কোথায় পেল সে?

ইশাক বললো, এই বান্দাই পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল জাঁহাপনা। তবে পোশাক যতই মূল্যবান হোক তা মানানসই করে পরতে না জানলে মোটেই সুন্দর দেখায় না। আর সবার ওপরে জাঁহাপনার প্রসন্ন দৃষ্টিই তাকে আরও সুন্দর করে তুলতে পেরেছে।

খলিফা জাফরকে ডেকে বললেন, ইশাক আজ আমাকে যা দিয়েছে, কড়ির মূল্যে তা কেনা যায় না জাফর, এক লক্ষ মোহর ওর প্রাসাদে বকশিশ পাঠিয়ে দাও। সেই সঙ্গে দশটি মূল্যবান সাজ-পোশাকও দিও।

সন্ধ্যা সমাগত হলে খলিফা সুন্দরী তুফার কক্ষে এলেন। দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নতুন রোমাঞ্চে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলেন তুফা আজ পর্যন্ত অনাঘ্রাতা অপাপবিদ্ধা একটি ফুল। তারই ভোগের পাত্রী হয়ে অপেক্ষা করছিল সে এতদিন।

সেইদিন থেকে তুফা খলিফার হৃদয়-সিংহাসনে সর্বোচ্চ সমাদর ও ভালবাসায় অধিষ্ঠিতা হয়ে রইল। খলিফা তুফার শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধি বিচক্ষণতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে গেলে তার হাতেই সরকার পরিচালনার চাবিকাঠি তুলে দিলেন। মাসে দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মাসহারা বন্দোবস্ত করা হলো! এবং তার পরিচর্যার জন্য পঞ্চাশটি নফর চাকর পরিচারিকা দাসী বাঁদীর ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

ভালবাসার আকর্ষণ দিনে দিনে এমনই ভাবে বাড়তে থাকলো যে, খলিফা আজকাল বড় একটা অন্য কোনও বাঁদী বেগমের ঘরে রাত কাটান না। দরবার শেষে সোজা চলে যান তিনি তুফার মহলে। সেখানেই তাঁর সর্বাধিক সময় কাটে।

অন্য কোনও খোজার প্রহরাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। তুফার মহল ছেড়ে চলে আসার সময় তিনি নিজে হাতে দরজায় কুলুপ এঁটে দেন। আবার ফিরে এসে নিজে হাতেই সে তালা খুলে তুফার ঘরে প্রবেশ করেন।

একদিন খলিফা তুফার ঘরে প্রবেশ করে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে আদর জানিয়ে চুম্বন করলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত, ক্ষোভে ফেটে পড়লো তুফা। রাগের মাথায় কী করবে ভেবে না পেয়ে সাধের তানপুরাটাই দুখানা করে ভেঙে ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। খলিফা হতভম্ব তুফার গোসার কারণ কি কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না।

—কী হলো মনি, কী করলাম আমি? অমন করে কাঁদছো কেন? তোমার

চোখে পানি দেখলে যে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না। বল আমার কী দোষ হয়েছে?

—দোষের কথা নয় জাঁহাপনা, তুফা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলে, আপনি আর আগের মতো আমাকে ভালবাসেন না।

—হায় আল্লাহ, এই তুমি আবিষ্কার করলে? তুমি তো জান না সোনা, তোমার জন্য আজকাল আমি সরকারী কাজেও গাফিলতি আরম্ভ করেছি। তোমাকে চোখের আড়াল করে একদণ্ড আমি সুস্থির থাকতে পারি না। আর তুমি কিনা বললে, আমার ভালবাসায় ভাটা পড়েছে।

তুফা বলে, তা নয় তো কী? আপনি একটা নিয়ম রক্ষার জন্য শুধু আমার হাতখানা নিয়ে চুমু খেলেন কেন? আমি কী রূপ-যৌবন সব খুইয়ে ফেলেছি এর মধ্যে। আমার অধরে কি কামনা নাই? আমার বুকে কি আর মধু পান না আপনি? শুধু শুকনো একখানা হাত টেনে নিয়ে ঠোঁট ছুইয়ে কর্তব্য শেষ করতে চাইছেন।

উষ্মার আসল কারণ অনুধাবন করতে পেরে সুলতান দুহাতে তুফার দেহখানা টেনে নেন বুকের মধ্যে, চুম্বনে চুম্বনে আরক্ত করে দেন ওর অধর, স্তন, নাভিস্থল, জঙ্ঘা।

—ও, এই জন্য তুমি রাগ করেছ মনি। তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি। আমার চাচার মেয়ে জুবেদা আমার খাস বেগম—তাকেও আমি এত ভালবাসি না সোনা। তুমি আমার সারা হৃদয় মন অধিকার করে বসে আছ।

একদিন খলিফা শিকারে বেরিয়ে গেছেন, তুফা একা একা তার ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিল, এমন সময় সেখানে বেগম জুবেদা এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ নাকে একটা সুমধুর সুগন্ধ ভেসে আসতে চোখ তুলে তাকাতেই জুবেদাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে কাচুমাচু মুখে বলতে লাগলো, আপনি অপরাধ নেবেন না বেগমসাহেবা। এ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার আমার অনুমতি নাই, তাই আপনার সঙ্গে ইচ্ছা থাকলেও, সাক্ষাৎ করতে যেতে পারিনি। বাঁদীর ঘরে আপনি নিজেই যখন এসেছেন, মেহেরবানী করে আসন গ্রহণ করে ধন্য করুন।

জুবেদা তুফার প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়লেন। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলো আমি শুনেছি তুমি খুব উঁচুমানের মেয়ে। তোমার মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, স্বার্থত্যাগের কোনও অভাব নাই। আজ তোমার সামনে এসে তোমার বিনয়াবনত ব্যবহার দেখে আমারও সে কথা মনে হচ্ছে। সহজাত মহত্ত্বই তোমার ভূষণ। আমার স্বামীর দিব্যি নিয়ে বলছি, তার পেয়ারের বাঁদীদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ানো আমার স্বভাব নয় তুফা। তা সত্ত্বেও তোমার কাছে কেন এলাম? শোনও তাহলে বলি: যে দিন থেকে এই হারেমে তুমি এসেছ, সেইদিন থেকে আমার সুখের দিন শেষ হয়েছে তুফা। একদিকে সুলতানের কাছে তোমার সমাদর, আদর সোহাগ যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে

আমার বেলায় তেমনি ভাটা পড়েছে। আজকাল বলতে গেলে, সুলতান আর আমার মহলে পা-ই রাখেন না। আমি যেন প্রায় অবহেলিত হয়ে এই প্রাসাদের এক কোণে পড়ে আছি এক নগণ্য নারীর মতো। এই হারেমে একদা সুলতান-সোহাগিনী অনেক বাঁজা বাঁদী পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে, অবশেষে আমাকেও কি তাদের দলে নাম লেখাতে হবে! না হলে আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, ভুলেও তিনি একবার আমার খোঁজ করেন না আজকাল!

জুবেদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বেগমসাহেবার দুঃখে তুফাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না। সেও কাঁদতে লাগলো।

কিন্তু জুবেদা শুধু কাঁদতেই থাকলেন না, কাঁদার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলাও অব্যাহত রাখলেন তিনি।

—আমি তোমার কাছে একটি আর্জি নিয়ে এসেছি বোন, তুমি এই বড় বোনের মুখের দিকে চেয়ে মাসে অন্তত একটি রাতের জন্য—সুলতানকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও। শুধু একটি মাত্র রাত—এক মাসের মধ্যে। কী পারবে না তাকে ছেড়ে দিতে? যত যা ঘটুক, আমি তো তাঁর কেনা বাঁদী নই —কোরান ছুঁয়ে শপথ করে ধর্মমতে শাদী করেছেন তিনি আমাকে।

জুবেদার করতলে অধর রাখলো তুফা, অব্যক্ত বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে অস্ফুট স্বরে বলতে পারলো না না শুধু একরাতের জন্য নয় বেগমসাহেবা, সারা মাসের প্রতিটি রাত্রি তিনি আপনার কাছে অতিবাহিত করবেন। আপনার চোখে পানি—না না, সে মহাপাপ আমার পক্ষে। আমি না জেনে যে গুস্তাকী করেছি আপনি নিজগুণে আমাকে তা ক্ষমা করুন বেগমসাহেবা। আমি আপনার চিরকাল দাসী বাঁদী হয়ে থাকতে চাই।

এই সময় জুবেদা দেখলেন সুলতান শিকার শেষ করে প্রাসাদে ফিরেই তিনি সোজা তুফার ঘরের দিকে ছুটে আসছেন। জুবেদা আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলেন না তুফার ঘরে। বললেন, তা হলে আজ চলি, ভাই।

সুলতান ঘরে ঢুকেই তুফাকে কোলে টেনে নিয়ে সোহাগ করতে থাকলেন, জান মনি, শিকারে গিয়ে আর কিছুই ভাল লাগে না। তুমি পাশে নাই, শিকারে কি মন বসে! একটা খরগোশও মারতে পারলাম না।

দুজনে সরাবের পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। খানা-পিনা শেষ করে বিবস্ত্র হয়ে শয্যায় যাওয়ার জন্য সুলতান তুফাকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তুফা খলিফাকে সোহাগ জানাতে জানাতে বললেন, আজ আমার একটা কথা রাখতে হবে জাঁহাপনা।

—তোমার কোন্ কথা আমি রাখিনি, সোনা। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। বল কী করতে হবে?

তুফা বললো, আপনি বেগমসাহেবার প্রতি প্রসন্ন হোন, আজ রাতটা তার মহলেই কাটিয়ে আসুন, এই আমি চাই জাঁহাপনা।

খলিফা একটু হকচকিয়ে গেলেন তুফার কথায়, বেশ তো, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। হ্যাঁ, অনেক দিন তার কোনও খোঁজখবর নিতে পারিনি, বড় অন্যায়

হয়ে গেছে। কিন্তু মনি, আমি যখন তোমার ঘরে এলাম তখন না বলে যখন সাজ-পোশাক খুলে নগ্ন নাগা হয়ে শুতে যাবো সেই সময় একথা বললে কেন?

তুফা বললো, মহাজন বলেছেন, যখন তুমি কিছু প্রার্থনা করবে তখন তুমি অবশ্যই নগ্ন বিবস্ত্র থাকবে।

তুফার মুখে উপদেশের বাণী শুনে ওকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন সুলতান। তারপর যা ঘটার তাই ঘটেছিল।

তুফার মহলে তালা এঁটে জুবেদার মহলে চলে এলেন সুলতান।

এরপর তুফার জীবনে যা ঘটেছিল তা বড়ই বিচিত্র—এক কথায় অনন্যসাধারণ বলা যায়। যাই হোক সেই কাহিনীই ধীরে ধীরে শোনাবো আপনাকে, জাঁহাপনা—।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো তিরিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

সুলতান চলে গেলে তুফা একখানা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারলো না। বইখানা রেখে দিয়ে তানপুরাটা তুলে নিয়ে গান ধরলো।

সঙ্গীত-মূর্ছনায় বিভোর হয়ে গেছে তুফা, এমন সময় সে দেখল ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ। তুফার সারা শরীর ভয়ে কেঁপে উঠলো, এমন সুরক্ষিত হারেমে পরপুরুষ প্রবেশ করলো কী উপায়ে? সে কি স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে?

বৃদ্ধটা কাছে এল না, কোনও কথা বললো না। তুফা আর সেদিকে তাকালো না, গানও থামালো না। যেন কিছুই ঘটেনি, কেউই আসেনি সেখানে এমনই ভাব করে আপন মনে গাইতেই থাকলো।

আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখতে থাকলো তুফা; লোকটা গানের তালে তাল মিলিয়ে অপূর্ব ছন্দে নেচে চলেছে।

এক সময় সে গান থামায়। বৃদ্ধের নাচও বন্ধ হয়ে যায়। এবার সে কাছে এগিয়ে এসে বলে, আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ? ভয়ের কিছু নাই, তুফা। আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই জানি। আমার দ্বারা কোনও রকম অনিষ্ট তোমার হবে না।

বুকে সাহস টেনে তুফা বলে, কে তুমি? সুলতানের এই হারেমে তো কোনও পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। তুমি এলে কি করে এখানে?

বৃদ্ধ বললো, আমার গতি অবাধ, আমাকে কেউ রুখতে পারে না।

তুফা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তবে কি তুমি কোনও জিন?

বৃদ্ধ বলে; তোমার অনুমান সত্য, আমি জিনিস্তান থেকে আসছি। আমার নাম ইবলিস।

—ইয়া আল্লাহ! তুফা আর্তনাদ করে ওঠে, একি করলে তুমি? আমি তো কখনও বিধর্মের কথা চিন্তা করিনি?

বৃদ্ধ ইবলিস আরও কাছে এসে তুফার হাতে চুম্বন করে বললো, আমাকে ভয় করো না, বাছা। হতে পারি জিন, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমার ক্ষতি করতে আসিনি এখানে। বরং, বহুদিন ধরে তোমাকে আমি আড়াল করে রেখেছি, যাতে কেউই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ না করতে পারে। আমাদের মহারানী জিন-সম্রাজ্ঞী কামাবিয়াহ তোমাকে প্রাণাধিক ভালবেসে ফেলেছেন। আমি তারই আজ্ঞাবহ, সকল বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি আমার ঘাড়ে দিয়েছেন। তুমি জান না, কত দিন গভীর রাতে আমাকে তিনি সংগে করে নিয়ে এসেছেন এখানে। আমি দেখেছি, সারাটা রাত তিনি অপলকভাবে তোমার নিদ্রিত দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার রাতের অন্ধকারেই স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন। তোমাকে দেখে দেখে তাঁর যেন আর আশ মেটে না।

কিন্তু আজ আমি একাই এসেছি তার দূত হয়ে। যদি তুমি আমার ওপর ভরসা রেখে আমার সংগে এই রাতে জিনিস্তানে চল তবে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন মহারানী। আজ একটা পরম শুভদিন। আজ আমার কন্যার বিয়ে হচ্ছে, আর ছেলের হচ্ছে ছুন্নত। দারুণ আনন্দ উৎসবের বান ডেকেছে সারা জিনিস্তানে। এই শুভদিনে মহারানী তোমাকে একান্তভাবেই কামনা করছেন। তুমি উপস্থিত থাকলে, আমাদের উৎসব আনন্দ আরও দশগুণ বেড়ে যাবে। আমার অনুরোধ, তুমি না করো না, চল আমার সংগে। সেখানে তুমি যতদিন বা যতক্ষণ থাকতে চাও থেক, তারপর যদি না ভাল লাগে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব এখানে।

ইবলিসের এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস হলো না ভয়ার্ত তুফার। সে জানতো 'না' বললে হিতে বিপরীত হবে। তখন সে জোর করেই তাকে নিয়ে যাবে।

ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানালো। এবং প্রায় সংগে সংগেই ইবলিস তুফাকে পিঠে বসিয়ে কী এক আশ্চর্য যাদুবলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে চলতে থাকলো।

নিচের দিকে তাকিয়ে তুফা বুঝতে পারলো সে কত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ইবলিসের পিঠে চেপে। মাথাটা কেমন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। তারপর কখন যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, আর বুঝতে পারেনি।

যখন জ্ঞান ফিরলো, চোখ মেলে সে দেখলো এক স্বপ্নে দেখা সোনার প্রাসাদ-পুরীতে এসে পৌঁচেছে। যেদিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়, হীরা চুনী পান্না মুক্তোর ছড়াছড়ি। প্রাসাদের দেওয়াল মহামূল্যবান মনি ও রত্ন দিয়ে কারুকার্য করা। আলোর ছটায় ঝলমল করছে চতুর্দিক।

জিন-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তুফাকে দেখা মাত্র সহাস্যে নেমে এলেন তিনি। তার পিছনে পিছনে এসে দাঁড়াল তিনটি অপরূপ

সুন্দরী মেয়ে। সকলেই তুফাকে স্বাগত জানিয়ে অভিবাদন করলো। মহারানী এগিয়ে এসে একখানা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করলেন।

তুফার বুঝতে অসুবিধা হলো না এই সেই মহারানী কামারিয়াহ।

তুফাকে হাতে ধরে মহারানী তাঁর সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন। দুহাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরে আদর সোহাগ করলেন অনেকক্ষণ।

এমন সময় বৃদ্ধ ইবলিস আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আমিই বাদ পড়ে গেলাম শুধু।

এই সময় রাত্রি, প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো একত্রিশতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

সংগে সংগে হাসির তুফান উঠলো। সে হাসিতে তুফাও যোগ না দিয়ে পারলো না।

মহারানী কামারিয়াহ বললেন, আমি তোমাকে কি যে ভালবাসি বোন, কি করে বোঝাবো তোমাকে! তোমাকে কাছে পাবো বলে আমার আকুতির অন্ত নাই।

তুফা বললো, আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়ে গেছি মহারানী। আপনার এই আদর সোহাগ আমার চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এই বলে তুফা কামারিয়াহর সামনে গড় হয়ে নমস্কার জানালো। মহারানী দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলেন তুফাকে। আদর চুম্বন করে বাকী তিন নারীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এরা আমার বোন, সম্রাটের অন্য তিন পত্নী।

তুফা ওদেরও অভিবাদন জানালো।

পরিচারিকারা নানারকম খানাপিনার থালা সাজিয়ে দিল সামনে। মহারানী বললেন, নাও খেয়ে নাও, ভাই।

সিংহাসনের দুই পাশে দুটি দৈত্যের মতো বিরাট এবং কুৎসিত কদাকার দুই জিন দানব দণ্ডায়মান ছিল। ওদের দেখে তুফার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠছিল। খিদে তেষ্টা সব উঠে গিয়েছিল ওর। তুফা সাহস করে মহারানী কামারিয়াহর কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, আচ্ছা মহারানী, ওরা অত ভয়ংকর কুৎসিত কেন?

মহারানী অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, ভয় নাই ভাই, ওদের একজনের নাম অল শিসবান, আর একজন স্বনামে ধন্য মাইমুন, আমার দেহরক্ষী। ওরা দেখতে অসুন্দর হলেও ভয়ের কিছু নাই। তোমার কোনও অসম্মান যাতে না ঘটে, তাই ওরা সতত প্রস্তুত।

—আমি যে ওদের দিকে চাইতে পারছি না, মহারানী! ঐ মাইমুন যেন আরও বেশি ভয়ংকর। আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

তুফার কথায় আবার হো হো করে হেসে উঠলেন কামারিয়াহ। হাসির কারণ বুঝতে না পেরে শিসবান জিজ্ঞেস করলো, কি হলো, অমন হাসছেন কেন, মহারানী? এমন কি মজার ব্যাপার ঘটলো?

জিনেদের দুর্বোধ্য ভাষায় মহারানী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ওদের। তা শুনে রুষ্ট হওয়ার বদলে দুজনেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি?

তুফার মনে আর সংশয় রইল না। ভয়-টয় উঠে গেল তৎক্ষণাৎ। হাসি গল্প কথার মধ্য দিয়ে আহারাদি শেষ করলো সে।

এরপর ইবলিস মদের একটা পাত্র এনে হাজির করলো তুফার সামনে। বললো, অবশ্য এই ঝারির মদের আর তেমন প্রয়োজন নাই, তোমার রূপের মাদিরাতেই আমরা সবাই মাতাল হয়ে উঠেছি এরই মধ্যে।

আবার হাসির গমকে ফেটে পড়লো মহারানীর মহল।

বৃদ্ধ বললো, তোমার সুললিত কণ্ঠের সংগীত একমাত্র আমিই শুনেছি। সে যে কি বস্তু তা ব্যক্ত করে বোঝাবার ভাষা আমার নাই। তাই মালকিন, আমার অনুরোধ সেই অলৌকিক সংগীত একবার এখানে শুনিয়ে দাও মহারানীদের।

তুফা গান ধরলো, আর তার তালে তালে নাচতে থাকলো বৃদ্ধ ইবলিস।

গানের গমকে চন-মন করে ওঠে সকলে। মহারানী প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, আজকের আনন্দের তুলনা নাই। একি শোনালে, ভাই? এ কণ্ঠ তুমি কোথায় পেয়েছ? তোমার গান শুনে আমার দেহের রক্তও তার পথে চলতে ভুলে গেছে। হাত দিয়ে দেখ আমার বুকের কলিজাও তার কাজ বন্ধ রেখে তোমার গান শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আহা! কি মধুর গানই শোনালে, মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল! আর একখানা শোনাবে ভাই?

তুফা বললো, সে আর বেশি কি কথা। আমার গান আপনার ভাল লেগেছে তাতেই আমি ধন্য। আপনার যতক্ষণ ভাল লাগে শুনুন, আমি গাইছি।

গানে গানে উদ্দাম হয়ে উঠলো জিন হুরী। স্থান কাল পাত্র ভুলে ছোট বড় সকলে থৈ থৈ করে নাচতে লাগলো।

এইভাবে একটানা গানের মাইফেল চললো অনেকক্ষণ। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এক সময় থামলো তুফা। মহারাণী কামারিয়াহ ওকে জড়িয়ে ধরে অন্তরের সোহাগ জানালেন।

—আমার মুখে ভাষা নাই বোন, যে তোমার গানের উপযুক্ত প্রশংসা করতে পারি। তুমি আমাদের যে আনন্দ দিলে তার কোনও তুলনা হয় না। শুধু শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না।

তুফা আহ্লাদে ফেটে পড়ে, আপনারা খুশি হয়েছেন এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আজ আমি এখানে পৌছনোর পর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। না হলে এতক্ষণে আরও অনেক রকমের গান শোনাতে পারতাম আপনাদের। আবার যদি কখনও সুযোগ হয় আমি আসবো আপনার কাছে।

তখন দেখবেন কত গান শোনাই। কিন্তু আজ আর নয়, রাত শেষ হয়ে আসছে, এবার ইবলিস দাদু আপনি আমাকে মেহেরবানী করে আমার প্রাসাদে রেখে আসুন। আমার মালিক ধর্মাবতার খলিফা যদি আমাকে ঘরে না দেখেন তবে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে কন্যার শাদী এবং পুত্রের ছুন্নত দেখে যেতাম কিন্তু আজ আর এখানে অবস্থান করার শক্তি এবং সাহস আমার নাই।

বৃদ্ধ ইবলিস বললো, এখনি চলে যাবে শুনে ব্যথায় বুক ফেটে যেতে চাইছে। কিন্তু কীই বা উপায়, তোমাকে তো ফিরতেই হবে সেখানে। যাই হোক, আরও একটু সময় কাটিয়ে যাও, এই আমাদের ইচ্ছা তুফা। কী, পারবে না? সবে আমরা মদের পাত্র অধরে রেখেছি। এমন সময় তুমি পেয়ালা নামিয়ে রেখে মৌতাত ভেঙ্গে দিতে বলছো ভাই? আর একটু সময় কি তুমি যাওয়াটা পিছিয়ে দিতে পার না তুফা?

তুফা বললো, আর আমাকে ধরে রাখবেন না, দাদু। আমার হাত পা বাঁধা, আপনি অবশ্যই জানেন। এখুনি আমাকে খলিফার হারেমে ফিরে যেতে হবে। আমি মাটির সন্তান, মাটিতেই আমার সুখ শান্তি। এই জিন হুরী যতই সুন্দর হোক, এ জায়গা মানুষের জন্য নয়। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আর আমাকে এখানে ধরে রাখবেন না। অবশ্য আপনারাও নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটকে রাখতে চান না।

—তোমার কথা শিরোধার্য সুন্দরী, ইবলিস বললো, তবে যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি জানি তোমার ওস্তাদ স্বনামধন্য ইশাক ইবন ইবরাহিম। তিনি আমাকে বেশ ভাল করেই জানেন। এক শীতের সন্ধ্যায় একটা ব্যাপার ঘটেছিল। সময় মতো তোমাকে সব বলবো আমি। আজ শুধু এইটুকু জেনে যাও, তোমার গুরু ইশাক আজ জগৎ বিখ্যাত হতে পেরেছে আমারই কল্যাণে। আর তুমি? তুমিই বা এই কোকিল-কণ্ঠ পেলে কী করে? সেও আমারই দেওয়া! ইশাকের ওপর আমি যতটা প্রসন্ন, তোমার ওপর তার চাইতে অনেক বেশি। তুমি যখন গান গাইতে শুরু কর আমি তোমার কণ্ঠে ভর করি। তাই তোমার গান শুনে সবাই পাগল হয়ে ওঠে। এরপর আমি তোমাকে যে সুর দেব তা শুনে সারা দুনিয়া অবাক হয়ে যাবে। খলিফা তোমাকে মাথার মণি করে রাখবেন চিরকাল। সুতরাং ভেবে দেখ, কী করবে, তুফা?

ইবলিস তুফার তানপুরাটা তুলে নিয়ে গান ধরলে তুফা চমকে উঠলো; এমন নতুন সুর তো কখনও সে শোনেনি কোথাও? মুহূর্তের মধ্যে সে বুঝেতে পারলো, এতদিন ওস্তাদ ইশাক তাকে যা শিখিয়েছে তা এর কাছে নেহাতই ভুলে ভরা।

ইবলিসের হাত থেকে তানপুরাটা নিয়ে সে ঐ গানটা হুবহু গেয়ে দিল। মহারাণী এবং তার সঙ্গীনিরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। চমৎকার—চমৎকার তুফা, জবাব নাই! তুমি একেবারে উচ্চমার্গে পৌঁছে গেছ, আমি

তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধিতে বরণ করলাম। আজ থেকে তুমি সংগীত-সম্রাজ্ঞী হলে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো ছত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একখানা সুদৃশ্য মোরগের চামড়ার ওপর ইবলিস নিজ হাতে মানপত্র রচনা করে তুফার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এ সম্মান পৃথিবীর কোনও মানুষ আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি তুফা, তুমিই শুধু পারলে ?

এর পর তুড়ি বাজাতেই বারটি সুন্দরী মেয়ে প্রত্যেকে একটা করে সোনার বাক্স মাথায় করে প্রবেশ করলো সেখানে। বাক্সগুলি মহামূল্যবান রত্ন অলঙ্কারে ভরা ছিল। ইবলিস খুলে খুলে দেখালো বাক্সগুলো, এই সবই তোমার। মহারানী তোমাকে উপহার দিলেন।

মহারানী কামারিয়াহ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে তুফাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন, আমি জানি কোনও কিছু দিয়েই তোমাকে ধরে রাখতে পারবো না এখানে। তবে এই বড় বোনকে মনে রেখ। আবার তুমি সময় মতো এসো আমাদের মাঝখানে, দুদন্ডের আনন্দ ভালোবাসায় আবার আমার মহল মুখর করে তুলো, এই আমার অনুরোধ, বোন। প্রতি রাতেই আমি তোমাকে দেখতে যাই তোমার প্রাসাদে। আজও ইবলিসের সংগে আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারনি। কারণ আমি অশরীরি হয়েছিলাম তখন। তাই তুমি আমাকে দেখতে পাওনি। এরপর আমি সশরীরে একটি ছোট মেয়ের রূপ ধরে তোমার ঘরে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে জাগাবো তুফা। তুমি রাগ করবে না তো ?

তুফা বলে, কি যে বলেন, না না, আমি খুব খুশি হবো মহারানী, আপনি যাবেন আমার ঘরে! আপনার হাতের স্পর্শে যদি আমার ঘুম ভাংগে তার চেয়ে আর আনন্দের কি হতে পারে, মহারানী ?

শেষ বারের মতো কামারিয়াহ তুফার কপোলে চুম্বন এঁকে দিয়ে বিদায় জানান।

ইবলিস হামাগুড়ি দিয়ে বসে তুফাকে পিঠে বসিয়ে আবার উড়ে চলে আকাশ পথে। চলার গতি বিদ্যুতের প্রায়। এবার কিন্তু তুফার ভয় করে না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে না।

উড়তে উড়তে প্রাসাদে এসে অতি সন্তর্পণে তুফাকে তার পালঙ্ক-শয্যায় নামিয়ে দেয় ইবলিস। তারপর কুর্নিশ জানিয়ে নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

তুফার চোখে ঘুম আসে না। তানপুরাটা তুলে নিয়ে সে গান ধরে।

গানের আওয়াজে অবাক হয়ে উঁকি দেয় খোজা প্রহরী সাবাব। একি ভূতুড়ে কান্ড রে বাবা! যে মেয়েকে সারা প্রাসাদ তোলপাড় করেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, হঠাৎ আবার সে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো কী করে ?

চারদিকে সতর্ক পাহারা ফাঁকি দিয়ে একটা পতঙ্গেরও তো ঢোকার উপায় নাই এই হারেমে। সেক্ষেত্রে তুফা বাঁদী কি করেই বা রাতারাতি অদৃশ্য হতে পেরেছিল, আবার কি করেই বা সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আবার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে পারলো ?

কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে সে খলিফার খাস দেহরক্ষী মাসরুরের কাছে ছুটে গেল।

সব শুনে মাসরুর বললো, কী, আজ বুঝি মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে ? খলিফা শুনলে তোর গর্দান নেবে।

সাবাব বললো, কিন্তু নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারছি না মাসরুরজী। বিশ্বাস না হয়, আপনি চলুন, স্বচক্ষে দেখবেন তাকে।

অবশেষে সাবাবের কথার অসারতা প্রমাণ করার জন্যেই মাসরুর এল তুফার কামরার সামনে।

তাজ্জব ব্যাপার! একি করে সম্ভব ? ছুটে গেল সে খলিফার কক্ষে। সুলতান হারুন অল রসিদ তখন ঘুমে বিভোর। সে সময় তাঁর নিদ্রা ভংগ করা মহা অপরাধ। কিন্তু হতবুদ্ধি মাসরুর তখন সে সব নিয়ম-কানুন বেমালুম ভুলে গিয়ে খলিফাকে ডেকে তুললো।

স্বভাবতই সুলতান ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ওরে পাষণ্ড, তোর এত সাহস, আমার ঘুম ভাঙ্গালি ? কী, কী ব্যাপার, কোন্ সরকারী কার্য রসাতলে যেতে বসেছে যে. এই রাত দুপুরে তুই আমার ঘুম ভাংগাতে সাহস করলি ? জানিস এর সাজা কী ?

মাসরুর বলে, জানি ধর্মাবতার, মৃত্যু। কিন্তু এদিকে যা দেখে এলাম, এই মুহূর্তে আপনাকে তা না জানাতে পারলে তাতেও আমাকে মৃত্যুদণ্ডই নিতে হতো। সেই কারণে জানের মায়া ত্যাগ করে এখুনি আপনাকে জানাতে বাধ্য হয়েছি।

—কী এমন আজব খবর ?

—জী, মহামান্যা মালকিন তুফা ফিরে এসেছেন।

সুলতান হো হো করে হেসে উঠলেন, ব্যাটা নচ্ছার, কুত্তাকা বাচ্চা, চরস টেনেছিস্ ? এই অপরাধে তোকে শূলে চড়াবো কাল।

—তা আপনার যা অভিরুচি করবেন, জাঁহাপনা। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখে এলাম তিনি তাঁর পালঙ্কে বসে গান ধরেছেন।

সুলতান বললেন, দ্যাখ মাসরুর, এই দুপুর রাতে আমাকে তুই আবার তুফার ঘরে দৌড় করাবি ? কিন্তু মনে থাকে যেন, তোর কথা যদি মিথ্যে হয় তবে নির্ঘাৎ ফাঁসী দেব তোকে। আর যদি সত্যি সত্যিই তুফাকে আমি দেখতে পাই তবে দু লক্ষ দিনার ইনাম পাবি তুই। আর সেই সঙ্গে আজই তোকে আমার গোলামী থেকে খালাস করে দেব।

মাসরুরকে সংগে নিয়ে সুলতান তুফার মহলে চলে এলেন। সত্যিই অবাক কাণ্ড, অপূর্ব স্খলিত কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছে তুফার কক্ষ থেকে। এবং

এ কণ্ঠ তো তার বহুৎ চেনা—তুফা ছাড়া এমন মধুর করে কেই বা এ গান গাইতে পারে ?

সুলতানকে দরজার সামনে দেখামাত্র গান থামিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তুফা। ভূত দেখার আতংকে দুপা পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে তুফার বাহুপাশ মুক্ত করে নেন, কে তুমি ?

—সে কি জাঁহাপনা, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি আপনার সোহাগের তুফা।

—কিন্তু তুমি তো জিনের কবলে পড়েছিলে ? একবার যার ওপর জিনের নজর পড়ে, সে তো আর ফিরে আসতে পারে না। এলে কী করে ?

তখন তুফা আদ্যোপান্ত পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। বললো, এই দেখুন ধর্মাবতার এই সেই মানপত্র। স্বয়ং ইবলিস দিয়েছেন আমাকে। আর এই দেখুন বারটি সোনার তৈরি রত্নালংকারের বাক্স। সবগুলো বাক্সই মহামূল্য মণি-রত্নে ভরা আছে।

এই বলে সে কেশের ভিতর থেকে সেই মানপত্রখানা বের করে দিল সুলতানের হাতে। এবং বাক্সগুলোর ডালা খুলে বিপুল ঐশ্বর্য আভরণ দেখাতে থাকলো।

এরপর সুলতান হারুন অল রসিদ সব বিশ্বাস করলেন তুফার কথা। এবার তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তুফাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

সুলতান হারুন অল রসিদের আনন্দের আর অবধি রইল না। সারা শহর প্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত করতে বললেন তিনি।

উৎসবের ধুম পড়ে গেল। ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো গরীবদের জন্য। একমাস ধরে চললো দরিদ্র-সেবা।

কাহিনী শেষ করে শাহরাজাদ থামলো।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেছেন সুলতান শাহরিয়ার। ভাবলেন, উজির-কন্যা শাহরাজাদকে আর হত্যা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে তার জীবনে আল্লাহর আশীর্বাদের মতো এসে উপস্থিত হয়েছে। তার মত অসাধারণ গুণবতী মেয়েকে হত্যা করা সংগত হবে না। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ওর কাছ থেকে হয়তো আরও অনেক চমৎকার গল্প কাহিনী শুনতে পাওয়া যাবে।

শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন সুলতান শাহরিয়ার। চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর বরপুত্রী, তোমার কিস্সা আমার সব দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দিতে পেরেছে, শাহরাজাদ। আর যদি কিছু কাহিনী শোনাতে চাও, শুরু করে দাও। তোমার কিস্সা শোনার জন্য আমি অধীর হয়ে বসে আছি।

শাহরাজাদ বলে, আমি আপনার বাঁদী জাঁহাপনা, আপনার চিত্ত-বিনোদন করাই আমার একমাত্র ব্রত। আপনি যদি শুনতে ইচ্ছা করেন, অফুরন্ত কাহিনী শোনাতে পারি আপনাকে। কিন্তু সে সব গল্প আপনাকে খুশি করতে পারবে কিনা জানি না।

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, যে সব কাহিনী তুমি আমাকে শুনিয়েছ, তাতে

প্রত্যয় হয়েছে, তুমি এরপর যা শোনাবে তাও আমার ভাল লাগবে, বল। "আমার বেগমের বিশ্বাসঘাতকতার পর নারীজাতি সম্পর্কে আমার একটা তীব্র ঘৃণা জন্মেছিল। কিন্তু তোমার সান্নিধ্যে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে সে ভাব আমার গেছে। এখন বুঝতে পারছি সব নারীই একই প্রকৃতির নয়।

শাহরাজাদ বললো, এবার জাঁহাপনাকে অল-মালিক অল-জাহির রুক অল-দিন বাইবারস অল বুন্দুকেদারি এবং তার সিপাইসর্দারের কিস্সা শোনাবো আমি।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে :

এক সময়ে মিশরের কাইরো শহর তুরস্কের এক স্বনামধন্য সুলতান অল মালিক অল জাহির রুক অল-দিন বাইবারস অল বুন্দুকেদারি শাসন করতেন। তাঁর শাসন সময়ে ইসলাম আপন মহিমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে ফেলেছে। পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই যাও না কেন, ইসলামধর্মী ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্ব ছিল না তখন।

সুলতান বাইবারস নিজে যেমন প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন, প্রজারাও তেমনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। প্রজারা কীভাবে দিন গুজরান করে তা তিনি নজর রাখতেন সর্বদা।

সুলতানের যে ক'জন সিপাই-সর্দার ছিল তারা সকলেই তাঁর একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত। তাদের মারফতেই তিনি প্রজাদের সুখ দুঃখের সংবাদ সংগ্রহ করতেন নিত্য। সারাদিন কাজের শেষে সুলতান সমীপে হাজির হতো তারা। সুলতান ওদের নিয়ে গল্পের মজলিস বসাতেন। এক একদিন এক একজন সিপাইসর্দার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতো। আজ সেইসব কাহিনীই এখানে শোনাবো জাঁহাপনাকে।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, সুলতানের সামনে মুইন অল দিন নামে তাঁর অন্যতম এক সর্দার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে শুরু করলো :

প্রথম সর্দারের কাহিনী ঃ

আমি যখন প্রথম কাইরোয় এসে সিপাই দলে ভর্তি হই তখন আমাদের সর্দার ছিলেন আলম অল দিন মঞ্জার। তার আগেই অবশ্য আমি বেশ নাম কিনেছিলাম এই কাজে।

শহরের যত সব চোর ছ্যাঁচোড়, মেয়েমানুষের দালাল, লোচ্চা, বদমাইশ, ইতর, বেল্লিকরা আমার নাম শুনলে ঠকঠক করে কাঁপতো। আমি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের পথে চলি তখন ভয়ে কুঁকড়ে গর্তে ঢুকে যেত যতসব চোর বদমাইশ বেতমিজরা। আড়াল থেকে তারা আমাকে উঁকি দিয়ে দেখতো আর তাদের সঙ্গীদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলতো, ঐ দ্যাখ সাক্ষাৎ যম যাচ্ছে।

আমি কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে প্রবল প্রতাপে শহর পরিক্রমা করে বেড়াই।

একদিন আমি আমার কোতোয়ালীতে একটা আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করছি, এমন সময় হঠাৎ আমার কোলের ওপর এসে পড়লো একটা তোড়া। খুলে দেখি শ'খানেক দিরহাম মাত্র। হঠাৎ কী করে আমার কোলে এসে পড়লো ওটা আন্দাজ করতে না পেরে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক খুব তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু ধারে কাছে তেমন কাউকেই নজরে পড়লো না! কেমন খটকা লাগলো, তবে কি এটা আল্লাহর পাঠানো ইনাম! আমার সুকর্মের পুরস্কার!

পরদিন সকালে কাজ কাম সেরে আবার আমি বিশ্রাম করতে বসেছি আরাম কেদারাটায়, আবার একটা তোড়া এসে পড়লো আমার কাঁধের ওপর। খুলে দেখে অবাক হলাম। একই ব্যাপার, প্রায় শ'খানেক দিরহাম। এদিক ওদিক ভাল করে দেখলাম, না, কোথাও কেউ নাই তার কাছে।

আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখছি?

কিন্তু না, আমি তো ঘুমিয়ে নেই? তবে? একি তাজ্জব ব্যাপার?

যাই হোক, ভিতরে তোলপাড় হতে থাকলেও বাইরে সে ভাব চেপে যেন কিছুই ঘটেনি এমন সহজ মেজাজে সামনের আঙ্গিনায় আমি পায়চারী করতে থাকলাম।

কিন্তু পরদিন সকালে কাজ সেরে আমি খুব সজাগ হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখি সে দিনও সে ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি হয় কিনা।

আমার শ্যেন দৃষ্টির বাণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই কারো। আজ যদি আসে সে নির্ঘাৎ তাকে ধরবো।

এই সব ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্লান্তিতেই বোধ হয় কিছুটা তন্দ্রা এসেছিল।

হঠাৎ অনুভব করতে পারলাম, কুসুম-পেলব কোমল একখানি হাত যেন আমার নাভিকুণ্ডলীর চারপাশে কি যেন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

চোখ মেলে দেখলাম, নানা রত্নাভরণ-ভূষিতা সালংকারা পরম রূপবতী এক কিশোরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে লাস্য হেনে হাসছে।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কে তুমি সুন্দরী? কোন্ বাগানের বুলবুলি?

আমার সোহাগ সম্বোধনে কিছুমাত্র লজ্জা পেল না সে। মুখে কোনও কথা বললো না, ইশারায় জানালো, ওঠ, চল আমার সঙ্গে।

আমি কেমন ঘাবড়ে গেলাম, কে তুমি?

সে সপ্রতিভ ভাবে বললো, আমি কে যদি জানতে চাও তবে আমার সঙ্গে চল, মুইন।

আমি আর দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ উঠে ওকে অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। এমন সহজ নিঃশংকভাবে তার পিছনে পিছনে আমি চলছিলাম যে, যে কেউ দেখলে ভাবতে পারতো সে যেন আমার কত কালের চেনা আপনজন।

চলতে চলতে এক সময় আমরা একটা অন্ধ গলির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমাকে বললো, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে মুইন।

আমি গদগদ হয়ে বললাম, বান্দা প্রস্তুত মালকিন, বল কী করতে হবে?

মেয়েটি বললে, এই শহরের কাজীর মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব। এক দণ্ড না দেখলে আমি থাকতে পারি না। আমরা দুজনে একসঙ্গে গল্প করি, খেলা করি, খাই, বেড়াই এবং এক বিছানাতেই রাত কাটাই। ও আমার চোখের মণি, বুকের কলিজা, ওকে ছাড়া আমি জানে বাঁচবো না। ওকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমরা দুজনে দুজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, জীবনে কোনও পুরুষকে শাদী করবো না আমরা।

এইভাবে আমাদের অনেকদিন কেটেছে। কিন্তু কাজী সাহেব আমাদের এই মাখামাখি সুনজরে দেখতে পারলেন না। প্রথমে তিনি তাঁর কন্যাকে নিষেধ করলেন আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে। কিন্তু তাতেও যখন ফল হলো না, তখন তিনি ঘরে তালা দিয়ে রেখে দিলেন তাকে। আমাকে শাসালেন তিনি, ফের যদি তাঁর দরজা মাড়াই, মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবেন আমার। সেই থেকে আমার ভালবাসাকে আর আমি দেখিনি। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তার অদর্শনে। একমাত্র তোমার দ্বারাই আবার তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটতে পারে সর্দারজী। সেই কারণে আজ আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো আমার। মেয়েটা বলে কী? সেও একটা মেয়ে, কাজীর মেয়েও একটা মেয়ে। মেয়েতে মেয়েতে এ কি রকম মহব্বত? না—তবে কি এ মেয়ে আসলে কোনও মেয়ে নয়—ছেলে?

অস্থির এক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম, কিন্তু আমি তো তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না সুন্দরী, কী বলতে চাইছো তুমি? ভাল

করে বুঝিয়ে বল তো। একটা মুরগী কি আর একটা মুরগীর পিছনে ছোটে কখনও ?

ধৈর্য ধর, মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলে, সব খোলসা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তুমি একটা হাঁদা, ভালবাসার এমন গূঢ় রহস্যের খোঁজ রাখ না কিছু! অবশ্য তোমাকে কি দোষ দেব, ক'জনই বা রাখে ?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাইত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এরপর আমাকে মোটামুটি প্রকৃত ব্যাপারটা খুলে বললো সে।

—আশা করি আর বেশি খুঁটিনাটি না শুনলেও আমাদের দুজনের সম্পর্কটা অনুমান করতে পারছো ? এবার বল, কী ভাবে আমি তাকে পেতে পারি, এবং এ ব্যাপারে তুমিই বা আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পার ? তবে মনে রেখ, উপকারের প্রতিদান দিতে আমি কার্পণ্য করি না।

আমি মনে মনে পুলকিত হলাম ; ওঃ কি তোফা! দুজনের যাকে পছন্দ তাকে আমি অঙ্কশায়িনী করবো। দুনিয়াতে অনেক রকম মাগীর দালালীর কাহিনী শুনেছি, কিন্তু এমন এমন অদ্ভুত দালালী এবং তার ইনামের কথা কি কেউ ভাবতেও পেরেছে ?

বলতে কি, এর জন্যে নির্দিষ্ট কোনও আইনের বিধান নাই। সুতরাং ভয় কি, এগোনো যাক। গলা খাঁকারী দিয়ে আমি বললাম ওকে, মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। যাই হোক, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করছি। জানি না কতটা সফল হতে পারবো।

মেয়েটি কাকুতি মিনতি জানাতে থাকলো, শুধু একবারের তরে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দাও, তারপর আর তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমরাই ঠিক করে নেব।

ঠিক আছে, সুন্দরী, তাই হবে। তবে একটা কথা, কাজীর বাড়িতেই কাজীর মেয়ে থাকবে। আমি আমার দপ্তরেই বসে থাকবো—তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দেব।

—বহুৎ আচ্ছা সর্দারজী। কিন্তু আমার মাথায় একটা ফিকির এসেছে, তুমি মন দিয়ে শোন, তারপর বল কোনও ফাঁক আছে কিনা।

এরপর মেয়েটি তার মতলবের কথা আমাকে শোনালো ঃ আজ সন্ধ্যায় আমি খুব ঝলমলে সাজে সেজেগুজে কাজীর বাড়ির পাশের রোয়াকটায় বসে থাকবো। তুমি যাবে তোমার সিপাই-সান্ত্রী সঙ্গে নিয়ে। আমার পোশাকে আতরের উগ্র গন্ধ থাকবে। তার ফলে অতি সহজেই আমার অবস্থিতি বুঝতে পারবে তুমি। তারপর আমার কাছে এসে বলবে, কে তুমি ? এত রাতে এখানে কেন ?

আমি অসহায় ভাব দেখিয়ে বলবো, আমার বাবা সুলতানের এক আমির। বাজারে কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছিলাম, তাই ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের প্রাসাদের সদর ফটকে তালা পড়ে গিয়েছে। আজ রাতের মতো সে প্রাসাদে আর ঢুকবার কোনও উপায় নাই। তাই হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি। ভাবলাম, যদি কোনও চেনা আপনজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পথে। কিন্তু নসীব খারাপ, তেমন কারুরই সাক্ষাৎ পেলাম না। তাই কাজীর বাড়ীর সামনে এসে বসে আছি। এ জায়গাটায় বোধহয় চোর ডাকাতরা আসতে সাহস করবে না।

তখন তুমি বলবে, তোমার ভুল ধারণা মেয়ে। চোর ডাকাতরা এইসব জায়গাতেই বেশি ঘোরাফেরা করে। এই রাতে তোমাকে এমনভাবে রাস্তায় রেখে তো যেতে পারি না আমি।

তখন আমি বলবো, 'তাহলে আমাকে আপনার কোতোয়ালীতে নিয়ে চলুন, অথবা আপনার বাড়িতে, রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাল সকালে ঘরে ফিরে যাবো।

তাতে তুমি বলবে, সে হয় না, রাতের বেলা কোতোয়ালী চোর বদমাশে ভরে যায়, সেখানে তোমার মতো সুন্দরী অভিজাত মেয়ের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এবং তা যদি হয়, তুমি আমির-কন্যা—আমার চাকরী যাবে। তার চেয়ে বরং এই কাজী সাহেবকে বলে কয়ে এ'র বাড়িতেই রাতটা কাটাবার চেষ্টা দেখছি।

তুমি যদি কাজী সাহেবকে আমার বিপদের কথা বুঝিয়ে বল, তিনি না করতে পারবেন না। আর একবার তাঁর হারেমে ঢুকতে পারলে আমি কাজ হাসিল করে নেব।

মেয়েটির বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে। যথাসময়ে আমি কাজীর বাড়ীর সামনে দলবল নিয়ে হাজির হবো।

সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ রাত হয়ে গেল। আমি আমার সিপাইদের নিয়ে শহরে টহল দিতে বেরুলাম।

চলতে চলতে এক সময় কাজী-বাড়ির সামনে এসে দেখলাম একটি দামী রেশমী বোরখা পরা মেয়ে রোয়াকের একপাশে বসে আছে। চিনতে অসুবিধা হলো না, এই-ই সেই মেয়ে। কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি বাছা, এত রাতে এখানে কেন?

মেয়েটি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে জবাব দিল, আমার বাবা এখানকার সুলতানের আমির। কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারে বেরিয়েছিলাম। ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রাসাদের সামনে গিয়ে দেখি সদরে তালা পড়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। তালা যখন একবার পড়েছে শত চেষ্টা করেও আজ রাতে সে তালা কেউ খোলাতে পারবে না। পথে অন্য কোন চেনালোকের সঙ্গেও দেখা হলো না যে, তাদের বাড়িতে গিয়ে রাতটা কাটাই, তাই এখানে এসে বসে আছি।

আমি বললাম, কিন্তু এ শহর চোর বদমাশদের আড্ডা—বিশেষ করে রাতের

বেলায়। তোমার গায়ে তো অনেক মূল্যবান গহনা দেখছি। ওরা একবার সন্ধান পেলে তোমাকে তো রেয়াত করবে না বাছা।

—তা হলে আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন আমাকে আজকের রাতের মতো। কাল সকালে উঠে চলে যাবো ?

আমি আঁৎকে উঠলাম, ওরে ব্যস, তোমার মতো রূপসী মেয়েকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে আমাকে ঝাঁটাপেটা করবে যে।

—তা হলে আপনার কোতোয়ালীতেই নিয়ে চলুন আমাকে।

—না তাও হয় না। রাতের বেলায় ও জায়গাটা মাতাল আর চোর ডাকাতে ভরে যায়। ওখানে তোমার ইজ্জত রাখতে পারবো না।

মেয়েটি হতাশ হয়ে করুণ চোখে আমার দিকে তাকালো—তা হলে ?

আমি বললাম, দাঁড়াও দেখছি, কি করা যায়। কাজী সাহেবকে একবার বলে দেখি, তিনি যদি রাজি হয়ে যান, তা হলে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারবে তুমি।

কাজী সাহেব অতি সদাশয় মানুষ। সমস্ত শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, যাও মা, অন্দরে যাও। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমার মেয়ে আছে, তার সঙ্গে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

মেয়েটি কাজীর হারেমে প্রবেশ করলো। আমি ফিরে গেলাম আমার কাজে।

পরদিন সকালে পায়ে পায়ে কাজীর বাড়িতে এসে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য মেয়েটির খবরাখবর নেওয়া। আমাকে দেখেই কাজী সাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, সব তোমার দোষ, তোমার জন্যেই এই সর্বনাশটা আমার ঘটলো। একটা চোরকে আমার ঘরে ঢুকিয়ে গিয়েছিলে তুমি! সে আমার যথা-সর্বস্ব ফাঁক করে নিয়ে গেছে।

—বলেন কী, চুরি করে পালিয়েছে, কত টাকা ?

কাজী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুরি করে পালিয়েছে ? আহা নেকা, কিছুই যেন জান না ? দাঁড়াও, তোমায় আমি মজাটা দেখাচ্ছি। এখুনি সুলতানের কাছে তোমার নামে নালিশ ঠুকে দেব আমি। ওহো, হো, দশটি হাজার দিনার নিয়ে সে চম্পট দিয়েছে।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এমনভাবে একটা মেয়ে আমাকে ধোঁকা দিতে পারে ভাবতেও পারিনি।

কাজীকে বিনীতভাবে বললাম, যা ঘটার তা ঘটবে বলেই ঘটে গেছে। যাই হোক, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে পার পাবে না।

কাজী বললেন, ওসব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না। সুলতানের কাছে মামলা করবো তোমার নামে। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা! তোমার গর্দান যাবে।

আমি করজোড়ে বললাম, মেহেরবানী করে আমাকে তিনদিনের সময় দিন হুজুর। তার মধ্যে মুলজিমকে হাজির করবো আমি।

কাজী মৌন হয়ে ভাবলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তিন

দিনের সময় দিলাম তোমাকে। কিন্তু ঐ তিনদিনই। তারপর তিন পলকও দেরি করবো না। সুলতানকে জানিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।

ঘরে ফিরে এসে মহা ভাবনায় পড়লাম। এত বড় শহরে কোথায় খুঁজে পাব তাকে? সে যদি পুরুষ-মানুষ হতো তা হলে না হয় কথা ছিল, একটা বজ্জাত মেয়েমানুষকে খুঁজে বের করবো কি করে? আইনের কোন বিধান নাই কোনও সিপাই-সান্ত্রী কারো হারেমে তল্লাশি চালাতে পারে। সুতরাং এ তো অকুল দরিয়া সামনে।

পথে ঘাটে বৃথা খোঁজাখুঁজি করে কোনও ফয়দা হবে না নিশ্চিত জেনে ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম তিনদিন। ভাবলাম মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু কি করা যাবে। নিজের বোকামীর কুফল তো নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। আর ঘরে বসে থেকে বা পালিয়ে বেড়িয়ে কোনও লাভ নাই। তাতে আরও খারাপ হবে আখেরে। তাই কাজির বাড়ির দিকে রওনা হলাম। মনে মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, কাজীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে দেখবো, তিনি যদি নিজগুণে এ যাত্রা আমাকে মার্জনা করে দেন তবে প্রাণটা রক্ষা পাবে।

কাজী সাহেবের বাড়িতে ঢুকতে যাবো এমন সময় নারীকণ্ঠের ডাকে পিছন ফিরে তাকালাম।

তাজ্জব ব্যাপার! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। যাকে আমি একান্তভাবে চাইছিলাম সেই মেয়ে নিজেই এসে হাজির হয়েছে আমার সামনে?

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। যাক, প্রাণদণ্ডটা আর হবে না এ যাত্রা। আসামীকে আল্লাহর আশীর্বাদে বিনা চেষ্টায় কব্জায় পেয়ে গেছি। এবার তাকে কাজীর হাতে তুলে দিলেই আমি দায়মুক্ত হয়ে যাবো।

আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব মোলায়েম সুরে বললাম, তোমার কি কাণ্ড বলতো, সকালবেলায় আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে তো? তা না, কাজ হাসিল করেই একেবারে কেটে পড়লে? আমি তোমাকে তামাম শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর তুমি দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছ? তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ তোমার জন্যে আমাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হতো?

মেয়েটি একেবারে আমার মুখোমুখি এসে তো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বেশ অনুভব করতে পারলাম, ওর ভুঁড়িটা আমার ভুঁড়ির সঙ্গে লেপটে গেছে। মুখে ওর দুর্বোধ্য দুষ্টুমীর হাসি। ভুরু নাচিয়ে বললো, কাপ্তেন সাহেবের ভয় লেগেছে বুঝি? যাই হোক ওসব কেচ্ছা আর শুনিয়ে লাভ নাই, সবই আমি জানি। আমাকে সশরীরে ধরে কাজীর সামনে হাজির করার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, এবার তোমার ফাঁসী অবধারিত। কেউ তা রদ করতে পারতো না, কিন্তু আমি এখনও পারি, মুইন সাহেব।

আমি ওকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। সত্যিই তো ও যদি নিজে থেকে

এসে আমার হাতে ধরা না দিত তবে সারা জীবন ধরে তল্লাশ করেও তো ধরতে পারতাম না আমি। আমি ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন এ'কে দিয়ে বললাম, তোমার মতো এমন অপূর্ব মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

—আহা অমন উতলা হচ্ছো কেন! আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না! আমি তো কথা দিচ্ছি, কোনও অনিষ্ট তোমার হবে না। ছাড়, হাত ছাড়, চল আমার সংগে চল।

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চললাম। অনতি দূরে একটি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো সে। আমিও ঢুকলাম।

একটি সুসজ্জিত কক্ষ। এক ধারে পাশাপাশি দুটি সিন্দুক। দুটিরই ডালা খুলে ফেললো সে। আমি তো দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ও বললো, কী দেখছো মুইন কাপ্তেন? এই সব এক একটা হীরে জহরতের গয়নার দাম কত জান? ছয় হাজার নয়, ছত্রিশ হাজারের বেশি। তা আমার এই সিন্দুক দুটোয় কত টাকার হীরে জহরত আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে?

আমি আমতা আমতা করে বলি, কী করে বলবো? এ সব জিনিষ তো চোখে দেখিনি কখনও, দাম আন্দাজ করবো কী করে?

মেয়েটি বললো, এর মধ্যে যা দেখছো, ফেলে ছড়িয়েও এর দাম পাঁচ লাখ দিনার হতে পারবে। আর জান, এগুলোর মালিক কিন্তু আমি একা। কোনও ভাগীদার নাই। তা হলে এবার তোমার প্রত্যয় হচ্ছে কি কাজীর ঐ তুচ্ছ ছয় হাজার টাকার তোড়া চুরি করার জন্য আমি যাইনি সেখানে?

আমি কোনও রকমে বলতে পারি, তা তো বটেই, তা তো বটেই। এত যার ধন-দৌলত, সে কেন সামান্য ছয় হাজার দিনারের তোড়া চুরি করবে?

—কাজী যাই ভাবুক, তুমি তো জান কাপ্তেন, কেন আমি তার বাসায় সে রাত কাটিয়েছিলাম?

—বিলক্ষণ জানি? কিন্তু কাজী সাহেবের টাকার তোড়াটা গেল কোথায়?

—অবশ্যই আমি সংগে করে এনেছি। কেন এনেছি তারও কারণ আছে। তবে এটা তো ঠিক চুরি করার জন্য আনিনি। তাহলে শোনও আমার ফিকির।

ঐ টাকাটা চুরি না করে আনলে আমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। সে রাতের ব্যাপার সেখানেই ইতি হয়ে যেত। কিন্তু আমি তো তা চাইনি। আমার ভালবাসাকে আমি চিরকালের করে পেতে চাই। এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই ফন্দী আঁটতে হয়েছিল আমাকে।

আমি বুঝতে না পেরে বললাম, কিন্তু এতে তো ব্যাপারটা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে!

—জট ভালভাবে না পাকালে তা কি ছাড়বার প্রয়োজন হয়? ওসব থাক, এবার আমার মতলব শোন:

এখান থেকে সোজা তুমি কাজীর কাছে যাও।

আমি শিউরে উঠলাম, একা?

ও হেসে বললো, হ্যাঁ একা, ভয় নাই আমি পালিয়ে যাবো না। আর কাজীও

তোমাকে শূলে চাপাতে পারবে না।

কাজীর সামনে দাঁড়ালেই ক্রোধে সে ফেটে পড়বে। লোকটা ভীষণ কঞ্জুস। অতগুলো টাকা খোয়া গেছে, সে শোক সে ভুলতে পারছে না। তোমাকে বলবে, কোথায় সে আসামী? কোথায় আমার তোড়া? জানি তুমি আনতে পারবে না। তবে এবার তোমার রক্ষা নাই। এখনি আমি সুলতানের কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে।

তখন তুমি তার অনেক মহত্ত্বের গুণগান করে বলবে, আমি সারা শহর তোলপাড় করেছি আপনার তোড়াশুদ্ধ আসামীকে গেপ্তার করতে। কিন্তু না কোথাও সে নাই। আমি নারী-গুপ্তচরকে পাঠিয়ে অনুসন্ধান করেছি শহরের সব বাড়ির অন্দরমহল। না সে কোথাও নাই। অবশেষে এই সন্দেহই আমার মনে মাথা চাড়া দিয়েছে। ওই মেয়েটি আপনার গৃহেরই কোনও গোপন স্থানে অবস্থান করছে। আপনিই ভেবে দেখুন হুজুর, আপনার গৃহের যা সুরক্ষা তাতে এখান থেকে কোনও মানুষ চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সক্ষম হবে না। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি আমার দলবল দিয়ে আপনার বাড়িটা একবার তল্লাশ করে দেখি।

তোমার কথা শুনে কাজি সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, কী এত বড় কথা! আমি ন্যায়-বিচারের প্রতিমূর্তি, আমাকে তুমি সন্দেহ করছো?

তখন তুমি আরও বেশি বিনীত ভাব দেখিয়ে বলবে, আমায় সর্বদা মার্জনা করবেন, হুজুর। কিন্তু আমি কর্তব্যের দাস মাত্র। খানা-তল্লাশি আমাকে করতেই হবে। আমি বলছি না, আপনি জেনে-শুনে কিছু গোপন করতে চাইছেন আমার কাছে। এমন তো হতে পারে, এর মধ্যে আপনার গৃহের অন্য ব্যক্তির কারসাজি আছে।

কাজি সাহেব চিৎকার করে উঠবেন, বলবেন, বেশ কর, তল্লাশি। কিন্তু ইয়াদ রেখো, আমার বাড়িতে যদি কিছু না পাওয়া যায় আরও গুরুতর সাজা পাবে তুমি।

তুমি বলবে, আমি জানি হুজুর, মৃত্যুই আমার একমাত্র দণ্ড। তার অধিক আর কী সাজা হতে পারে?

তখন তুমি সিপাইদের নিয়ে কাজির ঘরদোর তল্লাশ করতে করতে কিছু না পেয়ে অবশেষে রসুইঘরে পৌঁছবে। সবশেষে তুরুপের তাসটা ওল্টাবে। ঐ ঘরে একটা বিরাট জালা বসানো আছে। আগে তেল রাখা হতো, এখন খালিই পড়ে থাকে। ওটার মধ্যে হাত দিয়ে তুমি কতকগুলো সাজ-পোশাক টেনে তুলবে। দেখবে ওগুলো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। ভয় নাই, কোনও নরহত্যা নয়। একটা কুকুর কেটে তার রক্তে মাখিয়ে একটা মোড়কে ভরে সে দিন আমি কাজীর গৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজী সাহেবের মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। কারণ তাকে বলা হয়েছিল, আমি কেনাকাটা করতে বাজারে বেরিয়েছিলাম। তারপর আর বাড়ি ঢুকতে পারিনি।

এই সময় আমি বললাম, কিন্তু আমিও তো বুঝতে পারিনি, ঐ মোড়কে

তুমি খুন মাখানো কাপড়-চোপড় মুড়ে নিয়ে এসেছিলে ?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বললো, তোমরা মাথা মোটা সেপাই। বরকন্দাজ মানুষ, এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলে কোৎকা ঘুরিয়ে বেড়াও ? যাক ওসব, এবার আমার মোক্ষম প্যাঁচের কথাগুলো মন দিয়ে শোন।

ঐ রক্তমাখা শেমিজ, কাঁচুলি, ইজের, বোরখা প্রভৃতি দেখে বুঝতে অসুবিধা হবে না, সেগুলো কোনও নারীর।

এরপরে কাজির আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। হয়তো সে অজ্ঞান হয়েও অক্কা পেতে পারে। লোকটা যদি তখুনি মারা যায় তাহলে তো পোয়াবার। আর যদি না মরে তবে তুমি বলবে, আপনি সাক্ষাৎ ন্যায়মূর্তি আর আপনার ঘরে এই কাণ্ড। এসব দেখলে সুলতান কী করবেন, আপনার কী হবে সে আমি জানি না, হুজুর। কিন্তু আমার কর্তব্য তো আমাকে করতেই হবে।

এরপর দেখবে কি হয় ? একটু আগে তোমার প্রাণ যায় যায় হয়েছিল, এবার তার প্রাণ তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তুমি যদি কঞ্জুস কাজি সাহেবের সমস্ত সঞ্চিত সম্পদও দাবী কর তাও সে দিতে বাধ্য হবে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে শুধু বলতে পারলাম, সা-বা-স !

আমাকে দেখেই কাজি সাহেব গর্জে উঠলেন, হুম্, তাহলে খালি হাতে এসেছ দেখছি। কোথায় সে আসামী ? আর কোথায়ই বা আমার ছয় হাজার দিনারের তোড়া ?

কাজী সাহেবের তড়পানীতে মুহূর্তের জন্য আমি ভড়কে গেলাম। মুখে কোনও কথা সরলো না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, সারা কাইরো শহর আমি তোলপাড় করে ফেলেছি হুজুর। মেয়েছেলে গুপ্তচর পাঠিয়েছি প্রত্যেক বাড়ির হারেমে। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমার চৌকস সিপাই-বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে থাকবে এমন আসামী তো জীবনে দেখিনি ? তবে সে গেল কোথায় ?

কাজী বললো, ওসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলবো না মুইন। যে-কোনও কারণেই হোক, তুমি যখন তাকে বামাল শুদ্ধ হাজির করতে পারলে না, তখন তার ফল তোমাকে পেতেই হবে। ফাঁসীর দড়ি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বললাম, মরতে আমি ভয় পাই না হুজুর। তবে তদন্ত আমাকে শেষ করতে দিন আগে।

—তদন্ত ? কাজি প্রশ্ন করে, আবার কিসের তদন্ত ?

—আমার গুস্তাকী মাফ করবেন হুজুর, আমার সন্দেহ হচ্ছে মুলজিম আপনার গৃহেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

কাজি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, কী ? এত বড় কথা ? আমি সুলতানের কাজী, ন্যায় বিচার আমার ধর্মকর্ম, আর কিনা তুমি বলতে চাইছো, আমি তাকে

বাড়িতে লুকিয়ে রেখে তোমার ঘাড়ে মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়েছি?

আমি জিভ কেটে বললাম, না, হুজুর অতবড় স্পর্ধা আমার হতে পারে না। আমার সন্দেহ, আপনার গৃহের অন্য কোনও ব্যক্তি আপনাকে চুপিয়ে মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। আমাকে একবার তল্লাশি করতে অনুমতি দিন আপনি।

কাজি বললেন, এভাবে আর কতটুকু কালক্ষয় করতে পারবে কাপ্তেন? বেশ, কর তল্লাশি। কিন্তু মনে রেখ, আমার বাড়িতে যদি কিছু না পাওয়া যায়, তবে তোমার সাজা আরও কঠিন হবে।

আমি হেসে বললাম, মৃত্যুর বড় সাজা আর কী হতে পারে হুজুর। আমি তার জন্যে মাথা বাড়িয়েই বসে আছি। কিন্তু তাই বলে তো কর্তব্যে অবহেলা করতে পারি না।

এই বলে সিপাইদের সংগে নিয়ে কাজির বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়লাম আমি।

বাড়ির প্রতিটি ঘর তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না।

কাজি সাহেব ক্রমশঃই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হতে থাকলেন। অবশেষে রসুইঘরে এসে দাঁড়ালাম আমরা। আমার সিপাইরা হাঁড়ি পাতিল উল্টে পাল্টে দেখতে থাকলো। আমি কিন্তু তখন বড় জালাটার মধ্যে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছি। কাজি সাহেব বিদ্রূপ করে বললেন, আরে হাত ঢুকিয়েই দেখ না, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন! ওটা আজ কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে আছে এঘরে। সেই থেকে ওটা ইঁদুর আরশোলাদের দুর্গ হয়ে উঠেছে।

আমি সত্যিসত্যিই হাত ঢুকিয়ে টেনে তুললাম এক পোঁটলা রক্তমাখা সাজ-পোশাক। সায়া, শেমিজ, কাঁচুলি, ইজের, বোরখা ইত্যাদি। অর্থাৎ যা যা একটি মেয়ের অংগে থাকতে পারে সব।

কাজি সাহেব দুহাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর অস্ফুট আওয়াজ তুলে মেঝের ওপর ঢলে পড়লেন।

তাঁকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে গেল আমার সিপাইরা। শুইয়ে দিল পালংকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য ফিরে এল। চোখ মেলেই তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমার একটা কথা রাখবে ভাই?

আমি সবিনয়ে বললাম, আজ্ঞা করুন হুজুর।

—বিশ্বাস কর, প্রকৃত ঘটনা কী আমি জানি না। তবে এভাবে নিজের দোষ-স্খালন করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ খবর যদি একবার বাইরে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে তবে আত্মহত্যা করে মরা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। মরতে আমিও ভয় পাই না ভাই, তবে কি জান, সারাটা জীবন উচ্চ সম্মানের আসনে বসেছিলাম আমি। দেশবাসী আমাকে ন্যায় এবং সুবিচারের প্রতীক বলে মনে করে। তারা তো ভাবতে পারে না, আমার দ্বারা কোনও সামান্যতম

অপরাধও হতে পারে। সেই বিশ্বাস শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি সব নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তার বদলে ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান অসম্মানের জুতোর মালা পরতে হবে গলায়। না, না, সে আমি সইতে পারবো না। তার আগে এ জীবন শেষ করে দেব আমি নিজের হাতে।

আমি আনত মস্তকে বললাম, এক্ষেত্রে আমাকে কী করতে বলেন হুজুর।

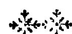
কাজি সাহেব হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন, তুমি আমার ইজ্জত বাঁচাও ভাই। তোমার হাতেই আমার বাঁচা মরা নির্ভর করছে। আমার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে সব তোমাকে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, শুধু তার বদলে এই খবরটা যেন চিরকালের মতো চাপা পড়ে যায়।

আমি বললাম, ঠিক আছে—তাই হবে হুজুর।

এরপর অর্থের শোকেই হোক আর আতঙ্কেই হোক, তিন রাত্রি পর্যন্ত কাজি সাহেব টিকে থাকলেন না।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাকে নিয়ে ঐ মেয়েটি নীলের উপকূলে এক প্রাসাদে গিয়ে উঠেছে।

কাপ্তেন মুইন তার কাহিনী শেষ করলে দ্বিতীয় কাপ্তেন উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, শাহেনশাহ মহানুভব, এরপর আমি আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছি, জাঁহাপনাকেঃ

দ্বিতীয় কাপ্তেন বলতে শুরু করেঃ

জাঁহাপনা, আমার চাচার মেয়ের সঙ্গে আমার শাদীর প্রস্তাব হলো। তাতে সে সম্মতি দিয়েছিল তিনটি শর্তে।

—তোমার সঙ্গে শাদী আমার হতে পারে, কিন্তু সারাটা জীবন তিনটি শর্ত মেনে চলতে হবে তোমাকে?

আমি জানতে চাইলাম, কী শর্ত?

—এক, জীবনে কখনও তুমি চরস খেতে পারবে না। দুই, কখনও তরমুজ ছোঁবে না, আর তিন, কখনও কোনও চেয়ারে বসবে না।

আমি বললাম এ বড় বিদঘুটে শর্ত। যাই হোক, আমি রাজি।

ব্যস, তারপর যথানিয়মে ধুমধাম করে আমাদের দুজনের শাদী হয়ে গেল।

এরপর অনেককাল কেটে গেছে। তার ভালোবাসায় আমার জীবন ভরে উঠেছে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই বিবির ঐ শর্তের কথাগুলো আমাকে হনন করতে থাকে। কেন সে আমাকে চরস আর তরমুজ খেতে বারণ করেছে, এবং কী কারণেই বা চেয়ারে বসতে দিতে চায় না সে?

অনেকবার কথার ছলে তার কাছ থেকে এবং প্রকৃত কারণ—জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, ওসব কথায় তোমার কী দরকার? শর্ত করেছ, শর্ত রাখবে।

এরপর চুপসে যাওয়া ছাড়া আমার আর কি করারই বা থাকে। কিন্তু একদিন আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, ওসব শর্তফর্ত গুলি মারবো আমি।

সেইদিনই দোকানে গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। একটা পাকা দেখে তরমুজ আনিয়ে গোটা তরমুজটা গোগ্রাসে খেয়ে পেটটা জয়ঢাক বানালাম। তারপর দোকানীকে বললাম, এক ছিলিম সাজ তো ভাই।

চরসের গোলাপী নেশাটা বেশ জমে উঠলো। আমার প্রাণটা ফুরফুরে হাওয়ায় ডালিমগাছের ডালে বসে শিস দিয়ে উঠলো বহুকাল পরে।

ঘরে ফিরে আসতেই আজব ব্যাপার ঘটে গেল মুহূর্তে। আমার শাদী করা বিবি বোরখার নাকাব মুখে ঢেকে রাগে ফেটে পড়তে চাইলো।

—তুমি একটা কুত্তার বাচ্চা, যার জবানের ঠিক থাকে না সে আবার মানুষ নাকি! কি দরকার ছিল কসম্ খেয়ে শর্ত করার? শর্ত করে শাদীই যখন করেছিলে আজ তা ভাঙলে কোন্ আক্কেলে? চল, এক্ষুণি কাজির কাছে চল। আমি আর তোমার ঘর করবো না, তালাক চাই।

আমার মেজাজটা তখনও বেশ শরিফ ছিল, বিবিকে শান্ত করার জন্য মিথ্যে করেই বলালাম, কেন বাজে বকছো, বাওবা, আমি তো শর্তের খেলাপ করিনি।

—মিথ্যে কথা, ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো সে, এই তো দেখছি নেশায় বেশ কথা জড়িয়ে আসছে তোমার। আর তরমুজ তুমি যে খেয়েছ তা তোমার কাপড়-চোপড়ে রসের দাগ দেখেই দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। পিছনে নজর করে দেখ, তোমার কুর্তার ঝুলটা কেন কুঁচকে রয়েছে। অমনটা তো চেয়ারে বসলেই হতে পারে!

নেশার ঘোরে তবু আমি স্বীকার করলাম না বিবির অভিযোগ। বললাম, ভুল—সব ভুল ধারণা তোমার।

এবার বিবি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, কী আমি মিথ্যে বলছি? ঠিক আছে চল, কাজির কাছে যাই। এখনি ফয়সলা হয়ে যাবে। মোটকথা তোমার মতো বাজে বেজম্মা লোকের সঙ্গে আমি আর ঘর করবো না।

কাজি সাহেব বিশেষ সদাশয় সুবিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। সব শুনেটুনে তিনি আমার বিবিকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন, স্বামীর ঘর হুট করে ছাড়বো বললেই কি ছাড়া যায়।

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। সমানে সে কাজির সঙ্গে তর্ক করে যেতে লাগলো। তার এক কথা, কেন আমি আমার কথার খেলাপ করেছি।

অবশেষে আমার বিবি কাজিকে বললো, আপনি যদি আমার তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন তবে আপনার উপদেশ আমি মেনে নিতে পারি।

কাজি সাহেব বললেন, বেশ বল, কী তোমার প্রশ্ন ?

আমার বিবি বললেন, প্রথমে থাকে হাড়ের মতো দড়, পরে হয় শক্ত পেশী তারপর একেবারেই থলথলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। কেন ? এবং কি কারণে ?

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। কাজি সাহেব তো মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তেও কোনও জবাব দিতে পারলেন না তখন। বললেন, সারাদিনে অনেক জটিল মামলা চালিয়েছি। এখন তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না, ভাল মানুষের মেয়ে। তবে কাল সকালে আদালত বসার পরেও এর জবাব তুমি পেয়ে যাবে।

সেদিনের মতো আদালতের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে গেলেন কাজি। প্রশ্ন তিনটি নিয়ে সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করতে থাকলেন মনে মনে। কিন্তু কিছুতেই সুরাহা করতে পারলেন না।

খেতে বসে ভাল করে খেতেও পারলেন না তিনি। কাজির কিশোরী কন্যা বাবার চিন্তান্বিত মুখ দেখে কাছে এগিয়ে এসে বললো, তোমাকে আজ ভীষণ চিন্তিত দেখছি, আব্বাজান! কী হয়েছে ?

মেয়েকে আদর করে কাজি সাহেব বললেন, সে বড় কঠিন প্রশ্ন মা, কিছুতেই উত্তর খুজে পাচ্ছি না।

—কী প্রশ্ন আব্বাজান, বলই না আমাকে। দেখি তার জবাব দেওয়া যায় কিনা।

তখন কাজি সাহেব আগাগোড়া সমস্ত খুলে বললেন মেয়ের কাছে। মেয়ে সব শুনে হাসতে হাসতে বললো, এইজন্য তুমি এত দুর্ভাবনা করছো ? এতো পানির মতো পরিষ্কার। পুরুষদের পনের থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষাঙ্গ হাড়ের মতো কঠিন থাকে। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীর্যের তেজে ভাটা আসতে থাকে। পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট অবধি আর হাড়ের মতো শক্ত হতে পারে না, মাংসপেশীর মতো মনে হয়। এবং ষাটের পর একেবারেই থলথলে মাংসপিণ্ড হয়ে যায়।

ঐটুকু মেয়ের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যান কাজি।

পরদিন আদালতে এসে আমার বিবির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন কাজী সাহেব।

কাজি সাহেবের জবাবে তুষ্ট হয়ে আমার বিবিজান সে যাত্রা আমার গুনাহ মাফ করে দিয়ে ঘরে টেনে নিয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয় কাপ্তেনের কাহিনী শেষ হলো। এবার অন্য এক কাপ্তেনের পালা।

তৃতীয় কাপ্তেন বলতে শুরু করেঃ

তা হলে শুনুন জাঁহাপনা, গল্পটা আমার মা-র কাছে শোনা।

এক সময় এক লবণ হ্রদের তীরে এক ধীবর-দম্পতি বাস করতো। মোটা-মুটিভাবে তাদের কোনও অভাব ছিল না। স্বামী রোজ সকালে জাল চুপড়ি নিয়ে হ্রদের তীরে মাছ ধরতে যায়। সারাদিনে সে বেশি মাছ ধরার চেষ্টা করে না। যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি কিছুতেই না। ওতে ওদের বেশ ভালভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অসময়ের জন্য সঞ্চয় হচ্ছিল না কিছু। অবশ্য তা ওরা চায়ও না কখনও।

একদিন জেলের অসুখ হলো। জেলেনী বললো, ঘরে খানাপিনা বাড়ন্ত। মাছ না ধরলে তো খাবার জুটবে না গো!

জেলে বলে, কিন্তু আমি সেরে না উঠলে মাছ কী করে ধরবো?

জেলে-বৌ বললো, এক কাজ কর, আমি জাল আর চুপড়ি মাথায় নিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে হ্রদের ধারে চল তো। শুধু জাল ফেলার প্যাঁচটা আমাকে হাতে ধরে দু'একবার শিখিয়ে দেবে, দেখবে আমিই মাছ ধরতে পারবো।

জেলে বললো, ধ্যুৎ তাও কি হয়? তাছাড়া তোমার মতো রূপসী মেয়ে ঘাটে গিয়ে জাল ফেললে হাজার লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়বে না?

জেলে-বৌ হেসে বলে, ওগো ভয় নাই, ওগো ভয় নাই, তোমার বৌ হাত ছাড়া হয়ে যাবে না। তা এক কাজ করা যাক, ঐ যে সুলতানঘাট—যার পাশে সুলতানের প্রাসাদ গো, চল ঐ ঘাটে যাই। ওখানে উট্‌কো লোকের ঝামেলা নাই। কেউ নজর দেবে না তোমার সুন্দরী বিবির দিকে।

সুলতান জানলার পাশে বসে হ্রদের মনোহর শোভা দেখছিল। হঠাৎ তার নজর পড়লো জেলে-বৌয়ের দিকে। আহা, কী খাসা রূপ! এমন মেয়ে জেলের ঘরে শুকিয়ে মরছে!

জেলে-বৌয়ের জ্বলন্ত যৌবনের লেলিহান শিখা সুলতানের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিজেকে আর কিছুতেই সংযত রাখতে পারে না সে। উজিরকে ডেকে বলে, দেখ উজির, ঐ জেলেটার বিবির কি রূপ আর যৌবন! আমি তো কিছুতেই আর ঠিক থাকতে পারছি না। জেলেটাকে খুন করে মেয়েটাকে এক্ষুণি আমার সামনে হাজির কর।

উজির বিচক্ষণ ব্যক্তি, একটু ভেবে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, সে কাজটা কি ভাল হবে, ধর্মাবতার? আপনি ন্যায়ধর্মের ধ্বজা ধরে প্রজা পালন করছেন। বিনা অপরাধে একটা লোককে খুন করলে প্রজাদের মনে বিষক্রিয়া ঘটবে না? তারা ভাবতে পারে এ রাজ্যে জীবনে বেঁচে থাকার কোনও স্থিরতা নাই। সুলতানের খেয়ালে যে-কোনও মানুষের যে-কোনও সময় জান চলে

যেতে পারে। আপনার সম্পর্কে তারা একবার অনাস্থার কথা চিন্তা করলে দেশের শান্তি বজায় রাখা শক্ত হবে।

সুলতান বললো, তুমি যথার্থই বলেছ উজির। বিনা দোষে কাউকে প্রাণদণ্ড দিলে প্রজাদের মনে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। কিন্তু ঐ জেলে-বৌটাকে যে আমার চাই-ই। ওকে দেখা মাত্র আমার রক্তে তুফান শুরু হয়ে গেছে।

উজির বললো, সে আর এমন বেশি কি কথা জাঁহাপনা! আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, সে পথ আমার জানা আছে ঢের।

তখুনি উজির সিপাই পাঠিয়ে দিল জেলের কাছে, যাও লোকটাকে এখানে হাজির কর।

দুরু দুরু কম্পিত বুকে জেলে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়ালে উজির বললো, তোমাকে তিনদিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এই তিনদিনের মধ্যে ওই দরবারের মেঝেটা একখানা মাত্র গালিচা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে তোমাকে। কোনও রকম জোড়াতালি দেওয়া চলবে না। তা যদি না পার তোমার গর্দান যাবে। এই সুলতানের হুকুম।

জেলে বিনীতভাবে বলে, আমি জেলের পো, মাছ ধরে খাই। মাছের ব্যাপারে আদেশ করুন, আমি সাধ্যমতো তামিল করবো। কিন্তু তাঁতীর কাজ আমার দ্বারা হবে কী করে? আস্ত একখানা গালিচা চোখেই দেখিনি জীবন ভোর। তা আবার বানাবো আমি! এ অসম্ভব কাজ আমার ঘাড়ে চাপাবেন না হুজুর।

উজির ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ কর, মেলা বকো না। যা হুকুম হয়েছে তা তোমাকে করতে হবে। সে কাজ তুমি জান কি জান না, সে সব আমার জানার দরকার নাই। এই ধর চুক্তিনামা, টিপসই দাও একটা।

—জী টিপসই চান, একটা কেন হাজারটা দিচ্ছি কিন্তু ঐ গালিচা-ফালিচা বানানো আমার কর্ম নয়।

উজির বললো, তোমার এসব ফালতু কথা শোনার সময় নাই আমার। ধর টিপ ছাপ দাও এখানে।

দলিলে টিপসই দিয়ে ঘরে ফিরে এল জেলে। স্বামীকে বিষণ্ণ দেখে কাছে এগিয়ে এসে বৌটা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো গো, সুলতান কেন তলব করেছিলেন তোমাকে?

জেলে বললো, কী করি বলতো বিবিজান? আমি জেলের ছেলে, মাছ বই অন্য কিছু জানি না। আমাকে বানিয়ে দিতে হবে একখানা এমন গালিচা যা দিয়ে আগাগোড়া সুলতানের দরবারের মেঝে মোড়া হয়ে যাবে। জোড়াতালি চলবে না; ছোটবড় হলে হবে না; একেবারে মাপে মাপে চাই। না না, বিবিজান এ অসম্ভব কাজ তো আর আমাদের দ্বারা হবে না। সুতরাং নির্ঘাৎ আমার গর্দান যাবে। চল, আর দেরি না করে আজ রাতেই আমরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে অন্য কোনও দেশে চলে যাই।

জেলে-বৌ স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললো, এই সামান্য কাজের ভয়ে তুমি দেশত্যাগী হবে? কোনও ভয় ভাবনার কারণ নাই। তুমি খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে, যা করার যথাসময়ে করে আমি সামাল দেব।

জেলের পো বলে, কিন্তু এই অসম্ভব কাজ তুমি করবে কি করে?

বৌটা বলে, আমাদের বাড়ির পিছনে যে বুড়ো বটগাছটা আছে, তার নিচে দাঁড়িয়ে আর্জি জানাবে, 'ও বটবৃক্ষ, তোমার বন্ধু আজ বিশেষ বিপদে পড়েছে। সুলতানের হুকুম হয়েছে তার দরবার-মহলটা একটা মাত্র গালিচায় ঢেকে দিতে হবে। তুমি ছাড়া এ কাজ তো উদ্ধার হবে না, বৃক্ষ বাবা!' তখন দেখবে সে তোমাকে একটা সুতোর গুলি দেবে। সেই গুলিটা জেবে ভরে তুমি উজিরের কাছে গিয়ে বলবে, আমাকে একটা লোহার গজাল দিন। গজালটা তুমি ঘরের চারপাশে ঘোরাতে থাকবে। ব্যস আর কিছু করতে হবে না, দেখবে সুন্দর একখানা ঘরজোড়া গালিচা তৈরী হয়ে যাবে।

তিনদিন পরে চারদিনের দিন ভোরবেলায় জেলে ঐ বুড়ো বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ায়। দুহাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়, ওগো বৃক্ষপতি, আজ বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। সুলতানের হুকুম তার দরবারের আগাগোড়া মেঝে একখানা মাত্র গালিচায় ঢেকে দিতে হবে। এই অসম্ভব কাজ করে দিতে না পারলে আমার গর্দান যাবে। তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও বৃক্ষবাবা!

একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল। জেলে তাকিয়ে দেখলো তার পায়ের কাছে এসে পড়েছে একটা সুতোর গুলি।

গুলিটা কামিজের জেবে ভরে সে সুলতানের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। উজির বললো, এই যে জেলের পো, এসেছ দেখছি। তা তোমার চুক্তি কেমন করে রক্ষা করবে? তা না হলে এখুনি তোমার গর্দান যাবে।

জেলে বলে, আমার ওয়াদা আমি পূরণ করবো। তার আগে আমাকে একটা বড় লোহার গজাল এনে দিন।

উজির প্রশ্ন করে, গজাল দিয়ে কি করবে?

—এই সুতোর গুলি দিয়ে আমি গালিচা বুনে দেব এখনই।

উজির সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জাঁহাপনা। এত বড় দরবারের মেঝে ঢাকার জন্য একটা সুতোর গুলি জেবে ভরে এনেছে।

সুলতান বললো, ঠিক আছে, ওকে একটা গজাল এনে দাও, দেখা যাক কী করে।

সংগে সংগে গজাল এসে গেল। জেলে ওটাকে ঘরের একপাশে পুঁতে সুতোর প্রান্তটা বেঁধে দিয়ে গুলিটাকে ঘরের চারপাশে ঘোরাতে থাকলো।

উজির ততক্ষণে জল্লাদকে নির্দেশ দিয়েছেন, খাঁড়া হাতে এসে দাঁড়াতে।

শাণিত অস্ত্র কাঁধে করে ঘাতক এসে দাঁড়ালো দরবারের দ্বারদেশে। উজিরের ইশারা পাওয়া মাত্র সে জেলেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। সেইভাবে সে প্রস্তুত হতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে একখানা ঘরজোড়া সুন্দর গালিচা বানিয়ে ফেললো জেলে। উজিরের মুখ চুন হয়ে গেল। জেলে বললো, দেখুন হুজুর, গালিচাটা পছন্দসই হয়েছে কিনা ?

উজির বললো, তা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। সুলতানের হুকুম। আজ থেকে ঠিক আটদিন বাদে এই দরবারে হাজির হতে হবে তোমাকে। সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে একটি আটদিনের শিশু। সে বাচ্চা অনর্গল গুলতাপ্পির গল্প শোনাতে পারবে সুলতানকে।

জেলে বললো, এমন গাঁজাখুরি কথা শুনেছে নাকি কেউ কখনও, মাত্র আটদিনের কোনও মানব-শিশুর মুখে কথা ফোটে ?

—ওসব অজুহাত শুনতে চাই না আমি। যেমন করে পার সংগ্রহ করে আনতে হবে সেই শিশুকে। এই ধর চুক্তিপত্র, একটা টিপ ছাপ দাও।

জেলে বললো, একটা কেন হাজারটা টিপসই আমি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আটদিন কেন, আমার জিন্দগীভর চেষ্টা করলেও অমন আজব বস্তু আমি জোগাড় করতে পারবো না, হুজুর।

—আঃ, অবাধ্য হয়ো না। ভুলে যেও না এ হুকুম স্বয়ং সুলতানের। যথা-সময়ে তামিল করতে না পারলে তোমার গর্দান যাবে।

প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসে জেলে। উৎকণ্ঠিত হয়ে কাছে আসে, কি গো, গালিচা বুনে দিতে পারলে ?

—না না, সে কাজ অতি চমৎকার ভাবেই হয়ে গেছে। কিন্তু এক নতুন ফরমাস হয়েছে। আটদিনের একটা কচি বাচ্চাকে যোগাড় করতে হবে—যে অনর্গল গুলতাপ্পির গল্প শোনাতে পারবে সুলতানকে। তা-না হলে আমার গর্দান যাবে। এবার আর বাঁচবার কোনই উপায় নাই বিবিজান। চল আমরা দেশত্যাগ করে পালিয়ে যাই আজই রাতে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো একচল্লিশতম রজনী ঃ
আবার সে বলতে থাকে ঃ

জেলে-বৌ বললো, সুলতানের শয়তানীর আর শেষ নাই, দেখছি। নচ্ছারটার নজর পড়েছে আমার দিকে। কোনও একটা ছলছুতোয় তোমাকে মেরে ফেলে আমাকে হারেমে তোলার সাধ হয়েছে মুখপোড়ার। ঠিক আছে, তুমি কোনও চিন্তা করো না, ওর সাধ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি বিশ্রাম করগে, আটদিন বাদে যথাসময়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

নয়দিনের দিন সকালে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে জেলে-বৌ ঐ বটবৃক্ষের নিচে এসে দাঁড়ালো।

—ও বাবা বটবৃক্ষ, তোমার দয়াতে একবার আমার স্বামীর জীবন রক্ষা হয়েছে, সেজন্য তোমাকে শতকোটি সালাম জানাই। কিন্তু আবার এক নতুন বিপদ এসেছে। সুলতান হুকুম করেছে একটা আটদিনের বাচ্চাকে নিয়ে যেতে

হবে তার সামনে। সে বাচ্চা অনর্গল গল্পগপ্প শোনাতে পারবে সুলতানকে। সুলতানের এই অসম্ভব বায়না যদি মেটাতে না পারে তবে আমার স্বামীর গর্দান যাবে। আপনি আমাদের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু, আপনার সাহায্য না পেলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো না।

সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-শোঁ আওয়াজ করে একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। এবং পরক্ষণেই ওরা দেখতে পেল একটা প্রায় সদ্যজাত শিশু ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে পায়ের কাছে।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে ঘরে ফিরে এল ওরা। জেলে হতাশ হয়ে বললো, কিন্তু বিবিজান, এ বাচ্চা তো শুধু কাঁদতেই জানে, কথা বলবে কী করে?

জেলে-বৌ বলে, তোমার কোন ভাবনা নাই গো, দেখো ঠিক সময়ে এর মুখে খৈ ফুটবে!

ছেলেটাকে কোলে করে জেলে সুলতানের দরবারে আসে। উজির বলে, এনেছ? কই দেখি? এই বাচ্চা কথা বলে?

এই বলে সে শিশুটির গাল টিপে দিয়ে বলে, তোমার নাম কি খোকা?

বাচ্চাটা কিন্তু উজিরের প্রশ্নের জবাব দেয় না, শুধু ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে।

উজির বলে, এ তো দেখছি এর মুখে এখনও বোল ফোটেনি, সুলতানকে গল্পগপ্প শোনাবে কী করে এ?

জেলে রাগতভাবে বলে, ও দিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নাই হুজুর, আপনি আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিন।

উজিরের নির্দেশে সেখানে একখানা নরম গদীর বড় ডিভান এনে বসানো হলো। ছেলেটাকে কোলে করে জেলে বসে পড়লো তার ওপর।

সুলতান তখুনি তাঁর পার্শ্বচর আমির ওমরাহ এবং শহরের গণ্যমান্যদের উপস্থিত হতে ফরমান দিলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উপস্থিত হয়ে যে যার যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করে বসলো। সুলতান ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই কি তোমার সেই বাচ্চা, যে আমাকে গল্পগপ্প শোনাবে?

জেলে সবিনয়ে বললো, জী হ্যাঁ, জাঁহাপনা?

সঙ্গে সঙ্গে সারা দরবারমহলে কৌতূহলের স্তব্ধতা নেমে এল। জেলের কোলে বাচ্চা হঠাৎ কথা বলে উঠলো, সুলতান মহানুভব!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সকলে। একটা প্রায় সদ্যজাত শিশু সুলতানকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানালো?

সুলতান বললো, ওহে গুণধর, আমি তোমার কাছে কিছু গুলতাপ্পির গল্প শুনতে বাসনা করি!

সকলে তাজ্জব হয়ে শুনতে লাগলো, ছেলেটি বলছে: কোনও এক সময়ে—তখন সবে আমি প্রথম যৌবনে পা দিয়েছি—একদিন শহরের বাইরে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড দাবদাহে প্রায় দগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মনে বাসনা হলো একটা রসালো তরমুজ উদরস্থ করি।

একটুক্ষণের মধ্যে সংগ্রহও করলাম একটা বেশ বড়সড় গোছের পাকা তরমুজ। দুভাগ করার জন্য ছুরি বসিয়ে দিলাম, কিন্তু জাঁহাপনা কী বলবো, তরমুজটা কেটে দেখি তার মধ্যে একটা গোটা শহর—কত ঘরবাড়ি প্রাসাদ মসজিদ বাগ-বাগিচা—কত মানুষজন তার আর ইয়ত্তা নাই। আমি তো তাজ্জব! এমনটা যে ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। যাই হোক আর কালক্ষেপ না করে তরমুজটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বড় চমৎকার শহর। যতদূরে যাই সুন্দর সুন্দর সব ইমারত, ফুলবাগিচা হাটবাজার—আরো কত কী? একটা বাগানে ঢুকে দেখি গাছে গাছে কত রং-বেরঙের পাকাপাকা ফল। দুচারটা পেড়ে খেলাম। কি মিষ্টি! প্রাণ ভরে গেল। এরপর আমি আবার চলতে থাকি। চলতে চলতে এক সময় শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। চারদিকে সবুজ শস্যের মেলা। একটা চাষীর বাড়ির সামনে তরকারীর চাষ হয়েছে। লাউ কুমড়ো শশা বরবটি নানারকম তরকারি। একটা বরবটি ছিঁড়ে নিয়ে তার বিচি খাব বলে খুললাম। দেখি বরবটিটার মধ্যে চাষীরা লাঙ্গল গরু নিয়ে জমি চাষ করছে। অদ্ভুত লাগলো। বরবটির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মাঠের আল ধরে চলেছি। চলতে চলতে একটা খামারবাড়ি পেলাম। সেখানে দেখি মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানছে, কেউ বা যবের ছাতু বানাচ্ছে চাকী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আবার কিছু লোককে শস্য মাড়াই করতে দেখলাম। আরও একটু এগোতে দেখি একটা লোক ঘরের দাওয়ায় বসে আছাড় দিয়ে দিয়ে ডিম ফাটাচ্ছে। এক একটা করে ডিম আছাড় দিয়ে খানিকক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকছে। আর কী আশ্চর্য, ডিমের ঐ কুসুম থেকে কুঁক কুঁক করে ডাক ছেড়ে এক একটা মোরগ মুরগী বেরিয়ে চোঁচা দৌড় মেরে পালাচ্ছে এদিক ওদিক। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম একটা গাধার পিঠে করে বয়ে চলেছে এক বোঝা ডালের রুটি। লোভ আর সামলাতে পারলাম না। খানকতক তুলে নিয়ে একখানা রুটিতে সবে একটা কামড় বসিয়েছি হঠাৎ দেখলাম আমি তরমুজটার বাইরে বেরিয়ে এসেছি। আমার সামনে গোলগাল অর্থাৎ তরমুজটা যেমন রেখেছিলাম কাটার আগে ঠিক তেমনি আস্তই পড়ে আছে, দেখতে পেলাম। এই হচ্ছে আমার কাহিনী, জাঁহাপনা।

সুলতান হাসি আর চাপতে পারে না; হো হো হো করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হ্যাঁ বাবা, গল্পেরও একটা সীমা থাকা দরকার। এ যে দেখছি গল্পের বাদশা। আচ্ছা, হে গুণধর গল্পবাজ! তুমি যে বললে ডিম আছাড় দিতে মোরগ মুরগী ডাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো, একি কোন যুক্তির কথা হলো?

বাচ্চাটা বললো, গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা! আজকালকার জগতে যুক্তিবহ কিছুই চলে না। মিথ্যা, জালিয়াত, প্রবঞ্চনা, অসম্ভব এবং অবাস্তবতার দাপটেই নিরীহ শান্ত সৎ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে আজ! আপনি নিজেকে দিয়েই এর বিচার করুন জাঁহাপনা। আপনার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এই নিরপরাধ নিরীহ জেলের-পো-কে আপনি অসম্ভব অবাস্তব

কাজের বায়না চাপিয়েছেন। না পারলে তার গর্দান নেবেন আপনি। এটা কি কোন ন্যায়সংগত যুক্তির কথা? আসলে আপনার উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারে জেলের-পোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে তার সুন্দরী বৌটাকে উপভোগ করা। এটা কি কোনও সংগত ব্যাপার, ধর্মত আপনি বলুন, জাঁহাপনা?

দরবারে উপস্থিত আমির ওমরাহরা অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

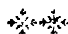
আচমকা এমনটা ঘটতে পারে ভাবেনি সুলতান। নিজের লজ্জা ঢাকতে সে তখন চটপট দরবার সমাপ্ত ঘোষণা করে উঠে দাঁড়ালো।

এরপর বাচ্চাটা বললো, চাচা আর এখানে নয়, চল আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

শিশুটিকে কোলে করে জেলে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ তাকে আর বাধা দিতে এগিয়ে এল না।

তৃতীয় কাপ্তেন তার গল্প শেষ করলে সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার —চমৎকার তোমার কিসসা।

এরপর সুলতানের চতুর্থ কাপ্তেন মুহী অল দিন এগিয়ে এসে যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে বললো, এবার আমার কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

চতুর্থ কাপ্তেনের কাহিনী ঃ

আমার এ কাহিনী আগের কাহিনীরই শেষাংশ জাঁহাপনা।

কালক্রমে ঐ জেলের একটি চাঁদের মতো ছেলে হয়েছিল। ঠিক মায়েরই মতো।

সুলতানেরও এক পুত্রসন্তান জন্মেছিল। কিন্তু সে দেখতে হয়েছিল ঠিক বাঁদরের মতো। গায়ের রঙও কালিপড়া হাঁড়ির মতো।

সুলতানের ছেলে আর জেলের ছেলে একই পাঠশালায় পড়াশুনা করে। প্রতিদিন পাঠশালায় এসেই সুলতানের ছেলে জেলের ছেলেকে জেলে গরীব ভিখিরি বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। জেলের ছেলেও ছেড়ে কথা কয় না, সে বলে, এই যে শাহাজাদা, তা ভাই তোমার শরীরটা একটু ভাল করে ডলাইমলাই কর না কেন? ঘষতে ঘষতে, দেখবে, চামড়া একদিন সফেদ হয়ে গেছে—

এইভাবে প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। একদিন সুলতান-তনয় এসে বাবার কাছে নালিশ করলো, আমি আর ঐ পাঠশালায় যাবো না, আব্বাজান। জেলের ছেলে আমার চেহারা নিয়ে রোজ ঠাট্টা তামাশা করে।

ক্রোধে জ্বলে ওঠে সুলতান। এত বড় স্পর্ধা জেলের ছেলের। এখুনি এনে ওকে কোতল করবো।

কিন্তু আগের সেই বে-ইজ্জতের ঘটনা স্মরণ করে আপাতত সে পরিকল্পনা মুলতুবি রাখতে হলো তাকে। ভাবলো, ছেলেটাকে এনে ফাঁসী দিলে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়তে পারে। তারা হয়তো ভাবতে পারে, সেদিনের দরবারে জেলেকে কোতল না করতে পারার ঝাল মিটিয়েছি আমি।

পাঠশালার মৌলভীকে ডেকে তিনি বললেন, শোনও শেখ, আমার কথা মতো কাজ করতে হবে। তাহলে অনেক ইনাম দেব তোমাকে। সেই সঙ্গে পাবে সুন্দরী সুন্দরী গুটিকয়েক রক্ষিতা। তোমার পাঠশালায় জেলের ছেলে পড়তে যায়। তাকে খতম করতে হবে, যে ভাবে পার।

মৌলভী কুর্নিশ জানিয়ে বললো, এ আর এমন কঠিন কী কাজ জাঁহাপনা। আমার মা'র দুনিয়ার বা'র। কয়েকদিনেই ওকে আমি পিটিয়ে শেষ করে দেব।

পরদিন পাঠশালা শুরু হতে না হতেই জেলের ছেলেকে মোটা লাঠি দিয়ে বেমক্কা পেটাতে লাগলো মৌলভী। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো সে এক সময়। সারা দেহ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। মৌলভী দেখলো ছেলেটা আর সাড়া শব্দ করে না। ভয়ে সে সরে গেল, কিন্তু মুখের বোলচাল ঠিকই চলতে থাকলো, যত্তোসব অপগণ্ড। একেবারে মাথায় কিছু ঢোকে না। আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল আবার পেটাবো।

বিকেলে রক্তাক্ত দেহে বাড়ি ফিরে এসে জেলের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মা-বাবাকে মৌলভীর অহেতুক মারের কাহিনী বললো।

—কাল থেকে আর আমি ঐ পাঠশালায় যাবো না, বাবা।

বাবা বললো, ঠিক আছে, লেখাপড়া করে আর কাজ নাই, চল কাল থেকে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবি।

পরদিন সকালে সে জাল চুপড়ি মাথায় নিয়ে বাবার সঙ্গে হ্রদের তীরে মাছ ধরতে আসে।

প্রথম জালে কোনও ভাল জাতের মাছ উঠলো না। উঠলো একটা চ্যাং। ছেলেটি বললো, এটা দিয়ে আমি নাস্তা করবো।

এই বলে সে চুপড়িতে ফেলে রাখলো। চ্যাংটা মুখ হাঁ করে কথা বলে উঠলো, আমাকে খেয়ে ফেল না জেলের পো। আমি সত্যিই কোনও মাছ নই। স্থানভ্রষ্ট এক জিন কন্যা। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। দেখো, সময়কালে আমি তোমার যথেষ্ট উপকার করবো।

জেলের ছেলে বললো, ঠিক আছে; তোমাকে যেখান থেকে তুলেছিলাম সেখানেই আবার ফেলে দিচ্ছি।

এই বলে সে হ্রদের জলে চ্যাংটাকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার জাল ফেললো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বিয়াল্লিশতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

দুইদিন পরে। সুলতান মৌলভীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী? জেলের ছেলেটাকে খতম করতে পেরেছ?

মৌলভী ভীত চকিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, না হুজুর, প্রথম দিন আমার মার খেয়ে বাড়ি চলে গেল ; এই দুদিন আর সে পাঠশালায় আসেনি। খবর পেলাম, সে আর লেখাপড়া করবে না, ওর বাবার সংগে মাছ ধরবে।

ক্রোধে জ্বলে উঠলো সুলতান, দূর হ খানকির ছেলে, আমার সামনে থেকে ভাগ্।

তারপর সে উজিরকে ডেকে বললো, ছোঁড়াটা এখনো বেঁচে আছে। এখন আমাদের কী কর্তব্য, উজির?

উজির মাথা চুলকে বলে, একটা পথ আমি বের করছি, হুজুর।

—বল, শুনি।

উজির বলতে থাকে, সবুজ শহরের সুলতানের এক পরমাসুন্দরী রূপবতী কন্যা আছে। তার সংগে আমাদের শাহজাদার শাদী হলে চমৎকার মানাবে। কিন্তু মুশকিল হলো সবুজ শহরের সুলতান বড় একরোখা বদমেজাজী মানুষ। যে সব শাহজাদারা তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে গেছে এ যাবৎ, তারা আর ফিরে আসতে পারেনি। সুলতান তাদের সকলকে শূলে চড়িয়েছেন। এখন আমার মতলব হলো, ঐ জেলের ছেলেকে সেখানে পাঠানো। তাকে আপনি হুকুম করুন, যেভাবেই পার ঐ সবুজ দেশের শাহজাদীকে এনে হাজির করতে হবে এখানে, তার সংগে আমার ছেলের শাদী হবে।

সুলতান বললো, আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি উজির। চমৎকার হবে। ডাক তাকে এখানে—এক্ষুণি।

সুলতানের পেয়াদা জেলের বাড়িতে এসে এত্তেলা দিল।

জেলেপুত্র মহম্মদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরবারে এসে হাজির হলো। উজির বললো, শোনও সুলতানের হুকুম, তোমাকে একটা কাজ করে আসতে হবে। সবুজ শহরের সুলতানের কাছে যাবে তুমি। তার পরমাসুন্দরী কন্যাটিকে আমাদের চাই। শাহজাদা তাকে শাদী করবে।

মহম্মদ বললো, কিন্তু সবুজ শহর কোথায় কোন্ দিকে কিছুই তো জানি না আমি।

উজির উত্তেজিত হয়ে বলে, ওসব কিছুই শুনতে চাই না আমি। এ সুলতানের হুকুম। যদি অগ্রাহ্য কর গর্দান যাবে তোমার।

মহম্মদ সাশ্রুনয়নে ঘরে ফিরে এসে মায়ের কাছে সব বললো। মা বললো, বিপদে ধৈর্য হারাতে নাই, ভয় পেতে নেই বাবা। খোদা ভরসা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের এই নদীটা যেখানে সমুদ্রের সংগে মিশেছে সেই মোহনায়

গিয়ে তুমি দাঁড়াও—দেখবে, সব পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

মায়ের কথামতো মহম্মদ সমুদ্র-মোহনায় গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনও জনমানুষের সন্ধান পেল না। হতাশ হয়ে ফিরে আসবে, এমন সময় জল থেকে লাফিয়ে একটা চ্যাং মাছ ডাঙায় উঠে এসে মানুষের মতো কথা বলতে লাগলো, আমাকে চিনতে পারছো মহম্মদ, আমি তোমাদের জালে ধরা পড়েছিলাম একদিন। সেদিন তোমার দয়াতেই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলাম। আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত। কিন্তু কী ব্যাপার বল তো বন্ধু ?

মহম্মদ বলে, ব্যাপার গুরুতর, আমার ওপর সুলতানের হুকুম হয়েছে, সবুজ দেশের শাহজাদীকে নিয়ে এসে দিতে হবে তার ছেলের জন্য। কিন্তু সে দেশটা কোথায়, কী ভাবেই বা যাবো, কিছুই আমার জানা নাই।

চ্যাং বললো, মাত ঘাবড়াও। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো সেই দেশে। কিন্তু সবুজ দেশের সুলতান বড় কড়া মেজাজের মানুষ। তার সামনে দাঁড়ালেই শূলে চড়াবে তোমাকে। যাই হোক, আমি যখন সঙ্গে থাকবো তখন তোমার ঘাবড়াবার কিছু নাই। সব পথ বাতলে দেব। তার আগে তুমি উজিরের কাছে গিয়ে বল, সে দেশের শাহজাদীকে আনতে হলে সোনার তরী চাই। সে নৌকা ভোগবিলাসের যাবতীয় সামগ্রীতে ঠাসা হতে হবে। তা না হলে শাহজাদীর মন উঠবে কেন ?

মহম্মদের ফরমাশ মতো সোনার পানসী-নৌকা বানিয়ে দিল উজির। নানা রত্ন-মাণিক্যে সাজিয়ে দিল সুন্দর করে।

মহম্মদ মা-বাবার কাছে বিদায় নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল।

চ্যাং বন্ধু আগে আগে পথ দেখিয়ে চলে। মহম্মদের আর কোনও অসুবিধা হয় না। আটদিন পরে সবুজ দ্বীপের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ে। সোনার নৌকা দেখার জন্য শহরবাসীরা ভেঙে পড়ে। আজব বস্তু, এমন জিনিস না দেখে কি থাকা যায়।

চ্যাঙের পরামর্শে নৌকো ছেড়ে ডাঙায় নামলো না মহম্মদ। দলে দলে শহরবাসীরা এসে নৌকোর চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে চলে যায়।

এইভাবে একটা সপ্তাহ কেটে গেল, মহম্মদ চ্যাংকে জিজ্ঞেস করলো, এভাবে আর একা একা এখানে কতদিন বসে থাকবো বন্ধু ?

চ্যাং বললে, সবুর কর বন্ধু, সময়ে মেওয়া ফলবে।

সারা সবুজ শহরে লোকের মুখে সোনার তরী ছাড়া আর কোনও কথা নাই। শাহজাদী সুলতানের কাছে আব্দার ধরলো, আব্বাজান, শুনেছি আমাদের ঘাটে এক সোনার নৌকা এসে ভিড়েছে। সে নাকি চমৎকার দেখার মতো জিনিস। তুমি আমাকে অনুমতি দাও বাবা, আমি একবার দেখে আসি।

সুলতানের ততটা ইচ্ছা নয়, কিন্তু প্রাণাধিকা কন্যার কোনও কথা ঠেলতে পারেন না তিনি। তাই বললেন, ঠিক আছে, কাল সকালে গিয়ে তুমি দেখে এস। আমি ঢ্যাঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাল বাড়ি থেকে পথে বেরুতে পারবে না।

পরদিন প্রত্যুষে জনহীন রাজপথ ধরে শুধুমাত্র সখী পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে শাহজাদী ঘাটে এসে পৌঁছল। মহম্মদ তাকে স্বাগত জানালো নৌকার ভিতরে এসে সবকিছু দেখার জন্য।

শাহজাদী তার প্রধান পরিচারিকাকে সঙ্গে করে নৌকায় উঠলো।

আহা, কী সুন্দর করে সাজানো গোছানো! কত মূল্যবান হীরে জহরতের নিখুঁত মনোহর কাজ চারধারে! চোখ জুড়িয়ে যায়।

দেখতে দেখতে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল শাহজাদী। খেয়ালই ছিল না, সে এক নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা দোলা লাগাতে চমকে উঠে ছই-এর বাইরে এসে দেখলো, নৌকাটা তীর ছেড়ে অনেকটা ভিতরে এসে তরতর করে বয়ে চলেছে। শাহজাদী বুঝতে পারলো সবুজ দ্বীপ ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছে। মহম্মদকে সে জিজ্ঞেস করলো, এমনটা করলে কেন?

—তা না হলে সহজ পথে তোমাকে তোমার বাবার দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারতাম না।

—কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?

—ভয় নাই, দোজাকে নয়। এক সুলতানের প্রাসাদে। তার পুত্রের সঙ্গে তোমার শাদী হবে।

শাহজাদী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে। কিন্তু সে শাহজাদা দেখতে কেমন? তোমার মতো রূপবান?

মহম্মদ বলে, সে আমি বলতে পারবো না। চল, গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পাবে তাকে।

শাহজাদী তার হাতের একটা আংটি জলে ফেলে দিল। কিন্তু চ্যাং বন্ধু নিচে তলিয়ে যাওয়ার আগেই গপ করে গিলে ফেললো সেটা।

—শাহজাদী বললো, না আমি অন্য কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলেকে শাদী করতে চাই না। তোমাকে আমার মনে ধরেছে। তুমিই হবে আমার স্বামী। এস, আর দেরি করে লাভ নাই, নিচে এই দরিয়ার পানি আর ওপরে ঐ আসমানের চাঁদ সাক্ষী রেখে তোমার আমার শাদী হয়ে গেল আজ।

শাহজাদীকে বুকে জড়িয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে আটটা দিন কেটে গেল। নৌকা এসে ভিড়লো তার নিজের দেশে সুলতানের প্রাসাদ ঘাটে।

মহম্মদ সুলতানকে গিয়ে বললো, আপনার আদেশ মতো সবুজ দেশের শাহজাদীকে সঙ্গে করে এনেছি, জাঁহাপনা। এবার তাকে যথা-মর্যাদায় বরণ করে প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে। ঘাটের সিঁড়ি থেকে প্রাসাদের হারেম পর্যন্ত সারাটা পথ সবুজ রেশমের গালিচায় মুড়ে দিতে হবে। তার ওপর পা রেখে শাহজাদী হাঁটবেন।

সুলতান উজিরকে নির্দেশ দিলেন, যত অর্থের প্রয়োজন হয় হোক, যেমনটি দরকার ঠিক তেমনি সমাদরে তাকে প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে।

সুলতানের হুকুমে দেশ-বিদেশের মহা-মূল্যবান সবুজ গালিচা সংগ্রহ করে এনে পেতে দেওয়া হলো। শাহজাদীকে বরণ করে নিতে এল শাহজাদা।

—আমি তোমাকে আমার বেগম করে রাখতে চাই। তুমি রাজি তো?

শাহজাদী বললো, রাজি হতে পারি, একটা শর্তে।

—কী শর্ত?

পথে আসতে আসতে দরিয়ার পানিতে আমার হাতের একটা আংটি পড়ে গেছে, সেই আংটিটা আমার চাই, ওটা এনে দিতে হবে।

মহা-সমস্যা; সমুদ্রের জলে যে আংটি পড়ে গেছে তাকে কখনও উদ্ধার করা সম্ভব?

উজির বললো, জাঁহাপনা আপনি কিছু ভাববেন না, এই মওকায় জেলের ছেলেকে খতম করে দেব।

মহম্মদকে ডেকে সে বললো, শোনও জেলের ছেলে, এই শাহজাদীর হাতের আংটি সমুদ্রের পানিতে খোয়া গেছে। ওটা তোমাকে খুঁজে এনে দিতে হবে। না হলে শাহজাদী শাদীতে মত দিচ্ছে না।

চ্যাং বন্ধু আংটিটা যথাসময়ে মহম্মদের হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা শাহ-জাদীর হাতের আংটি। ভাল করে রাখ, সময়ে কাজ দেবে।

মহমম্দ বললো, সে আংটি আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

আংটির সমস্যা মিটে গেল। এবার শাহজাদী কোন্ ছলনার আশ্রয় নেবে?

রাজকুমারী বললো, আমাদের দেশে যে নিয়ম চালু আছে সেই নিয়মেই শাদীর অনুষ্ঠান হতে হবে।

সুলতান তাতেই সম্মত হয়ে বললো, বেশ তাতেই আমি রাজি। বল তোমাদের দেশের কি প্রথা?

শাহজাদী বলতে থাকে: বাসরঘর থেকে ঘাট পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ কাটতে হবে। সেই সুড়ঙ্গপথ ধরে পাত্র আসবে গোসল করতে। কিন্তু আসার সময় তাকে সারা সুড়ঙ্গপথ গনগনে কাঠের আগুনে পা রেখে আসতে হবে। এই ভাবে আগুন-পানিতে শুদ্ধ হয়ে তবে সে আমাকে গ্রহণ করতে পারবে। আমি নৌকাতেই অবস্থান করবো তার জন্য।

সুলতান শঙ্কিত হলো। সুড়ঙ্গ কাটা হলো প্রাসাদকক্ষ থেকে ঘাট পর্যন্ত। এবং সারা সুড়ঙ্গে কাঠের ডালপালা ভরে দেওয়াও হলো। কিন্তু ঐ আগুনের হলকার মধ্যে ছেলেকে নামিয়ে দিতে তাঁর মন সরলো না। রাজকুমারী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিল, আমাদের দেশে শাদীর মতো পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। সেই কারণে আল্লাহর আশীর্বাদে পাত্রের দেহে আগুনের আঁচ লাগে না এতটুকু।

তবু সুলতানের ভরসা হলো না। উজির বললো, এক কাজ করা যাক। সুড়ঙ্গের ধুনিতে আগুন দিয়ে আগে মহম্মদকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। সে যদি অক্ষত শরীরে ঘাটে গিয়ে পেঁছিতে পারে তবে বুঝতে হবে সত্যিই খোদার মাহাত্ম্য আছে। তখন আমরা শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে ঘাটে গিয়ে শাহজাদীকে বরণ করে নিয়ে আসবো।

সুলতান বললো, আহা কি চমৎকার তোমার বুদ্ধি, উজির!

চ্যাং বন্ধু জল থেকে লাফিয়ে উঠে মহম্মদকে বললো, এবার তোমাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে পাঠাবে উজির। তবে তোমার কোনও ভয় নাই, আগুন তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি শুধু দুকানে হাত রেখে এই মন্ত্রটা আওড়াতে থাকবে: 'আল্লাহ তোমার দোয়াতেই আমি বেঁচে আছি।' ব্যস, দেখবে তোমার দেহে কোনও উত্তাপ লাগবে না।

সুলতানের আদেশে মহম্মদকে হাজির করা হলো। উজির বললো, মহম্মদ, এই সুড়ঙ্গের পবিত্র আগুনের মধ্যে দিয়ে তোমাকে সব আগে ঘাটে গিয়ে পৌঁছতে হবে। আমরা দেখবো, তোমার গায়ে যদি আঁচ না লাগে তা হলে আমরা শাহজাদাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করবো।

মহম্মদ বললো, ঠিক আছে। সুড়ঙ্গে আগুন দেওয়া হোক। আমি নেমে যাচ্ছি নিচে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সুড়ঙ্গের কাঠ।

মহম্মদ আল্লাহর নাম স্মরণ করে কানে হাত চাপা দিয়ে নিচে নেমে গেল। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অক্ষত দেহে এসে পৌঁছল ঘাটে।

সুলতানের ভরসা হলো! শাহজাদাকে সঙ্গে করে সদলবলে সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটার তাই ঘটে গেল। সুলতান সপরিবারে অঙ্গার হয়ে গেল নিমেষে॥

এর পরের কাহিনী আর না বললেও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, জাঁহাপনা?

চতুর্থ কাপ্তেন তার কাহিনী শেষ করলো।

পঞ্চম কাপ্তেন এগিয়ে এল সুলতান বাইবারসকে গল্প শোনাবার জন্য।

—তাহলে শুনুন জাঁহাপনা।

সে বলতে থাকে:

একদা এক সুলতান তাঁর উজিরকে বললেন, দেখ উজির, আমি এমন একটা আংটি চাই যা পরলে আমার ইচ্ছামতো ক্রুদ্ধ বা আনন্দিত হতে পারি।

উজির বাজারে গিয়ে প্রতিটি স্যাকরাকে বললো সুলতানের অভিপ্রায়। কিন্তু কেউই বানিয়ে দিতে পারে বলে জানালো না।

সুলতান শুনে রুষ্ট হলেন। বললেন, কী আশ্চর্য, এই সামান্য একটা বস্তু আমার সলতানিয়তে সংগ্রহ করা যাবে না? যাও, তুমি শহর ছেড়ে দূরে দেশে চলে যাও। যেখান থেকে পার নিয়ে এস ঐ রকম একটা আংটি।

সুলতানের হুকুম তামিল করতে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যায় উজির।

এক বৃদ্ধ শেখ তার খামারবাড়িতে গম ঝাড়াই করছিল। উজির তার কাছে গিয়ে বললো, আচ্ছা শেখ সাহেব, এমন কোনও গুণী লোকের সন্ধান দিতে পার, যে একটা আংটি বানিয়ে দিতে পারে। সে আংটি পরলে ইচ্ছামত ক্রোধ বা পুলক জাগাতে পারে?

বৃদ্ধ চাষী বললো, আপনি একটু অপেক্ষা করুন জনাব, আমি আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করে আসি।

বৃদ্ধের কিশোরী কন্যা অসাধারণ রূপগুণবতী। সব শুনে সে বললো, হ্যাঁ বাবা, আমি পারি। আমি বানিয়ে দেব। তুমি মেহেমানকে এখানে খানা-পিনা করতে বল। আমি তার মধ্যে তৈরি করে দিচ্ছি আংটিটা।

সুলতান আংটিটা পেয়ে আনন্দিত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আংটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে বুঝলেন, প্রকৃতই আংটিটির দৈব ক্ষমতা আছে। উজিরকে তিনি বললেন, এমন যে গুণবতী কন্যা, তাকে আমি শাদী করতে চাই। তুমি ব্যবস্থা কর, উজির।

পরদিনই মহাধুমধামে সুলতানের সঙ্গে কৃষক-কন্যার শুভ পরিণয় হয়ে গেল। চাষীর মেয়ে এসে উঠলো সুলতানের হারেমে।

কিন্তু কয়েকদিন পরে চাষী-কন্যা যুঁই অসুস্থ হয়ে পড়লো। হাকিম ডাকা হলো। তিনি বললেন, গ্রামের মেয়ে, খোলামেলা জায়গায় থাকা অভ্যেস। হারেমের বন্ধঘরে এসে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এছাড়া অন্য কোনও রোগ নাই তার। ওকে একটু নির্মল বায়ু সেবন করানো দরকার।

সুলতান উজিরকে বললেন, নদীর ধারে আমার প্রমোদ-প্রাসাদে বেগমকে রাখা হবে, তুমি সব ব্যবস্থা কর।

সুলতানের ইচ্ছায় সেইদিনই নদীতীরের প্রাসাদে যুঁই-এর থাকার ব্যবস্থা হলো।

জানলা খুললেই সামনে স্রোতস্বিনী। ঝিরঝির করে সুশীতল হাওয়া বয়ে চলে সারাক্ষণ। সুন্দরী যুঁই জানলার পাশে বসে নদীর মনোহর দৃশ্য দেখে দেখে পুলকিত হয়।

একদিন সে জানলার পাশে বসে এক জেলের মাছ ধরা দেখছিল। লোকটা এক একবার জাল ফেলে গুটিয়ে আনছে আর এক এক ঝুড়ি রুপোলী মাছ তুলছে।

জেলেটাকে ডেকে সে বললো, এই শোনও, আমার জন্য একবার জাল ফেলতো। আমি তোমায় একটা মোহর দেব। তবে যা উঠবে সব আমার।

জেলে বললো, তোমার মতো সুন্দরীর হাত থেকে পয়সা নেব না। আমি এমনিই তোমার জন্য একবার জাল ফেলেছি।

সেবারে জালে কোনও মাছ উঠলো না। উঠলো একটা তামার কৌটো। ঢাকনা দিয়ে মুখটা ঢাকা। যুঁই একটা দিনার দিতে গেল জেলেকে। ওটা আমাকে দিয়ে দাও, এই নাও তোমার মোহর।

জেলে তাম্রপাত্রটি সুন্দরীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, পয়সা আমি নেব না।

যুঁই বলে, সে কি, তা কি করে হয় ? তুমি আমাকে শুধু শুধু দেবে তা হয় না।

জেলের ছেলে বলে, তা যদি দেবার এতই ইচ্ছে তবে সোনা-দানা কিছু চাইনে, তোমার অধরে ছোট্ট একটা চুম্বন করবো, এই অনুমতি দাও।

যুঁই শিহরিত হয়ে ওঠে। জেলের ছেলের লৌহ-কঠিন বলিষ্ঠ বাহুপেশীর দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে সে। ওর প্রার্থনা একেবারে মঞ্জুর করতে পারে না। জানলা দিয়ে মুখখানা সে বাইরে বাড়িয়ে দেয়। ছেলেটাও এগিয়ে আসে চুম্বন-বাসনায়। কিন্তু মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে যায়। সুলতান স্বয়ং সব শুনে ফেলেছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে তরবারীখানা আমূল বসিয়ে দেন তার বুকে।

তারপর যুঁই-এর দিকে অগ্নিবাণ হেনে বলে, আমার হারেম তোমার জন্য নয়। তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পার।

যুঁই পথে নেমে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে এক সময় এসে পৌঁছয় শহরের অপর প্রান্তে। এক দোকানের দাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।

পরদিনও দোকানদার যুঁইকে একই জায়গায় একইভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, কে গো বাছা, কাল থেকে দেখছি তুমি এইখানে বসে আছ ?

যুঁই বলে, আমি পরদেশী। আজ দুদিন আমার খাওয়া হয়নি কিছু।

—আহা, তা বলনি কেন ? চল আমার বাড়িতে চল। সেখানে খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নেবে।

যুঁইকে সঙ্গে করে দোকানদার তার বাড়িতে এসে বৌকে বলে, দেখ, এই মেয়েটি আজ দুদিন অনাহারে আছে। একে কিছু খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ কর।

দোকানীর বৌ যুঁই-এর রূপে ঈর্ষান্বিতা হয়ে নিগ্রো নফরটাকে বলে, এই আঁটকুড়িকে মুরগীর ঘরে নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রাখ।

সারাটা দিন কেটে গেল, কিন্তু খানাপিনা কিছুই দিয়ে গেল না কেউ। যুঁই খিদেয় ছটফট করে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যেতে থাকে। কিন্তু এক বিন্দু জলও ওরা পাঠালো না।

অবশেষে তামার কৌটোটার ঢাকনা খুলে ফেলে সে। নদীর তলায় পড়েছিল, হয়তো একটুও জল থাকতে পারে ওতে।

কিন্তু ঢাকনাটা খুলেই সে অবাক হয়ে গেল। কৌটোটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সুন্দর জলের ঝারি। আর বেরুলো খানকয়েক রেকাবী। সেগুলো মেঝেয় বিছিয়ে পাততেই নানারকম মুখোরচক খানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

যুঁই-এর ক্ষুধাও ছিল ভীষণ। কী করে সে সব সংঘটিত হলো তখন আর ভাববার সময় নাই যুঁই-এর। গোগ্রাসে সে খেয়ে নিল সব।

খাওয়া শেষ করে কৌটোটার দিকে লক্ষ্য করতে সে দেখতে পেল তার ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলি সুন্দর সুসজ্জিত পুতুল। ওগুলো বের করে সামনে রাখতেই পুতুল-সুন্দরীরা পলকে পরমাসুন্দরী কিশোরীর আকার ধারণ

করে নানা ছন্দে নাচতে থাকলো। দশজন নাচুনীর হাতে দশটা তোড়া ছিল। নাচতে নাচতে এক সময় তারা সেগুলো যুই-এর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। তারপর নাচ শেষ করে এক সময় আবার তারা ঢুকে পড়লো ঐ কৌটোর ভিতরে।

যুই-এর মনে আর দুঃখ নাই। সারাদিনে রাতে যখনই প্রয়োজন কৌটোটা খুললেই খানাপিনা পেয়ে যায় সে। তার সঙ্গে প্রতিবারই ঐ দশটি সুন্দরী নাচ শেষ করে প্রণামী রেখে যায় দশটি মোহরের তোড়া।

কয়েকদিন পরে নিগ্রো নফরটা মালকিনকে জিজ্ঞেস করে, মালকিন, ঐ মেয়েটি যাকে মুরগী ঘরে তালা দিয়ে রেখে এসেছিলাম তাকে তো খানাপিনা কিছু দেওয়া হয়নি ?

দোকানীর বৌ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুই থামতো, ও বিদেয় হয়েছে।

নিগ্রোটার কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে কথা। মুরগী-ঘরে গিয়ে দেখে মেয়েটা সেইখানেই শুয়ে আছে।

চাকরটা দোকানীর কাছে ছুটে গিয়ে খবর দেয়। দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ করে বাড়িতে বৌকে গালমন্দ করে মুরগীর ঘরে যায়।

যুই বলে, আল্লাহর দোয়ায় পেট ভরেই খেয়েছি এতদিন।

দোকানী বলে এবার তুমি কী করবে, বাছা ? কোথায় যাবে বল, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

যুই টাকার থলেগুলো দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, এই শহরে আমি একখানা চমৎকার বাড়ি বানাতে চাই। এই নিন টাকা—দরকার হলে আরও অনেক দেব। আপনি আমাকে একখানা সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে দিন।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিশাল প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল যুই-এর জন্য। ইতিমধ্যে যুই-এর মুরগী-ঘর মোহরের তোড়ায় ভরে গেছে।

বাজারের সবচেয়ে সেরা সেরা জিনিসে প্রাসাদের কক্ষ সাজানো হলো। যুই এক যুবক সুলতানের ছদ্মবেশ পরে এসে উঠলো তার প্রাসাদে।

সুলতান উজিরকে সঙ্গে নিয়ে শহর-পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন ছদ্মবেশে। চলতে চলতে তিনি যুই-এর মনোহর প্রাসাদের সামনে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। উজিরকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা উজির, এখানে তো এই প্রাসাদটা ছিল না। কী ব্যাপার, এ তো দেখছি আমার প্রাসাদের চেয়েও সুরম্য। মনে হচ্ছে, অন্য কোনও দেশের সুলতান আমার শহরে ঢুকে পড়েছে, আমার অনুমতি ছাড়াই।

উজির বললো, আপনি কাল শহরে ঢ্যাড়া দিয়ে জানিয়ে দিন জাঁহাপনা, কাল রাতে কেউ আলো জ্বালাতে পারবে না। যদি দেখেন এই প্রাসাদও অন্ধকার হয়ে আছে তবে বুঝবেন সে আপনার অনুগত এক প্রজামাত্র। কিন্তু আপনার নির্দেশ অমান্য করে সে যদি আলো জ্বালায় তবে বুঝতে হবে সে অন্য কোনও পরাক্রমশালী সুলতান বাদশাহ আপনার সলতানিয়ত জবরদখল করে বসেছে।

সুলতানের ফরমান শহরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হলো পরদিন সকালেই। সন্ধ্যায় সুলতান এবং উজির আবার পথে বেরুলেন ছদ্মবেশে। পথ-ঘাট ঘর-বাড়ি সারা শহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু ঐ প্রাসাদটি আলোয় ঝলমল করছে। সুলতানের আর বুঝতে অসুবিধা হলো না। কোনও এক যুদ্ধবাজ আক্রমণকারী বাদশাহ তার শহরে অনধিকার প্রবেশ করেছে।

পরদিনও একই ফরমান জারী করা হলো। সে রাতেও কেউ আলো জ্বালালো না। কিন্তু ঐ প্রাসাদ আলোয় আলোময় হয়ে রইলো।

সুলতান বললেন, আর দেরি করে লাভ নাই উজির, চল আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। জানতে চাইবো, কেন সে আমার শহরে প্রবেশ করেছে?

উজির বাধা দিয়ে বললো, আগেই আপনার পক্ষে যাওয়া সহজ হবে না জাঁহাপনা। ব্যাপারটা কী আমি গিয়ে পরখ করে আসি প্রথমে, তারপর আপনি যাবেন।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে আজ তাহলে তুমিই দেখে এস। আমি প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি।

দ্বাররক্ষীর কাছে বলতেই সে উজিরকে এক বিশাল দরবার-মহলে নিয়ে এল। ঘরের মাঝখানে একটি সোনার সিংহাসনে যুঁই তরুণ সুলতানের ছদ্মবেশে আসীন ছিল। উজিরকে দেখা মাত্র সে তাকে চিনতে পারলো। আদর করে বসতে দিল পাশের আসনে। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম খানা-পিনা এল। যুঁই উজিরকে অনুরোধ করলো, আপনি অতিথি, মেহেরবানী করে আহারাদি সমাধা করুন।

উজির গোগ্রাসে উদরস্থ করলো সব। যুঁই তাকে একটা মোহরের তোড়া উপহার দিয়ে বললো, আপনার সাজ-পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনি অতি গরীব-সরীব মানুষ। দয়া করে এই তোড়াটা রেখে দিন।

উজির ফিরে এসে সুলতানকে ঐ প্রাসাদ এবং তার প্রিয়দর্শন তরুণ সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো, আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, অত ঐশ্বর্য্য আমি জীবনে দেখিনি কখনও। টাকা যেন তার কাছে খোলামকুচি। দুহাতে বিলিয়ে দিচ্ছে। এই দেখুন, না চাইতে আমাকে কত মোহর দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বিপদ আসন্ন। তার অর্থ এবং পরাক্রম আমাদের তুলনায় ঢের বেশি বলে আমার মনে হয়েছে। সুতরাং আত্মরক্ষার উপায় দেখতে হবে আমাদের।

সুলতান বললেন, কাল সন্ধ্যায় আমি নিজে যাবো সেখানে। স্বচক্ষে দেখে এসে তারপর যা করার করা যাবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সুলতান এক বণিকের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন। প্রহরীকে বলতেই সে সসম্মানে সুলতানকে যুঁইএর সিংহাসন-সম্মুখে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলো।

যুঁই অলক্ষ্যে মৃদু হেসে সাদর অভ্যর্থনা জানালো তাকে। খানা-পিনায় আপ্যায়ন করলো যথোচিত। তারপর কৌটোটা থেকে দশটি ছোট ছোট পুতুল

সামনে দাঁড় করাতেই চোখের পলকে তারা এক একটি পরমাসুন্দরী কিশোরীতে রূপান্তরিত হয়ে সুললিত ছন্দে নৃত্য করতে লাগলো। পরিশেষে প্রত্যেকে তাদের হাতের তোড়া যুঁইএর পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে আবার কৌটোর কোটরে ঢুকে পড়লো।

সুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

—এ বস্তু আপনি কোথা থেকে কিনেছেন সুলতান?

যুঁই বললো, না, কিনিনি। একজন আমাকে দিয়েছে।

—দিয়েছে? এমন জিনিস কেউ শুধু শুধু হাতছাড়া করে?

—শুধু শুধু নয়. অর্থের বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। তার দাবী ছিল অন্য। অবশেষে সেই দাবীই পূরণ করে এটা পেতে হয়েছে আমাকে।

—কী ছিল তার দাবী?

যুঁই লজ্জারক্ত হয়ে বলে, সে কথা খোলাখুলি আপনাকে কী করে বলি? তবে জেনে রাখুন একটা মোরগ একটা মুরগী দেখলে যা করতে চায় তাই সে একটি বার দাবী করেছিল আমার কাছে। এবং বুঝতেই পারছেন, আমি তা পূরণ করেছিলাম।

যুঁই এখানে কিছুটা মিথ্যা ভাষণ করলো।

সুলতান উত্তেজিত হয়ে বললো, ঠিক আছে আমি একবার নয় দু' দুবার সে কর্মে রাজি আছি। আপনি আমাকে ওটা দিন।

যুঁই আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। কিন্তু এখনই হেসে ফেললে সব মাটি হয়ে যাবে। সে বললো, দুবারে তো আমার সুখ হবে না, সাহেব? অন্ততঃ চারবার চাই।

সুলতান তৎক্ষণাৎ বললো, আমি তাতেই রাজি। কিন্তু ওটা আমার চাই-ই, সুলতান। আমাকে ফেরাবেন না আপনি।

যুঁই বলে, না ফেরাবো না। তবে এই দরবার-মহলে তো সে কাজ হবে না। আপনি পাশের শয়নকক্ষে চলুন।

সুলতানের আর তর সয় না। সে তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, চলুন তা হলে—

পাশের ঘরে এসে সুলতান হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। যুঁই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—আপনি এই সলতানিয়তের বাদশা। আপনার বিত্ত বৈভব পরাক্রমের অন্ত নাই। কিন্তু সামান্য একটা তাম্র-পাত্রের জন্যে একি আপনার লালসা! তার জন্য অতি জঘন্যতম কাজে লিপ্ত হতেও পিছ-পা হন না আপনি। অথচ এই আমি আপনার বেগম এই বস্তু এক ধীবর-সন্তানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম ছোট্ট একটি চুম্বনের প্রতিশ্রুতিতে। আহা বেচারা, তার মনের সাধ মনেই রয়ে গেল। এ জীবনের মতো আর কোনও দিন কোনও নারীকে চুম্বন করতে পারবে না সে। আপনার শাণিত তরবারী তার জীবনের সব সাধ

ঘুচিয়ে দিয়েছে সেদিন।

সুলতান স্তব্ধ, বিস্মিত, বিমূঢ়!

এই সেই যূঁই—তার বেগম। একে তিনি একদিন প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরকীয়া প্রেমের অপরাধে!

সুলতান দুহাত বাড়িয়ে যূঁইকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তার মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে। শুধু তাকে বুকে চেপে হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করার চেষ্টা করতে থাকেন।

কাপ্তেন গল্প শেষ করে থামে। সুলতান বাইবারস মুগ্ধ হয়ে বলে, চমৎকার তোমার কাহিনী নূরে অল দিন।

এরপর ষষ্ঠ কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করে।

এক সুলতানের পরম রূপবতী এক কন্যা জন্মেছিল। যখন তার বয়স সবে সাত, সেই সময় সে একদিন মাথায় চিরুণী দিতে দিতে একটা ঢাউস উকুন খুঁজে পেল। উকুনটাকে সে এক তেলের শিশিতে পুরে মুখে ছিপি এঁটে ভাঁড়ার ঘরের তাকে রেখে দিল।

এরপর অনেক কাল কেটে গেছে। শাহজাদীর আর স্মরণে নাই কবে ছোট বেলায় সে একটা শিশিতে ভরে রেখেছিল।

শাহজাদী এখন প্রায় ষোড়শী। আরও সুন্দরী, আরও চমৎকার হয়েছে দেখতে।

একদিন সে সুলতানের পাশে দাঁড়িয়েছিল দরবারে। এমন সময় উন্মত্ত মোষের মতো দাপাতে দাপাতে সেখানে এসে হাজির হলো কিম্ভূত কিমাকার এক জানোয়ার।

শাহজাদী শিউরে উঠলো, সর্বনাশ বাবা, ঐ জানোয়ারটা আসলে একটা উকুন। ওকে আমি খুব ছোটবেলায় একটা তেলের শিশিতে পুরে রেখেছিলাম।

সুলতান উজিরকে বললেন, ওটাকে মেরে ওর ছাল ছাড়িয়ে প্রাসাদের সদর ফটকে ঝুলিয়ে রাখ। ঘোষণা করে দাও, যে ঐ ছালটা দেখে বলতে পারবে কিসের, কোন প্রাণীর চামড়া, তার সংগে আমার কন্যার শাদী দেব। কিন্তু যদি কেউ বলতে এসে ঠিক ঠিক বলতে না পারে তবে তার মুণ্ডু কেটে ঝুলিয়ে রাখা হবে ফটকে।

সুলতানের হুকুমমতো উজির জল্লাদকে নির্দেশ করতে সে খাঁড়ার এক কোপে ঐ বিশালাকৃতি উকুনটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। এবং সেই দিন তার ছালটা ছাড়িয়ে প্রাসাদ-ফটকে লটকে দিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া

হলো সুলতানের ফরমান।

দেশ-বিদেশ থেকে কত সুলতান বাদশাহর ছেলেরা এসে প্রাণ বিসর্জন দিল। কেউ বললো, ওটা একটা বুনো মোষ, কারো বা ধারণা, ওটা এক ধরনের রাম-ছাগল। প্রায় চল্লিশটি শাহজাদার নরমুণ্ড প্রাসাদ-ফটকে ঝুলতে লাগলো।

অবশেষে একদিন অপূর্ব সুন্দর শাহরাজাদা এসে বললো, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ওটা একটা বৃহদাকার উকুনের চামড়া। উকুনটা বহুকাল তেলের শিশিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু একদিন সে বিরাট আকার ধারণ করে তৈলপাত্র ভেঙে-চুরে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সুলতান আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি! তাহলে তুমিই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে।

সেইদিনই কাজীকে ডেকে শাদীনামা তৈরি করা হলো। মহা আড়ম্বরে সমাধা হয়ে গেল শাহজাদীর শাদী।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো ছেচল্লিশতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

একটানা চল্লিশ দিন ব্যাপী উৎসবে মুখর হয়ে থাকল সারা শহর-প্রাসাদ।

তারপর জামাতা এসে সুলতানকে বললো, এবার অনুমতি করুন জাঁহাপনা, আমার বেগমকে আমি দেশে নিয়ে যাই। আমার মা বাবা সবাই অধীর হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমিও বাদশাজাদা, সুতরাং চিরকাল তো শ্বশুরালয়ে পড়ে থাকা আমার শোভা পায় না।

সুলতান বললেন, সে তো একশোবার। তোমার শাদী করা বেগম—তাকে স্বদেশে নিয়ে যাবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে! ঠিক আছে, কালকের দিনটা অপেক্ষা কর, তোমার দানযৌতুক সব গুছিয়ে দিক আমার নফর চাকররা।

জামাতা বললো, ওসবের কিছু প্রয়োজন নাই, জাঁহাপনা। ঐশ্বর্য আমার অগাধ আছে। আমি শুধু আপনার কন্যাকেই নিয়ে যেতে চাই।

সুলতান বললেন, বেশ তাই হবে। তবে কনের সঙ্গে তার মাকেও নিয়ে যাও। সে দেখে আসুক তোমাদের দেশ। চিনে আসুক পথঘাট—যাতে সময়ে অসময়ে আমাদের সে পথ নির্দেশ করে নিয়ে যেতে পারবে তোমার শহরে।

—শাশুড়ীকে আবার কেন, জামাতা আপত্তি জানায়, তিনি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। পথের ধকল তাঁর সইবে না। বরং আমিই মাঝে মাঝে এনে দেখিয়ে যাব আপনাদের কন্যাকে।

সুলতান বললেন, অতি উত্তম। তবে তাই হোক, আজই তুমি যাত্রা কর।

এই শাহজাদা জামাতাটি আসলে কোনও সুলতান বাদশাহ-পুত্র নয়। একটি বহুরূপী দানব।

পর্বত-চূড়ায় তার আবাস। সে শাহজাদীকে সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুললো।

শাহজাদী দু-একদিনেই স্বামীর অন্য পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠলো। সারাদিন সে বাইরে বাইরে কাটায়। রাতের বেলায় যখন সে ফিরে আসে তখন সারা অংগ রক্তমাখা হয়ে থাকে। শাহজাদী আন্দাজ করতে পারে তার স্বামী অনেক হত্যাকাণ্ড সমাধা করে এসেছে।

একদিন সে একটা নরমুণ্ড হাতে ঝুলিয়ে ঘরে ফিরে এসে বললো, এটাকে বেশ ভাল করে পাকাও দেখি।

শাহজাদী আতঙ্কে দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, একি বলছো তুমি ? আমি কি নরমাংস খাবো ?

দানব আর জুলুম করলো না। আবার বাইরে বেরিয়ে গেল তখুনি। এবং ক্ষণকালের মধ্যে একটা নাদুস-নদুস ভেড়া মেরে নিয়ে এল।

সারাদিন দানবটা নানা জন্তু-জানোয়ারের ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে সারা দেশ তছনছ করে বেড়ায়। তার আতঙ্কে কত গর্ভবতী নারী অকালে মৃতবৎসা হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগে না। বনের সিংহের সঙ্গে লড়াই করে অবলীলাক্রমে প্রাণ সংহার করে তার। অথচ সে যখন ঘরে ফিরে আসে তার বিবির কাছে, তখন সে একেবারে অন্যরকম। শান্তশিষ্ট নিরীহ প্রিয়দর্শন এক যুবকের রূপ ধরে হাজির হয় সে শাহজাদীর সামনে।

একদিন মায়াবী দানবটা শাহজাদীর মায়ের রূপ ধারণ করে নিজের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো। শাহজাদী জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো তার মা এসেছে। ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলে জড়িয়ে ধরলো দানবকে, মা, মা তুমি এসেছ ? কিন্তু এই দুর্গম পথ একা একা এলে কি করে মা ?

মায়াবী দানব বলে, ভালবাসার টানে মা, ভালবাসার টানে। পেটে তো এখনও ধরিসনি, যদি তাঁর দয়ায় দুটি-একটি হয় তখন বুঝবি, সন্তান কি বস্তু !

—তা মা শুনলাম, তোমার স্বামী একটা মায়াবী দানব ? সে নাকি তোকে নরমাংস খেতে বলে ? এই কথা শুনে আমি তো আর রাতে ঘুমাতে পারি না, মা। না না—এই দৈত্যদানবের কাছে তোকে আর রেখে যাব না আমি। এখন সে ঘরে নাই, এই ফাঁকে চল আমরা কেটে পড়ি এখান থেকে।

মায়ের কথায় প্রসন্ন হতে পারে না শাহজাদী। বলে, কে তোমাকে এই আজগুবি কথা জানিয়েছে, মা। আমার স্বামী মানুষ নয় মায়াবী দানব, সে আমাকে নরমাংস খাওয়াতে চায়, এসব তো ডাহা মিথ্যা কথা মা। আমি খুব সুখে আছি আমার স্বামীর কাছে। তার আদর সোহাগ রাখবার জায়গা নাই আমার। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যাও মা, আমার জন্য কোনও দুশ্চিন্তা করো না।

মায়াদানব নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। যাক, তার বিবি তাকে

সত্যিই ভালবাসে প্রাণ দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার তার মানব রূপ ধারণ করে একটা ভেড়া কাঁধে করে ফিরে আসে। দল-অল স্বামীকে বলে, জান, আজ মা আমাকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে চাইলো না।

—ইস্, আজই ফিরতে আমার দেরি হয়ে গেল। তোমার মা-এর সঙ্গে দেখা হলে বড় আনন্দ পেতাম। তোমার এক মাসী আছে না? তাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

দল-অল লাফিয়ে ওঠে, করে না আবার! কিন্তু কে তাকে নিয়ে আসবে?

মায়াদানব বলে, কাল আমি তাকে খবর দিয়ে আসবো।

কয়েকদিন বাদে মায়াদানব দল-অল-এর মাসীর মূর্তি ধারণ করে এসে দরজায় করাঘাত করলো।

মাসীকে দেখে দল-অল-এর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মাসী হা-হুতাশ করে কেঁদে আকুল। বলে, হায়-হায়-হায়, একি সর্বনাশ হলো! শেষ পর্যন্ত তোর ভাগ্যে লেখা ছিল এক মায়াদানব!

আনন্দে উদ্ভাসিত দল-অল মুহূর্তে ক্রোধে ফেটে পড়ে, চুপ কর মাসী। আমার স্বামীর সম্বন্ধে যা-তা কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। কে বলেছে, কোথা থেকে শুনেছ এইসব আজগুবী খবর? আমার স্বামী এক বাদশাহর ছেলে। আমার বাবার চেয়ে ঢের ঢের বেশি তার ঐশ্বর্য সম্পদ। আর তার মতো রূপবান পুরুষ কেই বা কটা দেখেছে, মাসী?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতচল্লিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

মাসী-বেশী মায়াদানবকে অল-দল ভেড়ার মাংস দিয়ে ভূরিভোজন করালো।

—খেলে তো মাসী, কীসের মাংস আমরা খাই তা নিজেই বুঝতে পারলে? তোমার তো ধারণা আমরা নরমাংস ছাড়া আহার করি না। ছি ছি, এত নীচ তোমাদের ধারণা!

মাসী বললো, আমি না হয় বুঝলাম, বাছা। কিন্তু কত লোকে কত কী বলে যাচ্ছে তোর বাবার কাছে। একবার তিনি এসে চক্ষে দেখে গেলে ভাল হতো।

—বেশ তো মাসী, বাবাকে একবার আসতে বল না আমার বাড়িতে। তার প্রাণাধিক কন্যা কি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে কাটাচ্ছে নিজের চোখেই তিনি দেখে যান।

মাসী বললো, বেশ তাই বলবো, এখন চলি বাছা।

একটু পরে মায়াদানব আবার মানুষরূপ ধরে একটা ভেড়া কাঁধে করে ঘরে

ফিরে আসে। সব শুনে বলে, আমার বরাতটাই খারাপ, একটুর জন্য মাসীর সঙ্গে দেখা হলো না।

কয়েকদিন পরে সে দল-অল-এর পিতা সুলতানের রূপ ধরে এসে উপস্থিত হলো। বাবাকে পেয়ে কন্যা আকুল হয়ে ছুটে গেল। সুলতানরূপী মায়াদানব দল-অলকে আদর করে সাশ্রুনয়নে বললেন, মা, এই তোর ভাগ্যে ছিল! শেষে আমি তোকে একটা মায়াবী দানবের হাতে তুলে দিলাম।

বাবার চোখের জল দেখে সব গোলমাল হয়ে গেল দল-অল-এর! ফিসফিস করে বললো, চুপ, বাবা, আস্তে। হয়তো সে এখুনি এসে পড়বে। জান বাবা, সে সত্যিই কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলে নয়। দানবই বটে। প্রথম প্রথম সে আমাকে নরমাংস খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করেছিল। আমি খেতে অস্বীকার করায় সে অবশ্য আমাকে জোর-জুলুম করেনি। তারপর থেকে রোজ একটা করে ভেড়া নিয়ে আসে সে আমার জন্য। কিন্তু নিজে খায় মানুষের মাংস। আমার ভয় হয় বাবা, একদিন না সে আমাকে মেরে খেয়ে ফেলে!

দল-অল-এর শেষ কথাটা তার মুখেই রয়ে গেল, মায়াদানব তার ভয়াল ভয়ঙ্কর দানবের রূপ ধারণ করে দাঁতমুখ খিচিয়ে তেড়ে এল। বলা বাহুল্য আতঙ্কে শিউরে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল দল-অল।

—হুম্, এবার বুঝেছি, তুমি আমার নামে কি রকম নিন্দে করেছ তাদের কাছে।

দল-অলকে এক হাত দিয়ে তুলে আবার ছুঁড়ে দিল সে।

—আমাকে বাঁচাও, প্রাণে মেরো না। কসম খাচ্ছি, আর কক্ষণো কাউকে বলবো না।

—তোমাকে আর বিশ্বাস করি না। তোমার যখন ধারণাই হয়েছে কোন্‌দিন তোমাকেই আমি খেয়ে ফেলবো, সে ধারণা আমি মিথ্যে হতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে খাব? কিন্তু বল, কোন্‌দিক থেকে শুরু করবো?

দল-অল আর্তনাদ করে ওঠে, এই আমার নিয়তি। এইভাবে তোমার হাতে আমাকে মরতে হবে, আমি তা ঠেকাবো কেমন করে। ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছে, খেও, আমাকে। কিন্তু আজ আমার শরীর নোংরা হয়ে আছে। এই অবস্থায় আমার দেহের মাংস খেতে তোমার আস্বাদ লাগবে না। আমাকে হামামে নিয়ে চল, আগে আমি ঘষে মেজে গোসল করে সাফ হয়ে উঠি তারপর আমি নিজে থেকেই তোমার খাবার টেবিলে বসবো। তখন তুমি আমার শরীরের যেখান থেকে শুরু করতে ইচ্ছে কর, করো; তখন তোমার রুচিও হবে, খেতেও ভাল লাগবে আমাকে।

দল-অলের কথা মায়াদানবের মনে ধরলো। বললো, ঠিক আছে তাই হবে। তৎক্ষণাৎ সে স্নানের কাপড়-চোপড় এবং একটা বড় সোনার গামলা সঙ্গে নিয়ে তার একটা অনুচর ভৃত্যকে যাদুবলে গাধায় রূপান্তরিত করে এবং নিজে একটা রাখাল বালকের রূপ ধরে দল-অলকে ঐ গাধার পিঠে চাপিয়ে গ্রামান্তরে এক হামামের উদ্দেশে রওনা হলো।

কিছুক্ষণ পরে সে হামামের কাছে এসে পৌছলো। হামামের নারী-প্রহরীর হাতে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে মায়াদানব বললো, শোনও মেয়ে, ইনি হচ্ছেন এক শাহজাদী। একে অন্দরে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল করে শাহী কেতায় গোসল করিয়ে তারপর আমায় কাছে দিয়ে যাবে, কেমন ?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ওকে দামী আতর-পানীতে গোসল করিয়ে দিচ্ছি। আপনি এই দরজার পাশে বসুন।

এই বলে দ্বার-রক্ষিণী দল-অলকে নিয়ে হামামের ভিতরে চলে গেল।

হামামঘরের বৈঠকখানায় অপেক্ষমান অন্য মেয়েদের পাশে দল-অলকে বসিয়ে দ্বার-রক্ষিণী চলে গেল। একে একে অন্য মেয়েরা স্নানের ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু দল-অল আর ওঠে না। বিষণ্ণ বদনে বসে সে নিজের নসীবের কথা ভাবতে থাকে। আর একটু বাদেই সে মায়াদানবের পেটে চলে যাবে! উফ্ ভাবতেও কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর ? চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

একদল মেয়ে হাসিতে উচ্ছল হয়ে হামামে ঢোকে। দল-অলকে কাঁদতে দেখে ওরা বলে, সে কি কাঁদছো কেন গো ? গোসল করবে তো ? চলো, আমাদের সঙ্গে চলো, একসঙ্গে মজা করে গোসল করা যাবে।

দল-অল ঘাড় নাড়ে, না ভাই তোমরা যাও। আমি আর গোসল করে কী করবো ? এ জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ আমার শেষ হয়ে গেছে।

মেয়েগুলো আর ওকে ঘাঁটালো না। হামামের ভিতরে ঢুকে গেল।

একটু পরে এক বুড়ি মাথায় একটা চুপড়ি নিয়ে প্রবেশ করলো। এই হামামে সে নিত্য চিনেবাদাম ও পানিফল বিক্রি করতে আসে। যারা এখানে গোসল করতে আসে তাদের কাছে বিক্রি করে এক আধলা পায়। তাই দিয়ে সে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। বুড়িটার নিজের কোনও গৃহ নাই। সারাদিন ফিরি করার পর এই হামামেরই এক কোণে সে পড়ে থেকে রাত কাটায়।

বুড়িটাকে ইশারায় কাছে ডাকে দল-অল। বলে, হ্যাঁগো বুড়িমা, আমাকে খানিকটা চিনেবাদাম দাও তো।

বুড়ি একটা ঠোঙায় চিনেবাদাম ভরে দল-অল-এর হাতে দেয়।

—কত দাম ?

বুড়ি বলে আধ দিরহাম, মা।

নিজের গলার মূল্যবান জড়োয়ার হারটা খুলে সে বুড়ির হাতে দেয়, এটা রাখ, তোমার বালবাচ্চারা সুখে থাকবে।

বুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দল-অল-এর দিকে। দল-অল বলে, আচ্ছা বুড়ি মা, তোমার এই ঝুড়ি আর পরনের সাজপোশাকগুলো আমায় দিতে পার ? যদি দাও তবে তোমাকে এই সোনার গামলাটা এবং আমার গায়ে যত গহনা আছে সব দেব।

বুড়ি এবার রেগে ওঠে। গরীব বলে কি আমি মানুষ নই মা ? এইভাবে তামাশা অপমান করবে ?

দল-অল বলে, সত্যি, বিশ্বাস কর বুড়ি মা, আমি তোমার সঙ্গে একবিন্দু রঙ্গতামাশা করছি না। যদি সত্যি সত্যিই তোমার সাজপোশাক আর ঐ ঝুড়িটা আমাকে দাও, আমি কথা দিচ্ছি, আমার বলতে এখানে যা আছে সব তোমাকে দেব।

বুড়ি তার ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় ছেড়ে দিল। দল-অল সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে মূল্যবান সাজপোশাক খুলে দিল বুড়িকে। বুড়ির ময়লা ছেঁড়া সাজপোশাক এবং বোরখা পরে চিনেবাদাম আর পানি-ফলের ঝুড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে গুটি গুটি সদরের দিকে এগিয়ে গেল অল-দল।

হামামের দরজার পাশে বসেছিল রাখাল-বেশী মায়াদানব। দরজা পার হয়েই অল-দল হাঁক শুরু করলো, চিনেবাদাম পানিফল নেবে গো—

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। মায়াদানব দ্বার-রক্ষিণীকে তাগাদা দিল, কই গো মেয়ে, আমার মালকিন এখনও বেরুচ্ছে না কেন? যাও না একবার দেখে এস।

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুমি বাপু অত অধৈর্য হচ্ছো কেন? একি যেমন তেমন গোসল নাকি। পুরো বাদশাহী কেতায় আতর গোলাপ-পানিতে নাহাতে হবে। তারপর পরিপাটি করে সাজপোশাক পরাতে হবে। গায়ে খুশবু ছড়াতে হবে, সময় লাগবে না?

মায়াদানব ঘাড় নেড়ে বলে, তা বটে, তা বটে।

রাত ঘনিয়ে আসে। এবার দ্বাররক্ষী হামামের সদর বন্ধ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মায়াদানব রুখে দাঁড়ায়, এ্যাই, এটা কি হচ্ছে? আমার মালকিন রয়ে গেল অন্দরে, আর তুমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ যে?

মেয়েটি বলে, সে কি! হামামের ভিতরে তো কোনও খদ্দের নাই। সবাই গোসল করে চলে গেছে। শুধু মাত্র এক ফিরিওলি বুড়ি শুয়ে আছে এক কোণে। তা সে তো রোজই এখানে রাত কাটায়।

মায়াদানব এবার লাফিয়ে এসে মেয়েটির টুঁটি চেপে ধরে, তোমার ওসব বুজরুকী আমি শুনতে চাই না। আমার মালকিনকে বের করে দাও। না হলে গলা টিপে শেষ করে দেব?

মেয়েটি প্রাণপণে মায়াদানবের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে চিৎকার তোলে, ওগো কে কোথায় আছ বাঁচাও-বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেললো।

চেঁচামেচি চিৎকারে নিমেষে হাজার লোক জমায়েত হয় সেখানে। মায়াদানব বেগতিক দেখে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

দল-অল ফেরিওলির ছদ্মবেশে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকটা গ্রাম পিছনে ফেলে ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে এক খর-স্রোতা নদীর কূলে এসে দাঁড়ায়।

পথশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। সবুজ ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে অঞ্জলিভরে নদীর জল পান করে সে। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

চলতে চলতে একদিন সে এসে উপস্থিত হয় এক শহরে। সেখানকার সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে প্রহরীকে বলে, আমি এক সুলতান-কন্যা, তোমাদের বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

খবর পেয়ে সুলতান তাঁর পুত্রকে পাঠালেন অতিথিকে স্বাগত জানাতে। শাহজাদা দল-অলের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি-প্রার্থনা করলো।

দল-অল সম্মত হলো। সেইদিনই কাজী-সাক্ষী ডেকে শাদীনামা তৈরি করাল সুলতান।

সারা শহরে প্রাসাদে উৎসবের ধুম পড়ে গেল। বিকেলের দিকে এক শেখ এল সুলতান-সমীপে। তার সঙ্গে ছিল একটা তাগড়াই ভেড়া। সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে সে ভেড়াটা ভেট দিল সুলতানের পুত্রের শাদী উপলক্ষে। বললো, এই ভেড়াটাকে অনেক আদর যত্ন করে লালনপালন করেছি আমি, জাঁহাপনা। আজ শাহজাদার শাদী উপলক্ষে এটা আপনাকে প্রদান করে ধন্য হতে চাই আমি।

সুলতান প্রীত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এই ভেড়ার মাংস বড় উপাদেয় হবে মনে হচ্ছে। কাল সকালে একে জবাই করা হবে।

শেখ বললো, কিন্তু জাঁহাপনা একটা কথা, ভেড়াটাকে আমার বিবি সবসময় হারেমের মধ্যে রেখে পালন করতেন। তাই নারীসঙ্গ ছাড়া সে শান্ত থাকতে পারে না। আমার অনুরোধ, আজকের রাতটা একে আপনার হারেমে বেঁধে রাখবেন। না হলে এ ব্যাটা মহা অশান্তি করে সকলের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে।

সুলতান হারেমের খোজাকে বললেন, আজ রাতটা এই ভেড়াটাকে হারেমে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখবে। কাল সকালে জবাই করা হবে।

অনেক রাতে ভেড়ারূপী মায়াদানবটা তার আসল মূর্তি ধরে দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দল-অল-এর বাসরকক্ষের দিকে ধাবমান হলো। কিন্তু ঐ সময় দল-অলকে পাহারা দিচ্ছিল বেহেস্তের এক জিন। মায়াদানবের উগ্র রূপ দেখে সে বুঝতে পারলো, এই শয়তান রাক্ষসটা নিশ্চয়ই শাহজাদীকে অপহরণ করবে। তৎক্ষণাৎ সে রাক্ষসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুমদাম গোটাকতক কিল ঘুষি বসিয়ে দিতেই সে অক্কা পেয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝের।

পরদিন সকালে সবাই দেখলো, ভেড়াটা বাসরঘরের দরজার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

দল-অল বিপদ মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

এরপর সপ্তম কাপ্তেন এগিয়ে এল তার কাহিনী শোনাতে।

সে বলতে থাকে :

আমি যে জেলায় বাস করতাম সেই জেলায় এক চাষীর বাড়িতে এক রাতে এক আরব দস্যু হানা দিয়েছিল। সে যখন গমের বস্তা ধরে টানাটানি করছিল, তখন গৃহস্বামী জেগে উঠে চোর চোর বলে সোরগোল তুলে পাড়াপড়শীদের জাগিয়ে তুললো। চোরটা এমনভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো যে, আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার টিকি দেখতে পেলাম না। নিরাশ হয়ে চলে যাবো ভাবছি, এমন সময় গমের বস্তার গাদা থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবং সংগে সংগে আমিও ছুটে গেলাম সেইদিকে। দেখলাম একটা লোক বুকের ওপর একটা আড়াই-মণি গমের বস্তা নিয়ে শুয়ে আছে ঘাপটি মেরে।

লোকটিকে টেনে বের করে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার, অমন আওয়াজ করে ধরা দিলে কেন?

লোকটা বললো, আওয়াজ আমি ইচ্ছে করে করিনি, মালিক। গমের বস্তাটা পেটের ওপর এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, পেটের বায়ু সশব্দে বেরিয়ে গেছে।

সপ্তম কাপ্তেন বললো, তারপর চোরটাকে আমি বেদম প্রহার দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

সপ্তম কাপ্তেনের এই অতি ক্ষুদ্র কাহিনী শুনে সুলতান সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি অষ্টম কাপ্তেনকে ডাকলেন।

অষ্টম কাপ্তেন বলতে শুরু করে :

এক বাঁশী-বাদকের বৌ একদা একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। স্বামীটার কোনই সঙ্গতি ছিল না। ধাইকে তার পাওনা-গণ্ডাও দিতে পারলো না। প্রসূতির জন্য পথ্যও সংগ্রহ হলো না।

অগত্যা সে ঘর ছেড়ে পথে বেরুলো ভিক্ষা করতে।

সে মাঠের পথে চলতে চলতে এক সময় লক্ষ্য করলো, একটা খামারবাড়ির খাঁচার ওপর বসে একটা মুরগী আজান দিচ্ছে।

খাঁচার মধ্যে মুরগীর গোটাকয়েক ডিম দেখে সে আর লোভ সামলাতে না পেরে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে টুক করে ডিমগুলো তুলে নিল এক হাতে এবং

অন্য হাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেললো মুরগীটাকে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে সে ভাবলো, যাক, আল্লাহর দোয়ায় আমার বিবিকে মুরগীর ঝোল খাওয়াতে পারবো। আর এই ডিম কটা দিয়ে ধাই-এর ঋণ শোধ করা যাবে।

বাজারে ঢুকে বাঁশী-বাদক এক স্যাকরার দোকানের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ইহুদী জহুরীর ডাকে থমকে দাঁড়ালো সে।

—কি গো বাছা, তোমার হাতে কী?

বাঁশী-বাদক বলে, একটা মুরগী আর কয়েকটা ডিম।

জহুরী জিজ্ঞেস করে, ডিম কটা বেচবে?

—হ্যাঁ।

—কত নেবে?

বাঁশী-বাদক ভাবছে কত চাইবে। ইহুদী আবার বললো, খুব বেশি হলে দশ দিনারের বেশি হওয়া উচিত নয়, কী বল?

এবার বাঁশী-বাদক বুঝতে পারে ইহুদীটা তার সংগে মস্করা করছে। না হলে কয়েকটা ডিমের দাম দশ দিনার বলে কেউ?

—আপনি তো ভালই জানেন জহুরী সাহেব, এই ডিমের ও দাম হতে পারে না। তবু আমার সংগে রসিকতা করছেন কেন? আমি গরীব বলে?

জহুরী ভাবলো, লোকটা বুঝি আরও বেশি কিছু চায়, তাই সে বললো, ঠিক আছে, পনের দিনার নিও?

বাঁশী-বাদক চিৎকার দিয়ে ওঠে। ইয়া আল্লাহ, এ কি মসিব্বতে ফেললে আমাকে।

জহুরী অন্যরূপ ভাবলো। সে বললো, আচ্ছা কুড়ি দিনারই দেব।

বাঁশী-বাদক দেখলো লোকটা রসিকতাই করুক আর যাই করুক, ডিমগুলো সে ছাড়বে না। বাঁশী-বাদক ডিমগুলো ওর সামনে নামিয়ে দিয়ে বললো, কই দামটা দিয়ে দিন।

জহুরী গুণে গুণে কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিল বাঁশী-বাদকের হাতে। টাকাগুলো পকেটে পুরে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো ঘরের দিকে। জহুরী তার পিছনে ছুটতে ছুটতে এসে বললো, হ্যাঁগো, এমন ডিম কি আরও আছে, তোমার ঘরে? যদি থাকে কাল আবার নিয়ে এস। এইরকম দামই দেব।

বাঁশী-বাদক বলে, মুরগীটা যদি পাড়ে তবে কাল সকালে তোমাকে বেচে যাবো।

জহুরী বললো, না না, তোমার আর কষ্ট করে আসার দরকার নাই। তার চেয়ে তোমার বাড়িটা আমাকে চিনিয়ে দাও, কাল থেকে রোজ সকালে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো। আর শোন, এবার থেকে প্রতিটির জন্য কুড়ি দিনার করে দেব।

বাঁশী-বাদক সম্মত হয়ে জহুরীকে বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে বিবির জন্য বাজার থেকে অন্য একটা মুরগী কিনে বাড়ি ফিরলো।

পরদিন সকালে উঠে বাঁশী-বাদক তার বিবিকে বললো, দেখো, ভুলেও যেন কখনও ঐ মুরগীটাকে জবাই করে খেও না। ওর এক একটা ডিম কুড়ি দিনারে বিকাবে। এইভাবে কিছুদিন যদি সে ডিম দেয় তবে দেখে নিও, আমরা আর এইরকম গরীব থাকবো না।

এইসময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো উনপঞ্চাশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

ইহুদী প্রতিদিন সকালে আসে। বাঁশী-বাদক একটা করে ডিম দেয় তাকে। সে খুশি মনে কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা গুণে দিয়ে যায়।

এইভাবে কালক্রমে বাঁশী-বাদকের হাতে বেশ মোটা টাকা জমে ওঠে। একদিন সে বাজারে একটা দোকান কেনে।

এখন আর সে গরীব বাঁশী-বাদক নয়, শহরের বেশ গণ্যমান্য পয়সাওলা সওদাগর। তার পুত্রের পাঠশালা যাওয়ার বয়েস হলো। সে এক অবৈতনিক পাঠশালা খুলে দিল তার বাড়ির পাশে। মাইনে করে মৌলভী রাখলো। পাড়ার অন্য সব গরীব ছেলেদের সঙ্গে তার ছেলেও লেখাপড়া শিখতে থাকলো।

বাঁশী-বাদকের এখন অনেক পয়সা। মক্কায় গিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে আসবে এই বাসনায় সে তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে গেল। যাবার আগে বিবিকে সাবধান করে গেল, জহুরীটা হয়তো তোমাকে অনেক টাকার লোভ দেখাবে। কিন্তু খবরদার, কোনও দামেই মুরগীটা তাকে বেচে দিও না কিন্তু!

পরদিন সকালে ইহুদীটা একটা বাক্স কাঁধে নিয়ে বাঁশী-বাদকের বিবির কাছে এল। বাক্সের ডালা খুলে সে বললো, এই যে বাক্সভর্তি মোহর দেখছো, এগুলো সব তোমাকে দেব, তার বদলে তুমি আমাকে তোমার মুরগীটা বিক্রি করে দাও।

এক বাক্স চকচকে স্বর্ণমুদ্রা দেখে বাঁশী-বাদকের বিবির চোখ নেচে ওঠে। কিন্তু স্বামীর সতর্কবাণী স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যায়। না গো, সে পারবো না। সে যাওয়ার সময় বলে গেছে, আমি যেন তোমাকে শুধু ডিমই বিক্রি করি। মুরগী বেচতে বারণ করে গেছে।

জহুরী বাক্সটা মেঝের উপর উপুড় করে ফেলে দেয়। একরাশ সোনার দিনার। জহুরী বলে, কতগুলো মোহর, একবার তাকিয়ে দেখ। এত টাকা পাওয়া যাবে ঐ একটা মাত্র মুরগীর জন্যে, তা কি তোমার স্বামী ভাবতে পেরেছিল কোনও দিন?

বাঁশী-বাদকের বিবি বলে, ঠিক আছে মুরগীটা তাহলে বেচেই দিচ্ছি তোমাকে। নিয়ে যাও।

ইহুদী বলে, না গো মেয়ে, ও মুরগী আমি নিয়ে যাবো না সঙ্গে করে। তুমি কেটেকুটে আচ্ছা করে বানাও আমার জন্য। আমি একটা কাজে যাচ্ছি ফিরে

এসে খাবো। কিন্তু একটা কথা, আমার মুরগীর একটুকরো মাংসও যেন গাঁড়া মেরো না। যত চালাকী করেই কাট আমি খেতে বসে সব বুঝতে পারবো কোন মাংসটা নাই। আমার মাংসের একটা টুকরো যদি পেটে পুরো তবে আমি পেট চিরে তা বের করে নেব, বলে দিলাম।

বাঁশী-বাদকের বিবি বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মাংস কেউ মুখে দেবে না।

দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফিরে আসে ছেলে। খিদেয় সে চনমন করছিল। রসুইঘরে এসে বলে, মা খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

মা বলে, একটু দাঁড়া বাবা, বানিয়ে দিচ্ছি। এখন তো কিছু তৈরি হয়নি।

ঘরের একপাশে রাখা সদ্য রান্না করা মুরগীটার সুগন্ধ পেয়ে সে বলে, ঐ তো দেখছি মুরগী রেঁধেছ, আমাকে দাও আমি খাব।

—সর্বনাশ! ও মুরগীর দিকে নজর দিসনি। ইহুদী জহুরী এক বাক্স মোহর দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনেছে খাবে বলে। বলে গেছে, একটা টুকরো কম হলে সে ধরে ফেলবে। তুই একটু বস বাবা, আমি এখুনি তোর খানা পাকিয়ে দিচ্ছি।

মা ছেলের খানা বানাতে ব্যস্ত ছিল, এই ফাঁকে ক্ষুধার্ত পুত্র গামলার ঢাকনা খুলে মুরগীর একটা টুকরো তুলে মুখে পুরে দেয় অলক্ষ্যে।

জিভে স্বাদ লাগে, আরও একটুকরো তুলে নেয় সে মায়ের অজান্তে। এই ভাবে এক এক করে পুরো মুরগীটাই সাবাড় করে ফেলে সে।

হঠাৎ মায়ের নজর পড়ে শূন্য গামলার দিকে। সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। এ কি করলি বাবা? লোকটা বিধর্মী, ধূর্ত ইহুদী। আমার সঙ্গে শর্ত হয়েছে, তার মাংস কেউ খেলে তার পেট চিরে সে বের করে নিবে সেই মাংস। এখন কী উপায় হবে বাবা?

ছেলেটি বলে, আমি সটকে পড়লাম। ইহুদীটা এলে বলো, আমি চুরি করে খেয়ে পালিয়েছি। তারপর দেখা যাবে সে ব্যাটা কেমন কাপ্তেন।

যথাসময়ে ইহুদীটা এসে বললো, কই আমার মাংস দাও।

বাঁশী-বাদকের বৌ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলে, খোদা হাফেজ, আপনার জন্য মাংসটা বানিয়ে আমি ঢেকে রেখেছিলাম যত্ন করে। কিন্তু, কি বলবো, আমার ছেলেটা মাদ্রাসা থেকে ফিরে আমাকে না বলেই সবটা খেয়ে ফেলেছে।

ইহুদী হুঙ্কার ছাড়ে, কোথায় সে? আমি তার পেট চিরে বের করবো আমার হকের মাংস। একি মাগুনা চাইছি নাকি? নগদ এক বাক্স সোনার মোহর দিয়েছি তোমাকে ঐ একটা মুরগীর জন্য। তোমার সঙ্গে আমার যা ওয়াদা তা পূরণ করতেই হবে তোমাকে।

বৌটা বলে, কিন্তু ছেলে তো ঘর ছেড়ে পালিয়েছে!

কোথায় পালাবে? আমি তাকে ধরবোই।

এই বলে উন্মত্তের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

শহর ছেড়ে প্রান্তর, প্রান্তর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে আবার প্রান্তর গ্রামে

অনুসন্ধান করে বেড়াতে লাগলো ইহুদী। অবশেষে এক বাগানের মধ্যে দেখতে পেল ছেলেটিকে। কাছে এসে বললো, তুমি আমার মুরগী খেয়েছ, তোমার পেট চিরে আমি ঐ মাংস বের করবো।

এই বলে ছুরিটা বাগিয়ে ধরলো সে ছেলেটির পেটের দিকে। কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে ইহুদীর হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্রখানা। বললো, তোমার লজ্জা করে না? একটা তুচ্ছ মুরগীর মাংসের জন্য তুমি আমার পেট চিরতে এসেছ? যাও, এখান থেকে। না হলে তোমার ঐ ছুরি তোমারই বুকে বসে যাবে।

ইহুদী কিন্তু তখন ক্রোধে হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেটির ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা ঘটা সম্ভব তাই ঘটে গেল পলকে।

ছেলেটির হাতের ছুরি বিদীর্ণ করে দিল ইহুদীর বুক। প্রাণ-হীন দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

এরপর ছেলেটি বাড়ি ফেরার জন্য ছুটতে লাগলো। কিন্তু পথ ভুলে সে বাড়ির বদলে এসে পেঁছিলো এক সুলতানের প্রাসাদ-ফটকে। সেখানে সশস্ত্র প্রহরীরা দামামা পিটিয়ে ঘোষণা করছিল, তামাম দুনিয়ার জাঁদরেল নওজোয়ানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেন শাহজাদী। যদি কারো তেমন তাগদ থাকে তবে তিনি এগিয়ে আসতে পারেন। শাহজাদীকে যিনি পরাস্ত করতে পারবেন তার গলাতেই মালা দেবেন তিনি। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, যদি লড়াই-এ পরাজয় ঘটে, তবে কোতল হতে হবে তাকে।

ছেলেটি সুলতানের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি আপনার কন্যার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, জাঁহাপনা।

সুলতান বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে বাছা! আমার কন্যা অপরাজেয়। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হারাতে পারেনি। কতশত শাহজাদার প্রাণবলি হয়েছে, এ পর্যন্ত তা কি তুমি জান?

ছেলেটি বলে, ওসব জেনে আমার লাভ নাই। আমি তার সঙ্গে লড়তে এসেছি। তাকে হারিয়ে আমি শাদী করবোই। আর আমি যদি হারি, তবে তো আপনি আমার গর্দান নেবেন, তাও আমার অজানা নয়।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তা হলে এই চুক্তিনামায় সই কর। চুক্তির শর্ত সব এতে পরিষ্কার করে লেখা আছে।

কুস্তির লড়াই শুরু হলো।

দরবার-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে গালিচা বিছানো হলো। ছেলে আর মেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো।

এরপর দুজনে দুজনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে প্রবল বিক্রমে একে অন্যকে কাবু করার কসরৎ ভাঁজতে থাকলো।

সে-এক অভূতপূর্ব মল্লযুদ্ধের দৃশ্য। একবার ছেলেটি মেয়েটিকে চ্যাং দোলা করে তুলে আছাড় মারতে উদ্যত হয়। আবার কখনও বা মেয়েটি সাপিনীর

মতো আশেপাশে জড়িয়ে ধরে ছেলেটিকে।

এইভাবে একটানা দু'ঘণ্টা চলতে থাকে ওদের লড়াই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই কাউকে গালিচায় ফেলে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন, তাঁর কন্যা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করতে পারছে না কিছুতেই। চিৎকার করে ওঠেন তিনি, থাক থাক খুব হয়েছে, আজ থাম তোমরা। কাল আবার দেখা যাবে।

সুলতান তাঁর কক্ষে চলে গেলেন এবং সেরা হাকিমকে তলব করলেন।

—শোনও হাকিম, আজ রাতে ঐ ছেলেটিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে ওর সর্বাঙ্গ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। আমি বুঝতেই পারছি না, যে কন্যাকে এর আগে উনচল্লিশ জন জাঁদরেল জোয়ান ছেলে কাবু করতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছে, তাকে কি করে এই ছেলেটা আজ সামাল দিতে পারলো? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই সে এমন কোন বস্তু অঙ্গে ধারণ করেছে, যার অমিত বিক্রমকে পরাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না আমার কন্যার পক্ষে। তুমি আজ রাতে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ ছেলেটিকে। তার দেহাভ্যন্তরে নিশ্চয় কোনও অলৌকিক বস্তু লুকানো আছে। সন্ধান করে আজ রাতেই তা বের করে ফেলতে হবে তার শরীর থেকে। এ কাজ যদি যথাযথ সমাধা করতে পার যথাযোগ্য ইনাম পাবে তুমি। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, তা হলে তোমার মুন্ডুহীন ধড়খানা কুকুর দিয়ে খাওয়াবো আমি।

সুতরাং রাত্রি গভীর হলে হাকিম নিদ্রিত ছেলেটির পাশে এসে কড়া-জাতের একটা ওষুধ ওর নাকের সামনে ধরলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি অসাড় হয়ে এলিয়ে পড়লো বিছানায়। হাকিম পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো, ছেলেটির পেটে একপ্রকার মুরগীর মাংস আছে। এবং ঐ মুরগীর মাংসের বলেই সে মহা বলবান হতে পেরেছে।

নিপুণ হাতে পেটে ছুরি বসিয়ে ঐ মুরগীর মাংসখন্ডগুলি এক এক করে সব বের করে দিল হাকিম। তারপর সুক্ষ্মভাবে সেলাই করে ওষুধ লাগিয়ে দিল। সে ওষুধের এমন গুণ কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে নিখুঁতভাবে জোড়া লেগে যায় কাটা চামড়া। এরপর নাকে ভিনিগার ঘষে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই ছেলেটি বুঝতে পারলো তার দেহের অসাধারণ শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। তখন সে বেশ বুঝতে পারলো, গতকাল তার দেহে অমিত বিক্রম এসেছিল ঐ মুরগীর মাংস ভক্ষণের জন্য। পেটে হাত বুলিয়ে সে শিউরে উঠলো। না, আজ তো তার পেট প্রায় খালি। এই অবস্থায়, কোন্ সাহসে সে ঐ শাহজাদীর সঙ্গে কুস্তি লড়ার দুঃসাহস করবে।

প্রাসাদ ছেড়ে সে পালালো সেই মুহূর্তে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একসময় সে এসে থামলো বিবদমান তিন বন্ধুর এক আড্ডায়। ওরা ভীষণ রকম চেঁচামেচি করে ঝগড়া-ঝাটিতে মত্ত হয়ে উঠেছে।

—কী ব্যাপার, কেন তোমরা এমন ঝগড়া করছো ? কিসের এত গোল ?

ছেলেটির প্রশ্নের জবাবে ওরা বললো, একটা জিনিস নিয়ে।

—কী এমন বস্তু ?

একজন বললো, এই গালিচাটা। এটা যাদুমন্ত্র করা। এই গালিচায় চেপে তুড়ি বাজিয়ে তুমি যেখানে যেতে ইচ্ছে কর যেতে পারবে। তা সে কাফ পর্ব্বতমালার উত্তুঙ্গ চূড়াতেই হোক না কেন, নিমেষে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেবে।

ছেলেটি বললো, এই মূল্যবান বস্তুখানি নিয়ে টানাটানি না করে এসো আমি তোমাদের বিরোধের একটা সুসঙ্গত সমাধান করে দিই।

ওরা বললো, ঠিক আছে, আমরা রাজি। তুমিই এর মীমাংসা করে দাও।

ছেলেটি বললো, আগে গালিচাখানা মাটিতে বিছাও। আমি দেখি কতটা লম্বা, কতটা চওড়া।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরাধরি করে গালিচাখানা বিছিয়ে দিল সামনে। এবার ছেলেটি ছোট্ট একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ঐ গালিচার ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো শোন, আমি এক দুই তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে এই ঢিলটা ছুঁড়ে দেব। তোমাদের মধ্যে যে আগে ছুটে গিয়ে এটা কুড়িয়ে আনতে পারবে সেই এই গালিচার মালিক হবে। কী, রাজি সবাই ?

তিনজনেই সমস্বরে লাফিয়ে উঠলো, রাজি, আমরা রাজি।

ছেলেটি এক দুই তিনগোণা মাত্র প্রাণপণে জোরে ঢিলটা ছুঁড়ে দিল অনেক দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ছুটে গেল ওরা তিনজন। আর সেই ফাঁকে ছেলেটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে বললো, ওহে গালিচা, যেখান থেকে আজ সকালে আমি পালিয়ে এসেছি এবার আমাকে ঐ প্রাসাদের সেই কক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

ছেলেটির মুখের বাক্য শেষ হতে না হতে শোঁ শোঁ করে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেল গালিচাখানা, তারপর বায়ুবেগে উড়ে চলতে থাকলো।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছেলেটি দেখলো গালিচাখানা এসে নামছে সেই প্রাসাদের দরবার-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে—গতকাল যেখানে সে শাহজাদীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মেতেছিল।

ছেলেটি বুকে চাপড় মেরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালো, কই, কে কোথায় আছ, লড়বে এস আমার সঙ্গে। আমি এবার এক প্যাঁচে কাত করে দেব।

শাহজাদী এই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না। তাকে পরাজিত করে যাবে এমন লড়াকু জোয়ান সে আজও দেখেনি।

গালিচার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি, ছেলেটির একেবারে মুখোমুখি। এই সময় ছেলেটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে বললো, সোজা নিয়ে চল কাফের চূড়ায়।

মুখের কথা শেষ হতে না হতে গালিচাখানা উপরে উঠে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। সুলতান তথা উপস্থিত হাজার দর্শক হতবাক নির্বোধের মতো

দাঁড়িয়ে রইলো শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে।

পলকে কাফের চূড়ায় এসে নামলো ওরা। ছেলেটি প্রশ্ন করলো, এবার কে জিতলো, সুন্দরী? তোমরা কায়দা করে আমার পেট থেকে মুরগীর মাংসগুলো বের করে নিয়ে অসদুপায়ে নির্জীব করার জঘন্য কৌশল তো করেছিলে! এবার আমিও শঠে শাঠ্যং করেছি। কুস্তির লড়াই করবো বলে ছল করে তোমাকে এই গালিচায় দাঁড় করিয়ে লোপাট করে এনেছি। এখন বল, তোমাদের ফন্দীর তুলনায় আমার চাতুরী কতটা বেশি দোষের?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো পঞ্চাশতম রজনী:

পরদিন আবার সে বলতে থাকে:

মেয়েটি মিনতি জানিয়ে বললো, যা হয়ে গেছে সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর তুমি। এখন আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করছি। যদি মেহেরবানী করে আমাকে আমার বাবার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, কথা দিচ্ছি, আমার বাবাকে দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দেব, তুমিই হবে আমার একমাত্র স্বামী।

ছেলেটি বললো, সে তো অতি উত্তম কথা। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে জানতো, লোহা যখন তেতে লাল হয়ে থাকে তখনই তাকে পিটিয়ে প্রয়োজন মতো আকারের জিনিস বানাতে পারা যায়। সুতরাং এস এই মুহূর্তেই তোমার কুমারীত্ব আমার হাতে খতম হয়ে যাক।

মেয়েটি বললো, বেশ তাই হোক।

মেয়েটিকে গালিচার ওপর চিৎ করে শোয়ালে সে। তারপর যথাকর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কটিদেশ স্থাপন করার পূর্বে মেয়েটি প্রচণ্ড জোরে ছেলেটির তলপেটে একটা লাথি বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়লো সে। আর সেই মওকায় মেয়েটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে গালিচাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাকে আমার প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

পলকে গালিচা উড়ে চলে গেল। ছেলেটি একা পড়ে রইলো, সেই নির্জন কাফ পর্বত-চূড়ায়।

পাহাড়ের শিখরে অসংখ্য গাছপালা। সবই অজানা অচেনা। কত গাছে কত রকমের বিচিত্র সব ফুল ফল। কিন্তু ছেলেটির কিছুই ভাল লাগে না। সে ভাবে এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-চূড়া থেকে কীভাবে কতদিনে সে মাটির সমতলে নামতে সক্ষম হবে।

দুটি দিন অনাহারেই কেটে গেল। গাছে গাছে অনেক ফল, কিন্তু ভরসা করে খেতে পারে না। কে জানে সে সব ফল খাদ্য কি অখাদ্য।

কিন্তু খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। আর সহ্য করা যায় না, যাই ঘটুক, ঐ

গাছের ফল সে খাবেই। যদি সে ফলের বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে, তবু তাকে খেতে হবে।

হলুদ আর লাল রঙের দুই রকমের ফল দেখতে পেল সে পাশাপাশি দুটি গাছে। একটা হলুদে বর্ণের ফল ছিঁড়ে নিয়ে কামড় বসাতেই সারা শরীর রি রি করে উঠলো মুহূর্তে। ছেলেটি দিশাহারা হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ফলটি। কিন্তু ততক্ষণে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো তার মাথা দিয়ে শিং গজাচ্ছে। এবং একটা দুটো নয়, ষোলটা।

তখন শিংগুলো বড় হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করে তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেক শিং থেকে অসংখ্য ডালপালা গজিয়ে সে এক বীভৎস আকার ধারণ করলো।

মৃত্যু অবধারিত জেনে মরিয়া হয়ে সে একটা লাল ফল ছিঁড়ে নিয়ে কামড় দিল। আর কি. এক আশ্চর্য অলৌকিক মন্ত্রবলের ন্যায় মুহূর্তে শিংগুলো আবাব মাথার মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ছেলের মাথায় ফন্দী খেলে গেল। দুই পকেটে হলুদ আর লাল ফলে ভরে নিয়ে পায়ে পায়ে সে নিচের দিকে নামতে থাকলো।

পাহাড়ের দুর্গম উতরাই পথ। একটু পা হড়কালে হাজার হাজার হাত নিচে গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে। যাই হোক আল্লাহর দোয়ায় অবশেষে একদিন সে সুস্থ দেহে সমতল মাটিতে নামতে পারলো।

তারপর পায়ে হেঁটে প্রায় মাসাধিক কাল পরে একদিন সে ঐ সুলতানের প্রাসাদ-সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো।

হলুদ ফলগুলো একটা চুপড়িতে নিয়ে ফিরিওলার বেশ ধরে সে প্রাসাদের সামনে দিয়ে হাঁক দিতে দিতে চলতে লাগল ঃ ফল নিবে গো, বহুত মজাদার পাহাড়ী ফল। একবার খেলে বার বার খেতে হবে। এ ফল যে খাবে সেও পস্তাবে, যে না খাবে সেও পস্তাবে। ফল নেবে গো, বড় আজব পাহাড়ী মিষ্টি ফল—

শাহজাদী জানলার পাশে বসে লোকজনদের পথচলা দেখছিল। ফেরিওলার মাথায় অদ্ভুত ধরনের ঐ ফল দেখে সে খোজা বান্দাকে বললো, যা তো কিছু ফল কিনে নিয়ে আয়।

খোজাটা ছেলেটার কাছ থেকে গোটাকয়েক হলুদ ফল কিনে এনে শাহজাদীর হাতে দিল।

—বাঃ কি সুন্দর দেখতে—

এই বলে একটা ফলে কামড় বসাতেই শাহজাদীর সারা শরীর রি রি করে ওঠে। সংগে সংগে মাথার চারপাশ দিয়ে ষোলটা শিং ফুঁড়ে বেরুতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে শিংগুলো বাড়তে বাড়তে বিশাল প্রাসাদকক্ষ ভরে গেল। অসংখ্য ডালপালা বেরিয়ে এক ভয়ংকর আকার ধারণ করলো ক্রমশঃ।

সারা প্রাসাদে হৈ চৈ পড়ে গেল। হাকিমকে ডেকে আনা হলো। কিন্তু অনেক ভাবে পরীক্ষা করেও সে ব্যাধির কারণ বুঝতে পারলো না।

তখন সুলতান সারা দেশে ঢাঁড়া পিটে ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর কন্যার ব্যাধি যে সারিয়ে দিতে পারবে তার সঙ্গে তার শাদী দিয়ে দেবেন তিনি।

এই মওকাতেই দিন গুনছিল ছেলেটি। সুলতানের সামনে এসে জানালো, শাহজাদীর অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে সে।

লাল ফলের একটা ছোট্ট টুকরো সে শাহজাদীর ঠোঁটে ঘঁষে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার বহু শাখা-বিস্তৃত শিংগুলি সুড়সুড় করে মাথার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সুলতান বিশ্বাস করলেন, এই ছেলের দ্বারাই তাঁর কন্যার রোগ নিরাময় হতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, এরই সঙ্গে শাহজাদীর শাদী হবে।

কাজী ও সাক্ষীকে ডাকা হলো। শাদীনামা তৈরি করে দিলেন তারা। সেই দিনই শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

সুলতান জামাতাকে সাদর স্বাগত জানালেন। দেশবাসী আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে উঠলো।

বাসরঘরে ছেলেটি শাহজাদীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, তা হলে শেষ পর্যন্ত কার জিত হলো শাহজাদী ?

শাহজাদী চোখ মেলে দেখলো, সেই ছেলেটি, যাকে কুস্তিতে হারাবার জন্য তার পেট চিরে মুরগীর মাংস বের করা হয়েছিল, যাকে সে একদা অত্যুচ্চ কাফ পর্বতচূড়ার একা ফেলে যাদু-গালিচায় চেপে উড়ে পালিয়ে এসেছিল।

লজ্জায় সে ছেলেটির বুকে মুখ লুকিয়ে ফেললো।

এরপর নবম কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করে :

একটা বাঁজা মেয়ের কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা। মেয়েটির যৌবন ছিল ডগমগে। স্বামী-সহবাসও সে নিত্যই করতো। কিন্তু হায়রে কপাল! একটা সন্তানও সে পেটে ধরতে পারলো না।

মেয়েটি এতকাল আল্লাহর কাছেই পুত্র-সন্তানই কামনা করে এসেছে, কিন্তু তাতে তিনি সদয় হলেন না দেখে এবার সে নিদেনপক্ষে একটি কন্যাই প্রার্থনা করলো।

খোদা এবার প্রসন্ন হলেন। যথাসময়ে একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যা-সন্তান প্রসব করলো সে।

আদর করে মেয়ের নাম রাখলো সে সিত্তুখান।

যখন তার দশ বছর বয়স, সেই সময় একদিন সে তার ঘরের জানলার পাশে বসেছিল। এমন সময় সুলতান-পুত্র সেই পথ অতিক্রম করার সময় তার নজর গিয়ে পড়লো সিত্তুখানের ওপর। এবং প্রথম দর্শনেই যাকে বলে মূর্চ্ছা —প্রায় সেই দশা হলো শাহজাদার।

অনেক হাকিম বদ্যি এল। অনেক দাওয়াই কবচ দিল তারা। কিন্তু শাহজাদার অসুখ আর সারে না।

অবশেষে একদিন এক বৃদ্ধা এসে শাহজাদাকে পরীক্ষা করে বললো, এ তো কোন বিমার নয়। হয় আপনি কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। নয়তো কোনও মেয়ে আপনাকে গভীরভাবে প্রেম-নিবেদন করেছে।

শাহজাদা বললো, আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে মজে গেছি। কিন্তু কে সে? আমি তো তাকে চিনি না, জানি না, তার কী নাম? পার তুমি? পার তুমি তার পরিচয় জেনে দিতে?

বৃদ্ধা মৃদু হেসে বললো, আমি সেইজন্যেই এসেছি আজ। তার নাম সিত্তুখান, দশ বছরের চাঁদের মতো সুন্দর একটি মেয়ে—জানলার ধারে সে বসেছিল। আপনার চোখে ওর চোখ পড়ে গিয়েছিল! কী, তাই না?

শাহজাদা বৃদ্ধার হাত চেপে ধরে, তুমি ঠিকই ধরেছ, বুড়িমা। ঐ সেই মেয়ে। ওকে দেখামাত্র আমি পাগল হয়ে উঠেছি। উঃ, কী যে যন্ত্রণা এই বুকে, কী করে তোমাকে বোঝাবো।

বৃদ্ধা বললো, শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন বেটা। তার সঙ্গে যাতে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

এই বলে সে সেদিনের মতো শাহজাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সটান চলে এল সিত্তুখানের বাড়িতে।

—সুখবর আছে মা, তোমার মতো ভাগ্যবতী আর কে? স্বয়ং সুলতানের ছেলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমাকে না দেখতে পেলে সে আর বাঁচবে না।

সিত্তুখান বলে, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে বুড়িমা? সে বাদশাহর ছেলে, আর আমি এক গরীবের মেয়ে?

বুড়ি বলে, সে ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি এক কাজ কর, তাঁতীর বাড়ি গিয়ে শনের কাজ শেখো।

সিত্তুখান মা-এর কাছে গিয়ে বায়না ধরে, মা আমি শনের তাঁত বোনা শিখবো। ও-পাড়ার তাঁতী-বৌর কাছে বলে তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

মা বলে ওসবের দরকার নাই মা। শনের গন্ধ নাকে গেলে তুই সহ্য করতে পারবি না—সে বড় কঠিন কাজ।

মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা। বলে, না, আমার কিছু হবে না। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

অগত্যা বাধ্য হয়ে মেয়ের জন্য মা তাঁতীর বাড়ি যায়।

পরদিন থেকে সিত্তুখান তাঁতে কাজ শিখতে থাকে। কিন্তু দিন দুই পরে

মাকু চালাতে চালাতে হঠাৎ এক সময় শনের ধারালো সুতো বিঁধে যায় সিত্তুখানের নখের ভিতরে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে আসে সিত্তুখানের। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। হাকিম বলে যায়, মেয়েকে নদীর মুক্ত বাতাসে রাখতে পারলে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

সিত্তুখানের বাবা একটা বজরা ভাড়া করে মেয়েকে নদীর নির্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করে।

এদিকে ঐ বৃদ্ধা শাহজাদাকে গিয়ে খবর দেয়, আপনার ভালবাসাকে দেখার এক চমৎকার সুযোগ এসেছে। সিত্তুখান এখন নদীর কিনারে এক বজরায় বাস করছে।

সেইদিনই বিকালে শাহজাদা উপস্থিত হলো নদীর ঘাটে। বৃদ্ধা আগে থেকেই হাজির ছিল সেখানে।

সিত্তুখান দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত জানায় শাহজাদাকে। শাহজাদা সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে না।

আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দুজনে দুজনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে।

এইভাবে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। বৃদ্ধা বলে আজ রাত হলো। এখন আপনি প্রাসাদে ফিরে যান শাহজাদা। কাল আবার আসবেন।

পরদিনও এল শাহজাদা। তার পরদিনও।

প্রেমের বন্যায় দুকূল ছাপিয়ে যেতে চায় দুজনের। জীবনে এত ভালবাসা থাকতে পারে, এর আগে কেউই অনুভব করতে পারেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে সিত্তুখানের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে শাহজাদা বলে, আমার বোধহয় আর আসা হবে না তোমার কাছে।

—কেন, কেন?

মেয়েটি শঙ্কিত হয়ে আবার জড়িয়ে ধরে শাহজাদাকে।

—আমি সুলতানের ছেলে, তুমি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। তোমার সঙ্গে আমার এই মাখামাখি আমার মা বাবা উজির আমির কেউই ভাল চোখে দেখছেন না।

সিত্তুখান কেঁদে আকুল হয়, তা হলে? তা হলে কী করে আমি বাঁচবো?

ছেলেটিও কেঁদে সারা হয়। আমারও তো সেই কথা সিত্তু? তুমি ছাড়া তামাম দুনিয়া আমার কাছে অন্ধকার হয়ে আসবে।

পরদিন শাহজাদা আর এল না। তারপর দিনও না। সিত্তুর বিরহে গাছের পাখিরা কাঁদে। ফুল শুকিয়ে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে।

বিকেল হলেই সিত্তু বজরা ছেড়ে নেমে নদীর ঘাটের পাশে শ্যামল দুর্বাদল-শয্যায় লুটিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু পড়ে থাকাই সার হয়। বৃথা চোখের জল চোখে শুকিয়ে যায়, সে আর আসে না।

একদিন বিকেলে সিত্তুখান ঘাসের শয্যায় শুয়ে বিরহের গান গাইছিল।

হঠাৎ তার নজর পড়লো, অদূরে ঘাসের ওপর পড়ে আছে একটা পাথর-বসানো আংটি! বেশ চকচক করছিল।

আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে সিত্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। অতি সাধারণ ধাতুর তৈরি। কানাকড়িও দাম হবে না। কিন্তু পাথরটা বড় চমৎকার। ঘোরাতে ফিরাতেই তারার আলোর ঝিলিক হানে। বাঁ হাতের মধ্যমাতে পরে নিল সিত্তু। ডান হাতের তালুতে একটু ঘষে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার সামনে এসে উপস্থিত হলো এক বিশালকায় দৈত্য। আভূমি আনত হয়ে সে সিত্তুখানকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, বান্দা হাজির মালকিন। আজ্ঞা করুন, কী করতে হবে?

প্রথমে ভয়ে তো শিউরে উঠেছিল সিত্তুখান। কিন্তু দৈত্যের বিনয়াবনত ভাবভঙ্গী দেখে ধড়ে প্রাণ পেল সে। বুকে সাহস এনে বললো, শোনও দৈত্য, ঐ যে সুলতানের প্রাসাদ দেখছো, ঠিক ঐ রকমই আর একখানা প্রাসাদ আমাকে বানিয়ে দিতে হবে ওরই ঠিক পাশে।

দৈত্য সেলাম জানিয়ে বলে, জো হুকুম মালকিন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সিত্তুখান দেখলো সুলতানের প্রাসাদের পাশে আর একখানা তাদৃশ ইমারত গর্বিত মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

দৈত্য এসে বললো, আপনার হুকুম তামিল করেছে বান্দা। আর কোনও আজ্ঞা আছে মালকিন?

সিত্তু বলে, না। এখন শুধু আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাও। তারপর আবার যখন দরকার হবে ডাকবো।

শাহজাদা মা-এর কাছে এসে বললো, মা, ওটা কাদের প্রাসাদ? আমাদের চেয়েও তো বাহারী দেখছি।

—কী জানি বাবা, হয়তো কোনও পরদেশী সুলতান বাদশাহর হবে।

পুত্র বলে, মা তুমি একবার গিয়ে আলাপ-সালাপ করে এস না ওদের শাহজাদীব সঙ্গে।

মা বললো, ও প্রাসাদে শাহজাদী আছে, কে বললো তোকে!

—আমি যে ওকে দোতলার বারান্দার জাফরীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, মা!

মা হাসলেন, ও, আচ্ছা এখন তুই যা আমি খোঁজ নিচ্ছি।

সেইদিনই বেগমসাহেবা সিত্তুর বাড়ি এল। সিত্তুর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, বেটি, এখনও তুমি শাদী করনি কেন?

কোন সুযোগ-সুবিধা হয়নি বেগমসাহেবা।

সিত্তু নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। বেগমসাহেবা অবাক হল, সে কি। তোমার মতো এমন রূপবতী কন্যাকে মাথার মণি করে নিয়ে যাওয়ার বাদশাহজাদার অভাব আছে নাকি। তুমি যদি রাজি থাক মা, তবে আমার ছেলের সঙ্গে তোমার শাদী হতে পারে।

সিত্তু বলে, আপনার ছেলেকে আমি শাদী করতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে।

—কী শর্ত, বেটি?

আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, এটা চাউর করে দিতে হবে। এবং সেও সত্যিই মরার মতো পড়ে থাকবে। তারপর তাকে পর পর সাতখানা শব আচ্ছাদনে ঢেকে সারা শহরের পথ ধরে শোক-মিছিল করে ঘুরিয়ে এনে আমার এই বাগানে নামাতে হবে।

বেগমসাহেবা বললেন, বেশ ঠিক আছে। তোমার শর্তের কথা গিয়ে বলি আমার ছেলেকে।

প্রাসাদে ফিরে এসে বেগমসাহেবা পুত্রকে সব বললেন। শাহজাদা তখুনি মরার মতো ভান করে পড়ে রইল। মা কেঁদে ভাসাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট এক শোক-মিছিল বের হলো শহরের পথে। শাহজাদার অকাল-মৃত্যুতে সারা শহরবাসী চোখের জল ফেললো। তারপর এক সময় শবাধার এনে নামানো হলো সিত্তুখানের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।

সবাই বিদায় নিলে সিত্তুখান নিচে নেমে এসে এক এক করে শবাচ্ছাদনগুলো সরিয়ে দেখলো। সে এরই জন্যে এতদিন দিন গুনছিল।

—আরে তুমি?

সিত্তুখান বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকায়। শাহজাদাও লাফিয়ে ওঠে, আরে তুমি? আমি যে তোমার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম মণি!

গল্প এখানেই শেষ।

সুলতান বাইবারস প্রীত হয়ে বললেন, চমৎকার তোমার কাহিনী জালাল অল-দিন। এর আগে এমন কাহিনী শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

এরপর দশম কাপ্তেন এগিয়ে এল তার কাহিনী শোনাতে।

এক সময়ে এক বাদশাহ ছিল। তার একমাত্র পুত্র। নাম মহম্মদ। একদিন শাহজাদা বাদশাহকে বললো, বাবা আমি শাদী করবো।

বাদশাহ বললেন, অতি উত্তম কথা। তবে কিছুদিন সবুর কর, আগে তোমার মাকে জিজ্ঞেস করি, হারেমের কোনও সঙ্গীকে সে পছন্দ করে রেখেছে কিনা তোমার জন্য।

শাহজাদা বললো তার চেয়ে বাবা, আমি নিজেই পছন্দ করে ঠিক করে নিই?

বাদশাহ বললো, আমার তাতেও আপত্তি নাই।

এরপর শাহজাদাকে সুন্দর একটা তাজি ঘোড়ায় চাপিয়ে বিদায় দিলেন বাদশাহ।

একটানা দুইদিন চলার পর এক মাঠের ধারে এসে শাহজাদা দেখতে পেল, এক চাষী পিঁয়াজকলি কাটছে আর তার পাশে এক যুবতী কন্যা সেগুলো গুছিয়ে আঁটি বাঁধছে।

শাহজাদা ওদের পাশে গিয়ে সালাম জানিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে মেয়েটিকে বলে, আমাকে একটু পানি খাওয়াও তো?

মেয়েটি জল এনে দেয়। শাহজাদা নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দেয় পাত্রটি। তারপর চাষীর দিকে তাকিয়ে বলে, শেখসাহেব, আপনার কন্যাটি আমার হাতে দেবেন?

চাষী কৃতার্থ হয়ে বলে, আমি আপনার বান্দা। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে?

শাহজাদা বলে, তা হলে ওই কথাই রইল। এখন আমি আমার শহরে ফিরে যাচ্ছি। শাদীর সব উৎসব আয়োজন করে আবার ফিরে আসবো?

শাহজাদা প্রাসাদে ফিরে এসে বাদশাহকে বলে, বাবা পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। এক চাষীর মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওকেই আমি শাদী করবো।

বাদশাহ বললেন, এক চাষীর কন্যাকে তোমার মনে ধরলো? ঠিক আছে, তোমার মাকে সেখানে পাঠাচ্ছি। সে সব জেনে আসুক, দেখে আসুক!

শাহজাদা বললেন, বেশ তাই পাঠান।

যথাসময়ে নফর-চাকর-দাসদাসী সমভিব্যাহারে বেগমসাহেবা চাষীর খামারে পেঁছিলেন! চাষী-কন্যা আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখলো না। মেয়েটির রূপলাবণ্য এবং বিনীত ব্যবহারে প্রীত হয়ে বেগমসাহেবা প্রস্তাব রাখলেন, তোমাকে দেখে আমার বড় পছন্দ হয়েছে মা, আমার ইচ্ছা তুমি আমার পুত্রবধূ হও।

মেয়েটি বললো, কিন্তু তা তো হতে পারে না। আমি কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলেকে স্বামী বলে বরণ করবো না।

বেগমসাহেবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন মা, কী কারণ?

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়, আমার স্বামী হাতে-কলমে কাজ-কাম করবে এই আমি চাই। কিন্তু আপনার পুত্র সোনার চামচ মুখে করে জন্মেছেন, তিনি কি কুটোগাছটা হাতে ধরতে পারবেন?

ক্রোধে আরক্ত হয়ে ফিরে এলেন বেগমসাহেবা। স্বামীকে বললেন, একেবারে বাজে। এত বড় স্পর্ধা! মেয়েটা বলে কিনা বাদশাহর ছেলেকে সে শাদী করবে না।

—কারণ?

বাদশাহ প্রশ্ন করেন।

কারণ, মেয়েটি তাকেই স্বামীত্বে বরণ করবে, যে তারই মতো চাষবাসের কাজে মেতে থাকবে।

বাদশাহ বললেন, সে তো ঠিকই বলেছে।

কিন্তু শাহজাদা একথা শুনে শয্যা গ্রহণ করলো।

সুতরাং বাদশাহ সমস্ত চাষী এবং কারিগরদের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে ফরমান জারি করলেন। সুলতানের আদেশ অমান্য করে সাধ্য কার! যথা-সময়ে দেশের তাবৎ কলাকুশলীরা হাজির হলো।

প্রথমে এক সূত্রধরকে প্রশ্ন করলেন বাদশাহ, তুমি আমার পুত্রকে কতদিনে তোমার কাজ শিখিয়ে দিতে পারবে?

সূত্রধর বলে, অন্তত দুটি বছর সময় লাগবে, জাঁহাপনা।

সুলতান তাকে পাশে দাঁড়াতে বলে এক কর্মকারকে প্রশ্ন করলেন। তুমি কতদিনে পারবে তোমার জাতব্যবসার কাজ শেখাতে?

কর্মকার বললো, তা হুজুর বছরখানেক লাগবে।

তাকেও পাশে সরিয়ে দিলেন বাদশাহ। কিন্তু এক এক করে যাকেই প্রশ্ন করেন সেই বলে এক বছর কিংবা দু বছর। আবার কেউ তারও বেশি সময় প্রার্থনা করে।

বাদশাহ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন।

এমন সময় একটা বেঁটে বাটকুল দুবলা লোক ল্যাং প্যাং করে লাফাতে লাফাতে বাদশাহর সামনে এগিয়ে আসতে থাকে।

বাদশাহ ঈষৎ বিরক্ত হয়েই তাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার তুমি অমন করে বাঁদর নাচ নাচছো কেন?

—জী হুজুর, আমিও এক কারিগর। জাঁহাপনার তলব পেয়ে এসেছিলাম এই সভায়। তা আমার সুরৎ আকার দেখে বুঝি শাহেনশাহর নজরেই ধরলো না। তাই ঐ রকম অঙ্গভঙ্গী করে বান্দা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা।

—তা তুমি কি কর?

—জী আমি তাঁতী। কাপড় বুনে খাই।

—বেশ, এখন বলতো, তোমার তাঁতের কাজ আমার ছেলেকে কতদিনে শেখাতে পারবে?

—মাত্র এক ঘণ্টায় জাঁহাপনা!

বাদশাহ অবাক হয়ে তাকায় লোকটার দিকে? পাগল নাকি?

—এক ঘণ্টায় শেখাবে তোমার বিদ্যা, একি সম্ভব?

—আলবত সম্ভব, জাঁহাপনা।

—ঠিক আছে, শাহজাদাকে আমি তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। তাকে নিয়ে যাও তোমার বাড়িতে।

শাহজাদাকে সঙ্গে করে তাঁতী তার নিজের ঘরে ফিরে এল। এবং তাঁতের পাশে বসিয়ে সে তাকে বললো, আপনি শুধু আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন, হুজুর। এই মাকুটা আমি এদিক থেকে চালিয়ে দেব আর ওদিক দিয়ে ধরে নেব।

শাহজাদা এক মনে তাঁতীর তাঁত বোনা দেখতে থাকে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটামুটি সুন্দর একখানা রুমাল বুনে ফেলে সে।

এরপর তাঁতী বলে, এবার আপনি তাঁতে এসে বসুন হুজুর। যেমনটি দেখলেন ঠিক তেমনিভাবে মাকু চালিয়ে আপনিও একখানা রুমাল বুনুন দেখি।

শাহজাদা অতি সহজেই একখানা চমৎকার কাজকরা রুমাল বুনে ফেলতে পারে।

দুখানা রুমাল হাতে করে শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসে তাঁতী। রুমাল দুখানা বাদশাহর হাতে দিয়ে বলে, এই দুখানার মধ্যে একখানা আপনার পুত্র বুনেছে। এখন আপনি বলুন দেখি, জাঁহাপনা, কোনখানা আপনার পুত্রের বোনা?

অপেক্ষাকৃত নিরেস রুমালখানা দেখিয়ে বাদশাহ বলেন, এইখানা মনে হচ্ছে!

—না হুজুর, ওখানা আমার হাতের।

বাদশাহ অবাক হয়ে বলেন। এত চমৎকার কাজ আমার ছেলের হাতের কাজ?

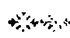
তখুনি তিনি বেগমের কাছে গিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, তোমার ছেলে পাকা তাঁতী হয়ে গেছে। যাও, এবার চাষীর মেয়েকে বলে কয়ে রাজি করাও গে!

চাষী কন্যা শাহজাদার হাতের বোনা দেখে মুগ্ধ হয়ে বললো, এরপর আমার আর অমত নাই। আপনি শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন বেগমসাহেবা।

গল্প শেষ হলো।

সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার হিতোপদেশের কাহিনী শোনালে হে কাপ্তেন!

এরপর একাদশ কাপ্তেন সালা অল-দিন কাহিনী শোনাবার জন্য এগিয়ে এল।

এক সুলতানের বেগম এক শুভনক্ষত্রে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন। ঠিক সেইদিনই সেই ক্ষণে সুলতানের আস্তাবলের এক গর্ভবতী ঘোড়া একটি বাচ্চা প্রসব করলো।

সুলতান বললেন, আল্লাহ আমার পুত্রের জন্যই বুঝি তাকে একই সময়ে দুনিয়ায় পাঠালেন।

শাহজাদার তরুণ বয়সকালে বেগমসাহেবা দেহ রাখলেন একদিন। আর কি আশ্চর্য, সেইদিনই আস্তাবলের ঐ ঘোড়াটারও মৃত্যু হলো।

যাই হোক, দিন কাটছিল। বাদশাহ হারেমের এক বাঁদীকে বেগম করলেন।

নব-পরিণীতা বাঁদী-বেগমের মোহে সারা দিনরাত আচ্ছন্ন হয়ে কাটান সুলতান। তাঁর একমাত্র পুত্র অনাদরে অবহেলায় কোনও রকমে বাড়তে থাকে প্রাসাদে। একা একাই বিদ্যালয়ে যায়। একা একাই ফিরে আসে। এতবড় প্রাসাদপুরীতে একমাত্র ঐ ঘোড়া ছাড়া তার আর পেয়ারের বলতে কেউ ছিল না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বাহান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

শাহজাদার সৎমাটি ছিল একটি অসৎ মেয়ে। প্রাসাদের হাকিমের সঙ্গে তার ছিল অবৈধ প্রণয়।

একদিন তারা যুক্তি করলো পথের কাঁটা ঐ ছেলেটাকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। হাকিম বললো, ঠিক আছে, আমি বিষ এনে দেব, তুমি ওর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিও।

বিদ্যালয় থেকে ফিরেই শাহজাদা সোজা গিয়ে ঢোকে আস্তাবলে। তার একমাত্র বন্ধু ঘোড়াটাকে আদর সোহাগ করে দানাপানি খেতে দেয়। সেদিন সে বিদ্যালয় থেকে ফিরে আস্তাবলে গিয়ে দেখে ঘোড়াটা অঝোরে কাঁদছে। কাছে গিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করে সে, কি দোস্ত, কাঁদছো কেন? তোমার কি কোনও অসুখ করেছে?

ঘোড়াটা ঘাড় নেড়ে বলে, না, সেজন্য নয়। আমি কাঁদছি তোমার জন্য?

—আমার জন্য? কেন?

ঘোড়া বলে, তোমার সৎমা যে তোমাকে আজ রাতে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে। দোহাই তোমার, ও খাবার তুমি খেও না।

শাহজাদা সোহাগ জানিয়ে বলে, তুমি আমাকে এত ভালবাস? ঠিক আছে, ও খাবার আমি খাব না।

সন্ধ্যা হতে না হতে সৎমা নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে শাহজাদাকে ডেকে বলে, খেয়ে নাও বাবা।

শাহজাদা খেতে বসে খাবারে একটা পোকা পড়েছে বলে রেগে মেগে থালা-গুলো সব উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। টেবিলের নিচে যে পোষা বিড়ালটা প্রসাদের আশায় বসেছিল, আস্ত ফলারটা পেয়ে সে গোগ্রাসে খেতে খেতে তখনি মেঝের ঢলে পড়লো।

এই দৃশ্য শাহজাদার নজর এড়ায় না। কিন্তু সে যেন কিছুই দেখেনি, এমনি ভাব দেখিয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

বাঁদী-বেগম তার প্রণয়ীকে প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার ছেলেটা আগে থেকে সব টের পেল কি করে?

হাকিম বললো, ঐ ঘোড়াটা সর্বজ্ঞ। দৈব ক্ষমতাবলে সব ও দিব্য চক্ষুতে দেখতে পায়। ওই সাবধান করে দিয়েছে শাহজাদাকে।

বাঁদীটার হিংস্র চোখ জ্বলে উঠলো, তা হলে আগে ঐ ঘোড়াটাকেই খতম করতে হবে।

হাকিম বললো, হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় নাই। তুমি অসুখের ভান করে পড়ে থাক। সুলতান আমাকে ডাকবেন। তখন আমি তাঁকে বলবো, এ অসুখ একটিমাত্র দাওয়াই-এ সারতে পারে। তা আপনার সবচেয়ে প্রিয় অশ্বের বুকের কলিজা দিয়েই কেবল তৈরি করা সম্ভব।

হাকিমের পরামর্শমতো বাঁদী-বেগম শয্যা নিল। সুলতান চিন্তিত হয়ে হাকিমকে ডাকলো।

সব শুনে সুলতান বললেন, ব্যাপারটা একটু মুশকিলের। ঘোড়াটা ছেলের বড় আদরের। যাই হোক, সে পাঠ শেষ করে ফিরে আসুক, তাকে বুঝিয়ে রাজি করাচ্ছি।

বিদ্যালয় থেকে ফিরে এল শাহজাদা। সুলতান তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার মা অসুস্থ। একমাত্র তোমার ঘোড়ার কলিজার বিনিময়ে তার রোগ নিরাময় হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তির কথা ভেবে আমি তোমাকে ঘোড়াটার মায়া ত্যাগ করতে বলছি, বাবা।

শাহজাদা ক্ষণকাল মৌন থেকে বললো, ঠিক আছে বাবা, আমি সম্মত আছি। তবে আমার জন্মের পর থেকে ওর পিঠে আমি চড়িনি কোনও দিন। ও তো চিরদিনের মতো চলেই যাবে আমার কাছ থেকে, তাই শেষ বিদায় দেবার আগে আজ আমি ওকে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসি।

সুলতান বললেন, বেশ যাও, শেষ বারের মতো তোমার মনের সাধ মিটিয়ে এস।

আস্তাবলে গিয়ে উত্তম সাজে সজ্জিত করলো সে ঘোড়াটিকে। তারপর বাইরে এসে পিঠে চেপে বসলো। পক্ষীরাজ তীরবেগে ছুটে গেল, পোলো মাঠের ওপ্রান্তে। আবার চোখের পলকে ফিরে এল প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। আবার সে বাঁক নিয়ে বায়ুবেগে ছুটতে থাকলো শহরের সদর রাস্তা ধরে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় সে শহরের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে ফাঁকা মরু-প্রান্তরে গিয়ে পড়লো।

এরপর আর পিছন দিকে ফিরে তাকালো না শাহজাদা। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে বিশাল প্রান্তরও অতিক্রম করে অন্য এক গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করলো।

একটানা তিনদিন ছুটার পর এক নতুন সলতানিয়তের শহরে এসে উপনীত হলো ওরা।

সুলতানের প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি মনোহর উদ্যান। সেই উদ্যানের ওপারে একটা জলের কুয়া। একটা লোক জোড়াবলদের ঘানি ঘুরিয়ে কপিকলের সাহায্যে জল তুলছিল।

শাহজাদা ঘোড়া থেকে নেমে লোকটির কাছে গিয়ে বললো, আমি পরদেশী। সঙ্গে কোনও রেস্ত নাই। আমাকে যদি একটা কাজ-কামের ব্যবস্থা করে দাও তবে খুব ভাল হয়।

লোকটি বললো, আমার এই ঘানির বলদ দুটোকে চালাতে হবে, পারবে ?

শাহজাদা বলে, খুব পারবো !

এরপর সে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে বলে, এবার বিদায় বন্ধু, তুমি চলে যাও। এখানেই আমার একটা হিল্লে হয়ে গেল।

ঘোড়াটা বললো আমার ঘাড়ের একগাছি লোম ছিঁড়ে রাখ বন্ধু। যখনই প্রয়োজন হবে একটা লোমে আগুন ধরালে সংগে সংগে আমি হাজির হবো তোমার সামনে।

কুয়ার ওপাশে ফুলবাগিচা। সেই বাগিচায় প্রতিদিন বিকালে সুলতানের সাতটি কন্যা বেড়াতে আসে। হঠাৎ সেদিন ওরা এক প্রিয়দর্শন তরুণকে ঘানির রাখালের কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে যায়। এক বোন বলে, দ্যাখ দ্যাখ, ছেলেটি কি সুন্দর। মনে হয় বড় ঘরের আদরের দুলাল।

ছোট বোন বলে, রাখালই হোক আর যেই হোক ওকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে শাদীই করবো না।

সুলতান মেয়েদের ডেকে বললেন, আমি ঠিক করেছি পছন্দমতো পাত্রের সংগে তোমাদের শাদী দিয়ে দেব।

সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর সাতটি কন্যার শাদী দেবেন তিনি। দেশের অবিবাহিত যুবকরা ইচ্ছা করলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে পারে। কন্যারা যে যাকে পছন্দ করবে তার সংগেই সেই কন্যার শাদী দেওয়া হবে !

যথাসময়ে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার তরুণ যুবক এসে সমবেত হলো। কন্যারা রুমাল হাতে বসলো অলিন্দে। তারপর নিজের নিজের পছন্দসই পাত্রের দিকে ছুঁড়ে দিল সেগুলো।

সুলতান দেখলেন, ছ'খানি রুমাল ছ'জন ভাগ্যবান যুবকের মাথায় গিয়ে পড়েছে।

যথাসময়ে ঐ ছয়টি পাত্রের সংগে ছয়টি কন্যার শাদী হয়ে গেল। কিন্তু ছোট কন্যা তার রুমাল নিক্ষেপ করেনি। সে কারণে তার শাদী আর হতে পারলো না।

সুলতান ছোট কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বড় বোনরা সবাই যে যার মতো স্বামী পছন্দ করে নিল, কিন্তু তুমি করলে না কেন ?

ছোট কন্যা বললো, আমি যাকে শাদী করতে চাই, সে আপনার আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়নি, বাবা।

—কে সে ?

—আমাদের বাগানের পাশে যে কুয়াটা আছে তার ঘানির রাখালকে আমি স্বামী হিসেবে পেতে চাই, বাবা।

—বেশ তো, তাই হবে। আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সেইদিনই রাখালবেশী শাহজাদার সংগে ছোটকন্যার শাদী হয়ে গেল মহা ধুমধামে।

এরপর বাদশাহী জামাই-আদরে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন

শাহজাদা খবর পেল যে তার বাবা ইন্তেকাল করেছেন। এবং শূন্য সিংহাসনে চেপে বসেছে সেই হাকিম। ঘোড়ার একটি লোমে আগুন ধরিয়ে দিল শাহজাদা। আর তক্ষুণি এসে হাজির হলো ঐ ঘোড়াটি। শাহজাদা বললো, বন্ধু, বাবা দেহ রেখেছেন। এখন আমার সিংহাসন অধিকার করে বসেছে ঐ হাকিম। চল, আর দেরি নয়, এখুনি আমাকে দেশে ফিরতে হবে।

শ্বশুরের এক বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে সে সেইদিন নিজের শহরে রওনা হয়ে গেল।

এরপর ঐ শয়তান হাকিমের কি দশা হয়েছিল নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন জাঁহাপনা।

গল্প শেষ হলো।

সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার।

এরপর দ্বাদশ কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার গল্প শুরু করলো ঃ

এক সুলতানের এক বন্ধ্যা বেগম ছিল। দেশ-বিদেশের কত হাকিম বদ্যি এসে দাওয়াই বড়ি দিয়ে গেছে কিন্তু বেগম সন্তান-সম্ভবা হতে পারেননি।

একদিন এক মুর এল। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো, আমি আপনার বেগমের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা সর্ত আছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করেন, কী শর্ত ?

—আপনার বেগমের গর্ভে প্রথম যে সন্তান উৎপাদন হবে তা আমাকে দিয়ে দিতে হবে।

সুলতান তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই দেব।

মুর তখন দুটি মণ্ডা বের করে সুলতানের হাতে তুলে দিলেন। তার একটি সবুজ আর একটি লাল রঙের।

—এই সবুজটা আপনি নিজে খাবেন, জাঁহাপনা। আর এই লাল মণ্ডাটি খেতে দেবেন বেগমসাহেবাকে। এরপর যা করার তিনিই করবেন।

এই বলে মুর বিদায় নিল।

যথাসময়ে বেগম একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলেন। সুলতান তার নাম রাখলেন মহম্মদ।

অপরিসীম আদর-যত্নের মধ্যে লালিত হতে লাগলো মহম্মদ। তার লেখা-পড়ার জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হলেন সুলতান।

এরপর বেগমসাহেবা দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিলেন। তার নাম রাখা হলো আলী। আলী কিন্তু মহম্মদের মতো প্রিয়দর্শন বা মেধাবী হলো না। এরপর

আরও একটি পুত্রসন্তানের মা হলেন বেগমসাহেবা। তার নাম মাহমুদ। এই ছেলেটি একেবারে গবেট হাঁদা।

দশ বছর পরে।

একদিন ঐ মুর এসে সুলতানকে বললেন, আপনার ওয়াদা পূরণ করুন, জাঁহাপনা। আমার প্রাপ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আমার হাতে দিয়ে দিন।

সুলতান বেগমের কাছে গিয়ে মুরের দাবীর কথা জানাতে বেগম প্রবল আপত্তি করে বললো, না না, সে হতে পারে না। আপনি বরং আলীকে দিয়ে দিন ওর হাতে।

আলীকে সঙ্গে নিয়ে মুরটি বিদায় হলো। হাঁটতে হাঁটতে দুপুর গড়িয়ে গেল। প্রচণ্ড সূর্যতাপে দুনিয়া তখন ঝলসে যাচ্ছে। এক জায়গায় থেমে মুর আলীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার খিদে-তেষ্টা পায়নি।

আলী বললো, পাক্কা আদ্ধেক দিন ধরে একটানা হাঁটছি, এখনও আপনি জিজ্ঞেস করছেন, খিদে পেয়েছে কিনা? আশ্চর্য!

মুর গম্ভীর হয়ে শুধু একটা আওয়াজ করলো, হুম!

তারপর সে আলীকে নিয়ে আবার ফিরে এল সুলতানের প্রাসাদে।

—এ ছেলে তো আমার নয়, জাঁহাপনা? তিনজনকেই একসঙ্গে এনে দাঁড় করান এখানে, আমি নিজে চিনে নেব কোনটা আমার।

সুতরাং নিরুপায় সুলতান তিন পুত্রকেই এনে পাশাপাশি দাঁড় করালেন। মহম্মদকে দেখিয়ে মুর বললেন, এই হচ্ছে আমার।

মহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আবার সে হাঁটাপথে রওনা হলো। প্রায় আধখানা দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল! সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হচ্ছে দুনিয়া। একসময় মুর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মহম্মদকে জিজ্ঞেস করলো, খাবে কিছু? খিদে-তেষ্টা পায়নি তোমার?

মহম্মদ বিনয়াবনত হয়ে বললো, আপনি যদি তৃষ্ণার্ত হন তবে আমিও তৃষ্ণার্ত। আপনি যদি ক্ষুধার্ত বোধ করেন, তবে আমিও ক্ষুধার্ত সন্দেহ নাই।

যাদুকর বুকে জড়িয়ে ধরলেন মহম্মদকে। আদর সোহাগ করে বললেন, এই তো বুদ্ধিমান বিনয়ী ছেলের কথা। তুমি জ্ঞানে গরিমায় শ্রেষ্ঠ হবে। তুমিই আমার সন্তান।

মহম্মদকে হাতে ধরে সে মরোক্কো শহরে এসে উপস্থিত হলো। একটি উদ্যানের সুশীতল ছায়ায় বসে দুজনে খানাপিনা করলো। তারপর মহম্মদের হাতে একখানা কিতাব তুলে দিয়ে মুর বললো, খুলে পড় দেখি!

মহম্মদ বইটার পাতা ওল্টাতে থাকলো। কিন্তু একটা বর্ণও বুঝতে পারলো না কিছু। একেবারে দুর্বোধ্য ভাষা।

ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলো মুর, তোমাকে আমি নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করেছি। অথচ এই বই তুমি পাঠ করতে পারছো না? দেখ চেষ্টা কর, এর পাঠোদ্ধার তোমাকে করতেই হবে। তা না হলে, গগ এর ম্যাগগের নামে শপথ

করে বলছি, একমাস পরে তোমার ডান হাতখানা আমি কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেব। এই আমি চললাম। ঠিক একমাস পরে আবার আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে। এই সময়ের মধ্যে যেভাবে পার এর পাঠোদ্ধার করবে।

এই বলে মহম্মদকে ঐ বাগানে ফেলে রেখে সে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

এরপর ঊনত্রিশটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। মহম্মদ ঐ বইখানা নিয়ে সারাদিন রাত নাড়াচাড়া করে। কিন্তু বইটার যে কোন্ দিক সোজা আর কোন্ দিক উল্টো—তাই সে আন্দাজ করতে পারে না। বইটাকে ফেলে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো, না, মরতে যখন হবেই তখন ঐ দুর্বোধ্য পুঁথির পাতায় মুখ গুঁজে থুবড়ে পড়ে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে সে খোলামেলা মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে বাকী দিনটা। দেখবে প্রকৃতির শোভা, গাইবে গান প্রাণভরে।

পায়ে পায়ে সে বাগানের অপর প্রান্তে চলে যায়। কতরকম ফুলে ফলে ভরা বাগানটি। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় মহম্মদের।

হঠাৎ একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়তে আঁৎকে ওঠে সে। একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী। তার মাথার দুটি বেণী দিয়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে গেছে কেউ। মহম্মদ কাছে গিয়ে মেয়েটিকে মুক্ত করে নিচে নামালো। কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ভরে এল মেয়েটির চোখে। দুহাত বাড়িয়ে মহম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, কে তুমি? এখানে এলে কী করে?

মহম্মদ বললো, তার কাহিনী।

ঊনত্রিশটা দিন চলে গেছে। সে বইএর একবর্ণও আমি উদ্ধার করতে পারিনি। আগামীকাল মুরের আসার তারিখ। আমি, জানি কালই আমার এই ডান হাতখানা কেটে ফেলবে সে।

মেয়েটি বললো, অমন বিচলিত হয়ো না। আমি জানি ঐ পুঁথি পাঠ করতে। বলবে কী করে কার কাছে শিখেছি? কারো কাছে শিখিনি, আমার অন্তর থেকেই আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম। ঐ মুর আমাকেও বলেছিল, পুঁথিখানা পাঠ করতে। আমি গড় গড় করে পড়ে দিতেই সে রাগে ফেটে পড়লো। তারপর চুলের বেণী ধরে নিয়ে এল এই গাছতলায়। তারপর একটা ডালে ঝুলিয়ে রেখে চলে গেল। সেই থেকে আমি এখানে এইভাবে ঝুলছিলাম। যাক, সে সব কথা, এখন চল তোমাকে আমি পুঁথিটার পড়া শিখিয়ে দিই।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মহম্মদ গড়গড় করে পড়ে যেতে পারলো গোটা বইটা। মেয়েটি বললো, কাল যখন মুর এসে তোমাকে পড়তে বলবে, তুমি কিন্তু ভুলেও পড়ে দিও না। তাহলে সে তোমাকেও গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখবে।

মহম্মদ বললো, কিন্তু তা না হলে ও যে আমার ডান হাতখানা কেটে ফেলবে?

—সেজন্য তুমি ভেব না। আমি সব ঠিক করে দেব। এবার আর দেরি করো না। আমি যেমনটি গাছের ডালে ঝুলছিলাম তেমনি করে আমাকে আবার ঝুলিয়ে রেখে এস ঐ ডালে।

পরদিন যাদুকর মুর এসে উপস্থিত হলো।

—এবার নিশ্চয়ই পুঁথিখানা পড়ে শোনাবে আমাকে ?

মহম্মদ আমতা আমতা করে বলে, তা কি করে সম্ভব, বলুন ! আমি তো ঐ ভাষার একটি বর্ণও চিনি না ।

জ. মুর রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বললো, ওসব কোনও ওজর আমি শুনতে না ।

আপ'এই বলে সে তলোয়ারটা খুলে এক কোপে নামিয়ে দিল মহম্মদের ডান দিন খানা ।

—এই আমি চললাম, কিন্তু আবার আসবো একমাস পরে। তখনও যদি দেখি তুমি পড়তে পারছ না তা হলে তোমার গর্দান নেব আমি ।

জ মুর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল কোথায় ।

কাটা হাত নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মহম্মদ এসে দাঁড়ালো মেয়েটির সামনে ।

—তোমার কথামতো কাজ করে এই আমার লাভ হলো ।

মেয়েটি মৃদু হেসে বললো, আমাকে আগে নামাও, তারপর আমি তোমার হাত জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি ।

ছেলেটি ওকে নিচে নামালে সে একটা গাছের তিনটি পাতা ছিঁড়ে এনে রস করে কাটা হাতে লাগিয়ে দিতে হাতখানা জোড়া লেগে গেল ।

মহম্মদ অবাক হয়ে বললো, এমন অলৌকিক দাওয়াই তুমি পেলে কার কাছে ? ঐ মুর শিখিয়েছে ?

মেয়েটি ঠোঁট ওলটায়, মুর ? ঐ মুর শেখাবে আমাকে ? ও কি জানে যে শেখাবে ? এই বিদ্যেটা আয়ত্ত করার জন্য আজ চল্লিশটা বছর হন্যে হয়ে ঘুরছে সারা দুনিয়া । কিন্তু আরও চল্লিশ বছর ঘুরলেও, আমি জানি, এ বিদ্যা সে শিখতে পারবে না কারো কাছে ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল ।

নয়শো তিপান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এরপর মেয়েটি পুঁথিখানার কয়েকটা ছত্র আবৃত্তি করে পাঠ করলো । এবং অন্য একটা লতার পাতা হাতে নিয়ে তুলতেই বায়ুবেগে ধেয়ে এসে দাঁড়ালো দুটি উট । মাথা মাটিতে নুইয়ে ওরা সালাম জানালো মেয়েটিকে ।

সে বললো, এই উট দুটো কোনও সাধারণ উট নয় । এরা তীরবেগে ছুটে চলতে পারে। এসো আমরা দুজনে দুটোর পিঠে চেপে বসে নিজের দেশে পালিয়ে যাই । পরে যথাসময়ে তুমি আমার বাবার কাছে এসে আমার পাণি-প্রার্থনা করো । আমার বাবার সলতানিয়ত তোমার অজানা নয় । তবু পথঘাট সব বলে দিচ্ছি ।

মহম্মদ প্রাসাদের এক খোজা নফরকে বললো, এই উটটা আজই হাটে নিয়ে

গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আয়। কিন্তু খবরদার, এর লাগামটা যেন বেচে দিসনি।

হাটে গিয়ে এক চরসখোর দালালের পাল্লায় পড়ে দারুণ জমে গেল খোজাটা। কারণ সেও চরসের এক ভক্ত। ঝোঁকের মাথায় গপ্প জমাতে জমাতে দালালটা খোজাকেও একটু প্রসাদ দিয়েছিল। আর তাতেই সে বেমালুম সব গুলে খেয়ে শাহজাদার কথা অমান্য করে লাগাম সুদ্ধ উটটা প্রায় জলের দরে বেচে দিয়ে গেল তার কাছে।

দালালটা উটকে তার দোকানের সামনে বেঁধে একটা কাঠের গামলায় খানিকটা পানি এনে ধরলো তার সামনে। লাগামটা খুলে দিল। উটটা পানিতে মুখ না দিয়ে এক এক করে চারখানা পা ডুবিয়ে দিল গামলার মধ্যে। আর কী আশ্চর্য্য, ঐ অত বড় পাহাড় সমান উটটা নিমেষে এতটুকু ইঁদুর ছানার মতো হয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চরসখোর দালালটা 'গেল গেল ধর ধর' আওয়াজ তুলে পাড়া-পড়শীদের হতচকিত করে দিল। মুহূর্তে ছুটে এল সবাই চারদিক থেকে।

—কী, কী হলো শেখ?

আমার উটটা ঐ পানির গামলার মধ্যে ডুবে গেছে। ওকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রতিবেশিরা মুচকি হেসে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একেই না বলে চরসখোর! এ তো গরুকেও গাছে তুলে দিতে যাচ্ছে।

এদিকে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন ওদিকে সেই যাদুকর মুর, পাখিরা পালিয়েছে দেখে ক্রোধে জ্বলতে থাকে। হুম্, আমাকে ধাপ্পা দিয়ে কোথায় পালাবে বাছারা? পৃথিবী বা যে-কোন গ্রহনক্ষত্রেই তোমরা থাক, খুঁজে আমি বের করবোই।

আর তিল মাত্র সময় বিলম্ব না করে সে তখুনি মহম্মদের শহরে রওনা হয়। এবং চোখের পলকে এসে পৌছয় সেই উটের দালালের দোকানের সামনে! দালালটা তখন উট হারানোর শোকে কপাল চাপড়িয়ে হা-হুতাশ করছিল। যাদুকর ওকে আশ্বাস দিয়ে বললো, তোমার উট আমি খুঁজে এনে দেব, শেখ। কিচ্ছু চিন্তা করো না। এখন একটা কাজ কর, উটের এই লাগামটা আমাকে দিয়ে দাও। তার বদলে আমি তোমাকে উটের কেনা দামের চেয়ে আরও একশো দিনার বেশি দিচ্ছি।

দালালটা এক কথায় সম্মত হয়ে লাগামটা দিয়ে দিল মুরকে। খুশির আনন্দে নেচে উঠলো যাদুকর। ঐ লাগামটা মন্ত্রপূত। ওটার সাহায্যে আবার উটটা ফিরে পাওয়া সম্ভব ছিল। এ ছাড়াও ঐ লাগামটা ইচ্ছামতো যে-কোনও মানুষকে যে-কোনও স্থান থেকে পাকড়াও করে এনে হাজির করতে পারে।

লাগামটা ধরে তাকে আদেশ করা মাত্র প্রাসাদ থেকে মহম্মদকে টেনে বের করে আনলো সে। যাদুকরের সামনে এসে মহম্মদ মন্ত্র-চালিতের মত হাঁটু গেড়ে বসে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো। যাদুকর তাকে পলকের মধ্যে একটি

উটে রূপান্তরিত করে লাগামটা তার মুখে পরিয়ে দিয়ে পিঠের ওপর চেপে বসলো।

এবার যাদুকর যাবে ঐ শাহজাদীর শহরে।

উট হয়ে মহম্মদ যাদুকরকে পিঠে করে সারাটা পথ বয়ে নিয়ে এল। এবং সারাক্ষণ ধরে যে দাঁত দিয়ে লাগামের দড়িটা কুট কুট করে কাটতে কাটতে আসছিল। শাহজাদীর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের মধ্যে এসে থামলো যাদুকর। নিচে নামার জন্য উটকে হাঁটু গেড়ে নিচু হওয়ার জন্য নির্দেশ করলো সে। উট-মহম্মদ তখন লাগামের দড়িটা প্রায় কেটে শেষ করে এনেছে। হঠাৎ মাথায় ঝাঁকানি দিতে লাগামের দড়িটা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে লাগামের দৈবগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মহম্মদ শাপমুক্ত হয়ে একটা ডালিম গাছের অত্যুচ্চ শাখায় একটা বিরাট ডালিম হয়ে ঝুলতে থাকলো। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে নাগালের মধ্যে পেল না যাদুকর।

শাহজাদীর বাবা সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে মুর তার পরিচয় দিয়ে প্রার্থনা জানালো, আপনার উদ্যানের একটি ডালিম যদি আমাকে দান করেন প্রভু, তবে আমার অন্তসত্ত্বা বিবির মনোবাসনা পূরণ করতে পারি। আপনি তো জানেন জাঁহাপনা, গর্ভবতী নারীর কামনা-বাসনা অপূর্ণ রাখলে স্বামীকে দোজকে যেতে হয়।

সুলতান বললেন, কিন্তু দরবেশ জী, এখন তো ডালিমের সময় নয়, কী করে আপনাকে সে ফল দেব? আপনি বরং অন্য কোনও ফল যাচ্ঞা করুন। আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করতে চাই।

যাদুকর বললো, কিন্তু অন্য ফলে আমার কাজ হবে না; প্রভু আপনার বাগানে যে একটি মাত্র ডালিম হয়েছে সেইটিই আমার আবশ্যক।

সুলতান বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার উদ্যানে একটি ডালিম ধরেছে এখন? আপনি কি অন্য ফলকে ডালিম ভ্রম করেননি ফকিরসাহেব?

যাদুকর বলে, না শাহেনশাহ।

তখুনি বাগানের প্রধান মালিকে সুলতান হুকুম করলেন, যাও, বাগানের ডালিম গাছগুলোর মধ্যে একটায় নাকি একটি ডালিম ধরেছে। ওটা পেড়ে নিয়ে এসে এই দরবেশজীকে দিয়ে দাও।

মালি বললো, একি অসম্ভব সংবাদ শোনাচ্ছেন জাঁহাপনা! সূর্য পশ্চিমে উদয় হতে পারে কিন্তু অকালে কখনও ডালিম গাছে ফল ধরে না।

—তবু আমার আদেশ, একবার বাগানের গাছগুলো পরীক্ষা করে এস।

মালি অবিশ্বাস নিয়ে দরবার ছেড়ে চলে গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো, না হুজুর, আপনি যে সংবাদ পেয়েছিলেন তা যথার্থ নয়।

এবার যাদুকর বেশ কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে, এই মালি সত্য ভাষণ করছে না, জাঁহাপনা। আমি এখনও বলছি আপনার উদ্যানে একটি মাত্র ডালিম ধরে আছে। ও ভাল করে না দেখেই আপনাকে ধোকা দিচ্ছে। আমার সঙ্গে সে চলুক, আমি দেখিয়ে দেব ডালিমটা। আর যদি দেখাতে না পারি

শাহেনশাহ যেন আমার গর্দান নেন।

সুলতান বললেন, আপনার কথাই মেনে নিলাম ফকিরসাহেব। আপনি মালির সংগে বাগানে চলে যান।

কিছুক্ষণের মধ্যে মালি বিরাট আকারের একটা ডালিম এনে সুলতানের হাতে দিল। অত বড় ডালিম সুলতান জীবনে দেখেননি কখনও। খুশিতে তিনি ডগমগ হয়ে উঠলেন। উজিরকে বললেন, এমন একটা আশ্চর্য ফল আমি অন্যকে দান করতে চাই না উজির।

উজির বললো, কিন্তু আগেই তো আপনি শর্ত করেছেন জাঁহাপনা! যদি এই ফলটি সত্যিই বাগানে না পাওয়া যেত, তবে তো আপনি এই ফকিরের গর্দান নিতেন।

—অবশ্যই। কারণ, শর্ত তাই ছিল।

উজির বলে, তা হলে শর্তের অন্য দিকটাও আপনাকে রক্ষা করতে হবে, না হলে অবিচার হবে হুজুর।

সুলতান ঘাড় নেড়ে বললেন, তুমি যথার্থ বলেছ উজির। তাহলে ঘোরতর অধর্ম হবে।

এই বলে সুলতান ডালিমটা যাদুকরের হাতে অর্পণ করতে গেলেন। কিন্তু কি কারণে বোঝা গেল না, ডালিমটা হাত ফসকে শ্বেত পাথরের মেঝেয় পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে সব দানাগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লো। সংগে সংগে যাদুকর দুহাত দিয়ে দানাগুলো খুঁটে খুঁটে কোচড়ে ভরতে লাগলো।

এইভাবে একটি বাদে সব কটি দানাই সে সংগ্রহ করে নিতে পারলো। কিন্তু যেটি নাগালের বাইরে একটা গর্তের মধ্যে ঢেকে গেছে সেটাকে আর কিছুতেই কব্জা করতে পারলো না। অথচ যাদুকর নিশ্চিত জানে, ঐ দানাটির মধ্যে মহম্মদ অবস্থান করছে।

গর্তটার মধ্যে মুখ নামিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল দানাটিকে তুলে আনবার জন্য। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে গেল যাদুকর। সুলতান এবং দরবারের সবাই লক্ষ্য করলেন, একখানা তরবারীর আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে যাদুকরের বক্ষদেশ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে মুহূর্তে মধ্যেই যাদুকর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। আর তখুনি ঐ গর্ত থেকে নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এল প্রিয়দর্শন শাহজাদা মহম্মদ।

সুলতানের পাশেই দাঁড়িয়েছিল শাহজাদী। সে বাবাকে বললো, এই সেই শাহজাদা মহম্মদ। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম আমি।

এরপর সুলতান মহম্মদকে আদর করে পাশে বসালেন। সেইদিনই কাজী সাক্ষী ডেকে নিজের কন্যার সংগে শাদী দিয়ে দিলেন মহম্মদের।

দ্বাদশ কাপ্তেন নাসর অল দিনের কাহিনী শেষ হলে সুলতান বাইবারস প্রীত হয়ে প্রত্যেক কাপ্তেনকে একশত দিনারের অতিরিক্ত মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

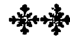
শাহরাজাদ মুচকি হেসে কাহিনী শেষ করে থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার প্রীত হয়ে বললেন, শাহরাজাদ আজ সত্যিই মনে হচ্ছে রাতগুলো কত ছোট ছোট। অথচ একদিন ছিল যখন বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। তখন মনে হতো ওরা যেন অশেষ অনন্ত, কিছুতেই ফুরোতে চাইতো না। আজ এই অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছে—সে শুধু তোমার এই সব মধুর গল্পের জন্য।

শাহরাজাদ বলে, তাই যদি মনে করেন জাঁহাপনা, তবে আরও অনেক কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি।

—সে তো শুনবোই, শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ আবার এক নতুন কাহিনী শুরু করে:

সারকাস্তেন দেশের এক শহরে এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রজা শাসন করতেন। তাঁর নাম জইন অল মুলুক। তাঁর তিনটি পুত্র-সন্তান জন্মেছিল। তারাও সবাই বাপ-কা বেটা। লক্ষজনের মাঝে থাকলেও যে কেউ তাদের একনজরে চিনে দিতে পারতো। অমন সুন্দর রূপ-যৌবন আল্লাহর আশীর্বাদ।

বাদশাহ জইন অল মুলুক কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে ঈষৎ নেকনজরে দেখতেন। একদিন তিনি গণকদের ডেকে পুত্রের ঠিকুজী তৈরি করতে বললেন।

গণকরা অনেক গুণে পড়ে বললো, আপনার এই পুত্রটি পরম শুভক্ষণে জন্মেছে। তার সুখ ও সম্ভোগের তুলনা নাই। কিন্তু একটা ব্যাপারে জাঁহাপনা আপনি নিজে সতর্ক থাকবেন। এই পুত্রের দিকে আপনার বিশেষ পক্ষপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকে আপনি বিরত হওয়ার চেষ্টা করবেন। না হলে আখেরে আপনার চক্ষুরত্ন নষ্ট হবে।

গণকদের কথায় বাদশাহ বেশ রুষ্ট এবং চিন্তিত হয়ে উজিরকে হুকুম দিলেন, এই ছেলেকে আমার চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মতো দূরে রাখবে। এক কাজ কর, একে আর এর মাকে দূরে কোথাও নির্বাসন দিয়ে এস। এ পাপ আমি আর প্রাসাদেই রাখতে চাই না।

সুলতানের হুকুম তামিল করা হলো।

এক নির্জন বনে তাদের জন্য একটি প্রাসাদ বানিয়ে সেখানে মা এবং ছেলেকে রেখে এল উজির।

এরপর বহুকাল কেটে গেছে। কনিষ্ঠ পুত্র নূরজিহান ঘোড়ায় চেপে সারা বন-প্রান্তর ছুটে বেড়ায়।

একদিন ঐ বনে বাদশাহ জইন অল মুলুক শিকারে গেলেন। এবং এক সময় আত্মজের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন। কিন্তু কি নিষ্ঠুর নিয়তি, পুত্রের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন। শিকার মাথায় উঠলো, তখুনি তিনি ফিরে এসে নিজের প্রাসাদে বন্দী হয়ে রইলেন। বাদশাহর আর বুঝতে বাকী রইল না, ঐ ঘোড়সওয়ার যুবকই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র! কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি, ইয়া আল্লা! একি হলো আমার, সব সন্তানের পিতাই পুত্রদের দেখে পুলকিত হয়, কিন্তু আমার ভাগ্যে এই আঁধিয়া জুটলো?

দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা হকিম বদ্যি এল। তারা পরীক্ষা করলো বাদশাহর চোখ। এবং সবাই এক মত হয়ে রায় দিল, কোন সাধারণ দাওয়াই-এ এ ব্যাধি সারবার নয়। তাঁর অন্ধত্ব সারাবার একটি মাত্র উপায় আছে, কিন্ত সে বড় দুঃসাধ্য কর্ম, অবশ্য সে পরামর্শ আমরা জাঁহাপনাকে দিতে পারি না।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কি এমন দুঃসাধ্য কর্ম?

—চীনের এক সমুদ্রকন্যা!

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো পঞ্চান্নতম রজনী:
আবার সে বলতে থাকে:

হকিমরা বললো, চীনের এক অভ্যন্তর-প্রদেশে সে মেয়ে বাস করে। তার পিতা প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশাহ ফিরোজশাহ। শাহ-কন্যার ফুল-বাগিচায় একটি সমুদ্র-গোলাপ গাছ আছে। সেই গাছের ফুল যদি সংগ্রহ করে আনা যায় তবে তা দিয়েই শুধু সুলতানের চোখের ব্যাধি সারানো সম্ভব হবে। ঐ গোলাপ দৈবগুণ-সম্পন্ন। যে-কোনও জন্মান্ধ তার দৃষ্টি ফিরে পাবে তার গুণে।

তৎক্ষণাৎ বাদশাহ জইন অল মুলুক ঘোষণা করে দিলেন, চীনদেশ থেকে যে ঐ সমুদ্র-গোলাপ এনে দিতে পারবে তাকে তিনি তাঁর সারা সলতানিয়তের অর্ধেক দিয়ে দেবেন।

কিন্তু এমন দুঃসাধ্য কাজে অপরে এগিয়ে আসবে কেন? বাদশাহর বড় দুই পুত্র জাহাজে পাল তুলে যাত্রা করলো চীনের উদ্দেশে। ছোট ছেলে নুরজিহানও আলাদা ভাবে যাত্রা করলো চীনদেশে। তার একমাত্র পণ, পথ যত দুর্গমই হোক, যত প্রাণ-সংশয় বিপদই সামনে আসুক, সে কিছুতেই ডরাবে না। যেন তেন প্রকারে সে ঐ সমুদ্র-গোলাপ সংগ্রহ করে আনবেই আনবে। অর্ধেক সলতানিয়তের লোভে নয়, তার জন্মদাতা পিতার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

জাহাজে পাল তুলে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া নয়, সে বেছে নিল মাটির পথ। তার প্রিয় অশ্বে জিন লাগাম চাপিয়ে সেইদিনই সে ছুটে

চললো বন মরুপ্রান্তর শহর গ্রাম গঞ্জ অতিক্রম করতে করতে।

একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবিরামভাবে সে চলতে থাকে। অবশেষে একদিন সে গভীর অন্তহীন বিশাল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। কোথায় পথ, কীভাবে তার মধ্য থেকে বাইরে বেরুনো যেতে পারে, কিছুই তার জ্ঞাত নয়। গাছের নিবিড় ডাল পালায় উপরের আকাশের কণামাত্র সূর্যালোক প্রবেশ করতে দেয় না। ঘন মসীময় অন্ধকার। দিন কি রাত কিছুই বোঝা যায় না। তার মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ করে চলতে থাকে সে। যত পথই অতিক্রম করে, এক বিন্দু আশার আলো দেখতে পায় না, তবু সে অকুতোভয়, উন্নতশির হয়ে পথ চলে। কত রকম পশু-পাখীর ভয়াল ভয়ংকর আওয়াজ, কিন্তু নুরজিহান ওসব কানে তোলে না। বুঝতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে কোনও এক হিংস্র জন্তুর মুখ-গহ্বরে সে ঢুকে যেতে পারে, কিন্তু তাতেও তার পথ চলার বিরাম নেই।

সামনে ঘন কালো অন্ধকার। হঠাৎ নুর দেখলো দুটি সোনার রঙের গোলক তার দিকে এগিয়ে আসছে। নুর বুঝতে পারলো কোনও ভয়ংকর শিকারী জানোয়ারের চোখ। মৃত্যু অবধারিত, পালাবার পথ নাই, পালাবার চেষ্টাও সে করলো না।

ক্রমে ক্রমে স্বর্ণগোলক দুটি আরও নিকটবর্তী হলো। এবার সে বুঝতে পারলো ছোটখাটো পাহাড়ের মতো একটা দৈত্য-দানব তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

নুর আল্লাহর নাম করে সালাম ঠুকলো দৈত্যটাকে। নুর-এর সুন্দর চেহারা দেখেই বোধহয় দৈত্যটা বেশ খুশি-খুশি ভাব নিয়ে কাছে এসে বসে পড়লো। নুরও ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। এবং ঝোলা থেকে একখানা তন্দুরী রুটি বের করে দৈত্যটার দিকে বাড়িয়ে দিল। রুটিখানা নিয়ে মুখে পুরে দিয়েই দৈত্যটা প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলো।

—বাঃ, তোমার খাবার তো বড় চমৎকার খেতে? মানুষরা কী করে এত সুন্দর খাবার বানাতে পারে?

নুর বলে, এ আর এমন কি ভাল খাবার। আমাদের দেশে হলে তোমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর খানা-পিনা খাওয়াতে পারতাম।

দৈত্য অবাক হয়ে বলে, এর-চাইতেও ভাল। সে কেমন খাবার? কৈ দেখি, আর একখানা দাও তো, ভাই!

নুর আর একখানা রুটি বের করে দৈত্যের হাতে দেয়। দৈত্যটা খুব খুশি হয়ে বলে, এমন অপূর্ব জিনিস তুমি আমাকে খাওয়ালে বন্ধু, কি করে তোমার এ উপহারের প্রতিদান দিই বলতো?

নুর বলে, না না, তার কী দরকার! সামান্য দুখানা রুটিই তো দিতে পেরেছি আপনাকে!

—সামান্য বলছো এই খাবারকে? আমার শরীর জুড়িয়ে গেছে তোমার রুটি খেয়ে। যাক, এখন বল কী কাজে লাগতে পারি তোমার? এরপর যদি

তোমার কোনও কাজে না লাগতে পারি, তবে দিল আমার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

নুর বললো, সত্যিই যদি আমার কিছু উপকার করতে চান তবে একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে!

—কী কাজ বল? তিন ভুবনের যেখান থেকে যা এনে দিতে বলবে, এক্ষুণি তা হাজির করে দেব আমি।

নুর বললো, না, আপনাকে এনে দিতে হবে না। আমাকে নিয়ে যেতে হবে এক জায়গায়।

—কোথায়?

শাহেনশাহ ফিরুজের কন্যার ফুল-বাগিচায়। সেখানে শুনেছি, সমুদ্র-গোলাপ গাছ আছে। ঐ গোলাপ ফুল আমার দরকার। আমি নিজে হাতে তা চয়ন করবো।

নুরের কথা শুনে দৈত্যের মুখমন্ডল সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুহূর্তে। বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে তারপর বললো, এ অসম্ভব! ঐ বাগানে বেহেস্তের জিন পরীরা পাহারা দেয়। ওখানে তো আমার যাওয়া সম্ভব নয়, বন্ধু।

নুর বলে, আপনি আমাকে বাগানের কাছে পৌঁছে দিন। তারপর কী করে কার্যোদ্ধার করতে হয় আমি দেখবো।

দৈত্য বললো, ঠিক আছে, চল আগে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই তো! তারপর ভাবা যাবে কি ভাবে কি করা যায়। এস, আমার কাঁধে এসে বসে পড়। আমি তোমাকে নিয়ে বায়ুবেগে উড়ে যাবো চীনদেশে।

বায়ুর বেগই বটে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নুরকে নিয়ে দৈত্যটা বাদশাহ ফিরুজের কন্যার প্রমোদ-উদ্যানে এসে উপনীত হলো। বাগানের অদূরে নুরকে নামিয়ে দিয়ে সে বললো, ঐ দ্যাখো, দেয়ালে ঘেরা সেই বাগান। একটু এগোলেই সদর ফটক দেখতে পাবে। তুমি চলে যাও। আমি এখানে অপেক্ষা করবো তোমার জন্য। কাজ শেষ করে ফিরে এস, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব তোমার মুলুকে।

বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে নুর-এর দুচোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে বহু বিচিত্র বর্ণের কত না ফুলের সমারোহ। নুর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে।

বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা পুকুর। শান-বাঁধানো তার ঘাট। সেই পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা ফুলের গাছ। গাছে ফুটে আছে একটি মাত্র লাল রঙের ফুল। সে ফুলের মদির গন্ধে সারা বাগান আমোদিত হয়ে আছে। নুর বুঝতে পারলো এই সেই সমুদ্র-গোলাপ।

তখুনি জলে নেমে পড়লো। সাঁতরে গিয়ে ছিঁড়ে আনলো ডালসমেত ফুলটা। পুকুরের পাড়ে উঠে ফুলটাকে অতি সযত্নে কুর্তার নিচে কোমরে গুঁজে নিল সে। তারপর বাগানটার চারপাশ ভাল করে দেখতে লাগলো।

এক জায়গায় এসে নুর দেখতে পেল এক পরমাসুন্দরী কিশোরী কেশ

এলায়িত করে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ সুন্দরীর রূপ-সুধাপান করতে থাকলো সে। আশা করতে লাগলো, হয়তো একটুক্ষণ পরেই ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু না, অনেকক্ষণ পাশে বসে থাকার পরও ওর ঘুম ভাঙ্গলো না। এদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে, আর অপেক্ষাও করা যায় না, নূর তার হাতের একটা আংটি খুলে কিশোরীর আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বাগানের বাইরে বেরিয়ে এল।

দৈত্যটা হাসিমুখে স্বাগত জানালো নূরকে, কী, কাজ হয়েছে ?

নূর বললো, হ্যাঁ। যে জন্যে এসেছি তা পেতে কিছু বেগ পেতে হয়নি।

—তা হলে আর একখানা রুটি ছাড়, বন্ধু।

নূরও হাসলো, এই নাও, একখানা নয় দুখানা দিলাম। বাব্বা এই সামান্য রুটি তোমার এত ভাল লেগেছে ?

নূরকে কাঁধে চাপিয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই দৈত্যটা জাইন অল মুলুকের প্রাসাদে এনে নামিয়ে দিল।

সমুদ্র-গোলাপের গন্ধ নাকে শুঁকতেই সুলতান জাইন দিব্যদৃষ্টি মেলে তাকালেন। আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আমি সব দেখতে পাচ্ছি নূর, সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

এরপর সুলতান উজির আমির ওমরাহদের ডেকে ঘোষণা করে দিলেন, এখন থেকে আমার সারা সলতানিয়তের অর্ধেক মালিক হবে আমার কনিষ্ঠ পুত্র নূরজিহান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো সাতান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

নূরজিহান একটা বিরাট বাগিচা বানিয়ে তার ভিতরে একটা পুকুর তৈরি করে সেই পুকুরের মাঝখানে গোলাপের ডালটাকে পুঁতে রাখলো।

বড় দুই পুত্র শূন্য হাতে ফিরে এল। সুলতান দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন এবং তাঁর পুরস্কারস্বরূপ ছোট ভাই অর্ধেক সলতানিয়তের মালিক হয়েছে দেখে তারা বিমর্ষ এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে বললো, ওসব সমুদ্র-গোলাপ টোলাপ কিছু নয়, সবই শয়তানের যাদু।

পুত্রদের এবম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে সুলতান তাদের ডেকে যাচ্ছেতাই ভাবে বকলেন, তোমরা কি আল্লাহর সৃষ্টি গাছ-গাছড়ার গুণাগুণও স্বীকার করতে চাও না ? তাঁর অপার মহিমা কে বুঝতে পারে ? তবে শোনো একটা গল্প বলি ঃ

এক সময়ে হিন্দুস্থানের এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর হারেমে ছিল শতাধিক পরমাসুন্দরী বাঁদী। সারা দুনিয়া থেকে বাছাই করে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর একটিও সন্তান হলো না। সেই

দুঃখে বাদশাহ কাতর হলেন।

যাই হোক অবশেষে তাঁর সর্বকনিষ্ঠা বাঁদী একসময় গর্ভবতী হলো, এবং যথাসময়ে ফুটফুটে সুন্দর একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করলো। মেয়ের মা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। বাদশাহ মনে-প্রাণে কামনা করেছেন, তাঁর যেন একটি পুত্র সন্তান হয়। এখন যদি তাঁকে বলা হয় কন্যা জন্মেছে, তবে তিনি সে দুঃখ হয়তো সহ্য করতে পারবেন না। তাই সুলতানকে সে খবর পাঠালো যে পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু গণৎকার বলেছে পুত্রের বয়স দশ বছর পুরো না হওয়া পর্যন্ত সুলতান যেন তার মুখদর্শন না করেন। তাতে ভয়ানক অনিষ্ট হবে।

মেয়েটি যখন দশে পা দিল, সেই সময় থেকে তার মা তাকে ছেলের সাজে সাজিয়ে রাখতে লাগলো। শুধু সাজে-পোশাকেই নয়, শিক্ষা-দীক্ষা চাল-চলনও তার ছেলের ধাঁচে বদলে দিতে লাগলো সে। এইভাবে মেয়েটি দিনে দিনে একটি বালকের ন্যায় আচার আচরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়লো।

সারাদিন সে শাহজাদার বেশে সেজে-গুজে থাকে। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়ায়। তলোয়ার খেলে, শিকার করতে বেরোয়।

সুলতানের আনন্দ আর ধরে না! পুত্র-গর্বে গর্বিত তাঁর বুক। তাঁর ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার-এর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন সুলতান। ভাবেন, এত বড় বিশাল সলতানিয়ত, কিন্তু এই পুত্রটি নাহলে সবই ছারখার হয়ে যেত একদিন! খোদা বহুত মেহেরবান, তাঁকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তিনি।

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে থাকেন সুলতান।

আরও পাঁচ বছর কেটে গেল। পাশের দেশের এক সুলতান-কন্যার সঙ্গে পুত্রের শাদীর কথা পাকা করলেন তিনি এবং সে কথা সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন সারা দেশে।

শাহজাদী একদিকে শিহরিত, অপরদিকে আতঙ্কিত হলো। অস্থির মনে সে একা একা ঘুরে বেড়ায় মাঠে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে। এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে সে রেহাই পাবে কি করে?

একদিন সন্ধ্যায় সে এক বনের মধ্যে বিচরণ করছিল। এমন সময় এক গাছের নিচে এক জিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শাহজাদীর। পরম রূপবান সে।

শাহজাদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে জিন তাকে শুভেচ্ছা জানায়। শাহজাদীও জীনের অসামান্য রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দুজনের বেশ ভাব জমে ওঠে। শাহজাদী তার আসন্ন বিবাহ এবং তার সমূহ বিপদের কথা তাকে বলে।

জিন তাকে তার নিজের পুরুষত্ব প্রদান করে শাহজাদীর নারীত্ব নিজের দেহে বদল করে নিয়ে বলে, প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তাই আমার পুরুষত্ব তোমাকে দিয়ে তোমার নারীত্ব গ্রহণ করলাম আমি। কিন্তু একটা শর্ত, অতি সঙ্গোপনে রাখবে এ সংবাদ, কেউ যেন না জানতে পারে। তোমার কাজ সমাধা হয়ে গেলে আবার তুমি আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে!

এরপর যথাসময়ে শাহজাদী বরের সাজে সেজে-গুজে পালকীতে বসলো। মহা ধুমধামে শাদীপর্ব সমাধা হয়ে গেল। এবং সেই রাতেই পাত্রী গর্ভবতী হলো। এর ঠিক নয় মাস পরে একদিন একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল সে। স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বামী বললো, যাক, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। তুমি আমাদের বংশ রক্ষা করেছ। এবার আমার দায়িত্ব মোটামুটি শেষ। তুমি এখন থেকে নিজের পুত্রকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে এই হারেমে বাস কর। আমি আমার কাজে ব্যস্ত থাকবো এখন থেকে।

সেইদিনই সে বনে প্রবেশ করলো জিনের সন্ধান করতে। দেখাও পেল তার। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তার! শরীর শীর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু পেটটা বিরাট একটা ধামার আকার ধারণ করেছে।

শাহজাদী বললো, আমার ওয়াদা পূরণ করতে এসেছি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তোমার দয়ায় আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। সবদিকে আমার কুল মান রক্ষা হয়েছে। যাক্, এবার তোমার জিনিস তুমি ফেরত নিয়ে আমার নারীত্ব আমাকে ফিরিয়ে দাও।

জিন কেঁদে ফেললো, তুমি তোমার কথা ঠিকই রাখতে পেরেছ, কিন্তু আমি পারিনি।

—কেন, কি হয়েছে?

জিন বলতে থাকে ঃ তোমার নারীত্ব নিয়ে আমি অতি সযত্নে সাবধানে লালন করছিলাম। কিন্তু কাল হলো আমার কামনা। একদিন নিশি রাতে দল বেঁধে কয়েকটা জিন উড়ে যাচ্ছিল আকাশ পথে। ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে নিচে নেমে আসে। ওদের মধ্যে একটি উঠতি বয়সের ছোকরা জিনকে দেখে আমি পাগল হয়ে উঠি। সেই রাতে সব কান্ডজ্ঞান হারিয়ে তার সঙ্গে রতিরঙ্গ করি। আঃ, সে কি পরমানন্দ তোমাকে কি করে বোঝাবো! যদিও তুমি জন্মগতভাবে নারী, তবুও নারীত্বের আস্বাদ তুমি পাওনি কখনও। আমি পুরুষ ছিলাম যখন তখন অনেক মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছি। তাতে যে সুখ পেয়েছি, সে সুখের তুলনায় রমণীরূপে পুরুষকে উপভোগ করার সুখ অনেক গুণ বেশি।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত, লজ্জিত, তোমার বহু যত্নে লালিত এই নারীত্ব আমি অক্ষত রাখতে পারিনি। এখন কথা হচ্ছে, এই পাপবিদ্ধ নারীদেহ ফিরিয়ে নিয়ে তুমি কি করবে? তার চেয়ে আমার পুরুষত্ব নিয়েই তুমি সারাজীবন কাটাও।

শাহজাদী বললো, আমার তাতে ভালই হবে, কিন্তু তোমার কোনও খেদ থাকবে না?

জিন বলে, খেদ? কি বলছো তুমি? নারীদেহ ধারণ করে যে অমৃতের স্বাদ আমি পেয়েছি, পুরুষের পক্ষে তা আহরণ করা কি সম্ভব? তুমি কিচ্ছু ভেবে না, তোমার এই নারীদেহ আমাকে অনন্ত সুখের সন্ধান দিয়েছে। এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না।

সুলতান জাইন অল মুলুক বললেন, এই গল্প থেকেই বুঝতে পারছ তোমরা আল্লাহর এই জগতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর ইচ্ছাতে একটা মেয়েও ছেলেতে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং আজ আমার ছোট ছেলের চেষ্টায় আল্লাহর করুণায় আমি আমার অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, একথাই বা শয়তানের যাদু বলে ব্যঙ্গ করছো কেন? তাঁর করুণা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। সুতরাং তোমরা এবার বিদায় হও। আমি আমার প্রতিশ্রুতি মতো নুরজিহানকে সলতানিয়তের অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছি।

এবার আমরা বাদশাহ ফিরুজের কন্যা সুন্দরী লিলির দিকে চোখ ফেরাই:

প্রতিদিন বিকালে শাহজাদী লিলি তার শখের উদ্যানে বেড়াতে যায়। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ফুলগাছের পরিচর্যা করে নিজের হাতে।

সেদিনও সে বাগানে গিয়েছিল। গাছগুলো দেখাশুনা করতে করতে এক সময় সে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর শাহজাদা নুরজিহানের আবির্ভাব ঘটে। এবং সে তার হাতের আংগুলে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ঘুম ভাংগতেই শাহজাদী লিলি তার সাধের গোলাপ গাছটা দেখতে না পেয়ে আঁৎকে ওঠে। তারপর নিজের আংগুলে অচেনা এক আংটি দেখে বিস্মিত হয়। এ কি করে সম্ভব? তার ফুলবাগিচায় বাইরের মানুষ প্রবেশ করলো কি করে? এমন সুরক্ষিত স্থানে তো কারো পক্ষে আসা সম্ভব নয়?

শাহজাদী হতাশায় ভেংগে পড়ে। সমুদ্র-গোলাপ তার চোখের মণি, বুকের কলিজা। তাকে ছাড়া সে বাঁচবে কি করে? কে সেই দুর্বৃত্ত, যে তার যথা-সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে?

শাহজাদী বাদশাহ ফিরুজের কাছে সব কথা জানালো।

—বাবা, ঐ সমুদ্র-গোলাপ ছাড়া আমি বাঁচবো না। ও আমার চোখের মণি। ওকে দেখতে না পেয়ে আমার চোখের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যদিও আমি নাজুক এবং নাবালিকা তবু বাবা ঐ চোরটাকে আমি খুঁজে বের করবোই।

সেইদিনই শাহজাদী তার সশস্ত্র নারী-বাহিনী সংগে নিয়ে পিতার মুলুক ছেড়ে সারকাস্তানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। এবং যথাসময়ে সে এসে পৌঁছলো সুলতান জাইন অল মুলুকের শহরে।

সে সময় সারা শহর আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে হাসছিল। যুবকের ছদ্মবেশ-ধারী শাহজাদী লিলি পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে জানলো, সুলতান জাইন অল মুলুক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দুঃসাধ্য সাধন করে চীন দেশ থেকে সমুদ্র-গোলাপ এনে পিতার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তারই আনন্দে আজ মেতে উঠেছে সারা দেশ। সুলতান মুক্তহস্তে দান ধ্যান করছেন। গোটা বছর ধরে চলবে এই উৎসব।

শাহজাদী লিলি আনন্দে নেচে ওঠে। যাক, তাহলে তার হারানিধির হদিশ পাওয়া গেল।

খুব ভাল করে শাহজাদার ছদ্মবেশে সেজেগুজে সে সুলতানের প্রাসাদে

এসে উপস্থিত হলো।

প্রাসাদের চত্বরে একটা ফুলের বাগিচা, শাহজাদী দেখতে পেল তার সমুদ্র-গোলাপ ফুটে আছে একটা বিরাট চৌবাচ্চার মাঝখানে।

সকলের অলক্ষ্যে অনায়াসেই সে তার গোলাপ গাছটাকে লোপাট করে পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু ঐ চোরটাকে সে একবার নিজের চোখে দেখতে চায়। তাই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে শাহজাদা নূর তার বাগানে এল। শাহজাদার আলোক-সামান্য রূপ-যৌবন দেখে শাহজাদী লিলি বিমুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেল। ভুলে গেল সে তার প্রতিহিংসা। অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইল নূরের মুখের দিকে।

বেশ কিছু পরে সম্বিত ফিরে পায় লিলি। হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে আবার তাকায় সামনে। কিন্তু কোথায় সেই চোর? নিমেষে উধাও হয়ে গেছে সে।

—ওঃ, চোরটা দেখছি শুধু আমার গোলাপ-চারাটাই চুরি করেনি, এখন দেখছি আমার বুকের ভালোবাসাও নিঙড়ে নিয়ে পালিয়েছে। ইয়া আল্লাহ! একি হলো আমার? এর জন্যে আমি কার কাছে নালিশ জানাবো?

বিরহ-বেদনায় হৃদয় কাতর হলো শাহজাদীর। ঐ বাগিচার ঘাসের ওপরেই সে বসে পড়লো।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন সে দেখলো চোর চূড়ামণি আর ফিরে এল না, তখন সে হতাশ হয়ে নিজের বাহিনীর মধ্যে ফিরে এল।

এক টুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে নূরজিহানকে একখানা খৎ লিখলো সে। তারপর তার পরিয়ে দেওয়া আংটিটাসহ চিঠিখানা সে পাঠিয়ে দিল এক পরিচারিকার হাতে।

শাহজাদা নূর তার আংটি দেখে চমকে উঠলো। এক অজানা আনন্দে দুলে উঠলো বুক। তবে কি সে এসেছে? তবে কি তার দেখা পাবো? চিঠি-খানা সে খুলে পড়তে থাকলোঃ

পরমপিতা আল্লাহর অশেষ করুণায় তোমার দর্শন পেলাম। তিনিই তোমাকে নিপুণ হাতে নিখুঁতভাবে গড়েছেন। আহা! কি নির্দয় তিনি। আমাদের অঙ্গের মতো তোমার দেহেও তো তিনি একটু আধটু খুঁতটুত রেখে দিতে পারতেন। একে একপেশে ছাড়া আর কি বলবো, বল? তোমাকে যে দেখবে, প্রথম দর্শনেই তার সব অহঙ্কার, গর্ব আভিজাত্য লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ের উপর।

তোমার চোখের ঐ যাদু আমাকে নিয়ত আকর্ষণ করছে কেন? আমার কী হবে বলতো? আমি কি তোমার রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবো? তাই কি তুমি চাও? যে তুষের অনল জ্বলছে আমার বুকে তা কি কোনদিন নিভবে? আর সেই শাশ্বত বাণী কি মিথ্যে হয়ে যাবেঃ এক হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষা আর এক দরদী হৃদয় ছাড়া কেউ শুনতে পায় না।

আজ আর নয়, এখানেই ইতি করছি।

নুরজিহান চিঠিখানা বন্ধ করে আবিষ্ট হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কাগজ কলম নিয়ে জবাব লিখতে থাকলো।

শোনও রজত-শুভ্রা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে আমার সব চেতনা তোমাতেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জগতে যা কিছু অপরূপ সুন্দর দেখি তার মধ্যেই তোমার মুখ দেখতে পাই আমি। আকাশের তারারা তোমাকে সুনজরে দেখে না। তার কারণ তুমি ওদের সব জ্যোতি কেড়ে নিয়েছ যে।

তোমার চিঠির শব্দগুলো তীর হয়ে আমার কলিজা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলছে। তোমাকে দেখার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য আমার হৃদয়ের কান্না কি তুমি শুনতে পাচ্ছো না, প্রিয়তমা। আর অহেতুক বিলম্বে কি বা প্রয়োজন? মিলনের সুতবন্ধ তো তৈরি হয়ে গেছে। তুমি পায়ে পায়ে চলে এস না আমার বাগানে? দেখবে কত ফুল, কত ফল, ঝরনা, কত কোয়েল রঙে রঙে গানে গানে মুখর করে রেখেছে। এসো না?

বিরহের যে কি যন্ত্রণা সে তো ভুক্তভোগী বিরহিণী ছাড়া বুঝতে পারে না। তবে কি তোমার বুকে কোনও কষ্ট নাই? আমার দশা তো জবাই করার পর দাপানো মোরগের মতো। দিন রাত ছটফট করছি। সুতরাং আর দেরি নয়, শীঘ্র চলে এস।

আমার কলম আর সরছে না। হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে। সর্বাঙ্গ থরথর করছে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে নুরজিহান পরিচারিকা দূতীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, তোমার মালকিনকে বুঝিয়ে বলো আমার অসহায় অবস্থা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো উনষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চিঠিখানা পেয়ে লিলির দেহ মনে শিহরণ জাগে।

—ওরে, তোরা আমায় সাজিয়ে দে। আমি তার অভিসারে যাবো।

সখীরা অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিল শাহজাদী লিলিকে। তারপর সে এসে উপস্থিত হলো নুর-এর ফুল-বাগিচায়। সেখানে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল শাহজাদা।

দুজনের মিলন হলো।

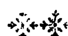
এরপর ওরা অমর্ত্য প্রেমের সায়রে গা ভাসিয়ে সুখে সম্ভোগে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামে। দুনিয়াজাদ দিদিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলে, ওঃ, কি চমৎকার গল্প দিদি? আর কি সুন্দর করেই না বলতে পার তুমি? এই রকম আর একটা শোনাও না?

শাহরাজাদ মুচকি হেসে বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো বোন। অবশ্য মহামান্য জাঁহাপনা যদি আজ্ঞা করেন—

সুলতান শাহরিয়ার বলে, আমার অনুমতির কোনোও প্রয়োজন নাই। শাহরাজাদ তুমি তো জান, একটা রাতও তোমার গল্প না শুনলে আমি ঘুমোতে পারি না।

শাহরাজাদ বলে, তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আরও একটা মজার কাহিনী শোনাচ্ছি।

কাইরো শহরে এক সময়ে এক নিষ্ঠাবান দরিদ্র মুচি বাস করতো। পুরোনো জুতো মেরামত করে কোনরকমে কায়-ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতো। তার পয়সা ছিল না সত্যি, কিন্তু সততা ও সারল্যের জন্য বহু বিত্তবানরাও তাকে হিংসে করতো।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এ রকম এক নিরীহ মানুষের ভাগ্যে জুটেছিল এক খাণ্ডারণী বৌ। তার মতো পরশ্রীকাতর কুচুটে মুখরা নীচ প্রকৃতির নারী বড় একটা দেখা যায় না। তার অমানুষিক অত্যাচারে অসহায় স্বামীটি সদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো।

মুচির নাম মারুফ। তার বৌ ফতিমা।

একদিন ফতিমা এসে স্বামীকে বললো, শোনো, আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় আমার জন্যে খানিকটা 'কুনাফা' হালওয়া নিয়ে এস। হ্যাঁ, হালওয়াটা যেন মধু দিয়ে মাখিয়ে আনতে ভুলো না। আমি আবার চিনির রসফস পছন্দ করি না।

মারুফ বিনীতভাবে বলে, শোনো চাচার মেয়ে! হাতে এখনও একটা দিরহাম নাই। তবে আশা করছি আল্লাহ আজ দেবেন। যদি পাই তবে তোমাকে কুনাফা খাওয়াবো আজ।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ফতিমা, তোমার ঐ সব বুজরুকির বাক্যি আমি শুনতে চাই না। রোজগার করতে পারবে কি পারবে না, সে আমার দেখবার নয়। আমি তোমাকে যা হুকুম করলাম তা আমার চাই-ই। তা সে তুমি চুরি করে আন বা রোজগার করে আন আমার জানতে ইচ্ছে নাই। কিন্তু কুনাফা না নিয়ে যদি খালি হাতে ঘরে ফেরো তবে তোমার বরাত খুব খারাপ হবে, এই বলে দিলাম। তোমার ঐ আল্লাহ-ফাল্লাহর দোহাই আমি শুনবো না তখন।

মারুফ মৃদু প্রতিবাদ করতে যায়, আহা অমন করে বলো না বিবিজান, আমরা সবাই তো তাঁরই করুণায় বেঁচে আছি। তিনি না জোটালে কার সাধ্য

জোটাতে পারে।

—ও সব ফালতু কথা রাখ, অক্ষম অপদার্থরাই ও সব বলে। যাই হোক, আমার সাফ কথা, কুনাফা আমার চাই—

এই বলে সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

মারুফ বাজারে গিয়ে তার ছোট্ট দোকানটা খুলে খদ্দেরের প্রত্যাশায় বসে রইল। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, সারাটা দিনে কেউ এল না তার কাছে। একটা দিরহামও রোজগার হলো না।

ফতিমার লাঞ্ছনার ছবি মনে ভাসতেই আতঙ্কে আঁৎকে উঠলো সে। কুনাফা দূরে থাক রাতের রুটি-সব্জীই বা জোগাড় হবে কি করে ?

বাড়ির পথে চলতে থাকে, কিন্তু পা আর চলে না। এক সময় সে বাজারের বড় মেঠাই-এর দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। হতাশ হয়ে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে দোকানের সাজানো মিঠাই মণ্ডার থালাগুলোর দিকে।

দোকানী বৃদ্ধ সদাশয় ব্যক্তি। মুচি মারুফকে সে বিলক্ষণ জানে। তার মতো সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ এ শহরে খুব বেশি নাই, সেকথা কেই বা না জানে ? কাছে এগিয়ে এসে দোকানী মারুফকে জিজ্ঞেস করে, কি মারুফভাই, কিছু নেবে ভাবছো ?

মারুফ আরও মুষড়ে পড়ে, হ্যাঁ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বিবি বলেছিল কুনাফা নিয়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহ আজ একটি আধলাও আমার জন্যে বরাদ্দ করেননি। তাই খালি হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে।

দোকানী আরও কাছে এগিয়ে এসে বলে, সে কি কথা, না হয় নাই হয়েছে রোজগার, তা বলে ঘরের বিবি সাধ করে একটা জিনিস খেতে চেয়েছে তা সে খেতে পাবে না, তা কি হয় ? আমি যখন জেনেছি, তখন আর তোমার ও নিয়ে দুর্ভাবনা করার কারণ নাই, মারুফভাই। তোমার বিবিজান কতটা খেতে পারবে কুনাফা—নিয়ে যাও আমার দোকান থেকে। পয়সার জন্যে খুঁতখুঁত করো না। সে তুমি যে দিন বাড়তি রোজগার করতে পারবে দিয়ে যেও। তোমার মতো মানুষকে একটু খুশি করতে পারাও তো সৌভাগ্যের কথা মারুফভাই।

একটা ভারি বোঝা মাথা থেকে নেমে গেল, মারুফ দোকানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়লো।

—আমাকে এক পোয়া কুনাফা দাও তাহলে।

দোকানী হালওয়ার রেকাবীতে জমানো কুনাফার চাকে ছুরি বসিয়ে একটা চাঁই কেটে তুলে পাল্লায় চাপিয়ে দেয়।

মারুফ বলে, কুনাফাটুকু মধু মাখিয়ে দাও ভাইসাব।

দোকানী বলে, মধু আজ ফুরিয়ে গেছে, যাই হোক ঘন চিনির সিরায় ডুবিয়ে দিচ্ছি। খেতে মধুর চেয়ে খারাপ লাগবে না। আমার বেশির ভাগ খদ্দেরই তো মধু ছেড়ে চিনির সিরাই পছন্দ করে।

মারুফ আমতা আমতা করে বললো, বেশ তাই দাও।

বাড়ির দরজায় পা রাখতেই ছুটে আসে জাঁহাবাজ ফতিমা।

—কই, কই আমার কুনাফা কই ?

হালওয়ার মোড়কটা বাড়িয়ে ধরতেই বাজের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে সে ঘরে ঢুকে যায়। এবং একটুক্ষণ পরে আবার সে গাঁক গাঁক করে তেড়ে আসে মারুফের দিকে।

—এই তোমার মধুর কুনাফা! আমি না তোমাকে বলেছিলাম মধু মাখিয়ে আনবে? কিন্তু তা না এনে এই ছাইপাঁশ চিনির সিরায় চুবিয়ে এনেছ কেন? এ কি কোনও মানুষে মুখে দিতে পারে?

এই বলে সে কুনাফাসুদ্ধ বেকারীখানা ছুঁড়ে মারে মারুফের মাথায়। এবং এতেও সে ক্ষান্ত হয় না, বাঘিনীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর ওপর। এক হাতে চুলের মুঠি ধরে আর এক হাতে কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকে বেপরোয়াভাবে।

রেকাবীর আঘাতে মারুফের একটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। ঠোঁট বেয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই সেও কিঞ্চিৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। স্ত্রীকে মুক্ত করার জন্য ঈষৎ বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয় মারুফ। এর ফল আরও মারাত্মক হয়। ফতিমা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ে, ওগো কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর, রক্ষা, কর, এই শয়তানটা আমাকে মেরে ফেললো—

নারী-কণ্ঠের আর্তনাদে পাড়া-পড়শীরা ছুটে এসে স্বামী-স্ত্রীর ইত্যাকার লড়াই দেখে লজ্জাহত হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মারুফ স্ত্রীর আঘাত সামলাবার জন্য ফতিমার হাত মুষড়ে ধরেছিল। তার ফলে ওর হাতের একটা আঙ্গুল গেছে ভেঙ্গে। আর ফতিমার রেকাবীর আঘাতে মারুফ হারিয়েছে একটা দাঁত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ ও বুক।

পাড়া-পড়শীরা এই রকম একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করবে ভেবে পায় না।

বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতিবেশীরা জানতে পারে মধুর বদলে চিনির রসের কুনাফা আনা হয়েছে বলেই এমন অঘটন ঘটেছে।

প্রতিবেশীরা ফতিমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, মধুর চেয়ে চিনির সিরা মাখানো কুনাফা খেতেই বেশী ভাল। এতে মারুফের কসুর কিছু হয়নি। আমরা তো সবাই চিনির রসের কুনাফাই খাই। এতে এতো ক্রোধের কি কারণ হতে পারে? আর কি জন্যে বা তুমি তার একটা দাঁত ভেঙ্গে দিলে, ভাল মানুষের মেয়ে? ছিঃ ছিঃ, এ তোমার দারুণ অন্যায়—দারুণ অন্যায়!

এই বলতে বলতে পড়শীরা বিদায় নিল।

আগন্তুকরা চলে যাওয়ার পর ঘরের দাওয়ার এক পাশে বসে গজরাতে থাকে ফতিমা, হুম, পাড়ার লোককে তুমি আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছো? ঠিক আছে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি!

হিংস্র বাঘিনীর মতো রক্তচক্ষু মেলে সে তম্বি করতে থাকে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুনাফার টুকরোগুলো কুড়িয়ে জলে ধুয়ে একটা রেকাবীতে সাজিয়ে আবার মারুফ স্ত্রীর সামনে ধরে সোহাগ জানিয়ে আস্তে আস্তে বলে, আহা,

রাগ করে কি হবে, নাও খেয়ে নাও। কাল তোমাকে আমি আবার মধু মাখা কুনাফা এনে দেব।

কিন্তু ফতিমা এক লাথি মেরে মারুফকে নিচে ফেলে দেয়, দূর হও আমার সামনে থেকে। তুমি কি ভেবেছ তোমার এই অখাদ্য হালওয়াটা আমি বসে বসে গিলবো? আমার নাম ফতিমা, এই তোমায় আমি বলে রাখলাম, কালকের মধ্যেই তোমাকে আমি শেষ করবো।

মারুফ আর ঘাটাতে সাহস করলো না ফতিমাকে। নিজেই সে হালওয়ার টুকরোগুলো বেশ তৃপ্তি করে গলধঃকরণ করলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মারুফ তৈরি হয়ে দোকান খুলতে চলে গেল তাড়াতাড়ি। আল্লাহ আজ হয়তো তাকে বঞ্চিত করবেন না। সে মনে মনে ভাবলো, আজ যা পয়সা পাবে তার সবটা দিয়ে সে বিবির জন্যে মধুর হালওয়া কিনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কোন খদ্দের এল না দোকানে। খদ্দের এল না, কিন্তু দুজন সিপাই এসে দাঁড়ালো যম-দূতের মতো।

—চলো, কাজী সাহেবের এজলাসে যেতে হবে তোমাকে।

সিপাই দুটো মারুফকে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে কাজীর আদালতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। মারুফ দেখতে পেল পূর্বাহ্নেই তার বিবি ফতিমা হাজির হয়েছে সেখানে। তার একখানা হাত ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা। তাতে খানিকটা লাল লাল ছোপও দেখা যাচ্ছিল। ফতিমার অন্য হাতের আঙ্গুলে ধরা একটা ভাংগা দাঁত।

ভীত চকিত মারুফকে দেখে গর্জে উঠলেন কাজী সাহেব, ওই বেশরম বতমিজ এদিকে এস, তোমার কি প্রাণে একটুও ডর নাই? এই অসহায় দুর্বল নারীর ওপর তুমি নির্মম নির্যাতন চালিয়েছ? তার হাত ও দাঁত ভেংগে দিয়েছ? এত বড় স্পর্ধা তোমার?

অভিযোগ শুনে মারুফ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন ডাহা মিথ্যার সে কি জবাব দেবে? ঐ ভাংগা দাঁতটা তো তারই নিজের। অথচ ফতিমা সেটাকে তার নিজের বলে চালিয়েছে কাজীর কাছে?

মারুফকে নিরুত্তর থাকতে দেখে কাজীসাহেব ভেবে নিলেন, অভিযোগ পুরোপুরি সত্য, স্বামীটারই এই সব কাণ্ড!

তৎক্ষণাৎ তিনি জল্লাদকে হুকুম করলেন, লোকটা বদমাইশ, ওকে একশ, ঘা বেত লাগাও।

কাজীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তালিম করা হলো তখুনি। এই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে অসহায় আর্তনাদে লুটিয়ে পড়লো মারুফ। আর সেই দুষ্ট শয়তান মেয়েছেলেটার চোখ দুটো খুশিতে লক-লক করে নাচতে থাকলো।

আদালত থেকে বেরিয়ে ব্যথা-বিষ-জর্জরিত নিজের দেহটাকে কোনও রকমে টানতে টানতে এক সময়ে সে নীল নদের উপকূলে এক পড়োবাড়ির মধ্যে

প্রবেশ করে আশ্রয় নিল। দেহের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখের জল আর রোধ করতে পারে না সে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, না না, আর কখনও সে ঘরে ফিরে যাবে না ঐ জহ্লাদ মেয়েছেলেটার কাছে। তার জন্যে যদি বেঘোরে পড়ে তাকে মরতেও হয় মরবে সে।

এই পড়োবাড়িতেই সে দুদিন পড়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে নদীর ঘাটে গিয়ে একটা চালানী নৌকায় চেপে বসলো। এবং যথাসময়ে নৌকাখানা তাকে পৌঁছে দিল দামিয়েত্তায়। সেইখানেই সে বন্দরের মুটের কাজ করে কোনও রকমে দিন গুজরান করতে থাকলো।

এরপর জাহাজের কাপ্তেনের সুনজরে পড়ে একদিন সে খালাসীর চাকরী পেল। তখন থেকে শুরু হলো তার সমুদ্র-জীবন।

জাহাজের খালাসী হয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। কত নতুন নতুন শহর বন্দর, কত না বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

বড় সুখেই কাটছিল দিন। কিন্তু একদিন সব বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ঘূর্ণী ঝড় উঠলো সমুদ্রে। সেই ঝড়ের দাপটে কাঠের নৌকাখানা খান খান হয়ে গেল পলকে। সমুদ্র তখন উত্তাল। সঙ্গী-সাথীরা কে যে কোথায় তলিয়ে গেল কিছুই হদিশ করতে পারলো না মারুফ। অবশ্য তখন আত্ম-রক্ষা ছাড়া অন্যদিকে খেয়ালই বা কে রাখতে পারে?

মারুফের বরাতের জোর, সে প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেল কোনও ক্রমে। ঐ প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সে ভাঙ্গা জাহাজের একখণ্ড কাঠ ভাসতে দেখে আঁকড়ে ধরতে পারলো। এবং সেই কাঠের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে অবশেষে একদিন এসে পৌঁছলো এক সমুদ্র উপকূলে।

যতক্ষণ তীরের সন্ধান মেলেনি ততক্ষণ মারুফ প্রাণপণে পা চালিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছিল। আহার নিদ্রা নাই, অথচ অমিত শক্তি সাহস এবং সহনশীলতার কোনও ঘাটতি ঘটেনি এই ক'দিন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তীরে পৌঁছামাত্র কোনও রকমে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সে তরী-ভূমিতে বালীর বিছানায় ঢেলে দিতে পেরেছিল মাত্র। তারপর আর তার কিছুই মনে নাই।

ঘুম ভাঙ্গলো মারুফের। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে এক জমকালো সাজ-পোশাকে সজ্জিত এক প্রিয়দর্শন যুবক।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো বাষট্টিতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

—খোদা মেহেরবান, আপনি কে মালিক, এইখানে এইভাবে পড়ে রয়েছেন?

যুবকের প্রশ্নের উত্তরে মারুফ তার দুঃখের কাহিনী শোনায় তাকে। সে বলে, আপনি চলুন আমাদের শহরে। আমাদের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন

বিশ্রাম করে সুস্থ হতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার দেশ কোথায় জনাব? দেখে মনে হচ্ছে আপনি মিশরের মানুষ।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, মালিক। কাইরো শহরে আমার বাড়ি।

—কাইরো? কাইরোর কোন মহল্লায়?

মারুফ বলে লাল পথ জানেন? ঐ লাল পথে আমার ঘর।

—আপনি কি করতেন সেখানে? ওখানকার কাকে কাকে চেনেন?

—আমার জাত-ব্যবসা জুতো তৈরি করা। অতি দরিদ্র সাধারণ মানুষ আমি। আমার যারা পরিচিত তারা সবাই সাধারণ মানুষ, কেউ-কেটা নয় কেউ। যদি জানতে চান তাদের অনেকের নামই আমি বলতে পারি আপনাকে।

এই বলে সে তার পাড়া-পড়শীদের অনেকের নামই গড়গড় করে বলে গেল।

যুবক প্রশ্ন করলো, আচ্ছা শেখসাহেব, আপনি ওখানকার শেখ আহমদকে জানেন? আতর বিক্রি করেন?

—খুব চিনি। তিনি তো আমারই প্রতিবেশী! একেবারেই পাশাপাশি বাড়ি। বলতে গেলে ওদের বাড়ি আমার বাড়ির মধ্যে একটা মাত্র দেওয়ালের ফারাক।

যুবক জানতে চায়, তিনি কি ভাল আছেন?

—খোদার কৃপায় ভালই আছেন মালিক।

—এখন তার কটি ছেলেপুলে?

—এখন পর্যন্ত তিনটি, খোদা তাদের সুখে রাখুন।

যুবক এবার জানতে চায়, আচ্ছা, মুস্তফা মহম্মদ আর তার ভাই আলী কেমন আছে?

মারুফ বলে, বড় ভাই মুস্তফা সাহেব ওখানকার মাদ্রাসার শিক্ষক। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাবান। আগাগোড়া কোরাণ তার কণ্ঠস্থ। নানা সুরে ছন্দেও নানা ভাবে তিনি তা লোককে শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ছোটজন আলীর একটা ডাক্তারখানা আছে। আতরের কারবারও করেন তিনি। ওদের বাবাও এই কারবার করতেন। তিনিই তাঁর দোকানের পাশে ছোট ছেলের জন্য আর একটা দোকান করে দিয়েছেন। আলীর ছেলে মহম্মদ আমার বাল্যকালের বন্ধু। এক সংগে খেলাধুলো করে আমরা বড় হয়েছি। আল্লাহ ওকে সুখে রাখুন। কিন্তু জানি না সে আজ কোথায়? বেঁচে আছে কি নাই, তাও কেউ বলতে পারে না।

ছোটবেলায় আমাদের খেলার সংগী ছিল একটি খৃষ্টান ছেলে। ওর বাবা পয়সা এবং প্রতিপত্তিতে ডাকসাইটে ছিল। একদিন মহম্মদ ঐ ছেলেটাকে নিয়ে মজা করতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধলো। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তার বাবার কাছে নালিশ করলো। বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে কোতোয়ালের কাছে এজাহার দিয়ে এল তখুনি। সিপাইরা মহম্মদকে পাকড়াও করার জন্যে মহম্মদের বাড়ি চড়াও হলো। কিন্তু ধরতে পারলো না। মহম্মদ খিড়কীর দরজা দিয়ে সে যে পালালো আর ফিরলো না কোনও দিন। আজ বিশটা বছর পার হয়ে গেছে

মহম্মদের কেউ কোনও সন্ধান দিতে পারেনি!

মারুফ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলো।

যুবক আকুল হয়ে মারুফকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। মারুফ, মারুফ আমাকে চিনতে পারছো দোস্ত? আমিই সেই মহম্মদ!

এর পর মারুফকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ তার প্রাসাদোপম ইমারতে এসে পৌঁছলো। নফর চাকর খোজা নিগ্রো দারোয়ান পাহারাদারে সরগরম হয়ে আছে সারা প্রাসাদ। দামী দামী আসবাব গালিচায় জমকালো সব ঘর-দোর! মহম্মদ বললো, এই আমার গরীবখানা।

পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে মহম্মদ সব কাজকর্ম ভুলে মারুফকে নিয়ে মেতে রইল কয়েকটা দিন।

মহম্মদ জানালো, এই শহরটায় এসে ইকতিয়ান অল খাতানের দাক্ষিণ্যে সে আজ বহু ধনদৌলতের মালিক হতে পেরেছ। এখন সে এই শহরের সবচেয়ে সেরা ধনী ব্যক্তি।

মহম্মদ বললো, মারুফ, আল্লাহর কৃপায় আমি অনেক পেয়েছি। এত অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। যদি তুমি আপত্তি না কর তবে আমার সম্পদের কিছু তোমাকে দিয়ে ধন্য হতে চাই আমি।

সে একটা থলেয় এক হাজার সোনার দিনার ভরে মারুফের হাতে তুলে দিল, বন্ধুকে বন্ধুর উপহার, নাও বন্ধু। কাল সকালে তুমি আমার সবচেয়ে সেরা খচ্চরে চেপে আমার দোকানে যাবে। ঐ সময় বাজারের অনেক গণ্যমান্য সওদাগররা আমার পাশে থাকবে। তোমাকে দেখামাত্র আমি ছুটে যাবো তোমার কাছে। খচ্চরের লাগাম ধরে তোমাকে নামতে সাহায্য করবো। এবং এমন স্বাগত সম্ভাষণ জানাবো যাতে তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে সওদাগর-মহলে। তারা বুঝবে, তুমি যে-সে ব্যক্তি নও। তারাও তোমাকে খাতির অভ্যর্থনা জানাবে। এর পর বাজারে একটা সেরা দোকান কিনে দেব তোমাকে। তুমি মালিক হয়ে বসবে সেখানে। খুব শিগ্গিরই দেখবে দারুণ পয়সা জমে যাবে তোমার ব্যবসায়। কত গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার। অচিরে তুমিও আমার মতোই এই শহরের সম্ভ্রান্ত এক সওদাগর হয়ে অতীতের সব দুঃখ-তাপ ভুলে যেতে পারবে। তোমার খাণ্ডারণী স্ত্রীর দুর্ব্যবহার নিরত তোমাকে দহন করছে জানি। কিন্তু হাতে পয়সা হলে সে সব আঘাত তুমি ভুলে যেতে পারবে, বন্ধু।

এ মহত্ত্বের তুলনা কোথায়, মারুফ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

পরদিন সকালে মারুফ সাজগোজ করে খচ্চরে চেপে বাজারে এসে উপস্থিত হয়। মহম্মদ তখন তার সওদাগর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খোশ-গল্পে মেতেছিল, মারুফকে দেখামাত্র সে ছুটে গিয়ে স্বাগতম জানায়। খচ্চরের লাগামটা চেপে ধরে বলে, মেহেরবানী করে আমার দোকানে পায়ের ধুলো দাও দোস্ত। আমার কী সৌভাগ্য, আজ তুমি আমার দোকানে এলে।

এর পর পূর্ব-নির্দিষ্ট নাটকটি যথাযথভাবে অভিনীত হয়ে গেল।

উপস্থিত সওদাগররা পরদেশী এক সওদাগরকে যথাবিহিত মর্যাদা সহকারে আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলো না। মারুফ গম্ভীর চালে মাথা হেলিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানালো।

সওদাগররা পরস্পরে ফিস ফিস করে আলোচনা করতে থাকলো। ইনি নিশ্চয়ই কোনও বিশাল ধনী সওদাগর। তা না হলে মহম্মদ সাহেব স্বয়ং অত খাতির সম্মান করেন?

মহম্মদ একবার গলা খাটো করে তার সওদাগর বন্ধুদের উদ্দেশ করে বলে, জান তো ইনি কে? তামাম দুনিয়ার সেরা ধনী সওদাগর। টাকার কুমীর! কেউ জানে না ও'র কত টাকা। উনি নিজেও বোধ হয় মাপ করতে পারবেন না ও'র ধন-দৌলতের পরিমাণ। সারা পৃথিবী জুড়ে ও'র কারবার। সব দেশে ও'র দোকানপাট আছে। এখানে আসার উদ্দেশ্যই তাই—একটা জমকালো দোকান খোলা। এত যে বিত্ত, কিন্তু মানুষ হিসেবে ও'র তুলনা বিরল। একেবারে মাটির মানুষ বলতে যাকে বলে, তাই। ধীরে ধীরে ও'র আরও অনেক গুণের পরিচয় পাবেন আপনারা। তবে নিজের ঢাক তো নিজে পেটান না কখনও, তাই জানতে একটু সময় লাগবে।

সওদাগররা মারুফের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হতে আগ্রহী হয়ে উঠলো। প্রত্যেকে তার বাড়িতে খানাপিনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকলো। মারুফ মধুর হাসি হেসে সবারই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো মাথা পেতে। কিন্তু আপাতত কিছুদিন তা রক্ষা করার অক্ষমতা জানিয়ে বললো, আপনারা আমার গুস্তাকী মাফ করবেন মালিক। আমি আপনাদের এদেশে এসেছি আমার দোস্ত মহম্মদের অতিথি হয়ে। তিনি যতদিন না আমাকে ছাড়বেন ততদিন আমি এ'র সঙ্গেই খানাপিনা করবো। তারপর ছাড়া পেলে অবশ্যই মিলিত হবো আপনাদের সঙ্গে।

এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারুফের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো তার ঐশ্বর্যের কথা। স্বয়ং মহম্মদ লোককে বলতে লাগলো, ওরে বাবা, মারুফ—সে তো ধনকুবের, তার কাছে আমি নস্যি।

একদিন এ সংবাদ সেখানকার সুলতানের কানেও পে'ছিল। উজিরকে ডেকে সুলতান বললেন, দেখতো উজির, আমার শহরে কে এক জগৎবিখ্যাত ধনী সওদাগর নাকি এসেছে, তার এতো ধন-দৌলত, কোন সুলতান বাদশাহরও নাই! সে নাকি অনেক মূল্যবান সওদাপত্র সঙ্গে এনেছে। এবং পরে নাকি আরও কোটি কোটি দিনারের অমূল্য সব হীরে জহরত নিয়ে আসছে তার সহচররা। আমার বিশ্বাস এই শহরের অর্থগৃধ্নু শকুনী সওদাগররা ওকে চুষে খাওয়ার জন্য ওৎ পেতে আছে। তুমি একবার খোঁজ নাও তো, কে সেই লোক? তাকে নিয়ে এস আমার সামনে। অমন একজন বিত্তবান মানুষ আমার মুলুকে এসে যাতে প্রতারিত না হতে পারে সেটা তো দেখা দরকার আমার। হয়তো এমনও

হতে তার দ্বারা আমার বা আমার বাচ্চাদেরও কিছু উপকার হতে পারবে !

উজির বিচক্ষণ ব্যক্তি, সব শুনে সুলতানকে বোঝাবার চেষ্টা করে, আপনি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। সবুরে মেওয়া ফলে। ধনপতি সওদাগর সাহেবের হীরে জহরতের লটবহরগুলো এসে পৌঁছাক, তারপর না হয় তাকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

একথায় সুলতান রুষ্ট হলেন, তোমার কি মাথায় গোবর পোরা আছে উজির ? সোজা সরল কথাটা বুঝতে পারছ না ? তুমি ভাবছো, ওর মালপত্র এসে পেঁছনর পর ঐ শকুনীরা তাকে আস্ত রাখবে ? না না, তোমার বুদ্ধিতে চললে আমি সব হারাবো, তুমি আর দেরি না করে আজই এক্ষুণি তাকে সসম্মানে নিয়ে এস আমার প্রাসাদে।

মুচি মারুফ এসে যথাবিহিত কুর্নিশাদি করে সুলতানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলো।

মারুফের নম্র বিনয়ী আদব-কায়দায় প্রীত হলেন সুলতান।

—শুনেছি আপনি শ্রেষ্ঠ ধনী সওদাগর। জগৎ জোড়া আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের খ্যাতি। তা আমার মুলুকে কি অভিপ্রায়ে এসেছেন, বণিক।

—ব্যবসাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, জাঁহাপনা। আপনার শহরেও এসেছি ব্যবসা করবো বলে। তা আমার লটবহর এখনও এসে পেঁছয়নি। না হলে দেখাতে পারতাম, কি কি ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য আমি করবো এখানে। আসেনি, তবে দু-একদিনেই পেঁছে যাবে মালপত্র। অনেক মূল্যবান হীরে জহরৎ আছে তার মধ্যে। আপনার কন্যা বা বেগমের নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

তখন সুলতান তাঁর সঞ্চিত সব মণি-রত্নাদি বের করে একটা বিরাট মুক্তো মারুফের হাতে তুলে দিয়ে বললো, দেখুন তো এটা কেমন জিনিস ?

মুক্তো হাতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করার ভান করেই মেঝেতে ফেলে দিয়ে জুতোর গোড়ালী ঠুকে গুঁড়িয়ে দিল।

সুলতান শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ এ কি করলেন আপনি ? ও যে মহামূল্য রত্ন! প্রায় হাজার মোহর দাম হবে ?

মারুফ বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি, হাজারখানেকই দাম হবে। কিন্তু আমার লটবহরের মধ্যে এক বস্তা মুক্তো আছে তার একটাও এত ছোট এত কম দামী নয়, জাঁহাপনা। সেগুলোর প্রত্যেকটি দেখতে যেমন বাহারী তেমনি দামেও অনেক বেশি মূল্যবান।

এতে সুলতানের লোভ শতগুণ হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, মনে মনে স্থির করে ফেললো, এমন ধনকুবেরকে তো হাত ছাড়া করা যায় না, আমার কন্যার সঙ্গে শাদী দিয়ে সম্পর্কের জালে জড়িয়ে ফেলতে হবে একে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো তেষট্টিতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

সুলতান মারুফকে উদ্দেশ্য করে বললেন. আপনার সঙ্গে কথা বলে প্রীত হলাম, বণিকসাহেব। এখন আমার অভিলাষ, আপনি আমার কন্যাকে শাদী করুন। আপনি আমার দেশের মাটিতে পা রেখে আমাকে ধন্য করেছেন। আমার কন্যাকে আপনার বাঁদী করে দিয়ে আমি আমার অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি অমত না করেন তবে শাদীর অয়োজন করি। আমার পুত্র-সন্তান নাই। তাই আমার মৃত্যুর পর আপনিই আমার মসনদে বসার অধিকারী হবেন।

মারুফ ক্ষণকাল নিরাসক্তভাবে মৌন হয়ে কি যেন ভাববার ভান করলো। তারপর বললো, জাঁহাপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস আমার নাই। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কি দরকার? আমার লটবহর পৌঁছতে দিন, তারপর না হয় শাদীর দিনক্ষণ ধার্য করা যাবে। তাছাড়া, শাদী বলে কথা, অনেক খরচপত্রের ব্যাপার রয়েছে। আমার ধনরত্ন এসে না পৌঁছলে কি করে এখনি সম্ভব, জাঁহাপনা? আমার যিনি বেগম হবেন তাঁকে তো হাজার মোহর করে দু লক্ষ তোড়া উপহার দিতে হবে আমাকে। এসব তো আর সঙ্গে করে আনা যায় না। আমার লোকজনরাই তা নিয়ে আসছে। এছাড়া গরীবদের মধ্যে দান ধ্যানও তো করতে হবে। তাতে হাজার টাকা করে হাজারটা তোড়া অন্তত দরকার। শাদীর রাতে এটা আমাদের বংশের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। এ না হলে আমি বাসরঘরেই ঢুকবো না। এছাড়া যাঁরা আমার শাদীতে উপঢৌকন দেবেন তাঁদের জন্যও ঐ রকম আরও হাজারটা তোড়া চাই। আর খানা-পিনার জন্যও বরাদ্দ রাখতে হবে এক হাজার তোড়া। এরপর হারেমের অন্য সব বাঁদী-বেগমদের জন্য উপহার আছে। প্রত্যেক বাঁদী-বেগমকে হাজারটা মুক্তো বসানো সাতনরী জড়োয়ার হার অবশ্যই দেব আমি। এইসব যথাযথভাবে করতে গেলে আমার লোক-লস্কর এসে না পৌঁছন পর্যন্ত কী করে এ শাদী সম্ভব হতে পারে জাঁহাপনা?

এইসব শুনে সুলতানের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে। ওরে বাপ, এ যে দেখছি বিরাট ব্যাপার! এমন পাত্র তো হাতছাড়া করা সম্ভব নয়।

—সে জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, মারুফ সাহেব। জাঁকজমকের একটু ত্রুটি রাখবো না আমি। যেমনটি আপনি বলবেন, বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে নেবেন, ঠিক ঠিক তেমন হবে সব। আপনার লটবহর যখন এসে পৌঁছবে তখন না হয় আপনি আমার মেয়ের দেনমোহর দেবেন। এখন শুভ কাজ সম্পন্ন হতে দিন। এ নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না। আপনার নগদ যা দরকার বলুন, আমি আমার ধনভাণ্ডার থেকে দিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া শাদীর উৎসবের জন্য যা খরচ হবে সব আমি করবো। তবে শুভ কাজে আমি বিলম্ব করতে চাই না। যত শীঘ্র সম্ভব শাদী হয়ে যাক, এটাই আমার ইচ্ছা। আপনি আর দ্বিধা সঙ্কোচ

করবেন না। আমার যা সবই তো আপনার হবে একদিন।

সুলতান তখনই উজিরকে ডেকে পাঠালেন।

—শোন উজির, আমীর মারুফের সংগে শাহজাদীর শাদী পাকা করে ফেলেছি। এখন তুমি শেখ অল ইসলামকে একবার খবর দাও, আমি তার সংগে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

সুলতানের সিদ্ধান্ত শুনে উজির গম্ভীর হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

সুলতান অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? কিছু বলবে কী?

—জাঁহাপনা, উজির করজোড়ে মিনতি জানায়, আপনি আর কটা-দিন অপেক্ষা করুন। শাহজাদীর শাদী, এ তো চাট্টিখানি কথা নয়! ভাল করে কুলশীল না জেনে যে-কোনও লোকের হাতে তো তুলে দেওয়া যায় না তাকে। সওদাগরটির কথাবার্তা শুনে আমি বিশেষ প্রীত হতে পারিনি, তার কারণ তার আদব-কায়দার মধ্যে কোথায় যেন একটা খানদানী মেজাজের খাকতি আছে। আপনি আর কটা-দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। ওর লটবহর পেঁছিতে দিন এখানে।

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন, তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক। আমার সর্বনাশ করতে আছ এখানে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। তুমি ভেবেছ, তোমার মতলব আমি টের পাইনি? আমার কন্যাকে শাদী করে তুমিই আমার মসনদে চেপে বসতে চাও। কিন্তু সে আমি হতে দেব না কিছুতেই। শোনও উজির, আর যদি কোনও ভাবে আমার কাজে বাগড়া দেবার কোশিস কর তবে তোমাকে খতম করে ফেলবো আমি। এ পর্যন্ত যত পাত্রই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, তারা কেউ শাহজাদীর যোগ্য নয় এই অজুহাতে তুমি তাদের বাতিল করে দিয়েছ। তখন আমি তোমার ফিকির বুঝতাম না, তাই বাধা দিইনি। কিন্তু এখন দেখছি, এইভাবে তুমি আমার কন্যাকে বুড়িয়ে দিতে চাইছো। যাতে আরও কেউ না তার দিকে হাত বাড়ায়। পরে তার যোগ্য পাত্র যখন আমি সংগ্রহ করতে পারবো না, তখন তুমিই তার পাণি প্রার্থনা করবে, এই তোমার ফন্দী! সে গুড়ে বালি, তা আমি হতে দেব না। মারুফকে হাতছাড়া করলে তার মতো যোগ্য পাত্র কোথায় পাব আর? তাছাড়া, সে আমার জামাই হলে তার ধন-সম্পদ সবই তো আমার ভাণ্ডারে জমা হবে। তখন আমিই হবো তামাম আরব দুনিয়ার সেরা ধনবান বাদশাহ। আর আমি ঐশ্বর্যবান হলে তোমাদেরও লাভ হবে। যাক ওসব কথা, এখন আর দেরি না করে তুমি শেখ অল ইসলামকে খবর দিয়ে এস।

কাজী শেখ অল ইসলাম এসে শাদীনামা তৈরি করে দিয়ে গেল। সুলতানের আদেশে সারা শহর প্রাসাদে সাজসাজ রব ছড়িয়ে পড়লো তখুনি। আলোর মালায় সাজানো হলো প্রতিটি গৃহ ইমারত প্রাসাদ। নৃত্য গানে মুখর হয়ে উঠল পুরবাসীরা।

মারুফ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের তখতে বসে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে থাকলো। এ কি কাণ্ড সে করে বসলো? এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তো সে জানে—মৃত্যু! কিন্তু এখন পালাবারও তো পথ নাই। সে চেষ্টা করতে গেলেও মৃত্যু!

দল বেঁধে দলে দলে মেয়েরা এসে ভরে ফেলেছে প্রাসাদ-আঙিনা। একদল গাইছে, একদল বাজনা বাজাচ্ছে, আর একদল সুললিত ছন্দে নেচে চলেছে।

এসব কিন্তু মারুফের বিষবৎ মনে হতে লাগলো তখন। শুধু ভাবতে লাগলো, কি করে এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল।

এরপর শাহজাদীকে অপূর্ব সাজে সাজিয়ে বাসরঘরে এনে হাজির করলো সখী বাঁদীরা। মারুফের বুক কাঁপতে লাগলো। এখন সে কী করবে? হায় আল্লাহ! নিয়তি তাকে কোথায় ঠেলে দিল?

শাহজাদীকে বাসরঘরে রেখে সবাই চলে গেল। পালঙ্কের এক পাশে বসে মারুফ ভেজা-বেড়ালের মতো কাঁপছে। শাহজাদী এসে পাশে বসে তার একখানা হাত নিজের কোলে তুলে নিল।

—তুমি অমন মুখ গোমড়া করে জবুথবু হয়ে বসে আছ কেন প্রাণনাথ?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো চৌষট্টিতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

মারুফ কোনও রকমে উচ্চারণ করতে পারলো, একমাত্র খোদা ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

—এ কথা কেন বলছো গো? আমাকে দেখে কি তোমার পছন্দ হয়নি। আমি কি এতই কুৎসিত?

মারুফ বলে, না না, তোমার কী দোষ? এর জন্য দায়ী একমাত্র তোমার বাবা।

—কেন, কি করেছেন তিনি?

মারুফ বললো, আমি তখনই বার বার বলেছিলাম, আপনি এত তাড়াহুড়ো করবেন না, আগে আমার সব লটবহর পৌঁছিতে দিন। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। আমাদের শাদীর প্রথম রাত, তোমাকে প্রাণভরে সাজাবো। সাতনরী মুক্তোর মালা পরাবো নিজের হাতে। কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হলো না। আমার ইচ্ছে ছিল, হারেমের সব বাঁদী-বেগমকে মূল্যবান উপহার পাঠাবো। কিন্তু তাও পারলাম না। এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায়?

শাহজাদী আশ্বস্ত হয়ে বললো, ও, ওই কথা। ছাড়তো ওসব, ভোবো না। এখন সাজ-পোশাক খুলে কাছে এস। এ মধুযামিনী ঐ সব ছুটো চিন্তায় নষ্ট করো না, সোনা। আমি তোমার সোনাদানা বিষয়-সম্পদ কিছুই চাই না।

তোমার মতো স্বামী পেয়েছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার লটবহর আসুক না আসুক, তার জন্যে আদৌ আমি লালায়িত নই। তুমি যদি একান্ত-ভাবে আমার হও তার চেয়ে বেশি আর কি প্রয়োজন? আমার ধনদৌলতের কোনও বাসনা নাই। ওতে কি মন ভরে? আমি বাদশাহজাদী, ঐশ্বর্যের অভাব কিছু নাই, কিন্তু বিশ্বাস কর, চিরকাল ধন-দৌলতকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করে এসেছি। ওতে আমার কোনও আসক্তি নাই। থাক ওসব কথা, আজকের এই মধুর রাত্রি তোমার আমার দেহ মন প্রাণ এক সঙ্গে মিশে যাক, এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে! এস, সাজ-পোশাক খোল, আর দেরি করো না। আমার সারা দেহ মন কামনায় জর-জর হয়ে উঠেছে, এস সোনা, দেরি আর আমি সইতে পারছি না।

—তা হলে তাই হোক, মারুফ ক্ষিপ্র হস্তে সাজ-পোশাক খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো মেঝের ওপর।

পরদিন সকালে উঠে হামামে গিয়ে বেশ ভাল করে গোসল করলো মারুফ। তারপর দারুন সাজে সেজে-গুজে গিয়ে বসলো দরবারে। উজিরকে বললো, যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে যথাযথ মর্যাদার সাজ-পোশাক উপহার দিন।

সকলে নতুন জামাই-এর বদান্যতায় ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

এইভাবে কুড়িটা দিন পার হয়ে গেল। শাহজাদী স্বামীসুখে গর্বিতা হয়ে উঠলো। মারুফের কথা আর কী বলবো?

এদিকে উজির চিন্তিত হলো, এলাহী খরচের ধাক্কায় ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ জামাই-এর লটবহরও এসে পৌঁছল না। সুলতানের কাছে গিয়ে সে করজোড়ে বললো, জাঁহাপনা কোষে আর কোনও অর্থ নাই। এদিকে জামাতার লটবহরও এসে পৌঁছায়নি। এখন কী হবে আমি বুঝতে পারছি না!

সুলতান ঈষৎ বিচলিত বোধ করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, পৌঁছতে হয়তো কিছু বিলম্ব ঘটছে। কিন্তু তা নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নাই, সবুর কর, ঠিকই এসে পৌঁছবে।

উজির তিক্ত হাসি হেসে বললো, আপনার কথাই যেন সত্য হয় জাঁহাপনা। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে আমি চিন্তিত না হয়ে পারছি না। ভাঁড়ার শূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ শাহজাদীর শাদী হয়ে গেছে এক অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গে। জানি না নসীবে কি আছে।

—তোমার কথায় আমিও চিন্তিত হচ্ছি, উজির! তবে শুধু দোষারোপ না করে আমাকে কিছু উপায় বাতলাও। যদি প্রমাণ করতে পার আমার জামাতা একজন ঠগ প্রতারক মিথ্যাবাদী তবে তারও আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তার আগে তো আমি কিছু করতে পারি না।

উজির বলে, আপনি যথার্থই বলেছেন জাঁহাপনা, বিনা প্রমাণে কারো সাজা হওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আর কেউ নয়, শুধু মাত্র আপনার কন্যাই আপনাকে আলোকপাত করতে পারেন। আমার কথা শুনুন,

তাকে একবার আপনি ডাকুন এখানে। আমি নিজে তাকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই। অবশ্য শাহজাদীর কোনও রকম অমর্যাদা না ঘটে সেদিকে আমি সজাগ থাকবো।

—ঠিক আছে, তাই হোক, গর্জে উঠলেন সুলতান, যদি প্রমাণ হয় মারুফ জালিয়াত, সে আমাদের প্রতারণা করেছে, তবে জামাতা হয়েও সে মউৎ এড়াতে পারবে না।

সে সময় মারুফ প্রাসাদে ছিল না। সুলতানের নির্দেশে শাহজাদী দরবারে এসে পর্দার আড়ালে বসলো। সুলতান-কন্যাকে উদ্দেশ করে বললেন, দরবারে এখন শুধু আমরা তিনজন, আর কেউ উপস্থিত নাই। উজির তোমাকে দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চায়, তুমি তার জবাব দিলে আমি খুশি হবো।

শাহজাদী ফুঁসে উঠলো, কী তোমার মতলব, উজির? বল, কী জানতে চাও?

উজির নম্র কণ্ঠে বললো, মালকিন, ধনভাণ্ডার প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। আমীর মারুফের লটবহর এখনও এসে পৌঁছয়নি। এবং কবে পৌঁছবে তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। সেই কারণে আপনার পিতা আমাদের মহামান্য জাঁহাপনা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছেন। এখন বলুন, এই পরদেশী সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? এই কুড়ি দিন ব্যাপী আপনি তাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, আপনার মনে কী কোনও রকম সন্দেহ দানা বেঁধেছে?

—আল্লাহ মারুফকে দীর্ঘায়ু করুন, আল্লাহ আমার স্বামীর প্রতি সহায় থাকুন, আপনি জানতে চান তাঁর সম্বন্ধে আমার কী ধারণা? তবে শুনুন, একটুও খারাপ নয় বরং অত্যন্ত ভাল। অমন মানুষ হয় না। তাঁর সঙ্গে শাদী হওয়ার পর থেকে রূপে রসে আনন্দে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার জীবন-যৌবন। আমার স্বামীর মধ্যে যে সব সংগুণ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তা খুব কম মানুষেরই থাকে। এক কথায় সে আমার সুধাপাত্র, এবং আমিও তার কাছে তাই।

সুলতান উজিরকে উদ্দেশ করে বললেন, কী শুনলে তো? ঘুচলো তোমার সন্দেহ? আমার জামাতার মতো মানুষ সত্যিই আমি দেখিনি কখনও।

উজির কিন্তু সে কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা ঐ লটবহরে কি কি সামানপত্র আছে তিনি বলেছেন?

—ওসব দিয়ে আমার কী দরকার? আমাদের ভালোবাসার মধ্যে বিষয় সম্পদের কথা উঠবেই বা কি করে? আর তুচ্ছ ঐ হীরে জহরতের বাক্স-প্যাটরা এল কি এল না, তাতেই বা আমার কী? ওসবে আমার কোনও দিন কোনও রকম আসক্তি ছিল না, আজও নাই।

উজির বলে, তথাপি যদি আদৌ সেগুলো কখনও এসে না পৌঁছয় তাহলে আমাদের খানাপিনা চলবে কি করে মালকিন? আপনি তো শুনলেন ভাঁড়ার খালি হয়ে গেছে।

—খোদা মেহেরবান, তাঁর ওপর ভরসা রাখুন, তিনিই সব চালিয়ে দেবেন।

উজির কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সুলতান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে। শাহজাদী যা বলেছে এর পরে আর কথা চলে না, উজির। তুমি থামো। আমার কন্যা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক কথা বলছে।

তারপর তিনি শাহজাদীকে উদ্দেশ করে বললেন, শোন বেটি, তুমি কথায় কথায় তার কাছ থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করো, কবে নাগাদ তার মালপত্র সব এসে পেঁছিবার সম্ভাবনা আছে। কারণ বুঝতে তো পারছো, শাদীর জন্যে প্রচুর খরচ হয়ে গেছে। ভাঁড়ার শূন্য হয়ে গেছে, অথচ পাওনাদারের অনেকের দেনাই মেটানো হয়নি। তারা তাগাদা দেবে, সে তো সহ্য হবে না। আমি যদি বুঝতে পারি কোন সময় নাগাদ এসে পেঁছিবে সেই মতো তাদের তারিখ দেব, পাওনা নিয়ে যাওয়ার জন্য। তা না হলে দেনা মেটাবার জন্য অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য আমাকে কোনও নতুন কর ধার্য করতে হবে।

শাহজাদী পর্দার আড়াল থেকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, জো হুকুম জাঁহাপনা। আজ রাতেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো। তারপর কাল সকালে আপনাকে জানাবো।

সেইদিন রাতে দুজনে পাশাপাশি শুয়েছিল, শাহজাদী তার একখানা হাত রাখলো মারুফের কাঁধে। কাছে টেনে নিয়ে এল তাকে। অধরে অধর রাখলো। গভীর আবেশে চুম্বন করলো দুজনে। তারপর শাহজাদী স্বামীকে সোহাগ করতে করতে কথাটা পাড়লো, তুমি আমার বুকের কলিজা, চোখের মণি, তোমাকে ছাড়া একটি দিনও আমি বাঁচবো না সোনা, তোমার উদ্দাম ভালবাসার জোয়ারে আমি হালভাংগা পালছেঁড়া দিশাহারা নাবিকের মতো ভেসে চলেছি। কোথায় কতদূরে কোন নিরুদ্দেশের অজানা ঠিকানায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে আমি জানি না, জানতে চাইও না। তবে একথা ঠিক, এক সূত্রে বেঁধেছি জীবন, তোমার যা হবে আমারও তাই হবে। আমাদের দুজনের একই নিয়তি। কেউ তা বদলাতে পারবে না।

তাই তোমার কাছে আমার যেমন লুকোবার কিছু নাই, আমি বিশ্বাস করি আমার কাছেও গোপন করার মতো কিছুই থাকতে পারে না তোমার। আচ্ছা বলতো সোনা, তোমার লোক ঐ সব লটবহর নিয়ে কবে নাগাদ এসে পেঁছিবে এখানে? আমার বাবা এবং উজির বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই ব্যাপারে। অবশ্য তার কারণও আছে। শাদীর জন্যে অত্যধিক ব্যয়ের চাপে ভাঁড়ার প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে। তোমার কিন্তু কিন্তু করার কোনও কারণ নাই, সোনা। যদি আশঙ্কা কর, তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখানে আসতে হয়তো আরও অনেক দেরি হতে পারে, তবে অসঙ্কোচে আমাকে সব বল। তুমি নিশ্চিন্ত থেকে, আমি সব দিক বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো প'য়ষট্টিতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

এই বলে সে মারুফকে আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো।

হো হো করে হেসে উঠে মারুফ শাহজাদীকে আদর জানিয়ে বললো, এই একটা সহজ সরল প্রশ্ন করতে ভূমিকা করতে হলো কেন, সোনা ?

মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল মারুফ। তারপর খাঁকারী দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, শোনও সোনা, আসলে আমি কোনও সওদাগর নই। আমার কোনও ধন-দৌলত কিছু নাই। স্বদেশে আমি এক অতি সাধারণ দরিদ্র চর্মকার ছিলাম। লোকের পায়ের জুতো সারিয়ে দিয়ে আমার জীবিকা চলতো। ফতিমা নামে এক দজ্জাল খণ্ডারণী মেয়েকে শাদী করেছিলাম সেখানে। সে আমার জীবনে চরম অভিশাপ হয়ে দাঁড়ালো। তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে একদিন ঘর ছেড়ে পথে নামতে হলো আমাকে। তারপর নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তোমাদের এই শহরে এসে পৌছলাম ভাগ্যচক্রে।

এইভাবে মারুফ তার জীবনের সব খুঁটিনাটি কাহিনী তুলে ধরলো শাহজাদীর সামনে।

সব শুনে শাহজাদী হেসে লুটিয়ে পড়ে মারুফের বুকে, ওঃ, তুমি কী সুন্দর! তোমার বৌটা অমন দজ্জাল ছিল বলেই না আজ তোমাকে আমি আমার বুকের কলিজা করে পেয়েছি। সত্যিই তোমার মতো মজার মানুষ আমি দেখিনি কখনও। এমন করে তুমি ভালবাসতে জান, অথচ তোমার বোকা বৌটা তোমাকে বুঝতে পারলো না ? যাক, পারেনি সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এখন মুসকিল হলো, বাবা এবং উজিরকে কি বলা যাবে। তারা যদি আসল ব্যাপার শোনেন তবে তো তোমার নির্ঘাৎ গর্দান যাবে। ও, না না, সে আমি সইতে পারবো না সোনা। তোমার এক মুহূর্তের অদর্শন আমাকে অধীর করে তোলে। তোমাকে যদি ওরা ফাঁসী দেয় তবে আমিও আত্মঘাতী [redacted]বা।

তারপর একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে থাকে, শোনও আর দেরির কাজ নাই। আজ ভোরেই তুমি প্রাসাদ থেকে এ শহর মুলুক ছেড়ে অন্য কোনও দূর দেশে রওনা হয়ে যাও। আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার মোহর আর আমার কিছু গহনাপত্র দিচ্ছি। আমার একান্ত বিশ্বস্ত এক নফরকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। তুমি যেখানে অবস্থান করবে সে ঐ ঠিকানাটা জেনে এসে জানাবে আমাকে। আমি তোমাকে মাঝে দূত পাঠিয়ে এখানকার হালচাল জানাবো। তার পরে যা করার, দরকার হবে তাই করবো। আমার আশা, বাবাকে আমি এমনভাবে বোঝাতে পারবো যাতে তোমার কোনও মান ইজ্জত একটুকু খোয়া না যায় তাদের কাছে।

মারুফ কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, আমি যদি বাঁচি তোমার কল্যাণেই বাঁচবো সোনা। এ ছাড়া আর কোনও পথ নাই।

এরপর সে রাতে আর কোনও কথা হলো না ওদের। প্রাত্যহিক রতিরঙ্গ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লো দুজনে।

শেষ রাতে শাহজাদীর ঘুম ভাঙ্গতেই মারুফকে জাগিয়ে তুললো সে। নিজে হাতে সাজিয়ে গুজিয়ে দিল এক বান্দার সাজ-পোশাকে। বললো, সাবধানে থেকো। তোমার জন্যে আমি বড় চিন্তায় থাকলাম। মাঝে মাঝে আমার লোক যাবে তোমার কাছে। তার মারফত সব জানতে পারবে।

সকালে দরবারে বসে সুলতান শাহজাদীকে ডেকে পাঠালেন, পাতলা পর্দার আড়ালে এসে বসলো সে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কাল রাতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, বেটী ?

শাহজাদী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, আপনার ঐ বুড়ো উজিরের মনস্কামনাই পূর্ণ হয়েছে বাবা।

সুলতান উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন, কী হয়েছে ?

শাহজাদী কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, কাল রাতে খানা-পিনা সেরে আমরা শোবার আয়োজন করছি, এমন সময় এক প্রহরী এসে দরজায় করাঘাত করলো। দরজা খুলতেই সে বললো, প্রাসাদের বাইরে এক দূত এসেছে। সে জামাতা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি বললাম, নিয়ে এস তাকে এখানে।

দূত এসেছিল আমার স্বামীর দলের লোকজনদের কাছ থেকে। একখানা চিঠি সে বাড়িয়ে দিল আমার স্বামীর দিকে। আমি উৎকন্ঠিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চিঠিখানা পড়া শেষ করে সে একটু হেসে বললো, ও কিছু নয়, পথের মধ্যে বাদাবী ডাকাতরা আক্রমণ করে আমার পাঁচশো সিপাই বন্দুকন্দাজের চারশোকে ঘায়েল করে হীরে জহরতের প্রায় চল্লিশটা বস্তা এবং কয়েক শো গাঁট কাপড়-চোপড় লুট করে নিয়ে গেছে।

—আমি আঁৎকে উঠলাম, সর্বনাশ !

তিনি কিন্তু মৃদু হেসে চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে বললেন, সর্বনাশ কেন হতে যাবে, সোনা ? যা গেছে তার পরিমাণ সাকুল্যে নয় দশ লাখের বেশি হবে না। তার জন্য আমাদের এই মধুরাত্রি বিষাদ করে তুলতে চাই না। তোমার মুখের এক কণা হাসির দাম তার চেয়ে লক্ষ্য গুণ বেশি। ও নিয়ে তুমি ভাবনা করো না। এসো আমরা শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল ভোরে আমাকে একটু সকাল সকাল ডেকে দিও। আমি দূতের সঙ্গে রওনা হয়ে যাব। আমাকে না দেখলে, আমার মুখ থেকে ভরসার কথা না শুনলে আমার লোকজনরা স্বস্তি পাবে না।

তারপর দূতকে বললেন তিনি, তুমি প্রাসাদের ফটকে অপেক্ষা কর। কাল ভোরে তোমার সঙ্গে যাব আমি।

খুব সকালেই তিনি রওনা হয়ে গেছেন। জানি না নসীবে কি আছে।

তিনি ফিরতে পারবেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার উজির প্রতিনিয়ত আমার স্বামীর অমংগল কামনা করে এসেছে। আমার বিশ্বাস এ বিপর্যয় তারই অভিশাপে ঘটেছে।

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না শাহজাদী। দরবার ছেড়ে হারেমে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে।

সুলতান গর্জে উঠলেন উজিরের ওপর, যত নষ্টের গোড়া তুমি। তোমার অমংগল কামনার জন্যেই এমন বিপদ ঘটতে পারলো। ছিঃ ছিঃ, একি তোমার নীচ প্রকৃতি উজির, অন্যের ভাল একটুও দেখতে পার না তুমি?

মারুফকে পিঠে নিয়ে সুলতানের তাজি ঘোড়া বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকে। মুচির ছেলে মারুফ, জীবনে কখনও ঘোড়ায় চাপেনি। সে কেন তাজির উদ্দামতা সহ্য করতে পারবে? ধীরে ধীরে শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। অনুতাপ করতে থাকলো, কেনই-বা শাহজাদীকে সে আসল কথা সব খুলে বলতে গেল? তা না হলে তো প্রাসাদের সুখ-বিলাস ছেড়ে আজ আবার তাকে পথে নামতে হতো না।

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় সে এক গ্রামের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। তখন সূর্য উঠে গেছে। খিদেও বেশ পেয়েছে। কিন্তু খেয়াল হলো তাড়াহুড়ার মধ্যে আসার সময় সে খানাপিনা কিছু সংগে নিতে বেমালুম ভুলে গেছে।

একটা বাড়ির আঙিনায় দুটো গরু বাঁধা ছিল। আর ঘরের দাওয়ায় বসে গৃহস্থ জাবনা তৈরি করছিল। মারুফ এগিয়ে গিয়ে ডাকলো, এই যে শেখ সাহেব—

গৃহস্থ এগিয়ে এসে সালাম জানিয়ে বললে, খোদা হাফেজ। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুলতানের বরকন্দাজ!

মারুফ বললো, হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন আপনি।

—আমার গরীবখানায় আপনার পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হোক!

মারুফ বললো, না শেখসাহেব, খুব তাড়া আছে। সুলতানের জরুরী কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। একটু কিছু খাবার দিতে পারেন আমাকে?

শেখ বিশেষ লজ্জিত হয়ে বললো, গুস্তাকী মাফ করবেন মালিক, ঘরে খানা বাড়ন্ত আপনি যদি মেহেরবানী করে নেমে ঘরে একটু বিশ্রাম করেন তবে আমি ছুটে গিয়ে পাশের গ্রামের হাট থেকে এক্ষুণি কিছু নিয়ে আসতে পারি। ততক্ষণে আপনার ঘোড়াটাও কিছু দানাপানি খেয়ে জিরিয়ে নিতে পারবে।

মারুফ ঘোড়া থেকে নেমে দাওয়ায় গিয়ে বসলো। গৃহস্থ ছুটলো পাশের গ্রামের হাটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খানাপিনা কিনে নিয়ে এল সে। অতিথিকে আদর আপ্যায়ন করে খাওয়ালো। মারুফ খুব খুশি হয়ে তাকে একটা দিনার উপহার দিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো।

চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে গেল। এক মাঠের মধ্যে এসে এক চাষীকে মাঠে হাল চালাতে দেখে তার কাছে এসে বললো, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু পানি খাওয়াতে পারো ভাইসাব?

সুলতানের পাইককে দেখে চাষী সসম্ভ্রমে তাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে এই গাছতলায় একটু বিশ্রাম করুন মালিক, কাছেই আমার ঘর, যাবো আর আসবো, এই ভর দুপুরবেলায় আপনি এলেন, শুধু পানি তো আর আপনাকে দিতে পারি না, একটু কিছু মুখে দিলে আমি খুব খুশি হবো।

মারুফ বলতে যায়, না না, তার কী দরকার, শুধু একটু পানি পেলেই আমার যথেষ্ট হবে।

চাষী বলে, আপনার যথেষ্ট মনে হলেও আমার তো হবে না জনাব। আপনি একটু বসুন, আমি যাবো আর আসবো।

চাষী হাল রেখে গ্রামের দিকে চলে যায়। মারুফ ভাবে এরা কত ভাল, অতিথি এদের কাছে পীরের মতো। আহা, লোকটা তার চাষের কাজ কামাই করে আমার আহারের জন্য ছুটলো।

মনটা বড় খুঁত খুঁত করতে লাগলো মারুফের। ভাবলো, লোকটা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ সে একটু চাষ করে দেবে ওর জমি।

হালের কাছে গিয়ে বলদ জোড়াকে চালিয়ে সে লাঙল চালাতে থাকলো। এক পাক ঘুরতে না ঘুরতে এক জায়গায় এসে লাঙলের ফলাটা আটকে গেল। অনেক লাঠি পেটা করেও গরু দুটোকে এক পা এগোনো গেল না।

মারুফ বুঝলো মাটির তলায় কোনও পাথরের চাঁই-এ আটকে গেছে লাঙলের ফলাটা। জমির আলে কোদাল রাখা ছিল। মারুফ সেই কোদাল দিয়ে মাটি কেটে লাঙলের ফলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা তামার মোটা পাত্র টেনে তুললো। কৌতূহলী হয়ে আরও দু'চার কোদাল মাটি কেটে তুলতে গিয়ে খন্ খন্ করে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে অবাক হলো।

একটা শ্বেত পাথরের চাঙড়। অনেক কসরৎ করে পাথরটাকে সরাতেই দেখতে পেল একটা সুড়ঙ্গ। উঁকি দিয়ে বুঝতে পারলো, একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

সভয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গের নিচে নামতে থাকলো। বিস্ময়ে মারুফের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। একি অসম্ভব কাণ্ড! সুড়ঙ্গের নিচে প্রকাণ্ড একটা কক্ষ। তার চারপাশে থরে থরে সাজানো অনেকগুলো জালা! সবগুলো সোনার মোহরে ভর্তি।

মারুফ একটা দরজা দিয়ে পাশের আর একটা ঘরে প্রবেশ করে। সে ঘরেও অনেকগুলো জালা। সেগুলো কিন্তু সব মুক্তোয় ভরা।

পাশের আর একখানা ঘরে সে দেখতে পেল জালা জালা ভর্তি সব হীরে চুনী পান্না এবং বহু মূল্যবান সব মণি-মাণিক্য।

পাশে আর একখানা ঘর। সে ঘরে কিছু নাই। একেবারে শূন্য ফাঁকা।

শুধু একটি ছোট টুলের ওপর রাখা আছে অতি ক্ষুদ্র পাতিলেবু আকারের একটি স্ফটিকের কৌটো।

এক অজানা আশায় দুলে উঠলো মারুফের বুক। সে অনেক গল্প কাহিনী শুনেছে। এই ধরনের ছোট্ট কৌটোর মধ্যেই নাকি এমন দৈব বস্তু থাকে যার দ্বারা সারা দুনিয়ার ধনরত্ন পলকে হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারে।

কৌটোর ঢাকনাটা খুলে সে একটা আংটি পেল। মীনায় কাজ করা। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন সব লেখা আছে তার ওপর। কিছুই পড়তে বা বুঝতে পারলো না মারুফ। বাঁ হাতের কনিষ্ঠাতে আংটিটা পরে নিল সে। তারপর হাতের তালু দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে চাইলো।

তৎক্ষণাৎ একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল মারুফের কানে, আমি এখানেই আছি। দোহাই আপনার, অত জোরে জোরে আর ঘষবেন না আংটিটা। আমার বড় ব্যথা লাগছে। আপনার যা প্রয়োজন মেহেরবানী করে হুকুম করুন, বান্দা তামিল করার জন্য সদাই প্রস্তুত আছে, মালিক। আপনি যা বলবেন, যা চাইবেন চোখের পলকে তা করে দেব, এনে দেব। যদি বলেন, কোনও বাদশার সারা মুলুক ছারখার করে জ্বালিয়ে দিতে হবে তাও যেমন পারি আবার যদি হুকুম করেন, এক রাতে সাতমহলা প্রাসাদ বানিয়ে দিতে, তাও করে দিতে পারি। আমার অসাধ্য কিছুই নাই, শুধু আপনি একবার হুকুম করে দেখুন। আমি আপনার দাসানুদাস, এই বিশ্ব-সংসারে যত জীন দৈত্য আছে আমি তাদের সম্রাট। আপনি যা ইচ্ছা করেন আমি তা পলকে পূরণ করে দেব। কিন্তু আপনার কাছে আমার বহুৎ মিনতি অত জোরে জোরে ঘষবেন না। বড় ব্যথা লাগে।

মারুফ বুঝতে পারল তার আঙ্গুলের আংটির ভেতর থেকেই ঐ আওয়াজটা বের হচ্ছে।

—আল্লাহ তুমি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, কিন্তু কে তুমি?

মারুফের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, আমি ভাগ্যবিধাতা। এই আংটির ক্রীতদাস। এই আংটি যার কাছে থাকে আমি তারই আজ্ঞাবহ হই। এখন আপনিই আমার একমাত্র প্রভু। আমার অসাধ্য বলে কিছুই নাই। আমি জিন সম্রাট, আমার অধীনে বাহাত্তর জন সেনাধ্যক্ষ, তাদের এক একজনের সেনাবাহিনীতে একাকোটি বিশ লক্ষ করে জিন সৈন্য আছে। তারা প্রত্যেকে সহস্র হাতির শক্তি ধরে। এখন আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন কী অসাধারণ আমার ক্ষমতা। তবে বলতে পারেন, তা হলে কেন আমি আপনার কাছে এমন দাসত্ব স্বীকার করছি কাতর ভাবে। তার উত্তর—আপনার হাতেই আমার জীবন। এই আংটি আমার হৃৎপিণ্ড। এটাকে যদি আপনি নষ্ট করে ফেলেন, আমার মৃত্যু ঘটবে। সেই কারণে এখন যে আপনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা। আপনাকে প্রসন্ন রাখাই আমার একমাত্র কাজ। আপনি আজ্ঞা করুন, প্রভু আমি আপনাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই। তবে একটা কথা, আপনি কিছুতেই দ্বিতীয়বার ঘর্ষণ করবেন না এই আংটির মীনা। তাতে আমার দেহে আগুন ধরে যাবে

এবং চিরকালের মতো আপনি আমাকে হারাবেন। আমি দেহত্যাগ করবো তৎক্ষণাৎ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতষট্টিতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

মারুফ বলে, শোনও ভাগ্যবিধাতা, তোমার সব কথাগুলো আমি মন দিয়ে শুনেছি। মগজে তা গাঁথা হয়ে থাকবে। আচ্ছা একটা কথা বলতে পার, কে তোমাকে এই পাতালপুরীতে এই কৌটোর মধ্যে আবন্ধ করে রেখেছিল ?

আংটি-দৈত্য বললো, এখন আমরা যেখানে আছি এটা সাদ্দাত ইবন আদেবের সেই বিখ্যাত রত্নাগার। তার আমি পেয়ারের বান্দা ছিলাম। এই আংটিটি তিনি হাতে ধারণ করতেন সব সময়।

মারুফ বললে, আচ্ছা বান্দা, তুমি কি এই সুড়ঙ্গের সমস্ত ধনরত্ন আমার নির্দেশমতো এখান থেকে অনত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পার ?

—কেন পারবো না মালিক ? আপনি হুকুম করুন।

—তা হলে তাই কর। এখুনি এখানকার সব ধনরত্ন উপরে নিয়ে চল। এককণাও কিছু রেখে যাবে না। আমার পরে যারা আশায় আশায় আসবে তারা যেন কিছুই না পেতে পারে।

মারুফ দেখলো বারটি তাগড়াই জোয়ান ছেলে এসে দাঁড়ালো তার সামনে তাদের প্রত্যেকের মাথায় বিরাট বিরাট বাক্স। তিনটি ঘরের জালা থেকে ঢেলে সমুদয় হীরে চুনি পান্না মুক্তো মোহর মণিমাণিক্য বোঝাই করলো ঐ বাক্সগুলোয়। তারপর মারুফকে অভিবাদন জানিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আংটিকে উদ্দেশ করে মারুফ বললো, চমৎকার ! এবার আমার অনেকগুলো গাধা খচ্চর উট চাই। আর চাই পাইক বরকন্দাজ, নফর চাকর এবং সহিস। এই সব সামানপত্র ইকতিয়ান অস খতানে নিয়ে যেতে হবে।

আংটির দৈত্য একটা হাঁক ছাড়তে এক পাল উট গাধা খচ্চর ও নফর চাকর, পাইক বরকন্দাজ সহিসরা এসে হাজির হলো সেখানে।

মারুফের নির্দেশে বাক্সগুলো উটের পিঠে চাপানো হলো। তারপর তারা যাত্রা করলো ইকতিয়ানের পথে।

মারুফ বললো, শোনও বান্দা, এবার আমার আরও হাজারখানেক জানোয়ার চাই। তাদের পিঠে বোঝাই থাকবে দামী দামী রেশমী কাপড়ের গাঁট। সে সব কাপড় সংগ্রহ করতে হবে সিরিয়া, মিশর, গ্রীস পারস্য, হিন্দুস্তান এবং চাইনা থেকে। সেখানকার সবচেয়ে সেরা সেরা জিনিস ছাড়া চলবে না।

মারুফের মুখের কথা শেষ হতে না হতে হাজারখানেক উট গাধা খচ্চরের একটা পাল আবির্ভূত হলো সেখানে। তাদের পিঠে ভারি ভারি কাপড়ের গাঁট।

মারুফ এই বিশাল লটবহর নিয়ে ইকতিয়ানের পথে রওনা হয়ে যাবে, এমন সময় ঐ চাষী দুখানা রুটি একটু নুন লঙ্কা পেঁয়াজ নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন এলাহী ব্যাপার কি করে সংঘটিত হতে পারলো, কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলো না।

মারুফ হাসতে হাসতে চাষীকে বললো, কী খুব অবাক হয়ে গেছ না? তা অবাক হওয়ার মতোই তো ব্যাপার।

চাষী কুণ্ঠিত হয়ে বললো, আপনি যে স্বয়ং সুলতান, তা তো আমি বুঝতে পারিনি জাঁহাপনা। তা হলে এই আধপোড়া রুটি আর পেঁয়াজ আপনার জন্য না এনে আমার ঘরের দুটো পোষা মুরগী মেরে খানা পাকিয়ে এনে দিতাম।

মারুফ বলে, তাতে কি হয়েছে। তোমার এই শুকনো রুটি পেঁয়াজই আমি বড় তৃপ্তি করে খাবো ভাইসাব। কই দাও আমার হাতে।

মারুফ দুখানা রুটি আর একটা পেঁয়াজ নিয়ে মুখে পুরে দিল।

—তোমাদের এই আন্তরিকতা কোনও পয়সা দিয়ে কেনা যায় না, দোস্ত! পোলাও মাংস তো রোজই খাই, কিন্তু আজ যা খেলাম তা অমৃত; মনে থাকবে অনেক কাল।

মারুফ বিদায় নেবার সময় বললো, আচ্ছা চলি ভাইসাব। আমি নিজে সুলতান নই এখনও, তবে সুলতানের জামাতা বটে। ভবিষ্যতে তাঁর অবর্তমানে হয়তো আমিই সুলতান হয়ে মসনদে বসবো একদিন। তখনও তোমার এই আতিথ্যের কথা মনে থাকবে আমার। আমি সুলতান বা সুলতানের জামাতা, সে কথা তো তুমি জানতে না। তা সত্ত্বেও তো এক অচেনা অজানা পরদেশী পথচারীকে আপ্যায়ন করার জন্য তোমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। হাতের কাজ ফেলে তার সেবার জন্য ছুটে গিয়েছিলে ঘরে। এমনটা ক'জনে করে আজকাল? মানুষ হিসেবে তুমি অনেক অনেক বড়। তোমার মতো দাতার প্রাণ ক'জনের হয়?

—এবার তোমাকে আমি ভালবেসে কিছু উপহার দিয়ে যেতে চাই চাষীভাই। এই যে যত লটবহর দেখছো সামনে—সব আমার। আমিই তার একচ্ছত্র মালিক। এখন বল, কী তোমার চাই? এক জোড়া উট, এক জোড়া গাধা আর এক জোড়া খচ্চর তুমি নাও। তোমার জমি-খামারের কাজে লাগবে! আর এদের পিঠে যে-সব গাঁট দেখছো তার মধ্যে আছে মূলবান সব রেশমী কাপড়। এগুলোও তোমাকে দিয়ে গেলাম। এ দ্বারা তুমি তোমার জমিজমা কিছু বাড়াতে পারবে। চাই কি ব্যবসা বাণিজ্য করেও মুনাফা করতে পারবে।

এরপর যাত্রা শুরু হলো ইকতিয়ানের পথে।

যথাসময়ে শহর সীমান্তে এসে পৌঁছলো মারুফ। দূত খবর বয়ে নিয়ে গেল সুলতানের দরবারে। মারুফ সেখানে দল-বল নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

দূত যখন দরবারে প্রবেশ করলো তখন উজির আর সুলতানের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা চলছিল ঃ

উজির বলছিল, জাঁহাপনা আর কতকাল অলীক চিন্তায় বসে বৃথা কালক্ষয় করবেন? আপনার জামাতা মহামান্য আমীর প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করেছে। আগাগোড়াই সে আপনাকে ধাপ্পা দিয়ে গেছে। লোক-লস্কর লটবহর কিছুই তার নাই—কিছুই এসে পেঁছিবে না। আমরা তাকে সন্দেহ করেছি এটা বুঝতে পেরেই সে প্রাসাদ থেকে কৌশলে কেটে পড়েছে।

উজিরের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না সুলতান। বলেন, হুম, আমাকে এমনভাবে ধোকা দিয়েছে সে? কিন্তু কোথায় পালাবে? কোথায় গিয়ে বাঁচতে পারবে? এখুনি দিকে দিকে সৈন্য পাঠাও। যেখানেই সে পালিয়ে যাক ধরে নিয়ে আসতে বল।

এই সময় মারুফের দূত যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সুলতানকে উদ্দেশ করে বললো, আমি আমীর মারুফের বান্দা। তার বার্তা বহন করে এনেছি আপনার কাছে। তিনি লোক-লস্কর ও লটবহর নিয়ে আমার পিছনে পিছনে আসছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শহর সীমান্তে এসে পেঁছিবেন। আপনাকে এই সংবাদ জানাবার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

সুলতান আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন উজিরের ওপর।

—এই তুমি—তুমিই যত নষ্টের গোড়া! তোমার বুদ্ধিতেই আমি বিভ্রান্ত হয়ে তাকে ধরে আনবার জন্য সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছিলাম। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা!

হারেমে কন্যার মহলে এলেন সুলতান।

—মা জননী, সুখবর আছে। মারুফ তার দলবল নিয়ে এসে পেঁছিচ্ছে একটু পরেই। আমি জানতাম সে আসবেই। তার মতো সৎ মানুষ সত্যিই আমি দেখিনি। যাই তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি গে।

এই বলে সুলতান দ্রুতপায়ে মহল ছেড়ে চলে গেলেন। শাহজাদীর মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এল। এ আবার কী হলো? মুচির ছেলের মাথায় আবার কি নতুন ফন্দি গজালো? কিন্তু যত নতুন চালই সে দিক তাতে তো কোন কাজ হবে না। ঐ শয়তান উজিরের জেরার মুখে পড়ে তার সব ফিকিরই ফাঁস হয়ে যাবে। উফ্, তারপর যে কী ঘটবে তা আর ভাবতে চায় না শাহজাদী। লোকটা আসলে অত্যন্ত ভাল মানুষ, সহজ সরল। কিন্তু তার নিজের ধারণা, তার মতো চালাক আর কেউ নয়।

শাহজাদী ভেবে পায় না, তাকে বার বার বারণ করা সত্ত্বেও কেন সে আবার আসছে। শাহজাদী তো তাকে বলেছিল সবদিক ব্যবস্থা করে সে-ই তাকে খবর পাঠাবে। সেই সময় পর্যন্ত সে ধৈর্য ধরে থাকতে পারলো না!

আবার সে ভাবে, ধৈর্য ধরে সে থাকবেই বা কী করে? সে নিজেও তো পাগলিনী-প্রায় হয়ে উঠেছে। ভালবাসা এমন বস্তু যা কোনও বাধাকেই বাধা মনে করে না, কোনও বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করে না। সেও এখন বোধ হয় উদভ্রান্ত প্রেমিক হয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে আসছে এখানে।

কিন্তু এখানে এলে তো তার মৃত্যু অবধারিত। না, সে কি ভেবেছে, বাবার কাছে সে অকপটে সব কথা খুলে বলে নিজের দৈন্য তুলে ধরে প্রাণ ভিক্ষা করবে? তা যদি করতে যায় সে, তবে তার চেয়ে আহম্মকীর আর কিছুই হবে না। সরল সত্যকথা বলে সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত করা যাবে না। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কী যে ঘটতে পারে তা বোধহয় ঐ বোকাটা আন্দাজ করতে পারেনি, তাই ছুটে এসেছে আবার।

সুলতানের নির্দেশে প্রাসাদ এবং সারা শহর আলোর মালায় সাজানো হলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ-দ্বার স্থাপন করা হতে লাগলো। শহরের সবাই উন্মুখ হয়ে রইলো আমীর মারুফকে দেখবার প্রত্যাশায়।

মারুফের বন্ধু মহম্মদ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। সর্বনাশ, এ তো আত্মঘাতী ব্যাপার ঘটাতে চলেছে মারুফ! সে সামান্য মুচির সন্তান। অথচ চাল-বোল দিয়ে সুলতানকে বুঝিয়েছে সে জগৎ বিখ্যাত বণিক সওদাগর। সত্য ঘটনাটা যখন উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে তখন বেচারার কী দশা হবে। ও কি জানে না সুলতানের সঙ্গে প্রতারণা করার কী কঠিন সাজা?

কিন্তু মহম্মদ হতভম্ব হয়ে গেল যখন দেখলো সত্যি সত্যিই মারুফ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে শহরের পথ দিয়ে এগিয়ে চলছে। সুলতানের উজির আমীর সেনাপতিরা স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে বরণ করে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না মহম্মদ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে বসে রইলো চুপ করে।

নয়শো উনসত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে থাকে:

প্রাসাদে পৌঁছলে সাদর অভ্যর্থনা করে সুলতান তাঁর পাশে এনে বসালো মারুফকে।

মারুফ তার নফরদের বললো, প্রথমে হীরে জহরতের বাক্সগুলো এনে এখানে খোল।

সুলতানসহ দরবারের সবাই তাজ্জব হয়ে দেখতে থাকলো সেই অভাবনীয় ঐশ্বর্য।

মারুফ সে সব দুহাতে বিতরণ করতে লাগলো উপস্থিত আমীর উজির এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে। সুলতান রাগে ফুঁসতে লাগলেন, ইস্ জামাইটা কী আহম্মক! এমন সব অমূল্য মণিরত্ন এইভাবে নয় ছয় করে বিলাচ্ছে সে! কিন্তু মুখ ফুটে কথাটি বলার সাহস হলো না তাঁর।

কিন্তু এক এক করে যখন প্রায় গোটা পাঁচেক বাক্স উজাড় হয়ে গেল তখন আর মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না তিনি।

—থাক থাক অনেক হয়েছে বাবা, আর বিলিয়ে কাজ নাই। এভাবে দানছত্র করলে শেষ পর্যন্ত আমাদের থাকবে কী?

কিন্তু মারুফ হাসতে হাসতে বললো, আপনি উতলা হবেন না আব্বাজান, আমার ভাঁড়ার শেষ হবার নয়।

কিছুক্ষণ পরে উজির এসে জানালো, জাঁহাপনার কোষাগার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর তিল ধারণের স্থান হবে না।

সুলতান বললেন, প্রাসাদের অন্য একটা মহল খালি করে নিয়ে তাতে রাখবার ব্যবস্থা কর।

মারুফ বললো, শুধু একটাতে হবে না জাঁহাপনা, আপনি আরও চার পাঁচটা বড় বড় কামরা খালি করার হুকুম দিন। আমার সব সামানপত্র তাতেও ধরবে কিনা সন্দেহ আছে।

রাত্রে শাহজাদীর ঘরে এসে মারুফ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়লো। একদিনে কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে সে। স্বামীর অদর্শন বিরহ তাকে কাবু করে ফেলেছিল খুবই। এখন তার অভিমান প্রতিহত হয়ে বর্ষার মতো ঝরে পড়তে লাগলো।

—তুমি আমার সঙ্গেও ছলনা করতে পেরেছ, সোনা? এটা কি তোমার উচিত হয়েছিল!

মারুফ অবাক হয়ে বলে, তোমার সঙ্গে ছলনা? হায় আল্লাহ, একি কথা শোনালে আমায়? খোদা কসম, তোমার কাছে তো কোনও কথা লুকাইনি আমি?

—লুকাওনি? মিথ্যেবাদী কোথাকার। কেন তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়ে বলেছিলে, তুমি এক দীন দরিদ্র মুচির ছেলে? কেন বলেছিলে, তুমি আমার বাবাকে ধাপ্পা দিয়ে আমাকে শাদী করেছ? উজির যখন বাবাকে বিষিয়ে দিচ্ছিল তখন তুমি কোনও প্রতিবাদ করলে না কেন? কেন আমার পরামর্শে প্রাসাদ থেকে পালাবার ছল করে সরে পড়লে? কেন? কেন?

দু হাতে এলোপাতাড়ী কিল বসাতে লাগলো সে মারুফের বুকে পিঠে।

মারুফ হাল্কা হাতে ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলে, আহা শোনই না আমার কথা!

—না না, আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না। তুমি একটা ঠগ্, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ।

মারুফ এবার শাহজাদীকে শান্ত করার জন্য একটু শক্ত হাতে বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরে অধরে অধর রাখে। মুহূর্তে সব দাপাদাপি শেষ হয়ে যায় শাহজাদীর। সেও দুহাতে জড়িয়ে ধরে স্বামীকে।

তারপর শান্ত নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়।

তারপর আবার ঝড় ওঠে। সে ঝড়ের দাপাদাপিতে কোথায় যে কিভাবে তছনছ ছিন্ন ভিন্ন ছত্রাকার হয়ে যায় সব, তার আর খেয়াল থাকে না কারো।

প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেলে মারুফ শাহজাদীকে নিজের হাতে জড়োয়ার গহনা পরিয়ে দিতে থাকে। গলায় সাতনরী মুক্তোর মালা। নাকে হীরের নাকছাবি, কানে চুণী পান্নার মাকড়ী, কোমরে রত্নবিছা, পায়ে হীরে

বসানো মল, হাতে বাজুবন্ধ, বাহুতে সাপের মাথার মণি বসানো তাগা, মাথায় টায়রা, আর কত কী ?

মারুফ বলে, আমার যত আছে রোজ এক প্রস্থ করে নতুন নতুন গহনা এবং সাজ-পোশাক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরতে পারবে। কোনওটা ঘুরিয়ে পরার দরকার হবে না, মণি।

শাহজাদী বলে, এ সবে আমার তেমন আসক্তি নেই, সে তো আমাকে ভাল করেই পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছ। সোনা, আমি চাই তুমি আমার বুকে থাকবে জিন্দগী ভর। আমি তোমার বাঁদী হয়ে সেবা করবো—এই আমার একমাত্র সাধ !

পরদিন খুব ভোরে সুলতান এসে করাঘাত করলেন দরজায়।

দরজা খুলে সুলতানকে উদভ্রান্ত পাণ্ডুর অবস্থায় দেখে শাহজাদী বিস্ময়াহত হয়ে বাবাকে হাতে ধরে একটা কুর্শিতে বসায়।

—কী হয়েছে বাবা, তোমাকে এমন উদ্বিগ্ন দেখছি কেন ?

একটা বাটিতে করে খানিকটা জল এনে সে সুলতানের চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়। সুলতান হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে, বড়ই দুঃসংবাদ বেটী। ভাবছি, তোমাদের এই সুখ-মিলনের মুহূর্তে তা বলা ঠিক হবে কিনা।

মারুফ এগিয়ে এসে বলে, আপনি কোনও রকম দ্বিধা সংকোচ না করে খুলে বলুন বাবা, কী হয়েছে ?

সুলতান বলে, তোমার লোকজন যারা লটবহর সঙ্গে করে এনেছিল তারা সংখ্যায় হাজারেরও বেশি হবে। এই এক রাতের মধ্যে তারা কীভাবে কোন দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে আমার সদা জাগ্রত প্রহরী কেউই কিছু বলতে পারছে না। শহরের কোনও লোকেরও চোখে পড়েনি তাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়া। এ তো একেবারে ভুতুড়ে কাণ্ড ! কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, এমন এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো কি করে ? আমি ভয়ে মরছি, তোমার কাছে এর কৈফিয়ৎ নেব।

মারুফ হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—আপনি ও নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করবেন না, বাবা। ওরা যথাস্থানেই লে গেছে। এবং হঠাৎ ওদের এই অন্তর্ধানে মোটেই আমি অবাক হইনি। আবার আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে আবার তারা এসে হাজির হবে এখানে। ওদের কোনও অনিষ্ট হয়নি, বেশ বহাল তবিয়তেই সবাই স্বদেশে ফিরে গেছে।

একথা শুনে সুলতান কৌতুক বোধ করলেন। এমন মজার ব্যাপার উজিরকে না বলে কি পারেন তিনি ?

—এ সব শুনে তোমার কী মনে এখনও সন্দেহ জাগছে উজির, আমার জামাতা যে সে লোক নয়। তার ওপর আল্লাহর অশেষ করুণার দৃষ্টি আছে। না হলে এমন অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে ?

উজির মনে মনে বললো, এইবার মওকা পেয়েছি। কি করে প্রতিশোধ নিতে

হয় এবার দেখিয়ে দেব বাছাধনকে।

সুলতানকে উদ্দেশ করে সে বলে, জাঁহাপনা, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। আপনি যদি শোনেন তবে আমার ধারণা, আপনার মনের আঁধার কেটে যাবে।

—বল কী বলতে চাও ?

—এত ধন-দৌলতের উৎস কোথায়, তা যদি জানতে চান তবে আমীর মারুফকে মাতোয়ারা করে দিতে হবে। তাহলে তিনি নিজেই আপনাকে বলে দেবেন এর গুপ্ত রহস্যের কথা। যখন তিনি সরাবের নেশায় নাচতে থাকবেন তখন আপনি তাঁকে কায়দা করে প্রশ্ন করবেন। এবং দেখবেন তখনই সে গড় গড় করে বলে দেবে সত্যি কথাটা।

সুলতান লাফিয়ে উঠলেন, বাঃ চমৎকার মতলব এঁটেছো তো উজির!

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে, সুলতান মারুফ এবং উজিরকে সঙ্গে নিয়ে পানাহারে বসলেন।

একে একে অনেকগুলো পাত্র উজাড় করে দিল মারুফ। ক্রমে নেশা জমে উঠলো। এবং একটু পরে কথা জড়িয়ে আসতে লাগলো তার। কারণে অকারণে হাসির গমকে গড়িয়ে পড়তে থাকলো সে। সুলতান সুযোগ বুঝে মারুফকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বেটা তোমার জীবনের বিচিত্র অভিযানের কোনও কাহিনীই শোনা হয়নি এতদিন। আজ শোনাবে ?

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো সত্তরতম রজনী ঃ
আবার সে বলতে থাকে ঃ

নেশার ঘোরে আগাগোড়া সব কাহিনী বলে গেল মারুফ। কাইরোতে এক দরিদ্র মুচির ঘরে তার জন্ম, তার দজ্জাল বৌ, তার অমানুষিক অত্যাচার, বাড়ি থেকে পলায়ন—ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শেষে কী ভাবে তার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটলো—কী করে সে দৈব আংটি পেয়ে রাতারাতি বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারলো—সব কাহিনীই আদ্যোপান্ত বলে গেল সে গড়-গড় করে।

সুলতান এবং উজির উন্মুখ হয়ে তাকালেন মারুফের হাতের দিকে। উজির বললো, আমীর সাহেব, ঐ আংটিটা একবার দেখিয়ে আমাদের চোখকে ধন্য করবেন ?

মারুফ বলে, অবশ্যই।

এই বলে নির্বোধ মারুফ সেই মহামূল্য আংটিটা খুলে শত্রু উজিরের হাতে তুলে দিল।

—এই নিন, এই আংটির মধ্যেই বাস করে ঐ জীন দৈত্য।

প্রায় ছোঁ মেরে আংটি মারুফের হাত থেকে তুলে নেয় উজির। নিজের আঙ্গুলে পরে নিয়ে ঘর্ষণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—এই তো আমি এখানে, আদেশ করুন মালিক, কী করতে হবে? যদি বলেন কোনও এক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারি, অথবা গড়ে দিতে পারি এক বিশাল শহর সলতানিয়ত। অথবা যদি হুকুম করেন এনে দিতে পারি কোনও সুলতান বাদশাহর শির।

উজির বললো, শোনও আংটির বান্দা, এই খানকীর ছেলে সুলতান আর এই মুচিটাকে এখুনি নিয়ে গিয়ে রেখে এস এক উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতান এবং মারুফ শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উজির দরবারে গিয়ে তখতে বসলো। উপস্থিত আমির ওমরাহ সৈন্যাধ্যক্ষদের বোঝাতে লাগলো, ঐ অপদার্থ সুলতান এবং তার জামাই এই দেশটাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। আমি তাদের ঊষর মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়েছি। এখন থেকে আমিই তোমাদের সুলতান। আমাকে যদি তোমরা সহজভাবে মেনে নাও, অতি উত্তম। কিন্তু যদি কেউ বিদ্রোহ করার চেষ্টা কর তবে জেনে রেখ মউৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দরবারের কেউই একথার প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। এরপর উজির শাহজাদীর কাছে সংবাদ পাঠালো, আমাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও, শাহজাদী। এতদিন ধরে তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি আকুল হয়ে আছি।

শাহজাদী পূর্বাহ্নেই খবর পেয়েছিল, উজির বিদ্রোহ করে তার বাপ এবং স্বামীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, খোজা নফরকে দিয়ে খবর পাঠালো, আমি আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপনি এই বাঁদীকে পায়ে আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন। কিন্তু একটা কথা বলতে শরম হচ্ছে, এখন আমি রজস্বলা হয়েছি। এই অপবিত্র দেহ ক'টা দিন আপনার ভোগে লাগবে না। আমি যখন শুদ্ধ হবো তখন আপনাকে খবর দেব।

উজির বলে পাঠালো, ওসব মাসিক-ফাসিক আমি জানি না, জানতে চাই না, আজই এক্ষুণি আমি তোমাকে সম্ভোগ করতে চাই। আমি যাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত থেক।

শাহজাদী জানালো, বেশ আপনার যদি অরুচি না হয় আমার আর আপত্তি কিসের? আসুন, নিজের চোখেই দেখে যান।

খুব দামী সাজ-পোশাকে নিজেকে সাজালো সে। দুষ্প্রাপ্য আতরের খুসবু মেখে নিল সারা অঙ্গে।

উজির এল। লাস্যময় বিলোল কটাক্ষ হেনে হাসিমুখে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে কোনও ত্রুটি রাখলো না শাহজাদী।

—আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য! এই মধুময় রাত্রিটির জন্য আমি কত কাল ধরে প্রত্যাশা করে বসেছিলাম। এতদিনে সে সাধ আমার আজ পূর্ণ হবে —এ আনন্দ আমি রাখবো কোথায় প্রভু!

এরপর সে ধীরে ধীরে তার অঙ্গবাস ছেড়ে ফেলতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ শাহজাদী আর্তনাদ করে উঠে বোরখা টেনে নিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। উজির উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী? কী ব্যাপার অমন চিৎকার দিয়ে উঠলে কেন?

—আপনি কী? একটা অচেনা পরপুরুষের সামনে আমাকে বিবস্ত্রা হতে বলছেন?

উজির ঘরের এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে থাকে।

—কই কাউকেই তো দেখছি না, শাহজাদী। তুমি আমি ছাড়া ঘরে তো তৃতীয় প্রাণী কেউ নেই?

শাহজাদী বললো, নেই মানে? আপনার ঐ আংটির ভিতরে একটা আস্ত দৈত্য বসে আছে, আর বলছেন কেউ নেই?

উজির লজ্জিত হয়ে বললো, ইয়া আল্লাহ্, একথা তো আমার খেয়ালই ছিল না একেবারে। হুঁ, তাইতো, এই বান্দাটা চুরিয়ে চুরিয়ে সব দেখে ফেলতে পারতো আমাদের কাজ কারবার? ছিঃ ছিঃ, কি বে-শরম ব্যাপার হতো বলতো, শাহজাদী? ভাগ্যে তুমি খেয়াল করেছিলে! দাঁড়াও, এটাকে খুলে বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রাখছি। তা হলে তো আর দেখতে পারবে না ব্যাটা।

শাহজাদী বললো, তা বটে। বালিশের নিচে চাপা পড়ে থাকলে আর দেখবে কি করে?

আংটিটা খুলে বালিশের নিচে চাপা দিয়ে রেখে উজির উদগ্র কামনা নিয়ে শাহজাদীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঠিক এই সময় তাক বুঝে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি বসিয়ে দেয় শাহজাদী। একেবারে উজিরের বিচির উপর। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে যায় সে মেঝের উপর। এবং সেই সুযোগে বালিশের তলা থেকে টুক করে আংটিটা তুলে নিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলে পরে নিয়ে আস্তে একবার ঘর্ষণ করে শাহজাদী।

—বান্দা আপনার সামনেই আছে, হুকুম করুন মালকিন!

শাহজাদী বললো, এই শয়তানটাকে অন্ধকার কূপ-কারাগারে নিক্ষেপ কর। তারপর আমার বাবা এবং স্বামীকে নিয়ে এস এই প্রাসাদে। দেখো, তাদের যেন কোনও তখলিফ না হয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো একাত্তরতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

তৎক্ষণাৎ উজিরকে দলা পাকিয়ে তুলে নিয়ে যায় অদৃশ্য দানব। এবং পর মুহূর্তেই, শাহজাদী দেখলো, তার বাবা এবং স্বামী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—তোমার খুব কষ্ট হয়েছে না?

শাহজাদী বাবা এবং স্বামীর কাছে এগিয়ে আসে।

সুলতান বলে, হ্যাঁ জি বেশ হয়েছে। ধু ধু করা উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর কোথাও একবিন্দু পানির চিহ্ন নাই। তবে অনেক ভাগ্য যে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়ে আনতে পেরেছ তুমি। না হলে দু-একদিনের মধ্যেই মরতে হতো সেখানে। কিন্তু মা, এমন অসাধ্য সাধন কী করে করলে তুমি। উজিরের হাত থেকে তোমার হাতে এল কী করে ঐ আংটিটা?

শাহজাদী বললো, সে সব কথা পরে বলছি বাবা, আগে তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে খানাপিনা করে নাও।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উজিরের বদমাইশির সব কাহিনী সবিস্তারে বললো শাহজাদী। সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন। ওকে আমি ফাঁসী দেব, আগুনে পুড়িয়ে মারবো। কী বল, মারুফ?

—তাই করুন বাবা, ও লোকের আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নাই।

তারপর শাহজাদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললো, কই আমার আংটিটা আমাকে দিয়ে দাও, মণি।

শাহজাদী ভ্রূকুটি হেনে বললো, না, এটা আমার কাছেই থাকবে। তোমার হাতে থেকেই তো এই বিপত্তি ঘটলো। তোমাকে দিলে আবার কখন কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে কে জানে। তার চেয়ে আমার কাছেই থাক।

মারুফ বললো, তা যা বলেছ। আমি তো ছাই অত প্যাঁচ পয়মার বুঝি না। কখন কে ঠকিয়ে হাতিয়ে নেবে কে জানে। যাক, ওটা তোমার কাছেই থাক।

পোলো মাঠে উজিরের ফাঁসীর মঞ্চ তৈরি করা হলো! তার নিচে সাজানো হলো কাঠের লকড়ি। এবং তাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন। হাজার হাজার শহরবাসীর উপস্থিতিতে উজিরের জীয়ন্ত দেহটা লেলিহান অগ্নিশিখায় পুড়ে আংরা হয়ে গেল মুহূর্তে।

সুলতান মারুফকে সিংহাসনে বসিয়ে শাসনভার তুলে দিলেন তার হাতে। আংটিটা শাহজাদীর হেফাজতেই রয়ে গেল। এরপর মারুফ সুখে শান্তিতেই বেশ কিছুকাল কাটালো।

কিন্তু বিপদ ঘটলো একদিন রাত্রে।

প্রাত্যাহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে নিজের কামরায় এসে সবে শুয়ে পড়েছে, এমন সময় অতর্কিতে এক আধবুড়ো মেয়ে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের ওপর। বাঘিনীর মতো সে হুঙ্কার ছাড়লো। মারুফের দাড়িগুচ্ছ মুঠি করে ধরে বেদম ঘুষি চালাতে লাগলো। ফলে, তার আরও দুখানা দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেল তক্ষুণি।

এই অর্ধ বুড়িটা যে কে তা নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি?

মারুফের বৌ ফাতিমা খুঁজতে খুঁজতে এত দূর দেশ অবধি চলে এসেছে।

—হুম, তুমি ভেবেছে, দেশ ছাড়া হয়ে পালিয়ে বাঁচবে? আমাকে না বলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার কী করে তোমার সাহস হলো সেই কৈফিয়ত আমার চাই। ওরে কুত্তার বাচ্চা, তুই কি ভেবেছিলি পালিয়ে নিস্তার পাবি আমার

হাত থেকে ? মেরে হাড় গ‍ুঁড়িয়ে দেব তোর, শয়তান, বেল্লিক কোথাকার !

মারুফ কোনও প্রকারে ফতিমার কব্জা থেকে নিজেকে মুক্ত করে চোঁচা দৌড় দিয়ে শাহজাদীর ঘরে এসে ঢুকে পড়ে। মাথার টুপী উড়ে গেছে, গায়ের কামিজ আধখানা ফতিমার হাতের মুঠোতেই রয়ে গেছে। পায়ে চটি নাই।

শাহজাদী মারুফের এই উদভ্রান্ত আতঙ্কিত মূর্তি দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, কী হয়েছে ? তোমার এ দশা হলো কী করে ?

—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও সোনা ! এই বলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল শাহজাদীর পায়ের তলায়।

একটা বাটিতে করে জল এনে স্বামীর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে থাকে শাহজাদী। একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকায় মারুফ। ঠিক এই সময় দজ্জাল ফতিমা রণমূর্তি ধরে শাহজাদীর কামরায় ঢুকে পড়ে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় সেই খানকীর বাচ্চা, আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন দেখে নেব আমি।

তারপর শাহজাদীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে দাঁত কড়মড় করে চোখ পাকিয়ে তাকায়, হুম, তাহলে তুমিই সেই মেয়েমানুষ। দাঁড়াও তোমারও ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

শাহজাদী বুঝতে পারলো উম্মাদ মেয়েছেলেটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই মুহূর্তে সে আংটিটা ঘষে দৈত্যকে হুকুম করলো, ঐ মেয়েটাকে পাকড়াও কর যেন সে আমার ওপর চড়াও হতে না পারে।

ফতিমা প্রাণপণে কসরৎ করেও নিজের হাত পা এক চুল এদিক ওদিক করতে পারে না। ক্রোধে দাঁত কড়মড় করতে পারে শুধু। চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলতে থাকে।

মারুফ এগিয়ে আসে ফতিমার কাছে। কিন্তু তার সেই বীভৎস ভাবে দাঁত মুখ খিঁচানো দেখে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

শাহজাদী আংটির দৈত্যকে বলে, ওকে এবার বাগানে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সংগে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দাও।

এরপর ফতিমার কি হয়েছিল জানি না, তবে মারুফ আর শাহজাদী সুখে সম্ভোগের মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল দুজনে।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার বললো, রাত তো এখনও অনেক বাকী। আর একটা আরম্ভ কর শাহরাজাদ। তোমার গল্প শোনার নেশা আমায় পেয়ে বসেছে।

শাহরাজাদ বলে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য, জাঁহাপনা ! আপনি যত দিন শুনতে চাইবেন ততদিনই তো আমি বেঁচে আছি। আমি যেদিন আপনার মনমতো কিসসা শোনাতে পারবো না সেইদিনই তো আমার দিন শেষ হয়ে যাবে।

থাক ওকথা। এবার নতুন কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

আলেকজান্দ্রা শহরে একটি যুবক বাস করতো। উত্তরাধিকারী সূত্রে

পিতার কাছ থেকে সে প্রচুর ধনরত্ন এবং বিষয় সম্পত্তি লাভ করে। এর মধ্যে ছিলো পর্যাপ্ত জলের সরবরাহযুক্ত অপর্যাপ্ত জমি, অগুনতি পাকা ইমারত ইত্যাদি। শিশুকাল থেকে সে স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়, তা সত্ত্বেও পবিত্র ধর্মগ্রন্থে মানুষের যে কটি গুণের কথা বলা হয়েছে তার সব কটিই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ঈশ্বর প্রেরিত মানুষকে সে ভালবাসতো, প্রয়োজনে মানুষকে সাহায্য করতে পারলে সে আর কিছু চাইতো না।

এই বিপুল ধনসম্পত্তি পেয়ে যুবকটি চিন্তায় পড়ে গেলো, কেমন করে এই বিষয় সম্পত্তি সবচেয়ে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়! অবশেষে সে স্থির করলো যে, একজন সত্যকার জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নেবে। জানাশোনার মধ্যে তার পিতার এক শেখ বন্ধু ছিলেন, যুবকটি তার কাছেই যাবে বলে মনস্থ করলো।

যুবকটি শেখের কাছে তার বক্তব্য পেশ করে। শেখ ঘণ্টাখানেক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন, তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন,—আবদুর রহমানের পুত্র! আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। শোন, ধনরত্ন দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে পুণ্যকর্ম, আল্লাহ এতে খুশী হন। কিন্তু একাজ তো যে-কোন ব্যক্তিই করতে পারে! নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তি অন্যকে বিলিয়ে দিতে গেলে মস্ত বড় গুণের অধিকারী হতে হয় না, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ। দান আরো এক রকমের আছে, সে হলো নিজের বুদ্ধি শক্তি, নিজের জ্ঞান অন্যকে বিতরণ। পৃথিবীতে যারা চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে, তাদের যে আলোর পথ দেখাতে পারে সেই আমার মতে সবচেয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি। আর মনে রেখো, একমাত্র সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তিই এই পুণ্যের অধিকারী। প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে হলে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়, গভীর ধ্যানে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে হয়। বৎস! সম্পদে নয়, তুমি তোমার মনকে সত্যকার ধনী করে তোলো, তুমি একজন দানবীর হয়ে ওঠ, মানুষকে আলোর পথ দেখাও, এই আমি চাই। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এর চেয়ে ভালো পরামর্শ আমি তোমায় দিতে পারবো না।

ধনী যুবকটির আরো ব্যাখ্যা জানতে চাইবার ইচ্ছা করলো কিন্তু শেখকে দেখে তার মনে হয় শেখ আর কিছু বলতে রাজী নন। অগত্যা সে ফিরে আসে। শেখের সুপরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে একদিন বই-এর বাজারে খোঁজ করতে গেলো। সমস্ত পুস্তক বিক্রেতাকে সে একত্রিত করে, (এদের মধ্যে কিছু কিছু সত্যকার দুর্লভ বই ছিল, এগুলি সেই বিশেষ লাইব্রেরীর বই যেগুলি খৃষ্টানরা পুড়িয়ে ফেলে, যখন আমরু বিন অল অস আলেকজান্দ্রিয়া শহরে প্রবেশ করেন।) এবং তাদের কাছে যত দুষ্প্রাপ্য-মূল্যবান গ্রন্থ ছিল সবগুলিকে তার গৃহে পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানায়। পুস্তক ব্যবসায়ীরা বই নিয়ে এলে সে সকলকে প্রকৃত মূল্য দিয়ে খুশী করে। কিন্তু মাত্র এই কটিতে তার অনুসন্ধিৎসা পূর্ণ হল না, সে তখন কায়রো, দামাস্কাস, বাগদাদ, পারস্য, মরক্কো এবং হিন্দুস্তানে দূত প্রেরণ করলো, এমন কি খৃষ্টানদের দেশেও

সে লোক পাঠাতে ভোলে না। প্রত্যেককে সে নির্দেশ দিয়ে দিলো যে, যে কোন মূল্যে সত্যিকার কোনো সুগ্রন্থ তারা যেন ছেড়ে না আসে। দূতেরা একে একে বই-এর বোঝা সাথে নিয়ে ফিরে আসে। যুবকটি প্রতিটি গ্রন্থ সযত্নে সাজিয়ে রাখে একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের অভ্যন্তরে। গম্বুজের প্রধান ফাটকের মাথায় সে নীল আর সোনালী অক্ষরে সুন্দর করে লিখে দেয়—"গ্রন্থ-গম্বুজ"।

ভোর হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকল।

নয়শত বাহাত্তরতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

যুবকটি যত্ন ও মনযোগ সহকারে বই-পাঠে মনোনিবেশ করে। সুন্দর স্মৃতিশক্তি থাকায় সে দ্রুত জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। অল্প কিছুদিনেই সে সমসায়িক যে-কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে আপন মেধায় অতিক্রম করে যায়। সমৃদ্ধ চিন্তাশক্তি অন্যের সাথে সমানভাগে ভাগ করে নেবার জন্য সে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, অতিথি সকলকে আমন্ত্রণ করতে থাকে তার গ্রন্থ-গম্বুজে। ভিক্ষুকেরা তার দরজায় সমাগত হলে, সে সকলকে প্রথমে পানাহারে তৃপ্ত করে তুলতো, তারপর তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করতো—আমার প্রিয় মেহমান, এসো আজ রাতে শুধুমাত্র নাচগানে মন না দিয়ে আমরা কিছু জ্ঞান আহরণ করি! একজন সুধী ব্যক্তি বলে গেছেন ঃ তোমার জ্ঞানের বাণী বিতরণ করে সকলের কানকে তৃপ্ত কর। যে সত্যিকার জ্ঞানকে আহরণ করতে পারে সেই প্রকৃত ধনী। ঈশ্বরকে যে খুশী করতে চায়, তাকে সত্যিকার জ্ঞানী হয়ে উঠতেই হবে, কারণ তার বাণীই সকল জ্ঞানের উৎস। কিন্তু দুঃখের কথা তার খুব কম সন্তানই এই সত্যকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এছাড়া আল্লাহ তার পয়গম্বর বা দেবদূতদের মুখ দিয়ে অনেকবার বলেছেন যে,—সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তোমার যে বস্তু, দান করলে তাই দান কর। দান করে কখনও গর্ব বোধ করো না, কারণ একজন দাম্ভিক দাতা একটি পাথরের পাহাড়ের মতো, যে পাথরের ওপর মাঠির আবরণ খুবই সামান্য। যখন বৃষ্টি হয় তখন খুব সহজেই তার মাটির আবরণ ধুয়ে মুছে যায়, পড়ে থাকে শুধুমাত্র নিঃসার পাথরের টুকরো। এই সমস্ত লোক দান করে কোনই পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে না। কিন্তু যারা নিজেদের আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য দান করে থাকে তারাই সত্যকার দাতা। তাদের জ্ঞানে পাহাড়ে প্রতিটি দান যেন এক একটি বৃক্ষ রোপণের মত। যখন বৃষ্টি হয়, প্রতিটি বৃক্ষ ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। একমাত্র এরাই আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের রাস্তা খুঁজে পায়।

এইজন্য আমি আজ তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি। এতদিন আমি যা কিছু শিখেছি, তা আমি নিজের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে চাই না, তোমাদের সবার সাথে আমি তা সমান ভাগে ভাগ করে নিতে চাই। কতটুকু আমার জ্ঞান

এতে শুধু তারই পরীক্ষা হবে, আর কিছু নয়।

এসো বন্ধুগণ, আজ আমরা ইতিহাস-উদ্যানের মধ্য দিয়ে একটুখানি বাইরের দিকে চেয়ে দেখবো। অতীতের সুন্দর সমৃদ্ধশালী দিনগুলি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাবে, আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করে নিয়ে যাবে তাদের মধুর রসে। আমাদের সেই জ্যোতির্ময় আলোর পথে পা পা করে এগিয়ে যেতে পারবো। আমেন।

সমগ্র অতিথিবৃন্দ তাদের হাত তুলে জবাব দেয়, 'আমেন'।

যুবকটি নিঃশব্দে বসে পড়ে, কিছুক্ষণ সুগভীর চিন্তার পর সে আবার বলতে শুরু করে।

—বন্ধুগণ, কি ভাবে বলতে শুরু করবো জানি না। সেই মহান বীরত্বপূর্ণ যুগে আমাদের পিতা-প্রপিতামহরা কেমন জীবন যাপন করতেন আমি তারই দু'একটা নমুনা তুলে ধরতে চাই তোমাদের সামনে। তাঁরা ছিলেন তাঁদের মাটি মায়ের সুযোগ্য আরব-সন্তান! কত শক্তিশালী কবি ছিলেন তখন, যাঁরা না জানতেন লিখতে, না জানতেন পড়তে। অদম্য প্রেরণাই ছিলো তাঁদের একমাত্র সম্পদ। তাঁদের না ছিল কালি, না ছিলো কলম, না ছিলো সমঝদার শ্রোতা, অথচ তাঁরাই দিনে দিনে গড়ে দিয়ে গেছেন আমাদের এই আরব-ভাষা, যে ভাষা আল্লাহ নিজে বেছে নিয়েছেন। পয়গম্বরের বাণী পাঠাতে তিনি তো এই ভাষাই ব্যবহার করেন! আমেন।'

অতিথি সমবেত স্বরে হাত তুলে জবাব দেয়, 'আমেন।'

যুবকটি তখন বলে, সেই মহান বীরত্বপূর্ণ যুগের সহস্র গল্পের মধ্যে একটি গল্প আমি আজ তোমাদের বলছি।

যুবকটি গুছিয়ে বসে গল্প শুরু করে।

কবি দরাইদ বিন সিমাহ ছিলেন বানী জুশাম উপজাতির একজন শেখ। সেই মহান বীরত্বপূর্ণ যুগের প্রথম আমলের লোক ছিলেন তিনি। যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যত সুনাম ছিল, কবি হিসাবে তাঁর যশ ছিল ততোধিক। অগুনতি তাঁবুর মালিক ছিলেন তিনি। তাছাড়া তাঁর ছিল প্রচুর তৃণাচ্ছাদিত জমি ও গৃহপালিত পশুর পাল।

বানী-ফিরাস উপজাতির সাথে তাদের চির অসন্তোষ লেগেই ছিল। রাবিয়াহ্‌, মরুভূমিতে অমন নামজাদা যোদ্ধা আর জন্মায়নি। একদা দরাইদ সেই বানী-ফিরাসদের আক্রমণ করবেন স্থির করলেন। বাছা বাছা কিছু যোদ্ধা বেছে নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে তাঁরা একটা উপত্যকায় এসে পেঁছিলেন, এটি ছিল তাঁদের শত্রুপক্ষের দখলে। হঠাৎ দূর দিগন্তে তাঁর চোখে পড়লো একটি লোক পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার পিছনে একটি উট, উটে চেপে বসে আছে একটি মহিলা। দরাইদ তার একজনকে ডেকে বললেন, —ঐ লোকটিকে আক্রমণ কর।

ঘোড়সোয়ার যোদ্ধাটি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায়। লোকটির কাছাকাছি পেঁছিতে চিৎকার করে ওঠে,—বাঁচতে চাও তো মেয়েটিকে ফেলে এখনই

পালাও। তিনবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যোদ্ধাটি। বিজ্ঞ লোকটি তাতে কর্ণপাত করে না, শান্ত পদক্ষেপে হেঁটে যেতে থাকে। যোদ্ধাটি খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই তিনি উটটিকে থামিয়ে একটি সুমধুর গান ধরলেন:

চলরে ছুটে ঘোড়সোয়ার
চিত্ত রেখে ভাবনাহীন।
প্রশান্ত দিন সামনে তোমার
গর্ব তোমার আকাশে লীন।
দেখাই যখন হল মাঝে
বন্ধু এমন অকস্মাৎ
তলোয়ার কেন খাপে ঢাকা থাকে
যুদ্ধ হোক না আজ একহাত!

বলতে বলতে চকিতে তিনি বর্শা চালান, মুহূর্তে দরাইদের সেই যোদ্ধার মৃতদেহ ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। চালকহীন ঘোড়ায় তিনি তখন চেপে বসেন। মহিলাটির প্রতি ঈষৎ কুর্ণিশ করে তিনি আবার এগিয়ে যেতে থাকেন, পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে থাকে উটটি। লোকটির মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদীও চুপ করে বসে থাকে।

নয়শত তিয়াত্তরতম রজনী:
আবার সে বলতে শুরু করে:

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন তাঁর যোদ্ধাটি আর ফিরে এলো না, তখন তিনি আরো একজনকে পাঠালেন। দ্বিতীয় যোদ্ধাটি ঘোড়া চালিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখতে পায় তার বন্ধুর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, তখন সে সেই খুনী লোকটিকে ধাওয়া করে। প্রথম যোদ্ধার মত সেই একই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে তিনবার, কিন্তু লোকটি কিছুতেই কর্ণপাত করেন না, শান্তভাবে তাঁর নতুন পাওয়া ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যেতে থাকেন। কাছাকাছি আসতেই তিনি উটটিকে থামিয়ে দেন এবং এই গানটি গাইতে গাইতে ঘোড়া চালিয়ে যোদ্ধাটির দিকে ছুটে আসেন:

নিয়তি যখন এই পথে আজ
পাঠাল তোমায় বন্ধু মোর
সত্য কথাটি জেনে যাও শুধু
যেমন সত্য এ মরুভূমি ধু-ধু
রবিয়াহুর হাতে বর্শা যখন
হেসে ওঠে তাতে অনেক জোর!

রবিয়াহুর বর্শা আবার চকিতে ঝলসে ওঠে, দ্বিতীয় যোদ্ধার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুহূর্ত মধ্যে, আত্মরক্ষার কোন সুযোগই সে পায় না।

রবিয়াহ্ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন।

দ্বিতীয় যোদ্ধাটিও যখন ফিরে এলো না, দরাইদ তখন চিন্তায় পড়ে গেলেন। তৃতীয় এক যোদ্ধাকে তিনি তখন পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। এই লোকটিও কিছুদূর গিয়ে তার বন্ধুদের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেলো। মৃতদেহ দুটি ডিঙিয়ে সে এগিয়ে যায়, দেখতে পায় উটে চেপে একটি মহিলা চলেছেন, তার সামনে ঘোড়ায় চেপে একটি পুরুষ, তার হাতে তাচ্ছিল্যের সাথে ধরা রয়েছে একটি বর্শা।

—শয়তান কুকুর, তোর যোগ্য শাস্তি এবার নে। যোদ্ধাটি চিৎকার করে তার দিকে ছুটে আসতে থাকে। রবিয়াহ্ বিচলিত হন না, উটটি থামিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ান, মুখে তাঁর এখনও গান ঃ

ফিরে দেখ ভাই সাথিরা তোমার
ধূলায় লুটায় শকুনীর আশে
শিক্ষা যখন হল না তোমার
ঠাঁই হোক তব সাথিদেরই পাশে!

দরাইদের তৃতীয় যোদ্ধার বুক তিনি বার বার বিদ্ধ করে দিতে থাকেন, তাঁর আক্রমণের আকস্মিকতায় তৃতীয় যোদ্ধাও হাত তোলার অবসর পায় না। কিন্তু এই বারম্বার আক্রমণে রবিয়াহ্র বর্শাটি ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর নিজস্ব উপজাতির তাঁবু খুব কাছেই এসে পড়েছে। একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি তাই এগিয়ে চললেন, মৃত শত্রুর অস্ত্রটি খুলে নেবার কথা তিনি চিন্তাও করলেন না।

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন তাঁর কোন যোদ্ধাই ফিরে এলো না, তখন তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন পর পর তিনজন যোদ্ধার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দরাইদ তাঁর সাথীদের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। এদিকে রবিয়াহ্ ততক্ষণে একটি টিলার আড়ালে চলে গেছিলেন, তিনি আড়াল থেকেই জুশাম-কবিকে চিনতে পারলেন। বাণী-ফিরাসের শেখের তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কেন তিনি তাঁর মৃত শত্রুর দেহ থেকে অস্ত্রটি খুলে নিলেন না! কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, বর্শার কাঠের হাতলটি হাতে নিয়েই তিনি দরাইদের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন রবিয়াহ্ নিরস্ত্র, তখন তাঁর শত আক্রোশ সত্ত্বেও তাকে আক্রমণ করতে পারলেন না। চিৎকার করে রবিয়াহ্কে জানালেন, বন্ধু ঘোড়সোয়ার! তোমার মত একজন নিরস্ত্র লোককে আমি খুন করতে পারবো না। কিন্তু আমার দল প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারা তোমাকে একা নিরস্ত্র অবস্থায় দেখতে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। তুমি আমার এই বর্শাটি নিয়ে যাও, আমি আমার লোকদের মাঝে ফিরে যাচ্ছি, ওদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব কথা দিচ্ছি।

বর্শাটি রবিয়াহ্‌র দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি ফিরে চললেন। তাঁর দলের লোকদের তিনি বোঝালেন, লোকটির অসীম সাহস। আমাদের তিনজন যোদ্ধাকেও পরাস্ত করেছে, তাদের মৃতদেহ এখন বালিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, আমার সাথে তীব্র যুদ্ধের পর আমার অস্ত্রও ওর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এমন শক্তিশালী শত্রুকে আক্রমণ করে কাজ নেই। চল, আমরা ফিরে যাই।

লোকজন নিয়ে তিনি নিজেদের অঞ্চলে ফিরে এলেন, রবিয়াহ্‌কে তিনি সেবারের মত অব্যাহতি দিলেন।

বছর ঘুরে যেতে লাগলো, রবিয়াহ্‌ একদিন মৃত্যুবরণ করলেন। একজন বীর যোদ্ধার মতই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। দরাইদের উপজাতির সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালেন।

তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ফিরাস-যোদ্ধাগণ বাণী-জুশামদের ওপর নতুন এক আক্রমণ শুরু করলো। রাত্রির অন্ধকারে তারা তাঁবু আক্রমণ করে, হঠাৎ আক্রমণে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে ফেলে সহজেই। বেশ কিছু সংখ্যক যোদ্ধাকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। সাথে নেয় কিছু লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ আর কয়েকটি মহিলা। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন শেখ দরাইদ।

শত্রুদের মধ্যে এসে পড়ে দরাইদ নিজের নাম প্রকাশ পেতে দিলেন না, সযত্নে গোপন করে রেখে দিলেন। শত্রুরা জানলো না যে, তারা কাকে বন্দী করে এনেছে। শক্ত প্রহরায় তাদের রেখে দেওয়া হল। ফিরাস-রমণীরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, কেউ কেউ তাকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করলো। দরাইদ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তখন একজন মহিলা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, ফিরাসের বোকা যোদ্ধারা, তোমরা কাকে ধরে এনেছো জান? ইনি একদিন তোমাদের সাহায্যেই এগিয়ে এসেছিলেন। নিরস্ত্র রবিয়াহ্‌কে হাতের মুঠোয় পেয়েও খুন করেননি, অথচ তার অল্পক্ষণ পূর্বেই রবিয়াহ্‌ এদের দলের তিনজনকে হত্যা করেন, নিরস্ত্র রবিয়াহ্‌কে ইনি এর বর্শা দান করে ফিরে যান।

মহিলাটি তার বোরখার একাংশ দরাইদের দিকে ছুঁড়ে দেন, অর্থাৎ দরাইদকে তিনি রক্ষা করতে চান। তারপর দলের যোদ্ধাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, ফিরাসের যোদ্ধারা, তোমাদের এই বন্দীটিকে তোমরা আমায় দিয়ে দাও।

যোদ্ধারা তখন কবি দরাইদকে ঘিরে ধরে, তার নাম জানতে চায়।

—আমি দরাইদ বিন সিমাহ্‌, তিনি উত্তর দেন, —কিন্তু এই মহিলাটি কে?

মহিলাটি নিজেই উত্তর দেন, —আমি রেয়তা, গিজুল অল তিয়নের কন্যা। সেদিন সেই উটের পিঠে আমিই চেপেছিলাম। রবিয়াহ্‌ আমার স্বামী।

তিনি তাঁর দলের যোদ্ধাদের প্রতিটি তাঁবুতে গিয়ে বললেন, —ফিরাসের যোদ্ধারা, সিমাহ্‌-পুত্রের সেই মহানুভবতার কথা স্মরণ আছে তো? রবিয়াহ্‌কে খুন না করে ইনি তাঁর নিজের বর্শা দান করেছিলেন। আজ তোমরা সুযোগ পেয়েছ, এর যোগ্য উত্তর দিতে ভুল করো না। নয়তো ফিরাসদের নামে

লোকে একদিন থ্তু ছ্ড়বে।

দরাইদকে তারা মুক্ত করে দেয়, রেয়তা তখন তাঁর মৃত স্বামীর অস্থিটি কবি দরাইদকে ফিরিয়ে দিলেন।

দরাইদ তাঁর নিজের উপজাতির মধ্যে ফিরে আসেন, কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ বাণী-ফিরাসদের তিনি আর কোনদিন আক্রমণ করেননি। বছরের পর বছর কেটে যেতে থাকে, দরাইদের বয়সও বেড়ে চলে, কিন্তু তার কবিত্ব শক্তি কমে না, উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

বানী-সোলাইম উপজাতিদের মধ্যে আমুর কন্যা সুন্দরী তুমাদির অল খানসা বাস করতো। তুমাদির ছিলো সুবিখ্যাত কবি। মরুভূমির চারদিকে তার সুনাম ছাড়িয়ে পড়েছিলো। একদিন দরাইদ ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে সোলাইমদের তাঁবুর কাছে এসে পড়েন। এক টিলার আড়াল থেকে তিনি দেখতে পান নির্জনে বসে তুমাদির তার পিতার একটি উটকে পরিচর্যা করছে। গ্রীষ্মের দুর্দান্ত দাহ থেকে মুক্তি পেতে সে যৎসামান্য পোষাকে নিজেকে আবৃত করে রেখেছে। চারিদিক সম্পূর্ণ নির্জন, সে আপন মনে তার প্রিয় উটের পরিচর্যা করতে থাকে সযত্নে। দরাইদ আড়াল থেকে এই অপরূপ স্বর্গীয় রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েন। তার মনে সুমধুর সংগীত গুঞ্জরন করতে থাকে। সময় বয়ে চলে, দরাইদ বিমোহিত চিত্তে সংগীত রচনা করে চলেন……।

পরদিন দরাইদ তাঁর দলের কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে তুমাদিরের পিতার সাথে দেখা করলেন। তিনি বিনীতভাবে তুমাদিরের পাণি প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ আমুর উত্তর দেন, —'মহান দরাইদ! আপনার এই প্রস্তাবে আমি গর্বিত বোধ করছি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার তুমাদির যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মেয়ে।

রাত ভোর হয়ে আসে। আমুরের ভাষ্য অসমাপ্ত রেখেই শাহরাজাদী চুপ করে যায়।

নয়শত চুয়াত্তরতম রজনী :

সে আবার বলতে শুরু করে :

আমুর বলতে থাকেন, আপনি তো জানেন, মেয়েদের মধ্যে এই গুণগুলি সচরাচর দেখা যায় না। আমি তাই তুমাদিরের স্বাধীন চিন্তায় কোন বাধা দিই না। আপনার এই প্রস্তাব আমি ওকে জানাবো, চাই কি তাকে অনুরোধও করতে পারি। কিন্তু ওর প্রাণ যা চায়, আমি তার বিরুদ্ধে যেতে পারবো না।

দরাইদ তাকে ধন্যবাদ জানায়। আমুর তখন তুমাদির অল খানসার তাঁবুতে এসে তাকে বললেন, খানসা, বানী জুশামের সুবিখ্যাত বীর মহানুভব দরাইদ এসেছেন আমাদের কাছে। তিনি এসেছেন তোর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। যদিও আজ তার বয়স হয়ে গেছে, তবুও তার বীরত্বের গল্পও তুই জানিস, আবার তার কবিত্ব শক্তির কথাও তোর অবিদিত নয়। তোরা একত্রিত হলে আমি

গর্ব অনুভব করবো, কিন্তু তোর আপন ইচ্ছার ওপর আমি জোর খাটাতে চাই না, তোর কি মত তুই আমাকে নিঃসংকোচে জানাতে পারিস।

তুমাদির উত্তর দেয়, বাবা আমাকে সময় দিন, আমি ভাল করে ভেবে দেখি, তারপর জবাব দেব।

আমুর দরাইদের কাছে ফিরে এসে জানান, —খানসাকে আপনার প্রস্তাব জানিয়েছি, সে কিছু সময় চেয়েছে। আমার মনে হয় ও শেষ পর্যন্ত মত দেবেই।

দরাইদকে তার লোকজন সমেত বিশ্রামের জন্য একটি তাঁবু দেওয়া হয়। যোগ্য সম্মানের সাথে তাদের আপ্যায়ন করা হতে থাকে।

দরাইদ তার উত্তরের জন্য ফিরে এলে আমুর পুনরায় কন্যার তাঁবুতে এলেন, পাশেই সেই তাঁবু। তুমাদির আমুরকে জানায়,—আমি চিন্তা করে দেখলাম পিতা! সোলাইম জাতির বাইরে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি কিন্তু ঐ বৃদ্ধ দরাইদকে কোনমতেই পতিত্বে বরণ করে নিতে পারবো না। কাল কিম্বা পরশু হয়তো ওর পেচক সদৃশ বৃদ্ধ আত্মাটি দেহমুক্ত হয়ে চলে যাবে! না, না আমি বরং বাঁদী হয়ে দিন কাটাতেও রাজী আছি কিন্তু ওর মত একজন লোলচর্ম বৃদ্ধকে সহ্য করতে পারবো না।

পাশের তাঁবুতে বসে দরাইদ সবই শুনতে পেলেন। তুমাদিরের এই ঘৃণা-ভরা উক্তিতে তার পৌরুষবোধ আহত হল। কিন্তু বানী সোলাইমদের সামনে তিনি মুখ খুললেন না, শান্ত সৌজন্যের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখলেন। তারপর স্বজনদের মধ্যে ফিরে এসে তুমাদিরের সেই নিষ্ঠুর ভাষ্যের জবাব দিলেন একটি সুন্দর ব্যঙ্গাত্মক গাঁথা রচনা করে ঃ

বৃদ্ধ হয়েছে দরাইদ আজি
একথা প্রথম শুনি তোর কাছে!
আমি কি বলেছি, গতকাল আমি
এসেছিনু এই পৃথিবীর মাঝে?
তুই যে কি চাস, সে আমি বুঝেছি
চাস তুই এক নবীন ভৃত্য;
বিগলিত ভাঁড়, দোলাবে চামর,
সেবা পেলে তব করিবে নৃত্য!
দরাইদ সম বীর যুবা যদি
পথ ভুলে কভু আসে তোর দ্বারে;
সম্মান দিস, ভয় পাস তারে!
মালা দিস নাকো, ফিরাস তাহারে।
কুসুম কোমল বিছানাই শুধু
সার কথা নয় পুরুষের কাছে;
সত্য সাহসী বীর হলে তার
পৃথিবীতে আরো বড় কাজ আছে।

তাই ফের বলি. বেছে নিস কোনা
বিগলিত ভাঁড়, পরম ভৃত্য।
পদসেবা করে পূজিবে সে তোরে,
সেবা পেলে তব করিবে নৃত্য!
বৃদ্ধ হয়েছে দরাইদ আজি
একথা প্রথম শুনি তোর কাছে।
আমি কি বলেছি, গতকাল আমি
এসেছিনু এই পৃথিবীর মাঝে?

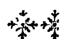
দরাইদ-এর এই গাথাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে! লোকমুখে তা ক্রমশঃ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে তা বানী সোলাইম-দেরও কানে এসে পৌঁছয়। সকলে তুমাদিরকে পরামর্শ দেয় দরাইদকে পতিত্বে বরণ করে নিতে। কিন্তু তুমাদির তাতে বিচলিত হয় না, সে একবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতেই অচল হয়ে থাকে।

তুমাদিরের ভাই মোরাইয়া একজন বীর যোদ্ধা ছিলো। কিন্তু মুরিদ উপজাতির সাথে এক ভয়ানক যুদ্ধে সে প্রাণ হারায়। ভাই-এর মৃত্যুতে তুমাদির একটি সুদীর্ঘ গাথা রচনা করে। এই গাথাটি তাকে সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ করে তোলে।

সুবিখ্যাত কবি নাবিগাহ্ অল ধোবিয়ানী এবং আরবের অন্যান্য খ্যাতনামা সকল কবিই তার এই গাথাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ওফাজের এক বাৎসরিক কবি-সম্মেলনে নাবিগাহ্ বলেন, তুমাদির তার কবিতায় বিশ্বের সকল কবিকে জড়িয়ে গেছেন।

তুমাদির আরবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পরও বেঁচেছিলো। হিজরতের অষ্টম বর্ষে তুমাদির তার পুত্র আব্বাসকে নিয়ে মুহম্মদের নিকট দীক্ষা নিতে আসে। পুত্র আব্বাস তখন বানী সোলাইমদের প্রধান পদে আসীন। মুহম্মদ তাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তার মুখে স্বরচিত বিভিন্ন গাথা শুনে তৃপ্ত হন।

কবি দরাইদ ও কবি তুমাদিরের গল্পটি এখানেই শেষ। সেই যুবকটি তখন তার অতিথিদের একটি নতুন গল্প শোনাতে শুরু করে।

বানী জিমন উপজাতির দল-নায়ক কবি ফিন্দের দুইটি কন্যা ছিল। বড়টির নাম ওফাইরাহ্ অর্থাৎ সূর্য্য এবং ছোটটির নাম হোজাইলাহ্ অর্থাৎ চন্দ্র। ফিন্দের বয়স যখন একশত বৎসর তখন বেকরাইদের উপজাতিবৃন্দ থালাবিদদের সাথে এক নিদারুণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। থালাবিদরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ফিন্দ এখনও বেশ শক্তিমান পুরুষ। সত্তরজন ঘোড়সোয়ার যোদ্ধার এক দলকে অসম্ভব তৎপরতার সাথে নেতৃত্ব দিতে পারতেন তিনি। এই যুদ্ধেও তিনি তাঁর দল নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন, সাথে গেল তাঁর দুই কন্যা। একজন দূত মারফত তিনি তাঁর উপজাতির যুদ্ধে যোগদানের সংবাদ প্রেরণ করলেন, তিনি জানলেন, আমরা বানী জিমনেরা এক সহস্র যোদ্ধা এবং সত্তরজন ঘোড়সোয়ারের এক দল প্রেরণ করছি। এই উক্তির মাধ্যমে ফিন্দ বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি একাই এক সহস্র যোদ্ধার সমান এবং এছাড়াও সত্তরজন ঘোড়সোয়ার যোদ্ধা তাঁকে অনুসরণ করবে।

তুমুল কথার বেগে বেকরাইদ সেনাবাহিনী এই যুদ্ধ শেষ করে। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ফল এখনও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। থালাবিদরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয় এবং সকল বন্দীকে মস্তক মুণ্ডন করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফিন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা এই যুদ্ধে তাদের অসীম সাহসীকতার জন্য লোকের স্মৃতিতে আজও অমর হয়ে আছে।

রাত ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদী গল্প থামিয়ে চুপ করে যায়।

নয়শত পঁচাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

যুদ্ধ যখন চরমে, উভয় পক্ষই ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, ফিন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা হঠাৎ তাদের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে! তারা অতিরিক্ত পোষাক-পরিচ্ছদের ভার সবেগে মুক্ত করে দেয়, ভারী ভারী পোষাকে তারা মুক্ত যুদ্ধ করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। সামান্য কটি বন্ধনী ও বক্ষ-বন্ধনীতে নিজেদের আচ্ছাদিত রেখে তারা বেকরাইদের দুই পার্শ্ববাহিনীর সাহায্যে ছুটে যায়। যুদ্ধের এই ভয়াবহতার মধ্যেই তারা উভয়েই একটি করে রণসংগীত রচনা করে নেয় মুখে মুখে। মাদল এবং চার তারের এক বাদ্যযন্ত্রের রণ-দামামার তালে তালে ওফাইরাহ্ তার রণ-সংগীত গেয়ে ওঠে ঃ

রক্তপিপাসু তরবারী খোল
বেকরাইদের সৈনিক দল!
তপ্ত শলাকা লোহিত যখন,
হান রে আঘাত বাজিয়ে মাদল!
মুক্ত স্বাধীন সৈনিক কভু
পেছু ফেরে নাকো যুদ্ধক্ষেত্রে।
বিচূর্ণ কর থালাবিদ সেনা
চিনে নিক ওরা জিমন গোত্রে!
বেকরাইদের বীর সেনাদল
রাঙিয়ে নে আজ শাণিত কৃপাণ।
ওফাইরাহ্ বলে আমি তারি দলে
যার অসি পেল শোণিতের ঘ্রাণ।।

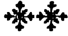
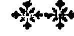
হোজাইলাহ্ ছুটে যায় বাম পার্শ্ব বাহিনীর দিকে। সেদিকে তার পিতা ফিন্দ মহা বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষও বিপুল উদ্যমে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। জিমন গোত্রের রণক্লান্ত সেনাদল ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকে, হোজাইলাহ্ তখন বিপুল উদ্যমে তার রণসংগীত শুরু করে :

বানী-জিমনের বীর সেনাদল
রাখো উন্নত কৃপাণ খড়্গ।
শত্রুশোণিতে স্নান করে আজ
জিনে নিতে হবে জয়ের স্বর্গ!
কার অসি কত
রুধিরে সিক্ত
তাই দিয়ে বীর হবে সনাক্ত;
ওবে দুই বাহু
থালাবিদ লোহু
রণ-প্রাঙ্গণ কর আরক্ত!
ঝঞ্ঝার বেগে
মত্ত আবেগে
শত্রু সবেগে
বিচূর্ণ কর নির্মম তেজে!
হোজাইলাহ বলে,
আমি তারি দলে
যার অসি বলে
রণ-বিজয়ের দুন্দুভি বাজে!

তাদের রণসংগীতে বেকরাইদের অবসন্ন সেনাদল আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নবীন উদ্যমে তারা শত্রুনিধনে মেতে ওঠে। থালাবিদবাহিনী তাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে পারে না, বেকরাইদবাহিনীর যুদ্ধে জয়লাভ ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে।

সেই মহা বীরত্বপূর্ণ যুগে আমাদের পিতা-প্রপিতামহরা এইভাবেই যুদ্ধ করতেন, সে আমলের নারীজাতিও এই ভাবেই তাদের সাহায্যে ছুটে যেত।

কবি ফিন্দ আর তার দুই বীরাঙ্গনা কন্যার গল্প এখানেই শেষ। যুবকটি এখন তার অতিথিবৃন্দকে এক নতুন গল্প শোনাতে শুরু করে।

ইরাকের হিরাহ্ সম্রাট নেমানের ফতিমা নাম্নী এক কন্যা ছিল। সে ছিল যেমনি সুন্দরী, তেমনি বদরাগী। তার স্বভাবের জন্য সম্রাট নেমান তাকে এক নির্জন প্রাসাদে অন্তরীণ করে রাখেন, প্রাসাদের বাইরে সম্রাট শক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করেন। একমাত্র ফতিমার নিজস্ব দাসদাসীবৃন্দ ছাড়া অন্য কারো সে প্রাসাদে প্রবেশের অধিকার নাই। কন্যার সম্মান রক্ষা ও তার চরিত্রের পরিবর্তনের জন্যই সম্রাট এত সব আয়োজন করেন। নির্জনে বসে রাজকন্যা সময়ে অসময়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়তো, তখন সে দেওয়াল বেয়ে প্রাসাদের চূড়ায় উঠে বসে থাকতো। উন্মুক্ত রাস্তায় লোকজন দেখতে দেখতে এক সময় তার বিষণ্ণতা দূর হয়ে যেত।

একদিন প্রাসাদ-চূড়ায় সময় কাটাতে কাটাতে সে দেখতে পায় ইবনাত ইজলান নাম্নী তার এক দাসী এক আকর্ষণীয় পুরুষের সাথে আলাপে রত। পরে দাসীটির কাছে অনুসন্ধান করে সে জানতে পারে পুরুষটি সুবিখ্যাত কবি মুরাকিশ।

দাসী ইবনাত সুন্দরী এবং প্রাণবন্ত মহিলা। মুরাকিশের দেহসৌষ্ঠব ও কাব্যপ্রতিভার কথা বলতে গিয়ে সে উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে। ইবনাতের প্রশংসা বাক্যেরাজকন্যা ফতিমা মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই আকর্ষণীয় বাগ্মী পুরুষকে দেখবার জন্য, তার সান্নিধ্য লাভের জন্য সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত রাজকন্যা হয়ে সে এমন হটকারীর মত কাজ করতে ইতস্ততঃ করে। কবি মুরাকিশের বংশ-মর্যাদা তার রুচিবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে সে কিছু করতে অক্ষম। তখনকার দিনে আরবদের আচরণই ছিল এই রকম, প্রতি পদক্ষেপে তারা বংশ-মর্যাদা মেপে কাজ করত।

রাজকন্যা তাই কৌশলে কবি মুরাকিশের বংশ-মর্যাদা ও রুচির পরিমাপ নিতে ব্রতী হয়। ইবনাত ইজলানকে সে বলে,—আগামী কাল তুমি তার সাথে আবার দেখা করবে। এই সুগন্ধী কাঠের তৈরী দাঁত-কাঠিটি সাথে রাখো আর এই নাও একটি ধুনুচি। কাল যখন তাঁর সাথে দেখা করবে তখন এটিতে কিছু সুগন্ধী ধূপ প্রজ্জ্বলিত করে নিয়ে যেও। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবে দাঁত-কাঠিটি ব্যবহার করার পূর্বে তিনি এর ডগাটি ভেঙে ছুঁচলো করে নেন কিনা। আর ধূপের ধোঁয়াতে তিনি তাঁর পোষাকের অভ্যন্তরভাগ সুগন্ধী করে নিতে চেষ্টা করেন কিনা তাও লক্ষ্য করে দেখবে। তাই যদি করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি নিচ বংশজাত। যতই বাগ্মী কবি হোন না কেন, একজন ভদ্রবংশীয়া রাজকন্যার যোগ্য তাকে বলা চলবে না কখনই।

পরদিন প্রাতে দাসীটি কবির বাসভবনে যায়। কবির বাসভবনে গিয়ে সে ধুনুচিটিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, তারপর সুগন্ধী ধূপ ছিটিয়ে দেয়। কবি

ম্বরাকিশ কাছেই ছিলেন। দাঁতকাঠিটি তাকে উপহার দিয়ে ইবনাত ধ্বপের সুগন্ধটি কেমন তা পরখ করে দেখতে অন্বরোধ করে। কবি জানান, ধ্বন্বচি এখানে নিয়ে এসো।

ইবনাত ধ্বন্বচিটি তার সামনে এনে রাখে, সুগন্ধী ধোঁয়া ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কবি ম্বরাকিশ তার লম্বা দাড়ি ও দীর্ঘ চুল ধোঁয়ায় সিক্ত হয়ে উঠলে সেগ্বলির ঘ্রাণ নেন যত্নে। তারপর সেই দাঁতকাঠিটি তুলে নিয়ে সেটির প্রান্তভাগ ভেঙ্গে ফেলেন এবং একটি ব্রাশের আকৃতিতে সেটিকে কেটে নিয়ে নিজের দন্ত মার্জন করেন। সবশেষে তিনি তার দাঁতের ঘ্রাণ নিতে প্রবৃত্ত হন।

বাঁদী ইবানত সোৎসাহে তার এই দ্বৈত পরীক্ষার বিশদ বিবরণ জানায় রাজকন্যাকে। রাজকন্যা ফতিমা উত্তেজিত স্বরে জানান,—এই অভিজাত কবিকে যেমন করে পার নিয়ে এসো আমার কাছে।

কিন্তু প্রহরী-বেষ্টিত রাজপ্বরীতে সে কেমন করে নিয়ে আসবে ম্বরাকিশ কে? শেষ পর্যন্ত সে একটি উপায় আবিষ্কার করে। রাত্রের অন্ধকারে সে ম্বরাকিশকে নিজের পিঠে তুলে নেয়, তারপর একটি ভারী চাদরে উভয়কে আচ্ছাদিত করে সে রাজপ্বরীতে প্রবেশ করে। কবির সাহচর্যে রাজকন্যা বিমোহিত হয়ে পড়ে সহজেই। সুন্দরী ফতিমার কোমল উষ্ণ আবেষ্টনীতে কবি ম্বরাকিশের রাত কেটে যায়। ভোর রাতের অন্ধকারে ইবনাত তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

সকালে সম্রাট নেমানের প্রহরীরা ফিরে এসে দেখতে পায় বালিতে মাত্র এক-জোড়া পায়ের ছাপই ফ্বটে আছে, সে ছাপ তাদের চেনা। সম্রাটকে সংবাদ দিতে গিয়ে তারা জানায়,—জাঁহাপনা, ইবনাত ইজলান ছাড়া আর কারো পায়ের ছাপ চোখে পড়লো না। তবে সে বোধহয় ভারী কিছ্ব বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কারণ তার পায়ের ছাপ বেশ গভীর হয়ে বসে গেছে বালির মধ্যে।

রাজকন্যা ফতিমা ও কবি ম্বরাকিশের প্রেম ক্রমশঃ মধ্বর থেকে মধ্বরতর হয়ে উঠতে থাকে। এইভাবে দিন কেটে সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাসও কেটে যেতে থাকে।

ম্বরাকিশের এক অন্তরঙ্গ দোস্ত ছিল, সুন্দরী ফতিমার গল্প শ্বনে সে তাকে দেখার জন্য উন্ম্বখ হয়ে ওঠে। কবি ম্বরাকিশ কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। সুপ্রিয় বন্ধ্বর ক্রমাগত অন্বরোধে অবশেষে সে একদিন মত না দিয়ে পারেন না। রাত্রের অন্ধকারে ইবনাতের পিঠে কবির বদলে তার বন্ধ্ব চেপে বসে। রাজকন্যা ফতিমার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ইবনাত তাকে নামিয়ে দেয়।

সুন্দরী ফতিমা ব্বদ্ধিমতী মহিলা, আপন স্পর্শবোধের সাহায্যে সে সমস্ত ছলচাতুরী ধরে ফেলে। ব্বঝতে পেরেই সে বিছানা থেকে ছিটকে নেমে যায়, ঘৃণা-প্বর্ণ পদাঘাতের সাহায্যে আগন্তুককে বিতাড়িত করে। ইবনাত ইজলান তাকে ঘাড়ে চাপিয়ে ফেরত দিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদী চুপ করে রইল।

নয়শত ছিয়াত্তরতম রজনীতে

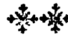
সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

মুরাকিশের বিশ্বাসঘাতকতায় ফতিমা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কবিকে সে আর এক মুহূর্তের জন্য কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করে। মুরাকিশ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন। রাজকন্যা কিন্তু তার প্রতিজ্ঞায় অটল, কিছুতেই সে আর কবির মুখ দর্শন করবে না। ফতিমার বিরহে কবি মুরাকিশ একটি গাথা রচনা করেন, এমনই সে গাথার আবেদন যে, যুগ যুগ ধরে লোক-মুখে তা অমর হয়ে আছে।

ফতিমার বিরহে শোকতপ্ত কবি অবশেষে একদিন মৃত্যু বরণ করেন। ইতিহাস বলে, তিনি প্রেমের জন্যই অবশেষে একদিন আত্মাহুতি দিয়েছেন।

যুবকটি তার অতিথিবৃন্দের দিকে ফিরে চেয়ে বলে, বন্ধুগণ, কবি মুরাকিশ আর সুন্দরী ফতিমার গল্প এখানেই শেষ হল। এবার আমি তোমাদের বলবো কিন্ডাইটের সম্রাট হজুর ও তার স্ত্রী হিন্দের গল্প।

সে তার নতুন গল্প শুরু করে ঃ

কিন্ডাইট সম্প্রদায়ের সম্রাট হজুর ছিলেন অসীম সাহসী ও দুর্দান্ত হিংস্র যোদ্ধা। তার পুত্র ইমরু অল কেয়স ছিল সে যুগের সুবিখ্যাত কবি। সম্রাট হজুর এত নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, তার নিজস্ব পরিবারের লোকেরাও তার নির্দয়তার হাত থেকে মুক্তি পেতো না। পিতার নির্যাতনে রাজকুমার ইমরু ঘর ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। তার পিতার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে কবিত্ব শক্তির জন্ম কাপুরুষতা থেকে।

একদা সম্রাট হজুর তার নিজস্ব অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে বানী-আসাদ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার চিরন্তন শত্রু কোদেইদে সম্প্রদায় এই সুযোগে তার অঞ্চল আক্রমণ করে। বীর জিয়াদের নেতৃত্বে তারা কিন্ডাইট সম্প্রদায়কে সহজেই নৃশংসভাবে পরাজিত করে। কারণ হজুর তরে বাহিনী নিয়ে তখন অনুপস্থিত ছিলেন। জিয়াদ তার বাহিনী সমেত কিন্ডাইটদের সঞ্চয় থেকে প্রচুর শুকনো খেজুর, অশ্ব, উট, অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু এবং কিছু অল্পবয়সী সুন্দরী মহিলা ছিনিয়ে নিয়ে যান। এদের মধ্যে ছিলেন সম্রাটের প্রিয়তমা পত্নী, কিন্ডাইটের রত্ন-প্রতিম সুন্দরী রানী হিন্দ।

এই দুঃসংবাদ কানে যেতেই সম্রাট হজুর তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দ্রুত ফিরে

এলেন এবং কোদেইদে বাহিনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। শত্রু সম্প্রদায়ের তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়তেই তিনি তার দুজন বিশ্বস্ত গুপ্তচর সালিহ্ এবং সাদুসকে পাঠিয়ে দিলেন জিয়াদের বাহিনী সম্পর্কে গোপন খোঁজ-খবর নিতে।

গুপ্তচরদ্বয় অনেক চেষ্টার পর কৌশলে শত্রু শিবিরে ঢুকে পড়ে। সেখানে তারা শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে। কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলে সালিহ্ তার সঙ্গীকে জানায়,—জিয়াদ বাহিনী সম্পর্কে আমরা অনেক তো সংবাদ সংগ্রহ করলাম, এখন চল আমরা নিজেদের শিবিরে ফিরে যাই। সুলতানকে আমরা জিয়াদের বুদ্ধি, পরিকল্পনা কি হতে পারে, এখন তা সহজেই বুঝিয়ে বলতে পারবো।

কিন্তু সাদুস উত্তর দেয়—না, আমি কিন্তু আরো সংবাদ সংগ্রহ করতে চাই।

সালিহ্ ফিরে যায়, সাদুস একাই থেকে যায় শত্রু শিবিরে।

রাত্রি সমাগত হতেই জিয়াদের বাহিনী তাদের নেতার শিবিরে কড়া পাহারা মোতায়েন করে। সাদুস এতে বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। অনেক চিন্তার পর সহসা সে এক অদ্ভুত সাহসের কাজ করে ফেলে। জিয়াদ বাহিনীর একজন রক্ষীর পিঠে সে অকস্মাৎ পদাঘাত করে বলতে চায়,—কে তুই গুপ্তচর! এখানে কি চাস?

লোকটি শঙ্কিত স্বরে নিজের বিশদ পরিচয় দিতে শুরু করে। এরপর আর সাদুসের পক্ষে মুক্তভাবে বিচরণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। সকলে তাকে জিয়াদ বাহিনীর রক্ষী বলেই ধরে নেয়।

জিয়াদের তাঁবুর সামনে সে কান পেতে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। তাঁবুর অভ্যন্তর থেকে জিয়াদ ও সম্রাজ্ঞী হিন্দের অন্তরঙ্গ ভাষ্যালাপ ও চুম্বনের শব্দ ভেসে আসে। জিয়াদের স্বর শোনা যায়,—আমাদের এই অন্তরঙ্গ মিলনের সংবাদ পেলে তোমার স্বামী কি করতেন বল?

হিন্দ উত্তর দেন,—আমি শপথ করে বলতে পারি, সে নেকড়ে বাঘের মত ছুটে এসে তোমাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। উন্মত্ত রাগে ও প্রতিহিংসায় সে পাগল হয়ে উঠতো, মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকতো।

জিয়াদ তার জবাব শুনে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন, হিন্দের গালে একটি চাপড় মেরে বলেন,—বুঝতে পারছি, ঐ বনমানুষটাকে এখনও তুমি ভালবাস। ওর হাতে আমি পরাস্ত হই নির্যাতিত হই, তাই তুমি চাও।

হিন্দ সরবে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন,—মোটেই না! আমি লাত এবং ও জাতের নামে শপথ করে বলতে পারি। আমার স্বামীকে যতদূর আমি ঘৃণা করি এমনটি আর কাউকেই কখনও করিনি। কিন্তু সেই সাথে আমি তোমাকেও সতর্ক করে দিতে চাই যে, কি শুতে, কি বসতে তার মত এমন সতর্ক আর বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক আমি দুটি দেখিনি।

জিয়াদ প্রশ্ন করেন,—কী রকম?

হিন্দ বলতে থাকেন, হজুর যখন নিদ্রা যায়, তখনও বোধ হয় ওর এক

চোখ খোলা থাকে এবং মন থাকে অর্ধ জাগ্রত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন রাত্রে হুজুর আমার পাশে ঘুমিয়েছিল, আমি শুয়ে শুয়ে ওকে দেখছিলাম। এমন সময় দেখি একটা বিষধর সাপ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে থাকি। সাপটি সোজা ওর মুখ লক্ষ্য করে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হুজুর পাশ ফিরে শোয়, সাপটি তখন ওর খোলা হাতের পাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি দেখতে পেলাম এবারেও ও ঘুমের মধ্যেই হাতটি সরিয়ে নিল। সাপটি তখনও সোজা এগিয়ে যাচ্ছে ওর পা লক্ষ্য করে। হুজুর এবারেও ঘুমের মধ্যেই পা মুড়ে শোয়। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখে যেতে থাকি। সাপটি ততক্ষণে হুজুরের বিছানা অতিক্রম করে চলে গেছে। কাছেই এক পাত্র দুধ রাখা ছিল, হুজুরের জন্য। সাপটি লোভীর মত সেই দুধ পান করে তারপর সেই পাত্রেই সেই দুধটুকু বমি করে রেখে যায়। আমি মনে মনে খুশি হয়ে উঠি। এতদিন পর আমি ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চলেছি। কারণ ঘুম থেকে উঠে ঐ বিষাক্ত দুধটুকু পান করলেই তো ওর মৃত্যু অনিবার্য! খানিকক্ষণ পর হুজুরের ঘুম ভেঙে যায়, তৃষ্ণার্ত বোধ করায় দুধের পাত্রটি সে হাতে তুলে নেয়, মুখে দিতে গিয়েও কি মনে হতে সে হাত নামিয়ে নেয়, দুধের গন্ধ শুঁকতেই তার হাত কাঁপতে থাকে। অবশেষে হাত থেকে পাত্রটি পড়ে যায় এবং চারদিকে সেই বিষাক্ত দুধটুকু ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারেই ও এমনি সতর্ক। বিপদ এসে পড়লেও বোধহয় আগে থাকতেই বুঝতেই পারে।

গুপ্তচরটি এরপর আর কোন বাক্যালাপ শুনতে পায় না। শুধু কিছু শ্বাস-প্রশ্বাস ও চুম্বনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ভেসে আসে না ভেতর থেকে। সাদুস সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সবার অলক্ষ্যে ফিরে আসে নিজেদের শিবিরে।

হুজুরকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে, সাদুস তার ভাষ্য শেষ করে এই বলে, আমি যখন জিয়াদের শিবির ত্যাগ করে আসি সে তখন সম্রাজ্ঞী হিন্দের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এখনও পর্যন্ত ওরা আমাদের কোন সংবাদই পায়নি।

সম্রাট হুজুর এই কথা শুনে এক নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেললেন, অবিলম্বে কোদেইদের শিবির আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন তিনি।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদীও গল্প থামিয়ে চুপ করে যায়।

নয়শত সাতাত্তরতম রজনীতে
সে আবার বলতে শুরু করে:

কিণ্ডাইটবাহিনী তাদের অনুসরণকারীদের অকস্মাৎ আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তাদের তাঁবুগুলি টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তাতে। প্রচুর লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল, কেউ কেউ অর্ধমৃত অবস্থায় পলায়ন করতে সক্ষম হল।

পলায়নপর বাহিনীতে হুজুর জিয়াদকে খুঁজে পান। উন্মত্ত আক্রোশে তিনি ঘোড়া থেকেই জিয়াদকে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নেন। সমস্ত শক্তি বাহুতে জড় করে তিনি জিয়াদকে খেলনার মত শূন্যে ছুঁড়ে দেন। মাটিতে পড়ে যেতে জিয়াদের হাড়গোড় ভেঙে যায়। তার মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে নিজের ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দেন হুজুর।

আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে হুজুর হিন্দের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। দুটি ঘোড়াকে দুদিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হিন্দকে বেঁধে দেওয়া হয় তাদের মাঝখানে। তীক্ষ্ণ চাবুকের আঘাতে ঘোড়া দুটিকে ছুটিয়ে দিতেই হিন্দের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হুজুর চিৎকার করে তাকে জানিয়ে দেন,—তোমার মুখ ছিল খুব মিষ্টি, কিন্তু বুকের মাঝখানটিতে বড় তিক্ত কথা লুকিয়ে ছিল।

এই বন্য প্রতিহিংসার গল্প শেষ করে যুবকটি আবার বলতে শুরু করে ঃ

আরব সাম্রাজ্যে তখন ইসলামের প্রবর্তন সবে শুরু হয়েছে। তখনকার দিনের আরব মহিলাদের সম্পর্কে এবার আমি তোমাদের একটি গল্প শোনাবো। গল্প বলা হয়েছে আমাদের প্রিয় নবীর স্ত্রী আয়েশার মুখ দিয়ে। তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম যুগের রমণীদের মধ্যে সুন্দরতমা এবং সত্যিকার মহিয়সী মহিলা। তিনি যেমনি নম্র স্বভাবের, তেমনি সাহসী। আবার তাঁর মত এমন পণ্ডিত ও বাগ্মী মহিলাও সেকালে দুর্লভ ছিল।

যুবকটি তখন আয়েশার ভাষ্যতেই পরবর্তী গল্পটি বলতে শুরু করে ঃ

একদা ইয়েমেনের কয়েকজন অভিজাত মহিলা আমার সাথে দেখা করতে আসেন। কথায় কথায় তাঁদের স্বামীদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাঁরা শপথ নিয়ে জানান, স্বামী সম্পর্কে প্রত্যেকেই নির্বিচারে সত্য কথা বলবেন।

প্রথমজন বলতে শুরু করেন,—আমার স্বামী! সে তো একজন চুড়ান্ত নোংরা লোক। যেন একটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে উটের মাংসের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোন রস কষ নেই লোকটির মধ্যে। তুলনা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, যেন একটা ছেঁড়া খড়ের মাদুর, কোনই কাজে আসে না।

দ্বিতীয় মহিলাটি শুরু করেন,—স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে আমার গা শিউরে ওঠে। একটা বুনো পশুর মত লোক। ওর একটি কথার প্রতিবাদ জানালে মুখ খিঁচিয়ে আমায় বিচ্ছেদের ভয় দেখাবেন আবার চুপ করে থাকলেও মহা গোলমাল হৈ চৈ বাধিয়ে বসবেন।

তৃতীয়জন তখন বলতে থাকেন,—আমার স্বামীদেবতাটির কথা বলি

তাহলে! এমনই লোক যে, খেতে শুরু করবে তো পায়ের তলানীটুকুও চেটে-পুটে শেষ করবে। আর পান করতে শুরু করলো তো শেষ বিন্দুটিও মহাযত্নে নিঃশেষ করে ফেলবে। যখন বসবে তো একটা ভারী বোকার মত বসেই থাকবে আবার খাবারের জন্য কোন জন্তুকে বেছে নেবে তো জানবেন সেটিই হল সবচেয়ে শুকনো, রোগা, মৃতপ্রায় জন্তু। এছাড়া তিনি আর কোন কর্মেরই নন!

চতুর্থজন বললেন,—আমার থেকে কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক, দিবা-রাত্রি ও আমার কাছে একটি বোকা। খুঁত খুঁজে বার করতে গেলে দেখবেন ওর সবেতেই খুঁত। সবকিছুতেই বোকার মত বাগাড়ম্বর করবে! দেখা হলেই মাথায় একটি চাটি মারবে প্রথমে অথবা পেটে একটি খোঁচা মারবে সজোরে। মারধরের আর শেষ নেই। একটা বদমেজাজী জন্তু যেন! আল্লাহ্ ওকে ধ্বংস করুন।

পঞ্চমজন তখন বলেন,—আমার স্বামীটি কিন্তু যেমন ভালো মানুষ তেমনি মিষ্টি স্বভাবের লোক। তিহামার সেই রূপকথার রাত্রের মত মিষ্ট লাগে ওর সংগ। উনি নিঃসন্দেহে একজন মহৎ লোক, আমাদের প্রতিটি যোদ্ধা ওকে যেমন ভয় পান আবার তেমনই সম্মান করেন। চলমান সিংহের মত ওর শান্ত গাম্ভীর্য্য এক দর্শনীয় বস্তু। চারপাশের প্রত্যেক লোককেই উনি ভালোবাসেন। বিপদের দিনে উনি নিজে থেকে এগিয়ে এসে সারারাত মহল্লা পাহারা দেবেন, ভোজের দিনেও অন্যদের কথা ভেবে পেট পুরে খাবেন না। মহল্লার একদম সামনের দিকে উনি বাড়ী করেছেন, যাতে যে-কোন পথিক প্রথমেই ওঁর দরজায় অতিথি হয়ে এসে ওঠে। যেমন তাঁর মহত্ত্ব আবার তেমনই তাঁর দেহ-সৌষ্ঠব। ওঁর ত্বক যেন খরগোশের চামড়ার মত রেশম কোমল। ওঁর নিঃশ্বাসে যেন জার্নরের সৌরভ ভাসে।

ষষ্ঠ মহিলা তাঁর স্বামীর কথা বলতে গিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে ফেলেন,—আমার স্বামী হলেন মালিক আবু জার, সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসে। শৈশবে তিনি আমাকে এক গরীব ঘর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। আমাকে উনি আদরে, সোহাগে, অলংকারে ভরিয়ে রেখে দিয়েছেন। উনি আমাকে যেমন সম্মান করেন তেমনই ভালবাসেন। সামহারের উজ্জ্বল বর্শা আর জীবন্ত সংগীতের মত উনি আমাদের বাড়ীটিকে সব সময় প্রাণবন্ত করে রাখেন। এখানে বসেও আমি যেন আমাদের উঠানে উট ঘোড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমার কানে এখন দুধ দোওয়ার শব্দ ভেসে আসছে। এমন মধুর ওনার সাহচর্য যে, আমি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারবো না। আমাকে উনি একটি কি সুন্দর সন্তান দিয়েছেন। শিশুটি যখন হেলে-দুলে পা-পা করে হাঁটতে চেষ্টা করে তখন ওকে দেখলে আপনি ভাল না বেসে পারবেন না। আমাকে একটি কন্যা সন্তানও দিয়েছেন উনি। এমন স্বাস্থ্যবতী আর নম্র স্বভাবের মেয়েটি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ওকে সকলে একটি রত্ন বলে ভাবে। বিশাল আয়ত ঘন কালো চোখ ওর, নাকটি যেন একটি বাঁকা বাঁশী। কি সুন্দর মেয়েটির

মুখশ্রী! ওর মিষ্টি কথা শুনলে নির্মল সুখে আপনার মন ভরে উঠবে। ওদের দুজনকে নিয়ে আমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আল্লাহ ওদের সুখে রাখুন, আবু জারের মঙ্গল করুন তিনি।

ষষ্ঠজন তার ভাষ্য শেষ করতেই আমি আমার সকল অতিথিকে ধন্যবাদ জানাই।

রাত প্রায় ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে যায়।

নয়শত আটাত্তরতম রজনীতে

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

আমি তখন তাদের বলি,—প্রিয় বোনেরা আমার! আল্লাহ্ আমাদের আশীর্বাদ করুন। তাঁর প্রেরিত মহান নবী আমাদের মেয়েদের সম্পর্কে কি বলেছেন তাই শুধু আমি আপনাদের জানাতে চাই। আমরা নারীরা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডের জ্বালানী এক একটি। একদিন আমি তাঁর কাছে উপদেশ চাইতে গেছিলাম। তিনি আমায় বললেন,—আয়েশা, আমার হৃদয়ের টুকরো! মুসলমান রমণীদের নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিপদের দিনে তাদের ধৈর্যশীলা হতে হবে আবার সুখের দিনে তারা যেন উদাসীন না হয়ে পড়েন! পুত্র-কন্যারা তাদের সংসার পূর্ণ করে তুলবেন, স্বামীকে সম্মান এবং যত্ন করবেন সুশীলা রমণীর মত। এবং আল্লাহর দয়ার কথা তারা যেন উপেক্ষা না করেন কোনদিন! আল্লাহর দোয়া থেকে তারা তাহলে বঞ্চিত হবেন চিরতরে। যে রমণী তার স্বামীকে ঘৃণা করবেন, বলবেন, 'কি কদাকার লোক! শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তার একটি চোখ মুচড়িয়ে খুলে নেবেন। তিনি তার শরীর বিকৃত করে দেবেন। যে রমণী কথায় কথায় তার স্বামীকে প্রতিবাদ জানাবেন, তাকে অনর্থক বিরক্ত করবেন আল্লাহ্ তার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন।

কিন্তু একজন কল্যাণী রমণী, যিনি স্বামীর শান্তি কখনও বিঘ্নিত করেন না, যিনি স্বামীর আদেশ ব্যতীত কখনও বাড়ির বাইরে যান না, যিনি মূল্যবান অলঙ্কারে কখনও শোভিত করেন না, যিনি চারু ভাষিণী, যিনি স্বামী পুত্রকে স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ করে রাখেন, একমাত্র তাকেই আল্লাহ স্বর্গের দুয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন। তার প্রেরিত দেবদূত আর অনুসরণকারীদের সেই রমণীই শুধু স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাবেন।

আমি তখন বলে উঠি,—নবী আমার! তুমি তো আমার কাছে আমার পিতামাতার চেয়েও বেশী আপন।

যুবকটি আবার বলতে শুরু করে,—এইবার আমি ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আমলের কয়েকটি গল্প বলবো। প্রথমে খলিফা ওমর ইবন অল-খাতাবের জীবন থেকে কয়েকটি আকর্ষণীয় ঘটনার কথা বলি।

যুবকটি তার নতুন গল্প শুরু করে ঃ

খলিফা ওমর ইবন অল-খাতাব ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। এমন খাঁটি চরিত্রের সত্যনিষ্ঠ মানুষ সে যুগে আর হয়নি। তাকে অনেকে অল-ফারুক বা বিচ্ছেদবাদী বলতেন। কারণ যে ব্যক্তি নবী মুহম্মদের দণ্ডাদেশ মানতে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাতো, তিনি একটি তরবারীর সাহায্যে মুহূর্তে তার শিরচ্ছেদ করে ফেলতেন।

তিনি অতিশয় সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। ইয়েমেন সাম্রাজ্যের রাজ-ভাণ্ডারের অধিকর্তা হয়ে তিনি সকল মুসলমানের মধ্যে তা সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন ; ছোট-বড়, গরীব-দুঃখী কিছুই বাছ-বিচার করলেন না। অন্যান্য জিনিষের সাথে প্রত্যেকের ভাগে পড়লো এক খণ্ড করে ডোরাকাটা কাপড়ের টুকরো। ওমর তার নিজের টুকরোটুকু দিয়ে একটি পোষাক তৈরী করলেন। সেই পোষাকে তিনি মদিনায় তার প্রচার বেদীতে উঠে দাঁড়িয়ে তার অনুসরণকারীদের ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। নাস্তিকদের কিভাবে দমন করতে হবে তিনি তাই বোঝাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললো, আমরা আপনাকে আর মানবো না।

ওমর জানতে চাইলেন, —কেন ?

লোকটি তখন উত্তর দেয়, —কারণ, আপনি যখন ইয়েমেনের এই ডোরা-কাটা কাপড় সকলকে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তখন আপনি বলেছিলেন যে, সকলকেই সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। কিন্তু আপনি যা লম্বা, মাত্র সেইটুকু কাপড়ে আপনার পোষাক তৈরী হতে পারে না। অর্থাৎ আপনি আমাদের ঠকিয়েছেন। আপনি চুরি করে নিজের জন্য বেশী কাপড় রেখেছেন, আপনি অধার্মিক।

ওমর তার পুত্র আবদাল্লার দিকে চেয়ে বললেন, —তুমি এর কথার উত্তর দাও, কারণ লোকটি ঠিকই বলেছে।

আবদাল্লা তখন উঠে দাঁড়ায়, সমবেত জনসাধারণকে চিৎকার করে জানায়, —মুসলমান ভাইগণ, আমাদের খলিফা যখন তাঁর পোষাক তৈরী করাতে গেলেন, তখন দেখা গেল যে, তার ভাগের সেই সামান্য কাপড়টুকু তাঁর শরীরের তুলনায় নিতান্তই কম। আমি তখন আমার ভাগ থেকে একটু অংশ ছিঁড়ে দিলাম তাঁকে, না হলে আজ আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবার মত তাঁর কোন পোষাকই থাকতো না।

তখন সেই বাধাদানকারী ব্যক্তি চিৎকার করে জানায়, আল্লাহু অবিনশ্বর! ওমর, আমায় মাপ করুন, আমরা আপনার সমস্ত কথা শিরোধার্য্য করে নেব।

আর একদিনের কথা, ওমর তখন সিরিয়া, মিশর, পারস্য, রাউমের সমগ্র ভূখণ্ড, এবং ইরাকের বাসোরা ও কুফা জয় করে মদিনা ফিরছেন, তাঁর শরীরের

পোষাক তখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, চারদিকে শুধু খন্ড-খন্ড কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। তিনি সেই ছেঁড়া পোষাকেই মসজিদের সিঁড়িতে বসে পড়লেন, বসে বসে তিনি সকলের অভিযোগের সুবিচার করতে থাকলেন। একজন আমীর থেকে একজন সামান্য উট চালক, প্রত্যেককেই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতেন।

সীজার হিরাক্লিয়স কনস্‌টান্টিনোপলের খৃষ্টানদের শাসন করতেন। একদা তিনি আরব-সম্রাটের আচার-ব্যবহার ও তাঁর শক্তি সম্পর্কে গোপনে তথ্যানুসন্ধানের জন্য একজন দূত নিযুক্ত করলেন। লোকটি মদিনায় এসে একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো, তোমাদের সম্রাট কই ?

লোকে তখন তাকে জবাব দেয়, আমাদের তো কোন সম্রাট নেই। তবে একজন নেতা আছেন। তিনি হলেন পরম ধার্মিক ওমর ইবন অল-খাতাব, ঈশ্বর প্রেরিত খলিফা।

লোকটি তখন জানতে চায়, —কোথায় থাকেন তিনি ? তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল।

লোকে তখন মসজিদের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানালো,—ঐ যে ঐখানেই থাকেন তিনি। উনি যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ জনসাধারণের সুবিচার করেন, বাকী সময় ঘুমান।

সিজার-প্রেরিত দূতটি তখন মসজিদের সামনে এসে দেখে দুপুরের কড়া রোদে ওমর মসজিদের সিঁড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, মাথার চারদিকে স্বেদ-বাষ্পের একটি বর্তুলাকার পিণ্ড তৈরী হয়েছে।

লোকটি হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে চিৎকার করে ওঠে,—পৃথিবীর সমস্ত সম্রাট এই ভিক্ষুকের পায়ের নিচে মাথা নোয়াবে। ইনিই গোটা ধরিত্রীর মালিক।

পারস্য বিজয়ের সময় ইস্তাকার নগরীতে অবস্থিত সম্রাট জেডেজার্ডের রাজপ্রাসাদ থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে ছিল একটি কার্পেট, দুইটি বৃহৎ বর্গাকার প্রস্তরখণ্ড, সেগুলিতে একটি বাগানের ছবি খোদিত, যার প্রতিটি ফুল-পাতাই স্বর্ণ বা কোন দুষ্প্রাপ্য পাথর দ্বারা প্রস্তুত। মুসলমান নেতা সাদ বিন আবু-ওয়াকাস দেখেই বুঝতে পারেন যে, এগুলি দুর্লভ বস্তু। তিনি তাই এইগুলি ওমরকে উপহার দেবার জন্য আলাদা করে রাখেন। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা এইগুলি গ্রহণ করতে ভয় পেলেন, পাছে সম্পদ ও জাঁকজমকের উপর তাঁর লোভ জন্মে যায়। ইয়েমেন দখলের পর থেকে তিনি একটুকরো মোটা ডোরাকাটা কাপড় ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবহার করতেন না। তিনি কার্পেটটিও নিজে গ্রহণ করলেন না। মদিনার গোষ্ঠীপ্রধানদের মধ্যে সমানভাবে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিলেন। কার্পেটটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলায় এর মূল্য নিঃসন্দেহে কমে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলী শুধুমাত্র তাঁর খণ্ডটিই সিরিয়ার এক বণিকের কাছে কুড়ি হাজার দিরহাম

মূল্যে বিক্রয় করেন।

পারস্য বিজয়ের সময় স্যাট্রাপ* হারমোজান ছিলেন সর্বশেষ যারা নতি স্বীকার করেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আত্ম-সমর্পণের সময় শর্ত করে নিলেন যে, একমাত্র খলিফা ওমরই তাঁর বিচার করতে পারবেন। ওমর তখন মদিনায় ছিলেন। দুজন সাহসী এবং বিশ্বস্ত আমীরের সাথে তাঁকে প্রেরণ করা হল।

আমীরদ্বয় ভালোমানুষ, রক্ষীর মর্যাদা যাতে খলিফা ওমর বুঝতে পারেন সেজন্য তারা হারমোজানকে তার রাজকীয় পোষাক পরে খলিফার সামনে উপস্থিত হতে অনুমতি দিলেন। হারমোজান স্বর্ণখচিত একটি ঢিলা এবং একটি উজ্জ্বল কিরীট পরিধান করে মসজিদের সামনে এলেন। কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পরা লোকটিকে তিনি খলিফা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

খলিফা ওমর চোখ তুলে দেখতে পান যে, যে জাঁক-জমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, তাই পরে একজন বন্দী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—আল্লাহর মহিমা বৃদ্ধি পাক! তোমার মত দম্ভিকদের শান্ত করবার জন্যই তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন।

তিনি বন্দীটির সেই রাজকীয় পোষাক টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য করেন। সেভালিতে মরুভূমির বালিতে নিক্ষেপ করে তিনি জানতে চান,—তুমি কি বিশ্বাস কর যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান?

হারমোজান সাথে সাথে উত্তর দেন,—হ্যাঁ বিশ্বাস করি। কারণ সেকথা সত্য না হলে আমাদের পরাজয় ঘটতে পারতো না। ঈশ্বর নিরপেক্ষ থাকলে আপনাদের বাহিনীকে আমরা সহজেই পরাস্ত করতে পারতাম। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন।

বন্দীর এই তীক্ষ্ণ সত্যভাষ্য উপলব্ধি করে ওমর কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার দিকে। হারমোজান তাঁর দৃষ্টি দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যান, ভাবেন এই রকম বাক্যালাপ করলে ওমর হয়তো তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। তিনি তাই শঙ্কিত দৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ার ভান করলেন। তিনি তাই জল পান করতে চাইলে তাঁকে এক মাটির পাত্রে জল দেওয়া হল। পাত্রটি হাতে নিয়ে ওমরের দিকে চেয়ে তিনি ইতস্ততঃ করতে থাকেন। ওমর তখন জানতে চান,—এত ভয় কিসের?

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে। গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে যায়।

* প্রাচীনকালে পারস্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে স্যট্রাপ বলা হত।

নয়শত উনআশীতম রজনীতে

সে আবার বলতে শুরু করে :

স্যাট্রাপ উত্তর দেন,—ভয় হচ্ছে, জল পান করা কালীন কেউ আমায় খুন না করে ফেলে!

ওমর এখন বলেন,—এ রকম সন্দেহের হাত থেকে আল্লাহ্ আমায় রক্ষা করুন। তৃষ্ণা নিবারিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার কোন ভয় নেই।

সাথে সাথে পারস্য বন্দীটি জল ভরা মাটির পাত্রটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। শপথে আবদ্ধ থাকায় ওমর তাকে কোন শাস্তি দিতে পারলেন না। হারমোজান তার করুণায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ওমর তাকে দুই সহস্র দিরহামের ভাতা মঞ্জুর করে দেন।

জেরুজালেম শহর দখলের সময় সেখানকার ধর্মযাজক সফরোনিয়স শর্ত দেন যে, খলিফা সশরীরে উপস্থিত হলে তবেই তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজী। ওমর সম্পূর্ণ একাকী একটি উটে চেপে মদিনা শহর থেকে জেরুজালেমের পথে রওয়ানা হলেন। মাত্র দুটি বোঝা সম্বল করে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে প্রবৃত্ত হন। তার একটিতে ছিল উটের জন্য কিছু শুকনো খাদ্য আর অন্যটিতে তাঁর নিজের জন্য কিছু শুকনো খেজুর। শুধুমাত্র প্রার্থনার জন্য বা পথে কেউ তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করলে তিনি উট থামাচ্ছিলেন, এছাড়া দিবারাত্র তিনি পথ অতিক্রম করতে থাকেন। শহর দখলের সন্ধিপত্রে সাক্ষর করার পর জেরুজালেমের দ্বার তাঁর সামনে খুলে দেওয়া হল। খৃষ্টানদের গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর প্রার্থনার সময় ঘনিয়ে এলো। কোথায় প্রার্থনা করা যায় জানতে চাইলে সফরোনিয়স তাঁকে তার গীর্জায় আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ওমর তখন বলেন,—যদিও তোমাদের বিশ্বাস ভুয়ো, তবু আমি এখানে প্রার্থনা করবো না। কারণ খলিফা যেখানে প্রার্থনা করেন, মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের দখল গ্রহণ করে।

প্রার্থনা শেষে তিনি খৃষ্ট-ধর্মযাজককে প্রশ্ন করেন,—কোথায় এখানকার মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ স্থাপন করা যায়। আমাকে দেখিয়ে দিন।

সফরোনিয়স তাঁকে সুলেমানের ধর্মস্থানের দিকে নিয়ে গেলেন। এই স্থানে আব্রাহামের পুত্র ইয়াকুব তাঁর দেহরক্ষা করেন। ওমর দেখতে পান যে, এই স্থানে শহরের সমস্ত আবর্জনা জড় করা হয়। তিনি তখন নিজে হাতে কিছু আবর্জনা তুলে তাঁর কাপড়ের ভাঁজে করে দূরে ফেলে দিয়ে আসেন। তাঁর এই কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেকে কাজে হাত লাগান, ফলে দ্রুত স্থানটি পরিষ্কৃত হয়ে যায়। এই স্থানে নির্মিত মসজিদটি বিশ্বের অন্যতম সুন্দর মসজিদ, এর সাথে তাঁর স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

ওমর মক্কা ও মদিনার রাস্তায় সাধারণতঃ একটি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতেন। যে সব বণিকরা লোক ঠকাতে চেষ্টা করতো, তিনি এই রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের হাতে নাতে ধরে

ফেলতেন। কখনও তিনি উপদেশ দিয়েই অপরাধীকে ছেড়ে দিতেন, কখনও বা অপরাধের গুরুত্ব বুঝে তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

একদিন তিনি দুধের বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা কয়েকপাত্র দুধ বিক্রয় করছে। বৃদ্ধাটিকে দুধে জল মেশাতে দেখে তিনি বলে উঠলেন, —শোন, আর কখনও এইভাবে লোক ঠকিও না। তুমি দুধে জল মিশিয়ে বিক্রী কর কেন? কখনও এমন কাজ করো না।

মহিলাটি উত্তর দেয়, আপনার কথা আমি মাথা পেতে নিলাম, আর কখনও করবো না।

পরদিন তিনি আবার দেখা করলেন বৃদ্ধা দুধ-বিক্রেতাটির সঙ্গে,—গতকালই না তোমায় আমি সাবধান করে দিলাম যে, দুধে জল মিশিও না! আবার তুমি সেই কাজ করেছ!

—না, শপথ করে বলছি, আমি আজ জল মেশাইনি। মহিলাটি চিৎকৃত নিনাদে প্রতিবাদ করে।

ভেতর থেকে একটি মেয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,—মা, তুমি খলিফা ওমরের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বললে কেমন করে? একে তো অন্যায় করেছ, তার ওপর আবার মিথ্যা কথা বলে পাপ বাড়াচ্ছো? আল্লাহ্ তোমায় মাপ করুন।

মেয়েটির সৎসাহস ও সত্যবাদিতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বৃদ্ধাটিকে শাস্তি না দিয়ে তিনি অবিলম্বে বাড়ি ফিরে এলেন, দুই পুত্র আবদাল্লা ও আকিমকে সমস্ত জানিয়ে বললেন,—এই গুণবতী মেয়েটিকে তোমাদের কে বিয়ে করতে চাও বল? আল্লাহ্ এই মেয়েটির নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন।

—আমি ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি, আব্বা। ছোট ছেলে আকিম উত্তর দেয়।

খলিফা পুত্র আকিমের সাথে দুগ্ধ-বিক্রেতা সেই বৃদ্ধার কন্যাটির বিবাহ হয়ে যায়। তাদের এই বিবাহে আল্লাহর সত্যকার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল, কারণ তাদের কন্যা আবদ্ অল আজিজ বিন্ মারোয়ানকে বিবাহ করে এবং ওমর বিন আবদ্ অল আজিজের জন্ম দেয়। কালক্রমে এই পুত্র ওমিয়াদ সিংহাসনে আসীন হন। তিনি ইসলামের সুমহান্ পাঁচজন খলিফাদের একজন ছিলেন।

ওমর বলতেন,—কোন মুসলমান খুন হলে আমি তার সত্যকার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো না।

একদিন তিনি মসজিদের সিঁড়িতে বসেছিলেন, এমন সময় কয়েকজন লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে আসে তার কাছে। তারা জানায়, এটিকে তারা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছে।

ওমর অনেক চেষ্টা করে এ হত্যার রহস্যের মীমাংসা করতে পারেন না। তাঁর সুবিচারক মনে এই ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রায়ই তাঁকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখা যেত, মহান্ আল্লাহ্, আমি যেন ঐ

লোকটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারি।

উক্ত ঘটনার প্রায় একবছর পরে কয়েকজন লোক তাঁর কাছে একটি শিশুকে নিয়ে আসে। তারা জানায়, শিশুটিকে সেই দুর্ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ওমর উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন,—আল্লাহ্ করুণাময়। আমি বুঝতে পারছি যে, সেই হত্যা-রহস্যের মীমাংসা এবার করতে পারবো।

তিনি তাঁর বিশ্বস্ত একটি মহিলার হাতে শিশুটিকে তুলে দিয়ে বললেন,—একে তুমি পালন কর, আমি এর যাবতীয় ব্যয় বহন করবো। একে সযত্নে আগলে রাখতে হবে, যদি এর সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে শোনো, সাথে সাথে, আমায় খবর দেবে। আর শিশুটিকে অপরিচিত কেউ যদি একে বুকে চেপে ধরে, আদর করে বা চুমু খায়, তাও আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে। গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে যায়।

নয়শত আশীতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

দিনে দিনে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে। শিশুটির যখন দুই বৎসর বয়স তখন একজন ক্রীতদাসী সহসা সেই মহিলার কাছে এসে জানায়,—আমার মনিব এই শিশুটিকে একটু দেখতে চান। তিনি অন্তঃসত্তা; আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা করবেন এই রকম সুকোমল গড়নের একটি স্বাস্থ্যবান পুত্র হয় যেন তার।

—ঠিক আছে, ওকে নিয়ে যেতে পার, তবে আমিও যাব তোমার সংগে।

শিশুটিকে নিয়ে ওরা ক্রীতদাসীটির মনিবের বাড়ী যায়। দূরে থেকে শিশুটিকে দেখতে পেয়েই সাশ্রুনয়নে ছুটে আসে মনিবটি, কোলে তুলে নিয়ে তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে থাকে।

ধাত্রীটি ছুটে এসে ওমরকে খবর দেয় যে, মহিলাটি শ্রদ্ধেয় নগররক্ষী সালের কন্যা সালেহা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ওমর একটি তরবারী তাঁর পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নগররক্ষীটির বাড়ী পৌঁছে তিনি দেখতে পান সদর দরজার পাশেই সালে প্রার্থনায় রত। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি জানতে চাইলেন,—তোমার কন্যাটির খবর কি?

আল্লাহ্ ওর মংগল করুন। দয়া, দাক্ষিণ্য এবং ধর্মপ্রিয়তার জন্য ওর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওর মত এমন সুচরিত্রের মেয়ে কটা হয়?

—বাঃ খুব ভাল কথা। আমি ওর সাথে দেখা করবো।

—আল্লাহ্ আপনাকে দোয়া করুন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওকে আগে খবর দিয়ে আসি।

অন্দরে প্রবেশ করে ওমর সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন, সালেহার

সাথে তিনি একাকী কথা বলতে চান। সবাই চলে গেলে ওমর তাঁর তরবারীটি মুক্ত করে বলেন ঃ

—রাস্তায় যে মৃতদেহটি পাওয়া গেছিল, তার সম্পর্কে তুমি কি জান বল ? যদি কোন সত্য গোপন করতে চেষ্টা কর তো এই তরবারীটি দেখতেই পাচ্ছ।

—মহান্ খলিফা! আপনি ঠিক জায়গাতেই খবর নিতে এসেছেন। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়ে বলছি যে, আমি আপনার কাছে কিছুই লুকাবো না। তারপর গলা নামিয়ে আবার সে বলতে শুরু করে, আমার কাছে একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা থাকতেন। তাঁকে আমি মায়ের মত ভালবাসতাম। অনেকদিন ছিলেন তিনি আমার কাছে। আমাকে উনি যেমন স্নেহ করতেন, আমিও ওনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম।

একদিন তিনি আমায় জানালেন, আমি এক আত্মীয়ের বাড়ী যেতে চাই কয়েকদিনের জন্য। আমার একটি কন্যা আছে, সে তোমার কাছে এসে থাকবে। আমি অনুমতি দিতে তিনি চলে গেলেন। পরদিন তাঁর কন্যাটি আমার বাড়ী এলো। মেয়েটিকে যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি দীর্ঘ সুস্থ চেহারা তার। ওকে আমার বেশ ভাল লেগে গেল। আমি ওকে আমার ঘরেই শুতে দিলাম।

একদিন বিকালে আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, ঘুমের মধ্যে একটি পুরুষ আমার উপর চড়াও হয়েছে। লোকটি সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করে আমাকে ততক্ষণে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার আগেই লোকটি আমাকে অসম্মান যা করার করে ফেললো। লজ্জায়, রাগে উন্মত্ত হয়ে আমি তখন ওর বুকে একটি ছুরি বসিয়ে দিলাম! তারপর ভাল করে দেখি, সে একটি মাকুন্দ পুরুষ এবং এই লোকটিই মেয়ে সেজে এসেছিল আমার কাছে, আমিও বিশ্বাস করে তাকে গ্রহণ করেছিলাম।

খুন করার পর কি করি, আমি ওকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কিন্তু বলাৎকারের ফলশ্রুতি হিসাবে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লাম, একটি পুত্র-সন্তান হল আমার। এই অসম্মানের সন্তানকে গ্রহণ করতে মন চাইল না আমার, আমি তখন এর পিতাকে যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেইখানেই একেও ছেড়ে দিয়ে এলাম। আল্লাহ্ জানেন, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করিনি।

—তুমি সত্যি কথাই বলেছ লক্ষ্মী মেয়ে, আল্লাহ্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মেয়ের সাহস ও সত্যবাদীতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান, আল্লাহ্‌র কাছে তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন।

কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে ধনী যুবকটি আবার বলতে শুরু করে ঃ

এইবার আমি তোমাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গল্প শোনাবো। সে তার নতুন গল্প শুরু করে ঃ

কুফার বিখ্যাত কবি গায়ক মহম্মদ এই কাহিনীটা বলেছিল ঃ

যারা আমার কাছে গান শিখতো তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল সলমা। শুধু দেখতেই সে অপরূপা ছিল না, গানের সময় তার কণ্ঠে মধু ঝরতো। অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিল সে। অতি সহজেই কঠিন সুরও আয়ত্ত করে ফেলতো।

এই শশাঙ্ক-শুভ্র সুন্দরীকে আমি আদর করে নীলা বলে ডাকতাম। তারও অবশ্য একটা কারণ ছিল। মেয়েটির ওপর ঠোঁটের উপরে গোঁফের জায়গাটা ঈষৎ নীলাভ দেখাতো। ঠিক কৈশোর কাটিয়ে তারুণ্যে পা রাখার আগে ছেলেদের যেমনটা হয়, তেমনি। মনে হতো. কেউ যেন ওর নাকের নিচে খানিকটা জলকালি মাখিয়ে দিয়েছে।

আমি যখন ওকে গান শেখাতাম তখন ও কুমারী কিশোরী। তবে কুঁড়ি ফুটবো ফুটবো করছে। বুঝতে পারতাম, ওর কামিজের নিচে ছোট ছোট স্তন দুটি দিনে দিনে সুগঠিত এবং তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে।

কেন জানি না, ওর দিকে চোখ পড়লেই আমার হৃদয় মথিত হয়ে যেত। বুকের মধ্যে এক তুফান উঠতো। চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলতে থাকতো, মাথাটা কেমন যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরে যেত।

যদিও সে সময় নীলার সতীর্থা ছিল কুফার সেরা সেরা সুন্দরী কন্যারা, তবু আমার কিন্তু ওকে ছাড়া আর কাউকেই তেমন মনে ধরেনি। আমার কেন, কোনও পুরুষই ওর দিকে তাকিয়ে বুকের তড়ফানী চেপে রাখতে পারতো না। একবার যারা দেখতো তারাই মনে-প্রাণে কামনা করতো সলমার সঙ্গ-সুখ।

জানি সে আমার ছাত্রী। গুরু শিষ্যার সম্পর্কের মধ্যে কাম-গন্ধ থাকতে নাই। তবু অকপটে বলবো, সলমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। শুধু নির্ভেজাল নিরামিষ মহব্বৎ নয়, কামনার শরে জাগরিত ছিল সেই উত্তপ্ত প্রেম। ওর একটি ইশারায় কিনা অসাধ্য সাধন করতে পারতাম আমি! যদি সে বলতো, একটা জ্যান্ত মানুষের শির কেটে মগজ এনে দাও, ভেজে খাবো, তাও আমি অনায়াসে এনে দিতে পারতাম তাকে। যদি সে হুকুম করতো, ঐ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়ায় উঠে পেড়ে আনতে হবে বকপাখীর ডিম, তাও আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। কিন্তু হায়, আমার পোড়া কপাল, তেমন কোন আজ্ঞাই তার কাছ থেকে পেলাম না কখনও।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো একাশীতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

ওস্তাদ ইবন ঘানিমের সঙ্গে সলমা মক্কায় গিয়েছিল, তখন আমি তার বিরহে একটা গান লিখেছিলাম। কিন্তু সে গান একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিরহের অভিব্যক্তি।

আমার চেয়ে হতভাগ্য ছিল আর একজন। তার নাম ইয়াজিদ ইবন আয়ুফ। সেও নীলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিল।

একদিন ওস্তাদ ঘানিম সলমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নীলা, এখানে কী তোমাকে কখনও কেউ ব্যর্থ প্রেম নিবেদন করেছে? সত্যি কথা বলতো?

সলমা বললো, না, তেমন কেউই কিছু করেনি। তবে একদিন ইয়াজিদ ইবন আয়ুফ আমাকে একটিমাত্র চুম্বন করেছিল।

ওস্তাদ ঘানিম অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, কী রকম? তোমার অমতে জোর জবরদস্তি করে?

—না তা নয়, তবে লোভ দেখিয়ে। সে আমাকে দুটো সুন্দর মুক্তো দেখিয়ে বলেছিল, এ দুটো তোমাকেই দেব, কিন্তু হাতে হাতে নয়। আমার মুখে থাকবে, তুমি মুখ দিয়েই তা বের করে তোমার মুখে পুরে নেবে।

সত্যি কথা বলতে কি, ঐ মুক্তো দুটো দেখে আমার ভারি লোভ হয়েছিল! ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। পরে ঐ মুক্তো দুটো বিক্রি করে আমি আশি হাজার দিরহাম পেয়েছিলাম।

ওস্তাদ ঘানিম গম্ভীর হয়ে বললেন, হুম, এই কাণ্ড।

এর পর ইয়াজিদের কপালে কি জুটেছিল বুঝতেই পারছেন। বেতের ঘায়ে ঘায়ে জর্জরিত হয়ে ব্যাচারা শয্যাশায়ী হয়ে থেকে একদিন মারা গেল। একটি চুমুর জন্য তাকে এইভাবে মূল্য দিতে হয়।

একদিন আমি ওস্তাদ ঘানিমের বাড়িতে যাচ্ছিলাম সলমাকে গানের তালিম দেবার জন্য। পথে দেখা ইয়াজিদের সঙ্গে। খুব রংদার জমকালো পোষাকে সেজে-গুজে সেও যেন কোথাও যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, এত সেজে-গুজে চললে কোথায়?

ইয়াজিদ বললো, তুমি যেখানে চলেছ, আমিও সেখানেই যাচ্ছি।

আমি বললাম, তা হলে তো ভালই হলো, চলো এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমরা ঘানিমজীর বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটু পরে সলমা এল। তারপরে চুমকী বসানো হলুদ রঙের বাহারী শালোয়ার আর পায়ে টকটকে লাল রঙের 'কাতান'। ওকে দেখে আমার মনে হলো এক জ্বলন্ত সূর্যের গোলা যেন। সলমার পিছনে এসে দাঁড়ালো একটি সুন্দরী বাঁদী। হাতে তারের বাদ্যযন্ত্র।

আমি ওকে যে গানটা শেখাচ্ছিলাম সেটা একবার গাইতে বললাম। বড় মধুর করে গেয়ে শোনালো সে।

ওস্তাদজী আমাদের বসিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলেন দুপুরের খানা-পিনার বায়না দিতে। সেই স্বযোগে ইয়াজিদ আরও কাছে ঘেষে বসলো সলমাব। সল্মা যাতে একটিবার তার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি মেলে তাকায়, সেই আশাতে অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু সলমা তখন গানে বিভোর।

ইয়াজিদ কোমরের থলে থেকে দুটো স্বন্দর মুক্তোবের করে নাচাতে লাগলো। এবং সলমা দেখে প্রলুব্ধ হলো। গান শেষ হলে ইয়াজিদ বললো, এ দুটো আমি ষাট হাজার দিরহামে কিনেছি। যদি তোমার পছন্দ হয় নিতে পার।

সলমা বললো, তার বদলে আমাকে কী করতে হবে?

—কিচ্ছু না, শুধু একটি গান শুনিয়ে দাও—

সলমা একটা গান শোনালো ইয়াজিদকে, তারপর বললো, কই দাও এবার?

ইয়াজিদ বললো, কথা যখন দিয়েছি আলবাৎ দেব। কিন্তু আমি মনে মনে একটা পণ করেছি। এ দুটো আমার মুখে থাকবে। আর তুমি তা বের করে নেবে তোমার ঠোঁট দুটো দিয়ে।

সলমার গা গুলিয়ে গেল। ঐ হতচ্ছাড়া লোকটার মুখে মুখ ঠেকাতে হবে? কিন্তু মুক্তো দুটো কী দামী? একটি মাত্র চুম্বনের বদলে অমন জিনিস সে দিয়ে দেবে তাকে! কী বোকা হাঁদা?

অবশেষে লোভ সামলাতে না পেরে সলমা সম্মত হয়ে গেল।

এই হচ্ছে ওদের চুম্বন বৃত্তান্ত।

এর পর আর একটা সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি ঃ

একদিন খলিফা ওয়ালিদ রবাহুত নবান্নভোজী তুফেনের সংগে খানাপিনা করছিলেন। যেখানেই ভালমন্দ খানাপিনার গন্ধ পেত সেখানেই সে হাজির হতো। সারা কুফা শহরে তার এই গায়ে পড়ে সেধে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার ব্যাপারটা তখন লোকের মুখে মুখে মুখরোচক গল্প হয়ে ফিরতো।

খেতে সে ভীষণ ভালোবাসতো, এক কথায় পেটুক বলা যায়। কিন্তু গোগ্রাসে গিলতে সে পারতো না। মজার মজার রঙ্গ-রস করে মজলিস মাতিয়ে তুলতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো বিরাশীতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে :

একদিন এক সম্ভ্রান্ত আমিরের বাড়িতে ভোজসভায় শহরের তাবৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হয়ে আহারে বসেছে। এমন সময় দরজার কাছে দরোয়ানদের সঙ্গে বচসা করতে শোনা গেল তুফেনকে।

তুফেনের গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র নিমন্ত্রিতরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

---এই সেরেছে, তুফেন যখন হানা দিয়েছে, তখন আর কাউকে পেট ভরে খেতে হবে না। ও একাই সেরা সেরা খানাগুলো সাবাড় করে দেবে।

একজন বললো, এক কাজ করা যাক, বড় মাছটাকে ঘরের ওপাশে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও। আর সামনে সাজিয়ে রাখ ছোটখাঁটো চুনো-পুঁটিগুলো। খেয়ে যখন সে বিদায় নেবে, তখন আমরা বের করবো ঐ বড় মাছটা।

তার কথায় সকলেই সায় দিল। বড় মাছটাকে একটা বারকোষের ওপর রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে একটু দূরে এক পাশে সরিয়ে রাখা হলো। আর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হোলো ছোট মাছের থালাগুলো।

তুফেন ঘরে ঢুকেই সবাইকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

সকলে তাকে শুকনো অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, আরে, এস এস তুফেন সাহেব, তোমার জন্যেই আমরা হাত তুলে বসে আছি। এস এস, তুলে নাও একটা থালা।

তুফেন টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে চুনোমাছের রেকাবী সাজানো আছে কয়েকখানা। একজন বললো, খুব ভাল মাছ, একটু মুখে দিয়ে দেখ।

তুফেন ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমার বাবা সমুদ্রের পানিতে ডুবে মরার পর থেকে মাছে আর তেমন কোনও আসক্তি নাই। তোমরাই খাও, ভাই সাব।

অন্য একজন বললো, সে কি কথা! এ যে ভূতুড়ে কথা শুনছি তোমার মুখে! একবার একটা তুলে চেখেই দেখ না, বড় ভাল হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বে একটা ছোট চারাপোনা দু আঙুলে তুলে সে নাকের কাছে ধরে। তারপর আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে দেয়।

—কী হলো, খাবে না?

সকলে অবাক হয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করে। তুফেন অনাসক্তের মতো বলে, নাঃ।

—কারণ?

তুফেন বলতে থাকে, এই খুদে মাছটাকে খাবো বলে মুখের কাছে ধরতেই ও কি বললো জানো? বললো, আমাকে কেন খাচ্ছো মালিক, তোমার বাবাকে তো আমরা কেউ খাইনি। যে খেয়েছিল সেও অবশ্য আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত আছে এই ভোজসভায়। তাকে যদি উদরস্থ করতে পার, তবে তোমার বাবার হন্তার প্রতি যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু

তেমন বড় মাপের মাছ তো এখানে নজরে পড়ছে না ?

ঐ মাছটাই আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ঐ—ঐ যে বারকোষটায় ঝুড়ি চাপা রয়েছে, ঐ রাঘব বোয়ালটাই তোমার বাবাকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলেছিল। এখন আমার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ব্যাটাকে পেলে আমি আস্ত গিলে খাবো।

এই বলে তুফেন দ্রুতপায়ে কোণে ঢাকা দিয়ে রাখা বারকোষের কাছে এগিয়ে যায় এবং লেজাটা ধরে টেনে তুলে ধরে নাকের সামনে।

—ওঃ, তোফা, খেতে হবে, কী বল ? তবে শয়তান, তুই আমার বাবাকে খেয়েছিলি ? আর আজ কী হবে ? তোকে আমি খেয়ে ফেললে তোর কোন বাপ ঠেকাতে আসবে এখানে ? উঁ-হুঁ-হুঁ, ওসব নাকি কান্না আমার ঢের শোনা আছে। না, কিছুতেই না, তোকে আস্ত আমার পেটে ঢোকাতে না পারলে আমার গায়ের ঝাল যাবে না।

এই বলে ঐ বিরাট মাছটাকে তুফেন একাই খেয়ে সাবাড় করে দিল।

উপস্থিত অভ্যাগতরা তার এই অভিনব ফিকির দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো সকলে।

—আরে তুফেন ভাই, অমন গোগ্রাসে খেও না, গলায় আটকে যাবে যে।

এর পর যুবকটি আর এক কাহিনী বলতে শুরু করলো ঃ

শোনা যায়, আব্বাসের তৃতীয় বংশধর খলিফা মাহদী তাঁর মৃত্যুকালে প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র অল হাদীকে মসনদের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি একটি শর্ত রেখে গিয়েছিলেন। তা হলো, অল হাদী মারা যাবার পর মাহদীর কনিষ্ঠ পুত্র হারুণ অল রসিদ মসনদ পাবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল হাদীর মৃতদেহে তার কোনও অধিকার বর্তাবে না।

অল হাদী ধর্মাবতার হয়ে মসনদে বসার পর থেকে যে অনুজ অল রসিদের ওপর দারুণ হিংসুটে হয়ে উঠলো। দিনে দিনে মিথ্যা সন্দেহের দানা বাঁধতে লাগলো তার মনে। নানা ছল ছুতো খুঁজতে লাগলো, কী উপায়ে রসিদকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়।

কিন্তু হারুনের মা খাইজারান অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ রমণী ছিলেন। প্রতি পদেই তিনি হারুনকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে আগলে রাখতেন। খলিফা মা-সুদ্ধ ছোট ছেলেকে সাবাড় করে দেবার মতলব ভাঁজতে লাগলো।

একদিন খলিফা অল হাদী তার নন্দন-কাননে প্রিয়তমা বাঁদী ঘদিরকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ বিহার করছিল।

ঘদিরকে আজ মাত্র চল্লিশ দিন হলো হারেমে আনা হয়েছে। এই চল্লিশ দিনের মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্য খলিফা তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনি। তার রূপ-সুধা পান করে করে অলস দিন কাটাচ্ছে সে।

বাগানের ঠিক মাঝখানে গালিচা পাতা হয়েছে। বিখ্যাত ওস্তাদ ইশাক এসেছে গান শোনাতে।

প্রথমে ঘদির গান গাইলো। যে গানের মূর্ছনায় তন্ময় হয়ে রইলো ইশাক। অল হাদীও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সুন্দরী বাঁদী ঘদিরের মুখের দিকে।

হঠাৎ যেন কি ঘটে গেল, খলিফা অল হাদী আর্তনাদ করে উঠলো। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, 'প্রত্যেকেরই সময়সীমা বাঁধা আছে। তার এক মুহূর্ত বেশি এখানে কাটাতে পারবে না কেউ। একদিন সময় ফুরালে সবাইকে সেখানে চলে যেতে হবে।

এরপর একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকলো খলিফা। তারপর চিৎকার করে হাঁকতে লাগলো, মাসরুর। জলদি মাসরুরকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

তক্ষুণি খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর এসে হাজির হলো, বান্দা হাজির জাঁহাপনা।

এই যে মাসরুর, তুমি এসেছ, হাঁপাতে হাঁপাতে অল হাদী বললো, এক্ষুণি যাও, অল রসিদের কাটা মুণ্ডু এনে হাজির কর আমার সামনে।

মাসরুর অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। ছোটবেলা থেকে অল রসিদকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে সে। এ দুনিয়ায় তার চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছু নাই। সেই প্রাণাধিক প্রিয় অল রসিদকে নিজের হাতে হত্যা করতে হবে আজ? ইয়া আল্লাহ, এ কি অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিলে আমায়। অল হাদী এখন স্বয়ং ধর্মাবতার। তার হুকুম অমান্য করা শুধু ঘোরতর অপরাধ নয়, মহা অধর্ম, মহা পাপও বটে। কিন্তু জগতে পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্মর চেয়ে বড় কি আর কিছুই নাই। নফর মাসরুর এ প্রশ্নের উত্তর পাবে কোথায়?

কী দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার হুকুম শুনতে পাওনি?

গর্জে উঠলো অল হাদী।

—জী হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

এই বলে সে হারেমের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে স্বগতভাবে শুধু বললো, আমরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। আবার মেয়াদ ফুরালে তার চরণেই ফিরে যাবো। তারপর এক বদ্ধ মাতালের মতো টলতে টলতে গিয়ে হাজির হলো সুলতান জননী খাজিরানের মহলে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো তিরাশীতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মাসরুরকে অস্বাভাবিক ভাবে টলতে টলতে আসতে দেখে খাইজারান অবাক হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, অমন টলমল করছিস কেন মাসরুর ?

মাসরুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না, মা জননী। আপনার গর্ভের সন্তান আমার প্রভু খলিফা হুকুম করেছেন তাঁর সহোদর ভাই অল রসিদের শির কেটে নিয়ে যেতে।

এই কথা শোনা মাত্র বিধবা বেগমসাহেবার চোখে অন্ধকার নেমে আসে।

—সর্বনাশ, কী উপায় হবে ? সে আমার গর্ভজাত সন্তান হতে পারে, কিন্তু এখন তো সে বাগদাদের খলিফা ধর্মাবতার। তার হুকুম অমান্য বা রদ করার সাধ্য তো ইহ দুনিয়ায় কারো হতে পারে না। পুত্রের এই আক্রোশ থেকে রসিদকে সে কী করে প্রাণে বাঁচাবে ?

কিন্তু বিপদে অধীর হলে চলবে না। মাসরুরকে বললেন, যা শিগ্গির, হারুনকে আমার কাছে নিয়ে আয়, এক্ষুণি।

হারুন অল রসিদ নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিল। মাসরুর ছুটে গিয়ে তাকে ঠেলে তুললো, মালিক, শিগ্গির শিগ্গির চলুন, মা জননী আপনাকে তলব করেছেন।

হারুন কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। তাড়াতাড়ি সে সাজগোজ করে মায়ের মহলে এসে দাঁড়ায়। খাইজারান আকুল হয়ে ছুটে এসে পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। মুখে কোনও কথা বলতে পারেন না।

একটু পরে একটা ছোট্ট কুঠরীতে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে বসেন তিনি।

—শোনও বাবা, তোমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এক্ষুণি তোমার গর্দান যাবে। তোমার বড় ভাই এই হুকুমই দিয়েছে মাসরুরকে। তোমার কাটা মুণ্ডু সে দেখতে চায় আজই। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এই গুপ্ত কুঠরিতেই লুকিয়ে থাক। কিছুতেই বাইরে বেরুবে না।

এরপর সুলতান-জননী বাইরে এসে মাসরুরকে বললো, যাও, এখনও হয়তো [illegible] ঘুম থেকে ওঠেনি, দরবারের আমিরদের বাড়িতে গিয়ে খবর দাও আমি [illegible] সংগে এই মুহূর্তে দেখা করতে চাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাইজারানের মহলে আমিরদের দরবার বসলো। বিধবা বেগমসাহেবা সকলকে উদ্দেশ করে বলতে থাকলেন, আপনারা তো হারুনকে ভাল করেই জানেন। সে কি করে, কোথায় যায়, কাদের সংগে মেলামেশা করে কিছুই আপনাদের অজানা নয়। আপনারাই বলুন, আজ পর্যন্ত সে কখনও তার বড় ভাই-এর বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ? অথবা প্রজা ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে কোনও অঞ্চলে ?

সকলে সমস্বরে বললো, না না, এ সব কী বলছেন, মহামান্যা বেগম-সাহেবা ? শাহজাদা হারুন অল রসিদের মতো ভালো ছেলে হয় না। তার

মনে কোনও পাপ নাই। সে জানত কারো বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করতে পারে এ আমরা বিশ্বাস করি না।

—তবে কোন্ অপরাধে খলিফা তার কনিষ্ঠ ভাই-এর গর্দান নেবার হুকুম করেছে? সে মাসরুরকে পাঠিয়েছে হারুনের শির কেটে নিয়ে গিয়ে তার সামনে হাজির করতে। কিন্তু কেন এই প্রাণদণ্ড? কী তার অপরাধ? আপনারা এর বিহিত করুন।

আমির অমাত্যরা হতবাক হয়ে মাথা নত করলো সকলে। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো সারা শরীর।

এই সময় উজির রাবিয়াহ উঠে দাঁড়িয়ে মাসরুরকে ইশারায় ডেকে কাছে এনে ফিসফিস করে বললো, খলিফা তোমাকে হুকুম তামিল করতে পাঠিয়েছেন, অথচ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কালক্ষেপ করছো, তাতে তো কোনও সুরাহা হবে না।

মাসরুর সাশ্রুনয়নে বলে, কিন্তু কী করবো হুজুর! এ হুকুম আমি তামিল করবো কী উপায়ে? তার চেয়ে আমারই গর্দান নিক খলিফা।

উজির বললো, বিপদে অধৈর্য হতে নাই, কথা শোন, তুমি খলিফার সামনে গিয়ে বল, সুলতান-মাতা সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছেন, সেই কারণে তুমি তাকে বধ করতে পারছো না।

মাসরুর অল হাদীর সামনে হাজির হতে সে হুঙ্কার ছাড়ে, কই, কোথায় তার কাল্লা? আমার হুকুম অমান্য করার সাজা কি জানিস না নরাধম?

—জানি জাঁহাপনা, আমার গুস্তাকী মাফ করবেন, আমি ধর্মাবতারের গোলাম, তাঁর আজ্ঞাবহ দাস, কিন্তু কি করবো মালিক, হারুন অল রসিদকে মা-জননী বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। তাকে বার বার মিনতি করে বলেছি, ওকে ছেড়ে দিন মা, আমাকে খলিফার হুকুম তামিল করতে দিন। কিন্তু তাঁর এক কথা, আমাকে হত্যা না করে হারুনকে হত্যা করতে পারবি না তোরা।

মাসরুরের কথা শুনে ক্রোধে আরক্ত হয়ে মাইফিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে অল হাদী। বাঁদী ঘাদির আর ওস্তাদ ইশাককে বলে তোমরা যেও না, অপেক্ষা কর, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

গট-গট করে সে সোজা মায়ের মহলে ঢুকে পড়ে। এপাশে ওপাশে তারই দরবারের আমির আমাত্যরা সকলে দণ্ডায়মান। অথচ সেদিকে ভুলেও ভ্রুক্ষেপ করলো না সে। সোজা মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত তলব করলো, তোমার এতবড় স্পর্ধা, আমার শাসন কার্যে ব্যাঘাত ঘটাতে চাও?

মা বলে, না ধর্মাবতার, আমি পাপিষ্ঠা নই। বাগদাদের খলিফা ন্যায়মূর্তি, ধর্মাবতার। তাঁর বিচারের সমালোচনায় মহাপাপ হয়।

শুধু আমি জানতে ইচ্ছা করি বাবা, কেন তুমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছ? কী তার অপরাধ, সে কী তোমাকে গদীচ্যুত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে? অথবা প্রজা ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে?

—না। সে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নাই।

—তবে? তবে আর এমন কী গুরুতর ব্যাপার ঘটতে পারে, যার জন্য

তাকে খাঁড়ার নিচে মাথা পেতে দিতে হবে ?

খাইজারানের প্রশ্নবাণে কাবু হয়ে পড়ে অল হাদী। একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে, সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু নাই, তবে আজ রাতে স্বপ্নের ঘোরে তাকে আমি এক অপকর্ম করতে দেখেছি। আমি দেখলাম, হারুন আমার প্রাণাধিক প্রিয়া বাঁদী ঘদিরকে নিয়ে আদর সোহাগ করছে। এরপরই আমার তন্দ্রা ছুটে যায়। আমি মাসরুরকে ডেকে পাঠিয়ে বলি, এখুনি হারুনের শির কেটে আন। আমার কাছে আমার বাঁদী ঘদির আর আমার মসনদ দুই-ই সমান প্রিয়। কোনওটাকে ছেড়েই আমি জীবন ধারণ করতে পারবো না। সেই প্রিয়তমাকে যে ভাগিয়ে বেহাত করে নিতে চায়, তার চেয়ে বড় শত্রু আমার আর কেউ নয়, মা।

—অবাক করলে বেটা, তোমার মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান নরপতির মুখে এহেন অবোধ বালকের মতো বাক্য শোভা পায় না। স্বপ্নের কতটুকু সত্য হয়ে ফুটে ওঠে মানুষের জীবনে? আমরা অবচেতন মনে যা চিন্তা ভাবনা করি তারই কিছু কিছু স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়ে সামনে ধরা দেয়। কিন্তু তার মধ্যে সত্য কতটুকু ? ছিঃ ছিঃ, এই তুচ্ছ মিথ্যা কারণে তুমি তোমার আদরের ভাইকে হত্যা করতে চাইছো ?

আমির আমাত্যরাও খলিফাকে বোঝালো, স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে কোনও কাজ করা কোনও বুদ্ধিমানের উচিত নয়।

এবার অল হাদী নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জিত হয়ে হারেম ত্যাগ করে বাগানে চলে যায়।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় জলকেলী করতে নেমে অল হাদী বাঁ পায়ে একটু চোট পায়। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ফুলেও ওঠে। এবং আবের মতো একটা ঢিবি বেঁধে যায়। তারপর শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

এই সংবাদ মাসরুর নিয়ে আসে খাইজারানের কাছে। পুত্রশোকে তিনি শোকাতুর না হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, যাক, আল্লাহর অসীম কৃপা, তাকে এই পাপকর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এখুনি তুই হারুনকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়। ওকে কিছু বলার দরকার নাই।

মাসরুর অল রসিদের ঘরে গিয়ে দেখে সে ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে সে বলে, মালিক, শিগগির চলুন, মা জননী আপনাকে ডাকছেন।

—কেন রে বান্দা, কী ব্যাপার ? আবার কোনও নতুন পরোয়ানা এসেছে নাকি বড় ভাই-এর কাছ থেকে ?

মাসরুর বলে, সে আমি বলতে পারবো না, হুজুর। আপনি আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।

খাইজারান পুত্র হারুনের মাথায় হাত রেখে বলে, বাবা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অধর্ম সয় না, তাই তার নিধন হয়েছে। তোর বড় ভাই আজ দেহ রেখেছে। এখন তুই-ই হবি আইনতঃ খলিফা। শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে এখনি

মসনদে গিয়ে বোস্। আমি উজির আমির সবাইকে এত্তেলা পাঠাচ্ছি। আজই তোর অভিষেক হবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো চুরাশীতম রজনী :
আবার সে বলতে শুরু করে :

একদিকে শোকের মিছিল, অন্যদিকে বর্ণাঢ্য অভিষেক উৎসব। দেশবাসীরা খলিফার অকাল বিয়োগে যেমন শোকাহত হলো অন্যদিকে হারুন অল রসিদকে নতুন খলিফা রূপে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলো। সেইদিন থেকেই শুরু হলো সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুলতানের হুকুমত কাল।

এবার আসুন আমরা ঘদিরের কথা বলি।

সাড়ম্বরে মসনদে আরোহণ করার পর সন্ধ্যাবেলায় খলিফা হারুন অল রসিদ হারেমে ঘদিরের কাছে সংবাদ পাঠালেন, ঘদির যেন অবিলম্বে বিলাস-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাকে সঙ্গদান করার জন্য নন্দনকাননের প্রমোদ বিহারে চলে আসে।

ঘদির এই রকমই একটা আশঙ্কা করছিল। খলিফার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো নাই। ঘদির শোকের কালো পোশাক খুলে ফেলে জমকালো সাজ-পোশাক পরে তৈরি হয়ে প্রমোদ বিহারে এসে হাজির হয়।

খলিফা এগিয়ে এসে ঘদিরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমি আশা করবো, প্রতিদিন তুমি যেমন এখানে এসে বড় ভাইকে তোমার মধুর সঙ্গীত শোনাতে সেই রকম আমাকে শোনাবে আজ থেকে।

ঘদির কুর্ণিশ জানিয়ে বলে, ধর্মাবতার আমি আপনার আজ্ঞাবহ বাঁদী। আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই করবো।

ঘদির অতি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করবে তা কিন্তু ভাবেননি খলিফা। সে যে ভাবে অল হাদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তাতে হারুন অল রসিদের ডাকে সাড়া না দিলেও তিনি বিস্মিত হতেন না। বরং এত সহজে পোষ মেনে গেল দেখেই তিনি অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন।

—তোমার গান শুনে নাকি বনের হিংস্র জানোয়াররাও পোষ মানে। তা আমাকে শোনাবে একখানা ?

ঘদির লাস্য হেসে বলে, কেন নয়, জাঁহাপনা ? এখন থেকে শুধুমাত্র আপনাকেই তো শোনাবো আমার গান।

পর পর দুখানা গান গাইল ঘদির। বলা বাহুল্য, গান দুখানির সুর ছিল বেহাগ করুণ রসের। তা হোক, বড় ভাল গায় সে। সুরের মূর্ছনা ঝঙ্কৃত হতে থাকে সারা দেহের রক্তকণিকায়। মথিত করতে থাকে হৃদয়।

আসরটাকে বেশ জমজমাট করার জন্য হারুন অল রসিদ বলেন, সঙ্গীতের সঙ্গে সুরা না হলে কী জমে ঘদির ? তুমি কি বল ?

—কিন্তু জাঁহাপনা, এই মাইফিলে ওস্তাদ ইশাক না থাকলে শুধু সুরায় কিছু জমবে না।

খলিফা বলেন, তার জন্য চিন্তা কী! এক্ষুনি তাকে হাজির হতে বলছি এখানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইশাক এসে কুর্ণিশ জানিয়ে আসন গ্রহণ করে।

মদের পাত্র পূর্ণ করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে না যাওয়া অবধি সমানে সুরাপান চলতে থাকে। এক সময় ইশাক মাতোয়ালা হয়ে ওঠে।

—এই চাঁদিনী রাত, ঝর্ণার কলতান, পাখীর কূজন, ফুলের সৌরভ—সব মিলে এক অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছে, জাঁহাপনা। এখন তো গান ছাড়া আর কিছুই মানায় না।

অল রসিদ বলেন, তা হলে গানই হোক।

ইশাক বলে, মহামান্যা মালকিনই গান ধরুন আগে।

ঘদির গাইতে শুরু করে। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে খালিফা আর ইশাক। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠে দুজনে। ঘদির গাইতে গাইতে পড়ে গেছে মেঝের উপর।

সুলতান ছুটে গিয়ে ধরে তোলেন ঘদির-এর নিষ্প্রাণ দেহখানা।

কী ভাবে ঘদির মারা গিয়েছিল সে কথা কোনদিনই জানা যায়নি।

অল হাদীর কবরের পাশে ঘদিরের মৃতদেহকে সমাহিত করা হয়েছিল।

এরপর যুবকটি আর এক কাহিনী বলতে আরম্ভ করে ঃ

মস্ত বড় সঙ্গীতসাধক হাসিম ইবন সুলেয়মানের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন। খলিফা হারুন অল রসিদ তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন।

হাসিমের একখানা গান শুনে খুশিতে নেচে উঠলেন খলিফা।

—এমন সঙ্গীত আপনি কী ভাবে কণ্ঠে ধারণ করলেন, ওস্তাদজী?

এই বলে তিনি তাঁর কণ্ঠের মহামূল্য রত্নহার পরিয়ে দিলেন হাসিমের গলায়।

এমন উপহারে উল্লসিত না হয়ে বিষাদ-বিষণ্ণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এ মণিহার আমাকে সাজে না, ধর্মাবতার!

দু ফোটা অশ্রু ঝরে পড়লো তার কপোল বেয়ে।

—কেন? আর কেনই বা এই অশ্রু ওস্তাদজী? আমার উপহার কী আপনার পছন্দ হয়নি?

—খোদা হাফেজ! আল্লাহ আপনাকে আরও মহান করুন; আমার এই

অন্তর বেদনা ওসব কোনও কারণে নয়। যদি অনুমতি করেন তবে এই হতভাগ্য তার জীবনের এক বেদনার কাহিনী শোনাতে পারে জাঁহাপনাকে।

খলিফা বলে, বেশ তাই শুনি—। নিশ্চয়ই সে কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। তা না হলে আপনার চোখ অশ্রু-সজল হবে কেন?

হাসিম তার স্মৃতিকথা বলতে থাকে:

তখন আমি বয়সে নবীন। কিন্তু সেই যৌবনকালেই আমার গান মানুষের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছিল।

একদিন আমি চলতে চলতে এক মনোহর উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে দেখলাম সুলতান ওয়ালিদ তাঁর দলবল নিয়ে মৃগয়া করতে এসেছেন।

বাগানের মাঝখানে একটা বিশাল দীঘি। তার পাড়ে ঘাসের শয্যার ওপর মখমলের গালিচা বিছিয়ে মাইফেলের আসর বসেছে। সুলতানের দুপাশে দুটি পরমাসুন্দরী কিশোরী। তাদের হাতে তারের বাদ্যযন্ত্র। একজন গান গাইছে। কান পেতে শুনলাম, আমারই একখানা বহু প্রচলিত সংগীত যথাসাধ্য দরদ দিয়ে গাইবার চেষ্টা করছে। কিন্তু গায়িকার দক্ষতার অভাবে মাঝে-মাঝে বেসুরো হয়ে যাচ্ছে গানখানা।

কৌতূহল নিয়ে আরও একটু এগিয়ে যেতে সুলতান ওয়ালিদ তাঁর এক সহচরীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ দেখ, তোমার গান শুনে লোকটা কেমন মাতোয়ালা হয়ে উঠেছে। ওকে এখানে ডেকে একটু মজা করা যাক, কী বল?

সুলতান ওয়ালিদ আমাকে কাছে আসতে ইশারা করলেন। আমি সামনে গিয়ে আভূমি আনত হয়ে যথাবিহিত কুর্নিশ জানালাম তাঁকে।

তিনি আমাকে বসতে বললেন, বস, গান শুনবে?

আমি সবিনয়ে মাথা নুইয়ে বললাম, শুনবো জাঁহাপনা।

সুলতান এবার সেই সহচরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, শুরু কর।

গানের সুর কেটে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় আমার। আমি আর মুখ বুজে সহ্য করতে পারলাম না।

—কিছু অপরাধ নেবেন না মালকিন, গানটা কিন্তু যথাযথ গাওয়া হচ্ছে না। মাঝে মাঝে সুর কেটে যাচ্ছে।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো, লোকটার কী মাথাটা খারাপ, জাঁহাপনা? আমার গানের তালে ভুল ধরছে?

সুলতান ওয়ালিদ বললেন, কী হে, তুমি কী ভেবেছ, তোমাদের রাখালদের কাছ থেকে শিখে এসেছে সে।

—না জাঁহাপনা, সে কথা আমি বলিনি। উনি নিশ্চয়ই নামী ওস্তাদের কাছেই তালিম পেয়েছেন। তবে ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেননি এখনও। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করবো, গলাটা ভাল আছে, মন দিয়ে শিখলে ভাল গান গাইতে পারবেন ভবিষ্যতে।

আমার কথায় বোধহয় কৌতুক বোধ করলেন সুলতান। বললেন, তা তুমিই

সে তালিম দেবার ভারটা নাও না !

—তা মহামান্য শাহেনশাহ যদি সেরূপ আদেশ করেন, মাথা পেতে নিতে পারি।

এবার তিনি বেশ রুষ্ট হয়েই বললেন, তোমার ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হচ্ছি! ঠিক আছে, একটা গান শোনাও তো দেখি।

আমি আরও একটু এগিয়ে বসে বললাম, জো হুকুম জাঁহাপনা!

তারপর ঐ মেয়েটিকে বললাম, তানপুরার তার আরও চড়া পর্দায় বেঁধে নিন।

মেয়েটি ক্রুদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো আমার দিকে। যেন ছোবল মারবে এই রকম ভাব।

আমি ঐ গানটাই গেয়ে শোনালাম।

এর পরের দৃশ্য বড় মধুর। মেয়েটি লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের ওপর। গুস্তাকী মাফ করবেন ওস্তাদজী, আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনার গান আমি আমার গুরুর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি আপনার গান ছাড়া আর কিছু শেখান না কাউকে।

সুলতান ওয়ালিদ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আপনিই ওস্তাদ হাসিম! আজ আমার মৃগয়া করতে আসা সার্থক হলো। এমন মানুষকে দেখেও আনন্দ।

মেয়েটি তার গলা থেকে একটি মহামূল্যবান রত্নহার আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো, আমার এই দীন উপহার, মেহেরবানী করে গ্রহণ করে ধন্য করুন আমাকে, ওস্তাদজী।

মালাটা আমি হাতে নিয়ে বললাম, কিন্তু এ যে অত্যন্ত মূল্যবান হার ?

সুলতান বললেন, টাকা পয়সার দামের চেয়েও আরও অনেক বেশি দামী বস্তু। এক বিশেষ মুহূর্তে আমার গলা থেকে খুলে নিজের হাতে ওকে পরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। ওর কাছে এর চেয়ে দামী জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। সেই সবচেয়ে সেরা অমূল্য ধন দিয়ে সে গুরু-দক্ষিণা দিল। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে ওস্তাদজী! আপনি গ্রহণ করে ওকে কৃতার্থ করুন।

এরপর সুলতান বললেন, আপনাকে যখন পেয়েছি, আজকের দিনটা স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আজ আমরা নৌকায় চেপে মাইফেলের আসর জমাবো। এই দীঘির কালো পানিতে ভাসতে থাকবে আমাদের নৌকাখানা। আর আমরা আপনার গান শুনে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেব।

আমি বললাম, চমৎকার হবে, জাঁহাপনা।

ঘাটে বাঁধা ছিল একখানা ময়ূরপঙ্খী নৌকা। প্রথমে সুলতান উঠলেন। তারপর আমি উঠলাম, আমার পিছনে সেই কিশোরী। একখানা পা পাটানে রাখতেই দুলে উঠলো নৌকাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল সেই চরম বিপর্যয়। পা হড়কে পড়ে গেল সে কালো দীঘির পানিতে। মাঝি-মাল্লারা

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো দীঘির পানিতে। কিন্তু নিমেষে কোথায় যে সে তলিয়ে গেল আর হদিশ করা গেল না!

সারা রাত ধরে তল্লাসী চালানো হলো দীঘিতে, তোলপাড় করে ফেলা হলো তার পানি। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

সুলতান কাঁদতে লাগলেন। আমিও আশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো ছিয়াশীতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুলতান ওয়ালিদের সে মর্মবেদনা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না জাঁহাপনা। তিনি সাশ্রুনয়নে আমাকে বললেন, ওকে আমি বড় পেয়ার করতাম, ওস্তাদজী। ঐ রত্নহার আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। ওরকম খানদানী বস্তু কেউ অন্যের হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু ওকে আমি একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছিলাম। তাই দিতে আর দ্বিধা হয়নি এতটুকু।

একটু থেমে আবার তিনি বলতে থাকেন, আজ ও আমাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। এখন কী নিয়ে থাকবো আমি। ওর কোনও স্মৃতিই আমার কাছে নাই। এই মালাটা ওর গলায় দুলতো, আর তার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো ওর সারা মুখ। চোখ বন্ধ করে সে মুখচ্ছবি এখনও আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারছি। কালের কবলে সবই তো একদিন ধুয়ে মুছে ঝাপসা হয়ে আসবে। তখন হয়তো আর আজকের প্রিয়ার এই ছবি ধরা দেবে না। সেই কারণে আপনাকে উপহার দেওয়া ঐ মালাটি আমি কাছে রাখতে বাসনা করছি ওস্তাদজী। কিন্তু এ মালা যে সে গুরুদক্ষিণা দিয়ে গেছে আপনাকে। আমি তো তা ওয়াপস করে নিতে পারি না। আপনি যদি আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে হারটা উচিত মূল্যে আমার কাছে বিক্রি করেন, চির কৃতজ্ঞ থাকবো আমি। মূল্য হিসাবে আমি আপনাকে তিরিশ হাজার দিরহাম দেব, আপনি ওটা আমার কাছে বিক্রি করে দিন।

বলা বাহুল্য, তক্ষুণি সে মালা আমি সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

তারপর কত কাল কেটে গেছে। বয়সের ভারে আমার দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। সারাটা জীবনের অসংখ্য ঘটনা একটি মাত্র মালায় গাঁথা হয়ে গেছে। আজ আর ওদের সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে ইয়াদ করতে পারি না।

আজ আপনার দেওয়া এই রত্নহারটি দেখে আমার যৌবনকালের এই শোকাবহ ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। বিধাতা-পুরুষের এমনই যে পরিহাস, সেদিনের সেই মালাটাই আজ আবার আমার হাতে ফিরে এল। সুলতান ওয়ালিদ গত হয়েছেন। তাঁর সলতানিয়ত এখন আপনার অধিকারে। বুঝতে পারলাম, সুলতানের অন্যান্য ধনরত্নের সঙ্গে এই মালাটিও আমার হাতে

এসেছিল। আপনি যে আমাকে এই মহামূল্য রত্নহারটি উপহার দিয়েছেন সে আমার পরম পাওয়া সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরনো স্মৃতির ক্ষতটায় আবার নতুন করে দারুণ ব্যথার প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে গেল। স্মৃতি সতত সুখের হয় না জাঁহাপনা. কখনও কখনও সে নতুন করে বুক ভেঙেগ দিয়ে যায়।

এরপর যুবকটি আর এক কাহিনী শুরু করে ঃ

মশুলের বিখ্যাত গায়ক ইশাকের দিনলিপি থেকে উদ্ধার করে এই গল্পটা আজ শোনাবো আপনাদের ঃ

একদিন আমি খলিফা হারুন অল রসিদের দরবারে প্রবেশ করে দেখলাম খলিফা মসনদে বসে আছেন। তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে উজির ফাদল এবং অল হিজাজের এক শেখসাহেব। দেখতে সে বেশ সুপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত।

যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে আমি উজিরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফিস-ফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পরদেশীটি কে? এর আগে এঁকে তো কখনও দেখিনি?

উজির জানালো, উনি হচ্ছেন অল হিজাজের মাবাদের নাতি। গায়ক এবং কবি। নামটা নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ পরিচিত।

আমি চিনতে পারলাম। তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে খাটো গলায় বললেন, ওস্তাদজী, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি আপনাকে আমার নানার বিখ্যাত গানগুলো গেয়ে শোনাতে পারি। আমার স্মৃতির পটে আজও সেই সব কথা অম্লান হয়ে আছে।

শেখের প্রস্তাবে আমি বিশেষ প্রীত হয়ে বললাম, আচ্ছা শেখসাহেব, আপনার নানা কতগুলো গান বেঁধেছিলেন আপনার ইয়াদ আছে?

—ষাটখানা।

—তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা গানগুলো কি কি আপনার মনে আছে?

—অবশ্যই আছে ইশাকজী। তাঁর সবচেয়ে সেরা গান ঃ ও আমার বুকের নিধি, ও আমার মুলেখা—

তানপুরাটা তুলে নিয়ে তিনি পুরো গানটা গেয়ে শোনালেন তখুনি। সত্যিই, অপূর্ব গান আর তার গলা! গান শেষ হয়ে গেলেও গানের রেশ অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগলো দরবারের সর্বত্র। খুশির আনন্দে ভরে গেল আমার মন। শেখশাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো সাতাশীতম রজনী :
আবার সে বলতে থাকে :

মনের মধ্যে তখন গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিল সেই সংগীত। তানপুরাটা তুলে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও ওই অল হিজাজ ঘরানার পুরো সুরটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলাম না। গানের একটা জায়গায় এসে স্বরলিপিটা আর কিছুতেই ইয়াদ করতে পারলাম না। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। জানা জিনিস যদি মন থেকে হারিয়ে যায়, তবে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। যে গান একবার আমি শুনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হই না। কিন্তু আজ একি হলো আমার! কিছুতেই পুরো গানটা তুলতে পারছি না।

সারা দিন সারা রাত ধরে আমি মনের মধ্যে আওড়াতে থাকলাম সেই সুরটা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

শুধু একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন কেটে গেল, কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে সংগীতের সুর আমি স্মরণে আনতে পারলাম না। সে যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা কি করে বোঝাই। একদিন ঐ গানের হারানো সুর আমাকে ঘর ছাড়া করে পথে নামালো। বাগদাদ, মশুল, বসরাহর বড় বড় ওস্তাদের কাছে গেলাম। কিন্তু কেউই উদ্ধার করে দিতে পারলো না অল হিজাজ ঘরানার সেই বিখ্যাত সংগীতটির স্বরলিপি।

শেষে ঠিক করলাম, মরুপ্রান্তর পার হয়ে মদিনায় চলে যাবো। সেখানে কবির নাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার ঐ গানখানা শুনবো তাঁর মুখ থেকে।

সে সময় আমি বসরাহতে ছিলাম। মন স্থির করেই আমি যাত্রী-নৌকায় চেপে বসবো বলে ঘাটের দিকে রওনা হলাম। পথের মধ্যে দুটি সম্ভ্রান্ত তরুণী আমার পথরোধ করে দাঁড়ালো।

আমি বিরক্ত হলাম মনে মনে। দেশে বিদেশে আমার অনুরক্ত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাদের হাতে পড়ে অনেক সময়ই আমাকে নিগ্রহ হতে হয়। সেইরকমই কিছু একটা হতে পারে ভেবে শঙ্কিত হলাম।

কিন্তু মেয়ে দুটির কেউই আমার গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সাদর অভিনন্দন জানালো না।

আমি ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বললাম, পথ ছাড়ুন, এখন আমার দাঁড়াবার সময় নাই।

মেয়ে দুটি খিলখিল করে হেসে উঠলো, ওস্তাদজী, এরই মধ্যে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যে গানের সুর আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না, তার জন্য সব উদ্যম এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল আপনার?

আমি ভীষণ রেগে উঠলাম, মিথ্যে কথা! একটা গানের কলির জন্য আমি দশটা বছর কাটিয়ে দিতে পারি। একটা কলিতে সুর দিতে গিয়ে আমার এক যুগ কেটে গেছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। কী করে আপনারা ভাবলেন যে,

সুর খোঁজার উৎসাহে ভাটা পড়েছে আমার ? আর তাছাড়া কোন গানের সুরের কথা বলছেন আপনারা ?

অন্যতমা বললো, সেদিন দরবারে আপনি যখন শেখসাহেবের কাছে অল হিজাজ ঘরানার গান শুনতে চাইলেন, তখন আমি পর্দার পিছনে হারেমে বসেছিলাম। আপনাদের সংগে আমিও যে সংগীতসুধা পান করেছি সেদিন। আমি জানি ও আমার বুকের নিধি, ও আমার মুলেখা, এই গানটি গাইতে গিয়ে আপনি সুর হারিয়ে ফেলেছেন। এবং হৃত সুর ফিরে পাওয়ার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু না পেয়ে এরই মধ্যে আপনি নিরাশ হয়ে পড়লেন ?

আমি আর্তনাদ করে উঠি, দোহাই আপনাদের, আপনারা আমাকে পাগল করে দেবেন না। গানের সুর খুঁজতে খুঁজতে আমি যত না উন্মাদ হয়েছি, আপনাদের এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তার চেয়ে বেশি হবো, আশঙ্কা হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার করজোড়ে মিনতি, এ নিয়ে আর আমাকে আঘাত করবেন না। মেহেরবানী করে পথ ছাড়ুন। এখন আমি মদিনায় যাত্রা করবো। ঐ সুর আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

—আমি যদি আপনাকে গানটা শুনিয়ে দিই, তবু আপনাকে মদিনায় যেতে হবে ?

—দোহাই আপনাকে, এভাবে আমার ওপর অত্যাচার চালাবেন না। আমি তো আগেই বলেছি, এই ব্যাপারে প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েছি।

হঠাৎ যুবতীটি গাইতে শুরু করলো। ইশাক স্তম্ভিত হয়ে গেল তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে। শেখসাহেব যে ভাবে গেয়েছিল এ সংগীত তার চেয়ে সহস্রগুণ শ্রুতিমধুর।

এতদিনে আমার মনের ঝড় থামলো। হারানিধিকে খুঁজে পাওয়ার সে যে কী আনন্দ, কী করে বোঝাবো !

গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেয়েটির পায়ের ওপর।

—কে আপনি গুণবতী আমি জানি না, কিন্তু আপনার গান আমার হৃদয়ের সকল সন্তাপ জুড়িয়ে দিতে পেরেছে। এ অমূল্য রত্ন আপনি কী ভাবে আহরণ করেছেন ? যদি আপনি মেহেরবানী করে আমার ঘরে পায়ের ধুলো দেন তবে আমি ধন্য হবো। আপনি শুধু আমাকে মুলেখার গানই শেখাবেন, তার বদলে আমি আপনাকে অজস্র অন্য গান শেখাবো।

মেয়েটি হাসলো, ইশাকজী, আপনার নিজের চরিত্র আপনি ভাল করেই জানেন। আজ পর্যন্ত কেউ আপনার কাছ থেকে একটির বেশি দুটি গান পায়নি। ঐ একটি ছাড়া আপনার ছাত্রছাত্রীরা অন্য যে সব গান গায়, তা অন্য ওস্তাদের কাছে শেখা। আমার আশঙ্কা আপনি আমাকেও একটির বেশি দুটি গান শেখাবেন না। তার চেয়ে ও-শর্ত থাক, আপনি যতক্ষণ না মুলেখার গানখানা ভালভাবে রপ্ত করতে পারবেন ততক্ষণ আমি গেয়ে শোনাবো আপনাকে।

তারপর আমার শেখার পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমি খুশি মনে বিদায় নেব।

ইশাক অধীর হয়ে বলে, আপনি বিশ্বাস করুন ভাল মানুষের কন্যা, যদি চান আমি আপনাকে আমার খুন দিতে পারি। কিন্তু কে আপনি, কী আপনার পরিচয় ?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো অষ্টাশীতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—আমি এক অতি সাধারণ গায়িকা। লোকের মুখে শুনে শুনে আমি গান শিখি। ঝরনার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তার কলতানের মধ্যে আমি সংগীতের সুর খুঁজে পাই। কখনও তরুশাখার পাখীর কূজন কান পেতে শুনি। তার মধ্যেও সুমধুর সংগীত শুনি। আমার নাম ওয়াহবা।

ওয়াহবা আর তার অনুজাকে সাদর আমন্ত্রণ করে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। সারাটা দিন সারাটা রাত্রি ব্যাপী চললো গানের আসর!

সংগীত এবং সুরা স্বল্পসময়ে সম্পর্কের ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

সে রাতে ওয়াহবা আমাকে অনেক দিয়েছিল, আমিও তাকে কম দিইনি। শুধু গানে নয়, দেহ মন প্রাণেও আমরা দুজনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম সে রজনীতে।

ইশাকের কাহিনী শেষ করে যুবকটি অন্য একটি কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

আপনারা জানেন মহম্মদ অল আমিন এবং অল মামুন এরা দুজনে বৈমাত্রেয় ভাই। অল আমিন বেগম জুবেদার এবং অল মামুন খলিফার এক বাঁদী মারজিনের গর্ভে জন্মেছিল।

দুজনের মধ্যে ছিল আজন্মের বৈরিতা।

এক মওকায় অল মামুনের সৈন্যবাহিনী প্রাসাদ আক্রমণ করে খলিফা অল আমিনকে নৃশংসভাবে নিহত করে। এরপর প্রাণভয়ে অল আমিনের সুবাদাররা একে একে অল মামুনের সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অল মামুন নতুন খলিফা হয়ে মসনদে বসলো।

শাসনভার হাতে নিয়েই সে ঘোষণা করে দিল, কারো ভীত হওয়ার

কোনও কারণ নাই। সকলে নির্ভয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমি তোমাদের রক্ষা করবো। এজন্য কাউকে তাদের পূর্ব অপকর্মের জন্য কোনও রকম সাজা দেওয়া হবে না।

এইভাবে সে সকল বাধা অতিক্রম করে প্রজাদের প্রিয় বাদশাহ হতে চাইল। যতদিন অল আমিন জীবিত ছিল ততদিন সে কিছুতেই খলিফা হারুন অল রসিদের মন ভেজাতে পারেনি। তার উপর ছিল বেগম জুবেদার কড়া দৃষ্টি।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে বেগম জুবেদা ভেঙ্গে পড়লেন। এবার তাঁর সৎ ছেলে মামুনের হাতে তাঁকে হেনস্তা হতে হবে সন্দেহ নাই। কোনও দিনই তাকে তিনি সুনজরে দেখতে পারেননি, সে সব কথা কি অল মামুন বিস্মৃত হতে পারে? এবার মওকা মিলেছে। যথাযোগ্য প্রতিশোধ নিতে সে কসুর করবে না। সুতরাং এ প্রাসাদে না থেকে তিনি মক্কায় গিয়ে বাকী জীবন কাটাবেন ঠিক করলেন।

নতুন খলিফাকে একখানা চিঠি লিখলেন তিনিঃ

'ধর্মাবতার, যদিও প্রমাদবশতঃ আপনি আমার প্রাণাধিক পুত্রকে হত্যা করেছেন, তবু আমি জানি আমার মতো আপনারও কোমল হৃদয় এই কারণে দগ্ধ হচ্ছে নিয়ত। আপনার মহত্ত্বের কাহিনী সুবিদিত। সুতরাং এই একটি মাত্র ভুল আপনার জীবনে কালিমা লেপে দিতে পারবে না। সে আজ নাই, জানি তার অপরাধ অসীম ছিল, কিন্তু আপনি নিজগুণে তাকে মার্জনা করে দেবেন, এই আমার প্রার্থনা।

আপনি যদি আমার প্রতি একটু অনুকম্পা দেখান, ধন্য হবো আমি। যদিও আপনার করুণা পাওয়ার অধিকারিণী আমি নই, তবু প্রার্থনা করবো আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার পিতার কথা স্মরণ করুন, তিনি আমাকে মাথার মণি করে রেখেছিলেন, তাঁর প্রতি কিছু সম্মান প্রদর্শনের জন্যও আপনি আমার প্রতি নির্মম হবেন না, এই প্রার্থনা করি।

বেগম জুবেদার এই কাকুতি-ভরা পত্রখানি পাঠ করে অল মামুন করুণায় আর্দ্র হয়ে কাঁদে। আহা, তিনি বড়ই অভাগিনী। একদিন যাঁর প্রতাপে সমস্ত সলতানিয়ত টলমল করে কাঁপতো, তিনি আজ ভিখারিণী হয়ে গেছেন।

মাগো, আপনার চিঠির কথাগুলো আমাকে শূলের মতো বিদ্ধ করেছে। আপনি মা, আপনার আদেশই এতকাল মান্য করে এসেছি সভয়ে। আজ একি কথা লিখেছেন মা? আপনার কোনও অসম্মান, সে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আপনার অসীম ক্ষমতার একবিন্দু তো আমি হরণ করিনি? অবে আপনি কেন এমন দীন দরিদ্রের মতো আমার কৃপা প্রার্থনা করছেন। আপনি মহিয়সী মা, আপনার সঙ্গে অন্য কারো কোনও তুলনা হয় না, আপনি আপনার স্বীয় সম্মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন আজীবন। আপনি আমাকে আদেশ করবেন মা, পুত্র সব সময়ই জননীর আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। আপনি আমার গর্ভধারিণী নন, কিন্তু আমার পিতা আপনার স্বামী। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার মা-এর চেয়ে আপনাকে কখনও আমি ছোট নজরে দেখিনি।

মানুষ নিয়তির দাস। যা ঘটে গেছে তা ঘটবে বলেই অনিবার্য ভাবে ঘটেছে। এ নিয়ে শোকতাপ করে আর কী হবে। তার আত্মার মঙ্গল কামনা ছাড়া এখন আর করণীয় কিছু নাই। আপনার বুকভাঙ্গা দুঃখ বেদনা আমি অনুভব করতে পারি মা। আমাকে দিয়ে যদি সে দুঃখের কিছুটাও লাঘব হয়, আমি প্রাণপণ করে তা করার চেষ্টা করবো।

আপনার যে সব সম্পত্তি, ঘর বাড়ি প্রাসাদ ইমারত এবং জমি-জমা আমার দপ্তর বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেগুলো আবার যাতে আপনি ফিরে পান তার জন্য আগেই আমি হুকুম পাঠিয়ে দিয়েছি।

আপনি যদি সব সংশয় ভুলে আমাদের মধ্যে এসে বসবাস করেন তার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। আপনি জেনে রাখুন মা, আপনার একটি পুত্রের ইন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু আরও এক পুত্র জীবিত, সে আপনার দাসানুদাস হয়েই থাকতে চায়। তার মুখের দিকে চেয়ে কি মৃত পুত্রের শোক কিছুটা ভুলতে পারবেন না? মা গো, এই অধম পুত্রকে অন্ততঃ একবার সুযোগ দিন, সে প্রমাণ করবে আপনার গর্ভজাত পুত্রের চেয়ে সে কোন অংশে কম মাতৃভক্ত নয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো চুরানব্বইতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

চিঠি পেয়ে বেগম জুবেদা এসে অল মামুনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলেন। অল মামুন দুহাত বাড়িয়ে তাকে তুলে ধরে কর-চুম্বন করে বললো, ছিঃ মা, আপনি এ কি করলেন! আমি আপনার সন্তান, এতে কি আমার পাপ হবে না? আপনার কোনও রকম অমর্যাদা আমি হতে দেব না মা। এতে আমার মৃত পিতার আত্মা শান্তি পাবে না।

কিন্তু অল মামুনের ভরসা বাক্যেও আশ্বস্ত হতে পারে না জুবেদা বেগম। কেবলই তার মনে হতে থাকে শৈশবে কৈশোরে সে আপন গর্ভজাত পুত্র অল আমিনকে প্রাণভরা আদর ভালবাসা দিয়েছে আর অল মামুনকে দিয়েছে ঘৃণা অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা। তার এই ব্যবহার বৈষম্য কি হঠাৎ আজ অল মামুন ভুলে যাবে? বিশ্বাস করা শক্ত।

এ ব্যাপারে খলিফা হারুন অল রসিদও জুবেদাকে বহুবারই শর্ত করে দিয়েছিলেন। দুই পুত্রকে সম দৃষ্টিতে দেখাই তার উচিত। কিন্তু জুবেদা সে তিরস্কারও গ্রাহ্য করেনি কখনও।

এরপর একদিন খলিফা অল মামুন বেগম জুবেদার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে নজর করলো। বেগমসাহেবা অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন আওড়ালেন।

অল মামুন বললো, মা, আপনি আমাকে দেখে কি অভিশাপ দিলেন? কিন্তু

বিশ্বাস করুন মা, আপনার ছেলের মৃত্যুর জন্য আমার কোনও হাত ছিল না। পার্শিরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার পুত্রকে নিহত করে আমাকে মসনদে বসিয়েছে।

জুবেদা জিভ কেটে বললেন, না বাবা না, ওসব কথা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে আসেনি। তুমি আমার সন্তান, তোমাকে শাপ-শাপান্ত করবো আমি? সে কি করে ভাবলে বেটা?

—তা হলে বিড়-বিড় করে কী বলছিলেন মা?

থতমত খেয়ে গেলেন জুবেদা। ঠিক সেই মুহূর্তে মুখে কোনও জবাব জোগালো না। মাথাটা নিচু করে বললেন, সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, বাবা।

কিন্তু অল মামুন তখন ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। না শুনে সে ক্ষান্ত হবে না। বার বাই সে জুবেদাকে বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলো।

অবশেষে জুবেদা ফেটে পড়লেন, নিতান্তই যদি শুনতে চাও তবে শোনা বাবা, হ্যাঁ, আমি তখন অভিশাপই দিচ্ছিলাম। তবে তোমাকে নয়—আমি নিজেকে। সেদিনের একটিমাত্র নির্বুদ্ধিতার জন্য আজ এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল আমার জীবনে। ঐ অভিশপ্ত ঘটনাটা যদি না ঘটতো সেদিন, তবে আজ আমার বুকের পাঁজর অল আমিনকেও হারাতে হতো না।

—কী সে ঘটনা মা?

অল মামুন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে জুবেদাকে।

—তবে শোন, জুবেদা অশান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, সেদিন কি তিথি নক্ষত্র ছিল জানি না, আমার স্বামী খলিফা হারুন অল রসিদ এলেন আমার ঘরে। এসেই আমার সঙ্গে দাবায় বসলেন। তুমি অবশ্যই জান, দাবাখেলার ওপর ওঁর একটা বিশ্রী রকমের ঝোঁক ছিল। তবে ও খেলাটা তিনি অত্যন্ত আপনজন ছাড়া কারো সঙ্গে খেলতেন না।

খলিফা আমাকে হারাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আমি ছেড়ে দেবার পাত্রী নই। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। হারুন অল রসিদ আমাকে বললেন, তুমি হেরে গেছ যখন তোমাকে তার সাজা পেতে হবে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে এই প্রাসাদ থেকে হেঁটে বাগানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে।

তখন প্রায় শেষ রাত। আমি লজ্জায় মরে যাই, একি খলিফার খামখেয়াল! তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু তিনি আমার সব আবেদন নিবেদন এক কথায় খারিজ করে দিয়ে বললেন, না, না, আমি যা বলেছি তার নড়-চড় হবে না।

সুতরাং আমি বাধ্য হয়ে তাঁর খেয়াল চরিতার্থ করলাম সেই রাতে। যখন আমি বাগান থেকে ফিরে এলাম তখন আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। সারা শরীর আমার হিম হয়ে আসতে লাগলো। ঘরে এসে আধমরা হয়ে পড়ে রইলাম পালঙ্কশয্যায়।

পরদিন আবার দাবার আসর বসলো। সেদিন কিন্তু আমি জিতলাম। প্রতিশোধ-স্পৃহা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বললাম, আজ আমি যে সাজা দেব, তাই মাথা পেতে নিতে হবে আপনাকে।

খলিফা বললেন, বান্দা প্রস্তুত। হুকুম করুন বেগমসাহেবা।

প্রতিহিংসায় তখন আমি দিশাহারা, বললাম, হারেমের রসুইখানার ঐ কালো কুৎসিত নোংরা নফরাণী মারজিলকে জড়িয়ে ধরে আজকের রাতটা কাটাতে হবে আপনাকে।

খলিফা শিউরে উঠলেন, কিন্তু বুঝলেন আমার মত পালটানো যাবে না, তাই তিনি মুখে আর কিছু বললেন না। সোজা চলে গেলেন রসুইখানায়।

পরদিন সকালে খলিফার মুখের দিকে আর তাকাতে পারা গেল না। সারা রাত ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন, তা তাঁর চোখে-মুখেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। খুব গম্ভীর মুখে একটিও কথা না বলে, আমার সামনে থেকে চলে গেলেন তিনি।

সেই আমার কাল হলো। ঐ জঘন্য নোংরা সহবাসের ফলে জন্ম হলো তোমার।

আমি কি আহাম্মক, নিজে ডেকে আনলাম আমার সর্বনাশ. সেই রাতেই আমার প্রিয় পুত্র অল আমিনের ঘাতকের ভ্রূণ সৃষ্টি হলো।

আমার গোঁ ছাড়া এমনটা কিছুতেই ঘটতে পারতো না।

আমাকে যদি না তিনি উলঙ্গ করে বাগানে পাঠাতেন তাহলে আমিও নিশ্চয়ই ঐ নীচ সহবাস করার জন্য তাঁকে রসুইঘরের এক নোংরা চাকরাণীর ঘরে পাঠাতাম না।

এজন্য নিজেকে ছাড়া আর কাকে দোষ দেব বাবা। এজন্য অভিশাপ যদি দিতে হয়, নিজেকেই দেব, তোমাকে নয়।

অল মামুন আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াতে পারলো না। ছুটে বেরিয়ে গেল জুবেদার সামনে থেকে।

নিজের মনেই সে ভাবতে থাকে আজ যদি বার বার করে বেগমসাহেবার কাছ থেকে জানতে না চাইতাম, তবে তো আমার নিজের জন্ম ইতিহাস অজ্ঞাতই থেকে যেত আমার কাছে।

কাহিনী শেষ করে ধনী যুবক, বন্ধুগণ, আমার মনে হয় আল্লাহর দোয়ায় আমি আপনাদের কিছু আনন্দের বিধান করতে পেরেছি এই গল্পগুলো শুনিয়ে। আজ আর নয়, অন্য একদিন আবার আপনাদের আরও ভাল কাহিনী শোনাবো।

এরপরে উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে এক স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী তুলে দিল।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে অধোবদন হয়ে রইল। সুলতান শাহরিয়ার খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, শাহরাজাদ, অপূর্ব তোমার কাহিনী। এসব গল্পের সার কথা জীবনের চলার পথের পরম পাথেয়। যাই হোক, এবার

উজির জাফর সম্বন্ধে কিছু শোনাও। অনেক দিন ধরেই তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী শোনার জন্য আমার খুব বাসনা। তার মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ একজন প্রধান উজিরই আমি সন্ধান করছি বহুকাল যাবৎ। কিন্তু ঐ রকম গুণবান ব্যক্তি কি ভুরি ভুরি মেলে?

শাহরাজাদ মাথা হেঁট করে বললো, আপনি জাফরের জীবনের সব কাহিনী শোনার জন্য আমাকে হুকুম করবেন না, জাঁহাপনা, সে বড়ই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। চোখের পানিতে ভেসে যাবে বুক, ব্যথায় ভেঙ্গে যাবে পাঁজর।

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, তা হোক, তুমি বল, আমি শুনতে চাই।

শাহরাজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে খোদা আমাকে রক্ষা করুন।

তারপর শাহরাজাদ বলতে শুরু করে:

এই দুঃখদায়ক রক্তঝরা কাহিনী বলতে আমার বুক কেঁপে উঠছে। খলিফা হারুন অল রসিদের সময় কালের কাহিনী এটা। যত রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাতে চারটি নদীতে বান ডেকে যেতে পারতো।

আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন জাঁহাপনা, উজির জাফররা চার ভাই। তার বাবা ইয়াহিয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাকও সুলতানের উজিরপদে বহাল ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

জাফরের বড় ভাই অল ফাদল ও অল রসিদ একই স্তন্যে পালিত হয়েছিল। তার কারণ খলিফার পরিবারের সঙ্গে বারমাকী পরিবারের বহুকালের বন্ধুত্ব সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। অল রসিদের মা খাইজারান এবং ফাদল-এর মা-এর মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। সেই সূত্রে শিশুকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত অল রসিদের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ইয়াহিয়ার বাড়িতে। অল ফাদলের সঙ্গে একই মায়ের স্তন্য পান করে ওরা দুটিতে মানুষ হয়েছিল। এই কারণে অল রসিদ ইয়াহিয়াকেও বাবা বলে ডাকতেন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো পঁচানব্বইতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

এই বারমাকীরা খুরাসনের বলখ্ শহরে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা যশ খ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তির শিখরে উঠেছিলেন। হজরত মহম্মদের প্রবর্তিত হিজরা সনের কম বেশি একশো বছরের মধ্যে এই খ্যাতি তাঁরা লাভ করতে

পেরেছিলেন।

এরপর বারমকীরা দামাসকাসে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তখন বাদশাহ উমর মসনদে আসীন ছিলেন।

সুলতান হাসিমের শাসনকালে বারমাকী পরিবারের প্রধান মাজিয়ান ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

কিন্তু আব্বাস-বংশই সর্বপ্রথম বারমাকীদের বাদশাহী সম্মানে ভূষিত করেছিল। খালিদ ইবন বারমাকই সর্বপ্রথম আবুল অল আব্বাসের প্রধান উজির পদে বহাল হয়েছিলেন। এবং আব্বাসের তৃতীয় পুরুষ সুলতান মাহদী বারমাকী ইয়াহিয়াকে অল রসিদের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। অল রসিদের জন্মের মাত্র সাত দিন আগে ইয়াহিয়া-পুত্র অল ফাদলের জন্ম হয়েছিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল হাদীর আকস্মিক মৃত্যুতে অল রসিদ খলিফা হয়েই প্রথমে ইয়াহিয়াকে প্রধান উজিরে বহাল করলেন। ইয়াহিয়া তাঁর দুই পুত্র অল ফাদল এবং জাফরকে তাঁর সহকারী উজির করে পাশে পাশে রেখে শিক্ষাদান করেছিলেন। এর ফলে খলিফার শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে লাগলো। প্রজারা খলিফার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

এই সব কারণে বারমাকীরা সুলতান-পরিবারে একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এবং ইয়াহিয়া ও তাঁর পুত্ররা কালক্রমে অসীম ক্ষমতার অধিকার অর্জন করতে পেরেছিল। সারা সলতানিয়ত তাঁদের আঙ্গুলের ইশারায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এবং হারুন অল রসিদের কালেই খলিফা বংশ খ্যাতি ও শৌর্যবীর্যের শীর্ষে পৌঁছতে পেরেছিল।

কবি আবু নবাস তাই লিখেছেন ঃ

যতকাল চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা জ্বলবে।
তোমাদের কীর্তিকথা মুখে মুখে চলবে ।।

ও‍ঁরা সকলেই স্বনামধন্য, জনপ্রিয়, জ্ঞানবান বিচক্ষণ উজির হতে পেরেছিলেন। ও‍ঁরা ছিলেন দেশের ও দশের গর্বের বস্তু। ও‍ঁরা ছিলেন দেশের মহামূল্য রত্ন। কর্তব্যে বজ্রাদপি কঠোর এবং বাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল ছিল তাঁদের হৃদয়। অমন জ্ঞানবৃদ্ধ এবং সৎ পরামর্শদাতা আর জন্মাবে না। ও‍ঁদের উদারতা এবং মহত্ত্ব হাতিমতাইকে মনে করিয়ে দেয়। ও‍ঁরা শান্তির পারাবার ছিল।

শুধু এই-ই সব নয়, ও‍ঁদের অসামান্য সমর-কুশলতায় খলিফা অল রসিদ তাঁর সলতানিয়তের পরিধি একদিকে মধ্য এশিয়ার সমতল থেকে সুদূর উত্তরাঞ্চলের অরণ্যভূমি, অন্যদিকে মরোক্কো এবং আন্দালুসিয়া থেকে চীন সীমান্ত এবং তাতার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর হঠাৎ একদিন বারমাক-সন্তানরা চরম খ্যাতির চূড়া থেকে ধপাস করে পড়ে গেলেন একেবারে মরণ-খাদে। ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, একদিন যাঁরা এক বিশাল সলতানিয়তের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়েছিলেন, যাঁরা

এক সময়ে সুলতানের প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা সব খুইয়ে বসলেন।

একদিন অল রসিদ মক্কা থেকে ফিরে এসে নৌকায় চেপে আনবার শহর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এবং পথের মাঝখানে তিনি অল উমরের এক সেনাবাসে রাত্রি কাটালেন। তাঁকে আদর আপ্যায়নের জন্য খানাপিনার এলাহী ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে।

কিন্তু এই সময়ে খলিফার নিত্য সহচর জাফর সঙ্গে ছিল না। দিনকয়েক আগে সে শিকারে গিয়েছিল নদীর ধারের এক জঙ্গলে। খলিফা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। তখুনি তাঁর নির্দেশে বনে জঙ্গলে দূতবাহিনী পাঠানো হলো। যেখানেই থাক, আজ রাতের মধ্যেই তাকে নিয়ে আসতে হবে খলিফার কাছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাফর এসে খলিফাকে সঙ্গ দান করেছিল সে রাতে।

সেদিন খলিফার সঙ্গে ছিল তাঁর একান্ত হকিম জিব্রিল বখচিয়াসু, প্রিয় অন্ধ কবি আবু জাফর। খলিফা ওদের বললেন, জাফর অসুস্থ। তোমরা ওকে নিয়ে একটু আমোদ প্রমোদ কর।

তখন রাত বেশি হয়নি, সান্ধ্য আহার শেষ করে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন জাফর। অন্ধ গায়ক ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে হাল্কা রসের গানে বেশ জমিয়ে তুলেছে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো ছিয়ানব্বইতম রজনী:
আবার সে বলতে থাকে:

হঠাৎ খলিফার দেহরক্ষী উদ্যত খড়্গ হাতে এসে জাফরের সামনে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়ালো! চোখে মুখে তার ক্রোধের ছাপ।

জাফর বেশ অবাক হয়ে তাকালো, মাসরুরকে সে আশৈশব থেকে জানে। কখনও তার বিনয় নম্র ব্যবহারে এমন ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত। হঠাৎ একি [illegible]া? বলা নাই কওয়া নাই, হুট করে সে ঢুকে পড়লো তার তাঁবুতে! মাসরুর [illegible]তো কখনও এমনটা করে না। উজিরের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সালাম কুর্নিশ জানাতে কখনও সে ভুল করে না। কিন্তু আজ একি তার অবিনয়ী উদ্ধত মেজাজ? একবার সে মাথা নোয়ালো না?

জাফর নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে মাসরুরকে স্বাগত জানায়, এই যে মাসরুর, এস এস। তোমাকে দেখলেও আহ্লাদ হয়! কিন্তু মাসরুর ভাই, ব্যাপার কী বলতো, আজ তোমাকে যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত দেখছি? এই প্রথম দেখলাম, তুমি আগে খবর না পাঠিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছ আমার কামরায়।

মাসরুর বললো, ব্যাপার বড় খারাপ, ওসব আদব কায়দা দেখাবার মতো

সময় নাই আমার। সুলতানের হুকুম, এই মুহূর্তে তোমার শির নিয়ে গিয়ে হাজির করতে হবে তাঁর সামনে। না, আর দেরি নয়, জাফর, ওঠ, চল বাইরে চল।

জাফর উঠে দাঁড়ালো।

—একমাত্র খোদা ছাড়া আর ভরসা নাই। তাঁর কাছ থেকে আমরা এসেছি এ দুনিয়ায়, আবার তাঁর চরণেই ফিরে যেতে হবে সময় হলে, চল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জাফর মাসরুরকে বললো, আমার কি মনে হয় জান মাসরুর, জাঁহাপনা মাত্রাধিক সুরাপান করে বেহেড হয়ে গিয়ে তোমাকে এই সব বলেছেন। কাল সকালেই দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন খলিফার কাছে ফিরে যাও, দেখবে একটু আগে তিনি যা হুকুম করেছেন এখনই তা আর স্মরণ করতে পারবেন না।

মাসরুর বললো, সে হয় না। হয় তোমার শির নিয়ে যাবো, না হয় আমার শির দিতে হবে। কাজ অসমাপ্ত রেখে আমি ফিরে যেতে পারবো না। তোমার যা শেষ কথা বলার আছে তুমি একখানা খতে লিখে দাও, আমি অবশ্যই সেখানা পেঁৗছে দেব তাঁর হাতে। তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের বন্ধুত্ব। সেই কারণে তোমার এইটুকু উপকার আমি করতে পারি, জাফর।

জাফর বললো, দেখ আমরা আল্লাহর বান্দা। আমাদের শেষ ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে নাই। সুতরাং লেখারও কোনও প্রশ্ন আসে না। আল্লাহ খলিফাকে দীর্ঘজীবি করুন, এই আমার শেষ বাসনা জাফর। আর কিছু বলার নাই। এবার তোমার কাজ তুমি সমাধা কর।

তাঁবুর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকালো জাফর। আর সেই মুহূর্তে মাসরুরের শাণিত খড়্গের একটি আঘাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তার মুণ্ডটা।

এরপর আজ্ঞাবহ মাসরুর জাফরের কাটা মুণ্ডটা একখানা রেকাবীতে করে বয়ে এনে খলিফার সামনে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিল। খলিফা উঠে এসে একটু নিচু হয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন জাফরের ছিন্ন মস্তকটি। তারপর থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন তার মুখের উপর।

এতেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না! তখনই হুকুম জারী করে দিলেন, জাফরের দেহটাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে বাগদাদের বড় সেতুর এক প্রান্তে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আর অন্য প্রান্তে ঝুলতে থাকবে তার এই মুণ্ডটা।

অপরাধের সাজা হিসাবে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক অপরাধীকেই। কিন্তু এমন মর্যাদা হরণ খুব কম হতভাগ্যেরই জীবনে বা মরণে হয়েছে এর আগে।

সুলতান আরও হুকুম-নামা জারি করলেন; ছয়মাস কাল ধরে জাফরের ধড় আর মুণ্ড বড় সেতুর এপার ওপারে ঝুলতে থাকবে। তারপরও যদি কোনও দেহাবশেষ থেকে যায় তবে তা গাধার গোবরের ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করবে। এবং সেই ছাই পায়খনার চাড়িতে চাড়িতে ছুঁড়ে দেবে।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! খাজাঞ্চীখানার তহবিলদার তার হিসাবের

খাতায় বারমাকী পরিবারের পাতায় যেখানে একবার লিখেছিল, ধর্মাবতারের নির্দেশে মহামান্য উজির জাফরকে জমকালো শাহী সাজ-পোশাক ও অন্যান্য উপহার দেওয়া বাবদ খরচ চার লক্ষ স্বর্ণ দিনার, ঠিক তার নিচেই আর এক ছত্রে সে লিখলো সেদিন, কাঠ খড় এবং গাধার গোবর দিয়ে জাফরের দেহ পুড়িয়ে ছাই করা বাবদ খরচ দশ দিরহাম।

এইভাবে জাফরের জীবনান্ত ঘটেছিল। প্রায় সারাটা জীবন সে খলিফার একমাত্র পরম প্রিয় বন্ধু, পথপ্রদর্শক, সৎ পরামর্শদাতা রূপে উচ্চাসনে আসীন ছিল। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে কোথায় উবে গেল সেই প্রেম মহব্বৎ ভালবাসা? এমন মহৎ প্রাণের কি এইভাবেই শেষ পরিণতি ঘটে?

পরদিন প্রত্যুষেই পেয়াদারা জাফর পিতা ইয়াহিয়া এবং অল ফাদলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল। খলিফার নির্দেশে তাদেরও হত্যা করা হলো। বারমাকী পরিবারের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন খলিফা। এই ইয়াহিয়া তাঁর শৈশবের শিক্ষক। তাকে তিনি পিতা সম্বোধন করে ডাকতেন। আর অল ফাদল—তার সঙ্গে তো তিনি এক মায়ের বুকের দুধ ভাগ করে খেয়েছেন।

ইয়াহিয়া পরিবারের বাকী সকলকে বন্দী করে এনে অন্ধকার কূপ-কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। এদের সংখ্যাও সহস্রাধিক। সবাই নিষ্পাপ নিরীহ মানুষ। কারো বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের অভিযোগ ছিল না।

আর যারা পড়ে রইল তারা গৃহ সম্পদ-হারা ভিখারী হয়ে পথে পথে ফিরতে লাগলো। তাদের অনেকেই অনাহারে মারা গেল, কেউ বা আত্মসম্ভ্রম বাঁচাতে গলায় দড়ি দিতে আত্মহত্যা করলো। কিন্তু ইয়াহিয়া, তার পুত্র অল ফাদল এবং মহম্মদকে নির্মম নিপীড়ন করে হত্যা করা হয়েছিল।

শাহরাজাদ এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করলো। জাঁহাপনা, আপনার নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে ইচ্ছে করছে। তা হলে শুনুন:

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে একদিন অল রসিদের কনিষ্ঠ ভগ্নী আলিয়াহ বড় ভাইয়ের কাছে এসে বললো, ধর্মাবতার, অনেক দিন ধরে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো করবো ভাবছি, কিন্তু সাহস পাই না।

খলিফা হারুন অল রসিদ ভগ্নীকে কাছে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী কথা বোন, নির্ভয়ে বল।

আলিয়াহ বললো, জাঁহাপনা, জাফরের মৃত্যুর পর একটা দিনও তোমাকে

সুস্থির শান্ত হতে দেখলাম না। এমন কী সে করেছিল যার জন্য আজও তোমার ক্রোধ প্রশমিত হলো না ?

অল রসিদের সারা মুখে কালো মেঘ নেমে আসে। ভগ্নীকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলে, ওসব কথা জেনে তোমার কী ফয়দা হবে ? সে কথা মনে হলেই আমার মন অশান্ত হয়ে ওঠে। যাও অন্দরে যাও।

এই বলে খলিফা বোনকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ পর্যন্ত যত ঐতিহাসিক গবেষক এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে যে সব তথ্য দাঁড় করিয়েছেন, তাদের একজনের সংগে অন্য জনের বড় একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের বক্তব্যই আলাদা ধরনের।

এখানে তার দু একটা নমুনা তুলে ধরছি ঃ

কেউ বলেন, খলিফা হারুন অল রসিদ শেষ পর্যন্ত জাফরের স্বেচ্ছাচারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। শেষের দিকে নাকি জাফরই বকলমে সুলতানের কার্যভার পরিচালনা করতো। বাইরের কোনও ব্যক্তি সরাসরি খলিফার কাছে তাদের আর্জি পেশ করতে পারতো না। যা কিছু বক্তব্য আগে জাফরের কাছে পেশ করতে হতো। সাধারণতঃ সে-ই ফরমান দিয়ে দিত। কখন সখনও সে খলিফার কাছে দু-একজনের অভাব অভিযোগ পাঠাতো মাত্র। খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন, জাফর তাঁকে কোণ-ঠাসা করে ফেলছে।

দরবারের সমস্ত উচ্চপদে জাফর তার পরিবারের আপনজনদের নিয়োগ করেছিল। শুধু দরবারে বা দপ্তরেই নয়, সেনাবাহিনীর প্রধান খুঁটিগুলোতেও ছিল তার নিজের লোক। এছাড়া সরকারী অর্থ আত্মসাতেরও নাকি অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জাফরের সময়কালে বারমাকী পরিবারের বিষয় সম্পদের পরিমাণ নাকি সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

অল রসিদের ব্যক্তিগত হকিম জীবরিলের জবানবন্দী থেকে এই তথ্য জানা যায় ঃ

একদিন আমি অল রসিদের টাইগ্রীস তীরের প্রমোদ-ভবনে আহূত হয়েছিলাম। বারমাকী পরিবার বাস করতো নদীর অপর তীরে। মাঝখানে শুধুমাত্র নদীটির ব্যবধান।

কথা প্রসঙ্গে খলিফা আমাকে বললেন, এখন আমি আর শাসন কাজ বড় একটা নিজে দেখা শুনা করি না। সবই তুলে দিয়েছি জাফরের হাতে। ওরা আমাদের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র নয়, আমাদের আব্বাস বংশের বহুকালের পরম সুহৃদও বটে। ওরা আমার কাঁধ থেকে সব বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। আমি এখন মুক্ত বিহংগের মতো নীলাকাশে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াই। কোনও চিন্তা ভাবনা দায় দায়িত্ব আমার এখন নাই।

কিন্তু অন্য আর একদিন এই খলিফাই আমাকে বললেন, বারমাকীদের বাড়াবাড়িতে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করছি হকিম। ইয়াহিয়া আর তার পুত্ররা আমার সলতানিয়তের শাসন পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে নিয়ে আমাকে যেন দিন দিন দূরে ঠেলে দিতে চাইছে। আমার যেন কেবলই মনে

হচ্ছে ওরাই আসল শক্তি, আমি যেন ওদের হাতের পুতুল মাত্র।

খলিফার মুখ থেকে শোনার পর থেকে নিশ্চিত বুঝতে পারলাম বারমাকী পরিবারদের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে এসেছে।

অন্যত্র ঐতিহাসিক বলেন, বারমাকী পরিবারের সৌজন্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে জাফরের তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীরাই খলিফার কানে বিষ ঢালতে শুরু করেছিল। কারণে অকারণে তারা মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে খলিফার কাছে গিয়ে বারমাকীদের সম্বন্ধে লাগান ভাণ্গান করতো।

আবার অন্য এক গবেষকের অভিমতঃ একদিন খলিফা জাফরকে নির্দেশ করেছিলেন, অতি গোপনে মহম্মদের কন্যা ফতিমা ও আলীর একমাত্র বংশধর সাঈদ ইয়াহিয়া ইবন আবদাল্লা অল হুসেনকে খতম করে ফেলতে হবে। জাফর নাকি খলিফার সে আদেশ পালন না করে আলি বংশধরকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করতে সহায়তা করেছিল। খলিফা এই লোকটিকে আব্বাস বংশের বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মনে করতেন।

খলিফা যখন জাফরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর হুকুম তামিল করা হয়েছে কিনা, তখন জাফর মিথ্যা ভাষণ করেনি তার কাছে।

—আমি যা করেছি তা আমার প্রভুর মঙ্গলের জন্যই করেছি, জাঁহাপনা।

—বাঃ চমৎকার, বেশ ভালই করেছ, জাফর।

সুলতান মনের ক্রোধ চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে জাফরকে মিথ্যা বাহবা দিলেন। কিন্তু সেইখানেই মনে মনে বললেন, তোমার এত বড় স্পর্ধা, মরবার পাখা গজিয়েছে?

আর এক ঐতিহাসিক বলেছেনঃ বারমাকীদের পতনের আসল কারণ ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামীর মূলে তাদের কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হওয়া। বারমাকীরা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগে বলখ্-এ বসবাস করতো। তখন ওরা মাজিয়ান ধর্মী ছিল। মাজিয়ানরা পুতুল পুজায় বিশ্বাস করতো।

খুরাসান অভিযানের সময় জাফর তার সৈন্যবাহিনীকে মাজি মন্দির এবং দেবদেবীদের ধ্বংস না করতে নাকি নির্দেশ দিয়েছিল। এ সংবাদ খলিফা হারুন অল রসিদের কানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। এরপর থেকে ইসলামে বারমাকীদের আস্থা সম্বন্ধে খলিফার মনে গভীর সংশয় জাগে।

বারমাকীদের পতনের আরও কিছু কিছু যুক্তিবহ তথ্য তুলে ধরেছেন ইবন খলিকান এবং ইবন অল আখির। তাঁরা বলেছেন—

খলিফা হারুন অল রসিদের এক ভগ্নী ছিল। তার নাম আব্বাসা। তার মতো রূপবতী রমণী সে সময়ে আর দুটি ছিল না। বড় হয়ে খলিফা স্বয়ং এই নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিলেন। আব্বাসাকে না দেখে তিনি এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারতেন না। দরবারে অথবা বিশ্রাম কক্ষে যেখানেই থাকতেন খলিফা সব সময় আব্বাসাকে কাছে কাছে রাখতেন।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। আব্বাস বংশের এক কন্যা সব

সময় নিজের স্বামী ছাড়া অন্যের সাথী হয়ে দিন কাটাবে—তা হয় না।

অবশেষে খলিফা একদিন জাফরকে তার হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনার কথা জানালেন।

—আমি ইচ্ছা করি জাফর, তুমি আব্বাসাকে শাদী কর। কিন্তু একটা শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে। আব্বাসার সঙ্গে তোমার কোনও দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না। একমাত্র আমার উপস্থিতিতে তোমরা একত্র হতে পারবে।

জাফর সুলতানের একান্ত অনুরক্ত উজির। সে বললো, আপনার অভিলাষ আমি পূরণ করবো, জাঁহাপনা।

শাদীর পর প্রতিদিন আব্বাসার সঙ্গে জাফরের সাক্ষাৎ হয় খলিফার দরবারে বা বিশ্রামকক্ষে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই ব্যবস্থায় অল রসিদ পুলকিত হলেও নব পরিণীতা দম্পতি বিশেষ প্রসন্ন হতে পারলো না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম প্রণয়ের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি একেবারেই অবাঞ্ছিত। যদিও জাফর সুলতানকে খুশি রাখার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারছিল, কিন্তু নব-যৌবন-উদ্ভিন্না আব্বাসা এ অত্যাচার বরদাস্ত করতে চাইলো না। একদিন সে গোপনে চিঠি লিখে পাঠালো জাফর-মাতা ইতাবার কাছে।

—মা, আজ আমি আপনার পুত্রবধূ। আপনার পুত্র জাফর বিধিসম্মত ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছেন। এরপর আমি আর এই প্রাসাদে অবস্থান করতে চাই না। আপনি আমাকে বরণ করে ঘরে নিন, এই আমার একমাত্র সাধ। তাঁর আর দশটা বাঁদীর পাশে আমাকেও একটু জায়গা করে দিন।

ইতাবা কিন্তু গোপন বিবাহ মঞ্জুর করলো না। আব্বাস বংশের কন্যা তাদের ঘরে বাঁদী হয়ে আসবে, সে কী কথা? এতে যে সারা দেশে ঢি ঢি পড়ে যাবে। এবং খলিফার রুদ্ররোষে পড়তে হবে তাদের! তাই সে জবাব লিখে পাঠালো, আমার এখানে পুত্রবধূ হয়ে আসা এবং থাকা তোমার পক্ষে উচিত হবে না।

এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো আব্বাসা। সে হুমকী দিয়ে লিখলো, আমি যাবোই, তাতে যদি দুনিয়া রসাতলে যায় যাবে। কিন্তু আমার বিধিসম্মত বিবাহিত স্বামীর দাবি আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তার জন্যে যদি আমাকে ফাঁসীতেও ঝুলতে হয়, ঝুলবো।

সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি জানাতে বাধ্য হলো ইতাবা।

আব্বাসাকে সে গোপনে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। রঙ চঙ মাখিয়ে একেবারে নতুন একটি বাঁদী সাজিয়ে হাজির করলো জাফরের সামনে। জাফর

তখন নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, আব্বাসাকে দেখেও চিনতে পারলো না। ইতাবা বললো, আজকের বাঁদী বাজার থেকে তোর জন্যে পছন্দ করে কিনে এনেছি, বাবা।

জাফর বললো, বেশ তো শাদীর পাট চুকিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি। আজই মধু-যামিনী যাপন করা যাক।

সেই রাতে বাসরঘরে জাফর আব্বাসাকে বিবস্ত্রা হয়ে কাছে আসতে বললো।

আব্বাসা বললো, আচ্ছা মালিক, শাহজাদীদের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? তাদের কেউ আপনার বাঁদী হয়ে এলে আপনার জিন্দগী একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে? সুলতান-তনয়ারা কী বাজারে কেনা বাঁদী থেকে আলাদা কিছু?

—শা-হ্-জা-দী?

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আব্বাসার দিকে তাকালো জাফর, তুমি কী কোনও সুলতান বাদশার কন্যা নাকি?

—শোন জাফর, আমি শাহজাদীও বটে, তোমার বাঁদীও বটে। আব্বাসের বংশে আমার জন্ম।

সব মনের নেশা মুহূর্তে উবে গেল জাফরের। শয্যার ওপরে সোজা হয়ে বসলো সে। তারপর চীৎকার করে উঠলো, এ তুমি কী করেছ আব্বাসা? নিজেও মরবে, আমাকেও মারবে?

ছুটে গেল সে মায়ের কাছে, মা এ তুমি কী সর্বনাশ ডেকে এনেছ?

মা কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে বললো, বাবা এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না আমার।

এরপর সে আব্বাসার চিঠিপত্রের সব কথা জাফরকে শোনালো।

যথাসময়ে প্রাসাদের হারেমে আব্বাসা একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিল। পুত্রটিকে সে তার একান্ত বিশ্বাসভাজন এক নফর বিয়াসের হাতে তুলে দিয়ে বললো, একে গোপনে মানুষ করবে। এর দেখা-শোনার জন্য আমার পরিচারিকা বারাহ্ তোমাকে সাহায্য করবে। একে নিয়ে আজই তোমরা দুজনে মক্কায় চলে যাও। এখানে থাকলে, যত সাবধানেই থাক, লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

কিন্তু যত গোপনতাই অবলম্বন করুক, এমন মুখরোচক সংবাদ চাপা রইলো না হারেমে।

ইয়াহিয়া অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেননি। তিনি প্রাসাদ তথা হারেমের রক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি প্রাসাদের সব মহলের দরজা তালা বন্ধ করে দিতেন। এতে বেগম জুবেদা ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ জানালো খলিফার কাছে।

খলিফা ইয়াহিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আব্বাজান, জুবেদা আপনার নামে নালিশ করছে কেন, কী করেছেন আপনি?

ইয়াহিয়া বললেন, কেন, সে কি আমার কাজের কোনও গাফিলতি দেখেছে? আমি কি ঠিকমতো হারেম দেখা শোনা করছি না?

—না সে সব কিছু নয়, আব্বাজান।

—তাহলে, ওর কথায় কান দিও না, ধর্মাবতার। আমি আমার কর্তব্যে কখনও অবহেলা করি না।

এরপর থেকে ইয়াহিয়া আরও সকাল সকাল হারেমের দরজায় কুলুপ লাগাবার ব্যবস্থা করেন।

জুবেদা আবার এল খলিফার কাছে। অল রসিদ সেবার বেশ কড়া ভাবেই জানিয়ে দিলেন জুবেদাকে, ইয়াহিয়া আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে শৈশবকালে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, তারই ফলে আজ আমি এতবড় বিশাল সলতানিয়তের শাসন কার্য চালাতে সক্ষম হচ্ছি। তাকে আমিই নিয়োগ করেছি হারেম দেখাশুনার জন্য। আমি জানি, তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আদেশ মোতাবেকই তিনি কর্তব্য করে চলেছেন। আমার এখনও স্মরণ আছে আমার পাঠ শেখার সময়ই তিনি এমনি কঠোর হাতে আমাকে শাসন করেছিলেন। এবং তার ফলেই আমি সত্যিকারের মানুষ হতে পেরেছি।

জুবেদা বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়ে বলতে থাকে, তা তিনি আপনাকে যেমন কঠিন শাসনে মানুষ করেছিলেন তেমনি করে নিজেরটাকে শিক্ষা দিতে পারেন নি কেন? সেটা তো একটা অমানুষ হয়েছে।

—তুমি কী বলতে চাও, বেগমসাহেবা? কে অমানুষ?

অল রসিদ ভীষণ রেগে গেলে জুবেদাকে বেগমসাহেবা বলে সম্বোধন করতেন।

জুবেদা তখন জাফর আর আব্বাসার সমস্ত গোপন কাহিনী শুনিয়ে দিল খলিফাকে।

খলিফা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনও প্রমাণ আছে?

—এই প্রাসাদ হারেমের একটি অবোধ শিশুও যে কথা জানে, তা আবার প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নাকি? আর তাছাড়া সে ছেলে তো এখনও জীবিত।

খলিফা জানতে চাইলেন, কোথায় আছে সে?

—মক্কা তীর্থে সে এখন লালিত হচ্ছে।

—তুমি ছাড়া আর কে কে জানে এ কথা?

—হারেমের সব বাঁদীই জানে।

অল রসিদ আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না।

সেইদিনই তিনি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে আব্বাসা তার এক গুপ্তচরের মারফতে মক্কায় বিয়াসের কাছে বার্তা পাঠালো, অবিলম্বে পুত্রকে নিয়ে ওখান থেকে পালাও। স্বয়ং খলিফা সেখানে যাচ্ছেন তার সন্ধানে। তোমরা অতি শীঘ্র শহর ত্যাগ করে ইয়ামিনে চলে যাবে।

মক্কায় পৌঁছে খলিফা দিকে দিকে চর পাঠালেন। তারা দু'একদিনের মধ্যে খবর এনে দিল, শাহজাদী আব্বাসার পুত্রকে ইয়ামিনের এক গৃহে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সে বেশ সুস্থ আছে।

কয়েকদিনের মধ্যে ছেলেটিকে উদ্ধার করে খলিফা বাগদাদে নিয়ে এলেন।

এর পরের ঘটনাটা ইউফ্রেট নদী-তীরে অল উমরের সেনা-ছাউনিতে সংঘটিত হয়েছিল। এবং সে যে কী নিদারুণ হৃদয়-বিদারক ঘটনা তা তো আপনারা শুনেছেন।

আব্বাসা এবং তার শিশু পুত্রকে গোবরের গাদায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছিলেন খলিফা।

এরপর রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নয়শো আঠানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এবার খলিফা হারুন অল রসিদ সম্বন্ধে শুনুন, জাঁহাপনা ঃ

সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শেষ করে খলিফা বাগদাদে ফিরে এলেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই অনুভব করতে পারলেন যে, বাগদাদ তাঁর কৈশোরের ক্রীড়াভূমি এবং যৌবনের উপবন ছিল, আজ এই বিকেল বয়সে তা বিষবৎ হয়ে উঠেছে।

সুলতান বাগদাদ পরিত্যাগ করে রাখাতে চলে গেলেন। এরপর আর কখনও তিনি ফিরে আসেননি। চির সুখের আবাসস্থল বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে কবি আব্বাস ইবন অল আহনফ্ লিখেছিলেন ঃ

যাবার সময় ওরা আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করেছিল,
আবার ফিরে এসো, ফিরে এসো এই নন্দনকাননে
কিন্তু আমরা বেশ বুঝেছিলাম, এ শুধু বিদায় অভিনন্দন।
তাই তো আমরা হাত নেড়ে বলেছিলাম, বিদায় বাগদাদ
চির বিদায় তোমাকে।

বন্ধু-বিয়োগের যে জ্বালা, খলিফা তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন। শেষের দিকে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। যাকে তাকে ডেকে বলতেন, তোমরা কেউ আমার জাফরকে ফিরিয়ে দিতে পার? তার বদলে আমার গোটা সলতানিয়ত দিয়ে দেব, পার কেউ আমার এ দুঃখ ঘোচাতে?

বারমাকীদের সম্বন্ধে যদি কেউ কখনও একবিন্দু নিন্দা অপবাদ দিত খলিফা ক্রোধে ফেটে পড়তেন, খবরদার, জিভ কেটে ফেলবো।

যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর বিশাল সলতানিয়তের একমাত্র নিয়ামক ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তাঁর হাতে তেমন কোনও ক্ষমতাই ছিল না। তাঁর চারপাশে মাছির মতো ভনভন করতো যারা, তারা ছিল সবাই ছদ্মবেশী শয়তান। মুখে তোষামদ করতো খলিফাকে, কিন্তু আড়ালে আড়ালে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতো।

খলিফা সব সময় শঙ্কিত থাকতেন, নিজের ঔরসজাত পুত্ররাই হয়তো তাঁকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে। তাদের ধারণা অল রসিদ অনেক কাল তখতে বসে

আছেন। এখন আর সেটা আঁকড়ে থাকা তাঁর পক্ষে উচিত নয়।

খলিফা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। একান্ত অনুরক্ত বিশ্বস্ত নফর চাকররা দিন দিন কেমন বিগড়ে যাচ্ছে। এই সব তাঁর দুই পুত্রের কারসাজী। মাসরুরের মতো অনুগত নফর তাঁর প্রিয় পুত্র অল মামুনের গুপ্তচর হয়ে খলিফার পাশে পাশে থেকে নজর রেখে চলে। খলিফার ব্যক্তিগত হাকিম জিবরিল—সে আবার অল আমিনের দূত হয়ে সকাল সন্ধ্যা সব খবর পাচার করে দেয়।

এ সবই খলিফার জানা। তিনি জানতেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে, কোনদিন তাঁর ছেলেদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

একদিন খলিফা একটি স্বপ্ন দেখলেন ঃ কে যেন তাঁর মাথায় খানিকটা রাঙা মাটি ছড়িয়ে দিয়ে বলছে, এই মাটিতেই তোর শান্তি হবে। আবার যেন প্রশ্ন করলো, কোথায় পাওয়া যাবে এ মাটি? উত্তর শোনা গেল তুস-এ।

খলিফা আর বিলম্ব করলেন না। পরদিনই তাঁর তাজি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন। তুস-এ যেতে হবে তাঁকে।

কয়েকদিন একটানা চলার পর তুস-এ প্রবেশ করেই খলিফা মাসরুরকে বললেন, যা দেখতো এখানে কোথায় পাওয়া যায় সেই রাঙা মাটি—নিয়ে আয় খানিকটা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল মাসরুর। তার হাতে টকটকে লাল রঙের এক চাঁই মাটি। খলিফা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে মাসরুর! এই লাল মাটিই স্বপ্নে দেখেছিলাম। আর কোনও চিন্তা নাই, এবার আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি আমাকে ডেকেছেন, যেতে হবে।

এরপর আর তাঁর ইরাকে ফেরা হয়নি।

পরদিনই খলিফার দেহ-মন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর পার্শ্বচরদের তিনি বললেন, সেই পরম লগ্ন সমাগত। আমি সারা দুনিয়ার ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু জানি, আজ তারাই আমার জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দ্বিধা করবে না।

জামাদা মাসের তৃতীয় দিবসে খলিফা তুস ভূমিতে দেহ রাখলেন। সনটা ছিল একশো তিরানব্বই হিজরী। আবুল ফিদার হিসেব মতো সাতচল্লিশ বছর পাঁচমাস পাঁচদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন খলিফা হারুন অল রসিদ।

আল্লাহর তাঁর সকল ভুল ভ্রান্তি মার্জনা করে দয়াপরবশ হোন।

তিনি ছিলেন এক ধর্মান্ধ গোঁড়া সুলতান।

শাহরাজাদ দেখলো, তার কাহিনী শুনতে শুনতে সুলতান শাহরিয়ার গভীর বেদনাহত হয়ে চোখের জল মুছছেন। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে শাহরাজাদ একটি মিষ্টি মধুর প্রেম উপাখ্যান শুরু করে দিল ঃ

এক সময়ে কোনও এক মুসলমান মুলুকে নুমানশাহ নামে এক বৃদ্ধ সুলতান প্রজা পালন করতেন। তাঁর মতো দিলদরিয়া মেজাজের বাদশাহ বড় একটা দেখা যায় না। তিনি ছিলেন আফলাতুনের তুল্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ। তাঁর স্বভাব প্রকৃতি ছিল সাধু-সন্তদের মতো। তাঁর মহিমা গরিমা ফরিদুনের মহিমা গরিমাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তাঁর রাশিচক্র ছিল আলেকজাণ্ডারের অনুরূপ। তিনি ছিলেন পারস্যের অনসিরবানের চেয়েও সৌভাগ্যবান।

সুলতানের সাত পুত্র। সাতজনই পরম রূপবান। এদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা নওজোয়ান ছিল কনিষ্ঠ পুত্র জুঁই। তার রূপ-যৌবনের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নাই।

সাত ভাই-এর মধ্যে সুলতান জুঁইকে নিযুক্ত করলেন তাঁর বিশাল গো-মহিষাবাথানের রাখাল হিসেবে।

একদিন জুঁই পাহাড়ের পাদদেশের সবুজ ঘাসের মাঠে গরু মহিষগুলোকে ছেড়ে দিয়ে উপলখণ্ডের উপর বসে মনের আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে চলেছিল, এমন সময় এক দরবেশ এসে দাঁড়ালেন ওর সামনে।

—খোদা মেহেরবান, বেটা, আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমাকে একটু দুধ খাওয়াও তুমি।

শাহজাদা জুঁই বললো, আপনি আমাকে মুশকিলে ফেললেন পীরসাহেব। এই মাত্র এদের দোহন করে সমস্ত দুধ আমি প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম। এখন আর দুধ পাওয়া যাবে না।

দরবেশ বললো, কিন্তু আমি যে বড় আশা করে এসেছি, তোমার গরুর দুগ্ধ পান করে ক্ষুধার নিবৃত্তি করবো। তুমি আর একবার দুয়ে দেখ, হয়তো কিছু মিলতে পারে।

জুঁই বললো, আপনি মুসাফীর, আপনি অতিথি, আপনাকে তুষ্ট করতে পারলে আমি ধন্য হবো। আপনি আদেশ করছেন অবশ্যই, আমি দোহন করে দুগ্ধ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। জানি না কতটুকু কী পাব।

একটা সুন্দর গভীকে ডেকে তার দুধ দুইতে লাগলো শাহজাদা জুঁই। কী আশ্চর্য, বাঁট ধরে দুচারটে টান দিতেই দুধে-ফেনায় পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠলো।

জুঁই অবাক হয়ে তাকালো ফকিরের দিকে। এ তো সাধারণ সাধু নন। নিশ্চয়ই কোনও পীর পয়গম্বর হবেন।

দুধের ভাঁড়টি বাড়িয়ে ধরলো জুঁই। আর হাত পেতে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিল সে। তারপর ঢেকুর তুলে বললো, তোমার এ আতিথেয়তা বিফলে যাবে না, বেটা। যে দুধ তুমি আমাকে খাওয়ালে তা অমৃত। এই অমৃত দানের সুফল পাবে তুমি।

আজ আমি তোমার কাছে এক শুভ সন্দেশ বয়ে নিয়ে এসেছি। এক ভালোবাসার সংবাদ।

শোনও বাবা, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি, তার মতো তোমার হৃদয় ভালবাসার জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছে। মহব্বত জীবনকে মহৎ করে। তবে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগ্য পাত্রীর মিলন হওয়া দরকার। আমি সেই সন্ধানই দিতে এসেছি তোমাকে।

এই মরুপ্রান্তরের ওপারে এক শস্য-শ্যামল দেশ আছে। সেখানকার সুলতান আকবরের কন্যা সুন্দরী বাদাম তার ফুলবাগিচায় বিহার করছিল। আমি তাকে দেখে তার যোগ্য পাত্র অনুসন্ধানে বেরিয়েছি। তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি বিশেষ প্রীত এবং মুগ্ধ হয়েছি। একথা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি ঐ শাহজাদীই হতে পারবে তোমার যোগ্য পত্নী। তার মতো রূপ-লাবণ্যবতী একালে বিরল। তোমার সঙ্গে যথার্থই মানাবে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো নিরানব্বইতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে:

আমি জানি, সে তোমারই পথ চেয়ে দিন গুনছে। আমি তোমার হৃদয়ে মহব্বতের বীজ অংকুরিত করে গেলাম। এখন তুমি দেখ, কী করে তাকে লাভ করতে পার।

এই বলে দরবেশ চলে গেলেন।

শাহজাদা জুঁই সত্যি সত্যিই প্রিয়া-মিলন আশায় অধীর হয়ে উঠলো। মজনু যেমন লাইলার জন্য আকুল হয়েছিল একদিন, সেই রকম আকুল হলো তার দেহ মন প্রাণ।

গো-মহিষ ফেলে রেখে সে মাতালের মতো ছুটে চলতে লাগলো।

একদিন রাতে শাহজাদী প্রাসাদের ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখলো, একটি পরম রূপবান যুবক তার কাছে এসে অধরে চুম্বন এঁকে দিচ্ছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে সেই সুন্দর সুপুরুষ যুবক অদৃশ্য হয়ে গেল। শাহজাদী আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো, কোথায় গেল, কোথায় গেল সে?

সকাল না হওয়া পর্যন্ত সারা রাত ধরে সে ফুঁপিয়ে ফাঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

সুলতান এবং বেগম এ সংবাদ শুনে ছুটে এলেন কন্যার কাছে, আলুলায়িত চুলে শাহজাদী তখন অসংবৃত বেশ-বাসে শয্যায় বসে খাটের বাজুতে মাথা কুটছিল।

মা-বাবাকে দেখে সে ক্ষিপ্র হাতে নিজেকে সংবৃত করে নেয়। এক এক করে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন ওরা! সবগুলোর যথাযথ জবাব দেয় সে। কখনও

বা সোচ্চার হয়ে আবার কখনও বা ঘাড় নেড়ে।

ওরা ভাবলেন, কন্যা দুঃস্বপ্ন দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তখুনি হকিম ডাকা হলো। কিন্তু তাতে উপকারের বদলে আরও খারাপ হয়ে পড়লো বাদামের অবস্থা। হকিম বললো, দেহে বদরক্ত জমা হয়েছে। ওটা বের করে দিতে হবে।

হাতের শিরা কাটা হলো, কিন্তু কী আশ্চর্য, এক ফোঁটা রক্তও ঝরে পড়লো না হাত থেকে।

হকিম হতাশা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, না, আশা নাই।

এর দিনকয়েক পরে।

হাসি গান হৈ-হল্লার মধ্যে ভুলিয়ে রাখার জন্য শাহজাদীর সখী, সহচরীরা সব সময় তাকে ঘিরে বসে থাকে।

একদিন বিকালে ওরা শাহজাদী বাদামকে সঙ্গে করে বাগানের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাদামের দৃষ্টি পড়লো একটি যুবকের ওপর। হঠাৎ ওর বুকের মধ্যে ঘ্যাঁৎ করে উঠলো।

যুবকটি কিন্তু একমনে সুমধুর তানে বাঁশী বাজাতে বাজাতে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।

এরপর একদিন শাহজাদীর এক বশংবদ নফর এসে খবর দিল, মালকিন, হাজারা থেকে এক পরম রূপবান রাখাল বালক এসেছে, এখানে। তার বাঁশী শুনে সবাই পাগল হয়ে উঠেছে।

নফরের কথা শুনে শাহজাদীর মুখে হাসি ফোটে। জিজ্ঞেস করে কোথায় আছে রে সে?

—আমাদের বাগানের এক পাশে ডেরা গেড়েছে।

—তার নাম কী জানিস?

—জানি মালকিন, শাহজাদা জুঁই!

শাহজাদী একখানি প্রেমপত্র লিখে নফরের হাতে দিয়ে বললো, যা, ওকে দিয়ে জবাব নিয়ে আয়।

শাহজাদা জুঁই প্রিয়ার পত্র পড়ে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই রাতে যথানির্দিষ্ট সময়ে শাহজাদী বাদাম এসে দাঁড়ায় বাগানে। তার অনেক আগেই জুঁই বাগানে প্রবেশ করে এক গাছের ডালে আত্মগোপন করেছিল।

বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাদাম চকিত হরিণীর মতো এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। এমন সময় জুঁই বৃক্ষশাখা থেকে নেমে পড়ে নিচে। ঠিক একেবারে শাহজাদীর সামনে।

জুঁই ভাবলো, দরবেশ একটুও বাড়িয়ে বলেনি শাহজাদীর রূপের কথা।

সেই রাত্রির অমল ধবল জ্যোৎস্নালোকে দুজনে আরও কাছে সরে এল। আরও কাছে। তারপর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করতে থাকলো ওরা। চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত হয়ে ওঠে অধর। দুজনেরই অশান্ত অন্তরে দল মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে দুটি রক্তগোলাপ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

এক সহস্রতম রজনী :

আবার সে বলতে শুরু করে :

পরদিনই শাহজাদী বাদাম বাবার সংগে সাক্ষাৎ করে একটি আর্জি পেশ করলো।

বাবা কন্যাঅন্ত প্রাণ ; তার কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখতে চান না তিনি।

শাহজাদী বাদাম বললো, বাবা, প্রতিদিন বিকালে মাঠে বেড়াতে যাই আমি ! সংগে থাকে আমার সখী সহচরীরা। মুক্ত বাতাস আর তরুলতার শ্যাম শোভা দেখে আমার চিত্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এই কদিনে এরই মধ্যে দেখ বাবা, আমার শরীর কেমন বেশ তাজা হয়ে উঠেছে।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি বাবা, মাঠে আমাদের যেসব গরু মহিষ চরে বেড়ায় সেগুলো বড়ই দুর্বল, রোগা পটকা। আমার মনে হয় রাখালরা একদম নজর দেয় না ওদের দিকে। না খেতে পেয়ে ওদের ঐ দশা হয়েছে। আহা, অবোধ পশু ওরা, মুখে তো ভাষা নাই, তাই আপনার কাছে নালিশ জানাতে পারে না ওরা। মাঠে বেড়াতে বেড়াতে কাল একটি চমৎকার রাখাল ছেলেকে দেখেছি। ভেবেছি ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো। তুমি তাকে সব ভার দিয়ে একবার পরখ করে দেখো, হয়তো সে আমাদের গরু মহিষগুলোকে আদর যত্ন করে পালন করতে পারবে।

কন্যার এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে সুলতান বিস্মিত হয়ে বলেন, এটা কী একটা আর্জি হলো তোমার ! এই তুচ্ছ কথাটা বলতে তুমি সাত সকালে ছুটে এসেছ আমার কাছে। বেশ তো, তুমি যদি তাকে পছন্দ করে থাক, এক্ষুণি ধরে এনে রাখালের পদে বহাল করে দিচ্ছি।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় শাহজাদী বাদাম জুইকে সংগে করে বাবার কাছে এসে বললো, এই সেই রাখাল ছেলে বাবা। শুনেছি দারুণ চৌকস।

সুলতান আকবর বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ব্যক্তি। রাখাল বালকের আলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য ও দেহ-সৌষ্ঠব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। এমন ছেলে রাখাল হলো কী করে ?

বাবাকে সন্দিহান হতে দেখে শাহজাদী বাদাম বললো, বুঝেছি বাবা, তোমার মনে সংশয় জেগেছে, এমন সুন্দর ছেলে সাধারণ রাখাল-পরিবারে জন্মালো কী করে ? কিন্তু বাবা নিয়মের কী ব্যতিক্রম ঘটে না। সুলতান বাদশাহর ঘরে কী অসুন্দর সন্তানের জন্ম হয় না কখনও ? তুমি ওর বাইরেটা দেখে বিচার করো না বাবা। ওকে কাজে বহাল করে দেখ, সে প্রমাণ করবে, রাখালের কাজে তার জুড়ি নাই।

সুলতান আকবর কন্যাকে খুশী করার জন্যই এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন তুললেন না। হাত নেড়ে তিনি তাঁর সম্মতি জানিয়ে দিলেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। দুনিয়াজাদ উঠে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললো, কি সুন্দর তোমার গল্পগুলো দিদি, আর কি মিষ্টি করেই না বল তুমি।

এই তিন বছরে বালিকা দুনিয়াজাদের দেহে ভরা যৌবনের বান এসেছে। বোনকে আদর করে বুকে জড়িয়ে বলে, দুনিয়া, এখন তুই বড় হয়ে উঠেছিস। প্রাণে তোর বসন্ত জেগে উঠছে। এখন তো এই সব গল্পই তোর ভাল লাগবে। তবে এ আর এমন কী প্রেম-কাহিনী। কাল রাতে মহব্বতের এমন কিস্সা শোনাবো, দেখবি বুকে তুফান উঠবে। অবশ্যই সবই নির্ভর করছে মেহেরবান জাঁহাপনার মর্জির ওপর। তিনি যদি সদয় থাকেন তবেই প্রাণে বাঁচবো, না হলে আজকের রাতই শেষ রাত হয়ে যাবে।

শাহরাজাদের কথার প্রতিবাদ করে সুলতান শাহরিয়ার আর্তনাদ করে ওঠে, আঃ কী হচ্ছে, শাহরাজাদ। আমি কি এখনও আগের মত অশান্ত উন্মত্ত আছি নাকি? এই দীর্ঘ তিন বছর ধরে তোমার কাছে নানা ভিন্ন স্বাদের কাহিনী শুনে একদিকে যেমন অনাবিল আনন্দ পেয়েছি, অন্যদিকে তেমন আমার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন বেশ বুঝতে পারি শাহরাজাদ, ক্রোধ মানুষকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। ষড়রিপুর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এই ক্রোধ। তোমার যাদুস্পর্শে আমি আজ ক্রোধ পরিহার করতে শিখেছি। আমার হৃদয়ে প্রশান্তির পদ্ম ফুটিয়েছ তুমি।

তুমি যদি ইচ্ছা কর, আজই অথবা কালই তোমার কাহিনীর শেষ করতে পার, শাহরাজাদ। আমার চিত্তে আর কোনও ক্ষোভ জ্বালা নাই। তবে জুঁই আর বাদাম-এর কিস্সার শেষটুকু অবশ্যই শুনতে সাধ হচ্ছে। আজ না হোক, কাল শুনিয়ে দিও, কী বল?

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনার যা অভিরুচি।

এরপর সুলতান শাহরিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নেন। যুবতী দুনিয়াজাদ লজ্জায় মুখ ঢেকে পাশ ফিরে শোয়।

পরদিন যথাসময়ে দরবারে আসেন সুলতান। প্রতিদিনের মতো সেদিনও উজির-কন্যার মৃতদেহ সৎকারের জন্য শবাচ্ছাদন সঙ্গে করে এনেছে। প্রতিদিনই সে শঙ্কিত হয়ে দরবারে প্রবেশ করে। আজ হয়তো তার কন্যার মুণ্ডচ্ছেদের সংবাদ ঘোষণা করবেন সুলতান। কিন্তু না, আজ তিন বছরের মধ্যে তার সে আশংকা—আশংকাই থেকে গেছে। কার্যতঃ কিছু ঘটেনি।

সেদিনও উজিরের হাতে কফিনের কাপড় দেখে সুলতান শাহরিয়ার বললেন, কাল থেকে ওটা আর আনবেন না। আর দরকার হবে না।

এরপর দরবারের অন্য কাজে মন দিলেন তিনি।

দিন শেষে সন্ধ্যে হতে না হতে সুলতান হারেমে চলে আসেন। তারপর শাহরাজাদের সঙ্গে তাঁর প্রাত্যহিক খানাপিনা রতিরঙ্গ-আদি সমাধা করে শয্যার এক পাশে বসে বলেন, এবার শেষটুকু শুনিয়ে দাও শাহরাজাদ। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো আমরা।

এক সহস্র একতম রজনী :

আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে :

এরপর শাহজাদা বাইরের জীবনে সুবোধ রাখাল ছেলে এবং রাতের অন্ধকারে অতি সংগোপনে শাহজাদী বাদামের বক্ষলগ্ন হয়ে এক দুর্দান্ত দামাল ছেলের মতো দিন কাটতে থাকে।

দিনের বেলায় গরু মহিষগুলোকে সে মাঠে মাঠে ছড়িয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সন্ধ্যের আগেই বাঁশী বাজিয়ে ডেকে এনে আবার তাদের খোয়াড়ে ভরে ফেলে। তারপর শুরু হয় তার অভিসার।

বাগানে ঢুকে গাছের ডালে লুকিয়ে শাহজাদীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে। যথাসময়ে বাদাম এসে উপস্থিত হয়। তারপর সারারাত ধরে চলে ওদের মান অভিমান, রাগ অনুরাগ এবং পরিশেষে রতিরঙ্গের রমণীয় পালা। এইভাবে ওরা জীবনকে রূপে রসে প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে।

কিন্তু এই নিষিদ্ধ প্রেমপর্ব গোপনে গোপনে আর কতকাল চালানো সম্ভব? একদিন ওদের এই নৈশ মিলনের দৃশ্য দেখে ফেলেছিল সুলতানের এক দূর সম্পর্কের ভাই। লোকটি তার নিজের ছেলের জন্য শাহজাদীর শাদী দেবার জন্য সারাক্ষণ সুলতানের পাশে পাশে ঘুরঘুর করতো। কিন্তু পাত্র হিসাবে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন যোগ্যতাই ছিল না। তাই সুলতান তাকে বড় একটা আমল দিতেন না।

মওকা পেয়ে সুলতানের কাছে গিয়ে লোকটা শাহজাদী বাদামের নৈশ বিহারের কাহিনী বেশ ফলাও করে তুলে ধরলো। সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। বাদামকে তিনি ডেকে পাঠালেন তখুনি। শাহজাদী অধোবদনে এসে পড়লো বাবার সামনে।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা! তুমি বাদশাহর ঘরে জন্মেছ, একি নোংরা আচরণ তোমার! আমি স্নেহে অন্ধ হয়ে তোমাকে অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। এখন দেখছি মহা ভুল করেছি। পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর উপদেশ বাণীতে এক জায়গায় বলেছেন, আমার অনুরক্তরা শোন, সংসারে বেগম, বাঁদী এবং কন্যারাই তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাদের কোনও বিবেক বা বিচার-বুদ্ধি বলে কিছু থাকে না। ওরা জন্মগতভাবেই পঙ্গু। তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, তাদের কড়াভাবে কয়েদ করে রাখা। দড়ি ছাড়া পেলেই তারা অপকর্ম করে বসবে। কঠিন হাতে শাসন করবে তাদের। অবাধ্য হলে প্রহার দিয়ে ঠাণ্ডা করবে।

এখন তুমি আমাকে বল বাদাম, এ অবস্থায় তোমাকে আমি কী প্রহার করবো? তুমি একটা অচেনা অপরিচিত নাম-গোত্রহীন রাখাল ছেলের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ। এমন জঘন্য কাজে নামতে তোমার একটু আত্ম-মর্যাদায় বাধলো না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই তলোয়ারের এক কোপে তোমার মুণ্ডুটা কেটে নামিয়ে দিই। অথবা তোমাদের দুজনকে জ্বলন্ত

চিতায় তুলে জীবন্ত দগ্ধ ক'রে মারি।

শাহজাদী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। কন্যাপ্রাণ সুলতান বললেন, থাক থাক, আর চোখের পানি ফেলে আমাকে কাবু করতে হবে না। ঢের হয়েছে, এবার হারেমে চলে যাও। আমার হুকুম ছাড়া আজ থেকে আর তুমি বাইরে বেরুতে পারবে না। তারপর ঐ রাখাল ছোঁড়াটাকে কী ভাবে বাঘ-ভালুক দিয়ে খাওয়াতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

সুলতান তাঁর পুত্রদের ডেকে বললেন, ঐ রাখাল ছেলেটাকে পাহাড়ের ওধারের গভীর জঙ্গলে রেখে আসতে হবে। ওই বনে এমন হিংস্র জানোয়ার আছে যে, এক রাতেই ওকে সাবাড় করে দেবে।

ঐ বনের ত্রিসীমানার কাছে যায় না কেউ। শোনা যায় মাঝে মাঝে ঐ জঙ্গল থেকে বাঘ-সিংহরা বাইরের মাঠ থেকে আস্ত আস্ত গরু মোষ ধরে নিয়ে যায়।

শাহজাদা জুঁইকে সুলতানের সশস্ত্র প্রহরীরা ঐ গভীর অরণ্যের ঠিক মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে চলে এল।

রাত বাড়ছিল। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল সমগ্র বনাঞ্চল। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আপন মনে বাঁশী বাজাতে থাকে জুঁই। এক এক করে বনের জন্তু-জানোয়াররা জড়ো হতে লাগলো জুঁই-এর আশেপাশে। বাঁশীর সুরে ওরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জুঁই ওদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর জানাতে থাকলো।

এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। একটি বাঘ-সিংহও তাকে আক্রমণ করলো না। বরং সকালে তখন সে তাদের বিদায় জানিয়ে বন থেকে বাইরে চলে এল। দুটি সিংহশাবক তার সঙ্গ ছাড়লো না কিছুতেই।

রাখাল ছেলেকে সশরীরে ফিরে আসতে দেখে সুলতান তো থ'। এমন অসম্ভব কান্ড সে ঘটালো কী করে!

জুঁই সুলতানকে কুর্নিশ করে সিংহশাবক দুটি উপহার দিল। এরপর সুলতান আর কী করেন, খুশী হয়ে তিনি তাঁর প্রাণদন্ড মকুব করে দিলেন।

সুলতানের পুত্ররা কিন্তু পিতার এই আচরণে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা ঠিক করলো, সেইদিন সন্ধ্যাকালেই শাহজাদী বাদামের শাদী দিয়ে দেবে তারা। কিন্তু পাত্র কোথায়? এমন সময় সেই চাচাটা এসে বললো, কেন, আমার ছেলেই তো আছে। তার সঙ্গেই শাদী দিয়ে দাও।

সেই রকমই ব্যবস্থা হতে লাগলো। সারা প্রাসাদে উৎসবের আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু যথাসময়ে পাত্রীকে আর হারেমে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না সেই রাখাল ছেলেকেও।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সারা দেশে গুপ্তচর সৈন্য পাঠানো হলো। তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করলো তারা সারা মুলুক। কিন্তু কোনই হদিশ করা গেল না তাদের।

তারপর কতকাল কেটে গেল, শাহজাদী বাদাম আর ফিরে এল না তার বাবার প্রাসাদে।

ধরণীর এক কোণে কোথায় যে গিয়ে ওরা সুখের নীড় রচনা করেছিল কেউ জানতে পারেনি কোনও দিন।

শাহরাজাদ বললো, এই হচ্ছে শাহজাদা জুঁই আর শাহজাদী বাদামের অবিস্মরণীয় প্রেম-উপাখ্যান। যেমনটি আমি শুনেছিলাম ঠিক তেমনি ভাবেই শোনালাম আপনাকে। জুঁই আর বাদাম নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল কেউ তা বলতে পারেনি। তারা যেখানেই যাক আল্লাহ তাদের সুখে সম্ভোগে রেখেছিলেন এটাই আমরা আশা করবো।

এরপর শাহরাজাদ থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, গল্পটা কিন্তু বড়ই চমৎকার! এমন প্রেমের প্রতিমূর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃতির পটে চিরদিনই ভাস্বর হয়ে থাকবে।

শাহরাজাদ, তুমি আমাকে শুধু গল্পই শোনাওনি এতদিন ধরে। তোমার কাছে থেকে অনেক শিক্ষাই আমি লাভ করেছি। তুমি আমাকে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছ। আমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে জ্ঞানের চিরাগ বাতি জেলে দিয়েছ।

এক এক করে এক সহস্র একটি রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তোমার পবিত্র সাহচর্যে। আমার সন্দিগ্ধ কলুষিত চিত্ত পূত-পবিত্র করে তুলেছ তুমি। দুচার কথায় তোমার মহিমা প্রকাশ করবো কী করে?

আজ আমি সকল কলুষমুক্ত আনন্দের ঝর্নাধারা হয়ে উঠেছি। এজন্য একমাত্র তুমিই দায়ী।

দুনিয়াজাদ উঠে এসে বড় বোনকে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যিই দিদি, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতার তুলনা মেলে না। কী সুন্দর সুন্দর সব কিসসা তুমি আমাদের শুনিয়েছ। আর সেগুলো তোমার মুখে মধু হয়ে ঝরেছে। আমরা অমৃত সুধা পান করেছি তোমার গল্পকথা শুনে।

শাহরাজাদ অনুজার কানে কানে কি যেন ফিস ফিস করে বললো। দুনিয়া উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং প্রায় তক্ষুণি ধাই দুটি যমজ শিশু পুত্রকে কোলে কাখে নিয়ে প্রবেশ করলো। তার পিছনে পিছনে আর একটি ফুটফুটে ছেলেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে এল দুনিয়াজাদ।

শাহরাজাদ তিন পুত্রকে আদর চুম্বন করে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে এগিয়ে দিল।

শাহরাজাদ স্বয়নে সুলতানকে সম্বোধন করে বলতে থাকলো, জাঁহাপনা এদের একটু আদর সোহাগ করুন। এরা আপনার ঔরসের সন্তান। এই বড়টিকে দেখছেন, এর বয়স দু'বছর। আর এই যমজ দুটির শিগ্গিরই এক সাল পূর্ণ হবে। আল্লাহর দোয়ায় ওরা সুস্থ সবলই আছে এখনও। আপনার স্মরণ থাকতে পারে জাঁহাপনা, ছয়শো উনআশীতম রজনী থেকে সাতশোতম রজনী পর্যন্ত আমি আপনাকে কোনও গল্প শোনাতে পারিনি। ঐ সময় আমি এই যমজ শ্রীমানদের জন্মদানের জন্য সূতিকাগারে ছিলাম। বড় ছেলের চেয়ে এরাই আমাকে বেশি ভুগিয়েছিল। বড়টির সময় আমি মাত্র কয়েকটি রজনী গল্প শোনাতে পারিনি। কিন্তু এই যমজ প্রসবের ধকল সহ্য করতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। এছাড়া ছোট খাটো অসুখে বিসুখে আরও কিছু রজনী আপনার কাছে উপস্থিত থাকতে পারিনি আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঠিক, প্রায় একটানা তিনটি বছর আপনাকে গল্প শোনাতে পেরেছি। জানি না, সে সব গল্পের কতটা আপনার মনে দাগ কাটতে পেরেছে। যদি কোনও কাহিনী ভাল না লেগে থাকে তবে সে দোষ গল্পের নয়, আমার। হয়তো বলার অক্ষমতাকেই ভাল লাগাতে পারিনি। আর যদি কোনও গল্প আপনার হৃদয়ে কিছুমাত্র দাগ কেটে থাকে তার পুরস্কার আমার প্রাপ্য নয়। সে সব কাহিনী যাঁরা রচনা করে গেছেন সে ইনাম তোলা থাক তাঁদের জন্য।

শাহরাজাদ থামলো।

দুনিয়াজাদ শিশু তিনটিকে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিতে থাকলো। আড়চোখে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে বাক্যবাণ ছুঁড়লো, তা হলে জাঁহাপনা, এবার তো আমার দিদির মুণ্ডুচ্ছেদ করবেন আপনি? এই যে ফুলের মতো আপনার তিনটি শিশু, এদের মাকে তো হত্যা করবেন আজ? এই অবোধ শিশু শাহজাদাদের মাতৃহারা করবেন না জাঁহাপনা?

সুলতান শাহরিয়ার দুনিয়াজাদের বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন, ঢের হয়েছে দুনিয়া, এবার ক্ষান্তি দেবে? আমি তো আমার ভুল স্বীকার করেছি, তবুও কেন এত যাতনা দিচ্ছ?

তারপর শাহরাজাদের দিকে তাকিয়ে বললো, এরা তোমার কোলে আসার অনেক আগে থেকেই তুমি আমার হৃদয়ে পাকাপাকিভাবে আসন পেতে নিতে পেরেছ শাহরাজাদ। কেন না, এই শিশুপুত্রদের মুখ চেয়ে আমার মন কোমল হয়েছে। ওরা আমার পরম আদরের সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি ওদেরও অধিক। তোমাকে পেয়ে আজ আমি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি, শাহরাজাদ। তোমার অদর্শন আমি আর সইতে পারবো না। আমি যতদিন বাঁচবো, তুমি আমার জীবনে ধ্রুবতারার মতো জ্বলবে চিরদিন। আমি তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তার কারণ তোমার মত নম্র বিনয়ী বিদুষী বিচক্ষণ সত্যাশ্রয়ী পবিত্র মধুরভাষিণী সচ্চিদানন্দা জ্ঞানী রসবতী নারী আমি এর আগে কখনও

পাইনি আমার জীবনে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন [illegible]মা। তোমার মাতা পিতা ভগ্নী এবং তোমাদের পরিবারের সকলকে তি[illegible]খে শান্তিতে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা জানাই। শাহরাজাদ, এক সহস্র এব বিনিদ্র রজনী আমরা অতিবাহিত করেছি। কিন্তু সে রাত্রিগুলো প্রকাশ্য দিবালোকের চেয়ে আরও আলোময় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমাদের জীবনে।

সুলতান শাহরিয়ার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে স[illegible]হে শাহরাজাদের মাথাটা টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। শাহরাজাদ সুলতানের [illegible]খানা হাত অধরে ঠেকিয়ে মিনতি জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা আজকের এই [illegible]ানন্দের মুহূর্তে আপনার দুঃখকাতর বৃদ্ধ উজিরকে এ খবর শুনালে তি[illegible]আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন।

সুলতানের ইশারায় প্রহরী তক্ষুণি উজিরকে সঙ্গে ক[illegible]য়ে এল সেখানে। তখনও তার হাতে ধরা একখানা কফিন। সারা দিনরাত [illegible]ঐ কফিনখানা বয়ে বেড়াতো।

সুলতান উজিরকে আলিঙ্গন করে বললেন, আপনার [illegible]ন্যাকে আমি আমার হারেমে শুধু নয় হৃদয়-আসনে বসিয়েছি চিরদিনের মতো। আপনি আর মনে [illegible]ানও সংশয় দ্বিধা রাখবেন না, আপনার কন্যা আমার [illegible]ছ সুখেই থাকবে [illegible]িরকাল।

বৃদ্ধ উজির আনন্দে অধীর হয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো। দুনিয়াজাদ গোলাপজল এনে বাবার চোখে মুখে ঝাপটা দিতে থাকলো।

একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেল উজির। ক্ষীণ কণ্ঠে ব[illegible]তে পারলো, আজ তিনটি বছর ধরে আমি চোখের দুপাতা এক করতে পারিনি মা। প্রতিটি রাত্রি আমার সামনে দারুণ এক বিভীষিকার রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুলতান শাহরিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজামানকে সংবাদ পাঠালেন। সমরখন্দের অল আজমের সুলতান। কয়েকদিনের মধ্যে সে এসে উপস্থিত হলো বড় ভাই-এর কাছে।

সারা শহর আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো। আতর ধূপের গন্ধে মেতে উঠলো আকাশ বাতাস।

খানাপিনার মহোৎসবে সুলতান শাহরিয়ার শাহজামানকে শাহরাজাদের অসাধারণ গুণকীর্তন করতে লাগলেন। প্রায় তিন বছর গল্প শুনিয়ে কীভাবে সে তার চণ্ডভাব বিতাড়িত করে আদর্শ মানুষ করে তুলতে পেরেছে সে সব কথা বলতে বলতে সুলতান গদগদ হয়ে উঠলেন।

—সে এখন আমার নিত্যসঙ্গী, আমার বেগম, আমার সন্তানের জননী।

এরপর সুলতান শাহরিয়ারের অনুরোধে শাহজামান দুনিয়াজাদকে শাদী করে বেগমের মর্যাদা দিল।

শাহরাজাদ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে থাকলো, জন্মাবধি দুনিয়া আমার কাছ ছাড়া হয়নি কখনও। আজ ও অন্য দেশে চলে যাবে, এ বিরহ আমার পক্ষে সহ্য করা শক্ত হবে জাঁহাপনা।

শাহজামান বললো, আমি বড় ভাই-এর কাছেই বাকী জীবনটা কাটাতে ইচ্ছা
কিন্তু কি করবো, সমরখন্দের মসনদ রক্ষা করতে হবে তো ? যাই হোক,
দিচ্ছি, দুনিয়া বেশির ভাগ সময় এখানে থাকবে। আমিও থাকবো এখানে

সুলতান শাহরিয়ার কলমচীদের ডেকে শাহরাজাদের কাহিনীগুলো সোনার
দ লিপিবন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।
এরপর তিরিশটি খণ্ডে লেখা হয়েছিল সে গ্রন্থ। তার নাম দেওয়া হয়েছিল
লিফ লায়লা'। [আমরা বাংলায় একেই সহস্র এক আরব্য রজনী নাম
ছি।] আজও সে গ্রন্থ পৃথিবীর এক মহান্ সাহিত্য-সম্পদ হয়ে আছে।

সমাপ্ত